

নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী



শ্রীকল্যাণী মল্লিক

এম.এ., পি-এইচ. ডি.



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৫০

মূল্য পনের টাকা ।



চাঃ স্যামুয়েল

লিঃ প্রঃ স্যামুয়েল ও. স্যামুয়েল

BCU 1291

Ref
NOT TO BE REMOVED
6/6/71

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় কর্তৃক
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

155333

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

অশেষ-শাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায়
ডক্টর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

পরিচায়িকা

নাথ-সম্প্রদায় বলিয়া যে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় মধ্যযুগ হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের অজ্ঞাত নয়। নাথ-গুরুদের অলৌকিক কাহিনী সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি নানা ভাষায় বিবিধ ভাবে গ্রথিত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষার সম্বন্ধে ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই সম্প্রদায়ের আদি-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল নাকি বাংলা দেশে, এবং অন্যান্য নাথ-যোগীদের কথাও, এ দেশে, মঙ্গলকাব্যের মত রচিত নাথ-গীতিকায় ও কাহিনীতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধর ও শিষ্যা ময়নামতী বাংলা গোপীচন্দ্রের গীতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও এই সম্প্রদায়ের পূর্ববৃত্তান্ত ও ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব সূক্ষ্ম নয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু ইহার দর্শন ও সাধনা-পদ্ধতির বিবরণ যাহা এ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, তাহা পর্যাপ্ত বা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ জিজ্ঞাসু পাঠকের অভাব বলিয়া নয়, বিবরণ ছুপ্রাপ্য বলিয়াই এ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার শেষ নাই। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য প্রকৃত অনুসন্ধানীর শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান বিজ্ঞী লেখিকার সেই উৎসাহ ও একাগ্রতা আছে বলিয়াই আমি তাহার বিস্তৃত ও সারগর্ভ প্রথম রচনাটিকে বিশ্বসমাজে পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি।

কিন্তু রচনার বিষয়টি চিন্তাকর্ষক হইলেও সহজসাধ্য নয়। অন্তর্গত হ্রস্বতার কথা ছাড়িয়া দিলেও বহির্গত উপকরণের অভাব রহিয়াছে যথেষ্ট। নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে এত অসঙ্গতি ও সংশয়ের কারণ রহিয়াছে যে তাহা হইতে একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্ত রচনা করা নিরাপদ নয়। ইহার তব ও সাধনা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের অভাবও যথেষ্ট। ইহা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, এই ভারত-বিস্তৃত প্রাচীন সম্প্রদায়ের

কোনও আদি মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ের গ্রন্থাদি, যাহা হইতে ইহার বৃত্তান্ত উদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহাও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ও ছুপ্রাপ্য, জলহাওয়ার প্রভাবে বা যত্নের অভাবে লুপ্তপ্রায়। ইহার অধিকাংশই অজ্ঞাত; যেগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদের সংগ্রহ করা যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা যাহারা এ ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, মধ্যযুগের অগ্রাঙ্ক সম্প্রদায়ের তুলনায়, নাথ-সম্প্রদায়ের পুঁথি অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে; অধিকাংশই এখনও অমুদ্রিত অথবা অপ্রখ্যাত স্থান হইতে মুদ্রিত। ইহার মধ্যে সবগুলিই যে প্রাচীন ও প্রামাণিক তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, নাথ-গুরুদের শিক্ষা ছিল পরম্পরাগত। গুরু তত্ত্ব বলিয়া অনধিকারী বা সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকের নিকট প্রকাশ্য ছিল না; তাই কোন বিশিষ্ট পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। কারণ যাহাই হউক না কেন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সাধক-সম্প্রদায়ের একটি সুসংযত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে যে তথ্যের উপাদান ও তত্ত্বের আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হয় নাই।

কিন্তু প্রাচীন বাংলা দেশ বুঝিতে হইলে ইহার প্রাচীন ধর্মসাধনা না বুঝিলে চলিবে না। অতীতের যে লুপ্ত চেতনা ও অনুভূতির উপর বর্তমানের ভাব ও চিন্তা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে; কারণ, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। বাঙালীর যুগবাহী অধ্যাত্মচিন্তার যে সনাতন স্বরূপ, যাহার মগ্ন ভিত্তিমূলের উপর বাঙালীর আত্মচেতনার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত, নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনা তাহারই একটি দিক। সুতরাং বাঙালীর পক্ষে ইহার তথ্যানুসন্ধান ও তথ্যানুশীলনের প্রয়োজন রহিয়াছে। নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বৃত্তান্ত লিখিবার সময় হয়ত এখনও আসে নাই; কিন্তু সমস্ত অশুবিধা সত্ত্বেও বর্তমান গ্রন্থে যতদূর সম্ভব ছুপ্রাপ্য আকরের অনুসন্ধান ও বিভিন্ন মোহন্তদের সহিত আলোচনা করিয়া যে বহু-আয়াস-সাধ্য বিবরণ রচিত হইয়াছে, তাহা এই প্রয়োজনের একটি উপযোগী দিক-নির্ণয়ের সহায়তা করিবে বলিয়াই মনে হয়।

(মহাযান বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, সেগুলি পরবর্তী বৌদ্ধ মতের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত।

ইহার সহিত যোগ রহিয়াছে হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্বের। তাহা ছাড়া, বাংলা দেশে বৈষ্ণব মতের বহু পূর্বে শৈব মতের প্রাচুর্য ও প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নাথ-ধর্ম বিশিষ্ট হইলেও এই সব প্রচলিত মতবাদকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই যদিও আমাদের লেখিকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা মূলতঃ ছিল শৈব। কিন্তু মধ্যযুগের চিন্তায় ছিল একটি সম্মিশ্রণ প্রবণতা (Syncretism), যাহার দ্বারা ঘটিয়াছিল উপরোক্ত বিভিন্ন সাধনা-পদ্ধতির পরস্পর সংযোগ ও সমীকরণ। তাই পরিভাষা ও বিবৃতির প্রণালী বিভিন্ন হইলেও সকলের মধ্যে একটি মূলগত সাদৃশ্য বা ঐক্য রহিয়াছে। লেখিকা দেখাইয়াছেন, এই সকল অধ্যাত্ম সাধনার একটি মূলমন্ত্র হইতেছে অন্তরঙ্গ 'যোগ'-সাধন, অপরটি হইতেছে দেহতত্ত্ব। দুইটি প্রস্থানের অঙ্কুর বহুপ্রাচীন, কিন্তু মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ভাবে পল্লবিত হইয়াছে। এই মূলকথা বোঝা কঠিন নয়; কিন্তু মধ্যযুগে এই গূঢ় তত্ত্ববাদের ভাষা হইয়াছে রূপকে ভাষা, তাই ছরুহ ও ছর্কোধ্য। আত্মগত সাধনা ভিন্ন ইহার বিশ্লেষণে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধিমতী লেখিকা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত নাথ-সম্প্রদায়ের বর্তমান গ্রন্থগুলি অবলম্বন ও আলোচনা করিয়া ইহার বিশিষ্ট তত্ত্বগুলির একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়াছেন। তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা যে নিষ্ফল হয় নাই তাহার পরিচয় গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে লেখিকা যে সকল সমস্কার উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সমাধান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে, তথাপি তাহার একাগ্র প্রয়াস ও যত্ন যদি ভবিষ্যৎ চর্চার ও সমালোচনার সহায়তা করে, এবং তাহার সংগৃহীত উপাদান যদি ভবিষ্যৎ পূর্ণতর বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাহার অনুশীলন একেবারে বার্থ হয় নাই। এ দাবী গ্রন্থকর্তা নিজেও করেন নাই যে এই ছরুহ বিষয়ের সকল সমস্কার তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আরও অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু তিনি সমগ্র বিষয়টির যে সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মীর পথপ্রদর্শক হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার এই সামান্য ক্রমিকার উদ্দেশ্য নয়।

সে ভার বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, যাহারা মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় ও সাধনা-পদ্ধতির রহস্য-লোকে প্রবেশ করিতে উৎসুক, তাহারা ইহা হইতে, আমারই মত, যথেষ্ট উপকার ও আনন্দ লাভ করিবেন।

কলিকাতা
১লা জাহুয়ারী, ১৯৫০ }

শ্রীশুশীলকুমার দে

অবতারণা

নাথ-সম্প্রদায় একদা সমগ্র ভারতবর্ষে একটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায় রূপে গণ্য হইত, নাথ সম্প্রদায়ের যোগীদের ভারতের সর্বত্র গতিবিধি ছিল এবং তাঁহাদের অলৌকিক কীর্তি ও কাহিনীসকল আসমুদ্রহিমাচল লোককে স্তম্ভিত করিত। নাথসিদ্ধদের মধ্যে দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিজ্ঞ ও রাজাদেরও অভাব ছিল না, দেশের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে ইহারা জীবন উৎসর্গ করেন। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৃতবিদ্য তেজিতরি, গ্রীয়ারসন, পুঁসা, উইন্টারনিটজ, গ্রুনবিভেল, লেভি, তুচী, ব্রীগ্‌স প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং প্রাচ্যের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ, পণ্ডিত অম্ল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, পণ্ডিত বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ রাধাগোবিন্দ নাথ, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাঃ মহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডাঃ মোহন সিং, ডাঃ রমণ শাস্ত্রী, ডাঃ হনুমান্দেব দে, ডাঃ হুমুয়ার সেন প্রভৃতি আলোচনা করিলেও নাথ-দর্শন একপ্রকার অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। অতএব এবিষয়ে অহুসঙ্কান ও আলোচনা করিবার যথেষ্ট অবসর অজ্ঞাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এযাবৎকাল মাত্র দুইটি নাথদর্শনের সংস্কৃত পুথি কানী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি পুথি প্রকাশিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে দোহাকোষ, গোরক্ষশতক, গোরক্ষসংহিতাদির নামও সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু কান্মীর হইতে প্রকাশিত গোরক্ষকৃত 'অমরোষ শাসন' বা হরিধার হইতে প্রকাশিত 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির' নাম অনেকের অজ্ঞাত থাকা বিচিত্র নহে। এখনও বিভিন্ন দেশে পুথি সকল অনাবিকৃত রহিয়াছে বা আবিকৃত হইয়াও মুদ্রিত হয় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রিত পুথিও অসম্প্রদায়িক লোকের নিকট গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি পুথির নকল অতি কষ্টে আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। হিন্দী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষাতেও এই সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আছে, বিভিন্ন দেশ হইতে সে সকল পুথিও কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়াছি। অনতিবিলম্বে সেগুলি প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। গোরক্ষনাথ, মৎস্কেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাথগুরুদের অলৌকিক কাহিনী বঙ্গীয় কবিদের উপজীব্য হইয়া বঙ্গভাষায় বিভিন্ন গীতিকায় পরিণত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে এসম্বন্ধে চিত্র ও নাটকাদি রচিত হইয়াছে, হিন্দী ভাষাতে ও উড়িয়া ভাষাতে কাব্য রচিত হইয়াছে, নেপালেও নেওয়ারী ভাষায় রচিত নাটক ও পুরাতন কাহিনীর অভাব নাই। নাথযোগীদের মধ্যে মৎস্কেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ প্রধান, ইহারা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালে মৎস্কেন্দ্রনাথের পূজা হয়, তাঁহার রথযাত্রা এখনও সে স্থলে প্রচলিত।

নাথযোগীদের কর্মক্ষেত্র বঙ্গদেশেই অধিক। মৎস্তেন্দ্র এই ধর্মের আদি প্রবর্তক ছিলেন, তাঁহার আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে ছিল, বঙ্গভাষায় তাঁহার রচিত পদ পাওয়া গিয়াছে। নাথগুরু ও গোরক্ষ শিষ্য মধো জালন্ধর নাথ বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্রের গুরু ছিলেন, সম্ভবতঃ জালন্ধরনাথই বঙ্গীয় গীতিকার হাড়িপা। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা, একথা গীতিকার মধো পাই, ময়নামতী, গোপীচন্দ্র, গোরক্ষনাথাদি সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী নাথগীতিকা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যাশী গীত হয়। গোপীচন্দ্রের গানের একসময়ে ভারতব্যাপী প্রচলন হইয়াছিল। মীননাথ প্রভৃতির রচিত পদও একসময়ে কীর্তনের সুরে গীত হইত। এই সকল কারণে বঙ্গদেশের সহিত নাথসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব বহু শতাব্দী ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে।

নাথসিদ্ধদের গৌরবময় যুগের কথা কেবল তাঁহাদের ইতিহাস নয়, তাঁহাদের ধর্ম ও দর্শনকে স্বরণ করাইয়া দেয়, তাই নিবন্ধ রচনায় তাঁহাদের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে তাঁহাদের দর্শনও আলোচনা করিয়াছি। এই নিবন্ধকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি,—‘ঐতিহাসিক’ অংশ, দর্শন বা ‘সিদ্ধান্ত’ অংশ এবং ‘সাধনা’ অংশ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক অংশে বিশেষ কোন নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হয় নাই, বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অমুদ্রিত পুথি হইতে সারসঙ্কলন করিয়া এবং মঠমন্দিরাদি দর্শনে লব্ধ আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। নিবন্ধ রচনার আরম্ভের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে বা যে সকল নূতন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাধামত সে সকল হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যোজনা করিয়াছি। এ সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ও আর্ম্মাণ ভাষায় রচিত কয়েকখানি মূলগ্রন্থাদি দেখিয়াছি, হিন্দীতে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি পড়িয়াছি, মহারাষ্ট্রে ভাষায় রচিত জ্ঞানেশ্বরীর হিন্দী অলুবাদ দেখিয়াছি। এই সকল পাঠ ও আলোচনার দ্বারা আমি মৎস্তেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া ঐতিহাসিক অংশে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (তারানাথ, লেভি, শহীদুল্লাহ প্রভৃতি মৎস্তেন্দ্রকে সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া ধাৰ্য্য করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় লুইপাকে নবম শতাব্দীর বলিয়াছেন, ভাণ্ডারকার ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অল্পমান করেন, গোরক্ষ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন, বাগচী মহাশয় লিপিত হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মৎস্তেন্দ্রনাথের ‘কৌল-জ্ঞাননির্ণয়’ পুথি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এবং পুথির রচয়িতা দশম শতাব্দীর শেষ ভাগের। ডাঃ মোহন সিং তাঁহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় প্রতিহার বংশের প্রাধাত্যের যুগে গোরক্ষনাথ বর্তমান ছিলেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে গোরক্ষের জন্ম খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ও মৃত্যু দশম শতাব্দীতে হয়।^১ প্রচলিত এবং

১। গোরক্ষনাথ গ্রন্থের ভূমিকা।—ডাঃ মোহন সিং।

বৌদ্ধগান ও বৌদ্ধার ভূমিকা—পৃঃ ১০, ২০, শাস্ত্রী সম্পাদিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৩৪; হুকুমার সেন।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা পৃঃ ৪, ৫, বাগচী সম্পাদিত।

নির্ভরযোগ্য যে কয়টি প্রমাণ আছে, তাহার দ্বারাও কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। জ্ঞানেশ্বরী তন্ত্রালোক ও কোলজ্ঞান নির্ণয় এই তিনটি গ্রন্থের সমন্বয় সাধন করিয়া আমি মৎস্তেন্দ্রকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষকে একাদশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির করিয়াছি। নিবন্ধমধ্যে এই কালনির্ণয়ের কারণ নির্ণীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও তথ্য আবিষ্কৃত হইবে আশা করিতেছি। লুইপাদ ও মৎস্তেন্দ্র এক কি ভিন্ন, উভয়ের ধর্মমত কি, নবগোরক্ষনাথ ও নবমৎস্তেন্দ্রনাথের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। তাহাদের সম্পর্কিত কয়েকটা স্থানের নির্দেশের প্রয়াসও করিয়াছি, যদিও বহু শতাব্দীর পর এ সমস্তার মীমাংসা কঠিনতম হইয়া পড়িয়াছে।

এই নিবন্ধের সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশদ্বয়ে এ পর্যন্ত আলোচিত নাথদর্শনের অপূর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিবার প্রবৃত্তি করিয়াছি, গ্রন্থাদির সাহায্যেই নাথদর্শন আলোচনায় বাধ্য হইলেও, এই অংশদ্বয়কে আমার মৌলিক আলোচনা স্বরূপ মনে করি। দ্বৈত বা অদ্বৈত মতামতের সহিত নাথমতের তুলনা নিম্নপ্রয়োজন, কারণ প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ প্রত্যেকের বিশেষত্ব, তাই শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতামতের বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়া কেবল নাথমতের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে যেটুকু প্রয়োজন তাহাই নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে নাথদর্শনের বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এতাবৎকাল ধারাবাহিকরূপে বা পূর্ণাপরসম্বন্ধরূপে ইহার আলোচনা হয় নাই। নাথদের যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ বা অমুদ্রিত পুঁথি আশ্রয় করিয়া আমি নাথদর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছি, সে সকল মৎস্তেন্দ্রনাথ বা গোরক্ষনাথ বিরচিত কি না তাহা বিবেচনা স্বধীমণ্ডলী সন্দেহপ্রকাশ করিবার অবকাশ পাইতে পারেন মনে করিয়া প্রথমেই স্বীকার করিতেছি যে প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে কোন পুঁথি কাহার রচিত তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। লিপিতত্ত্ব হইতে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার কালনির্ণয় সম্ভব হইলেও রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়, তথাপি এইটুকু স্বীকার্য যে গ্রন্থগুলি যে ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, মঠাদিতে ঘুরিয়া ও নাথযোগীদের সহিত আলাপ করিয়া এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

বিংশাদিক বৎসর অতীত হইল কালীর সরস্বতী ভবন হইতে 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ', 'সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ' মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও তাহা লইয়া কেহ সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। হরিদ্বার নাথব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি' মুদ্রিত হইলেও, সাধারণের পক্ষে উহা দৃশ্যাপ্য রহিয়াছে, বহু বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে উহার অমূল্যলিপি মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, কারণ পুঁথিটি যোগসম্বন্ধীয় এবং গোরক্ষকৃত, উহা অসম্প্রদায়ী ব্যক্তির নিকট গোপন রাখা কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। গোরক্ষপুরের মোহন মহারাজের সহিত এই পুঁথি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং স্বয়ং তৎপূর্ব হইতেই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে উহার অংশবিশেষ বোঝিত করিতেছি। যোধপুর

মিউজিয়মে সিন্ধুসিদ্ধান্তপদ্ধতি সম্বন্ধীয় ২৫টি চিত্রও রহিয়াছে। তাহাদের বিশেষ বিবরণ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; মহারাজ মানসিংহের রাজত্বকালে এই সকল চিত্র অঙ্কিত হয়, ইহাদের প্রত্যেকটির আকার ৪ × ১২ ফুট। রাজপুত চিত্রকরের তুলিকার ইহারা উত্তম নিদর্শন। নাথসম্প্রদায়ের বহু পুথি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিবন্ধ রচনাকালে ও তৎপরেও দক্ষিণভারত, যোধপুর, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকটি পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আলোড়য়ার মহারাজা যোগীদের বিষয়ে সন্ধান করিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পুথিশালায় নাথসম্প্রদায়ের পুথি থাকা বিচিত্র নহে। শান্তিনিকেতনের চীনাভবনে বা পাটনার স্থবিধ্যাত গ্রন্থাগারে এ বিষয়ে কোন পুথি নাই।

যে কয়েকটি মঠ দর্শন করিয়াছি সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভার অনতিদূরে নবাবপুরায় 'গোরক্ষ-টীলা' নামক স্থান আছে, মঠটি বহু প্রাচীন, ভগ্নপ্রায় মন্দিরচূড়ায় একটি অশ্বখ বৃক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে, মঠে মনুষ্যবসতির চিহ্ন নাই, মন্দির মধ্যে কোন মূর্তিও নাই। প্রাঙ্গণে একটি মৌনীর নেপালী সাধুর দর্শন মিলিল, তাহার কণ্ঠে নাথদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন সিংহাদ ও পবিত্রী থাকিলেও কর্ণে কুণ্ডল ছিল না। তিনি প্লেট আনিয়া হিন্দীতে লিখিয়া জানাইলেন শেষ মোহন লালনাথ মৃত হইলে তৎশিষ্য অর্জুননাথ শাস্ত্রাদিসহ হরিদ্বারে গমন করেন এবং তথায় তাহার অপঘাত মৃত্যু হয়। এক্ষণে মন্দির-সম্মুখে গোরক্ষ ও জালন্ধরের চরণ মাত্র সার হইয়াছে, মন্দির-মধ্যে যে সকল মূর্তি ছিল তাহা অপহৃত হইয়াছে। মন্দিরটি বর্তমানে যোধপুর মহারাজের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু কোন সাধুর সেখানে বাস করিবার অহুমতি নাই। দালানে সাধুদের থাকিবার উপযোগী বহু কুঠরী শূন্য পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া এককালে তাহার সমুদ্র অবস্থা অহুমান করিয়া ছুঃখ হইল।

কাশীর কালভৈরবের মন্দির সন্নিকটে নাথদের একটি ক্ষুদ্র মঠ আছে, বাবা বটুকনাথ ইহার মোহন, তিনি স্বল্প বয়সী এবং দর্শনী অর্থাৎ দর্শন বা কুণ্ডলধারী। নামের শেষে 'নাথ' পদবী ও পূর্ণ দীক্ষা হইলে 'কুণ্ডল' ধারণ নাথ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। মোহন নেপালী ও গৃহী, মাত্র তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতামাতাকর্তৃক কালভৈরবের চরণে উৎসর্গীকৃত হইলে, পূর্ক মোহন তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। মোহন পরিবার সেদিন জামাতার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন ছিলেন, জামাতা পূর্ক নেপালের দেবী পাটানের মন্দিরের ভাগরী ছিলেন, মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ক ঐ মঠে তাহার বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে শুনিলাম। ইহা শুনিয়া আমরাও আর কালবিলম্ব না করিয়া মোহনের পরামর্শানুযায়ী বাবা মঙ্গলনাথের মঠে চলিলাম। আমার সঙ্গীর মধ্যে একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ছিলেন, মোহন একটি গৃহী নাথসাধুকে সঙ্গে দিলেন, ইহার কর্ণে কুণ্ডল ছিল না।

অনতিদূরে বাবা মঙ্গলনাথের আশ্রম, বাবাজীর বয়স অশীতি বৎসরের উর্দ্ধে

হইলেও বেশ বলিষ্ঠ স্বপুরুষ, দীর্ঘ শ্বেতশ্রবণ ও জটামারী। তাঁহার সম্মুখেই গোরক্ষ প্রজ্জ্বলিত ধুনি জ্বলিতেছে এবং একটি মন্দিরের মধ্যে গোরক্ষনাথের বৃহৎ মূর্তি রহিয়াছে। বাবাজী অশ্বখবৃক্ষতলে কুশাসনে আমাদের বসিবার স্থান নির্দেশ করিলেন। কথাবাহিনী জানিলাম তাঁহার আদি নিবাস জয়পুরে, বহু বৎসর কাশীবাসী হইয়াছেন। বাবাজী বলিলেন, “গোরক্ষনাথের পিতামাতা ছিল না, তাঁহার দেশ বা জাতিও ছিল না, তিনি মহাদেবের ত্যাগের মূর্তি বিশেষ, পার্শ্বতীকে এই মূর্তিতে দেখা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং শঙ্কর গোরক্ষরূপে আবির্ভূত হন।” রাজা গোপীচন্দ্রের বিষয়ে বলিলেন, “অজরত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত মাতা ময়নামতী পুত্রকে সিদ্ধযোগী জালন্ধরের নিকট প্রেরণ করেন, গোপীচন্দ্র তাঁহাকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যার চেষ্টা করিলেও সফলকাম হন নাই।”

অনেক অহুনয়ের পর বাবাজী অহুগ্রহ করিয়া আমাদের সহিত গোরক্ষ-গায়ত্রী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও কোন শাস্ত্রগ্রন্থের সন্ধান পাইলাম না, আমাদের সমস্ত যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল তাঁহার নিকট হার মানিল, কেবল স্বীকার করিলেন, পূর্বে তাঁহার নিকট দুইটা পুথি ছিল বটে, কিন্তু জনৈক সাধু তাহা পাঠের নিমিত্ত লইয়া গিয়া প্রত্যর্পণ করেন নাই। তিনি হরিদ্বার আশ্রম ও কয়েকটা মূর্তিত পুথির নাম উল্লেখ করিলেন। বাবাজী বিশেষ অহুরোধ করায় সেদিন ঐ স্থানে প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইল। বৃদ্ধের অমায়িক স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমরা সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু পুথির কথা আমি ভুলিতে পারি নাই। তাহার পুনরুল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, “শাস্ত্রপাঠে কি হইবে? আমাদের সাধন অহুভূতি-সাপেক্ষ।” আমি বলিলাম “তাহা সত্য, কিন্তু এই প্রকারে সম্প্রদায়ের তবসকল লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।” তদন্তরে তিনি সম্মুখের অশ্বখবৃক্ষ দেখাইয়া সহাস্ত্রে বলিলেন, “ঐ যে বৃক্ষ দেখিতেছ তাহা মৃতপ্রায়, কিন্তু তাহার শাখাপ্রশাখা কিরূপ সতেজ দেখিয়াছ? বালকের সহিত বৃদ্ধ কি দৌড়াইয়া পারে? আমাদের সম্প্রদায় এখন ঐ বৃদ্ধ অশ্বখের ন্যায়।” আবার সাক্ষাৎ করিতে বারম্বার অহুরোধ করিয়া বাবাজী আমাদের বিদায় দিলেন।

কাশীর চৎগঞ্জে বাবা গুলাবচন্দ্রের মঠে কালভৈরবের নাথপন্থী যোগীদের মঠের সন্ধান পাইয়াছিলাম। বাবা গুলাবচাঁদ কেনারামী সম্প্রদায়ের অধোদী, ইংরাজি-শিক্ষিত, বৃদ্ধ, সরল ও অতিশয় বিনয়ী। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি আছে, একটি পাক্ষিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদক। তিনি কালীমঠে যন্ত্রাদির ও শিবালার নিকটবর্তী অধোদীমঠে ষট্চক্রের চিত্রের সন্ধান দিলেও, কার্যতঃ তাহাদের সন্ধান গিয়া তাহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাই নাই। যন্ত্রাদি দর্শনে অসম্প্রদায়িকের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের একেবারেই অনধিকার, চক্রের চিত্রের পরিবর্তে কয়েকটা সমাধি ধুনি ও তৎপার্শ্বে স্থপ্ত কুণ্ডলীকৃত দুইটা কুকুর, দস্তাজেয়, কেনারাম প্রভৃতির মূর্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছিল। মোহন বাবাজী চক্রাদির চিত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না।

কেনারামী অঘোরীরা নিজেদের অবদূত বলেন, আমাদের আলোচ্য নাথমার্গের আদর্শও 'অবদূত'। বাবা গুলাবচন্দ্রের সহিত ষট্চক্রসাধনার বিষয় আলাপ হইয়াছিল, বাবাজী বলেন, "অঘোরী ষট্চক্রের সাধক, অশ্রান্ত তান্ত্রিকেরা পঞ্চমকারের সাধক, অর্থাৎ নাভিমূল হইতে তাঁহার পঞ্চচক্রের মধ্য দিয়া বায়ুকে উর্দ্ধে নীত করেন। অবদূতের সাধনা মূলাধার চক্র হইতে, অতএব ইহাই ষট্চক্রের সাধন। মূলাধার হইতে বায়ু উত্তীর্ণ করেন বলিয়া অঘোরীদের মূত্রবিষ্ঠাহারী বলা হয়, ইহা ভ্রান্তিমাত্র। অঘোরী পক্ষে 'মৈধুন' অর্থে খেচরী মূত্রা সাধন দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া।" তৎপরে অতি সঙ্কোচের সহিত মুক্ত করে বৃদ্ধ বলিলেন, "মাফ্ কী জিয়েগা, বাঙ্গালামে পঞ্চমকারকা ছসরা অর্থ কিয়া গয়া ছায়।" ইহার রচিত 'বিবেকসার' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, অবদূত হইতে শ্রেষ্ঠ মার্গ আর নাই, পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি অবদূতের বেশ, অবদূত শিবোপাসক। বর্তমান কালে অবদূতের সিকান্দ কেহ মান্ত না করিয়া ভ্রান্তির পথে চলিয়াছেন, ইত্যাদি।

কলিকাতার নিকট দমদমে গোরখ বাহুলীতে বৃহৎ মঠ ও মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে ভর্তুহরি, গোরক্ষনাথ ও গোপীচাঁদের তিনটি বৃহৎ মূর্তি আছে, অশ্রান্ত দেবতার ক্ষুদ্র মূর্তিরও অভাব নাই, গোরক্ষ প্রজ্জ্বলিত ধূনিও আছে। মোহন্তর নাম 'বুধনাথ'। ইহাদের বিশ্বাস গোরক্ষনাথ ভারতের দক্ষিণ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার নিমিত্ত ঐখানে আগমন করেন। পূর্বে গঙ্গা ঐ মঠের নিকট ছিল। ভাণ্ডারগৃহে ধূলিধূসরিত কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থের ছিন্ন পত্র ব্যতীত কোন পুথির সন্ধান মিলিল না। যথেষ্ট প্রসাদ ও সরল ব্যবহার পাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। নিকটবর্তী বাটগাছি গ্রামে সাধক চিকিৎসক নগেন্দ্রনাথ নাথ মহাশয়ের নাম শুনিয়া তথায় গমন করিলাম। তাঁহার আশ্রয় ফলপ্রদ ঔষধের জ্ঞান দূরদূরান্তর হইতে সর্ব জাতি ও সর্ব শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশ দেখিলাম, কিন্তু কোন শাস্ত্র-গ্রন্থের সন্ধান মিলিল না। নাথসম্প্রদায়ের কোন শাস্ত্রগ্রন্থের সন্ধান তিনি রাখেন না দেখিলাম।

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের মঠ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মোহন্ত মহারাজ শ্রীমদ্ দিগ্বিজয় নাথ, বি, এ, দীর্ঘাবয়বসম্পন্ন ও স্বর্ণকুণ্ডলধারী। তিনি স্বদেশপ্রেমী নামে খ্যাত। তিনি মন্দির-মধ্যে লইয়া গেলেন, দেখিলাম গোরক্ষের কোন মূর্তি নাই, তাঁহার চরণদ্বয় পুষ্প ও নৈবেদ্যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, মন্দিরের গৃহতল স্বেতপ্রস্তর নিশ্চিত, চতুর্দিক ধূপ, ধূনা ও পুষ্পের গন্ধে আমোদিত। একপার্শ্বে গোরক্ষের কল্পিত মূর্তির একটি চিত্র রহিয়াছে, তৎপার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে গোরক্ষ-প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ শত শত বৎসর ধরিয়া জলিতেছে। মন্দিরের বহির্গাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। আমরা মন্দির-পরিভ্রমণ করিয়া কালীমূর্ত্যাদি দর্শন করিলাম। মন্দিরটি বৃহৎ না হইলেও তাহার চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। অতিথিশালা প্রভৃতির অভাব নাই। সেইদিন মন্দিরদর্শনপ্রার্থী পাটনা হইতে আগত মুসলমান ফকীরদের

দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। গোরক্ষমন্দিরের বাহিরে কৃতপূৰ্ণ মঠাধ্যক্ষ মহাশয় গভীরনাথের স্বন্দর মন্দির দেখিলাম। মন্দির মধ্যে বাবাজীর যেত প্রস্তরের স্বন্দর মূৰ্ত্তি রহিয়াছে। নৈতিক চরিত্রবলে তিনি সকলের নমস্কৃত হন, সাধুদের মধ্যে তিনি 'সিদ্ধ-যোগী'রূপে খ্যাত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী না হইলেও তাঁহার বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী শিষ্য আছেন, তাঁহাদের অর্থেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোরক্ষপুরের মঠ নাথপন্থীদের প্রধান তীর্থ বিশেষ। ইহার ভাণ্ডারগৃহেও কোন পুথির সন্ধান না পাইয়া যথার্থই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। গোরক্ষপুরের সুবিখ্যাত গীতা প্রেসের সবাধিকারী মহাশয়ের পুথি-সংগ্রহাগার আছে সন্ধান পাইয়া, সেখানে গিয়া যে দুইটি পুথির সন্ধান পাইলাম তাহা পূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে। নাথযোগীরা অলৌকিক সিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। যোগীদের অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে মিসেস্ ডেভিড্ ওনিল নামে একজন ইংরাজ মহিলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রহস্তাবৃত তিস্তত নিষিদ্ধ রাজ্যের জায়, তথায় বৌদ্ধলামার বেশে কোন মহিলার প্রবেশ করিয়া মঠাদির বিবরণ দেওয়া অতি বিস্ময়ের ব্যাপার। সম্প্রতি ভাগ্যক্রমে এই মহিলার সহিত আমার আলাপ ও আলোচনা হয়। ইনি এক্ষণে অশীতিপর্য্য বৃদ্ধা হইলেও যথেষ্ট সক্ষম। সাধনার বলে একদা ইনিও সিদ্ধিলাভ করেন।

বহু বৎসর যাবৎ নানাস্থানে নিজে গিয়া বা পত্র লিখিয়া অহুসঙ্কানের ফলে যে সকল পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার পুস্তকাগারাদ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শঙ্করনারায়ণ চৌবে বি,এল, এবং সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ মিশ্র, কাশী বিজ্ঞাপীঠ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষেরা, কাশীর শ্রীযুক্ত গিরিদারীলাল বাসজী, যোধপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পার্শ্বলাল নাগ, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল পুথির পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ এ, সঙ্করণ, এম, এ, পি, এইচ, ডি এবং তাজোর মহারাজের গ্রন্থাগারাদ্যক্ষ শ্রীগোপালন, বি-এ, বি-এল আমার বিশেষ ধন্যবাদার্থ। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার জন্ত আমি তাঁহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, নানা তীর্থ পর্য্যটক শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেলগাঁওয়ের ডাঃ এন, আর, সাকারে এম, এ, টি, ডি, রায়বাহাদুর স্বরেশচন্দ্র সিংহরায় বিজ্ঞানার্ণব, এম, এ, প্রভৃতি দ্বারা আমার পত্রের উত্তরদান বা গ্রন্থদান করিয়া আমার কাৰ্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত বাসজীর নিকট আমি একটি পুথির জন্ত বিশেষভাবে ঋণী। পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য ও পণ্ডিত তারকেশ্বর পাঠকশাস্ত্রী প্রাচীন সংস্কৃত, হিন্দী ও রাজস্থানী ভাষায় রচিত পুথির ছরুহ অর্থ উদ্ধার করিতে আমায় যে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্ত আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ভবিষ্যতে অহুসঙ্কিত ব্যক্তি দ্বারা নাথযোগীদের অজ্ঞাত পুথি সংগৃহীত হইলে আরও আলোচনা সম্ভব হইতে পারে।

মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনগত ঐক্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি নিবন্ধের ঐতিহাসিক অংশের শেষাংশে করিয়াছি, ইহা অহুসঙ্কিত পাঠক দ্বারা পৃথকভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য বিষয় বলিয়া মনে করি। বর্তমান নিবন্ধের অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় এবং আমার গবেষণার বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় এ বিষয়ে আমার আলোচনার ফল আমার নিবন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত করিতেছি না।

মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের আলোচনা করিলে জানা যায় যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান কাল হইতে যে সকল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, তাহাদের প্রত্যেকের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য আছে। নাথ সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধনের সহিত উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনের তুলনা করিলে চিত্তবৃত্তির একটি সাধারণ ধারা প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। নাথদর্শন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে সকল গ্রন্থ অবলম্বনে যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্তরের মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে। নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি মূলতঃ আশ্রয় করিয়া, সমজাতীয় প্রচলিত তত্ত্ব ও উপনিষদের সাহায্যে নাথসিদ্ধদের দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইয়াছি, কারণ মধ্যযুগের দর্শন আলোচনায় ইহা ব্যতীত উপায়াস্তর নাই। তত্ত্বের সহিত নাথদর্শনের যোগ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। ডাঃ মোহন সিং সংক্ষেপে উপনিষদের সহিত ও ডাঃ পীতাম্বর দত্ত বড়খাল নিগুণ সম্প্রদায়ের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই নিবন্ধে তত্ত্ব ও উপনিষদ উভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি, প্রসঙ্গতঃ সন্ত, হুফী, রসেশ্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহিত নাথদের যোগসূত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া মস্ত্যান, কালচক্রবান, জৈন সম্প্রদায় এবং কাপালিক, কালামুখ, পান্তপত, অঘোরীদের সহিত নাথদের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। ইহাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান সকল স্থলে সাক্ষাৎ ভাবে না ঘটিলেও, চিন্তাধারার সাধারণ ক্ষেত্র হইতে ঐক্যের উদ্ভব হয়। কালের নিখরম হস্তে কয়েকটি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইলেও, ভারতের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ফল্গুধারার জায় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া বহুযুগ হইতে প্রবাহিত হইয়া একটি ক্ষীণ যোগসূত্রের স্থাপনা করিয়াছে। সেই যোগসূত্রটি অন্তরঙ্গ সাধন বা 'যোগ' সাধন। দেহমধ্যে বিশ্বকল্পনা এই যুগের সাধনের বৈশিষ্ট্য। পৃষ্ঠীয় দশম শতাব্দী হইতে জিয়াকাও ও বহিরঙ্গ সাধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া অন্তরঙ্গ সাধন প্রচলিত হয়। নাথপন্থের "লবণং তোয়সম্পর্কাদ্ যথা তোয়সমং ভবেৎ। মনোহপি ব্রহ্মসম্পর্কাত্তথা ব্রহ্মময়ং ভবেৎ॥" (অমনস্ক ১।২৫) প্রভৃতির অতুল্য কথা বৌদ্ধসহজিয়া ও জৈনদের সাধন মধ্যে পাওয়া যায়। নাথপন্থের যাহা শিব ও শক্তি, বৌদ্ধসহজিয়ার তাহাই শূন্যতা ও কল্পনা; নাথদের যাহা নাদ ও বিন্দু, বৌদ্ধসহজিয়ার তাহাই প্রজ্ঞা ও উপায়; নাথদের যাহা সামরঙ্গ, বৌদ্ধদের তাহাই

এবমকার; নাথদের বাহা সিদ্ধদেহ, বৌদ্ধদের তাহাই বজ্রদেহ, রসেশ্বরের তাহাই হরগৌরীতত্ত্ব, পাতঞ্জল মতে ইহাই কায়সম্পৎ। নাথদের কুণ্ডলিনী শক্তি, বৌদ্ধদের নৈরাশ্য দেবী। বাক্সী, সহজ, শূত্র, মন্ত্রযোগ, উন্নয়নী, মুদ্রা প্রভৃতির সাধন মধ্যযুগের বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, সন্ত, স্থকী সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। গুরুবাদ ও ধর্মের অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইত। তথাপি নাথদর্শন আলোচনাকালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে, সর্বত্র অন্তমতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তুলনামূলক আলোচনা করা নিরাপদও মনে হয় নাই।

এদেশে নাথসিদ্ধদের 'বৌদ্ধ' সম্বাসী রূপে অভিহিত করার প্রথা প্রচলিত আছে, তিব্বতীয় ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় বিশিষ্ট নাথসিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত নাথপন্থীদের যোগাযোগ অধিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য রচয়িতা স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "নাথ-মহাস্তদের ধর্ম বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং নাথগীতিকাগুলিতে ও হাড়িপার উপদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে। গোরক্ষের চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি ও গুরুভক্তি আছে। এইরূপে নাথধর্মে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণে মিশিয়া গিয়াছিল।" তাঁহার রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থে মীননাথ ও গোরক্ষনাথকে তিনি বৌদ্ধযোগীরূপে অভিহিত করিয়াছেন। নেপালে মন্ত্রেশ্বরনাথ অবলোকিতেশ্বরের অবতার ও চতুর্থ বোধিস্বরূপে গণ্য হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মন্ত্রেশ্বরকে বৌদ্ধসম্বাসী বলিয়াছেন। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নাথপন্থকে বৌদ্ধমতের রূপান্তর ও সহজসিদ্ধির উত্তরাধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া ও বিভিন্ন মোহন্তদের সহিত আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাদের মূলতঃ 'শৈব' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। নাথদের মন্ত্র "শিব-গোরক্ষ", তাঁহাদের তীর্থ শৈব তীর্থ, তাঁহারা শিবের স্ত্রায় কুণ্ডলধারী, তাঁহাদের কণ্ঠে যোনিলিঙ্গের প্রতীক ধারণ বিধি, কোটেশ্বর তীর্থ হইতেও তাঁহারা এই চিহ্ন ধারণ করিয়া আসেন এবং নিজেদের 'শৈব' বলিয়া পরিচয় দেন। "গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে" (পৃ: ৪৭) উল্লিখিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর উপাসকের মোক্ষের আশাও বৃথা। অতএব নাথেরা বৈষ্ণব ছিলেন না। মন্ত্রেশ্বর শৈব ধর্ম প্রচার করিতেই নেপালে গমন করেন, তিনি পাশ্চপত শৈবের বেশ ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে বৌদ্ধসম্বাসী বলা অসঙ্গত। কালীতেও কাল-ভৈরবের মন্দিরের পূজারীরা নাথযোগী। নাথযোগীদের দর্শন, গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা ফলে নাথ-সিদ্ধযোগীর যে চিত্র আমার মনে উদ্ভিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন গ্রন্থে সংযোজিত চিত্রে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি।

নাথমার্গে তন্ত্র ও রহস্যবাদের অপূর্ণ মিশ্রণ আছে। প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া এদেশে তন্ত্রের প্রচার হয়।^১ তন্ত্রের

১। Modern Buddhism in Orissa, N. N. Vasu, Intro. p. 10.

দীক্ষাপ্রণালীও অবৈদিক, অতএব হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম একই মূল হইতে তত্ত্ব শিক্ষা করেন; এবিষয়ে কেহ কাহারও নিকট স্বীকৃতি নহেন। বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত নাথগ্রন্থের অধিক যোগাযোগ আছে একথা বলা সম্ভব নহে। নাথগ্রন্থে শিব ও শক্তির উল্লেখ বারংবার দেখা যায়। সহস্রাব, ইড়া, পিকলা, স্মৃতা, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়। নাথমতে শিবশক্তির সামরস দ্বারা ও বৌদ্ধ সহজসিদ্ধিমতে শূন্যতা করুণার মিলন দ্বারা চিত্তের সমতা লাভই উদ্দেশ্য। তত্ত্ব হিন্দুর পঞ্চম বেদ, তন্ত্রের আগম এবং করিয়া মন্ত্ররূপী মন্ত্রশ্রেষ্ঠ যোগধর্ম শিক্ষা ও প্রচার করেন, মন্ত্রশ্রেষ্ঠ নিজেকে 'কৌল' বলিয়াছেন। কৌলেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা শিবোপাসক। মন্ত্রশ্রেষ্ঠ রচিত কৌল গ্রন্থে বৌদ্ধদের উল্লেখ মাত্র নাই। মন্ত্রশ্রেষ্ঠ মন্ত্র ধরিতেন, সম্ভবতঃ গোরক্ষ পন্থত্যা করিতেন, অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহারা প্রাণী-হত্যাকারী হইয়া বৌদ্ধ হইতে পারেন না। গোরক্ষ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ডাঃ মোহন সিংহ তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সাধনগত ঐক্য দেখিয়াও তাঁহাদের বৌদ্ধ বলা চলে না। বৌদ্ধ সহজিয়া দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে উপনীত হইবার সাধনা করেন। নাথযোগী বলেন, "দ্বৈতবা-
দ্বৈতরূপং দ্বয়ং উত পরং যোগিনাং শব্দয়ং বা"। এই তত্ত্বাতীত অবস্থা দ্বৈত বা অদ্বৈত নহে, ইহা দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ অবস্থা, এককথায় 'মাদৃশ এব তাদৃশ এব' অবস্থা, ইহাই নাথমার্গের 'পরমপদ'। নাথগুরুকে 'নাদবিন্দুকলায়নে' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বৌদ্ধ সহজিয়া গুরু 'যুগনন্ড' রূপ। অতএব নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন বলা যায় না। তবে মন্ত্রশ্রেষ্ঠনাথ পাশুপত শৈব গুরু হইয়াও নেপালী বৌদ্ধদের উপাস্ত দেবতারূপে এখনও পূজা পাইতেছেন, ইহা স্বীকার্য।

বঙ্গদেশের সহিত নাথযোগীদের ঘনিষ্ঠ সন্ধি থাকায় আমি এই নিবন্ধ বঙ্গভাষায় রচনা করিতে কৃতসম্মত হই, কিন্তু উপযুক্ত বাংলা লিপিবদ্ধ ও শিক্ষিত যন্ত্রচালক অভাবে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। এতৎসহ সংযোজিত গ্রন্থশূচীতে আমি মাত্র এই নিবন্ধের অল্প ব্যবহৃত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছি। পাদটীকায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত নামের বিবরণ ও ইংরাজিগ্রন্থের তালিকাও যোজিত হইল। শব্দশূচীতে কেবল নাথমতের বৈশিষ্ট্যমূলক শব্দের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধকালীন গোলযোগে ইচ্ছামত সকল গ্রন্থ সংগ্রহ সম্ভবপর না হইলেও, ভারতের বিভিন্নস্থানের গ্রন্থাগারাদ্যক্ষদের আমি যথেষ্ট সাহায্য ও সহায়ত্ব লাভ করিয়াছি, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার হইতেও সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই আমার বিশেষ ধন্যবাদার্থ।

এই নিবন্ধ রচনায় আমি অগ্রনিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিয়াছি, তবে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী মাননীয় পরীক্ষকগণ স্থলবিশেষে সামান্য পরিবর্তন ও ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ মুদ্রণের সময়ে পালন করিয়াছি।

প্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভাঃ প্রবোধস্বল্প বাগচী মহাশয় ও অজ্ঞাত উৎসাহদাতা বন্ধু ও আত্মীয়গণকে আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। আমার পুস্তকভাণ্ডার ও প্রতিলিপি কার্যে তাহাদের সাধ্যমত আমার সাহায্য করিয়াছে, স্নেহভাজন সোদরোপম অন্তেরাও নানাতাবে আমায় উপকৃত করিয়াছেন। পৃথকভাবে সকলের নাম করা সম্ভব নহে, আমার অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি মার্জনীয়। তবে বিশেষভাবে দুইজনের নাম না করিলে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে; পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, ডি, লিট্ মহাশয়, এই নিবন্ধে ব্যবহৃত তাহার গ্রন্থাগারের মূল জ্ঞান, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্যদান ও অর্থ নির্ণয় করিয়া, ও অগ্রজপ্রতিম, আমার প্রতি স্নেহাসক্ত স্বর্গীয় রামশশী মিত্র মহাশয় মূল সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়া যে অকৃত্রিম সাহায্য করিয়াছেন সে স্বর্ণ অপরিশোধনীয়। এই উভয়ের সাহায্য ব্যতীত এ কঠিন কার্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইত, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। কৈশোরে গল্প প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনার জগৎ যিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন, সেই পুজনীয় স্বর্গত পিতৃদেবকে আজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি, তাহার সদিচ্ছাপূরণ করিতে পারিয়াছি কি না, তাহা স্বদীর্ঘ বিচার করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নিবন্ধ প্রকাশের ভার লইয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীসরস্বতী প্রেসের পরিচালকসঙ্ঘের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় এবং তাহার সহকর্মীবর্গ মূল্য ব্যাপারে আমাকে অক্লান্তভাবে সাহায্য করিয়া চিরজ্ঞানী করিয়াছেন। তথাপি আমার অনভিজ্ঞতা ও সম্পূর্ণরূপে একাকী কার্য করার ফলে পুস্তকে যে সকল ত্রুটি বহিয়া গেল তাহার জগৎ সহৃদয় পাঠকবর্গের মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বিগত দ্বাদশ বৎসর বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে ককণাময়ের কৃপায় এই নিবন্ধরচনা শেষ করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে, সেই স্বয়ংপূর্ণ দৈত্যদৈত্যবিলক্ষণ, সগুণ-নিগুণের অতীত 'নাথ'স্বরূপকে বারবার প্রণিপাত করি।

রাখী-পূর্ণিমা

১৩৫৫

শ্রীকল্যাণী দেবী

নিবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির

সূচী-নির্দেশ

অমনস্কবিবরণম্—‘শাস্ত্রশতক’ সংগ্রহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, ২নং হরিমোহন বসু লেন, নতুন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২২২ সাল।

অমরৌষশাসনম্—সিদ্ধ গোরক্ষনাথ কৃত, ভট্ট বামদেব কৃত ‘জন্মমরণ বিচার’ নামক Kashmir Series No XIX মধ্যে প্রকাশিত, ১২১২।

অবধূত গীতা (হিন্দী)—দত্তাত্রেয় কৃত, হরিপ্রসাদ ভাগীরথজী কর্তৃক প্রকাশিত, নেটিব ওপিনিয়ন মুদ্রণ বস্ত্রালয়ে, ১২২৫।

অহুভূত যোগসাধন—স্বামী সত্যানন্দ, ২য় সং, হুবীকেশ।

অভিধর্মকোশঃ (বহুবন্ধু)—রাহুল সংকৃত্যায়ণ সম্পাদিত, বিজ্ঞাপীঠ সংস্কৃত গ্রন্থমালা—১, কাশী।

অমৃত বচন—দয়ালবাগ, আগ্রা, রাধাস্বামী সংসদ সভা হইতে প্রকাশিত, ১২৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দ্বারা অনূদিত।

আশাবতীর উপাখ্যান—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত, বিদ্যুৎমণ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৩৩।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামাহুজ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২য় সং, ১৮৪৮ শকাব্দ।

আত্মবোধ—শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীত, হুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৬, ইয়ুরেকা প্রিন্টিং প্রেস, গোধুলিয়া, বেংগারস।

ঈশ্বর প্রত্যাভিজ্ঞাবিমশিনী—অভিনব গুপ্ত।

ঈশাঙ্কটোত্তরশতোপনিষদঃ—পাণ্ডুরং জগদ্বাজী প্রকাশিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ২৬১২৮ কোল্লাট লেন, বোম্বাই, ৪র্থ সং, ১২৩২।

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—১ম ও ২য় খণ্ড উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। ১৩৪৮, ১৩৫০।

ওঙ্কার ও গায়ত্রীমন্ত্র—শ্রীকুরেশচন্দ্র সিংহরায় বিজ্ঞানার্ণব, রায় বাহাদুর, এম, এ। ২য় সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা।

কদলীরাজ্য—রাজমোহন নাথ, বি, ই; ১ম সং, ১২৪১। Trio Stores, Gauhati.

কৌলমার্গ রহস্য—সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সং, ৭৬।

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন—বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ, সাহিত্য পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত।



কুলার্ণবতন্ত্র

গঙ্গা (হিন্দী) পুরাতত্ত্ব—জাহ্নবীরী, ১৯৩৩। এই বিশেষায়ক সম্পাদক রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রামগোবিন্দ ত্রিবেদী—গঙ্গা কার্যালয়, কৃষ্ণগড়, হুলতানগর, ভাগলপুর হইতে প্রকাশিত।

গণকারিক—আচার্য ভাস্করজি বিরজি, G. O. S. XV. Edited by C. D. Dalal.

গঙ্গীরনাথ প্রসঙ্গ—অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩২।

গীতা—উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা। ১ম সং।

গোপীচন্দ্রের গান (দুই খণ্ড)—(গোপীচন্দ্রের পাচালী, গোপীচন্দ্রের সম্রাস) দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ১৯২৪।

গোরক্ষ-বিকাশ (হিন্দী)—সদানাপ যোগী, কৈলাস আশ্রম, জালান্ধর।

গোরক্ষ-বোধ (হিন্দী)—‘গোরক্ষ-বিকাশে’ সন্নিবেশিত।

গোরক্ষ-বোধ (ইংরাজি)—ডাঃ মোহন সিংএর ‘Gorakhnath’ গ্রন্থে অহুবাদ সন্নিবেশিত, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীর ইহা অহুবাদ।

গোরক্ষ-পদ্ধতি (হিন্দী)—হিমালয়ের টেহরী রাজধানীতে হিন্দীতে রচিত। বোধাইএ মুদ্রিত। ইহাতে গোরক্ষ-শতক ও হঠযোগ প্রদীপিকার অহুরূপ দুইশত শ্লোক আছে, হিন্দী টীকা সহ। ইহা গোরক্ষ সংহিতা নামেও প্রচলিত।

গোরক্ষ-শতক—ব্রীগ্‌স্ সাহেব রচিত ইংরাজি ‘গোরক্ষনাথ’ গ্রন্থে ইহার শ্লোক ও অহুবাদ আছে।

গোরক্ষ-সংহিতা—প্রসন্নকুমার কবিরত্ন সম্পাদিত সংস্করণ, ১৮১৩।

গোরক্ষ-বাণী (হিন্দী)—ডাঃ পীতাম্বর দত্ত বড়খাল, ১ম সংস্করণ, সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ।

গোরক্ষ-গোষ্ঠী (হিন্দী)—বাবা লক্ষণদাসজী, কবীর চৌরা, বেণারস, ১৯৩৭।

গোরক্ষ-বিজয়—ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত, মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সং ৬৪। ১৩২৪।

গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ—পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, সরস্বতী ভবন ট্রেস্টে নং ১৮, বেণারস, ১৯২৫।

জ্ঞানেশ্বরী (হিন্দী)—ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ২য় সংস্করণ।

জ্ঞানেশ্বরী (বাংলা)—জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী, ২৪৬ নবাবপুরা, ঢাকা ১৩৪১।

জ্ঞান-ভারতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তি নিকেতন, ১ম সং।

জন্মমরণ বিচার—ভট্টবাম দেব র্ত্ত। Kashmir Series No XIX

জীবনীকোষ—শশী বিদ্যালঙ্কার, রেডুন, ১৩৩৬।

জৈবধর্ম—ঠাকুর বিজ্ঞানবিনোদ (কেদার দত্ত)

তত্ত্ববটধানিকা—অভিনব গুপ্ত বিরচিত Kashmir Series No. XXIV.

তত্ত্বাভিলাসীর সাধুসঙ্গ—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৮

তত্ত্বালোক—অভিনব গুপ্ত বিরচিত, কাশ্মীর ।

তত্ত্বসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

ত্রিপুরা রহস্য (জ্ঞান খণ্ড) ১ম ভাগ, সরস্বতী ভবন টেক্সট নং ১৫, কাশী । ১২২৫ ।

দর্শন পরিচয়—গোপালচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ ।

দাদু—আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন ।

দেবী যুদ্ধে চিন্তনীয়—স্বামী হুর্গাচৈতন্য ভারতী, ৪২ মানমন্দির, কাশী ।

দ্বাত্রিংশ উপনিষৎ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৩১ শকাব্দ ।

জ্ঞানদর্শন—

প্রজ্ঞাপারমিতা—(১ম ভাগ) গোবিন্দকুমার সংস্কৃত সিরিজ নং ১ ‘বোধিচর্য্যা-
বতার’ ভ্রষ্টব্য, কাপিলমঠ, মধুপুর ।

প্রজ্ঞাপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি—বৌদ্ধ গান ও দোহা ভ্রষ্টব্য ।

প্রেমধর্ম—হীরেন দত্ত, ১৩৪৫ ।

পাতঞ্জল সূত্রম—কালীবর বেদান্তবাগীশ ।

পাতঞ্জল-যোগদর্শন—শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য, কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয় কর্তৃক
প্রকাশিত ১২৩৮ ।

পাঠকাপকক স্তোত্র—(শ্রীশিবোক্ত) মন্ত্রযোগ—অবদ্যুত জ্ঞানানন্দ পৃ ৮৮-৯০
কালীচরণের ‘অমলা’ নামে ইহার টীকা আছে ।

বর্ণবন্ধকর—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 4th Ort. Con. Proceedings.
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন (৫ম সং), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড
সন্স, ১৩৩৪ ।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয় প্রকাশিত ।

বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন; মডার্ন বুক এজেন্সী ১৩৪৭ ।

বিবেকসার (হিন্দী)—কিনারামজী মহারাজ, আনন্দ ভবন, চেন্নগঞ্জ ।

বীজক—রীবা সংস্করণ, বেঙ্গলেশ্বর যন্ত্রালয়, বোম্বাই, ১২৬১ সন্থৎ ।

বেণের মেঘে—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির ।

বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব—স্বামী হুর্গাচৈতন্য ভারতী, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,
কলিকাতা ।

বেদান্তসার—সদানাথ যোগী বিরচিত, কালীবর বেদান্তবাগীশ সংকলিত ।

বেদান্ত সংজ্ঞাপ্রকরণম্—আদিত্যপুরী বিরচিত ।

বেদান্তসূত্রম্—মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত (শারীরিক সূত্রম্) ১৩১৭ ।

বেদসংহিতা—মধুসূদন সরকার কর্তৃক অনূদিত, হিন্দুমিশন যন্ত্র, কলিকাতা,
১৩০২ সাল ।

বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্—ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, কালী ।

বৌদ্ধগান ও দোহা—(চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়, দোহাকোষ প্রভৃতি)—ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী, সংখ্যা ৫৫ ।

ব্রহ্মসূত্র—শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য প্রণীত ।

ভারতীয় দর্শন (হিন্দী)—বলদেব উপাধ্যায়, এম, এ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, কালী ১২৪২ ।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দুই খণ্ড)—অক্ষয় দত্ত, ২য় সংস্করণ ।

ময়নামতীর গান—নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠ দত্ত সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ । ইহা গ্রীষ্মারসন সংগৃহীত মানিকচন্দ্র রাজার গানের অম্লরূপ ।

মীনচেতন—ভণিতায় জামদাস সেনের নাম, ভট্টশালী সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ । ইহা গোরক্ষ-বিজয়ের অম্লরূপ গ্রন্থ ।

মধ্যযুগে বাঙ্গলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ১৩৩০ ।

মহাযোগ—অবদূত জ্ঞানানন্দ, আদরচন্দ্র মিত্র দ্বারা প্রকাশিত, পাঠ-ভাঙ্গা, বীড়া-বল্লভপাড়া, ২৪ পরগণা, ১৩৩৬ ।

যোগশাস্ত্রাবলী—যোগরহস্য, যোগী বাজবল্লভ, যোগতারাবলী, শিবসংহিতা, ঘেরওসংহিতা প্রভৃতি সংগ্রহ, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত, ১৩২৫ সাল । কালিকা প্রেস, ২১নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী ২য় লেন ।

যোগাধুনি—শিবসংহিতা, যোগতারাবলী ইত্যাদি সংগ্রহ, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্তৃক অম্লবাদিত ও সংকলিত, ১৩২১ ।

যোগবীজম্—দুবনচন্দ্র বসাক প্রকাশিত, সংবাদরত্নাকর দ্বারা মুদ্রিত, ৮, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, ১৮৮৬ ।

যোগিসম্প্রদায়বিহৃতি (হিন্দী)—চন্দ্রনাথ যোগী, যোগাশ্রম, অহমদাবাদ, ১২২৪ ।

রহস্য পূজাপদ্ধতি—জগমোহন তর্কালঙ্কার বিরচিত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তত্ত্বরত্ন সংকলিত ।

রসজুদয়তম্—গোবিন্দভাগবৎ পাদাচার্য্য, মোতিলাল বেণারসীদাস প্রকাশিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, লাহোর ।

রাজযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন গ্রন্থাবলী, ১৩২৭ ।

শারদাতিলক—

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৫৮, ১৩২৩ ।

শূদ্রপুরাণ—বহুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬ ।

- শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত—স্বামী তুর্গাচৈতন্য ভারতী, ৪২ মানমন্দির, কালী।
- সম্ভবাণী সংগ্রহ—(১ম খণ্ড) Belvedere Press.
- সর্বদর্শন সংগ্রহ—মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত, সন ১৯৫০।
- সাংখ্য-সূত্রম্—অনিরুদ্ধ-টীকাযুক্ত, কালীঘর বেদান্তবাগীশ সংকলিত।
- সাংখ্য-কারিকা—ঐশ্বরকৃত, বঙ্গাভবাদ প্রিন্সসফিক্যাল সোসাইটী, ১২২২।
- সরল সাংখ্য-যোগ—(১ম সং) কাপিলশ্রম, ত্রিবেণী হইতে প্রকাশিত।
- স্বাধায়রত্নম্—যোগভাগ্যসুগাথা, কাপিলমঠ, মধুপুর।
- সদগুরুবাণী—(হিন্দী) রামমুণ্ডি শর্মা সম্পাদিত। সীতারাম ব্রহ্মচারী
ডি ৩২/৬১ পাতালেখর, বেণারস।
- সর্বোন্নাসতত্ত্বম্—সর্বানন্দ কৃত, রাসমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত, রামমালা
গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, ১৯৪১।
- সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ—সরস্বতী ভবন টেকস্ট নং ১৩, বেণারস, ১৯২৫। ম.ম.
গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত; বলভদ্র কৃত।
- সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি—গোরক্ষনাথ কৃত, নাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম, হরিদ্বার।
- সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতির চিত্রের বিবরণ—সরদার ম্যাজিয়াম, যোধপুর, সন ১৯৩৫
- হঠযোগ প্রদীপিকা—স্বতারাং যোগী, মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত ২য় সং,
১৮১০ শকাব্দ।

গ্রন্থের সংক্ষেপ নির্দেশ

- গো. সি. স—গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, সরস্বতী ভবন, কালী।
- গো. সং—গোরক্ষ-সংহিতা (প্রসন্ন কবিরত্ন সম্পাদিত)
- গো. বিজয়—গোরক্ষ-বিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সং ৬৪।
- সি. সি. স—সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, কালী।
- সি. সি. প—সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, হরিদ্বার।
- হ. যো. প্র.—হঠযোগ প্রদীপিকা, স্বতারাং যোগী।
- ভা. উ. স—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় দত্ত।
- বা. সা. ই.—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, হুমুয়ার সেন।
- বঙ্গ. সা. প—বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দীনেশ সেন।
- বঙ্গদেশের ইতিহাস—History of Bengal. Vol 1. Dacca University.
- ১০৮ উপনিষদের নাম সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে যথা :—
- যোগ. শি. উঃ—যোগ শিখো উপনিষদ।
- না. প. উ.—নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ, ইত্যাদি।
- ‘গোরক্ষনাথ’ গ্রন্থ ব্রীগ্‌স ও মোহন সিং উভয়ের দ্বারা রচিত হওয়ায় কেবল
ব্রীগ্‌স বা সিং দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে।



বাগ্‌চী—ডাঃ বাগ্‌চীর কৃমিকা Kaulajnana-nirnaya দ্রষ্টব্য।

ফারকার—Farquharএর Outline of the Religious Literature of India.

অণ্ডারহিল রহস্যবাদ—Underhillএর Mysticism.

বড়খাল নিগুণ সম্প্রদায়—Barthwal's Nirguna School of Hindi Poetry.

ইঃ—ইত্যাদি, ইহা ইংরাজি শব্দের following বা ff এর পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছি।

C. H. I.—Cultural Heritage of India in 3 Vols. Ram krishna Mission Publication.

G. O. S.—Gaekwad's Oriental Series.

E. R. E.—Hasting's Encyclopaedia of Religion & Ethics.

I. H. Q.—Indian Historical Quarterly.

S. B. S.—Saraswati Bhavan Series, Benares.

খ

Alberuni's India. (2 Vols) Trans, by Dr. E. C. Sachan, 1910.

Abhisamayalankara (Maitreya) E. Obermiller, Calcutta, Oriental Series No. 27.

Abhinava Gupta—An Historical Philosophical study. K. C. Panday, Chowkhamba Skt. Series. Vol. 1. 1935, Benares City.

Aspects of Mahayana Buddhism & its relation to Hinayana —N. Dutta.

Buddhist Art in India.—Prof. Albert Grünwedel's Hand-buck Trans. by Jones. Burgess. London 1901.

Childer's Pali Dictionary—Mahapurushio.

Charyas—Ed. by Dr. P. C. Bagchi. Journal of the Dept. of Letters—Cal. Univ. Vol. XXX.

Dravya Samgraha—N. Siddhanta. Trans. by S. C. Ghosal. Sacred Books of the Jainas Series Vol. I. 1917.

Dabistan Moshan Fani. (2 Vols). Trans. by David Shea. Paris 1843.

Doctrine of Maitreya Nath & Asanga—Tucci.

Doctrinal Culture & Tradition of the Siddhas—Dr. Raman Shastri C. H. I. Vol. II. p. 303 ff.

E. R. E. Vol. VI. etc. for articles on Gorakhnath, Dharmanath, Kanphatas etc.

First Principles of Theosophy—C. Jinarajadasa. Adyar, Madras. Theosophical Publishing House. 5th Ed. 1938.



Gorakhnath & Medieval Hindu Mysticism—Dr. Mohan Singh. Oriental College. Lahore, 1937.

Gorakhnath & the Kanphata Yogis—G. W. Briggs. Y. M. C. A. Publishing House, Calcutta, 1938.

Geschichte der indischen Litteratur—Dr. M. Winternitz. Leipzig, 1922.

Hatha-Yoga—Yogi Ramcharaka. 1904. Chicago, Ill. Masonic Temple, Yogi Publication Society.

History of Bengal—Ed. by R. C. Mazumder. Vol I. Hindu Period, Dacca University, Dr. S. K. De's Article, Sanskrit Literature pp. 290—373.

History of Bengali Language & Literature—D. C. Sen. Cal. Univ. Pub. 1911.

Indian Philosophy (2 Vols.)—S. Radhakrishnan, George Allen & Unwin Ltd., London 1941.

Initiation (The Perfecting of Man)—Annie Beasant.

Is the Cult of Dharma a Living Relic of Buddhism in Bengal?—Dr. Sukumar Sen. Reprint from Dr. B. C. Law's Vol. Pt. I.

The Idea of Personality in Sufism.—Nicholson, 1923.

'Jnaneswar' in Kalyan-Kalpataru—Magazine from Gita Press, Gorakhpore, Vol. VIII. Jan. 1941.

Kashmir Saivism—J. C. Chatterji. State Publication, 1914.

Kaulajnana-nirnaya—Edited by Dr. P. C. Bagchi, Calcutta University Pub. This includes Akulaviratantra 'A' & 'B', Akulagamtantra, Nityanhika-tilakam, etc.

Lamaism—(The Buddhism of Tibet)—L. A. Waddell, 2nd. Ed. 1934.

Les Chantes Mystiques.—M. Sabidullah. 1928.

Legend of Raja Gopichand—by Gopal Haldar. 6th All-India Oriental Conference Proceedings. Patna. 1930.

Legend of Matsyendranath—C. Chakravarti. I. H. Q. 1930. pp. 178-87.

Lingadharanachandrika—M. R. Sakhare, M. A. T. D. Belgaon, 1942.

Magic & Miracle in Jain Literature—K. Mitra, Principal D. J. College, Mongyhr.

Modern Buddhism and its Followers in Orissa—N. N. Vasu. Visvakosa Office, Bagbazar, 1911.

Monograph of the Religious Sects in India—D. A. Pai.
Published by the Bombay Corporation 1928.

Mysticism—Evelynn Underhill. 12th Edition—Revised.

Mysticism in Maharastra—by Ranade. History of Indian
Philosophy Vol. VII 1933.

Mystic Significance of Evam.—Pt. Gopinath Kaviraj,
Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Nov. 1944.

New Background of Science—Sir James Jeans. Camb.
1933.

Niramana Kaya—Pt. Gopinath Kaviraj. S. B. S. Vol. I.
pp. 47—58.

Nirguna School of Hindi Poetry—Dr. P. D. Barthwal,
Indian Book Shop, Benares, 1937.

Nyaya-Kusumanjali—(Eng. Trans. 1st Ch.) by Pt. Gopinath
Kaviraj, S. B. S. Vol. II.

Outlines of Jainism—Jagmanderlal Jaini, M. A., Jain Lit.
Society 1916.

Outline of the Religious Literature of India—J. N.
Farquhar. 1920.

Oriental Mysticism—E. H. Palmer. Intro. by Arbery.

Origin & Development of the Bengali Language (2 Vols.)
—Dr. S. Chatterji.

(An) Outline of the History & Teaching of the Nath-
panthiya Siddhas—by Pt. Pandurang Sarma. 3rd Ort. Con.
Proceedings 1924. pp. 495—501.

Oxford History of India—V. Smith. 1923.

Pratima Lakshana. (Text from Nepal)—J. Banerji.
(Cal. Univ. Pub.)

Post-Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal—M. M. Bose 1930.

Pahuda Doha—Hiralal Jain.

Positive Sciences of the Ancient Hindus.—B. N. Seal.

Ramai Pandit—Dr. B. C. Sen. Cal. Review, August, 1924.

Report on the Search of Hindi M. S. S. 1902. Benares
University.

Risala-I-Haqqnama—Prince Muhammad Dara Shikoh,
Translated by S. C. Vasu, as 'The Compassion of Truth.'

Shakti & Shakta (1st Ed.)—Sir J. Woodroffe, Luzac &
Co. London 1918.

Serpent Power—Sir J. Woodroffe. 2nd Ed. in 1920.

Soma of Sauma Sect of the Saiva—C. Chakravarti I. H. Q.
Vol VI 1932.



Sekoddesatika (Naropa)—G. O. S. Vol. XC M. Carelli 1941, Baroda.

Shadhanmala (2 Vols)—Dr. B. Bhattacharji. Baroda.

Studies in the Tantras—Dr. P. Bagchi Cal. Univ. Publication 1939.

Some Aspects of the History & Doctrine of the Naths.—Pt. Gopinath Kaviraj, S. B. S. Vol. VI p. 19 ff.

Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal—Dr. B. C. Sen.

System of Chakras according to Gorakhnath—Pt. Gopinath Kaviraj, S. B. S. Vol. II, pp. 83-92.

Seven Books in Tibetan—Dr. Evans Wentz.

Tibetan Yoga and Secret Doctrines—Dr. W. Y. Evans Wentz, Oxford University Press, London, 1935.

Tibet's Great Yogi Milarepa—W. Y. Evans Wentz, Ox. Univ. Press, 1928.

The Apocalypse Unsealed (Revelation of St. John)—Trans. James M. Pryse. New York, 1910.

Vaisnavism, Saivism & Minor Religious Systems—Dr. R. G. Bhandarkar.

Wave of Bliss (Trans. of Anandalahari)—Arthur Avalon.

What are the Tantras and their Significance—Arthur Avalon (Reprint from Prabuddha Bharat, Vol XXII, pp. 37-72).

With Mystics & Magicians in Tibet—A. David Neel, Penguin Series, 1938.

Yoga Philosophy, an Introduction to—Major B. D. Basu, Allahabad 1912.

Yoga Upanishads—Adyar, Madras 1938.

নিবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত পুঁথির নাম

- ১। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি—গোরক্ষনাথ কৃত
- ২। গোরক্ষ-উপনিষদ—গোরক্ষ কৃত
- ৩। মৎস্তেন্দ্র জী কা পদ
- ৪। ভবধর জী কা সর্বদী
- ৫। চিরপট জী কা সর্বদী
- ৬। গোপীচাঁদ জী কা সর্বদী
- ৭। জালন্ধরী কী সর্বদী
- ৮। যোগবিষয়—মৎস্তেন্দ্র বিরচিত
- ৯। অমরোদয়-প্রবোধ—গোরক্ষ বিরচিত
- ১০। যোগমার্গশু—গোরক্ষনাথ বিরচিত



চিত্র-পরিচয়

নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতে ৮৪ সিদ্ধার চিত্র আছে, কিন্তু সাধারণতঃ মংক্রেজ, গোরক্ষ প্রভৃতি মহাসিদ্ধের কোন চিত্র প্রদর্শিত হয় না, মন্দির মন্দির মূর্তি বা চিত্র কাল্পনিক। এই নিবন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সাহায্যে নাথযোগীর যে আলেখ্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে সাম্প্রদায়িক চিত্র সকলের পরিচয় পাওয়া যাইবে, যথা—ললাটে ত্রিগুণধারণ কর্ণের উপস্থিতি ভেদ করিয়া কুণ্ডল বা 'মুদ্রা' ধারণ, কণ্ঠে ঠুম্বা ও আশাপুরীর মালা, তদ্ব্যতীত 'সেলী' নামক ঔর্ণ উপবীত সহ শিব-পার্বতীর প্রতীক স্বরূপ 'শিংনাদ' ধারণ, দক্ষিণ বাহুতে কোটেশ্বরের তীর্থ প্রত্যাগত 'যোনিলিঙ্গে'র চিত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে কেদার-বদরীর লৌহাদি ধাতু নির্মিত বলয়, অঙ্গে ধূনিভস্ম লেপন, ও গেকিয়া বসন ধারণ। জটাদারণ সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কালীতে প্রাচীনপন্থী জয়পুরের বাবা মঙ্গলনাথকে জটাদারণ করিতে দেখিয়াছি, তাহাও পাগড়ী দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিল, তাঁহার দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রুও ছিল, নবীন নাথযোগীদের জটা দেখি নাই। চিত্রের আসন 'পদ্মাসন' হইলেও বুকের পদ্মাসন হইতে ইহার ভিন্নতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(গ)

প্রবন্ধ-সূচী

অ-ক-খ চক্র, যুক্তজিবেণী, মুদ্রাদির রহস্য, শিবনারায়ণজী শর্মা সেঙ্গই, কল্যাণ, যোগাঙ্ক পৃ: ৬৪২।

অনাহত নাদ—স্বামী শ্রীনয়নানন্দজী সরস্বতী, সাধনাঙ্ক (১ম) পৃ: ৩৪৭

কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব—অধ্যক্ষ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম-এ, বঙ্গসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, বারাণসী হইতে প্রকাশিত।

গুজরাটে গোপীচাঁদের গান—ননীলাল রায় চৌধুরী, প্রবাসী ১৩৩৬ পৃ: ৬৩৬।

গুরুতত্ত্ব ও সঙ্গুরুরহস্য—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০, কালী হইতে প্রকাশিত।

গঙ্গীরনাথজী (সিদ্ধ যোগীরাজ মাহাত্ম্য)—কল্যাণ, সম্ভবতঃ পৃ: ৭০০।

চৌরঙ্গীনাথ—ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৮।

জালন্ধর নাথ—কল্যাণ যোগাঙ্ক পরিশিষ্ট ২নং সূচীতে দ্রষ্টব্য, পৃ: ৭৮৩।

তত্ত্ব ও বাঙ্গালী—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩।

তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, কার্তিক ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

তত্ত্ব গুরু সাধনা—ভবানী দাসজী মেহরা, সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭ ই:।

তাত্ত্বিক সাধনা বা মুদ্রা—উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৪।

তাত্ত্বিক সাধন—দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড,

পৃ: ৪২১ ই:।

তাত্ত্বিক বৌদ্ধ সাহিত্যে বাদ্যালীর অবদান—রাসমোহন চক্রবর্তী, উদ্বোধন
বৈশাখ ১৩৪২।

দীকারহস্ত—ম.ন. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ সাধনাক্ষ, ২য় খণ্ড পৃ: ১২০৩
গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য।

দীক্ষা ও অমুশাসন—সাধনাক্ষ ১ম খণ্ড, পৃ: ২১০ ইং, লেখকের নাম নাই।

দেলপুজার ছড়া—তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ,
৪র্থ সংখ্যা।

নাথপন্থ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য
সম্মেলন, প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২২।

নাথযোগী সম্প্রদায় ও যোগিরাজ গম্ভীরনাথ—অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রবর্তক—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৫০।

নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ—স্বামীজি মোক্তিকনাথজী, কল্যাণ সম্বৎসর।

নিবৃত্তিনাথ (শ্রীগুরু)—কল্যাণ সম্বৎসর দ্রষ্টব্য।

নাদবিন্দুকলা—শ্রীগৌরীশঙ্কর দ্বিবেদী সাহিত্যরত্ন, কল্যাণ শক্তিঅক্ষ দ্রষ্টব্য,—

Based on Arthur Avalon's Garland of Letters.

নাথপন্থে যোগ—পীতাম্বর দত্ত বড়খাল, কল্যাণ, যোগাক্ষ পৃ ৭০২ ইং।

পাণ্ডপত সিদ্ধান্ত ও বেদান্ত—কল্যাণ, বেদান্তঅক্ষ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক রহস্ত—দয়ালকর রবিশঙ্কর, কল্যাণ, শক্তিঅক্ষ।

পঞ্চদশকলায়ক পঞ্চদশতিথিরূপী নিত্য। তথা ঘোড়শী অথবা অমৃতকলার
বিচার—শ্রীকৃষ্ণজী কানীনাথ শাস্ত্রী, কল্যাণ, সাধনাক্ষ ২য় খণ্ড পৃ ৮৫৭—৫৮।

প্রণবোপাসনা—হরিনন্দজী শর্মা বেদান্তাচার্য, কল্যাণ, সাধনাক্ষ ২য় খণ্ড।

প্রাণশক্তিযোগ ও পরকায় প্রবেশবিচার পূর্বরূপ—শ্রীহৃদয়ক ভাস্কর শাস্ত্রী
থরে, কল্যাণ, সাধনাক্ষ ১ম খণ্ড, পৃ ৪০৪ ইং।

বঙ্গীয় যোগিজ্ঞাতি—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, সমাজ—অগ্রহায়ণ, পৌষ,
১৩১৬ সাল।

বগুড়ায় বৌদ্ধ-যোগী—হরগোপাল দাস কুণ্ড, প্রবাসী—আষাঢ় ১৩১৭ সাল।

বামাচার—হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮।

বাল্মীকীর দৈবীশক্তি লাভ—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, সমাজ—ফাল্গুন ১৩৩৬।

ভাব ও আচার—অটলবিহারী ঘোষ, কল্যাণ, শক্তিঅক্ষ।

মন্ত্রদান, সহজদান ও চৌরাশী সিদ্ধ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন, গঙ্গা, পুরাতত্ত্বাক্ষ,
জানুয়ারী ১৯৩৩।

মহানির্দীপতন্ত্র—সতীশচন্দ্র দেব, শ্রীভারতী, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

মধ্যযুগের সন্ত ও নাথসাধনা—কল্যাণী দেবী, পুরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২।

মন্ত্রযোগের অর্থ—রামেশ্বরপ্রসাদ বকীল, কল্যাণ, যোগাক্ষ পৃ: ৩৪৪ ইং।

মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধসাধনার ধারা—ডাঃ প্রবোধ বাগ্‌চী, পরিচয়—
আঘাট ১৩৪৭।

মীননাথ—ডাঃ শশীভূষণ দাস ওপ্ত, শ্রীভারতী, আশ্বিন ১৩৪২।

মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ—মাঘ,
ফাল্গুন ১৩৪৭।

মৎস্যোক্তনাথ—কল্যাণ-যোগাঙ্ক, পৃঃ ৭৮৩।

যোগিজ্ঞাতি—অমূল্যচরণ বিজ্ঞাভূষণ, প্রবাসী—চৈত্র ১৩২৮। যোগিসংখ্যা—চৈত্র
১৩২৮, বৈশাখ ১৩২৯।

যোগিরাজ শ্রীগোবিন্দনাথ—কল্যাণ—যোগাঙ্ক পৃঃ ৭৮৩।

যোগবিজ্ঞা—হুম্মানজী শর্মা, কল্যাণ—যোগাঙ্ক পৃঃ ৬৬৫।

যোগের বিষয় পরিচয়—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ—যোগাঙ্ক পৃঃ ৫১।

যোগচতুষ্টয়—কল্যাণ—সাধনাঙ্ক (১ম খণ্ড) লেখকের নাম নাই।

রসসিদ্ধি—শ্রীনारायण दामोदर शास्त्री, কল্যাণ—সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড পৃঃ ৫১।

শক্তিসাধনা—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক ১২৩৫ সাল।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব—স্বর্ঘ্যনারায়ণ শাস্ত্রী, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক।

শব্দযোগ ও বাগ্‌যোগ—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ—যোগাঙ্ক।

শক্তির স্বরূপ—ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক।

শক্তিপাত রহস্য—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা—পৌষ ১৩৪২।

শাক্তধর্ম—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক, পৃঃ ৫১২ ইঃ।

সন্তোকাী সহস্রশ্লোক সাধনা—আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন, কল্যাণ—সাধনাঙ্ক
(১ম খণ্ড)।

সাধনমার্গে শক্তিতত্ত্ব—ম.ম. প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক।

সমাধিসাধন ও বিভূতিলভ—দ্বিজদাস দত্ত, প্রবাসী—শ্রাবণ, ২২।

হিন্দুজাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী—‘প্রবন্ধপাঠ’ নামে বহু প্রাচীন মূল-
পাঠ্য পুস্তকের খণ্ডিতাংশে প্রাপ্ত, গ্রন্থের প্রথম বা শেষাংশ না পাওয়ায় লেখকের নাম
দিতে পারিলাম না।

বিষয়-সূচী

ঐতিহাসিক অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ (পৃ ১—১০)

নাথসম্প্রদায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার ইতিহাস

দীক্ষাস্তে নাথ পদবী যোগ—নাথপন্থ' শব্দটির উৎপত্তি—নাথেরা কোল ও পরমতপস্বী—যোগিজ্ঞাতির পরিচয়—আদিনাথ হইতে জন্মবৃত্তান্ত—পুরাণাদিতে বিবরণ—শাক্তী মহাশয়ের মতামত—দোহাকোষে নাথধর্মের যোগের প্রভাব—গোপীচন্দ্রের কাহিনী—গোরক্ষপন্থী ও কানফাটা যোগী—নাথযোগীদের সংখ্যা—নাথপন্থীদের মন্দিরাদি—গোরক্ষ-সাহিত্য এবং উহা প্রামাণ্য কি না তাহার বিচার—সিদ্ধাদের মাহাত্ম্য পাঁচালী—মধ্যযুগের সিদ্ধমার্গের সহিত তুলনা—নাথসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ১১—২৪)

নাথসম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান

ভারতের সর্বত্র গোরক্ষের অলৌকিক কাহিনী—বঙ্গদেশের গীতিকা বা ও বিভিন্ন ভগিতায় প্রাপ্ত পুঁথি—উত্তরভারতে বর্ণিত কাহিনী—কোলজ্ঞান নির্ণয় প্রভৃতির বৃত্তান্ত—হিন্দী-সাহিত্যে বর্ণিত উপাখ্যান—পশ্চিম ভারতের উপাখ্যান—উড়িষ্যা প্রদেশের কাহিনী—দাক্ষিণাত্যে গোরক্ষের যোগ পরিচয়—কবীরাদির গ্রন্থে গোরক্ষের যোগবর্ণনা—ভারতের সর্বজনপ্রিয় কাহিনী—তাহার সিদ্ধাস্তরূপ স্বতঃই বিভিন্ন গ্রন্থের উদয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ২৫—৩৯)

মৎশ্রেষ্ঠ ও গোরক্ষনাথ কে ? তাঁহাদের প্রাত্তর্ভাব কাহিনী এবং ঐতিহাসিকতা

নেপালে মৎশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ—গোরক্ষগুরু মৎশ্রেষ্ঠনাথ স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অবতার—বুগামে রথযাত্রা ও ভোগমতী নদীতীরে উৎসব—কোলজ্ঞান নির্ণয় পুঁথিতে মৎশ্রেষ্ঠের নামাস্তর ভূদ্রীপাদ—মীননাথ কথা—নেপালের রাজবংশের তালিকায় বুগাম লোকেশ্বরের রথযাত্রা কথা—মৎশ্রেষ্ঠের

নেপালে দেবতারূপে পূজা—মৎশ্বেত্রেজের জন্মস্থান বরণা বঙ্গদেশে—চন্দ্রদ্বীপ, কামরূপ প্রভৃতির সহিত মৎশ্বেত্রেজের নাম জড়িত—চন্দ্রদ্বীপ কোথায় ? মৎশ্বেত্রেজের পতন-কাহিনীর সহিত যুক্ত কদলীনগর—মাঘামল্লের চিত্রে মৎশ্বেত্রেজের শ্রেষ্ঠত্ব।

গোরক্ষ-কাহিনী—গোরক্ষনাথের গোময়ে জন্ম—নেপালে গুরুদর্শনে যাত্রা, অনাবৃষ্টি ও তাহার প্রতিকার—মৎশ্বেত্রেজ সপ্তদ্বীপ বৌদ্ধ-কাহিনী এই কাহিনীরই সহিত যুক্ত—নেপালে গোরক্ষের পূজা—‘গোরক্ষ’ শব্দের ব্যাখ্যা—ঈশ্বরসম্মান—চরিত্র-মাহাত্ম্য—সম্ভবতঃ পাণ্ডাবের অধিবাসী—অপূর্ণ জন্মবৃত্তান্ত—বঙ্গীয় মৎশ্বেত্রেজ ও গোপীচন্দ্রের সহিত গোরক্ষের নাম যুক্ত হইলেও তাহার জন্মবৃত্তান্ত রহস্তাবৃত।

মৎশ্বেত্রেজ-গোরক্ষের ঐতিহাসিকতা—দাবিতান, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, বীজক ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ—নেপালের শিলালিপি—মৎশ্বেত্রেজ অবলোকিতেশ্বরের অবতার—বিভিন্ন শৈব মন্দিরের মূর্তি—‘নবনাথ’ ‘চতুরশীতি সিদ্ধ’ মধ্যে স্থান—গোরক্ষনাথের নামের সহিত যুক্ত স্থানাদি ও গ্রন্থাদি—ঐতিহাসিক ঘটনা—ষোড়শ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত শতাব্দীভেদে এই ঘটনাগুলির বিচার—মুদ্রা ও মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে গোরক্ষের কাল নির্ণয় চেষ্টা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃ ৪০—৫৮)

✓ **গোরক্ষনাথের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত**

মতামতের চারিটা বিভাগ—প্রথমতঃ কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎবৃত্তান্ত—উড়িষ্যায় প্রাপ্ত শুক্ত-সংহিতার বিবরণ—লামা তারানাথের মতামত—দ্বিতীয়তঃ ভারতের যুদ্ধাদি ও গৃগা, ভড়হরি, পিঙ্গলা, গোপীচাঁদ প্রভৃতির বৃত্তান্ত—জ্ঞানেশ্বরের রচনাকাল—তৃতীয়তঃ নেপালে গোরক্ষের গমন—বাগ্মারাওকে তরবারি দান—রসালু ও পুরাণ ভাগবতের সহিত সম্বন্ধ—নানা স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা—চতুর্থতঃ দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গ প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের নামের যোগ—কিন্তু গোরক্ষকাল এত প্রাচীন হওয়া সম্ভব নহে—গোরক্ষের জন্মস্থান ও জাতি বিচার—গোরক্ষের যোগ কথা—হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে গোরক্ষের শিষ্যাদি—গোরক্ষ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন, ইহা আশ্চর্য—গৈনীন্যাথ ও চর্পটি গোরক্ষের শিষ্য।

মৎশ্বেত্রেজ ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ প্রচেষ্টা

মহাযোগীরা কালজয়ী, তথাপি কালনিরূপণ প্রচেষ্টা—মৎশ্বেত্রেজ, মীননাথ ও লুইপা কথা—জন্মস্থান—কামরূপে কৌলশাস্ত্রের প্রচার—ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্য—গোরক্ষের বাংলা পদ নাই, লুইপার আছে—গোরক্ষ হিন্দী গজের আদি রচয়িতা—গুরুপরম্পরায়—নেপালের সহিত মৎসোত্রেজের নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—রথযাত্রা—মৎশ্বেত্রেজ-শিষ্য গোরক্ষের গোপীচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ—গোপীচন্দ্র বৃত্তান্ত—ধর্মকীর্তির সমসাময়িক—বাগ্‌চী মহাশয়ের প্রতিবাদ—শহীদুল্লাহের ৭ম শতাব্দীতে মৎশ্বেত্রেজকে

স্থাপনা—তাহার বিচার—কৌলজ্ঞান পুঁথির রচনাকাল লইয়া মতভেদ—উক্ত পুঁথিতে গোরক্ষের নামোল্লেখ মাত্র নাই—বাগ্‌চী মহাশয়ের মতে মৎস্তেন্দ্র দশম শতাব্দীর—অভিনবের তত্ত্বালোক—(তত্ত্বালোক ১১ শতাব্দীর রচনা ইহাতে মচ্ছেন্দ্রবিভূকে নমস্কার জ্ঞাপন)—ইহাতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই—কামরূপে ‘অঙ্কিত্যধক’ শাখার প্রতিষ্ঠাতা মচ্ছেন্দ্রবিভূ—মৎস্তেন্দ্রের নামান্তর ‘তুর্য়ানাথ’ অর্থাৎ চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা—পাণ্ডে রচিত ‘অভিনবগুপ্ত’ গ্রন্থে ত্রাঘকের কালবিচার—মঙ্গলশতকে মৎস্তেন্দ্রের উল্লেখ—তুকারাম শিখা বহীনাবাঈ প্রাপ্ত গুরুপরম্পরার তালিকা—কবীরের ৮৪ সিন্ধের ও গোরক্ষের উল্লেখ—জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল ইহাতে গোরক্ষের কালনিরূপণ—জনাবাঈয়ের অভদী বা পদ—জ্ঞানদেব ও জ্ঞানেশ্বরীর কথা কিন্তু জ্ঞানেশ্বরীর গুরুপরম্পরায় প্রচলিত ব্যবধান ধরিলে গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর ধরিলে অসঙ্গত প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটে—রসরত্নসমুচ্চয়, শব্দপ্রদীপ ইহাতে কালনিরূপণ—ময়নামতীর গানে উল্লেখ—বিভিন্ন তন্ত্রে উল্লেখ—লুইপাদের বংশে অসঙ্গত মিত্র—লুইপা, চর্পটী ও নাগার্জুনের কালবিচার—লুইপার দীপঙ্করকে পুঁথি ব্যাখ্যা, ভণিতায় যুগ্মনাম—হঠযোগপ্রদীপিকায় উল্লেখ—‘নবনাথ’ তালিকা—বেণের মেয়ে গ্রন্থে বর্ণনা—লুইপা ওতিয়ানের রাজকর্মচারী—মতান্তরে ধর্মপালের কায়স্থ বা লেখক—মীননাথ কথা—কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড় ইত্যাদি—পালবংশের ইতিহাস—তাত্ত্বিক আচার—কৌল-প্রথা—বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থাদি—আকাশমার্গে গমনাদি বিহুতি—কাপালিক, পাশুপত আদি

সম্প্রদায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পৃ ৫৯—৭২)

লুইপাদ, মৎস্তেন্দ্র, মীননাথ ভিন্ন না অভিন্ন

মীননাথ, মৎস্তেন্দ্র—বঙ্গদেশে প্রবাদ মৎস্তেন্দ্র পিতা মীননাথ পুত্র, তিব্বতী মতে মীননাথ মৎস্তেন্দ্রের পিতা—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চীর মতে উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি—তত্ত্বালোক ভাষ্য দ্বারাও মীন ও মৎস্তেন্দ্রের অভিন্নত্ব প্রমাণ—
লুইপাদ, মৎস্তেন্দ্র—তিব্বতে লুইপাদ আদিসিকরূপে পরিচিত—শাবরীপা ইহার গুরু—লুইপাদ লোহিতা দেশের অধিবাসী—লুই অর্থে লোহিত—বঙ্গদেশে মৎস্তেন্দ্র আদিসিকরূপে পরিচিত—লোহিত বা রোহিত শব্দে মৎস্তেন্দ্র বা মৎস্তের রাজা—লুইএর নামান্তর মৎস্তাজ্ঞান—মৎস্তেন্দ্রের তিব্বতী চিত্র—লুইপার চিত্র—মৎস্তের সহিত উভয়ের যোগ—উভয়েই কৌলমার্গের সহিত যুক্ত—অতএব উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি এবং বাঙ্গালী—মীননাথের বাংলাপদ—সহজসিদ্ধির প্রথম আচার্য—নাথপন্থের সূত্রপাত—হঠযোগের সহিত মিলিত—মীননাথ ও মৎস্তেন্দ্র তারার পূজারী—অতএব লুই, মীননাথ ও মৎস্তেন্দ্র এক ও অভিন্ন।

লুইপাদ ও মৎস্তেশ্বর ধর্মমত বিচার

লুইপাদ রচিত পদ—বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন—মীননাথের ভণিতায়ুক্ত বাংলা দোহা—কারুপাদ প্রভৃতির বাংলাপদ—এই পদগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ—ধর্মঠাকুরের পূজা—মৎস্তেশ্বর দ্বারা হঠযোগের সহিত নাথপন্থের যোগ—আদিনাথ হঠযোগের উপদেষ্টা—গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের নেতা—লুইপাদ কষ্টসাধ্য সাধনের বিরোধী—অতএব মনে হয় লুইপাদ ও মৎস্তেশ্বর ভিন্ন ব্যক্তি—কিন্তু বাগ্‌চী দ্বারা অভিন্নত্ব প্রমাণ—যোগশাস্ত্রে ও নাথসাহিত্যে ইহাদের অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ—লুইপাদের সহজ ধর্মের ক্রমশঃ রূপান্তর—বঙ্গদেশে প্রচারিত নবীন তান্ত্রিক সাধনা—নব মৎস্তেশ্বরনাথ ও নব গোরক্ষনাথ বৃত্তান্ত—শ্রীরাজমোহন নাথ মহাশয়ের বর্ণনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (পৃ ৭৩—৮৮)

অন্যান্য নাথযোগীদের কালনির্ণয় চেষ্টা

গোপীচন্দ্রের কালনির্ণয়

গোপীচন্দ্র কাহিনী সুপ্রচলিত—বিভিন্ন গাথা—গোপীচন্দ্রের রাজধানী—তিরুমলয় শিলালিপি—চন্দ্ররাজাদের ইতিবৃত্ত—পাইকাপাড়া ও সন্দীপ শিলালিপি—গোপীচন্দ্র পালরাজাদের সমসাময়িক—হরেশ্বর, শ্রীহর প্রভৃতির সময় দ্বারা কালনির্ণয় চেষ্টা।

চৌরঙ্গীনাথের কালনির্ণয়

চৌরঙ্গী মৎস্তেশ্বরনাথের শিষ্য—পূর্ব কাহিনী—চৌরঙ্গীর পিতা দেবপাল—ময়নামতী দেবপালের ভগিনী—ধর্মপূজার উৎসাহদাত্রী—শূন্যপুরাণে ধর্মপূজা বৃত্তান্ত—গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে গাভুর সিদ্ধার উল্লেখ—তিনিই চৌরঙ্গীনাথ—গাভুর বজ্রবনের ভাঙকার—গাভুর পূর্বদেশীয়—পালরাজাদের সময়ে রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম বা ধর্মপূজার প্রচারক।

হাড়িসিদ্ধা বা জালন্ধরিনাথের উৎপত্তি কথা

হাড়িসিদ্ধার জন্মস্থান সিদ্ধদেশে—ওড়িষ্যানে যোগশিক্ষা—অদ্ভুত ক্ষমতার্জন—ময়নামতীর গুরুভাই—গোরক্ষনাথ গুরু—গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য—জালন্ধরিনাথের বন্দনা—নিরঞ্জনপুরাণে জলন্ধরের কথা—জলন্ধর রাজা ও ময়নামতীর ভ্রাতা—গোপীচন্দ্র সিদ্ধরূপে 'শূদ্রারী পাব' নামে পরিচিত—সিদ্ধান্তবাক্যে জালন্ধর—গোপীচন্দ্রের প্রপৌত্র—জালন্ধরনাথের অন্তরূপ জন্মবৃত্তান্ত।

ভর্ষুহরিনাথ

গোরক্ষনাথ ভর্ষুহরির গুরু—প্রবাদ আছে যে ভর্ষুহরি উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন—পত্নীর ব্যবহারে সন্ধ্যাসংগ্রহণ—ও বনবাসে গ্রন্থরচনা—কিন্তু এই ভর্ষু

গোরক্ষশিষ্য ভক্ত হইতে ভিন্ন—কারণ গোরক্ষশিষ্য ভক্তর স্ত্রী পিঙ্গলা পতিব্রতা—ইহাই ভক্তর সম্মান লইবার বিলম্বের কারণ—ভক্ত কাহিনীর সঠিক অনুসন্ধান নিফল—ভক্তর ভ্রাতা বিক্রমকে শালিবাহন পরাজিত করিয়া নিজ সহ্য প্রতিষ্ঠা করেন—দেবতা মিত্রাবরণের পুত্র ভক্তর ভাও মধ্যে জন্ম—তাই ‘ভণী’ নাম—উচ্চদিনীর সহিত সখ্য —গোরক্ষের শিষ্য ও ময়নামতীর ধর্মভ্রাতা ।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ

মহারাষ্ট্র প্রদেশে জ্ঞানদেবের জন্ম—গোরক্ষনাথের শিষ্য—মহারাষ্ট্র ভাষায় ‘জ্ঞানেশ্বরী’ নামক গীতা-ভাষ্য ও অজ্ঞান গ্রন্থ রচনা—জ্ঞানেশ্বরীর রচনা কাল— সমাজচ্যুত পরিবারে জন্ম—নিজ সিদ্ধি বলে ‘জ্ঞানেশ্বর’ নাম অর্জন—মাত্র ২১ বৎসর বয়সে জীবন্তে সমাধি গ্রহণ ।

গহনীনাথ, চর্পটনাথ প্রভৃতির উৎপত্তি কথা ।

শ্রীগন্তীরনাথজী

গোরক্ষপুরের মোহন গোপালনাথজীর নিকট গন্তীরনাথের দীক্ষা গ্রহণ— অসাধারণ চরিত্রবল—বহু বাদ্যালী শিষ্য—গোরক্ষপুরের মঠাধ্যক্ষ—অতিথি সেবা ও দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ—বর্তমান যুগে মহাসিদ্ধ পুরুষরূপে খ্যাত ।

সংস্কৃত পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন নাথসিদ্ধ যোগীদের নাম ও শ্রেণীবিভাগ—(পৃ: ৮২—১০০)

‘নবনাথ’ নামে প্রসিদ্ধি—নবনাথের বিভিন্ন তালিকা—নবঘারের নাম— নবনাথ—গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহে ঈশ্বর সন্তান শ্রীগোরক্ষনাথের উল্লেখ—বিভিন্ন তন্ত্রে উল্লেখ—৮৪ সিদ্ধা—দ্বাদশ পদ—‘নাথ’ শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নাথমার্গের নামান্তর যোগমার্গ প্রভৃতি—শ্রেণীবিভাগ—দ্বাদশ পদ হইতে কানফাটা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—সংনাথী, ধর্মনাথী প্রভৃতি সম্প্রদায়—গোপীচন্দ্রের সম্প্রদায় ।

নাথ যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়

গার্হস্থ্য ও মঠধারী যোগী—উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা—বঙ্গীয় যোগিজাতির মধ্যে বহু বিভাগ—তাহাদের বিবরণ—বোম্বাই প্রদেশের যোগী—পুণা, বেরার প্রভৃতিতে নাথযোগীদের আবাস—দাক্ষিণাত্যে যোগীদের বৃত্তি—মহারাষ্ট্রে ‘যোগীপুরুষ’ সম্প্রদায়—যুক্তপ্রদেশে, নেপালে বিভিন্ন যোগী সম্প্রদায়—বগুড়ায় বৌদ্ধ যোগীসম্প্রদায় ।

নাথপন্থের সহিত যুক্ত অন্যান্য যোগী সম্প্রদায়

পুণার এক মুসলমান সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যরূপে পরিচিত—পেশোয়ার প্রভৃতি নানাস্থানে গোরক্ষের শিষ্য—অম্বারী দত্তপ্রভৃতির শিষ্যদের সহিত গোরক্ষ-

যোগীদের সংস্পর্শ—বিভিন্ন যোগীসম্প্রদায়ের নাম—সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘সাধ’শ্রেণী
গোরক্ষের উপাসক—

ভেদে বারহ পন্থ বা কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা দ্বাদশ বৎসরান্তে মোহন্ত
নির্বাচন আদি কার্য সাধন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃ: ১০১—১১০)

মঠ ও তীর্থস্থানাদি

বঙ্গদেশে দমদমের নিকট গোরখ-বাসলী, মন্দির মধ্যে ত্রিমূর্তি—গোরক্ষধ্বনি
প্রভৃতি—হুগলীর ত্রিবেণীতে মহানাদ গ্রামও গোরক্ষ-ক্ষেত্র—কালীঘাটের
কালীমূর্তি।

সিকিম, নেপাল, তুলসীপুর, কাশ্মীর, নৈনিতাল, হরিদ্বার, গোরক্ষপুর,
বারানসী, পেশোয়ার প্রভৃতি বহুস্থানে গোরক্ষ-পূজা, তন্মধ্যে গোরক্ষপুরের মঠ,
পাঞ্জাবের টিলা মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ—করাচীর অনতিদূরে কোটেশ্বর তীর্থে নাথ-
যোগীদের ‘যোনিলিঙ্গ’ চিহ্ন ধারণ—কচ্ছপ্রদেশের ধীনোদরের প্রসিদ্ধ দ্বিতল মঠ—
ইহাতে ধর্মনাথের মূর্তি—ভারতের বহুস্থানে গোরক্ষনাথের নামে যোগাশ্রম
বিদ্যমান।

নাথসম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতা

যোগীরা শৈব, শিবের ভৈরবাদি মূর্তি-পূজা—অষ্টমূর্তি—সাধারণতঃ কাপালিক
দ্বারা ভৈরবের পূজা—অশ্বা ও জগদম্বা-পূজা—কুণ্ডলিনীর আগরণ—শক্তিপূজা—যোনি
ও লিঙ্গপূজা—শ্রীচক্রের পূজা, তবে স্ত্রী লইয়া সাধনার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ (পৃ: ১১১—১১৫)

মৎস্তেন্দ্র ও গোরক্ষনাথাদি সম্পর্কিত কয়েকটি স্থানের নির্দেশ

পূর্বদেশ—মীননাথ পূর্বদেশের অর্থাৎ কামরূপের অধিবাসী।

কদলীদেশ—প্রবাদ আছে মৎস্তেন্দ্র কদলীদেশের অধিপতীর মোহে আবদ্ধ
হন, এই দেশের অবস্থান সন্দেহে মতভেদ আছে, সম্ভবতঃ উহা কামরূপের বর্তমান
নগাও জেলার ‘কদলী’।

বিজয়নগর—ইহা বর্তমান বিজয়ী রাজ্যের অন্তর্গত।

ওড়িষ্যান—বৌদ্ধতান্ত্রিকদের পীঠস্থান, বাহুবিল্লার জন্ত প্রসিদ্ধ—লুইপা
ওড়িষ্যান রাজ্যের কর্মচারী ছিলেন, ওড়িষ্যানের সংস্থান সন্দেহে মতভেদ ও তাহার
আলোচনা।

লঙ্কাপুরী, জাহোর—কাশ্মীর ও নেপালের সীমান্তে জাহোর ও তথায়
লঙ্কাপুরী নামে সমাধি—মৎস্তেন্দ্রের জন্মস্থান ও দেশভ্রমণাদি সন্দেহে আলোচনা।

কামলাক গোড়ের সহর—গোপীচন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত পুরাতন শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান।

ডাড়ার সহর—সম্ভবতঃ বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের কোন সহর।

দশম পরিচ্ছেদ (পৃ: ১১৬—১২০)

নাথসম্প্রদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি ও ব্যবহার্য্য জব্যাসকল

যোগীদের খাজাখাজ সম্বন্ধে বিচার—অন্ন বিতরণ—ঔষধ কবচাদি দান—শিবরাত্রিতে গোরক্ষাদির চরণপূজা—গোরক্ষগীত—কালভৈরবের পূজা—নেপালে মংস্ত্রেন্দ্রের রথযাত্রা—‘আদেশ’ শব্দের অর্থ ও অভিধান প্রথা—গোরক্ষনাথীদের মদ্যে বিভিন্ন জাতি—কর্ণবেদ প্রথা—কুণ্ডলধারণ—শিখাশ্ছেদ—‘শিব-গোরক্ষ’ মন্ত্র গ্রহণ—শিংনাদসহ সূত্র ধারণ—মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি।

নাথযোগীদের ব্যবহার্য্য জব্যাসকল—কুণ্ডল, সেলী নামক ঔর্ণ উপবীত সহ কৃষ্ণবর্ণের বংশীর চায় ‘নাদ’ ধারণ—গৈরিক ধারণ—ভস্ম লেপন—ত্রিপুরাধারণ—সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ ঝুমরা ও আশাপুরীর মালা—দক্ষিণ বাহতে যোনিলিঙ্গ চিহ্ন—নানাবিধ বলয়, ধূনি ও ‘আচল’ যন্ত্রের ব্যবহার—সূত্র, শিখাদির যৌগিক অর্থ—বিভূতিস্নান—কুণ্ডল দ্বারা আদিনাথ শিবকে স্মরণ—কুণ্ডলের নামান্তর ‘দর্শন বা মুদ্রা’।

একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃ: ১২১—১৫০)

✓ গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

শৈবযোগীদের সহজবোধ্য ভাষায় পদরচনা—লুইপাদ রচিত পদ—মংস্ত্রেন্দ্র গোরক্ষাদি রচিত সংস্কৃত পুথি—তাহারা প্রামাণ্য কি না বিচার—গোরক্ষ বিজয়, মঘনামতীর গান প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনী—নেপালে প্রাপ্ত কোলজ্ঞাননির্ঘয় পুথি—ইহার লিপিকাল—পুথিতে মৌননাথ ও মংস্ত্রেন্দ্র উভয় নাম থাকায় অভিন্ন ব্যক্তি—মংস্ত্রেন্দ্র রচিত অকুলাগম তন্ত্র প্রভৃতি—বৌদ্ধ গান ও দোহায় লুইপাদ রচিত গ্রন্থের নাম—মংস্ত্রেন্দ্র সংহিতা—গোরক্ষ সংহিতা—গোরক্ষ রচিত সিন্ধুসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, বিবেকমার্গ ও প্রভৃতি গ্রন্থ—কাশ্মীর গ্রন্থাগারের অমরোঘ-শাসনম্—প্রাচীন হিন্দীতে রচিত গোরক্ষবোধ—শিবসংহিতা ও ঘেরও সংহিতায় গোরক্ষ সম্প্রদায়ের রীতিনীতি—মংস্ত্রেন্দ্র হঠযোগের আদি প্রচারকর্তা—স্বতারাং যোগীন্দ্র রচিত হঠযোগ প্রদীপিকার মূল গোরক্ষ পদ্ধতি ও গোরক্ষ শতক—এই গ্রন্থদ্বয় হইতে নাথমার্গীদের সাধন-পদ্ধতি উপলব্ধি—গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে নাথ সম্প্রদায়ের প্রচলিত বহু পুথির উল্লেখ—বলভদ্ররচিত সিন্ধুসিদ্ধান্ত সংগ্রহ—অমনস্ক—যোগবীজম্ গ্রন্থ—বিভিন্ন গ্রন্থকর্তার নামে সিন্ধুসিদ্ধান্ত পদ্ধতি—গোরক্ষবোধ গ্রন্থ—পরবর্তী গোরক্ষবোধে কবীর পন্থীদের মতামত—গোরক্ষবোধ একাদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশ্রিত ভাষায় রচিত—ডাঃ মোহন সিংএর গ্রন্থ-তালিকা—ঋত-শব্দ-যোগ ও উল্টা-সাধন



বর্ণন—গোরক্ষের রচনার নমুনা—নাথদিগের ভাষা অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী ও রাজপুত ভাষা মিশ্রিত—বিভিন্ন স্থানে গোপীচন্দ ও ভট্টহরি সম্বন্ধে নাটক—গোরক্ষের সর্বাংগে প্রামাণিক রচনা ‘সব্দী’—হিন্দী গোরক্ষবিকাশ গ্রন্থে গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত অর্ধ শতাব্দিক গ্রন্থের উল্লেখ—মৎস্কেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ—যোধপুররাজ মানসিংহ কর্তৃক গোরক্ষ প্রশংসা—জয়পুরে কবীরের সংগ্রহ গ্রন্থে গোরক্ষনাথের কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয়—যোধপুর গ্রন্থাগারে গোরক্ষের নামে প্রচলিত পুথি—গোরক্ষগোষ্ঠী নামক হিন্দী পুস্তিকা—বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত পদ ও পুথি—গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন, গোপীচন্দ্রের সম্রাস, মাণিকচন্দ্রের গান প্রভৃতি বন্দীত গ্রন্থ।

বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

গোরক্ষবিজয় প্রভৃতিতে গোরক্ষের যোগকথা—‘মহাজ্ঞান’ লাভ—ইহা দ্বারা মরণশীল দেহের পরিবর্তন—শিবতত্ত্ব লাভ—গোরক্ষের ব্রহ্মচর্যা সাধন—মীননাথের পতন—গোরক্ষের গুরু উদ্ধার—মুদগ্ধে ‘কায়াসাধনে’র বোল—গায়ত্রী-ক্রিয়া—উন্টাসাধন—বন্ধনালে সাধন—মহারসকে উর্জমুখী করার সাধন—মহারসই চন্দ্রামৃত—শঙ্খিনীনাড়ীর পরিচয়—ইহাই বন্ধনাল—গোরক্ষবিজয়ে ইহাকে ‘হুই মুখ সাপ’ বলা হইয়াছে—দশমীদ্বার কথা—চর্যাপদ প্রভৃতিতে দশমীদ্বার, গঙ্গাধমুনা অবস্থিতি মার্গ প্রভৃতির উল্লেখ—গোরক্ষবিজয়ে গঙ্গাধমুনা, ব্রহ্মনাল প্রভৃতির উল্লেখ—ব্রহ্মনালই স্বরূপাধ—গোরক্ষবিজয়ে খেচরীমুক্তা সাধনের ইঙ্গিত—কায়া পরিচয়, অজপাজপ, বিন্দুরক্ষা প্রভৃতির উল্লেখ—হিন্দীতে অহরূপ প্রস্রোত্তর—বঙ্গভাষা ও হিন্দীভাষায় রচিত পদের তুলনা—‘বৈষ্ণব মিনাই’ অর্থে সাধু মীননাথ—কারণ বৈষ্ণব ও নাথদের সাধনা-পদ্ধতি ভিন্ন—বুদ্ধের ‘দশবল’ ও গোরক্ষের ‘বিভূতি’—শূত্রপুরাণের সৃষ্টিবিবরণ—শব্দব্রহ্মের ইঙ্গিত—ইহাতে নাথপন্থের পীঠস্থান হিংলাজের উল্লেখ—গোপীচন্দ্রের সম্রাসে নামজপের মাহাত্ম্য—অজপাজপ বা ‘হংস’ মন্ত্র—মহাজ্ঞান অর্থে যোগযুক্ত জ্ঞান—ময়নামতীর মহাজ্ঞান সবেও পুত্রের সন্দেহ ও মাতাকে পরীক্ষা—মাতাপুত্রের প্রস্রোত্তরের মধ্যে বিবিধ তত্ত্ব-কথা—সাধকরঞ্জে ত্রিবেণী কথা—ষট্চক্রভেদ, কুণ্ডলিনী জাগরণ, ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ ও ব্রহ্মচর্যা সাধন নাথযোগীদের বৈশিষ্ট্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ (পৃ: ১৫১—১৯৭)

নাথপন্থের সহিত তত্ত্ব, কৌলমার্গ, রহস্যবাদী, বৌদ্ধ ও
শৈবসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথপন্থের মূল অহমসন্ধানার্থ সমসাময়িক পন্থাদির সহিত তুলনা

(ক) নাথপন্থের সহিত তত্ত্বের যোগাযোগ

নাথপন্থীরা শৈবতান্ত্রিক—বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে ভেদ—বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যে তত্ত্বের সাধনা—ভারতের বিভিন্ন দেশে তত্ত্বের আলোচনা—

বঙ্গদেশে তাত্ত্বিক বৌদ্ধদের বিরূপ সাহিত্যের তিক্ততী অল্পবাদ—আসন্দের
অষ্টসিদ্ধি—মঙ্গলান সম্প্রদায়—কালচক্রদান—বজ্রদান হইতে লামাদর্শের উৎপত্তি—
তিক্ততে বিচিত্র অল্পদান—ভারত হইতে গুরু পদ্মসত্ত্বের তিক্ততে গমন—যাতুবিজ্ঞা
শিক্ষাদান—বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি—বৌদ্ধদের বিহার বঙ্গদেশে ও বিহারে—বৌদ্ধ
বিহারে গ্রন্থরচনা—সাক্ষ্য ভাষার ব্যবহার—বঙ্গদেশের দীপঙ্কর, শীলভদ্র প্রভৃতি—
মৎস্যসূত্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ নাই, তথাপি তিনি বৌদ্ধদের দেবতা—
আর্য্য ও জৈন ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের ভেদ—নাথধর্মে হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধ যোগতত্ত্বের
সংমিশ্রণ—তত্ত্বের উৎপত্তি—বৈদিক যুগ হইতে ইন্দ্রজালের ব্যবহার—দ্বাদশ
শতাব্দীর লোকগীতির মধ্যে তত্ত্বের প্রভাব—ভোজবিজ্ঞার গ্রন্থ—বৈদিক ও
তৎপরে বৌদ্ধযুগেও ভোজবিজ্ঞার প্রভাব—শাক্ত ধর্মেও ইন্দ্রজালের ব্যবস্থা—দেবী-
পুজায় মঙ্গসাধন—কুণ্ডলিনীর জাগরণ—বৌদ্ধধর্মের ভারতের বাহিরে প্রচার—
শঙ্করাচার্য্যকে মহাদানী বৌদ্ধ প্রতিপন্নের চেষ্টা—শাক্তদের মধ্যে শঙ্কর কর্তৃক দক্ষিণাচার
প্রচলিত—বলিদান প্রভৃতি ইহাতে নাই—দাক্ষিণাত্যে ‘পাকুরাত্র’ ও ‘বৈখানস’
সংহিতার ব্যবহার রীতি—শৈবাগমের সহিত পাকুরাত্রের সাদৃশ্য—ইহার। গোরক্ষ-
পূর্বযুগের—সংহিতা ও আগম—আভাসবাদ—ত্রিক বা পতি-পাশ-পশু সহজে বিচার
—আগমে দ্বৈতবাদ—৬৪ তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়—সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থে তত্ত্বের
প্রভাব—শাক্তের দেবীপূজা—ও মহামন্ত্রের সহিত শক্তি জড়িত—শক্তিই পরাবাক্য—
শাক্তদের ষট্চক্রসাধন—চক্রপূজা—সর্বশ্রেণীর প্রবেশাধিকার থাকায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম
হীনবল—ক্রমশঃ বৌদ্ধদের তত্ত্ব বিশ্বাস—কাপালিক, পাশুপত, লকুলীশ, কানকাটা,
নাথ প্রভৃতি সম্প্রদায়—ইহার। সকলেই মূলতঃ শৈব—ব্রাত্যমোগীরা শৈব—অধর্মবেদে
বর্ণনা—ইহাদের মধ্যেও তত্ত্বের সাধনা—কালামুখ সম্প্রদায়—ইহার।ও শৈব—সুবিখ্যাত
• হর্ষ পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—বাণের—হর্ষচরিত সপ্তম শতাব্দীতে রচিত,
—কালামুখদের ললাটে কৃষ্ণচিহ্ন—ইহার। ভৈরবের উপাসক ও অঘোরীদের
সহিত যুক্ত—মালতীমাধব প্রভৃতিতে কাপালিকের চিত্র—দশকুমার চরিতে বর্ণিত
ভয়াবহ চিত্র—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে গ্রন্থগুলি রচিত—বৌদ্ধতত্ত্ব গ্রন্থ তথাগত-গৃহকও
সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে রচিত—অতএব বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মেই তত্ত্বের প্রবেশ—
পাশুপত শৈবদের সহিত নাথপন্থের সাধনায় সাদৃশ্য—পশুপতিই শিব—নাথধর্মে যোগ
ও তত্ত্বের মিশ্রণ—জৈনগ্রন্থে যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত মাত্র—তত্ত্বসাধনার
দ্বারা সিদ্ধিলাভ নাথদের অদ্ব্যতম লক্ষ্য—বৌদ্ধধর্মে তত্ত্বসাধনার দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি—তত্ত্ব
হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আগম ও নিয়ম—‘গণকারিকা’ গ্রন্থে পাশুপত-দর্শন—সর্বদর্শন-
সংগ্রহ ও মহাভারতেও পাশুপত সিদ্ধান্ত—দত্তাজেয় রচিত ৬৪ তত্ত্ব—মঙ্গসাধনই তত্ত্বের
মুখ্য উদ্দেশ্য—তত্ত্বের সাধক পশু, বীর ও দিব্য—তদ্ব্যখ্যে দিব্যসাধকই ‘কৌল’—নাথ-
সিদ্ধেরাও কৌল নামে পরিচিত—ইহা দ্বারা তত্ত্বের সহিত নাথপন্থের যোগাযোগ
স্থচিত হয়।

(খ) নাথমার্গের সহিত কোলমার্গের সম্বন্ধ বিচার

কোলজ্ঞাননির্ণয়ে বিভিন্ন কোল সম্প্রদায় ও তাহাদের গুরুদের নাম—কোল-শাস্ত্রে যোগপ্রণালীর ব্যাখ্যা—মন্ত্রস্তোত্র সিক্তামৃত কোলান্তর্গত যোগিনীকোল ছিলেন—এই কুলশাস্ত্র কামরূপে প্রচার—কোলদের দুইটি শ্রেণী—‘কৃতক’ ও ‘সহজ’—‘সহজের’ উচ্চস্থান—বৌদ্ধসিদ্ধেরাও সহজসাধক—সহজাবস্থা লাভ হইলে সাধক স্বয়ং দেবতা হন—শাস্ত্রাদি সহজসাধনের অমুরায়ত্ত্বরূপ—কোলজ্ঞানেও লৌকিকমার্গ বর্জননের কথা আছে—কোলদের মধ্যে পঞ্চকূলের উল্লেখ—পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র ও ছন্দ এই চারি শ্রেণীর তীর্থ—কামাখ্যা, পূর্ণগিরি, ওড়িয়ান ও অর্কুদ পীঠ—বৌদ্ধতন্ত্রে ও কোলজ্ঞান-নির্ণয়ে ‘শান্তিকা’, ‘পোষ্টিকা’ আদি শব্দ—অতএব উভয় মতই কোন সাধারণ মূল ভিত্তির আশ্রয়ে বর্জিত—কুলার্ণব তন্ত্রে সপ্তবিধ আচার বর্ণনা—পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—“কোলমার্গ রহস্ত্রে” ইহাদের ব্যাখ্যা—পূর্ণাভিষিক্ত জীবমুক্ত যোগীর পক্ষে পঞ্চমকারের বাহ্য অহুষ্ঠানে আপত্তি নাই—ইহার নিমিত্ত শিবসদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন—বৈদিক ও তান্ত্রিক যোগসাধনের চরম লক্ষ্য এক হইলেও পদ্ধতি অন্য—কোলাচারের মূখ্য কেন্দ্র কামাখ্যা—কোল দ্বিবিধ—“উত্তরকোল” ও “পূর্বকোল”—“কোল” ও “সময়মার্গী” “কুল” শব্দের অর্থ—পূর্ণ অবৈতজ্ঞানীই কোল—তান্ত্রিকপূজার অধিকারী স্বল্প—তন্ত্রের শক্তি কল্পনা বৈদিক—ঋষিদের “বাগম্বুনী সূত্র”—সপ্তবিধ আচার মধ্যে ‘বামাচার’ মাত্র অবৈদিক—কঠিনতম ভাব ও আচার ‘দিব্য’ ও ‘কোল’ ইহা নাথসম্প্রদায়ের অহুমোদিত—‘কোল’, ‘কুল’ ও ‘অকূলের’ সম্বন্ধ—কোলের ভেদাভেদ নাই—পিত্ত ও চন্দন, পুত্র ও শত্রু উভয়েই তুলা—নাথসিদ্ধদের ইহাই লক্ষ্য—বিভিন্ন গ্রন্থে কোলদের বিবরণ—ভাব মানসবর্ধ, আচার তাহারই বহিঃপ্রকাশ—সকল ভাববর্জিত সাধকই কোল—তাহার কোন নিয়ম বা বন্ধন নাই—‘রহস্ত্র পূজা পদ্ধতি’তে কোল ও চক্রাহুষ্ঠানের বর্ণনা—গঙ্গাঘনুনার ব্যাখ্যা—ভাসবর্ণিত বীরাচারের প্রতি বিজ্ঞপ—সোমদেবের ‘নীতিবাক্যামৃত’র টীকায় কোলাচারের নিন্দা—হিন্দুতন্ত্র বা কোলাচার বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট স্বীয় নহে—বৌদ্ধধর্মে পরবর্ত্তীকালে বীরাচারের প্রবেশ—নিত্যা প্রকৃতির নারীতে স্থলরূপে আবির্ভাব, তাই তন্ত্রে শক্তির সাধনা—‘সেকোদ্ধেশ’ গ্রন্থে মহামুদ্রা সাধন কথা—বীড় পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অহুত্ব—‘কেবলী’ সাধক—তান্ত্রিক সাধনে ‘যন্ত্রের’ ব্যবহার—শক্তি সাধনায় সর্বজাতির মিলন।

(গ) ভারতের মধ্যযুগের রহস্ত্রবাদীদের সাধনার সহিত নাথ সাধনার সম্বন্ধ বিচার

ভারতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যোগতন্ত্র—সম্প্রদায় ও স্বকীয়দের সহিত নাথ সাধনার ঐক্য—সাধনার মধ্যে ‘যোগ’—সম্প্রদায়ের ‘সাধ’ শ্রেণী গোরক্ষনাথের পূজারী—কবীর, দাদু প্রভৃতির গোরক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—দিনাজপুরে স্বকীয় ও নাথযোগীদের সাধনার মিশ্রণ—নাথপন্থীদের দ্বারা কবীরের হিন্দু ও মুসলমানে অভেদ দেখা—স্বকীয় সাধক মনস্কর

হালাহ ও সম্ভবসাধক শিবদয়ালের জীবাস্থা ও পরমাস্থা সম্বন্ধে মতামত—নাথযোগীদের 'জীব' ও 'শিব' ভেদ—সম্ভ সাধনায় 'স্বরত' শব্দ যোগ—সাজাহান পুত্র দ্বারা সেখের পুস্তকে অনাহতনাদ কথা—নাথমার্গে ইহাই অজ্ঞপাজপ—ইহারই নামান্তর 'মহাচৈতন্য'—উপনিষদে ও নাথমার্গে প্রথব-প্রশস্তি, সম্ভ মধ্যে 'সম্ভনাম' বা 'সত্যনামে'র প্রশস্তি—সম্ভদের 'বিগমদেশ' নাথদের 'উন্ননী' বা মনোহীন অবস্থা—সুফীদের 'সমা' সাধন—মীরার ভজন অতুলনীয়—নামরূপ বা 'স্বমীরণ' দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়—কবীরের রামনাম জপ—এই রাম নিগুণ, তাই মূর্তি বা মন্দিরহীন—সম্ভ, নাথ ও সুফীদের মধ্যে সঙ্গুর প্রাধান্য—শরীর মধ্যে চক্রাদির সাধন—ইহাই সম্ভদের 'কবল' বা 'কমল'—নাথ মধ্যে কুণ্ডলিনী আগরণের বৈশিষ্ট্য—জীবমুক্ত যোগী—সম্ভ, নাথ, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে শূক্তের সাধনা—সুফীসাধক চিশ্তীর হঠযোগ সাধন—দাদু নাথযোগীদের মধ্যে 'কুস্তারীপাব' নামে প্রসিদ্ধ—বাউল সহজিয়া ও সুফীদের মধ্যে সহজসাধন—সম্ভদের বিন-মন-সা বা মনঃশূন্য অবস্থা নাথদের 'অমনস্ত' অবস্থার তায়।

১২/১ (ঘ) নাথপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথদের কেহ বৌদ্ধ কেহ শৈব বলেন—নাথমার্গে হিন্দুত্বের নাথদের ও বৌদ্ধ সহজিয়া রহস্যের অপূর্ণ মিশ্রণ—নাথ হঠযোগ ও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন—নাথমত মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যমার্গের সহিত যুক্ত—শিবশক্তি ও প্রজ্ঞা উপায়—মহানুভা সাংস্কার—মহাস্থ বা এবম্কার—তত্ত্বের ঘটকোণ—সামরক্ত—জীবের কালচক্রে আবর্তন—তৎপরে নির্দোষলাভ—নাথমতে অদ্বৈতভাবের উৎপত্তি—অমনস্ত অবস্থার বর্ণনা—নাদবিন্দু বা প্রজ্ঞাউপায়ের মিলন—চন্দ্রহর্ষা কথা—চন্দ্রের নিত্যকলা—সহস্যারে আনন্দাহুভূতি—বৌদ্ধদের শূক্তসমাধি ও নাথদের সমরস সাধন—পরমপদ লাভ—নাথ, বৌদ্ধ ও জৈন মতে শূক্ত সাধনা—সহজ ও পরমপদ—বজ্রদেহ, যোগদেহ, সিদ্ধদেহ ও রসময়ী তত্ত্ব—নাথমতে ষাটশমুদ্রা—বজ্রদেশে প্রজ্ঞার বৌদ্ধ—নাথেরা বৌদ্ধ নহেন—শৈববেশে মৎস্তেশ্বরের নেপালে গমন ও শৈবধর্ম প্রচার—গোরক্ষ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ প্রবাদ—স্পষ্ট প্রমাণের অভাব—বৌদ্ধ ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় নাথসিদ্ধদের নাম—নাথদের মন্ত্র 'শিব-গোরক্ষ' পরিচ্ছদ শৈব যোগীর অঙ্গরূপ, তীর্থ শৈবতীর্থ, গোত্র শিবগোত্র, অতএব বৌদ্ধ হওয়া অসম্ভব—গোরক্ষ পশুহত্যাকারী ও মৎস্যোদ্ভব কৈবর্ত, অতএব বৌদ্ধ নহেন—দাক্ষিণাত্যের ত্রিপর্যন্তে বৌদ্ধদের যাত্রাবিজ্ঞা শিক্ষা—এইরূপে দাক্ষিণাত্যের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি—৮৪ সিদ্ধার দ্বারা উহা উত্তর ভারতে প্রচার—তন্মধ্যে নাথসিদ্ধারাও অগ্রতম—চৌরাসী সিদ্ধের বংশবৃক্ষ—বৌদ্ধসহজিয়া ও পাশ্চাত্য সাধনের মধ্যে তুলনা—গোরক্ষের সাধন ভিন্ন—ইহা উপনিষদের ধর্মসাধন—তৎসহ হঠযোগ প্রভৃতির মিশ্রণ—ডাঃ মোহন সিং মতে গোরক্ষের নাদাহুসজ্ঞান উপনিষদেও পাওয়া যায়—গোরক্ষের সহজানন্দ লাভের উপদেশ।

(৩) নাথসম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

বৈদিক কাল হইতে শিবের পূজা—শৈবদের চারিটি সম্প্রদায়, শৈব পাণ্ডপত কালদমন ও কাপালিক—ত্রিকদর্শন ও বীরশৈব প্রভৃতি দর্শনের সহিত নাথদর্শনের মিল—দক্ষিণে তামিলদেশে শৈবসিদ্ধান্ত দর্শন—ছাদশ শতকে বীরশৈব মত—ইহাদের কণ্ঠে লিঙ্গ মূর্তি ধারণ—নাথদের শিঃনাদ ধারণ—কাশ্মীর শৈবাব্দৈতবাদই ত্রিকবাদ—ত্রিকদর্শন একাধারে সাহিত্য ও দর্শন, মালিনীবিজয়বাটিক, তন্ত্রসার প্রভৃতি—কামাখ্যায় শাক্ততন্ত্র রচনা—কৌলমতের মুখস্থান কামাখ্যা—বীরশৈব সিদ্ধান্ত মত—জীব ও শিব বস্তুতঃ অভেদ—শৈবসিদ্ধান্ত মত—শিব, শক্তি ও বিন্দু রত্নত্রয়—শিবের সংজ্ঞা ‘পতি’—তিনি পঞ্চকৃত্যকারী (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, অতঃপ্রহ ও নিগ্রহ শিবের পঞ্চকৃত্য)—ত্রিকবাদে শিবেরই পশুভাব গ্রহণ—মোক্ষকথা—প্রত্যভিজ্ঞাই মোক্ষ—অর্থাৎ স্ব স্ব রূপের উপলব্ধি—পরমেশ্বরের নিরপেক্ষ শক্তিপাত—ত্রিকমতে শিবের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি—নাথ মতে শক্তির ক্রিয়ানীল অবস্থায় জগতের উদ্ভব—শক্তিয়ুক্ত শিবই ‘সকল’ পরমেশ্বর—শক্তির তিনটি রূপ—শৈবসিদ্ধান্ত মতের শিব, শক্তি ও বিন্দুর সহিত নাথদর্শনের অনেকাংশে মিল—বিন্দু হইতে নাদ তথা জগৎ সৃষ্টি—শিবশক্তির জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছাই বিন্দু—শিবশক্তির সদ্গমে পরমপদ প্রাপ্তি—ইহাই নাথসিদ্ধদের লক্ষ্য।

সিদ্ধান্ত অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১৯৯-২১২)

পরমপদ বা পূর্ণসত্যের স্বরূপ, সামরন্ত

নাথগণের চরমলক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি সর্বতত্ত্বের উর্দ্ধস্থ পরমতত্ত্ব—কার্যাকারণ কর্তৃহীন ও সর্বকারণের কারণ—পরমপদ গতাগতিহীন, সামরন্তাত্মক, সর্বানন্দময়, স্বরূপস্থিতি তুরীয়াতীত শান্তিনিয়ম, সাত্ত্বজাগর অবস্থা—মনবুদ্ধির অতীত পরমপদ স্বসংবেগ, একাধারে বিশ্বরূপ ও বিশ্বোত্তীর্ণ আনন্দঘন অভয়পদ—নাথস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি, উহাই পরমপদ—নাথস্বরূপ দ্বৈতাত্মক উপরোবর্তী—সামরন্তই মোক্ষ, যথায় বিস্তৃত আত্মার উপলব্ধি ও অনাস্ব ভাবের প্রশান্তি অপিলীন ও চরাচরের অঙ্গীকার—পাপপুণ্যহীন বিগতক্লেশ সাম্যাবস্থা, তাদাখ্যো ভেদবিরহ অথও একবোধ, শিবভাবই সামরন্তের ভূমি, যুগপৎ বিশ্বাতীত ও বিশ্বরূপই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ—জ্ঞানে বহু ভেদময় সংকীর্ণ ভাবের সমাবেশ বশতঃ পূর্ণতত্ত্বের অভাব—অভিন্নত্বই পূর্ণতত্ত্ব, ভেদবিরহই সামরন্ত—পরমপদই সহজাবস্থা সামরন্তের ভূমি কলাকুলের প্রতিষ্ঠা—পূর্ণসত্যের লক্ষণ, সর্ব-বিলক্ষণ—পূর্ণসত্য ‘নাথ’ নিগুণ সত্ত্বের ঐক্যভূমি—ক্রিয়া ও অক্রিয়া উভয়ই যাহাতে স্থিত তাহাই পূর্ণসত্য—সকল নিকল মিলিয়াই পূর্ণ—অপরোক্ষ পরমপদলাভে গুরুকৃপা ও পুরুষকারের প্রয়োজন—পরমপদ লাভের সাধন ‘জ্ঞান’ ও ‘যোগ’ উভয় উপায়ে—সংকল্প ত্যাগ ও পরমাত্মার স্বরূপদর্শনে মুক্তি, ইহা যোগসাধ্য—যোগাগ্নি দ্বারা অপকদেহের

দহন ও পকদেহ লাভ—পবনজয়ে চিত্তজয় ও দোষহীন চিত্তে সাত্বপ্রকাশ—চতুর্বিধ জ্ঞানাবস্থা—তন্মাত্রাভে পরমপদে স্থিতি, চাক্ষুর্য মূল সংকল্পের নিরোধে নৈকথ্য—নিরুখান ও সামরস্ত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ—নৈকথ্য মাত্র পরমপদ নহে, নিজাশক্তির আশ্রয়ে যুগপৎ বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবই পরমপদ—কেবলীপুরুষের পরমপদে স্থিতি—কুণ্ডলিনীর প্রবোধে ও সর্গ কৰ্ম্মত্যাগে সহজাবস্থা—ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সংযমনসহ প্রণব উচ্চারণ ও ভগবানকে স্বরূপপূৰ্ব্বক পরমগতিলাভ অন্তরঙ্গ সাধন—পরমবৈরাগ্য দ্বারা বুদ্ধি উপরস্ত হইলে স্বরূপে অবস্থান তাহাই সহজাবস্থা—নৈকথ্যের স্বরূপ—আশ্রয়ের প্রলয় হইতে নিষ্কম্পতা, তাহা হইতে নিজাবেশ, তৎ প্রতিষ্ঠাই নৈকথ্য, পরমপদে নিজপিণ্ডবিত্তি ও স্বরূপানন্দের উন্মেষ, উন্মেষ প্রত্যাহরণই সামরস্যের রহস্য—বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বের অস্বীকার সামরস্ত্রের চরমস্তর—সামরস্ত্রে বা পরমপদে বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণের এক অখণ্ডবোধ, সচ্চিদানন্দমুষ্টি কল্পনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ: ২১৫-২২১)

পিণ্ডভঙ্গ

সত্যবিচারে উৎপত্তি নাই—ব্যবহার দৃষ্টিতে উৎপত্তি আলোচ্য—ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পরেও পরব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপ—অনামা পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ কার্যাকারণ কর্তৃহীন—অব্যক্তের নিজাপরাদি পঞ্চশক্তি ও তাহাদের প্রত্যেকের পঞ্চগুণ, নিজাদির পঞ্চবিংশতি গুণাশ্রয়ে পরপিণ্ড, অনাদিপিণ্ড পঞ্চতত্ত্বযুক্ত, আত্মপিণ্ড ও তাহার পঞ্চতত্ত্ব, সাকার ও মহাসাকার পিণ্ড, মহাসাকারই শিব, শিবের অষ্টমুষ্টি জীবের পঞ্চ অস্তঃকরণ, অকুল ও কুল, কুলপঞ্চক—সব্বরজতমকাল ও জীব—জীবের পঞ্চগুণ, ব্যক্তিপঞ্চক, প্রত্যক্ষকরণ পঞ্চক, কলা চন্দ্রের ১৬, সূর্য্যের ১২, অগ্নির ১০, তদতিরিক্ত অমৃত, প্রকাশিকা ও পরাজ্যোতি কলা—গর্ভপিণ্ড, অমূলোম ও বিলোম ক্রমে পরমেশ্বর ও মনুষ্য ভ্রূণের সৃষ্টি, সৃষ্টমতে ষট্‌পিণ্ডের উদ্ভব—জীবের মুক্তি প্রয়োজন, মুক্তির নিমিত্ত সাধন—জীবের স্বরূপ নিরূপণে ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাবের চিত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ: ২২২-২২৭)

পিণ্ডাদার

পিণ্ডশব্দের অর্থ—পিণ্ড সকল উৎপন্ন, শক্তির প্রসার ও সংকোচই সৃষ্টি ও সংহার, শক্তিমান শিব জগদাকারে ক্ষুরিত, শিব ও শক্তি চন্দ্র চন্দ্রিকার হৃদয়—শক্তি নিখিলপিণ্ডের আশ্রয়, তত্ত্ব যেমন সূত্ররূপে বস্তুর আশ্রয়, অতএব শক্তির নাম পিণ্ডাদার, শক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—১। শিবস্বরূপ, ২। আধারশক্তি, ৩। চিদ্রূপা। শিবভাব সামরস্ত্রের ভূমি কুলাকুল স্বরূপ, কুল ও অকুল শক্তি—বিমর্শ পরাসক্তাদি পঞ্চকুলশক্তি—শক্তির প্রসারে শিবের স্বরূপচ্যুতি ঘটে না, কারণ বিসর্গ ব্যবহারিক পারমাণ্বিক নহে, আধারশক্তি কুণ্ডলিনী, প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধরূপা কুণ্ডলিনীর

উর্দ্ধগমনই আগরণ, তখন প্রপঞ্চনিরস্ত—আধারশক্তি মূলশক্তি, নবচক্রশক্তি তদধীনা—
উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ শক্তি, মধ্যশক্তির স্থূল ও সূক্ষ্মভেদ—ক্রিয়াভেদে ত্রিশক্তির ত্রিবিধ
আখ্যা—উর্দ্ধশক্তির নিপাতনে পরমপদ প্রাপ্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২২৮—২৩২)

শিবশক্তির পরম্পর সম্বন্ধ বিচার

জগৎ প্রপঞ্চের পরমকারণরূপ শিব—তিনি স্বয়ংসিদ্ধ—শিবের কারণতাই
তাহার শক্তি—শিবশক্তি নিত্যযুক্ত ও অভিন্ন, তথাপি এই পরমতত্ত্ব দৃষ্টিভেদে শিব
বা শক্তি, শক্তির প্রসার ও সঙ্কোচ, বহিঃপ্রকাশই শক্তির কার্য—বিকাশ ও উন্মেষ—
শিবের নিগ্রহ ও অহুগ্রহ, শক্তি প্রসার সঙ্কোচাত্মক, শিব উহার উপরমাত্মক—
শিব নিরাভাস ও শক্তি আভাসস্বরূপা—একরস সর্বস্ব, পরমশিবের দ্বৈতরূপা—সক্রিয়
ও নিষ্ক্রিয়—শিবস্বরূপ ও শক্তির পঞ্চভাব, বিমর্শই শিবের শক্তি—অনামা পরমব্রহ্ম
ও পরাইচ্ছাদি পঞ্চশক্তি—কুণ্ডলিনীশক্তি। শক্তির নিগ্রহ ও অহুগ্রহ, বহির্মুখ ও
অন্তর্মুখ ক্রিয়া নিষেধব্যাপাররূপা শক্তি ও অলুপ্তশক্তিমান শিব, শক্তি দ্বারা বাচ্য-
বাচকত্বের উপরম—শিব ও শক্তি ভাবের তুলনা—শিবাভিন্ন শক্তি, সৃষ্টির অপেক্ষায়
শক্তির প্রসার ও সঙ্কোচ, শক্তি শিবের আগন্তুক ধর্ম নহে, অনিষ্টস্বরূপ যোগ্যতা।
নিকখন দশা শিব, উখিত দশা শক্তি—শক্তির স্থূলসূক্ষ্ম কারণভাব, প্রমাতা, প্রমেয়,
প্রমাণরূপা শক্তি, পরা, পরাপরা ও অপরাভাব চিতিশক্তির ত্রিবিধরূপ, চিৎ, মায়া ও
জীবশক্তি; ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া শক্তি অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তটস্থ শক্তি এবং শক্তি ও
শক্তিমানের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ—শক্তির তারতম্য অহুসারে বিভিন্ন নাম—রাধাস্বামীতব।
পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বা ষট্‌ত্রিংশতিতত্ত্ব—শিবতত্ত্ব—স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে খ্যাত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২৩৩—২৪৯)

সৃষ্টি ও সংহার—পিণ্ড উৎপত্তি বিচার

সৃষ্টি ও সংহার—ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব—বুদ্ধ ও অবুদ্ধ ভাব—শক্তির প্রসার ও
সঙ্কোচ—সৃষ্টি ও সংহার—সৃষ্টি জগতের সাকার নিরাকারভেদ—ষট্‌পিণ্ড—গোরক্ষমতে
সৃষ্টির পূর্বাঙ্গের ক্রম—ব্রহ্মার দৃষ্টি হইতে প্রাকৃতপিণ্ড—পরমতত্ত্ব বিশ্বময় হইয়া
বিশ্বোত্তীর্ণ—শক্তির প্রসারের ক্রম ও ভেদ—সৃষ্টিহেতু পরতত্ত্বের পূর্ণতা খণ্ডিত হয় না।
পরপিণ্ডের অপরম্পরাদি পঞ্চভাবের আবির্ভাব—স্বপ্রকাশ ও বিমর্শভাব। শক্তির
ক্রমোন্মেষেই সৃষ্টির আরম্ভ—আত্মপিণ্ড হইতে সাকার সৃষ্টি—কূলপঞ্চক—সৃষ্টি ও
সংহারের স্বরূপ—বিসর্গশক্তি—ইহা বিশ্বসৃষ্টির কারণ—নাদ ও বিন্দুরূপ সৃষ্টি, শব্দসৃষ্টি
—এক হইতে বহু সৃষ্টি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ বিগ্রহ—নাথ সম্প্রদায়ে প্রচলিত বঙ্গ-
সাহিত্যে সৃষ্টিপদ্ধতি বর্ণনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (পৃ: ২৫০—২৬৬)

জীব, ঈশ্বর ও জগৎ

শক্তি ও শক্তিমান অহম্ মমেতিবৎ—শিবই জীব—নাম ও রূপদ্বারা ব্যক্ত জগৎ—
ব্যক্ত জগতের উপাদান কারণ ঋতিতে মায়াশক্তি—প্রকৃষ্টরূপে বা মূখ্যস্বরূপে জগতের
কর্ত্রীই প্রকৃতি—‘জীব’ শব্দ মনুষ্যজীব অর্থে ব্যবহৃত—জীবের ‘পাশ’ ও তাহা হইতে
মুক্তি—জীবের জন্ম—জীবের ত্রিবিধ দেহ ধারণ—একজীববাদ ও অনন্তজীববাদ
—ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণ চেষ্টা—বেদান্তে ও তন্ত্রে—শক্তির অস্থলীন অবস্থায় শিব
শব্দবৎ—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—কৈবল্যের উর্দ্ধে শিবকে লাভ করিবার অবস্থা—বিষ ও
প্রতিবিষ, সাধনবলে ‘মায়া’কে দূর করা যায়—কিন্তু ‘শক্তি’কে দূর করা যায় না—
শিবের অষ্টমূর্ত্তি—শঙ্করপরবর্ত্তী যুগে ঈশ্বরতত্ত্ব—জীব, ব্রহ্মা ও ঈশ্বরে ভেদ—নাথস্বরূপ
—শিব, শক্তি, কাল ও নাথ—দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্বাচন, ‘ব্রহ্ম’ ও
‘নাথে’ ভেদ—শিব-শক্তি অভেদ—উপনিষদে ঈশ্বরলক্ষণ এবং সিকাসিকাসংগ্রহে
পরমেশ্বরের লক্ষণভেদ—‘ব্রহ্মযোনি’ বা ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির কারণস্বরূপ—জগৎ ও আত্মা
ভ্রোগ্য ও ভোক্তা স্বরূপ—মায়া কামধেনু, জীব ও ঈশ্বর তাহার বৎস স্বরূপ—জীবে
ঈশ্বরে ভেদাভেদ—বেদান্তমতে মায়ার উচ্ছেদে মোক্ষ—শক্তি দর্শনে উহা হইতে পৃথক্
কল্পনা—জীব চৈতন্য স্বরূপ—জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর—ব্যাধি ও সমষ্টি ভেদে জীব
ও ঈশ্বর—শঙ্কর মতে জগৎ মিথ্যা—শশশুদ্ধের দ্বায় অলীক নহে—উহার ব্যবহারিক
সত্তা আছে—সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট জীব—স্থূল ভূতের পক্ষীকরণ—শিব জীব হন ও
জীব পুনরায় শিব হন—শরীরাত্তিমাণে জীবত্ব—সমনস্ত ও অমনস্ত জীব—ঈশ্বরের
অস্তিত্ব অস্বীকার—সত্ত্ব ও নিগুণ ব্রহ্মে ভেদ—‘গৌরক্ষমতে’ বিশ্বের উৎপত্তি—
মৎস্তেন্দ্রনাথের ‘নিরঞ্জন’—সৃষ্টি সংহার ও জীব কল্পনা—তন্ত্রের বিনু ও বিসর্গ রহস্ত—
বৈষ্ণবতন্ত্রে নারায়ণ ও তাঁহার শক্তি—তত্ত্বমসি ব্যাখ্যা—অহম্ রূপে বাচ্যবাচক
সম্বন্ধ—চন্দ্র চন্দ্রিকার দ্বায়—নিরাকার হইতে ইচ্ছাশক্তির জন্ম—যোগমায়া জন্ম—
মহামায়া ও মায়ায় সম্বন্ধ—দ্বৈত অদ্বৈতবাদ ও সিন্ধুমতে পুরুষ প্রকৃতি ভেদ বর্ণনা—
বিবর্ত্ত ও আভাসবাদ—বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ—নাথমতে বিশ্বের উদ্ভব ও শিবশক্তির
সম্বন্ধ—বৌদ্ধমতে শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি কল্পনা ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পৃ: ২৬৭—২৯১)

দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিন্ধুমতের বৈশিষ্ট্য (পৃ ২৬৭—২৮০)

বেদান্ত ও আগমে সাধনার আদর্শ বা লক্ষ্য এক—বেদান্তে অদ্বৈতবাদ, আগমে
দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—শক্তি উপাসনা—ভারতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে শক্তিপূজা
উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত—বাণের চণ্ডীশতক—ঋতিতে শক্তিপূজা—শক্তি ও কারণব্রহ্ম
বস্তুতঃ অভেদ—অদ্বৈতাগমে শিব ও শক্তি অভিন্ন—মহাশক্তি তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্ব-



তত্ত্বাত্মক—সিদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দ্বৈত ও অদ্বৈত বিবজ্জিত—দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই পরমমতের একাংশ—নাথমতের বৈশিষ্ট্য—সিদ্ধমতে যোগ ও ভোগের বৈশিষ্ট্য—অবদূত প্রারম্ভ কৰ্ম নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম—গীতায়া নিকাম কৰ্মের উপদেশ—বেদান্তীয় জ্ঞান ও কৰ্ম পরস্পরসাপেক্ষ—দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ পদে অবস্থানে মুক্তি—ব্রহ্ম সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—নিষ্ঠা 'ব্রহ্ম' ও 'নাথ' স্বরূপে ভেদ—নাথস্বরূপ ষাদৃশ এব তাদৃশ এব—সিদ্ধমতে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্ত্র কন্তব্য—ঐকার সাধনে কুণ্ডলিনীর জাগরণ—কায়সাধন—মহাসিদ্ধদের দণ্ড, উপবীত, শিখাদির বৈশিষ্ট্য—নাথ বিদ্যোত্তীর্ণ ও যোগদ্বারা লভ্য—যোগমার্গ শ্রেষ্ঠমার্গ—হঠযোগের বর্ণনা—মন্সোল্ল গোরক্ষ জালন্ধর আদির নামে আসন, বন্ধ ইত্যাদি—বায়ুজয় দ্বারা রাজযোগে উপনীত হওয়া সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য—নাথমতে আসন, নাদ প্রভৃতি সাধনের ফল—কুণ্ডলিনীর প্রবোধন ও সহস্রারে স্থিতি—আস্থার আচ্ছাদনস্বরূপ মন ও ভূত—শিবের দিব্যচক্ষু লাভের সাধন বা দিব্যদর্শন—নাথমতে নদীর সাগরে নীত হইবার দ্বারা মানবের পরমসত্তাকে উপলব্ধি—জড়পদার্থ শিব ও শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে—বৌদ্ধ ও হিন্দুত্বে শিব-শক্তির মিলন আদর্শ—সাধকের প্রকৃতিলীন অবস্থা—'সদ্ধিক্ষণে' স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি—সিদ্ধমতে এই নিমিত্ত ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ—কুণ্ডলিনীর জাগরণ, মধ্যনাড়ীর পথ উন্মুক্ত ইত্যাদি একই কথা—শ্রুতিতে মধ্যনাড়ী বা স্বস্থার কথা—সিদ্ধমতে যোগ ও জ্ঞানের সম্বন্ধ—নাথমতে পক্ষ ও অপক্কেদেহ—অগ্ন্যস্ত্র মার্গে মুক্তি চরমলক্ষ্য কিন্তু সিদ্ধমার্গে মুক্তিসহ সিদ্ধি লক্ষ্য—কোলজ্ঞাননির্ণয়ে সিদ্ধিলাভের কথা দূরদর্শন পরকায় প্রবেশ আদি সিদ্ধি—যোগীদের খেচরীমূত্রা সাধন—দশদ্বার কথা—গোরক্ষমতে 'শব্দব্রহ্ম' সাধন—নিরঞ্জনের জ্ঞানে মুক্তি—বৃত্তি, প্রাণ ও বীৰ্য্যজয়ে গোরক্ষমতে বৈশিষ্ট্য—অর্কনারীধর পুরুষবাৎ—দ্বৈত হইতে অদ্বৈত, তৎপরে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবজ্জিত সত্তার উপলব্ধি সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য।

ত্যাগ ও ভোগের সামরস্ত্র (পৃ ২৮০—২৮৩)

ত্যাগ ও ভোগের রহস্তভেদ—অবদূত পক্ষে ভোগ বাসকস্বরূপ নহে—গৃহস্থের ত্যাগ ও ভোগ, ভোগের পরে ত্যাগের পন্থাগ্রহণ—যোগিপক্ষে প্রারম্ভের জয়—ভারতীয় আদর্শাশ্রমায়ী ত্যাগে মুক্তি, ভোগে বন্ধন—কিন্তু উপনিষদে সামরস্ত্র আদর্শ—ভোগাসক্ত না হইলে ভোগ বর্জনীয় নহে—বৌদ্ধ ও আর্হতদর্শনে ত্যাগমার্গ—ত্রিকদর্শনে ভোগ ও মোক্ষের সামরস্ত্রে জীবমুক্তি—বৌদ্ধ সহজিয়ার 'মহাস্থখ' উপলব্ধিতে ভব ও নিক্রাণ উভয় সিদ্ধি।

পরমহংস ও অবদূত (পৃ ২৮৩—২৮৫)

অবদূতই নাথমার্গের আদর্শ—নাথমতে পরমহংস ও অবদূত বিচার—সিদ্ধমতে পরমহংস কেবল ত্যাগী, জীবদূতের ত্যাগ ও ভোগ উভয়ই করায়ত্ত—বেদান্তমতে

পরমহংস শ্রেষ্ঠ—অতএব বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন আদর্শ, ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠ বিচার অকর্তব্য ।

বন্ধন ও মোক্ষ (পৃ ২৮৫—২৯১)

নাথমতে বন্ধ পক্ষপাতবিনিমুক্ত—বর্ণাশ্রমত্যাগে মুক্তি—নাথস্বরূপে অবস্থানে মুক্তি—সবিষয় ও নিবিষয় মন বন্ধন ও মোক্ষের কারণ—চিত্ত ও অচিত্তে সমতাপন্ন ব্যক্তি মুক্ত—সন্তোমুক্তি ক্রমমুক্তি বিহঙ্গমমার্গ ও পিপীলিকামার্গ—যোগবীজে মর্কটক্রম ও কাকমত—সিদ্ধযোগী বন্ধমোক্ষহীন—সিদ্ধযোগী ভাবাভাবমুক্ত অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের যোগ জানেন—মোক্ষলাভার্থে ‘জ্ঞানযুক্ত যোগ’ আবশ্যক—কুলের বা শক্তির উর্দ্ধগমনে মোক্ষ—বেদান্তমতে অধ্যাস দূর হইলে মুক্তি—সাংখ্যমতে হৃৎকের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে মোক্ষ—শক্তিতে মোক্ষের আদর্শ এবং বন্ধ ও মোক্ষের বৈলক্ষ্য—কুণ্ডলিনীর জাগরণ ভিন্ন পরমাত্মায় স্থিতিলাভ অসম্ভব—পূর্ণজাগরণে অদ্বৈত জ্ঞান বা ‘পূর্ণহস্তা’—‘স্রোতাপন্ন’ বা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন একই কথা—কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্যে মেরুপথে সহস্রারে গমন—সাধনদ্বারা তত্ত্বাতীত অবস্থা লাভ—কৈবলাসিদ্ধি অথবা জীবোদ্ধার নিমিত্ত নির্মাণকায় গ্রহণ—নাথাবস্থায় অবস্থিতি হইলে মগ্নোপানবৎ পুনরুত্থান হয় না—সাংখ্যের কার্যেশ্বরত্ব ও তটস্থ অবস্থা—তত্ত্বমতে সাম্যভাবে স্থিতি বা ব্রাহ্মী স্থিতি ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃ ২৯২—৩০৭)

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপরা ও পরা মুক্তি

মুক্তি ত্রিপ্রকার—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি—উহাদের ভেদবর্ণন—বেদান্তীর জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি—নাথমতে জীবন্মুক্তি আদর্শ—সিদ্ধদেহলাভে মুক্তি রক্ষা—সম্ভবমতেও স্থলদেহে মুক্তিলাভ আদর্শ—জীবন্মুক্ত যোগীর পিওপাত হয় না—যোগীর ইচ্ছামৃত্যু—জীবের অজ্ঞানের স্বরূপ মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান—পক্ষদেহ প্রারম্ভের অধীন নহে—যোগদ্বারা প্রারম্ভের ক্ষয়—বেদান্তী জ্ঞানমার্গী অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা জীবন্মুক্তি লক্ষ্য—সাংখ্য ও গীতাতে জীবন্মুক্তির আদর্শ—শ্রুতিতে জীবন্মুক্তি—শ্রুতিতে বিদেহমুক্তির আদর্শ—নবদ্বার রুদ্ধকরণে বিদেহমুক্তি—সাংখ্য প্রভৃতির আদর্শ ইহা হইতে ভিন্ন—নাথমতে যোগীর আদর্শ—দেহনাশে বিদেহ বা অদেশ মুক্তি—শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপের জ্ঞান ও তাহাতে স্থিতি যথাক্রমে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তিরূপে পরিচিত—জীবন্মুক্তের বিভিন্ন ভূমি—নির্লিকার যোগী জীবন্মুক্ত—কায়িক ও মানসিক কর্মত্যাগই জীবন্মুক্তি—সিদ্ধমতে বিদেহমুক্তি নাই, কায়ব্যূহ রচনা দ্বারা প্রারম্ভ ক্ষয়—বেদান্তীর প্রারম্ভ ক্ষয়ে বিদেহমুক্তি—শুদ্ধমার্গের দিব্যদেহ, যোগদেহ ও ভারদেহ—রামানুজমতে ভগবানের কৈরুর্ঘ্যই পরমমুক্তি—রামানুজ নির্ধার্ত্ত জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না, বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন—সাংখ্যমতে বিবেকজ্ঞানে জীবন্মুক্তি—

শরীরনাশে দুঃখ হইতে মুক্তিই বিদেহমুক্তি—বিদেহমুক্তদের প্রকারভেদ—প্রকৃতিলীন ও বিদেহলীনদের মোক্ষ—বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির ভেদবর্ণন—ত্রিকদর্শনে জীবন্মুক্তির স্বরূপ বিচার—বায়ুনিরোধে ভগ্ন মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়—জ্ঞানের উন্মেষে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার—চিন্তনয় ও বিবেকখ্যাতির দ্বারা যোগীর জীবন্মুক্তি—যোগীর চারি অবস্থা—নাথমতে ‘উন্নয়নী’ অবস্থা—প্রাপ্তি আদর্শ—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে অপরা ও পরা মুক্তি—আগমসম্মত পরামুক্তিতে পূর্ণত্ব—মৎস্তেন্দ্রমতে দেহমুক্ত জীবই শিব—সালোক্যাদি প্রাপ্তি অপরামুক্তি এবং শিবত্বপ্রাপ্তি পরামুক্তি—পরামুক্তি পুনরাবর্তনশূন্য—কালচক্রের আবর্তন হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—জন্ম ও দেহসিদ্ধি—মৃত্যুতে মুক্তি এ দারুণা ভ্রান্তিমাত্র—মানবের ত্রিবিধদেহ—প্রণবতত্বলাভ ও জীবন্মুক্তি, জ্ঞানতত্বলাভ ও পরামুক্তি—প্রণবতত্ব হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানতত্বলাভ—দেহশুদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া—অজপাজপ—রসের ব্যবহার ইত্যাদি—সিদ্ধদেহ বা মস্ততত্বই রূপান্তরিত দেহ—মতান্তরে মহাকারণ দেহ, বৈন্দব দেহ, শুদ্ধ দেহ ইত্যাদি সিদ্ধমার্গে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে দেহসাধন প্রক্রিয়া প্রচলিত—চীনদেশের ভোগের দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ—সিদ্ধমতে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভই মুক্তি পদবাচ্য—কুণ্ডলিনীর প্রবোধনে মৃত্যুহীন সিদ্ধদেহলাভ।

নবম পরিচ্ছেদ (পৃ ৩০৮—৩০৯)

গুরু-পরম্পরায় নাদ ও বিন্দুসন্তান

নবনাথ কথা—বিভিন্ন গুরুবর্ণনা—শ্রীগোরক্ষনাথ ঈশ্বরসন্তান—বিন্দুসন্তান—পুত্র, নাদসন্তান—শিষ্য—সিদ্ধমতে শিষ্য বা নাদসন্তান পুত্রাপেক্ষা প্রিয়—নাদ হইতে নবনাথের জন্ম—বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম—তত্ত্বমতে পরশিব আদিগুরু—শিষ্যরূপে তিনিই ঈশ্বর পদবাচ্য বা অপারশিব—ঈশ্বরের অল্পগ্রহে মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বরাদির জন্ম।

দশম পরিচ্ছেদ (পৃ: ৩১০—৩১২)

জরামৃত্যুর রহস্য এবং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ

পাকভৌতিক দেহ জরামরণশীল—তথাপি এই দেহে অজরত্ব অমরত্ব সাধন—খেচরীমূর্ত্তা সাধন—রস বা পারদের ব্যবহার—বিভিন্ন মূর্ত্তাসাধনে কাষসিদ্ধি—কালজয় বদ্ধত্বয়ের সাধন—অমৃতকলার আব—অমৃতকলায় ঘোড়শী শক্তি—জীবনের পূর্ণিমা ও অমাবস্তা—পঞ্চমহাভূতের পঞ্চদশগুণ—ঘোড়শী নিত্য বা মহাত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা—এই ঘোড়শীকলার সহিত নাথসিদ্ধদের সম্বন্ধ—কুণ্ডলিনীর জাগরণ—দেহমধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র বা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক—বিন্দুজয়, উন্নয়নী বা তুরীয় অবস্থা—উন্টামার্গে সাধন—মৃত্যুকালে দশমীঘোর হইতে বহির্গমনের সাধন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দশমীঘোরের উল্লেখ—ইন্দ্রিয় ও প্রাণের প্রত্যাহার—উর্দ্ধজিবেণী বা বারাগসী সঙ্কম—ব্রহ্মবিজ্ঞালাভে

জরামরণ জয়—ভোগবাসনাই মানবের জন্মের কারণ—লিঙ্গশরীরে ভোগ নিষ্পন্ন হয় না—তিক্ষতে মুমূর্ষুর গতি নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন—গীতায় মৃত্যুবিজ্ঞান—গীতায় মন ও প্রাণ নিরোধের উপায় বর্ণন—গীতায় অক্ষরব্রহ্মযোগ—নাথযোগীর সাধন—অজ্ঞাপা জ্ঞাপ—বিন্দুজয়ে কায়সিদ্ধি—বৌদ্ধদের বজ্রকায়—রসেশ্বরের হরগৌরী তত্ত্ব—সিদ্ধমার্গের দিব্যদেহ ও সিদ্ধদেহ—অশুদ্ধ স্থিতিতে অবস্থান্তরই জরা—শুদ্ধ অক্ষার মরণ বা তিরোভাব জাগতিক মরণের সদৃশ নহে—সিদ্ধমার্গে কল্পান্ত বা যুগান্তরূপ দীর্ঘস্থিতিতে অমরত্ব লাভ—কালের গতির উর্দ্ধে অজরত্ব লাভ ও জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি।

একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃ: ৩২০—৩৩৯)

দেহতত্ত্ব ও পিণ্ডসংবেদন

দেহতত্ত্ব কি? পিণ্ডসংবেদনের অর্থ—পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ—বিশ্ব উৎপত্তি—জীবের আবির্ভাব—ভূতাকাশ হইতে পঞ্চমণ্ডল ও পঞ্চচক্রের উৎপত্তি নিম্নতম চক্রে স্থূল জগতের জীব—যটপিণ্ডের উৎপত্তি ও গর্তপিণ্ডে জীবের আবির্ভাব—জীবের তিনটি আবরণ: বাসনা, কামনা ও অভিমান—জীবের ঈশ্বরতত্ত্বলাভের সাধনা—শ্রুতিতে জীবদেহের উৎপত্তি এবং 'হংস' মন্ত বর্ণন—ব্রাহ্মী স্থিতি ও কুণ্ডলিনীতত্ত্ব—ত্রিবিধ দেহ: স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—নাথদের সিদ্ধদেহ আত্মা উপাধি জয় হইতে ভিন্ন—লিঙ্গশরীরের উপাদান—সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান—স্থূল শরীর বা ভোগায়তন দেহ—নাথমতে স্থূলশরীর মোক্ষের উপায়স্বরূপ—জীবের চৈতন্য ও ত্রিবিধ অবস্থায় উহার অবস্থিতি—নাথগণের উৎপত্তি বর্ণন—ব্রহ্মাণ্ড কি? ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন, পিণ্ডে চতুর্দশ ভুবন কল্পনা—দেহমধ্যে নদনদী, দেবতাদির অবস্থান—ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডে সমষ্টি ও ব্যষ্টি সম্বন্ধ—শিব ও শক্তির জীবদেহে অবস্থান বর্ণন—ব্যষ্টি ও সমষ্টির জ্ঞান আবশ্যক—কুণ্ডলিনীর উদ্বোধনে পিণ্ডসিদ্ধি—পাশ্চাত্যদেশে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা—পিত্ত ও ব্রহ্মাণ্ডে যটচক্রের অবস্থান—সম্ভবমতে মহুষ্কপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডীমনের দেশ—মহুষ্কদেহে 'শ্রীচক্র'র রূপ কল্পনা—অম্বিতার তিনটি রূপ: মানস, প্রাণময় ও ভৌতিক শরীর—আত্মা ও অম্বিতার ভেদ—নাথগণের আত্মোপলব্ধি কাম্য সেই নিমিত্ত পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ (পৃ: ৩৪০—৩৬১)

শূন্যতত্ত্ব

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে শূন্যতত্ত্বের ধারণা প্রচলিত—শূন্যবাদ বৌদ্ধ ধর্মের নিজস্ব কোন বাদ নহে—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে শূন্য কথা—নাথধর্মে শূন্যতত্ত্ব—সহজাবস্থানলাভে শূন্যসমাধি—বৌদ্ধ সহজিয়ামতে চারিশূন্য—ইষ্টযোগ গ্রন্থে শূন্যলক্ষণ ও প্রকারভেদ বর্ণন—অমনস্বে শূন্য পর যোগী কথা—গীতায় তবে লীন যোগী কথা—নাথমার্গে জলমধ্যে লবণের দ্বায় ব্রহ্মে লীন যোগীর কথা—বৌদ্ধ ও জৈনমার্গে ইহার

অম্লরূপ কথা—শূন্যপদবী বা ব্রহ্মনাড়ী—বিশুদ্ধ শূন্য বা নির্মাণ পদ—চতুর্থ শূন্য
অবৈতত্বমি স্বরূপ—উপায় ও প্রজ্ঞা বা নাদ ও বিন্দুর মিলনে নির্মাণপদলাভ বা চিত্তের
শূন্যময় অবস্থা—নাথমার্গে পঞ্চব্যোমের সাধনই শূন্য সাধন—শূন্যমুক্তি নিরঞ্জনের পূজা—
নাথমন্ত্রদ্বারা হইতে নিরঞ্জনীদের উদ্ভব—বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে অন্তরঙ্গ সাধনে ঐক্য—
শূন্যত্বের বিভিন্ন ধর্মে প্রবেশ—শূন্য অর্থে বৃত্তাকার বা কুণ্ডলী—শূন্য বা ব্যাপিনী
ঐক্যের মাত্রাংশ, ব্যাপিনী ও নিরাকার নাথে ভেদ বর্ণন—প্রণবের স্বরূপ—গোরক্ষ-
বোধে শূন্যকথা—গোরক্ষ-বিকাশে মনের শূন্যরূপ করণা—শূন্যত্ব উপলক্ষি গুরু-
সাপেক্ষ—যোগীর লয় সাধনে শূন্যসাধন—যোগীর চিত্ত শূন্যময়—উন্নতী অবস্থাপ্রাপ্ত
যোগী—দেহমধ্যে যে শূন্য বা আকাশ আছে তাহাই উন্নতী অবস্থায় মনের আবাস—
গোপীচন্দ্রের গীতে শূন্য কথা—হাড়িপার শূন্য হইতে বিশ্বের উদ্ভব করণা—দ্ব্যষ্টাকুর
শূন্যমুক্তি—বৌদ্ধ 'শূন্য' স্বয়ংজ্যোতি—বহুদেশে ধর্মপূজা শূন্যপূজার নামান্তর—ঋগ্বেদে
শূন্যত্ব উপনিষদের নিরাকার 'ব্রহ্ম'—বৌদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দৃশ্য ধর্মের নিষেধবাচক
শূন্য দ্বারা অভিহিত—নির্মাণ লাভে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহাই শূন্য—শূন্যের স্বরূপ
ব্যাখ্যা—শূন্যই 'ব্রহ্ম'—চিত্তের নির্মাণ ও অব্যাক্ত লীন হওয়া এক কথা—নির্মাণ
শূন্যোপম—মহাযান মতে শূন্যের বহু ভেদ ও শূন্যত্বের মূলকথা সাপেক্ষত্ব—বৌদ্ধ
সহজিয়া দোহায় শূন্য কথা—অবিজ্ঞা দূর হইলে মহাশূন্যে স্থিতি হয়—ত্রিরত্নের ধর্ম
শূন্য—অতএব একবার পুরুষ একবার প্রকৃতিরূপে বর্ণিত—মাত্মমিক ও শূন্যবাদীর
দুইদল—পরমার্থ সত্যই শূন্য—শূন্যতা ভাবনার উপদেশ—গোরক্ষনাথের যোগতত্ত্ব ও
নিগুণীদের শূন্য বা সংএর সাধনা—রাধাস্বামী মতে শূন্য সত্যলোকের নিম্নে, শূন্য ও
অমরগুহায় ধ্যাক্রমে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান—ব্রহ্ম জ্ঞানলাভে শূন্য উপলক্ষি—
বঙ্গীয় গীতিকায় তাহার উল্লেখ—বৈদিক যুগ হইতে শূন্যত্বের বিভিন্ন রূপ—বৌদ্ধদের
'শূন্য', নাথদের 'নাথ', যোগের 'ঈশ্বর' ও পরমেশ্বরতত্ত্ব ভেদাভেদবর্ণন, নাথ-
স্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

সকল সাধনার মূলতত্ত্ব চিত্তকে বৃত্তিহীন করা,—নির্মাণ, অমনস্ক প্রকৃতি বর্ণন
—বৌদ্ধদের চারিটি শূন্য—পাতঞ্জল যোগমতে যোগীর চারিটি অবস্থা—হঠযোগের
তিনটি শূন্য, নাথসিদ্ধদের পঞ্চব্যোম, ত্রিলক্ষসাধন—মহাযান বৌদ্ধদের বিংশতি
শূন্য—বৌদ্ধদের বীজমন্ত্র 'ও শূন্যব্রহ্মণে নমঃ'—সকল সাধনতত্ত্বের মূলকথা এক, ইহাই
নির্মাণলাভ বা পরমপদে স্থিতি।

সাধনা অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ (পৃ ৩৬৫—৩৮৭)

গুরুত্ব ও সৎগুরুর মহিমা

একমাত্র গুরুবাক্যে সিদ্ধিলাভ—সহজাবস্থাতে গুরুর প্রয়োজনীয়তা—
গুরুর স্বরূপ বর্ণনা—নাদবিন্দুকলায়ানে—'নাথ', শিব ও গুরু অভেদ—বিভিন্ন গুরু



—সদগুরু অভেদে রূপা করেন—আত্মাই সদগুরু—গুরুরূপাকল—নাথগুরুর বৈশিষ্ট্য—যোগশাস্ত্রের প্রবর্তক—নাথ, যুগনাথ, ওয়ারহ—নাথযোগীর আদর্শ—নাথস্বরূপে অবস্থান—নাথস্বরূপ—অবদূতই গুরুশ্রেষ্ঠ, সকলের মহাগুরু—অবদূত গুরুর উপদেশের বৈশিষ্ট্য—সিদ্ধগুরু পঞ্চমাত্রমী—সদগুরুর লক্ষণ—সদগুরু পরমপদপ্রাপ্তির সহায়—সদগুরু ঠাকুর তব প্রদর্শক—অসদগুরুর লক্ষণ—গুরু-শিষ্য ভাব ও লক্ষণ—মহাপুরুষ-লক্ষণ বিচার—আদর্শ যোগী পঞ্চপাতবিনিমুক্ত, স্বদ্বাতীত—অবদূতই আদর্শ যোগী—সিদ্ধযোগিরাজ—অবদূতগুরুবাক্যের প্রাধান্য, তাঁহার বাহ্যলক্ষণ—পরমহংস ও অবদূত—অবদূত গুরু সিদ্ধদেহী, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক গুরুত্ব—নাথলক্ষণ—নাদ ও বিন্দুসন্তান—উভয়ের তুলনা—সিদ্ধদেহীর পক্ষে শিষ্যের দায়িত্বগ্রহণ—বহুশিষ্য গ্রহণ নিষেধ—গুরুসেবাকল—‘ও’ ও ‘রূ’র অর্থ মহাজ্ঞান লাভ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৫৮৮—৩২২)

যোগসাধনের উদ্দেশ্য

যোগমহত্ত্ব—নাথগণের আদর্শ—পূর্ণতব বা নাথস্বরূপ—সাধন ও দেহভুক্তি—সিদ্ধদেহ—বৈন্দবদেহ শুদ্ধদেহের নামান্তর—মহাজ্ঞানের উদয়—দিব্য বা শাক্ত দেহ লাভ—যোগসাধনের মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্য—পঞ্চদেহলাভ গৌণ, পূর্ণদেহলাভ মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবকল্যাণ ও অবৈত উপলব্ধি—নাথগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধদেহলাভ ও জগতের কল্যাণসাধন, তৎপরে অবিনাশত্বপ্রাপ্তি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ৩২৫—৪০৩)

সহজাবস্থালাভ, যোগসাধন-প্রণালী

পরমৈশ্বর্যলাভে সহজপন্থা অবলম্বন—যোগ ও তত্ত্ব—শিব ও শক্তি—শক্তিদর হওয়া প্রথমাদর্শ—দীক্ষা—শিবত্বপ্রাপ্তি—ব্রহ্ম ও পরমশিব—তত্ত্বের সাধনপ্রণালী—মহাবিন্দুতে মহামিলন—পঞ্চকোষসাধন—সহজাবস্থালাভ চরমলক্ষ্য—বেদান্ত, তত্ত্ব, পাতঞ্জল, বৌদ্ধযোগ মূলতঃ এক, মার্গ ভিন্ন—যোগসাধনের যোগ্যতা বিচার—দেশকাল বিচার—প্রাণায়ামের স্থান—যোগারম্ভের কাল—হঠমতে স্থানবিচার—যোগীর পথ্যাপথ্য—যোগসাধনে আত্মবদ্বিক অবস্থার অহুকুলতা—অভ্যাসকালীন নিয়ম ও আচারাদি—অনিয়মাদি—পঞ্চব্রত ও পঞ্চনিয়ম পালন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃ ৪০৪—৪৫২)

যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার (৪০৪—৪১২)

যোগমার্গে জ্ঞানযুক্ত যোগের আবশ্যক—জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞেয়র পরিসমাপ্তি হইলেও মোক্ষ হয় না—পঞ্চ ও অপঞ্চ দেহী—জ্ঞানীর পুনর্জন্ম—যোগ নিরপেক্ষ ও সকলের কর্তব্য—জ্ঞানযুক্ত যোগে মোক্ষলাভ—যোগ দ্বিবিধ—আন্তর ও বাহ্য—বহিঃস্থ ও অধ্যাত্ম—শাস্ত্রজ্ঞান আত্মজ্ঞানলাভের উপায় মাত্র—জ্ঞানের স্বরূপ—

ত্রিবিধ জ্ঞান—যোগী জ্ঞানকে আশ্রয় করেন—জ্ঞান ও অজ্ঞানে ভেদ—বিবেকী সদামুক্ত সংসারভ্রমবঞ্চিত যোগ বিনা জ্ঞানে মুক্তি নাই, নাথমার্গে 'জ্ঞান' ও 'যোগে'র অবস্থা—'মহাজ্ঞান' লাভ—জ্ঞানী ও যোগীর মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধ বিচার—যোগীর চারিপ্রকার ভেদ—মহাজ্ঞানের স্বরূপ বিচার—মহানামতীর 'মহাজ্ঞান'—মহাজ্ঞানলাভের দুইটি প্রকারভেদ—পঞ্চদেহে মহাজ্ঞানধারণ সম্ভব—যোগযুক্ত জ্ঞানই মহাজ্ঞান বা তারকজ্ঞান—জ্ঞানখণ্ডা, যোগ যুক্তস্বরূপ—যোগের দ্বারাই জীবের মুক্তি—যোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মার্গ নাই।

যোগ ও যোগাজ (পৃ ৪১৩—৪৫২)

যোগের অর্থ—যোগের অষ্ট অঙ্গ বা গোরক্ষমতে ষট্ অঙ্গ—যম ও নিয়ম—আসন (সিকাসন ও পদ্মাসনে ভেদ)—গোরকাসন, মন্ত্রোক্তাসন প্রভৃতি, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, দ্যান, সমাধি বর্ণন, যোগীর সপ্তসাধন—যোগের চারিটি পথ :—'মন্ত্র' 'হঠ' 'লঘু' ও 'রাজযোগ'—এই বিভিন্ন পথের বর্ণন মন্ত্রযোগে মন্ত্রচৈতন্য—যোড়শীকলা—জপাং সিদ্ধিঃ—হঠযোগের ষট্ কৰ্ম, মূদ্রা, বন্ধ, বেদ, সপ্তসাধন—মহামূদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেদ—মূদ্রাসাধনের ফল—খেচরী প্রভৃতি মূদ্রার রহস্য—সমাধি—হঠযোগ সাধনের ফলাফল—বজ্রোলী, সহজোলী ও অমরোলী মূদ্রার রহস্য—কুণ্ডলিনীতত্ত্ব—হঠযোগে সিদ্ধিলক্ষণ—লঘুযোগে চিত্তলয় দ্বারা মোক্ষ—ষট্ চক্র গোরক্ষমতে নবচক্র, যোড়শাধার ত্রিলক্ষা, পঞ্চব্যোমসাধন—দশদ্বার কথা—দশমীদ্বার বা শঙ্খিনীদ্বার—পীঠতত্ত্ব—কামরূপ, পূর্ণগিরি, জালন্ধর ও ওড়িয়ানপীঠ—রাজযোগ সৰ্বযোগের রাজা—ইহাই পাতঞ্জল যোগের অসম্প্রজাত সমাধি—রাজযোগ সাধনের মোড়শঅঙ্গ—রাজযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবমুক্ত যোগী—ইহাই যোগের চরমসীমা ও নাথগণের আদর্শ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হঠ ও রাজযোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার—নাড়ীচক্র ও নাড়ীশুদ্ধি অঙ্গপাসাধন (পৃ ৪৫৩—৪৬২)

হঠযোগের অর্থ—রাজযোগ আরোহণের সোপানস্বরূপ—হঠ ও রাজযোগের সমন্বয় কর্তব্য—যোগারম্ভের ফল—নাড়ীচক্র ও নাড়ীশুদ্ধি—বায়ুর সহিত দেহের সম্বন্ধ—অঙ্গপাণ্ডুরী—ইহা কুণ্ডলিনী হইতে সমুদ্ভূত—নাড়ীশুদ্ধির লক্ষণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাদ ও নাদানুসন্ধান, নাদের অবস্থাচতুষ্টয় (পৃ ৪৬৩—৪৬৯)

আকাশ সাম্যভাবে বর্তমান, আকাশের গুণ শব্দ—উহাতে শক্তির আঘাতে কম্পনের ফলে নাদের উৎপত্তি—উহার বহিমুখী ও অন্তর্মুখী দ্বারা—ছয়টি দ্বারা—ষট্ চক্রভেদ—গুরুরূপায় অনন্তহৃৎকর শ্রবণ—নাদ মূলতঃ এক, কিন্তু বিভিন্ন স্তর

বর্ণন—‘ফোট’—বিভিন্ন প্রকার নাদ শ্রবণ—আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি
অবস্থার বর্ণন—যোগীর নাদাত্মসন্ধান ও চিন্তন—রাজযোগ বা উন্নয়নী অবস্থা প্রাপ্তি—
নাদাত্মসন্ধানের কল জীবনমুক্তি—মহাচেতন—ঘট্ ত্রিংশ মণ্ডল—নাদরূপী আশ্রমের
উপলব্ধি—হংসময় জপ—সোহহং দ্বারা আত্মদর্শন—নাদাত্মসন্ধান লব্ধসাধনের মূখ্যতম
উপায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পৃ: ৪৭০—৪৮৬)

ওঁকারের স্বরূপ ও সাধন

সকল সম্প্রদায়ের মূলসাধন ওঁকার—সদগুরু ইহার পথপ্রদর্শক—ওঁকার সাধনে
শিবদেহের বিকাশ বা শিবসামা, শ্রুতিতে প্রণব কথা—অ-উ-ম—ওঁকার সাধনে ‘ত্রিরত্ন’
উপলব্ধি—চিৎ, শক্তি ও বিন্দু দীক্ষা দ্বারা মল অপসারণ—জীবের অণুভাব—বিবিধ
অজ্ঞান—‘হংস’পক্ষী—ওঁকারের দ্বাদশমাত্রা—ব্রহ্ম মাত্রারহিত—সিদ্ধমতে ওঁকারের
মাত্রা—ওঁকার জপে মনোলাভ—ইহাই ‘হংসময়’ বা অজপাজাপ’—আদিনাথ স্বয়ং
মীননাথকে অজপা গায়ত্রীর বর্ণনা করেন—শ্রুতিতে ও গীতাতে প্রণব প্রশংসা—এই
একাক্ষর মন্ত্রেই মুক্তি—শব্দযোগ বা বাক্যযোগ—শব্দযোগের পরিচয়—অস্থিম সীমানায়
ওঁকাররূপ রথও পরিত্যাগ কর্তব্য—প্রণবের অষ্ট অঙ্গ, চতুষ্পাদ—নাদ, বিন্দু, কলা
প্রভৃতি মাত্রা—নাদবিন্দু যোগে বিশ্বস্থিতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃ: ৪৮৭—৫১০)

নাদবিন্দু কলা

গুরু-নমস্কার, ‘নাদবিন্দুকলায়নে’—পরমেশ্বর ও চিৎশক্তি—‘সকল’ ও ‘নিকল’
শিব—চিৎশক্তির আসন, চিদাকাশ, মহামায়া, পরবিন্দু—পরবিন্দু হইতে জ্যোতি বা
নাদ, ওঁকার—জ্যোতির বহিরঙ্গ মায়া বা শিবের আত্মাবরণ—প্রলয়কালে পঙ্কমলজীব
—মন্ত্রেশ্বর ও মন্ত্র—উহাদের বৈন্দবদেহ কারণ বিন্দু জ্যোতির্ময়—বিন্দুর প্রথম কম্পনে
নাদের উৎপত্তি বা ওঁকার—ফোটবাদের ব্যাখ্যা—মানবমধ্যে অনাহত নাদ—
নাদ হইতে কলা বা বর্ণের উৎপত্তি—বর্ণের ব্যাখ্যা, বর্ণসমষ্টি ময়ূর অঙ্কুরের তায়—
ঘট্চক্র সাধন—পরা, পশ্চাদী, মধ্যমা, বৈধরী অবস্থার বর্ণন—বিন্দুতে আঘাত ফলে
পঙ্কগুণের উৎপত্তি, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞা, শাস্তি ও শাস্ত্যাতীত কলা—কলার সহিত
বর্ণ যুক্ত, যেক্রপ বাক্যের সহিত অর্থ—‘যড়ধ্বা’ ব্যাখ্যা—শব্দব্রহ্ম—চিৎ ও অচিৎ কলা—
পরবিন্দু হইতে নাদবিন্দু ও বর্ণ—ব্যাপ্তি অবস্থায় বাহ্য নাদ, ঘনীভূত অবস্থায় তাহাই
বিন্দু—শক্তির উদয় অথচ নাদের আবির্ভাব হয় নাই—তাহাই নির্মাণ বা অমাকলা—
ঈশ্বরতত্ত্ব বা শিবের তিন অবসর ও জগৎস্থিতি—জগতের লয় বা পর: শিব: অবস্থা
—কামকলার বিচার—জীবদেহে কুণ্ডলিনীরূপ বিন্দু কামকলার দর্শন—শিবের
পঙ্কবক্ত—এবম্কার—ঈশ্বরতত্ত্ব—‘অহম্ ইদম্’—এরূপ রহস্য—পরমেশ্বর হইতে শক্তি,

নাদ ও বিন্দুর উৎপত্তি—নাদবিন্দু বীজের ক্রমবিকাশ, কলার ব্যাখ্যা—ষট্টিবিংশতি-
তমের চিত্র—নাদ ও বিন্দুর বিচার—পরমপদ প্রাপ্তি।

নবম পরিচ্ছেদ (পৃ ৫১১—৫৫২)

কায়সিদ্ধি

কায়সিদ্ধির উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন দেশে উহার আবঙ্গকতা উপলক্ষি—ভারতে
দেহসিদ্ধির বিভিন্ন উপায়—নাথদর্শনে উহার স্থান—বিভিন্ন নাথগ্রন্থে ইহার উল্লেখ—
প্রাণাপানের সংযোগ—মুদ্রা—দেহসিদ্ধির দুইটি ধারা—প্রথম ধারার বৈশিষ্ট্য ও
বিবিধ অবস্থা—দ্বিতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য—কায়সম্পৎ ও মন্ত্রযোগ—বিন্দুস্বৈর্য্য ও
নাদাহুতান—প্রণবতম বা মন্ত্রতম—মহাজ্ঞানরূপ বীজ—শুদ্ধদেহ অবোনিজ দেহ—
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির মিলনে চৈতন্যের প্রবাহ—মনসের উচ্চ গতি—পঞ্চদেহের বৈশিষ্ট্য—
চিত্তরোধ, বায়ুজয় ও ব্রহ্মময়ত্ব—চিন্ময় শরীর—রসের দ্বারা দেহবেদ—রসের রহস্য—
হরগৌরীতম—পাশ্চাত্যে রসসিদ্ধি—রসবিজ্ঞার ভাষা সাক্ষেতিক—বৌদ্ধ রাসায়নিক
নাগার্জুন—গোবিন্দভাগবৎ পাদাচার্য্য, গোড়পাদ প্রভৃতি রসসিদ্ধ—শঙ্করের পরকায়
প্রবেশ সিদ্ধি—রসের প্রয়োগ—তিব্বতে শবাহার প্রথা—রস ও বায়ু—হঠযোগ ও
রসেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রণালী একই সীমাদ্বারা আবদ্ধ—রাজযোগ দ্বারা পূর্ণ প্রজ্জালাভ—
বঙ্গীয় গাথায় কায়সিদ্ধির কথা—মহাজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুজয়—মহাজ্ঞান রহস্য ভেদ—
তিব্বতে উহার সাধন—মায়া ও মন—মহাস্থম মহাভাব দ্বারা পিওসিদ্ধি—কাপালিক
সম্প্রদায়ে পিওসিদ্ধি—সহস্রার ক্ষয়িত সোমরস—বিন্দুস্বৈর্য্য—অমরবারুণী পান—চন্দ্র ও
সূর্য্যের অবস্থান—চন্দ্রামৃত—বিপরীত ভাবনা বা উন্টা সাধনা—বন্ধনাল বা শঙ্খিনী—
দশমী ছয়ার—বঙ্গগীতিকায় দশমীছার কথা—দ্বীপদ্ব ও গোরক্ষবাক্য—চন্দ্রসূর্য্য
বলীকরণ দ্বারা কায়সিদ্ধি—আলি ও কালি, সোম ও অগ্নি—উড়িষ্যায় কায়সাধন কথা
—শ্রুতিতে বিবরণ—মৃতলামার দেহ হইতে নির্গমন প্রক্রিয়া ও নবদেহলাভ—কায়বাহ
সৃষ্টি—তিব্বতী সিদ্ধদের বজ্রদেহে লোকান্তর গমন—নির্মাণচিত্ত—নির্মাণকায়—উহা
পঞ্চকৃতশূন্য—সিদ্ধদেহে ভ্রমণ—সিদ্ধদেহী পূর্বেই মৃত—সিদ্ধদেহী কর্তব্যাহীন—
নাথমার্গে কায়সাধন বা উন্টাসাধন সম্ভববির উন্টাজ্ঞান ও কায়সিদ্ধি—কায়সিদ্ধির
প্রণালী ভেদ—জ্ঞানেশ্বরীতে কায়সিদ্ধি—দেহব্রহ্মাণ্ড ও কালজয়—প্রাণাপান জয়ে
কালবকন—অজরত্ব ও অমরত্ব—সিদ্ধ ও দিব্য দেহ—গোরক্ষ ও আলানপ্রভু—জৈনদের
মধ্যে সিদ্ধদেহ সর্গজ ও আলোকাকাসবাসী।

দশম পরিচ্ছেদ (পৃ: ৫৫৩—৫৫৮)

অধিকার লাভ বা অবদুত বা সিদ্ধযোগীর লক্ষণ

অবদুতের সাঙ্গাৎ অহুতব হইয়াছে বলিয়া যথার্থ অধিকারিরূপে নাথমার্গে
মান্ত—বিন্দুদ্বারণে 'মোক', করণে 'সংসার'—দেহস্থ পঞ্চকোষ ও পঞ্চবিন্দু—সহস্রারে

মহাবিন্দু বা অমৃতকলা—বিন্দুশোধন—উর্দ্ধমুখী বিন্দু বা কুণ্ডলিনীর আগরণে আশ্র-
জ্ঞানের বিকাশ বা অধিকার লাভ—ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম উপায় স্বরূপ—হঠ, মন্ত্র, রাজযোগ
প্রভৃতি দ্বারা সত্যলাভ—কুণ্ডলিনীর আগরণে সত্যে স্থিতিলাভ—নাথমার্গে ইহাকেই
'সহজাবস্থা' বলা হইয়াছে—ইহাই নিষ্কল বা দম্ভবীজের জায় অবস্থা—এইরূপ যোগী
পক্ষে সকল লোকাচার নিষিদ্ধ—ঈশ্বর অকুল, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে বাহ্যচরণ
নিষিদ্ধ—পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক সাধনই লক্ষ্য—অন্তরায় নরকবাস—আচারত্যাগীই
'অবধূত'—তিনি ত্যাগ বা ভোগ দ্বারা অলিপ্ত—মুদ্রা, নাদ প্রভৃতি ধারণের আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যা—অ-ব-ধূ-ত লক্ষণ—প্রারব্ধহীন, নূতনকর্ম্মফলহীন—অবধূত গুরুর কর্তব্য,
তিনি সর্বাবস্থা-বিনির্মুক্ত, পঞ্চমাশ্রমী ও পূর্ণ অধিকারী।

একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃ: ৫৫৯—৫৬৭)

সিদ্ধি ও যোগপথে সিদ্ধির স্থান

সিদ্ধি এক প্রকার বিশেষ শক্তি ও মহাজ্ঞান দ্বারা লভ্য—ঈশ্বর সদামুক্ত হইয়াও
ঐশ্বর্য্যযুক্ত—কেবলী যোগীর পক্ষে সিদ্ধি অন্তরায় স্বরূপ—অষ্টসিদ্ধি—ষট্‌অভিজ্ঞা—দশ-
সিদ্ধি—২৪ ও ৩৬ সিদ্ধি বর্ণন—সিদ্ধিলাভ যোগীর পক্ষে অবশ্যস্বাবী—যোগজ সাধন-
ফলে মধুমতী ভূমিতে পদার্পণ—সাংখ্য ও তন্ত্রে ভেদ—তন্ত্রে শক্তিলাভের উপদেশ—
যোগীর দৈহিক তেজ বৃদ্ধি—বিভিন্ন হঠযোগীর উল্লেখ—নানাবিধ সিদ্ধি প্রদর্শন—
তাহা প্রকৃত সিদ্ধি নহে—শিবনেত্রের উন্মেষ—হুলভাদির আধ্যাত্মিক—তিক্ষতের
সিদ্ধি বৃত্তান্ত—যোগ দ্বারা দূরদর্শন ইত্যাদি অসম্ভব নহে।

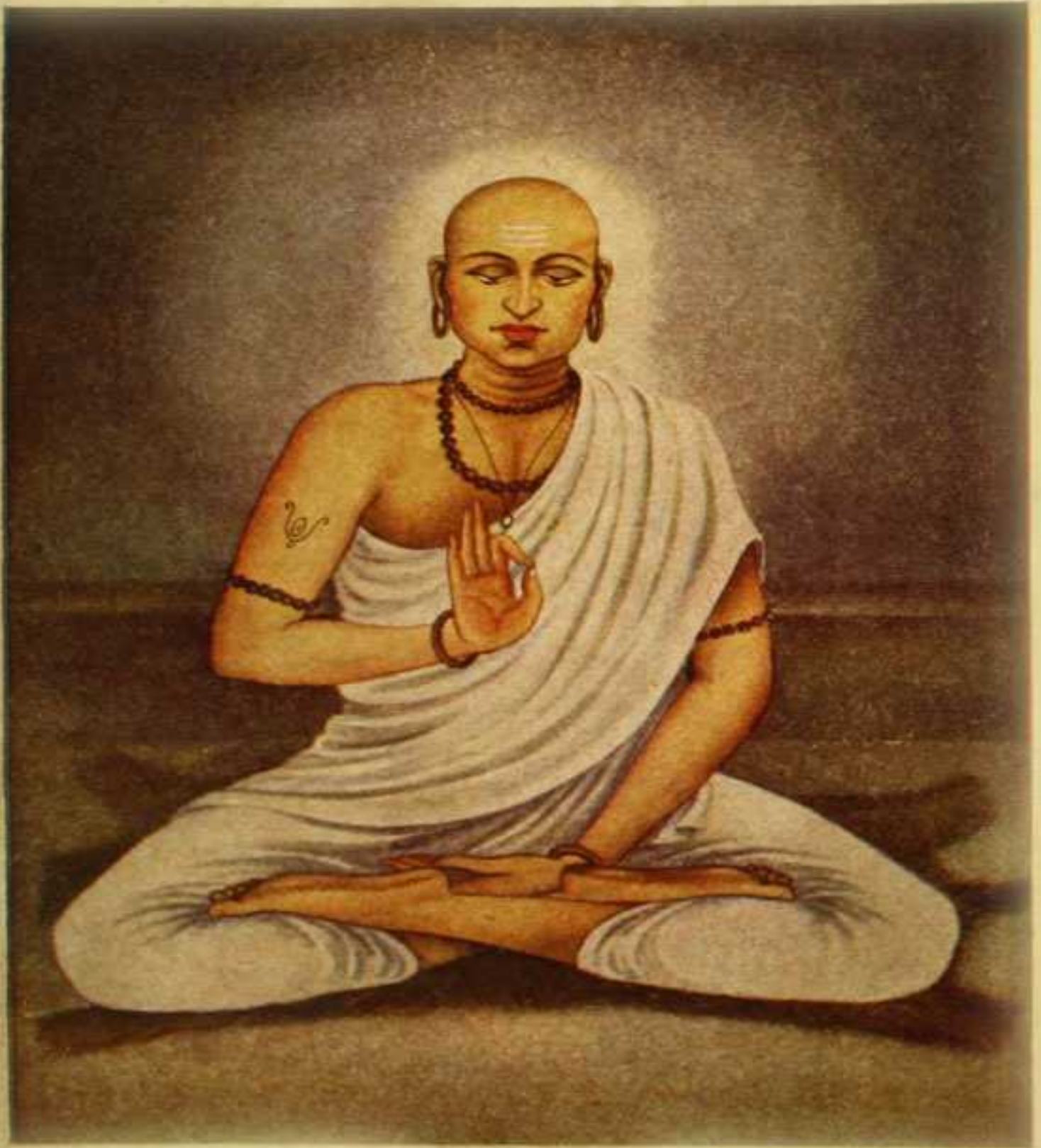
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ বা উপসংহার (পৃ: ৫৬৮—৫৭৭)

পরমপদে পিণ্ডলয়—সমরসীকরণ

নাথপন্থে সামরস্য সাধন বৈশিষ্ট্য—সিদ্ধসম্প্রদায়ে দেহসিদ্ধি—পরমতত্ত্ব তত্ত্বাতীত
—তিনি কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট, নাম ও রূপহীন—শব্দ বা 'নাদ' দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ-
কার হয়—অগম লোকে পৌছাইবার উপায়—যোগী তাঁহার তত্ত্ব অবগত—বাসনা-
ত্যাগে নিগুণ সত্ত্বের ঐক্যভূমিতে অবস্থান—নাথস্বরূপ বর্ণন—নিরুখান দশা ও পূর্ণ
ব্রহ্মে স্থিতিতে ভেদ—যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধনে পরমপদ লাভ—পঙ্ক ও অপঙ্ক
দেহ—যোগদেহ লাভে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার—জীবের আবির্ভাব—জীবের মুক্তি—
কুণ্ডলিনীর আগরণ দ্বারা মুক্তি লভ্য—শিবাভিন্না শক্তি, তাই শিব-সামরস্য চাহিলে
শক্তিসাধনা—বেদান্তে মায়াতে ত্যাগের উপদেশ, তন্ত্রে শক্তিকে লাভের সাধনা—
দ্বৈতমধ্য দিয়া অদ্বৈতে উপনীত হইতে হয়—নাথসিদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈত
বিবর্জিত—ঐকার সাধনে মুক্তি—হঠযোগ সাধন নাথ মধ্যে প্রচলিত—মুক্তি সহ সিদ্ধি
লক্ষ্য—জীবদেহ মুক্তিলাভের অন্তরায় নহে—রসায়নী মুহাবিজ্ঞা—ষট্‌কর্ম্মাদি সাধন—
মীনমার্গে গমনের উপদেশ—বিন্দুজয়ের সাধন—বিন্দুকণ্ঠে কঁক বিনাশ—নাথযোগীর

আদর্শ ও সাধন—অমৃতাস্বাদন ও আত্মজ্যোতির্দর্শন—অজপা সাধন—যোগীর চতুর্বিধ অবস্থা—দেহসংস্কে নাথসিদ্ধেরা মধ্যমার্গী—ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়—বালযোগীর ধর্ম সাধন কর্তব্য—কুণ্ডলিনী জীবের উদ্ধারকর্ত্রী—দর্শন বা কুণ্ডলের মাহাত্ম্য—যোগীর সমরসীকরণ সিদ্ধি—নবদ্বার রুদ্ধ করণ—‘গৌরঙ্গগোষ্ঠী’র বিচার—পরমপদের ব্যাখ্যা—নিজপিণ্ডের জ্ঞান—মুক্তি দ্বিপ্রকার, নাথগণের জীবনমুক্তি আদর্শ—অবদূত আদর্শ যোগী ও গুরু—হঠযোগের অস্ত্রে রাজযোগ—মুক্তির দুইটি মার্গ : বিহঙ্গম ও পিপীলিকা—একজন্মে পরমপদে পিণ্ডলয় বা সমরসীকরণ—কায়সিদ্ধির আবশ্যিকতা—দেহতত্ত্ব ও পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান—প্রাচীন সম্প্রদায় মধ্যে শূন্যতত্ত্বের ধারণা সাধারণ হইয়াও ভিন্নার্থক—যোগের প্রাধান্ত এবং নাথসিদ্ধ মধ্যে জ্ঞান-যুক্ত যোগ বা ‘মহাজ্ঞানের’ প্রাধান্ত—নাথযোগী ঔকার সাধনের স্বার্থ অধিকারী ছিলেন এবং পরমপদের সন্ধান পাইয়া তাহাতে স্থিতিলাভ করেন—নাথসিদ্ধদের ভারতব্যাপী খ্যাতি ।

প্রথম ভাগ
ঐতিহাসিক অংশ



नाथदयाजी

নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার-ইতিহাস

আদিনাথ, মৎস্যেশ্বরনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির নাম ভারতীয় যোগি-সম্প্রদায়ে সুবিদিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীদের নামের শেষে দীক্ষান্তে 'নাথ' পদবী যুক্ত করা হয়, তাই উহারা বর্তমানে 'নাথযোগী সম্প্রদায়' বা 'নাথপন্থী' রূপে সমাজে পরিচিত। কিন্তু 'নাথপন্থ' শব্দটি অতি আধুনিক; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক এই নামকরণ হইয়াছে। অধুনা আমরা নাথপন্থীদের শৈব বা বৌদ্ধ বলিলেও, তাঁহারা 'কৌল' নামেই পরিচিত ছিলেন; নাথ, যোগী প্রভৃতি শব্দ পরবর্তী কালের যোজনা। এই কৌলরা পরম তপস্বী ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাই ইহাদের 'সিদ্ধ'ও বলিত। হঠযোগমার্গে ইহাদের দক্ষতা অবিসংবাদী ছিল। বর্তমানে ইহারা হীনাবস্থা হইলেও এবং যোগমার্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না রাখিলেও, এক সময়ে সমগ্র ভারতে তথা বাঙ্গলার সমাজে ও সাহিত্যে ইহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সংখ্যায়ও তখন তাঁহারা নগণ্য ছিলেন না।

বঙ্গদেশে নাথ-সম্প্রদায় ও নাথ-ধর্মের আলোচনার প্রসঙ্গ উঠিলে প্রথমেই 'নাথ' পদবীধারী বঙ্গীয় যোগি-জাতির কথা মনে হয়। আদিনাথ, মৎস্যেশ্বরনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বংশেই ইহাদের উদ্ভব, এইরূপ বিশ্বাস অনেকেই করেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় 'বঙ্গীয় যোগিজাতি' সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যোগীরা নিজেরাই তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। কোপাবিষ্ট ঈশ্বরের ললাটায় হইতে একাদশ রক্ত ও তদীয় পত্নীর উদ্ভব হয়, তাঁহাদের 'মহান' আদি বহুনাথ্যক পুত্র

হয়, তাঁহারা সকলেই শিবপার্বদ ও যোগধর্মপরায়ণ ছিলেন (ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ, ১ম স্কন্ধ, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়)।

আবার আগমসংহিতা মতে ঈশ্বর হইতে যোগী একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি, এই একাদশ রুদ্রের মধ্যে মহাযোগীই প্রধান। মহাযোগীর পুত্র বিন্দুনাথ, বিন্দুনাথের পুত্র আদিনাথ (আইনাথ), এই আদিনাথই রুদ্রকুলের প্রকাশক। বিন্দুনাথের বংশে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। যোগিগণ ত্রিদত্তী ও যোগপট্টধারী; তাঁহারা গাত্রে ভস্ম লেপন, ললাটে অর্জুচন্দ্র ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা নাথগুরুর উপদেশে পরমগুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন। এই রুদ্রকুলসমুৎত যোগীদের অনাদি (শিব) গোত্র।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের যোগধর্মপরায়ণ ‘মহান্’ ও আগমসংহিতানুযায়ী ‘মহাযোগী’ এক ও অভিন্ন। উভয়েই ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত রুদ্র; কেবল যোগী শব্দ পরে থাকাতে তাহা মহান্ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া আগম-সংহিতার ‘মহাযোগী’ হইয়াছে। মহান্ ও মহাযোগীর বংশধরেরা শিবগোত্রীয়, অতএব উভয় মতে অনৈক্য নাই।

চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সূর্য্যবংশীয় সুধর্ম্মা রাজার কন্যা সূর্য্যবতী তপস্বী দ্বারা মহাদেবের বরে যে পুত্রলাভ করেন তাঁহার নাম যোগনাথ, স্বয়ং মহাদেব তাঁহাকে গায়ত্রী মন্ত্র, আগমাদি শিক্ষা দেন। যোগনাথ মহাদেবের আদেশে বিবাহ করিলে তদীয় পত্নী সুরতীর গর্ভে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি ষোড়শ পুত্রের জন্ম হয়। যোগনাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা সকলেই যোগী আখ্যা লাভ করেন। আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতনাথ, কপিলনাথ, নানকনাথ গৃহবাসী হইলেন, অন্তেরা দিগ্দিগন্তুর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।^১

ইহারা শিব বা নাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেই নামের শেষে ‘নাথ’ ব্যবহার করেন ও ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত বলিয়া ইহাদের জননে ও মরণে দশরাত্রি অশৌচ পালনীয় (বুদ্ধশাতাতপ সংহিতা, ৯ম অধ্যায়)। মহাবিরাটতন্ত্রে শিব পার্বতীকে বলিতেছেন, “আমা হইতে যোগিবংশের

১। সমাজ—অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ‘বঙ্গীয় যোগিজাতি’ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে পুরাণ ও সংহিতার বিষয়গুলি গৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধের লেখক কীদুস্ত বাখাণ্ডোবিন্দ নাথ মহাশয়।

উৎপত্তি, এই জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ।” পরাশরপদ্ধতি মতে ব্রাহ্মণকণ্ঠার গর্ভে অবধূতের ঔরসে নাথজাতির উদ্ভব হইয়াছে।

গোরক্ষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

“বর্ণযোগী শিবপত্ন্যা: পত্নতি তস্যবত্ ।
দাসদাসীতি মা বাচ্যং নাথদেব্যাতি মাং বদেত্ ।
পত্নতি সম্বোধনম্ভৈব শিবগোত্রী উচ্যতে ।
উক্ত গোত্রেণ গোত্রং স্যাৎ তস্য (যোগিন:) কুলোদ্ভবো দ্বিজ: ।
ত্রিগুণং ধারয়েত্ ”

“যহন্তে প্রবরস্য শিবশম্ভুহরব্রুণ ।
আদিশাখা ভবোদেব সামবেদ ত: সন্মত: ।
দশরাত্রাশীচানি চ ভূম্যাস্য বদনোত্তরে ।
অন্নপিণ্ডং পিতু: স্বর্গং ত্রিষু কন্মসু পাবগা ॥”

অর্থাৎ শিবপত্নী হইতে যোগীবর্ণের উৎপত্তি, ইহারা সিন্ধু, শিবগোত্র, শিব-শম্ভু-হরপ্রবর; ইহাদের পুরুষদের ‘দাস’ না বলিয়া ‘নাথ’ বলিবে, স্ত্রীদের ‘দাসী’ না বলিয়া ‘দেবী’ বলিবে। সামবেদানুসারে ইহাদের ক্রিয়াকর্ম্য হইবে, মৃত্যুর পর উত্তরাশ্রু করিয়া মৃত্তিকাতে সমাধি দিবে। ইহাদের অশৌচ দশদিন। পিতৃলোকের উদ্ধার-কামনায় অন্নপিণ্ড প্রদান করিতে হইবে, এই সকল বৈদিক ক্রিয়ায় ইহাদের অধিকার আছে।^১ ভট্টশালী মহাশয়ও যোগীদের ‘শিবগোত্র’ বলিয়াছেন।^২

যে গোরক্ষনাথের নামে অধুনা নাথসম্প্রদায় ও নাথধর্ম্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই গোরক্ষনাথকে অনেকে বাঙ্গালী মনে করেন। ডাক্তার মোহন সিং গোরক্ষনাথ-সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে গোরক্ষনাথকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও বঙ্গ-আসাম অঞ্চলের কোন কোন যোগিজাতির গোত্রনাম যে ‘গোরক্ষ’ তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।^৩

১। এই গোরক্ষসংহিতা প্রচলিত সংহিতা হইতে ভিন্ন। প্রসন্নকুমার কবিবর্ত্তের সঙ্কলনে এই শ্লোক নাই। সমাজ, পৌষ ১৩১৬, ‘বঙ্গীয় যোগিজাতি’ প্রবন্ধে এই শ্লোকের উল্লেখ আছে।

২। ময়নামতীর গান, ভূমিকা, ভট্টশালী।

৩। হিন্দী বিখ্যকোষ, ১৭ খণ্ড, পৃ ৭৪২, ডাঃ সিংহের ‘গোরক্ষনাথ’ গ্রন্থে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে শাজী মহাশয় বলেন : আমাদের দেশের সব যোগীদের উপাধি 'নাথ'। তাঁহারা বলেন, "আমরা এদেশের রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে"; তাই তাঁহারা এখন পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। 'নাথপন্থ' নামক এক প্রবল ধর্মসম্প্রদায় বহুশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় ও পূর্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে।

গোরক্ষনাথ ঋষ্টের আটশত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। নেপালে সংস্কার আছে যে নাথেরা বৌদ্ধ, কিন্তু গোরক্ষনাথ বৌদ্ধমত ত্যাগ করিয়া শৈবমত গ্রহণ করেন। তাঁহার বৌদ্ধনাম 'রমণবজ্র' বা 'অনঙ্গবজ্র'। নাথেরা যে বাঙ্গলা বা পূর্বভারতের লোক, তাঁহার প্রমাণ মীননাথের খাঁটি বাঙ্গলা পদ ও গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলায় অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা ময়নামতীর গানের নায়ক।/ রাজা মাণিকচন্দ্র ময়নামতীর স্বামী। অত্যাপি রংপুর অঞ্চলে যোগিসম্প্রদায় মাণিকচাঁদের গীত গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা মাণিকচন্দ্রকে রংপুরবাসী ও রাজা ধর্মপালের ভ্রাতা রূপে বর্ণনা করেন। রংপুরের যোগীরা পাশুপত শৈব, তাঁহারা গোরক্ষকে আদিগুরুরূপে মান্য করেন ও নিজদের 'কানকাটা' সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন। রংপুর আর্য্যজাতির গভীর বাহিরে ছিল, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে গীতিকায় বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট।^১

বাঙ্গলাদেশের গীতি-সাহিত্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করে। 'চর্যাপদ ও দোহাকোষ'গুলিতেও গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী 'লুইপাদ ও মংস্ত্রেন্দ্রনাথের ধর্মমত' অধ্যায়ে ইহার বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

শুজন রায় কৃত দিল্লীর ইতিহাসে ৩৪৩ বৎসর ধরিয়া যোগিবংশ ও ১৫৫ বৎসর ধরিয়া চাঁদবংশ রাজত্ব করিবার যে ইতিহাস আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ডাক্তার মোহন সিং বলিয়াছেন, তিলকচন্দ্রের বংশের গোবিন্দচন্দ্র, গোরক্ষ বা জালন্ধরের শিষ্য ছিলেন; এই গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গীয় গীতিকাব্যের গোপীচাঁদ কি না তাহা চিস্তনীয়।^২ কিন্তু ডাক্তার মোহন সিং যোগিবংশ বা চাঁদবংশের রাজত্বকালের উল্লেখ না করায়

১। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২, 'নাথপন্থ'—শাজী মহাশয়ের অভিভাষণ।

২। গোরক্ষনাথ—মোহন সিং, পৃ. ১৮।

ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অবশ্য কেহ কেহ গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতীকে মালবরাজ ভর্তৃহরির ভগিনী ও বঙ্গীয় রাজা মানিকচাঁদের পত্নী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলা দেশে তথা সমগ্র ভারতে একসময়ে যে প্রবল ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্তিত হয়, তাহার ফলে ভারতের প্রায় সর্বত্র গোরক্ষপন্থী মঠ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয় ও গোরক্ষনাথ কর্তৃক পুনঃপ্রচারিত নামধর্ম্ম ‘নাথপন্থ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নাথপন্থী প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্বগৌরব অধুনা ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাহাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অত্য়পি বহু পরিমাণে বিজ্ঞমান আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব গোরক্ষনাথকেই কানফাটা যোগিসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আদিনাথ এই পন্থের আদিম বক্তা হইলেও মৎস্তোজ ও গোরক্ষ কর্তৃক উত্তরকালে এই সম্প্রদায়ের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।^১ ‘গোরক্ষপন্থী’ ও ‘কানফাটা’ উভয় যোগীরাই শৈব, গোরক্ষপন্থী মতে গোরক্ষই নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; কানফাটাদের মতে গোরক্ষ ঐ সম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করেন কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠাতা নহেন। গোরক্ষপন্থী ও কানফাটাদের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।^২

নাথপন্থীরা ‘কানফাটা যোগী’ নামে কিম্বা কেবল ‘যোগী’ নামেও পরিচিত। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা একমাত্র বঙ্গদেশেই সাড়ে চারি লক্ষের কম নহে। ইহার দুইভাগ পূর্ববঙ্গের, একভাগ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ ও ঢাকায় অনেক যোগীর বাস। সকল যোগীরই সাধারণ উপাধি ‘নাথ’। বঙ্গদেশের যোগীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী আছে—যোগী, জাতযোগী ও সন্ন্যাসীযোগী। ইহারা উপস্থিত অস্পৃশ্য ও সমাজচ্যুত হইলেও, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বাতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুর অন্নগ্রহণ করে না ও নিজেদের হিন্দু বলে। দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হইলেও যোগীদের মধ্যে ৩,০০০এর অধিক গ্রাজুয়েট আছে। বঙ্গীয় যোগীরা অনেকেই তত্ত্ববায়ের কার্য্য করিত, তাহারা বস্ত্র ও সূত্রে ভাতের মণ্ড ব্যবহার করায় জাতিচ্যুত হয়; অন্য তাঁতিরা খইয়ের মণ্ড ব্যবহার করিত। জাতযোগীরা

১। E. R. E. Kanphatas—Grierson.

২। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভবন, যোগিজ্ঞান, পৃ ৭৫০।

ভবঘুরে ও সাপুড়ে। সম্রাসী যোগীরা 'গোরক্ষপন্থী' ও 'শৈব'।^১ গোরক্ষপন্থী ও কানফাটাদের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী হইতে জানা যায় যে আশ্রা ও অযোধ্যায় অওধর ও নাথযোগীরা শতকরা ৪৫ জন, তন্মধ্যে যোগীর ও যোগিনীর সংখ্যা প্রায় তুল্য। যোগীরা ব্রহ্মচারী এবং যোগিনীদের মধ্যে অনেকে বিধবা ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে ৪৫,৪৬৩ নাথযোগী ছিলেন, ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশে মোট ১৫,০০০ কানফাটা যোগিসংখ্যা নির্ণয় করা হয়, তৎপরে পৃথকভাবে ইহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় নাই। অত্য়াপি ভারতের সর্বত্র ইহাদের গতিবিধি আছে ও ভারতের লক্ষাধিক যোগীর মধ্যে সংখ্যায় ইহারা অন্ত্যাত্ম সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী হইতে নূন হইবেন না।^২

গোরক্ষপুরে নাথপন্থীদের প্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, কিছুদিন পূর্বেও মহাত্মা গান্ধীরনাথ এই মন্দিরের ভার গ্রহণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের অবসান হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ইহার মহাত্মা প্রচার করেন। কাঠিয়া বাবাজী ইহাকে 'নিত্যযুক্ত যোগী' বলিতেন (প্রবর্তক, ভাদ্র সংখ্যা ১৩৫০)।^৩ ইহার জন্মস্থান কাশ্মীরে, গোরক্ষপুরের মোহন্ত গোপালনাথের নিকটে ইনি দীক্ষা লাভ করেন।^৪ তাঁহার সাধন, জ্ঞাননিষ্ঠা ও নৈতিক বল ভারতের তদানীন্তন সর্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। গোরক্ষপুর ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্বত্র নাথপন্থীদের মঠ আছে, তন্মধ্যে কচ্ছপ্রদেশের ধীনোদর মঠ ও পাঞ্জাবের টিলামঠ সমধিক প্রসিদ্ধ।

বঙ্গদেশে দমদমের নিকটে 'গোরখবাসলী' ও হুগলীজেলায় 'ত্রিবেণী'র নিকটে 'মহানন্দ' নামক স্থানে নাথসম্প্রদায়ের মন্দিরাদি আছে। গোরক্ষ-মংস্তোত্র কর্তৃক প্রচারিত যোগপন্থা নাথপন্থীদের সকল মঠে মান্য হয়, এবং মংস্তোত্রনাথ ও গোরক্ষনাথ মহুশ্যদেহধারী গুরুরূপে পূজিত হন।

নাথপন্থীদের বিশ্বাস, অনাদিকাল হইতে নাথধর্ম জগতে প্রচারিত

১। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, অমূল্য বিজ্ঞানভূষণ, বোগিজ্ঞান, পৃ ৭৫৮-৬০।

২। গোরক্ষনাথ—ব্রীপ, পৃ ৪, ৫।

৩। প্রবর্তক, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৫০, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "নাথযোগী সম্প্রদায় ও যোগিবাজ গান্ধীরনাথ"।

৪। কল্যাণ সম্ভবত, পৃ ৭০০, দিগ্বোগিবাজ মহাত্মা বাবা শ্রীগান্ধীরনাথজী।

হইয়াছে। ইহার আদি উদ্ভব স্বয়ং আদিনাথ বা শিব হইতে; কালবশে সাধারণো ইহার প্রচার বিরল হইলে মৎস্তেন্দ্র ও গোরক্ষ ইহার পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অতএব মৎস্তেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের ইতিহাসই নাথধর্মের পুনরুদ্ভব ও প্রচারের ইতিহাসরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস ও জীবনী পাওয়া যায় না, জনমুখে প্রচারিত কিংবদন্তী ও নানাদেশের নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ কাহিনী ও উপাখ্যান ইহাদের জীবনীর ও ধর্মপ্রচার-ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। অত্যাশ্চর্য্য সমসাময়িক ধর্মমতে ইহাদের উল্লেখ বা আলোচনা হইতেও ইহাদের ইতিহাস কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা যাইতে পারে।

গোরক্ষনাথের পরবর্ত্তী কালে ভারতের ধর্মজগতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পন্থের উদ্ভব ও প্রচলন হইলেও, নাথপন্থ বিলুপ্ত না হওয়ায় ইহা অনুমান করা অসম্ভব হইবে না যে, এক সময়ে নাথসম্প্রদায় ভারতের ধর্মজগতের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং উহা প্রবল ও বহুবিস্তীর্ণ ছিল। নাথপন্থীরা এক বিশিষ্ট যোগপন্থী, অত্যাশ্চর্য্য সাধক-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের সাধনায় ঐক্য দেখা যায়। এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে আপেক্ষিক প্রাচীনতা বা অর্দ্ধপ্রাচীনতা সহজে নির্ণেয় না হইলেও, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও পরিণতির ইতিহাস যে অনুসন্ধানযোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ দৃষ্টি লইয়াই নাথমার্গের উদ্ভব, ইতিহাস ও তাহাদের দর্শন ও সাধন বিষয়ে নিবন্ধ রচনায় ব্রতী হইয়াছি।

নাথপন্থীদের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া, তাহাদের পূর্ব ইতিহাস যতদূর সম্ভব সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল নাথদর্শন আলোচিত হইবে, তাহা প্রাক্তন নাথ, সিদ্ধ বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দর্শন, তাহাদের গ্রন্থাদি হইতেই ইহার আলোচনা করিব। ‘গোরক্ষ-সংহিতা’ ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত’ আদি পুস্তক গোরক্ষের নামেই প্রচলিত, কিন্তু গোরক্ষনাথের রচনারূপে প্রামাণ্য কি না তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তবে উহারা তাহাদের দর্শন ও সাধন বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নাথ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত পুস্তকগুলি সংস্কৃতে রচিত। এই প্রচলিত পুথি ও পুস্তকাদির উপর নির্ভর করিয়াই নিবন্ধ রচনা করা ব্যতীত গতাস্থর নাই বলিয়া উহাদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি।

বঙ্গীয় রাজা গোপীচাঁদের গীত বা গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান ইত্যাদি পুস্তক মুসলমান আমলের পূর্বে রচিত হয় নাই। কাহিনীগুলি

প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা পুস্তকাকারে রচিত হইবার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে নহে।^১ মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপার অলৌকিক কাহিনী সকল এই গীতিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই চারি সিদ্ধার 'মাহাত্ম্য-পাঁচালী' মীননাথ ও অপরপক্ষে গোবিন্দ-চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বিবৃত হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই মীননাথকেই শৈবযোগী ও সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ বলিয়া মনে করেন। হঠযোগপ্রদীপিকা (১।৫-৯) মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও মীননাথ ভিন্ন।

মধ্যযুগের চিন্তাধারার অনুশীলনার্থে নাথ ও সিদ্ধমার্গের অনুশীলন কর্তব্য। শাস্ত্রী মহাশয় যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বহু নাথ-সিদ্ধের নাম পাওয়া যায়। হঠযোগী, বজ্রযান ও সহজযান, ত্রিপুরা তান্ত্রিক, বীরাচারী, দত্তাত্রেয়, শৈব, সহজিয়া ও নববৈষ্ণবদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে তাঁহাদের সাধনের মধ্যে কিছু কিছু ঐক্য লক্ষিত হইবে। সহজযান বৌদ্ধমতের 'শূন্যবাদ' হইতেই হঠ ও তন্ত্রের শূন্যবাদের উৎপত্তি। ইহাদের সকলের সহিত রসেশ্বর সম্প্রদায়ের সাধন জড়িত। নববৈষ্ণবদের রসবাদও সিদ্ধদের নামের সহিত জড়িত রহস্যময় বিজ্ঞানেরই উৎকর্ষ।^২

নাথ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য—গোরক্ষনাথের শিষ্যসম্প্রদায় নাথ, যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত, সাধারণতঃ ইহারা 'যোগী' নামেই অভিহিত হন। হিমালয়, পাঞ্জাব, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশে এই সম্প্রদায়ের যোগীদের নাম 'নাথ' অর্থাৎ প্রভু ও যোগিনীদের নাম 'নাথী'। পশ্চিমভারতে গোরক্ষের এক বিশিষ্ট শিষ্য ধর্ম্মনাথের নাম অনুযায়ী তত্রত্য যোগীরা 'ধর্ম্মনাথী' নামে অভিহিত হয়। দশনামী সন্ন্যাসীরা যেক্রপ গিরি, পুরী ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করেন, গোরক্ষনাথীরাও সেক্রপ 'নাথ' উপাধি ব্যবহার করেন। কিন্তু রাজপুতানা অঞ্চলে 'কণ্ঠদ' উপাধি প্রচলিত।^৩

অপরূপর যোগিসম্প্রদায় হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার

১। গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল; মীনচেনন পুথির লিপিকাল ১২২৪ সাল।—বা. সা. ইতিহাস—ব্রজমোহন সেন, পৃ ২৬২।

২। S. B. S., Vol. VI, p. 19. Some Aspects of the History and Doctrine of the Nathas by Gopinath Kaviraj.

৩। গোরক্ষনাথ—দ্বীপ স., পৃ ২৬, ৩০।

জন্ম নাথেরা কর্ণে ছিদ্ৰ করিয়া একপ্রকার কুণ্ডল ধারণ করেন, তাহার নাম 'দর্শন'। এই নিমিত্ত নাথদের অপর নাম 'দর্শনী'।

দর্শন বা কুণ্ডল বৃহদাকার, কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া উহা ধারণ করা বিধি; অতএব এই সম্প্রদায়ের আর এক নাম কানফাটা যোগী—সম্ভবতঃ মুসলমানেরা অবজ্ঞাভরে তাঁহাদের এই নাম দেন।^১ কুণ্ডল অপহৃত হইলে যোগীর পক্ষে সমাজে মুখপ্রদর্শন নিষিদ্ধ; এমন কি তাহাকে জীবন্ত সমাধি দিবার রীতিও প্রচলিত আছে।

নাথযোগীরা দীক্ষার সময়ে এই কুণ্ডল ধারণ করেন। মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক নাথ-সম্প্রদায় মধ্যে কুণ্ডল-ধারণ রীতি প্রবর্তিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কুণ্ডলের 'দর্শন' নামটি শ্রদ্ধামূলক। উহার অর্থ সাধকের পরমাত্মা দর্শন হইয়াছে, অতএব তিনি দর্শন ধারণের অধিকারী বা 'দর্শনী'। কুণ্ডলকে অতি পবিত্র জ্ঞানে 'পবিত্রী' আখ্যাও দেওয়া হয়। নাথ-পন্থীরা শৈব, শিবও কুণ্ডলধারী, তাই উক্ত কুণ্ডলকে ইহারা শৈব-কুণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করেন। কর্ণবেধ দ্বারা যে নাড়ী ভেদ হয় তাহার দ্বারা যোগজ সিদ্ধি লাভ হয় ও যোগী অমরত্ব লাভ করেন এই মতও প্রসিদ্ধ।

গুরু গোবিন্দ সিং-এর শিষ্য-সম্প্রদায় ও দর্শনামী সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম-গিরির গুদড় সম্প্রদায়ও কুণ্ডল ধারণ করেন। প্রবাদ আছে, গোরক্ষনাথ ব্রহ্মগিরিকে তাঁহার কুণ্ডল বা দর্শন দান করেন।^২ সেই অবধি ইহারা এক কর্ণে কুণ্ডল, অন্য কর্ণে গোরক্ষ-পদচিহ্নযুক্ত তাম্র-তন্ত্র ধারণ করেন।

পাঞ্জাবে যোগী নাম মুসলমানদিগের মধ্যেও প্রচলিত, তাঁহাদের উপাধি 'রাওল', উহার অর্থ 'নাথ' শব্দের অনুরূপ।

হিন্দু যোগীদের মধ্যে বঙ্গের যশোহর ও উৎকল প্রভৃতি দেশে বৈষ্ণবযোগী দেখা যায়। বগুড়ার বৌদ্ধযোগীরা কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত।^৩

অণ্ডঘর যোগীরাও কানফাটাদের স্থায় শৈব, কিন্তু ইহারা কর্ণে মুদ্রা ধারণ করে না।

১। I. A., Vol VII, p. 299—Ref. in Briggs, Gorakhnath, p. 1.

২। ভা. উ. স.—শৈব সম্প্রদায়, পৃ ২৫; ত্রীগ.স., পৃ ১১।

৩। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৭—বগুড়ার বৌদ্ধ যোগী, হরগোপাল দাস কুহু।

কানফাটা ও অওঘর যোগী ভিন্ন অন্য বহুপ্রকার শৈবযোগী আছে, তাহারাও নাথযোগীদের সহিত সংশ্লিষ্ট। মচ্ছেন্দ্রীযোগীরা গোরক্ষের গুরু মৎস্যেশ্বরনাথকে গুরু বলিয়া থাকে। ভর্তৃহরির শিষ্যদলও শৈব, ও ভর্তৃহরীযোগী নামে পরিচিত। শারঙ্গ লইয়া যে যোগীরা শিব ও শক্তি বিষয়ক গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, তাহাদের নাম 'শারঙ্গীহার', কার্পাস ও পটশূত্রের বস্ত্র বিক্রেতা যোগীদের নাম 'ডুরীহার'। তুবড়ী বাজাইয়া অহিতুওকবৃত্তি অবলম্বনে যাহারা জীবিকার্জন করে, তাহাদের নাম 'কাণিপা যোগী', ইহারাও গোরক্ষনাথকে আদিগুরু রূপে স্বীকার করে ও কর্ণযুগলে পিতল বা রৌপ্যাদি নির্মিত কুণ্ডল বা দর্শন ধারণ করে; কিন্তু ইহাদের কর্ণের ছিদ্র কানফাটাদের ন্যায় বৃহৎ নহে। কানফাটাদের ন্যায় ইহারাও গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও গলদেশে ঔর্ণশূত্র ধারণ করে, কিন্তু শিংনাদ (ইহার বিবরণ 'ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল' পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) ধারণ রীতি ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা পশ্চিমোত্তর দেশীয় যাযাবর জাতি বিশেষ এবং সাধারণতঃ গোরক্ষপুর হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নানাদেশে জীবিকার্জনের জন্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

অঘোরপন্থী যোগীরাও কুণ্ডলধারী, তাহারা অস্থিমালা ও রুদ্রাক্ষ-মালাসহ কানফাটাদের ন্যায় হিংলাজ তীর্থের 'ঠুমরা'র মালাও ধারণ করে, ইহারা নিজেদের 'স্বর্ভঙ্গী' বলিয়াও পরিচয় দেয়।

কাণিপা যোগীদের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 'ভোপা', 'চন্দ্রভাট' প্রভৃতি শৈবপন্থী যাযাবর শ্রেণীর যোগীদেরও দেখা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান

নেপাল হইতে রাজপুতানা, পাঞ্জাব হইতে বাদ্গলা, সিন্ধু হইতে দাক্ষিণাত্য—ভারতের সর্বত্রই গোরক্ষনাথের অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একদা সমগ্র ভারতে নাথসম্প্রদায়ের যে প্রাধান্য ছিল, অত্য়াপি প্রচারিত গীতিকায়, নাটকে, গ্রন্থে, তিস্বতীয় চিত্রে তাহার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান। নাথগুরুরাও সিদ্ধরূপে পূজিত হইয়াছেন ও ৮৪ সিদ্ধের বর্ণনা ও তালিকামধ্যে স্থান পাইয়াছেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষনাথের আবির্ভাবের কথা, কবীরাদির সহিত তর্কের কথা ও শেষনাগরূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার প্রবাদও আছে। এক্ষণে কোন্ দেশে কোন্ সাহিত্য, কাহিনী বা কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে গোরক্ষনাথ ও তাঁহার প্রচারিত যোগধর্ম বিষয়ে কি তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাহা আলোচিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীতে গোরক্ষনাথকে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী বলা হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পতনকাহিনী বঙ্গদেশেও প্রচলিত ছিল। শিষ্য গোরক্ষই গুরুর উদ্ধার সাধন করেন। মৎস্যেন্দ্র নাথমার্গের গুরু ছিলেন ও তিনি গোরক্ষকে বজ্রযান বৌদ্ধমত হইতে শৈবধর্মে দীক্ষাদান করেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে।^১

বঙ্গদেশের প্রচলিত কাহিনী—বঙ্গভাষায় রচিত গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন, ময়নামতীর পুথি, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গাথা, শূন্যপুরাণ ইত্যাদিতে শিব হইতে মীননাথ, হাড়িপা, গোরক্ষ, কান্ধুপা প্রভৃতি সিদ্ধগণের উৎপত্তি কাহিনী বর্ণিত আছে। শিবকে গোঁরীদান কালে গোরক্ষ মীনের ভৃত্য ও কান্ধুপা হাড়িপার ভৃত্য হন।

“তবে যদি পৃথিবীতে যাইল হরগৌরী
মীননাথ হাড়িফাএ করন্ত চাকরি।

মীননাথের চাকরি করে জতি গোরখাই।

হাড়িকার সেবা করে কানফা জোগাই ॥”^১

একদা শিব গৌরীকে সমুদ্রতীরে গৃহাতব ব্যাখ্যাকালে মীননাথ মৎস্যরূপে তাহা শ্রবণ করিলে শিব কর্তৃক অভিসম্পাত প্রাপ্ত হন যে তিনি শ্রুত-বিদ্যা ভুলিয়া যাইবেন। তৎপরে শিব গৌরীর সাহায্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপার চরিত্র পরীক্ষা করিলে একমাত্র গোরক্ষই তাহাতে উত্তীর্ণ হন। মীননাথ দেবীর আদেশে কদলীরাজ্যে গমন করিয়া ষোড়শ শত রমণীসহ মায়ামুগ্ধভাবে দিন অতিবাহিত করিতে থাকিলেন। দেবীর অভিসম্পাত-ফলে ইনি তপস্বী হইয়াও পাশবদ্ধ হন ও পরে তংশিয়া গোরক্ষনাথ কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। গোরক্ষনাথ নর্ত্তকী-রূপ ধারণ করিয়া (মতান্তরে কৃষ্ণ ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া) অশ্বের অগোচরে মৎস্যেশ্বরের আত্মস্থিতি পুনরুজ্জীবিত করেন। এই উদ্ধার-কাহিনী ‘মীনচেতন’ ও ‘গোরক্ষবিজয়ে’ বর্ণিত হইয়াছে। দেবীর আদেশে হাড়িপা ময়নামতী রাণীর দেশে যান ও পরে তাঁহার পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হন। এই সকল গীতিকাব্যে মীননাথকে অনেকস্থলে কথা ভাষার রূপে ‘মোচন্দর’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্যেশ্বর বোয়াল মৎস্যরূপে যোগতত্ত্ব শ্রবণ করেন।

“মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর

টান্দির লামাতে রহে বোয়াল সুন্দর।”

—গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩ ॥

এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে যে বিষ্ণুই মৎস্যোদরে প্রবেশ করিয়া হর-পার্কর্তীর যোগতত্ত্ব শ্রবণ করেন ও পরে বালকরূপে দেখা দেন। (কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃ ৭৮৩)। স্বন্দপুরাণ ও বৃহন্নারদপুরাণে বর্ণিত আছে যে এক দম্পতী অন্ততলগ্নে জাত পুত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে কোন মৎস্য তাহাকে উদরসাৎ করে। শিবপার্কর্তী-সংবাদ শুনিয়া সেই বালক ‘আদেশ’ ‘আদেশ’ বলিয়া চীৎকার করে, তৎকালে শিব তাহাকে উদ্ধার করিয়া ‘মৎস্যেশ্বরনাথ’ নাম রাখেন। শঙ্কর ভগবান ইহাকে যোগশিক্ষা দিয়া তাহা সংসারে প্রচারের আদেশ দেন (কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃ ৭৮৩, শ্রীমৎস্যেশ্বরনাথ)।

হাড়িকা চলিয়া গেল মনামতি পুরী ।

তথা গিয়া রহিল হাড়িরূপ ধরি ॥

... ..

মীননাথ চলি গেল কদলির দেশ ।

কদলিত দেখে জুবতি ধ্রুব প্রজা ।

দ্বীরাজ্য হএ সে জে দ্বী হএ রাজা ॥’

ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে ১,৬০০ যোগী ময়নামতী কর্তৃক আহৃত হন, তন্মধ্যে বিজ্ঞাধর গোরক্ষনাথ পুষ্পরথে আগমন করেন ।

শুকুর মহম্মদ রচিত ‘গোপীচাঁদের সন্ন্যাস’ রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল ; উহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে । ভবানীদাস রচিত ‘ময়নামতীর গান’ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠ দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন ।

গ্রীয়ারসন রংপুরের জনৈক যোগীর নিকট প্রাপ্ত ‘ময়নামতীর গীত’ প্রকাশ করেন । বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ময়নামতীর গানে মাণিক্যচন্দ্রের রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা বর্ণিত আছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সংগ্রহ ‘গোপীচাঁদের গান’ নামে মুদ্রিত হইয়াছে ।

ভবানীদাসকৃত রংপুর গীতিতে ময়না মাণিকচাঁদের প্রধানা দ্বী । স্বামীকে তিনি যোগদীক্ষা দেন ও তাঁহার পুত্র হাড়িপার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে । ময়নার বাল্যজীবনের কথাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ; অন্যান্য লেখকেরা গোপীচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী রচনা করিয়াছেন ।

ভট্টশালী মহাশয় প্রকাশিত ‘মীনচেতন’ (ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ‘গোরক্ষবিজয়’ একই গ্রন্থ বলিলে ভুল হয় না । একটী পুথিতে ‘ইতি মীননাথ চেতন গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত’ থাকায় উভয় নামই তুল্যরূপে উপযোগী ।

গোরক্ষবিজয়ের ভণিতায় কবীন্দ্রদাস, ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিতা পাওয়া যায় । তন্মধ্যে ফয়জুল্লার ভণিতাই সমধিক এবং প্রাচীনতম হস্তলিখিত পুথিতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃষ্ট হন । দ্বাদশ শতাব্দীতে যাহা বঙ্গীয় গ্রামা সাহিত্যের এককোণে

পড়িয়াছিল, কয়জুলা প্রভৃতি লেখকগণ হয়ত তাহা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীতে কুড়াইয়া লইয়া কাব্যে পরিণত করেন।^১

গোপীচন্দ্রের প্রচলিত কাহিনীর মূল বঙ্গদেশে; বঙ্গদেশ হইতেই সমগ্র ভারতে এই করুণ কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। রাজপুত্র হইয়াও মাতা কর্তৃক গৃহত্যাগে বাধ্য হওয়ায় তাহার কাহিনী বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ কাহিনীর স্থায়ী জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাহিনীটির মূল চট্টগ্রামে বা ত্রিপুরায়, এইরূপ মতবাদও প্রচলিত আছে।

কাহিনীগুলির মধ্যে গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। ষট্চক্রাদি ও শূন্যসাধন, বিন্দু ও নাদের কথা, অজ্ঞাপাসাধন, প্রভৃতি ছক্কা যোগমার্গ ও সাধনের কথা আছে। গোরক্ষ যখন গুরুর আশ্রয়ে চৈতন্য করাইতেছেন তখন সঙ্কেতে বলিতেছেন—

ইঙ্গলা পিঙ্গলা ছই উজানি বাহিয়া।

আনন্দে সুনহ ধ্বনি চৈতন্য রহিয়া। (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩৮)

প্রচলিত কাহিনী হইতে ময়নামতীকে শৈবতান্ত্রিক যোগিনী ও হাড়িপার সাধন-সঙ্গিনী বলিয়া শ্রীযুক্ত স্কুমার সেন মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বা. সা. ই., পৃ ৯৬৭)।

ময়নামতী যে গোরক্ষের শিষ্যা ছিলেন তাহা গোপীচাঁদের গান হইতে বুঝা যায়।

হেনকালে পূর্ব্বত গোর্থ পশ্চিমেতে জাএ।

বার বছর ধরি গোর্থ শূন্যেতে ভ্রমএ ॥

দেশে দেশে ভ্রমে তবে জতিশা গোর্ক্ষা এ।

সতীকন্য়ার লাগ গোর্খে কবু নহি পাএ ॥ (২য় খণ্ড, পৃ ৩৪২)

বালনাথ, হালিকপাব এবং মালীপাবও গোরক্ষের শিষ্য নামে পরিচিত। বালনাথ সম্ভবতঃ জালন্ধর নাথ। ইনি প্রথমে শূদ্র, পরে বৌদ্ধ ও শেষে নাথ হন। তিব্বতী সাহিত্যে ইহার বৃত্তান্ত আছে। বঙ্গীয় গীতিকায় ইনিই ‘হাড়িপা’। ‘পা’ শব্দটী তিব্বতী, ইহার অর্থ সিদ্ধ। ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, সেই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে গোরক্ষের উর্দ্ধে স্থান দেন। বঙ্গীয় গোপীচাঁদ, ভর্তৃহরি, চর্পট প্রভৃতির সহিত জালন্ধরের নাম সংশ্লিষ্ট। চৌরঙ্গী, ঘোড়াচলি প্রভৃতি মৎস্যেশ্বর-শিষ্যদের

অন্যতম। ইহাদের পদাবলী অজ্ঞাপি একতারা সহযোগে গীত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে।^১

হিন্দী সাহিত্যে মৎস্তেশ্বরের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ উল্লেখ আছে—

अहं मत्स्योदरे क्षिप्तः समुद्रे क्षीरसन्धवे
माता तु पिष्टवाक्येन नायं मम कुलान्वितः ॥
कुलक्षयभयन्तेन जातं स्त्रकुलनाशनम् ।
गण्डान्तयोगजनितो बालो न गृहकर्मक्षत् ॥^২

সংস্কৃত যোগগ্রন্থ ‘গোরক্ষ শতকে’র হিন্দী অনুবাদ ‘গোরক্ষসার’ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কাশীর রামনগরের রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। তাহাতে আছে : যিনি সকল চিন্তাবৃত্তি নিরোধ করিয়াছেন ও ঘটচক্রের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন এবং যিনি আত্মার অবিচল জ্যোতিতে অবস্থান করেন তিনিই ‘মহেন্দর’।^৩

ফলতঃ মীননাথ কাহিনীকে উপকথা জাতীয় বলা যায়, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে বাস্তবতা আছে। গ্রীয়ারসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিচার করিবার জন্য প্রচুর শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও নামের অন্তরালে মূল যে ঐতিহাসিক বীজ ছিল তাহা আত্মগোপন করিয়াছে।

(কৃষ্ণপাদ (গোপীচন্দ্র গীতের ‘কানুপা’) ও ‘মীননাথ’ রচিত বাংলা চর্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। অতএব ইহাদিগকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলা যায়।) গোরক্ষনাথ ও জালন্ধারিপাদ (হাড়িপা) মীননাথের শিষ্যদ্বয় বলিয়া সুপরিচিত। গোরক্ষনাথের কোন বাঙ্গলা পদ পাওয়া যায় নাই। মীননাথের রচনার ভাষা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। হিন্দী পুস্তক ‘যোগিসম্প্রদায়াবিস্কৃতি’তে যোগিসমাজের উৎপত্তি বিবরণ ও তাহা কি কারণে সংঘটিত হয় তাহার নিম্নরূপ বিবরণ আছে :—

দ্বাপরের অন্তে ঋষভরাজার নবপুত্র নবনারায়ণের জন্ম হয়। নারদের পরামর্শে ইহারা যোগমার্গের উদ্ধার ও ত্রিতাপ-সম্ভাপিত লোকোদ্ধার নিমিত্ত কৈলাসে মহাদেবের সকাশে গমন করেন। মহাদেবের

১। B. B. S., Vol. VI, p. 19 ff.

২। গোরক্ষ বিকাশ—পৃ ৩৯, স্বপ্নপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।

৩। মীননাথ—শ্রীভূষণ দাসগুপ্ত—ঐতাবলী, আশ্বিন ১৩৪২, পৃ ৬২।

কৃপায় ‘গোরক্ষনাথ’ নামে এক ব্যক্তি প্রকটিত হন; তিনি মুমুক্শুজনের রক্ষাকর্তা ও জীবকে সন্মার্গে নীত করিবার উদ্দেশ্যে ধরায় প্রেরিত হন। নবনারায়ণের অন্ততম কবিনারায়ণ ‘মংশ্বেন্দ্রনাথ’ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অত্বেরা (যথা করভাজন নারায়ণ, অন্তরিক্ষ নারায়ণ) যথাক্রমে গহনিনাথ, জ্বালেন্দ্রনাথ, কাণিপানাথ, চর্পটনাথ, রেবননাথ, নাগনাথ, ভর্তৃনাথ, গোপীচন্দ্রনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। মংশ্বেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ বাতীত এই অষ্ট-নাথ লইয়া দশজন নাথ। মংশ্বেন্দ্র ও জ্বালেন্দ্র মহাদেবের নিকট দীক্ষালাভ করেন। গোরক্ষ ও রেবননাথ মংশ্বেন্দ্রের নিকট; গহনী, নাগনাথ ও ভর্তৃনাথ গোরক্ষের নিকট; চর্পট মংশ্বেন্দ্রের নিকট; গোপীচন্দ্র ও কাণিপা জ্বালেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও মহাদেব করিলেন।^১

গুরু মংশ্বেন্দ্রের সহিত গোরক্ষনাথের বঙ্গদেশে মিলিত হইবার বৃত্তান্তও উক্ত পুস্তকের পৃ ৭৫-৭৮এ বর্ণিত হইয়াছে। উভয়েই ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশের কনকগিরি নামক গ্রামে মিলিত হন।

সিদ্ধদিগের জন্মবৃত্তান্তের নিম্নরূপ বর্ণনাও বঙ্গসাহিত্যে আছে : অনাত্তের শরীর হইতে শিব যোগিরূপ ধরিয়া জন্মিলেন, নাভিতে জন্মিলেন মীনগুরু ধনন্তরী, হাড়িকার জন্ম হইল হাড় হইতে, কর্ণ হইতে কানকা যোগী, গাভুর সিদ্ধাই অতি খরতর হইলেন, জটা ভেদ করিয়া গোর্থনাথ বাহির হইলেন ও অবশেষে জগৎমাতা গৌরী জন্ম গ্রহণ করিলেন। গাভুর সিদ্ধাই নামান্তরে ‘চৌরঙ্গীনাথ’, মংশ্বেন্দ্রের শিষ্যদ্বয় চৌরঙ্গীনাথ ও গোরক্ষনাথ।^২ পূর্বে হাড়িকা, দক্ষিণে কানকা, পশ্চিমে গোর্থ ও উত্তরে মিনাই গমন করিলেন (গোরক্ষ বিজয়, পৃ ১৫)। [তুলনীয় গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, পৃ ৩১৪, “পশ্চিম কুলের যুগী গোরক্ষনাথের চেলা”।]

উত্তর-ভারতে বর্ণিত কাহিনী

নেপালে আবিষ্কৃত ‘কৌলজ্ঞাননির্ণয়’ পুথি বহু প্রাচীন গ্রন্থ, অতএব উহাতে বর্ণিত মংশ্বেন্দ্র কাহিনীর প্রাচীনতা অবিসংবাদী। কৌলজ্ঞান-

১। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি—চন্দ্রনাথ যোগী, পৃ ১২-১৪।

২। ডাঃ শহীদুল্লাহ দ্বিতীয় পাঠ গোরক্ষবিজয়, পৃ ৬, ৭—উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৪২৭

নির্ণয়ের ঘোড়শ পটলে শিব সিদ্ধরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার কাহিনী পার্শ্বতীকে বলিতেছেন, “অহং সো ধীবরো দেবী, অহং বীরেশ্বরঃ প্রিয়ে।”—(১২ শ্লোক)। ঘোড়শ পটলে পুনর্ব্বার—

অহং সো ধীবরো দেবি কৈবর্ত্ত্বং ময়া কৃতঃ ।

আকৃত্য তু তদা মতস্য যক্তিজালসমীকৃতঃ ॥২৫॥

মতস্যোদরন্তু ততক্ষোদ্য গৃহীতস্ত্র কুলাগম ।

বদন্তি বিদিতা লোকে পশবো জ্ঞানবর্জিতাঃ ॥২৬॥

ব্রাহ্মণোঽসি মহাপুণ্ড্র্যে কৈবর্ত্ত্বং ময়া কৃতঃ ।

মত্স্যাভিঘাতিনৈবিদ্রা মত্স্যধ্মমিতি বিশ্বিতাঃ ॥

কৈবর্ত্ত্বং কৃতং যস্মাত্ কৈবর্ত্তী বিপ্রনাথকঃ ॥২৭॥

শিব চন্দ্ররূপে গূঢ়তয় জ্ঞানলাভ করিয়া স্বয়ং তাহা কামরূপে ‘কৌলাগম’ নামে প্রচার করেন। চন্দ্ররূপে বাসকালে কার্ত্তিকেয় তাঁহার শিষ্যরূপে (মতান্তরে মূষিকরূপে) আগমন করিয়া অজ্ঞানবশতঃ শাস্ত্রটী অপহরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে এক মৎস্য তাহা উদরসাৎ করে, শিব মৎস্যেশ্বর রূপে তাহাকে ধৃত করিয়া শাস্ত্র উদ্ধার করেন। কার্ত্তিকেয় তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার শাস্ত্র হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে শিব বৃহৎ মৎস্যকে ধরিতে অপারগ হইলেন, তখন শিব জাতিত্যাগ করিয়া কৈবর্ত্ত হইলেন ও মৎস্যকে ধরিয়া কুলাগম উদ্ধার করিলেন। সেই হইতে জাতিভ্রষ্ট ভৈরবের নাম ‘মচ্ছর’ বা ‘মৎস্য-হত্যাকারী’ হইল। কামরূপে মৎস্যেশ্বর এই কৌলশাস্ত্র প্রচার করেন।

মৎস্যেশ্বর অর্থে যে মৎস্য ধরে বা যে পাশমোচন করিতে সমর্থ। কাশ্মীরী শৈবমতে মৎস্য অর্থে ‘পাশ’ বা ইন্দ্রিয়। অভিনব গুপ্ত ‘রাগারূপম্ জালম্’ বলিতে সম্ভবতঃ মাৎস্য্য বলিতে চাহিয়াছেন। তদ্বালোক, ১ম খণ্ড, পৃ ২৫—১৭ :—

রাগারূপং যন্মিথিলাবকীর্ণম্ যৌ জালমাতান বিতানব্রুতিম্ ।

কলোন্মিতম্ বাস্পপথে চকার স্থান্যে স মচ্ছন্দবিভুঃ প্রসন্নঃ ॥

টীকাকার জয়দ্রথ বলিয়াছেন—“মচ্ছাঃ পাশাঃ সমাখ্যাতাঃ চপলাশ্চিত্ত-বৃত্তয়ঃ। ছেদিতান্ত্র যদা তেন মচ্ছন্দস্তেন কীৰ্ত্তিতঃ”—(বাগচী, পৃ ৬)।

প্রোফেসর টুটী ছর্জয়চন্দ্রের চতুর্পাঠ তন্ত্রের তৃতীয় পটলের টীকা

হইতে মাত্র একটি স্থান হইতে মংস্র অর্থাৎ আধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক এই অর্থ দেখাইয়াছেন, নহিলে মাংসর্ষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা কঠিন। কিন্তু মংস্র শব্দ যে কেবল রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কৌলজ্ঞানে মংস্র অর্থে মাছ ও মংস্রেন্দ্র অর্থে মংস্রধারী গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে ১১শ শতাব্দীতে অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোকে ইহার রূপক ব্যাখ্যা আছে; সম্ভবতঃ তখন মংস্রেন্দ্র প্রচারিত গুপ্ততত্ত্ব সাধারণে প্রচারিত হওয়ায়, তাঁহাকে কৈবর্ত বলিতে দ্বিধা জন্মাইয়াছিল। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে মংস্রেন্দ্রের বিষয়ে যে সকল অলৌকিক কাহিনী আছে তাহাও মংস্রেন্দ্রকে শিবাবতার রূপে গণ্য করার যুগে প্রচারিত বলিয়া মনে হয়।^১

অভিনব গুপ্ত একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক, অতএব মংস্রেন্দ্র তাহার অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন অনুমান করা অশাস্ত্রীয় নহে, অভিনব তাঁহাকে শিবতুল্য বলিয়াছেন।^২

সত্যযুগে ধার্মিক রাজা উদ্যোদরের মৃত্যু হইলে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত তাঁহার নাভিকুণ্ড আহার করিয়া এক মংস্রের যে সম্ভান ভূমিষ্ঠ হয় তাহার নাম ‘মংস্রেন্দ্র নাথ’, পূর্বজন্মে উক্ত রাজা ধার্মিক হওয়ায় এ জন্মে সাধুরূপে জন্মগ্রহণ করেন এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে।^৩

নেপালে প্রাপ্ত নেওয়ারী ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ে একটি নাটক পাওয়া গিয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার কিয়দংশের নকল আনিয়াছেন। পৃথিষ্ঠা ১৬২০-৫৭ খৃঃ লিপিবদ্ধ ও উহা বাঙলা ভাষায় রচিত। উহাতে জালন্ধরি গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন, “তুমি ছুইটা রাণী ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, আর আমি দিল্লী নগরের রাজা ছিলাম, সাতশত রাণী ত্যাগ করিয়াছি”—

জালন্ধরি নৃপতি জালন্ধর দেশ

শ্রীআদিনাথ কহিয় উপদেশ।

১। E. R. E. Grierson's article on Gorakhnath; বাগটী কৌলজ্ঞাননির্ণয় ভূমিকা,—পৃ ৭।

২। বাগটী, পৃ ২৬।

৩। Briggs, p. 233; Ref. Rose, Tribes and Castes of the Punjab Vol II, p. 393.

কোন বঙ্গ-কুমার কর্তৃক বঙ্গেশ্বর গোপীচাঁদের রাজধানী আক্রমণ ও গোপীচাঁদের পরাজয় এবং তৎপরে গোপীচাঁদের যোগীর সন্ধানে বহির্গমন ও জালন্ধর কর্তৃক জন্ম-মৃত্যু রহস্য বিবৃতি, চক্রাদিতে দীক্ষাদান, গোপীচাঁদের রানীদের সেই শোকে আত্মহত্যা প্রভৃতি বৃত্তান্ত এই পুথিতে আছে।^১

নেপালে রচিত নাটকের শেষাংশের সহিত ছল্লভ মল্লিকের গোবিন্দ-চন্দ্রের গীতের শেষাংশের মিল আছে। শিবচন্দ্র শীল ছল্লভ মল্লিকের গীত প্রকাশ করিয়াছেন।

নেপালে প্রচলিত এক কাহিনীর মধ্যে মৎস্যেশ্বরনাথের নিজ স্কুল-দেহরক্ষার ভার গোরক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া সন্তোমৃত এক রাজার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রানীর মায়াপাশে আবদ্ধ হইবার কথা আছে। গোরক্ষনাথই গুরুর স্কুল অচেতন দেহে চেতনা সঞ্চার করিয়া রানীর মায়াপাশ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন।^২ মতান্তরে গিরনার পর্বতে সমাধিস্থ থাকাকালে মৎস্যেশ্বর সিংহলের রানীর মায়াপাশে আবদ্ধ হন। তাঁহার পরশুরাম ও মীনরাম নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। গোরক্ষ তবলার ধ্বনির সাহায্যে গুরুর উদ্ধার সাধন করেন ও ‘আদেশ’ শব্দ দ্বারা গুরু নমস্কার করেন। এই সময়ে মৎস্যেশ্বরের স্কুল দেহরক্ষার ভার দত্তাত্রয়ের উপর ন্যস্ত হয়।^৩

এতদ্বারা মীনরাম মৎস্যেশ্বরের পুত্ররূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন।

• মীনরাম ও মীননাথ কি অভিন্ন?

গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে নেপালীদের ধারণা, তিনি পাঞ্জাব হইতে কাঠমুণ্ডে আসেন ও পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট বাস করিয়া শৈবধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। গোরক্ষনাথকে গো-রক্ষক বা গোরক্ষপুরের রক্ষক বলা হয়, নেপালীদের রক্ষক ছিলেন মৎস্যেশ্বরনাথ। গোরক্ষ শব্দ হইতেই কালক্রমে ‘গুর্খা’ শব্দের উৎপত্তি হয়। তারানাথ বলেন, তিব্বতী মতে গোরক্ষ বৌদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। তাঁহার শিষ্যরাও বৌদ্ধ ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা ঈশ্বরের শিষ্য অর্থাৎ ‘শৈব’ হইলেন। বিজয়ী

১। বা. সা. ই., পৃ. ২৫৫।

২। Briggs, p. 233.

৩। যোগিসম্প্রদায়বিকৃতি, পৃ. ১৬৩, ১৬৭ইং।

মুসলমানদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হইলেন।^১

ডাঃ মোহন সিং-এর মতে বরোদার 'গায়কোয়াড়' উপাধি যে 'গোরক্ষ'র সহিত অভিন্ন এ কথা অধুনা স্বীকৃত হইতেছে।

গোরক্ষপুরে প্রবাদ যে গোরক্ষ পাঞ্জাব হইতে যুক্তপ্রদেশে আসেন ও তাঁহার প্রধান মঠ ঝিলাম প্রদেশের টিলায়।

গোরক্ষপুরে যে গোরক্ষ মন্দির আছে তাহার বিশেষ বিবরণ বুকানন হ্যামিলটন দিয়াছেন।

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় ধর্মই আচরিত হয়। মহাযান বৌদ্ধ-মত প্রবল হইলেও গোরক্ষ কর্তৃক শৈব ধর্ম পরিপুষ্টি লাভ করে। এখনও পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে কানফাটা যোগীরা বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে গোরক্ষকে ভক্তিমার্গের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শৈবধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করিলেও ভক্তমালে মীননাথ ও গোরক্ষনাথ পরম বৈষ্ণবরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

পাঞ্জাবেও গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান আছে। স্যার রিচার্ড কার্ণাক টেম্পল সংগৃহীত উপাখ্যান মধ্যে গোপীচাঁদকে উজ্জয়িনীর রাজা বলা হইয়াছে। ময়নামতীর বিবাহ গোড়বঙ্গে হয়, তিনি ভর্তৃহরির ভগিনী ছিলেন। ময়নামতী তাঁহার পুত্র গোপীচাঁদকে জালন্ধরের শিষ্য গ্রহণ করিতে বলিলে, গোপীচাঁদ জালন্ধরকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তৎপরে গোরক্ষনাথ তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে গোপীচাঁদ ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া জালন্ধরের শিষ্য হইলেন। রাণীদ্বয় ও ভগিনী চম্পার নিকট গোপীচাঁদ বিদায় গ্রহণ করিলে চম্পা তাঁহার শোকে দেহত্যাগ করেন ও জালন্ধর কর্তৃক পুনর্জীবিত হন।

গোরক্ষের বিভূতি বর্ণনা পিঙ্গলা কাহিনীতে আছে। একদা ভর্তৃহরি স্বীয় মৃত্যু বিষয়ে মিথ্যা সংবাদ রাণী পিঙ্গলাকে প্রেরণের ফলে রাণী অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন। তখন শোকাচ্ছন্ন ভর্তৃহরিকে সাস্থ্য দিবার জন্য গোরক্ষ রাণীর জীবনদান করিলে ভর্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্য গ্রহণ করেন। গোরক্ষ কর্তৃক গোপীচাঁদের ভগিনীকে জীবনদান ও মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর ১৮ মাস পরে তাঁহার বরে ময়নামতীর পুত্রলাভ কাহিনীও আছে।

হিন্দী-সাহিত্যে বর্ণিত উপাখ্যান

মালিক মুহম্মদ জায়সী কর্তৃক হিন্দীভাষায় রচিত পঞ্চমাবৎ কাব্যে গোপীচাঁদের যে উপাখ্যান পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর অনুরূপ। তবে গোপীচাঁদ কর্তৃক জালন্ধরির পরীক্ষার কথা ইহাতে নাই। লক্ষণদাস রচিত হিন্দী গাথাতে তিলকচন্দ্র, ময়নামতী ও চম্পার বৃত্তান্তও আছে। পুরুষোত্তম দাসের গোপীচাঁদের লীলাতে গোরক্ষনাথকে গোপীচাঁদের গুরু বলা হইয়াছে। অন্য এক কাহিনী অনুসারে ভর্তৃহরিশ্রী স্বীয় ভাগিনেয়কে গোরক্ষনাথ সমীপে দীক্ষার্থ লইয়া যান।^১

সৃষ্টির প্রারম্ভে বিষ্ণু পদ্ম হইতে উৎথিত হইয়া সমুদ্রের জলরাশি দেখিয়া ভীত হইলে, পাতালপ্রদেশে গোরক্ষের শরণাপন্ন হইলেন। গোরক্ষ ধূনাচি হইতে ভস্ম দান করিলে ও অভয় প্রদান করিলে, বিষ্ণু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন। তদবধি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব গোরক্ষের শিষ্য হইলেন এইরূপ কিংবদন্তী আছে।^২

ভীম যখন হিমালয়ের মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন গোরক্ষ তাঁহার জীবনদান করিয়া তাঁহাকে ভোটানের (মতান্তরে নেপালের) রাজা করিয়া দেন। নেপালী প্রবাদ অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমন কালে মাত্র ভীম জীবিত থাকেন ও গোরক্ষের কৃপায় নেপালের রাজা হন।^৩

পশ্চিম-ভারতের উপাখ্যান

গুজরাটী উপাখ্যানমতে রাণী মেনাবতীর হার এক চোর অপহরণ করিয়া ধৃত হইবার ভয়ে ধ্যানস্থ জালন্ধরির কণ্ঠে উহা পরাইয়া দিলে, রাজভৃত্যেরা তাঁহার উপর নির্যাতন আরম্ভ করে। ধ্যানভঙ্গে যোগী শাপ দিলে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা গৌড়বঙ্গের তিলকচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। মতান্তরে ধ্যানভঙ্গে যোগীর কোপদৃষ্টিতে তিনটি দাইলপূর্ণ পাত্র ভস্ম হইবার কথাও আছে। মিঃ ঝবেরীচাঁদ মেঘানে গোপীচাঁদ বিষয়ে গুজরাটী উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন ও ননীলাল রায়চৌধুরী গোপীচাঁদের জন্ম 'দেব রত্নাকরে'র কৃপায় হয়, জালন্ধরির অভিশাপে রাজা তিলকের মৃত্যু

১। 6th Ort. Con. Pro.—G. Halder's article, pp. 267-69.

২। Briggs, p. 229.

৩। E. R. E.—Gorakhnath.

ঘটে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। কাহিনীর শেষাংশকে বঙ্গীয় কাহিনীর অনুরূপ দেখাইয়াছেন।^১

মহারাষ্ট্র প্রদেশেও চিত্রে ও নাটকে এই করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্মা দেশভ্রমণের পর সন্ন্যাসীবেশে রাণীদের সহিত গোপীচাঁদের সাক্ষাৎ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

মারাঠী উপাখ্যান মতে মৈনাবতী জালন্ধারিনাথকে কাষ্ঠভার বহন করিতে দেখিয়া তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাহার শিষ্য হন। কাহিনীটির কিয়দংশ গুজরাটী কাহিনীর অনুরূপ। যোগীর ধ্যানভঙ্গে তাহার কোপদৃষ্টিতে রাজার তিনটি স্বর্ণ-প্রতিকৃতি ভস্মীভূত হইবার কথা আছে। জালন্ধরনাথের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ—

একদা শিবপার্বতী একটি শিশুকে সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে দেখেন। শিব দয়া করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া দীক্ষা দেন—ইনিই ‘জালন্ধর’ নামে খ্যাত। গোপীচন্দ্র ইহাকেই দ্বাদশবর্ষ কূপে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, তৎপরেও ইহার দেহনাশ না হওয়ায় মুক্ত হইয়া ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভর্তৃহরি, মৈনাবতী, লীলাবতী প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের।^২

উড়িষ্যা-প্রদেশের কাহিনী

উড়িষ্যা ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় ময়ূরভঞ্জ হইতে লিপিবদ্ধ করিয়া আনেন। তাহার কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাহিনীটি বাঙ্গালা কাহিনীর অনুরূপ।

দাক্ষিণাত্যে গোরক্ষনাথের যোগবর্ণনা

দাক্ষিণাত্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে সিদ্ধ আলমপ্রভুর সহিত সিদ্ধ গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহার বিবরণ লিঙ্গধারণচন্দ্রিকায় পাওয়া যায়। উহাতে গোপীচাঁদের বৃত্তান্ত নাই বটে, কিন্তু গোরক্ষনাথের অলৌকিক শক্তির যে পরিচয় আছে তাহার পরিচয় অন্তত (কায়সিকি অধ্যায়ে) দেওয়া যাইতেছে।^৩

১। 6th Ort. Con. Pro. (Patna, 1930)—G. Halder's article, Raja Gopichand.

২। কল্যাণ যোগাত্মী জালন্ধরনাথ।

৩। লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা—সাকার্যে, পৃ ৩৪৭।

কবীরাদির গ্রন্থে গোরক্ষর যোগবর্ণনা

কবীরের বীজকে গোরক্ষনাথের স্পর্শমণি বা অলৌকিক সিদ্ধির কথা আছে। দত্তাত্রেয়ের সহিত তর্ক ও গোরক্ষের অদৃশ্য হইবার কথা দাবিস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতের সর্বজনপ্রিয় কাহিনী

বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে পশ্চিমে বিহারে, তৎপরে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত, গুজরাট, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে গোপীচাঁদ কাহিনী প্রচারিত হইতে থাকে ও রামায়ণ মহাভারতের ন্যায়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। অত্യാপি রংপুরে এই গীত ‘পালা-গান’ রূপে গীত হয়। তাহার মূল গায়ক অধিকাংশ স্থলেই মুসলমান। ধূয়া গাহিবার জন্ত তাহাদের দল থাকে। যোগী গায়কেরা বৈরাগী শ্রেণীর। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে গোপীচাঁদের পুথি পাঠ হয়। উত্তর ভারতে সারঙ্গী সাহায্যে গীত গাওয়া হয়। গুজরাটের বাউলেরা একতারা সাহায্যে গোপীচাঁদের গীত গাহিয়া থাকেন; নারীরাও দেবীর নবরাত্র পূজায় গর্ভা নৃত্যসহ এই গীত গাহিয়া থাকেন।’

বিভিন্ন কাহিনী হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে শ্রীআদিনাথ এই মার্গের উপদেষ্টা এবং মৎস্যেশ্বর ও গোরক্ষ তাঁহার কৃপাতেই নাথধর্ম প্রচার করিতে সমর্থ হন। গোরক্ষের অলৌকিক ক্ষমতায় ভর্তৃহরি, গোপীচাঁদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নাথধর্ম প্রচারের সহায়তা করেন। গোরক্ষের শিষ্যা ময়নামতীর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। নাথগুরুদিগের সহিত যোগ থাকাতেই গোপীচাঁদের গীত একরূপ প্রচার লাভ করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে নাথেরা শৈব ছিলেন ও ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের ক্ষমতার জন্ত সর্বত্র প্রিয় হন। মীননাথের কাহিনী উপকথা জাতীয় হইলেও, গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে কিছু বাস্তবতা আছে, কিন্তু পরস্পর-বিরোধী ঘটনার অন্তরালে ঐতিহাসিকতার বীজ আত্মগোপন করিয়াছে। গোপীচাঁদের রাজত্বকাল, তাঁহার ধর্ম, তাঁহার

রাজহ বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহার সামান্য আলোচনা ঐতিহাসিক তথ্য অধ্যায়ে করা যাইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও অবাস্তব কাহিনী ও অপ্রধান পাত্রপাত্রী লইয়া ভেদ দৃষ্ট হইলেও মূল কাহিনীটিতে ভেদ নাই।

এই সর্বজনপ্রিয় কাহিনী আলোচনায় নিম্নের কয়েকটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্ভূত হয় :—

১। মৎস্যেশ্বরনাথ ও গোরক্ষনাথ কে? তাঁহাদের কাল ও ধর্মমত কি?

২। গোরক্ষ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদিগের সহিত গোপীচাঁদের সম্বন্ধ কি এবং গোপীচাঁদের ঐতিহাসিকতাই বা কতটুকু?

৩। নাথপন্থের মূল কোথায়?

আমরা একে একে উক্ত প্রশ্নগুলি সমাধানের চেষ্টা করিব। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ, কানুপা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইহাদের বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখও করিতেছি। লুইপা ও মীননাথ অভিন্ন হইলে তাঁহার, জালন্ধরিপাদের ও কানুপার বাংলা পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু গোরক্ষনাথের হিন্দী ব্যতীত কোন বাংলা পদ এযাবৎকাল পাওয়া যায় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ কে ? তাঁহাদের প্রাচুর্যাব কাহিনী ও ঐতিহাসিকতা

মৎস্যেন্দ্র কাহিনী :

✓ নেপালে মৎস্যেন্দ্র বিষয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই দ্বিবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে। বৌদ্ধমতে মৎস্যেন্দ্র অবলোকিতেশ্বরের অবতার। একদা গোরক্ষ গুরু দর্শনে আসিয়া নেপালের ছুরারোহ পর্বতশ্রেণী দেখিয়া গুরু সাক্ষাৎকারে ক্ষান্ত হইয়া নবনাগকে আবদ্ধ করিয়া তত্পরি ধ্যানাসনে বসিলেন, তৎফলে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়া নেপালে হুর্ভিক্ষ হইল। ইহার প্রতিকারার্থে নেপালের রাজা স্বীয় গুরুসহ অবলোকিতেশ্বরের পূজা দিয়া গুপ্ত মন্ত্র লাভ করেন এবং কৃষ্ণভ্রমরের রূপে অবলোকিতেশ্বরকে কমণ্ডলু মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বুগাম সহরে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপালে তৎপরে বৃষ্টিপাত হইয়া হুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। প্রবাদ যে এই অবলোকিতেশ্বরই মৎস্যেন্দ্রনাথ। কাহিনীর শেষাংশে গোরক্ষের উল্লেখ নাই। অত্যাপি প্রতিবৎসর বুগাম সহরে মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা হইয়া থাকে। ইহা পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রার স্থায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।^১ একদা নেপালরাজ শ্রীবসন্তদেবজী রাজ্যচ্যুত হন এবং মৎস্যেন্দ্রের আশীর্ব্বাদে উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রতি বৈশাখ মাসে ভোগমতী নদী তীরে তাঁহার উৎসবের ব্যবস্থা করেন।^২

কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথিতে মৎস্যেন্দ্রের নামাস্তর ভূদ্বীপাদ (১৬ পটল, ১৭ শ্লোক)। ইহা দ্বারা নেপাল-রাজ কর্তৃক কৃষ্ণভ্রমরের রূপে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার বুগামে নীত হওয়ার কাহিনী সূচিত হইতেছে। লেভি বলিয়াছেন, বুগাম লোকেশ্বর নেপালে পূর্ব্ব হইতেই পূজিত হইতেন, পরে ইহাকে মৎস্যেন্দ্রাভিন্ন স্থির করা হয়। মৎস্যেন্দ্রকে 'লোহিত অবলোকিতেশ্বর' ও তদীয় ভ্রাতা মীননাথকে 'সান্ন মৎস্যেন্দ্র' রূপে পূজা করা হয়। কেহ কেহ

১। Briggs, pp. 144-145, 231, etc.

লেভি নেপাল, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪৭ ইত্যাদি—বাগটীর কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ভূমিকায় উল্লেখ।

২। কলাণ, যোগাঙ্ক, পৃ ৭৮৩—শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ।

মীননাথকে মৎস্যেশ্বরের পুত্র বলিয়া মনে করেন, আবার কাহারও মতে মৎস্যেশ্বর ও মীননাথ অভিন্ন।^১ এ বিষয় এই নিবন্ধের অন্তর্গত আলোচিত হইতেছে, অতএব পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। যোগীন্দ্র সান্দ্যারামের গুরু-পরম্পরায় মৎস্যেশ্বর ও গোরক্ষনাথের মধ্যে যথাক্রমে নাথ, সরহ, আনন্দ, ভৈরব, গৌরান্দ্র ও মীননাথ এই ছয়টি গুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ফাউন্ডার নেপাল সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুগাম লোকেশ্বরের উল্লেখ থাকিলেও, তাহাকে মৎস্যেশ্বরভিন্ন বুগাম প্রসন্ন উঠে নাই; নেপালের রাজবংশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তালিকাতে (আনুমানিক ১৩শ শতাব্দীর) রাজগুরু বহুদত্ত কর্তৃক বুগাম লোকেশ্বরের রথযাত্রার উদ্বোধন কথা আছে মাত্র, অতএব মৎস্যেশ্বরনাথের সহিত বুগাম লোকেশ্বরের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কালের ঘটনা বলিয়া অনুমান হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী কাল হইতেই নাথগুরুদিগের শ্রেষ্ঠত্ব দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে থাকে, অতএব সেই যুগেই মৎস্যেশ্বরকে অবলোকিতেশ্বর রূপ দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা বিচিত্র নহে।^২

নাথগুরুরা হিন্দু ছিলেন, গোরক্ষনাথ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন ও স্বধর্ম ত্যাগ করায় নেপালী বৌদ্ধরা তাহার উপর অসন্তুষ্ট, কিন্তু মৎস্যেশ্বর কৈবর্ত হইয়াও তাহাদের পূজা পাইয়াছেন। মৎস্যেশ্বরের রচিত ‘কৌলজ্ঞাননির্ণয়’ পুথি নেপালে সম্বন্ধে রক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ মাত্র নাই, ইহা হরপার্বতী সংবাদ আকারে রচিত। অথচ মীননাথের বাংলা পদ একটি বৌদ্ধগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাকে ‘পরদর্শনের মত’ বলা হইয়াছে।^৩

মৎস্যেশ্বরের জন্মস্থান :

কৌলজ্ঞান পুথি মতে মৎস্যেশ্বরের জন্মস্থান চন্দ্রদ্বীপে, ইহা সম্ভবতঃ কামরূপের নিকটবর্তী স্থান। ইহাতে মৎস্যেশ্বরের পতন কাহিনী নাই। মৎস্যেশ্বর সিদ্ধকৌলান্তর্গত যোগিনী কৌল ছিলেন, পুথির ভণিতায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু ‘কামরূপ ইদং শাস্ত্রং যোগীনাং গৃহে গৃহে’ (২২।১০) পুথির এই বর্ণনার সহিত কামরূপে মৎস্যেশ্বরের যোগধর্ম প্রচার কাহিনীর যে প্রবাদ আছে তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়।

১। বাগচী, কৌলজ্ঞাননির্ণয় ভূমিকা, পৃ ৭, ১২, ২৩, ২৪ জট্টবা; হঠযোগপ্রদীপিকা, ১।৫০ জট্টবা।

২। বাগচী ভূমিকা, পৃ ১৩।

৩। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২—‘নাথপন্থ’ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নিত্যাহিকতিলকম্ মতেও মৎস্যেন্দ্রর জন্ম বঙ্গদেশে, যথা—

বরণা বঙ্গদেশে জন্ম জাতি ব্রাহ্মণঃ বিষ্ণুশর্ম্মা নাম । মর্কটনৃপাঃ
যদা কষিতা তদা শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ । অস্তৈব শক্তিঃ শ্রীললিতাভৈরবীঅস্থাপপূ।^১

ইহাতে ষোড়শ গুরুর উল্লেখ আছে, প্রত্যেকের নামের সহিত শক্তির
নাম যুক্ত আছে দেখা যায়। উত্তর ভারতই এই গুরুদের জন্মস্থান।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রগোমীন বৈয়াকরণিক বরেন্দ্র
উত্তর বঙ্গ হইতে নির্বাসিত হইয়া ‘চন্দ্রদ্বীপে’ বাস করেন। এই ‘চন্দ্রদ্বীপ’
বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরের কোন্ অংশটুকু তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।
বাথরগঞ্জ, সুন্দরবন প্রভৃতি ঐ নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গোপকূলদেশ
অর্দ্ধচন্দ্রাকার বলিয়া চন্দ্রদ্বীপ নাম হওয়াও বিচিত্র নহে। চন্দ্রদ্বীপ কি
ক্রমশঃ সন্দ্বীপে পরিণত হইয়াছে? বোগদাদ হইতে দ্বাদশজন আওলিয়া
অর্থাৎ ফকির মৎস্যেন্দ্র আরোহণ করিয়া সন্দ্বীপে আগমন করেন, এইরূপ
একটি বিচিত্র কাহিনী আছে। নোয়াখালীর সন্দ্বীপে অধিকাংশ যোগী-
জাতির বাস, ইহারা নিজেদের মৎস্যেন্দ্র সম্প্রদায়ভুক্ত বলে। সম্ভবতঃ
মৎস্যেন্দ্র সমুদ্রতীরের সন্দ্বীপে শিষ্যাদি গ্রহণ করিয়া তৎপরে কামরূপে
যোগধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন।^২

নারদপুরাণে মৎস্যেন্দ্রের প্রাচুর্য কাহিনী আছে। শক্তিস গম তন্ত্রে
নেপাল রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ, শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথজীর
উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে মৎস্যেন্দ্রের অশুভলগ্নে জন্ম ফলে পিতামাতা
কর্তৃক সমুদ্রে নিক্ষেপ কাহিনী, মৎস্যেন্দ্রের হইতে শিবের যোগব্যাখ্যা শ্রবণ
ও শিব কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তির কাহিনী আছে।^৩

বঙ্গদেশে মৎস্যেন্দ্রের পতনকাহিনী কদলীনগর বা কামরূপের সহিত
জড়িত। ভট্টশালী মহাশয় “স্বাধীনতার দেশ”রূপে এই কামরূপকে
মণিপুর, ব্রহ্মদেশ বলিয়া অনুমান করেন।^৪ ডাক্তার শহীদুল্লাহর মতে
‘কদলীনগর’ সম্ভবতঃ আসামস্থ ‘কচলী’ বা ‘কাছার’।^৫ তিব্বতী
ভাষায় রচিত গ্রন্থ পুগস্বামগোমবজ্ঞানে কদলী ক্লেত্রের উল্লেখ আছে।

১। বাগচী ভূমিকা, পৃ ৩৮।

২। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২২-৩২।

৩। কলাগ, মন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৭২—নাথসম্প্রদায়ে মহাসিদ্ধ। বোগিসম্প্রদায়াবিহুতি, পৃ ১৫।

৪। ময়মামতীর গান (ঢাকা সাহিত্য পরিষদ), পৃ ১২২, টীকা।

৫। Les Chantes Mystiques, p. 27 fn, Ch. II.

তথায় যাইতে হইলে পথে গোপীচন্দ্রের রাজ্য পড়িত। রাজমোহন নাথ মহাশয় ‘কদলীরাজ্য’ নামক পুস্তিকায় ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মতান্তরে মৎসেন্দ্র সিংহলের রাণীর মায়ায় আবদ্ধ হন, পরবর্তী কালে এই রাণীর গর্ভজাত মৎসেন্দ্রের দুই পুত্র পরেশনাথ ও নিমনাথ জৈনধর্ম প্রচার করেন।^১

বোম্বাই অঞ্চলে ‘মায়ামচ্ছীন্দর’ নামক ছায়াচিত্রের খুব প্রচলন। এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে শিষ্য গোরক্ষের আত্মাভিমান বিনষ্ট করিতেই মহাসিদ্ধ মৎসেন্দ্রনাথ স্বচ্ছায় ভোগীরূপ ধারণ করেন। গোরক্ষ গুরুকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে যোগাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে স্বীকৃত করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে গুরু অস্তর্হিত হইয়াছেন ও গোদাবরী তীরে সমাধিস্থ আছেন। ইহাতে শিষ্যের চৈতন্য হইল। ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিতে মৎসেন্দ্র যে আপন শক্তি দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে সমর্থ, তাহা গোরক্ষনাথ উপলব্ধি করিলেন।^২

গোরক্ষ কাহিনী :

নেপালে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যকাহিনী অনুসারে মহাদেব একটা পুত্রকামা নারীকে ভক্ষ্য (মতান্তরে ভস্ম) প্রদান করিলে, সে তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া তাহা গোময়ে নিক্ষেপ করে। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে মহাদেবের অনুসন্ধান ফলে সেখানে ‘গোরক্ষনাথ’ আবিষ্কৃত হন। এই গোরক্ষ মৎসেন্দ্রের শিষ্য গ্রহণ করেন।^৩ ভবিষ্যৎকালে গোরক্ষ গুরুদর্শনে নেপালে গমন করিলে, সেখানে অনাদৃত হইয়া মেঘপুঞ্জকে আবদ্ধ করিয়া অনাবৃষ্টির সঞ্চার করেন। তঠাৎ সেই পথে গুরু মৎসেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে বাধ্য হইয়া গোরক্ষনাথকে দণ্ডায়মান হইতে হয়, মেঘেরাও মুক্ত হইয়া বারিবর্ষণ আরম্ভ করে। এই কাহিনী হইতে মৎসেন্দ্র যে গোরক্ষের গুরু ছিলেন, তাহা জানা যায়। মৎসেন্দ্রের পূর্ববৃত্তান্ত ইহাতে নাই। পূর্বোক্ত মৎসেন্দ্র সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ কাহিনীটা ইহারই পল্লবিত ও পরবর্তী সংস্করণ বলিয়া অনুমান হয়।^৪

১। Briggs, pp. 72-73, 233.

২। কল্যাণ, সন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৮০-৮১—নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ।

৩। কল্যাণ, যোগাঙ্ক—যোগিরাজ শ্রীগোরক্ষনাথ, পৃ ৭৮০।

৪। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ১২৭ কোলজাননির্ণয়।

নেপালের মুদ্রায় শ্রীগোরক্ষের নাম অঙ্কিত থাকে। সেখানে তাঁহার পশুপতিনাথের তুলা সম্মান। গোরক্ষনাথ স্তোত্রে “‘গ’কার গুণসংযুক্ত, ‘র’কার রূপলক্ষণ, ‘ক্ষ’কারেণ অক্ষয় ব্রহ্ম শ্রীগোরক্ষ নমোহস্ত মে” দ্বারা গোরক্ষ শব্দের মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে।^১

গোরক্ষের জন্মবৃত্তান্ত :

গোরক্ষের জন্মকথা রহস্যাবৃত। গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে ইহাকে ‘ঈশ্বর-সন্তান’ বলা হইয়াছে (পৃ ৪০ ভ্রষ্টব্য)। সম্ভবতঃ কবীরাদির আশ্রয় কোন অখ্যাতনামা বংশে গোরক্ষের জন্ম হওয়ায় তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তথাপি গোরক্ষ-চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যুধিকার আশ্রয় শুভ্র, তাঁহার চরিত্র মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিকনির্দেশক স্তম্ভ।^২ স্বয়ং দেবী ভগবতী ইহার চরিত্রের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। গোরক্ষের বিষয়ে বঙ্গভাষায় কাব্য রচিত হইলেও, তাঁহার জন্মবৃত্তান্তের উল্লেখ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যোগিসম্প্রদায় মধ্যে মাত্র পাওয়া যায়। নেপাল, গোরক্ষপুর, পাঞ্জাব প্রভৃতি গোরক্ষের জন্মস্থানরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। ডাঃ মোহন সিং গোরক্ষনাথকে পেশোয়ারের নিকটবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।^৩ বঙ্গীয় কাব্য ‘গোরক্ষ-বিজয়’ হইতে গোরক্ষের জন্ম মহাদেবের জটা হইতে এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। গোরক্ষের অশ্রান্ত জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ক। পুত্রকামা জনৈক নারীর শিব কর্তৃক ভ্রম প্রাপ্তি, উহা গোময়ে নিক্ষেপ ফলে গোরক্ষের জন্ম। সমুদ্র হইতে মৎস্য কর্তৃক গোরক্ষের গুরু প্রাপ্তি, তাই গুরুর নাম ‘মৎসেন্দ্রনাথ’। গোরক্ষের ধর্ম প্রচার ও দ্বাদশ শিষ্য লাভ।

খ। নিরাকার নিরঞ্জনের ধর্ম হইতে গোরক্ষের উৎপত্তি। ইনি মৎস্যজাত মৎসেন্দ্রের পিতা, নিজ পাপস্খালনের জন্য গুরু অবেষণ এবং অবশেষে স্বীয় পুত্রকেই গুরুরূপে বরণ।

গ। শিব বিষ্ণুর মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইলে মৎসেন্দ্রের জন্ম হয়। একটা গরু ইহাকে লালন পালন করে।

১। গো. সি. স., পৃ ৪২।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বীণেশ সেন, পৃ ৩০ (৫ম সং)।

৩। সিং, গোরক্ষনাথ ভ্রষ্টব্য।

৪। শিব জালন্ধর নামে জনৈক ছুট্টকে স্বীয় বশে আনেন। এই জালন্ধরের দুইটা শিষ্য—মংশেস্ত্র ও জালন্ধরিপা। মংশেস্ত্রের শিষ্য গোরক্ষ।
৫। জালন্ধরিপা ঋষি—পন্থের প্রবর্তক। মংশেস্ত্রের পতন, গোরক্ষের মক্ষিকারূপে গুরু উদ্ধার, সপ্তশিষ্য দ্বারা সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রচলন ইত্যাদিরও বর্ণনা আছে।^১

গোদাবরী তটে ব্রাহ্মণীগর্ভে গোরক্ষের জন্ম ও দ্বাদশবংশরাস্ত্রে মংশেস্ত্র কর্তৃক আন্তর্ধানিক রীতিতে সম্প্রদান, গোরক্ষের গোসেবা, যোগধর্ম শিক্ষা ইত্যাদি কথাও পাওয়া যায়।^২ স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত ভক্তিবিলাসের ৫১, ৫২ অধ্যায়ে গোরক্ষ অবতারের কথা আছে।^৩

এই সকল কাহিনী হইতে মংশেস্ত্রনাথই যে গোরক্ষের গুরু এই তথা সংগ্রহ করা কঠিন নহে। বঙ্গদেশে গোরক্ষের জন্মকথা অজ্ঞাত থাকিলেও, মংশেস্ত্রের জন্ম বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে ও তিনি ‘শিবপুত্র’ ও শিবসম্বৃত তাহা সর্বত্র স্বীকৃত। মংশেস্ত্র ও গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনী মূলতঃ বঙ্গদেশের। তবে গোরক্ষনাথ গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর গুরুরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। পাঞ্জাব কাহিনী অনুসারে গোপীচন্দ্র উজ্জয়িনীর রাজা হইলেও, তাঁহার জন্মস্থান গোড় বঙ্গদেশে। গোপীচন্দ্রের দেশ ত্রিপুরা জিলায়, সেখান হইতে গোড়, কামলাক যাওয়া যাইত। শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম গোড়, কুমিল্লার প্রাচীন নাম কামলাক। পদ্ম-পুরাণে শ্রীহট্ট গোড়ের উল্লেখ আছে।^৪ বঙ্গীয় মংশেস্ত্র বা গোপীচন্দ্রের কাহিনী হইতে গোরক্ষের জন্মস্থান নির্ধারণ সম্ভবপর নহে। অতএব উহা অজ্ঞাপি অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

মংশেস্ত্র-গোরক্ষনাথের ঐতিহাসিকতা

গ্রন্থাদিতে উল্লেখ :

মংশেস্ত্র-গোরক্ষনাথের প্রাচুর্য্যব সম্বন্ধীয় কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত হইল। এক্ষণে গ্রন্থাদি বা শিলালিপিতে তাঁহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি না তাহাই বিচার্য্য, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা সাধ্য হইবে। মংশেস্ত্র ও গোরক্ষনাথের

১। Briggs, pp 182, 183 ff.

২। যোগিসম্প্রদায়বিভূতি, পৃ ৩১।

৩। কলাণ, সপ্ত অঙ্ক, পৃ ৪৭২—নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ।

৪। গোপীচন্দ্রের সম্মান, পৃ ১০১ টীকা।

মধ্যে গোরক্ষের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ হওয়ায় দাবিস্তান, বীজক, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীতে গোরক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎস্যেন্দ্র স্বীয় উপযুক্ত শিষ্যকে ভার্য্যপণ করিয়া যুধিষ্ঠির সম্বৎ ১৯৩৯তে অস্থহিত হন বা গিরনার পর্বত মধ্যে সমাধিস্থ হন, এইরূপ প্রবাদ আছে।^১

দাবিস্তানে গোরক্ষের যোগবৃত্তান্ত আছে (১ম খণ্ড, পৃ ১২৭)। দাবিস্তান লেখক গোরক্ষের রচনাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ১২২) গোরক্ষকে মহম্মদের পালক পিতা ও শিক্ষাগুরু বলা হইয়াছে। গোরক্ষের মুসলমানী নাম 'রীন হাজি'। সিদ্ধুদেশে তিনি দাতার জামিল শাহ নামে পরিচিত ছিলেন ও গুণাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেন, ইহার উল্লেখ আছে।^২

দত্তাত্রেয়ের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে গোরক্ষ মণ্ডুকরূপে জলে অদৃশ্য হন, আবার দত্তাত্রেয় জলের রূপ ধারণ করিয়া জল মধ্যে অদৃশ্য হইলে গোরক্ষ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে অসমর্থ হন, ইহার উল্লেখও দাবিস্তানে পাই।^৩

অন্যত্র দাবিস্তানে মৎস্যেন্দ্রকে খৃষ্টানদের Jonahও বলা হইয়াছে।^৪ বাস্তবিকপক্ষে মৎস্যেন্দ্র না ব্রাহ্মণ্য, না বৌদ্ধ, না মুসলমান, কোন দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান না পাইয়াও যোগিশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছেন। মৎস্যেন্দ্রকে বিষ্ণুস্বামীরূপে প্রমাণেরও চেষ্টা করা হইয়াছে। 'গোরক্ষকী মায়াসার' নামক কাহিনীতে তাঁহাকে মহাবিষ্ণুসঙ্গ বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই প্রাচীন বিষ্ণুস্বামী বলিয়া অনুমান করেন। গোরক্ষ বিজয় (পৃ ৪৩) গ্রন্থেও মৎস্যেন্দ্রকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মৎস্যেন্দ্র 'কৌল' বা 'শৈব' ছিলেন।

গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীতে কবীর ও গোরক্ষের বার্তালাপের মধ্যে গোরক্ষ নিজেকে মৎস্যেন্দ্রের পুত্র ও আদিনাথের পৌত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই আদিনাথ অর্থে শিব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কবীরের কাল ষোড়শ শতাব্দী। কবীর তাঁহার 'বীজকে'র বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষনাথের উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসনের মতে গোরক্ষ কবীরের

১। যোগিসম্প্রদায়বিহৃতি, পৃ ১৬২, ১৬৩, ২২৮।

২। Briggs, p. 181.

৩। দাবিস্তান, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪০।

৪। দাবিস্তান, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩৭।

সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী।^১ কবীরের জায় নানকের সহিতও গোরক্ষ ও মৎসেন্দ্র উভয়ের কথোপকথন বৃন্তান্ত 'জনমশাখী'তে বর্ণিত আছে। নানকের কাল ১৪৬৯-১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ। একদা লিংহলে নানককে গোরক্ষ বলিয়া ভ্রম করার কথায় এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে ১৫শ শতাব্দীতেও গোরক্ষের মত প্রবল ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর লিপিতে নেপালে এক শিলায় এই বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে দেখা যায় : “যোগিশ্রেষ্ঠরা তাঁহাকে ‘মৎসেন্দ্রনাথ’ বলেন, শক্তি উপাসকেরা তাঁহাকে ‘শক্তি’ আখ্যা দেন, বৌদ্ধরা তাঁহাকে ‘লোকেশ্বর’ নামে অভিহিত করেন, যিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সেই পুরুষের জয় হউক।” এই লিপির কাল নির্ণয় হইয়াছে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ।^২

মৎসেন্দ্রনাথ নেপালীদের রক্ষকস্বরূপ দেবতা ও রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও অবলোকিতেশ্বরের অবতার। অবলোকিতেশ্বর চতুর্থ বোধিসত্ত্ব, এ যুগের ভারবহন কার্য্য তাঁহারই উপর ন্যস্ত, কারণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বোধিসত্ত্বের উপর রক্ষা ও সংহার ভার আছে। পঞ্চদ্যানীবুদ্ধের আশ্রয় পঞ্চবোধিসত্ত্বরূপে গণ্য।^৩ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মৎসেন্দ্রের কোলগ্রন্থ হইতে তাঁহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না, তিনি নাথদের গুরু হইয়াও নেপালী বৌদ্ধদের উপাস্ত দেবতা হন (বৌদ্ধ গান ও দোহা পৃ ১৬)।

অবলোকিতেশ্বর শিবকে যোগধর্ম শিক্ষা দেন। শিবসমুদ্র উপকূলে তাহা পার্বতীকে ব্যাখ্যা করিবার কালে মৎসুরূপী মৎসেন্দ্র উহা শ্রবণ করিয়া যোগধর্ম প্রচার করেন। গোরক্ষপদ্ধতির ভূমিকায় ও জ্ঞানেশ্বরীতে (১৮, ১৭৫২) এইরূপ বৃন্তান্ত আছে। ‘জ্ঞানেশ্বরী’ ও ‘গোরক্ষপদ্ধতি’ উভয় গ্রন্থই বিখ্যাত, তথাপি মৎসুরূপী মৎসেন্দ্রনাথের কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনা কতটুকু তাহাই বিচার্য্য।

অবলোকিতেশ্বরের অপর নাম লোকনাথ বা লোকেশ্বর। ইনি পরম তপস্বী ও ঐন্দ্রজালিক। খৃষ্টীয় ধর্মের আদিযুগে ইহার মত প্রচলিত ছিল। ইহার বীজমন্ত্র ‘ওঁ মণিপদমে হুম্’ অজ্ঞাপি বৌদ্ধগণ কর্তৃক উচ্চারিত হইতেছে। স্বর্গে প্রবেশলাভ ও নরক হইতে অব্যাহতি পাইবার

১। E. R. E., Vol. VI—Gorakhnath.

২। E. R. E., Vol., VI, pp. 256-61—Vallee Poussin.

৩। Briggs, p. 231—Refs. to Wright's History of Nepal, etc., etc.

একমাত্র সহায় এই বীজমন্ত্র। নেপালে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে মৎস্যেন্দ্রকে কপোতল বা পোতল পর্বত হইতে নেপালে আনয়ন করিয়া দেশকে রক্ষা করা হয়, তাই তাঁহার বিগ্রহ আজও সাদরে পূজিত হয়। এই পর্বতের অবস্থিতি-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন উহা আসামে, কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা বলেন উহা সিংহলে।^১ ডাঃ মোহন সিং-এর মতে সংলগ্নদ্বীপ বা সকলদ্বীপ বর্তমান সিয়ালকোটের নিকট, সেইস্থান হইতেই মৎস্যেন্দ্র নেপালে গমন করেন। শৈব পাণ্ডপতের বেশেই মৎস্যেন্দ্র নেপালে গমন করেন।^২ তিনি গোরক্ষের গুরু ও কানফাটা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, নেপালে তিনিই শৈব ধর্ম প্রচার করেন। তিনি পাণ্ডপত শৈব সন্ন্যাসিরূপে নেপালে গমন করেন বলিয়া তাঁহার শৈব বিগ্রহও নেপালে আছে। রংপুরে, উত্তর-পূর্ব বঙ্গদেশে প্রবাদ যে কানফাটার শঙ্করাচার্যের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু মণ্ডপানাসক্ত হওয়ায় শঙ্কর কর্তৃক ত্যাজ্য হন। কানফাটাদিগের দুইটি প্রধান বিভাগ আছে; একটি ভারতের উত্তরে, অপরটি পশ্চিম ভারতে। ইতালীয় পণ্ডিত তেমিতরির মতে কানফাটা যোগীরা সম্ভবতঃ ভারতের উত্তরাকল হইতে আগমন করেন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির যুগেও ইহারা বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগেই ইহাদের ক্ষমতার বিকাশ হয়।

আসামের দা পার্শ্বতীয়া নামক স্থানে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর একটি শৈব মন্দির আছে। তাহার একটি ইষ্টকে চতুর্ভূজ নরমূর্তি অঙ্কিত আছে। উহার এক হস্তে শিব-ডঙ্কর আছে, মূর্তিটি লকুলীশ শিবের। মূর্তির নিম্নে সমুদ্রতরঙ্গ অঙ্কিত আছে।^৩ সমুদ্রমধ্যে থাকিয়া মৎস্যেন্দ্র-কর্তৃক যোগধর্ম শ্রবণ কি ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে? গোরক্ষনাথ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হন, সেই নিমিত্ত নেপালী বৌদ্ধেরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট, সিকিমের বিভিন্ন মন্দিরে তাঁহার মূর্তি আছে এ কথা ঘাঁহারা বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ উহা গুরু রিম্বোচের মূর্তি।^৪ সাধারণতঃ নাথগুরুদিগকে 'নবনাথ' আখ্যা দেওয়া হয়। যোগসিদ্ধ চতুর-

১। বাগ্‌চী, ভূমিকা, পৃ ১৭; ব্রীক্স, গোরক্ষনাথ, পৃ ২৩২, ফুটনোট ২। ডাঃ সিং, গোরক্ষনাথ, পৃ ৭৩।

২। ব্রীক্স, গোরক্ষনাথ, পৃ ২৩২, ফুটনোট ২।

৩। ব্রীক্স, পৃ ২৩২, কামাখ্যার মন্দির কথা।

৪। Lamaism—Wadell, p. 292, re Gorakhnath.

শীতি জনের মধ্যেও ইহারা স্থান পাইয়াছেন। জ্যোতিরীশ্বরের ‘বর্ণ-রত্নাকরে’ ইহাদের তালিকা আছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৮৪ সিদ্ধার চিত্র ও বংশবৃক্ষ ভোটিয়া হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।^১ ত্রীগস তাঁহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে (পৃ ৭৫-৭৭) কয়েকটি গুরুপরম্পরার চিত্র দিয়াছেন। কল্যাণ সম্বাদে (হিন্দী গ্রন্থ, পৃ ৪৮৪) ত্রীগসের Chart B-র প্রায় অনুরূপ চিত্র আছে। ভোটিয়া গ্রন্থ মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ জালন্ধর-পার শিষ্য। ‘মহারাষ্ট্রমে নাথপন্থ’ প্রবন্ধে (কল্যাণ সম্বাদ, পৃ ৪৮৪ দ্রষ্টব্য) নাথসিদ্ধদের নামের সহিত যুক্ত বহু স্থানের উল্লেখ আছে। নাসিক জিলায় গোরক্ষ-গুহা, গৈনীনাতের মঠ, চোরঙ্গীর আবাসস্থল প্রভৃতি নির্দেশিত হয়। মহারাষ্ট্র-ভাষায় ‘ভর্তৃহরি-নির্ভেদ’ নামক গোরক্ষসম্বন্ধীয় নাটক আছে। প্রবাদ যে গোরক্ষ স্বয়ং মহারাষ্ট্র-ভাষায় ‘গোরক্ষ-অমর-সংবাদ’ ও ‘গোরক্ষ গীতা’ রচনা করেন। সংস্কৃতে রচিত ‘গোরক্ষ-সংহিতা’ ও ‘গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত’ গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত। বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ ‘বায়ুতন্ত্র-ভাবনোপদেশ’ জৈনিক গোরক্ষ-রচিত। (শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহা দ্রষ্টব্য)।

ঐতিহাসিক ঘটনা—একণে গোরক্ষের নামের সহিত যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা যুক্ত আছে, তাহাদের শতাব্দী অনুসারে বিভাগ করিয়া গোরক্ষ-সম্বন্ধে কোন তথ্য নির্দেশ করা সম্ভব হয় কিনা দেখা যাউক।

ষোড়শ শতাব্দী—কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ কথা ও তত্ত্বালোচনা সুবিদিত, কিন্তু কবীর বীজকের ৪০ শ্লোকে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে গোরক্ষ বহু পূর্বে মৃত হইয়াছেন, অতএব স্থলদেহে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। কবীরের কাল ১৪৪০-১৫১৮ খৃঃ, নানক কবীরের প্রায় ৩০ বৎসর পরের সাধক (১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ)। উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ কবীরের সহিত সাক্ষাতের উপর নির্ভর করিয়া গোরক্ষ-কাল পঞ্চদশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে, কারণ কবীর নিজেই বলিয়াছেন, “গোরক্ষ কৌরবদিগের স্থায় মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার দেহ প্রোথিত হইয়াছে।” তথাপি কবীরের যুগেও গোরক্ষ-প্রসিদ্ধি ছিল, এই পর্য্যন্ত বলা যায়।

১। বৌদ্ধগান ও দোহা—শাস্ত্রী, ভূমিকা, 4th Ort. Con. Proceedings. Dr. S. Chatterjee, p. 563, re ‘বর্ণরত্নাকর’ নাম। পদ্ম-পুরাতনাক, জাফরী ১৯০০, ময়দান, সহজদান ও জোরানী সিদ্ধ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

চতুর্দশ শতাব্দী—গোরক্ষ-শিষ্য গুণা সর্পদিগের দেবতা, তিনি অজ্ঞাপি পূজা পাইতেছেন। টডের ইতিহাসে ইনি রাজপুতানার জনৈক বীর ও গজনীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন বলা হইয়াছে। মতান্তরে গুণা চৌহান-রাজবংশীয় এবং পরে ‘জহর-পীর’ নামে পরিচিত হন। অপর একটি কাহিনীর মতে তিনি ফিরোজ সাহ কর্তৃক নিহত হন। ফিরোজ সাহের কাল চতুর্দশ শতাব্দী, কিন্তু এই কাহিনীর দ্বারা কোন ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। সর্প-দেবতা ও রাজপুত-বীর এক ও অভিন্ন কিনা তাহা নিরূপণ করাও অসম্ভব।^১

ধর্ম্মনাথ গোরক্ষ-শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশের বিখ্যাত ধীনোধরের মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতেই গ্রীয়ারসন গোরক্ষের কাল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন।^২ কিন্তু পরম্পরা-ক্রমে গোরক্ষনাথ ও ধর্ম্মনাথের মধ্যে সৎনাথের নাম পাওয়া যায়।^৩ অতএব তাঁহারা সমসাময়িক হওয়া সম্ভবপর নহে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী—বাবা ফরিদের নামের সহিত গোরক্ষনাথের নাম যুক্ত করা হয়। বাবা ফরিদ ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে গিরণারে গমন করেন, সেখানে গোরক্ষনাথেরও মন্দির আছে।^৪ সম্ভবতঃ বাবা ফরিদ গোরক্ষের সাধন-পদ্ধতি পরবর্ত্তী কালে গ্রহণ করেন, এই কারণেই গোরক্ষের সহিত তাঁহার নাম যুক্ত হয়। নানা কারণে ইহাদের মধ্যে পার্থিব সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না।

একাদশ শতাব্দী—এই শতাব্দীতে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য ঘটনার সহিত গোরক্ষনাথের যোগাযোগ দেখা যায়। প্রথমতঃ জ্ঞানদেব-রচিত ‘জ্ঞানেশ্বরী’-নামক গীতা ভাষ্যে নাথযোগীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ভাবে মতে জ্ঞানেশ্বরের সহিত নাথযোগীদের যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নহে, কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে নাথযোগীদের বিশেষ আধিপত্য ছিল। ভাবে মতে জ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল দশম বা একাদশ শতাব্দী। জ্ঞানদেবের কাল লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানদেব ১২১২ শকে উহা রচনা করেন (১২৯০ খৃঃ) তাহা তিনি নিজেই

১। Briggs, pp. 99, 132, etc.

২। E. R. E., VI, p. 329, Gorakhnath, p. 116, Dharmanath.

৩। Briggs, p. 77, Chart D.

৪। Briggs, p. 119.

উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বরের পিতামহ গোবিন্দপন্থের ধর্মে প্রবৃত্তি গোরক্ষনাথ দ্বারা সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে।^১ গোবিন্দপন্থ একাদশ শতাব্দীর হইলে, গোরক্ষের সহিত সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে।

ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে গোরক্ষের কাল একাদশ শতাব্দী বলা যায়, কারণ ময়নামতীর স্বামী মানিকচন্দ্র ধর্মপালের ভাতারূপে খ্যাত এবং পালবংশের লোপ হয় একাদশ শতাব্দীতে (১০৯৫ খৃঃ)।

১০২৫ খৃষ্টাব্দের রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ঐ সময়ে বঙ্গদেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে রাজা ছিলেন। তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। এই রাজারা বাথরগঞ্জের এক দ্বীপে বাস করিতেন বলিয়া ইহাদের উপাধি 'চন্দ্র' হইতে দ্বীপের নামও 'চন্দ্রদ্বীপ' হয়। রাঢ় বঙ্গদেশে ও বরেন্দ্রভূমিতে ঐ সময়ে পাল-রাজারা রাজত্ব করিতেন। বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগে চট্টগ্রাম, আরাকান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে বৌদ্ধমঠ ও বিহার স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ রাজারাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।^২ আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ অভিন্ন হইলে গোরক্ষ-কাল একাদশ শতাব্দী স্থির করা যাইতে পারে।

পাল-রাজাদিগের মধ্যে তৃতীয় রাজা দেবপাল জনৈক নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তির প্রেরণায় 'ধর্ম'পূজার প্রচলন করেন। বঙ্গদেশে ঐ ধর্মপূজার আদি প্রবর্তকের নাম রামাই পণ্ডিত। ইহার জন্ম হয় দশম শতাব্দীর শেষাংশে। ঐ ব্যক্তি নিম্ন শ্রেণীর হইলেও কেবল রাজা দেবপাল নহে, তাহার ভগিনী ময়নারও সাহায্য ও সহানুভূতি পান। শাস্ত্রীর মতে পরবর্তী পাল-রাজারা পাণ্ডপত শৈবদের ভূমি প্রদান করেন ও সহস্রাধিক মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।^৩ খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে পাল-রাজারা আধিপত্য করেন। পাল-রাজাদিগের গীতিকাতেও বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িসিদ্ধা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।^৪ ১১শ শতাব্দীর আরম্ভে মহীপালের সময়ে ভাষার অর্থাৎ অসংস্কৃত বা কথিত ভাষার প্রচার হয়। ধর্মপূজার পুথি 'শূন্য পুরাণ'

১। Briggs, p. 242, refs. to Pangarkar, Bhabe, etc.

২। কদলীরাজা, রাজমোহননাথ, পৃ ৭, ৮ চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে আলোচনা।

৩। Briggs, p. 245, refs. to Sastri.

৪। Hist. of Beng. Lang. & Litt.—D. C. Sen, p. 29. (1911 Ed.).

এই ভাষাতেই রচিত। বৌদ্ধধর্মেও এই সময় হইতে তান্ত্রিক ভৈরব-ভৈরবীর প্রবেশ ঘটে। নাথযোগীদিগের প্রতি সমাজে আদ্যা-প্রদর্শনই রীতি ছিল। বঙ্গীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে নাথগুরুরা যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন।

দশম শতাব্দী—ডাঃ বিনয় সেন দেখাইয়াছেন গোপীচন্দ্রের গানের হরিচন্দ্র (গোপীচন্দ্রের শ্বশুর), শৃঙ্গপুরাণের হরিচন্দ্র রাজা ও তারানাথ উল্লিখিত পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজা হরিচন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজা হরিচন্দ্র পালবংশের পতনের যুগে বঙ্গে রাজত্ব করেন। তিরুমলয় লিপি ১০২৫ খৃষ্টাব্দের হইলে এবং গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত হইলে তখন গোপীচন্দ্রের বয়স আনুমানিক ত্রিশ বৎসর হইবে এবং ময়নামতী রক্ষা হইবেন।^১ কিন্তু এই প্রমাণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে গোরক্ষনাথের কাল দশম শতাব্দী ধার্য্য করিতে হয়।

মালবরাজ ভর্তৃহরি ময়নামতীর ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে তিনি স্বীয় পত্নী পিঙ্গলার মৃত্যুতে শোকাক্ত হইয়া গোরক্ষনাথী হন। এক সম্প্রদায়ের কানফাটা যোগীরা ভর্তৃহরির নামে পরিচিত। ভর্তৃহরির পরে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা হন (১০৭৬—১১২৬ খৃঃ)। অতএব পিঙ্গলা রাণীর মৃত্যু ১১শ শতাব্দীর পূর্বের ঘটনা এবং গোরক্ষও তৎপরবর্ত্তী কালের নহেন। সিদ্ধদেশ, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে গোপীচাঁদ, রাণী পিঙ্গলা ও ভর্তৃহরির কাহিনী প্রচলিত আছে। সিদ্ধদেশে পটাও নামে এক পীর দ্বীপগুহা-মধ্যে বাস করিতেন। ১২০২ খৃঃ তাহার মৃত্যু ঘটে। হিন্দুরা তাহাকে গোপীচাঁদ বলিত। অত্য়াপি এই দ্বীপগুহা তীর্থ-বিশেষ। ময়নামতী ও হাড়িপা উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। গোপীচাঁদ হাড়িপার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সকল তথ্য হইতে গোরক্ষনাথ ১১শ শতাব্দীর পূর্বে বলিতে হয়।^২

দশম শতাব্দীর পূর্ববর্ত্তী কাল—মালব-রাজকন্যা ময়নামতীর স্বামী মাণিকচন্দ্রের গীত রংপুরের পাণ্ডপত শৈবরা গাহিয়া থাকে। তাহারা গোরক্ষনাথকে গুরুরূপে পূজা করে। পুগন্ধ্যাম্জোন্বজ্ঞান মতে শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের পরবর্ত্তী কালে মগধে শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজত্ব-

১। Cal. Review, Aug. 1924, Ramai Pandit by B. C Sen.

২। Briggs, p. 244.

কালে বঙ্গদেশে মাণিকচন্দ্রের পিতা রাজস্ব করিতেন।^১ শঙ্করের জন্ম হয় ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। গোরক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের দর্শনের সহিত উপনিষদের দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করেন, অতএব তিনি শঙ্করের বহু পরবর্তী যুগের নহেন—ঐয়ারসন এইরূপ অনুমান করেন।^২

রাজপুতদিগের সহিত মুসলমানদিগের সংঘর্ষের ঘটনাবলী হইতে গোরক্ষনাথ গুগার গুরুরূপে যেরূপ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলা হয়, সেইরূপ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু-মুসলমানের যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে গোরক্ষ-শিষ্য রাজা রসালু বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন, এইরূপ মতবাদ প্রচলিত থাকায় গোরক্ষনাথকে টেম্পল অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। রসালু ও তদীয় ভ্রাতা পুরাণ ভাগত উভয়েই গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন। কালে পুরাণ প্রসিদ্ধ যোগী হন।^৩

ঐতিহাসিক টডের মতে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রাজা গজের সহিত থুরাসন রাজের গজনীরাজ্যে যুদ্ধ হয়। গজের পৌত্র রসালু ৬৯৭ খৃঃ হইতে আফগানিস্থানে হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল তাহাতে যোগ দেন। বিভিন্ন গীতিকায় তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা গজ ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে লোক হইলে, রসালু ও তাঁহার গুরু গোরক্ষনাথের কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে বলিতে হয়।

রসালুর কাল-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কিন্তু তাঁহাকে সকলেই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালের বলিয়াছেন। অতএব গোরক্ষের কালও দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে, ইহা অনুমান করা অনায়াস নহে। অতএব গোরক্ষ যে কবীরাতির সমসাময়িক ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত।

মুদ্রা ও মন্দিরাদি

রাজপুতবীর বাপ্পা গোরক্ষনাথের কৃপায় চিতোর পুনরুদ্ধার করেন এইরূপ একটি কাহিনী আছে।^৪ বাপ্পারাওয়ের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অষ্টম শতাব্দীর।^৫ বাপ্পার আদেশে উদয়পুরে যে মন্দির

১। কমলীরাজ্য, রাজমোহন নাথ, পৃ. ৭

২। E.R.E., Vol. VI, 'Gorakhnath' by Grierson.

৩। Briggs, p. 239.

৪। সমাজ-পত্রিকা, কানুন, ১৩০৬, "বাপ্পারাওর দৈবশক্তিসাক্ষ্য", রাধাগোবিন্দ নাথ।

৫। Briggs, p. 247.

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে ৯৭১ খৃঃ উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মন্দিরের ভাণ্ডার-গৃহে নাথধর্মীদের মন্দির ছিল, এইরূপ প্রবাদ আছে। গোরক্ষের সাহায্যে চিতোর জয় করিয়া বাম্বা অষ্টম শতাব্দীতে উদয়পুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, ঐতিহাসিক টড এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নেপালরাজ বরদেবের মৃত্যু হইতে তাঁহার কাল অষ্টম শতাব্দী ধাৰ্য্য হইয়াছে। লেভির মতে বরদেবের পিতা নরেন্দ্রদেব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। গোরক্ষের নেপাল-গমনকালে ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, অতএব গোরক্ষ-কালও অষ্টম শতাব্দী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।^১

প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে এলোরার কৈলাস-মন্দিরের মহাযোগী কুণ্ডলধারী শিবমূর্তির সহিত কুণ্ডলধারী নাথযোগীদের তুলনা করা যাইতে পারে। মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীর।

সোমনাথের 'পঞ্চলিঙ্গের' মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে। উৎকীর্ণ লিপিতে গোরক্ষের নামও দেখা যায়, অতএব গোরক্ষ-কাল ইহার পূর্ববর্তী ইহা নিশ্চিত।

আরকোটের শিবলিঙ্গের স্থায় বৃহৎ লিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের কুত্রাপি নাই। লিঙ্গোপরি কুণ্ডলধারী শিবমূর্তি রহিয়াছে। মন্দিরটির সংস্কার হয় ১১২৬ খৃষ্টাব্দে।

মুদ্রাদি, শিলালিপি, মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা-কাল প্রভৃতি হইতে কালনিক্রম-বিধি সুপ্রচলিত হইলেও, গোরক্ষ-কাল-নির্ণয়ে ইহার দ্বারা বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায় না। তবে এই কালগুলির কোনটাই দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহে, ইহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। E. R. E., Vol. VI, Gorakhnath.

২। See Briggs, Ch. XI, etc. for detailed description of coins, temples, etc.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোরক্ষনাথের কাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

পূর্বোক্ত কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি, গীতিকা, শিলালিপি, প্রত্নতত্ত্ব, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানেশ্বরী, জনমশাখী, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, বীজক, যুক্তবিগ্রহ ও মুদ্রাদির বর্ণনা হইতে গোরক্ষনাথের কালনির্ণয় বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তথাপি চারিটী বিভাগে গোরক্ষের কাল-সম্বন্ধে মতামত বিভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত ষোড়শ শতাব্দীতে গোরক্ষের বাক্যালাপ-বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু উহার বহু পূর্বেই গোরক্ষনাথ মৃত হইয়াছেন বলিয়া কবীর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দেশে সিন্ধুপুরুষদিগের মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া ধর্মপ্রচার করিবার কথা সাধারণে বিশ্বাস করে, অতএব এইরূপ ‘গোষ্ঠী’ বা ‘জনমশাখী’ বৃত্তান্ত থাকা বিচিত্র নহে।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত ষোড়শ শতাব্দীর রচনা অচ্যুতানন্দের ‘শৃঙ্গসংহিতায়’ ৭০ অধ্যায়ে আছে—

নাগাস্ত্রক বেদাস্ত্রক যোগাস্ত্রক জেতে ।
নানাপ্রতি বিধিরে রহিমে তোষচিত্তে ॥
গোরক্ষনাথক বিজা বীরসিংহ আজ্ঞা ।
মল্লিকানাথক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা ॥
লোহিদাস কপিলক সাক্ষি-মন্ত্র জেতে ।
কহিলে জে যেমন্ত সে হোইছি গুপতে ॥

অর্থাৎ নাগার্জুনের মত, উপনিষদের মত, আসক্তের মতে যোগ, গোরক্ষের (হঠ) বিজা, বীরসিংহের আজ্ঞা, মল্লিকানাথের যোগ, বাউলদের সাধন, লোহিদাস ও কপিলের সাক্ষি-মন্ত্র, সবই গুপ্ত হইয়াছে।

লামা তারানাথের মতে গোরক্ষ শিষ্যদল-সহ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈব সন্ন্যাসী হন। শৃঙ্গসংহিতা-মতে গোরক্ষ ও মল্লিনাথ ‘যোগারূঢ়’ অর্থাৎ যোগাচার-সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহাতে লোহিদাসের প্রব্রজ্যা ও নিরাকার ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে, নাগার্জুনের বিপরীত-সাধনের কথাও আছে।

ত্রিমূর্তি-পূজা ‘বুদ্ধমাতা আদিশক্তিসংঘচ্ছক্তি কহি’ ও ‘মনখান’ শব্দ দ্বারা মন্ত্রযান, ও বৈষ্ণবরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের অস্তিত্ব-কথা শৃংখ-সংহিতায় আছে।^১ অতএব গোরক্ষনাথ যে ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্বের তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষের প্রথম যুগে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করিতে হইলে গুগা কাহিনী, গোপীচাঁদের গীত, ভর্তুহরি ও পিঙ্গলার কাহিনী, সিদ্ধদেশের পীর পটাও বৃত্তান্ত, সোমনাথে পঞ্চলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা তন্মধ্যে গোরক্ষের মন্দির (১২৮৭ খৃঃ) এবং প্রধানতঃ জ্ঞানেশ্বরীর গুরুশরম্পরার উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল যদি প্রক্ষিপ্তবাদ হয় তবে ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, নেপালরাজ নরেন্দ্রদেবের সময়ে গোরক্ষের নেপালে গমন, বাম্বারাওকে গোরক্ষের তরবারি-দান, রসালু ও তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা পুরাণ ভাগতের সহিত গোরক্ষের সম্বন্ধ, উদয়পুরে একলিঙ্গজীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা, এলোরাতে কুণ্ডলধারী শিবমূর্তি, দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গোপরি শিবমূর্তি হইতে গোরক্ষকে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর বলা হয়। বৌদ্ধধর্ম আলোচনা করিলে দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দী হইতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্মের ক্রমশঃ পতন ও শৈবধর্মের উত্থান হয়। শঙ্করের সময়ে (৭৮৮-৮৫০ খৃঃ) শৈবধর্মের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। শঙ্কর শৈব যোগীদের মন্ত্রপানরত বলিয়া উপেক্ষা করেন। দক্ষিণভারতেও সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-শৈব-সংঘর্ষ প্রবলতম আকার ধারণ করে। নেপালে ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ছয়টি শিবমন্দির ছিল, লেভি একথা বলিয়াছেন। অতএব বলিতে হইবে তৎপূর্বেই শৈবধর্মের সেখানে প্রচার হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্তিটি গোপীনাথ রাওর মতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর। শালিবাহন-রাজকে কেহ বা ৭৮ খৃষ্টাব্দের লোক বলেন, আবার কেহ শালিবাহন-পুত্র রসালুকে ৪০০ খৃষ্টাব্দের বলিয়াছেন। এই সকল মতামত বিশেষ মূল্যবান্ নহে। অতএব গোরক্ষ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বের হইতে পারেন না।

ডাঃ মোহন সিং গোরক্ষনাথ-সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে

১। Mod. Bud. in Orissa.—N. N. Vasu, pp. 122-30.

তাহাকে নবম বা দশম শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ মোহন সিং-এর মতে গোরক্ষ পূর্ববঙ্গের লোক। গোরক্ষ-সহস্র-নামস্তোত্রে গোরক্ষের নিবাসস্থল-সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট। পশ্চিম বঙ্গদেশ বা ঐরূপ কোন স্থানের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। (বাগচী—কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে উক্ত পুথির উল্লেখ দ্রষ্টব্য।)

Sir Francis Younghusband ডাঃ সিংএর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে যুগে উত্তর ভারতে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্ম-সম্প্রদায় সকলই প্রাধান্যের জন্য উন্মুখ ছিল, সেই যুগে গোরক্ষনাথের আবির্ভাব হয়। তিনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ও দশম শতাব্দীতে দেহত্যাগ করেন। গোরক্ষ নিম্ন জাতির ছিলেন ও চলিত ভাষার ব্যবহার করিতেন। তাহার পুথি ভারতের বিভিন্ন স্থানে রচিত হইয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞানের অতীত সাধন বা কৃত্রিমতার প্রতি গোরক্ষ বীতরাগ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্যের উপদেশ দিতেন। বিবাহিত হইলেও ঋতু, পানীয় বা ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ঈশ্বরতা লাভ হয় ইহাই তাহার মত ছিল।

Dr Betty Heimann উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, গোরক্ষের যোগ বিশুদ্ধ রাজযোগ নহে, উহা হঠযোগও নহে, ঋদ্ধি তাহার লক্ষ্য নহে, হঠযোগের কঠিন সাধনও তাহার অনুমোদিত নহে।

গোরক্ষের যোগ রূপকবিশেষ, উহা উপনিষদের দর্শনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'গোরক্ষবোধ' উপনিষদের তত্ত্বসকল স্মরণ করাইয়া দেয়, যথা—মন্ত্রই বীজ, বুদ্ধিই গর্ভকোষ, ধ্যানই ধৌতি, সন্তোষই আসন, ধ্যানই জ্ঞান, শব্দই কুলুপ, অশব্দই কুক্কা, শূন্যই মন্দির, শব্দ তাহার দ্বার। মধ্যযুগে প্রচলিত যোগসাধন হইতে গোরক্ষের যোগসাধন-পন্থার ভিন্নতা এই সকল উদাহরণ দ্বারা উপলব্ধ হয়।

ডাঃ বড়খাল-এর মতে গোরক্ষ দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন এবং গোরক্ষ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করেন।

হিমালয় অঞ্চলে তুটাকা-বশীকরণের যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতে গোরক্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্য থাকিবার উল্লেখ আছে। বাবা রতন হাজি কাবুলের বহু মুসলমানকে যোগী করেন। এই যোগীরা এখনও রতন হাজির ফকির নামে খ্যাত।

বাবা রতন হাজি গোরক্ষের শিষ্য ও গৃগার গুরুরূপে প্রসিদ্ধ।
গৃগার কাল আনুমানিক ১০০০ খৃঃ।

মৎস্তেন্দ্রের শিষ্যমধ্যে গোরক্ষ প্রধানতম। প্রবাদ আছে যে তিনি পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু গোরক্ষ-রচিত 'কায়াবোধ' গ্রন্থের একটি বচনে তাঁহাকে 'পঞ্চারম্বক' বা পশুহত্যাকারী মনে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁহার বৌদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।^১

গোরক্ষনাথের শিষ্যমধ্যে গৈনীনাত ও চর্পটীনাত প্রধানতম।

মৎস্তেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ-প্রচেষ্টা

মৎস্তেন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথের সম্বন্ধে বিভিন্ন কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিলেও এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এখানে প্রথমতঃ সংক্ষেপে পূর্ব্বালোচিত ঘটনাগুলির সারাংশ আলোচনা করিয়া, আমাদের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতেছি। যদিও ভারতীয় নীতি-অনুযায়ী মহাযোগীরা 'কালজয়ী,' তাঁহাদের কালনিরূপণের প্রথা নাই।

মৎস্তেন্দ্র, মীননাথ বা লুইপা এক ও অভিন্ন ছিলেন এবং তিনি পূর্ব্ব ভারতে সমুদ্র-উপকূলে জন্মগ্রহণ করেন, সে বিষয়ে প্রায় সকলে একমত। তাঁহার জন্মস্থান 'সন্দ্বীপে' বা 'চন্দ্রদ্বীপে,' পাঞ্জাব-কাহিনী-অনুসারে উহা 'সংলদ্বীপ' বা 'সকলদ্বীপ,' মোহন সিং উহা বর্ত্তমান সিয়ালকোটের নিকট বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।^২

কিন্তু নিত্যাহিকতিলকম্ পুথি (১৩৯৫) মতে মৎস্তেন্দ্রের জন্মস্থান বরনা, বঙ্গদেশে।^৩ মৎস্তেন্দ্র যোগিনী কৌলমার্গের বা চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কৌলশাস্ত্র কামরূপে প্রচার করেন, 'কামরূপে ইদং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে-গৃহে'।^৪ গোরক্ষের জন্ম-সম্বন্ধে কোন পুথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় না, যোগীরা তাঁহাকে 'ঈশ্বর-সন্তান' বলেন। গোরক্ষনাথ বঙ্গীয় রাজা মানিকচন্দ্র রাজার সমসাময়িক, কারণ তদীয়

১। Some Aspects of the History and Doctrines of the Nathas by Gopinath Kaviraj. S. B. S., Vol. VI, pp. 19 ff.

২। গোরক্ষনাথ—মোহন সিং, পৃঃ ৭২। ৩। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা—বাগচী, পৃঃ ৩৮।

৪। কৌলজ্ঞাননির্ণয়। ২২।১০।

মহিষী ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্যা ; প্রবাদ অনুসারে তিনি পাঞ্জাব জালন্ধরের লোক ।^১ তিনি বাঙ্গালী নহেন কারণ তাঁহার রচিত বাংলা কোন পদ পাওয়া যায় নাই, তবে তাঁহার সংস্কৃত ও হিন্দী রচনা পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু লুইপা বা মীননাথের বাংলা পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । মোহন সিং বলেন গোরক্ষই হিন্দী গল্পের আদি রচয়িতারূপে পরিচিত ।

গোরক্ষ মৎস্যেশ্বরের শিষ্যরূপেই পরিচিত, কেবল গ্রীয়ারসন উল্লেখ করিয়াছেন যে গোরক্ষ মৎস্যেশ্বর হইতে ষষ্ঠ পুরুষ ।^২ ইহা স্বীকার করিলে ইহাদের কালনির্ণয়-সমস্যা কঠিনতর হইয়া পড়ে । কিন্তু এই মত স্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ আদিনাথ, মৎস্যেশ্বরনাথ ও গোরক্ষনাথ এই তিনজনের নাম বিভিন্ন গুরু-পরম্পরায় প্রায়শঃ সর্বত্রই এই ক্রমানুসারেই উল্লিখিত হয় । অতএব আমরা গোরক্ষকে মৎস্যেশ্বরের ভারতবিখ্যাত শিষ্যরূপেই গ্রহণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি ।

মৎস্যেশ্বরের নামের সহিত নেপাল রাজ্যের নাম ঘনিষ্ঠভাবে বহু নেপালী কাহিনীতে যুক্ত হইতে দেখা যায় । নেপালের রথযাত্রা আমাদের দেশের রথযাত্রার অনুরূপ, ইহার সহিত মৎস্যেশ্বরের নাম ঘনিষ্ঠভাবে (সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে) যুক্ত হইয়াছে । নেপালের ইতিহাস-প্রণেতা রাইট স্থানীয় উপকরণ হইতে বলেন যে, বরদেবের সময়ে ষষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে, গোরক্ষনাথ নেপালে আগমন করেন । সিলভ'য়া লেভি প্রথম সূচনা করেন যে ষষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা নরেন্দ্রদেবের সময়ে মৎস্যেশ্বর নেপালে আগমন করেন ।^৩ শহীছলাহ্ লেভির মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মৎস্যেশ্বর নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে আগমন করেন । ইহা ব্যতীত শহীছলাহ্ বলিয়াছেন যে, জালন্ধরিশিষ্য কানুপা, মৎস্যেশ্বর, গোরক্ষ ও গোপীচাঁদ সমসাময়িক ছিলেন, এবং গোরক্ষ মৎস্যেশ্বরের শিষ্য ছিলেন । গোপীচাঁদ রাজা বিমলচন্দ্রের পুত্র ও মালবরাজ ভর্জুহরির ভাগিনেয় ছিলেন । বিমলচন্দ্র ধর্মকীর্তির সমসাময়িক ছিলেন, ধর্মকীর্তি বৌদ্ধজগতে খ্যাতনামা

১ । বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন (৫ম সং), পৃঃ ৫২ ।

২ । J. A. S. B. 1878, p. 138. Ref. Singh's Gorakhnath, add notes, p. XIX.

৩ । Le Nepal—S. Levi, p. 356.

(Schiefner-Geschichte, p. 122), ইটসিংও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মকীর্তি ৬১১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন একথার উল্লেখও ইটসিং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে। ইটসিং ৬৭৩ খৃঃ ভারতে আসেন। অতএব শহীদুল্লাহর মতে মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, ভর্তৃহরি, গোপীচাঁদ প্রভৃতি সপ্তম শতাব্দীর। ভর্তৃহরিও ধর্মকীর্তির সমসাময়িক (Schiefner Geschichte, পৃঃ ১৮৮)।^১

বাগচী এই মতের প্রতিবাদস্বরূপ বলিয়াছেন, নেপালের যে প্রাচীনতম ক্ষিতীশবংশাবলী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৭ম শতাব্দীতে মৎস্যেন্দ্রের নেপালে আগমনের উল্লেখ না থাকায় ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা সন্দেহ, সম্ভবতঃ ইহা পরবর্তী কালের যোজনা; উক্ত বৌদ্ধবংশাবলী ত্রয়োদশ শতাব্দীর। কিন্তু রাজগুরু বন্ধুদত্ত কর্তৃক বৃগম লোকেশ্বরের যাত্রা-প্রতিষ্ঠার কথা ইহাতে আছে। অতএব লোকেশ্বরের ও মৎস্যেন্দ্রের অভিন্ন-প্রতিষ্ঠা এ পর্য্যন্ত সাধিত হয় নাই, বলা যাইতে পারে।^২ তদ্ব্যতীত মৎস্যেন্দ্রকে ধৃত করিয়া আনিবার নেপালী কাহিনী এরূপ অলৌকিক যে ইহা দ্বারা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে।

শহীদুল্লাহ ভর্তৃহরি, ধর্মকীর্তি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মৎস্যেন্দ্রকে ৭ম শতাব্দীর স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ভর্তৃহরি কে? যদি ভর্তৃহরিকে গোপীচন্দ্রের মাতুল বলিতে হয় তবে ৭ম শতাব্দীর ভর্তৃহরি তিরুমলয় উৎকীর্ণ লিপির রাজেন্দ্রচোলের দ্বারা পরাজিত রাজা গোপীচন্দ্রের মাতুল হইতে পারেন না, কারণ এই লিপি ১১ শতাব্দীর। দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকালও ১১ শতাব্দীর প্রথমভাগে, পূর্ববঙ্গে এই সময়ে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। এই বংশের সহিতই গিরিলিপির সম্বন্ধ ছিল এ অস্বাভাবিক, যদিও পরম্পরাগত প্রবাদ দীর্ঘকাল পরে অনেকস্থলেই সম্বন্ধ-বিপর্যয় ঘটায়। তবে ৭ম শতাব্দীর ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদ আমাদের ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদ নহেন ইহা অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে বলা যায়। অতএব লেভি আদি বঙ্গ ও নেপাল কাহিনীকে মূলস্বরূপ অবলম্বন করিয়া যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত নহি। প্রাচীন রাজবংশাবলীতে প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ থাকে, অতএব মৎস্যেন্দ্রের স্থায় অসাধারণ

১। Les Chantes Mystiques—Sahidullah, pp. 27-28.

২। কোলজাননির্ঘ, ভূমিকা—বাগচী, পৃঃ ১০।

যোগীর উল্লেখ না থাকা বিচিত্র। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে যে উল্লেখ থাকিবেই, এই সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে, তবে তিরুমলয়-লিপি, গোপীচাঁদ-কাহিনী প্রভৃতিও ভাবিবার বিষয়। গোরক্ষকে অত্যন্ত প্রাচীন প্রমাণ করিবার চেষ্টায়, বিভিন্ন কাহিনীতে পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতির সহিতও ইহাকে যুক্ত করা হইয়াছে। ব্রীগ্‌স এই সকল কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন (ব্রীগ্‌স, পৃ: ২২৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

লেভি কৌলজ্ঞাননির্ণয় প্রভৃতি পুথির দ্বারা সময়-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। বাগচী প্রধানতঃ লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামক পুথির রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, শাস্ত্রী উহার লিপিকাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ স্থির করেন, বাগচী বহু প্রমাণ দিয়া উহা একাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন (বাগচী—কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা, পৃ: ১-৫)।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে কৌলশাস্ত্রকে ‘শিবসম্মত’ বলা হইয়াছে এবং মৎস্যেশ্বরকে শিবাবতার বলা হইয়াছে।^১ এই পুথিতে গোরক্ষের উল্লেখ-মাত্র নাই।

বাগচী বলেন কৌলজ্ঞান পুথির লিপিকাল একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহে, এবং ইহা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে মৎস্যেশ্বরকে তাহার একশত বৎসর পূর্বের বলিতে হয়। পুথিতে মৎস্যেশ্বর শিবাবতার বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় (“অহং সো ধীবরো দেবি,” ভৈরব দেবীকে এই কথা কৌলজ্ঞান পুথিতে বলিতেছেন), মৎস্যেশ্বর তাহার একশত বা ততোহধিক বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন অনুমিত হয়, কারণ অবতাররূপে গণ্য হওয়া সময়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত অভিনব তাঁহার তন্ত্রালোকে (১১শ শতাব্দীর প্রথমে) মৎস্যেশ্বর গুরুকে নমস্কার জানাইয়াছেন, তাহাতেও মৎস্যেশ্বরকে ‘শিবসমান’ বলা হইয়াছে। অতএব মৎস্যেশ্বর তাহার এক বৎসর পূর্বের লোক, অর্থাৎ আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দের, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে (বাগচী, পৃ: ২৬)। অবশ্য অভিনবের নমস্কার গুরু দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত, তবে দশম শতাব্দীর না হইতেও পারেন। তন্ত্রালোকের প্রমাণ দ্বারা এবং মৎস্যেশ্বর জীবিতকালেই পূজা পাইয়া থাকিলে, তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীর বলা চলে। এই পুথিতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই।

এই প্রসঙ্গে পাণ্ডে-রচিত ‘অভিনব গুপ্ত’ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। পাণ্ডে বহু আলোচনা দ্বারা অভিনবের জন্মকাল ২৫০-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থির করিয়াছেন।^১ অভিনব স্বরচিত গ্রন্থাদিতে লিপিকাল-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারাই পাণ্ডে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কাশ্মীরের লেখকরা সপ্তর্ষি অক্ষ ব্যবহার করেন, ইহা কলিযুগের ২৫ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। তদ্বালোকের কোন সঠিক লিপিকালের উল্লেখ পাণ্ডে করেন নাই। ক্রমস্তোত্র, বৃহতী বিমর্শিনী, ভৈরব-স্তোত্রের কাল অভিনব স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ও একাদশের প্রথম পাদে পুথিগুলি রচিত হয়।^২

অভিনবের প্রপরম গুরু শিবদৃষ্টি-রচয়িতা সোমানন্দ পরম্পরাক্রমে মৎস্তেন্দ্রের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি অদ্বৈত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ত্র্যম্বকের, ঊনবিংশতি বংশধররূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ত্র্যম্বক, অমরদক ও শ্রীনাথের দ্বারা শৈবাগম-সম্প্রদায়ের তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদের নামেই পরিচিত হয়। ত্র্যম্বক-কন্যার বংশ দ্বারা কামরূপে চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মীন বা মচ্ছেন্দ্রবিভু। এই চতুর্থ শাখার নামান্তর ‘অর্দ্ধ-ত্র্যম্বক’ শাখা এবং কামরূপ পীঠ (‘অর্দ্ধ-ত্র্যম্বক পীঠ’) নামে পরিচিত। তদ্বালোকের ভাষায় ইহার উল্লেখ আছে, যথা—

ভৈরব্য-ভৈরব্যাত্ প্রাপ্তং যোগং বাপং ততঃ প্রিয়ে।

তৎসকাশান্তু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে।

কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছেন্দ্রেন মহাম্বনা ॥ (১২৪ ভাষ্য)

তদ্বালোকের প্রথম আহ্নিকে যে স্থলে মচ্ছেন্দ্র বিভুকে নমস্কার জানান হইয়াছে, তাহার ভাষায় মচ্ছেন্দ্রকে তুর্য্যনাথ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ‘তুর্য্য’ বা চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

তদ্বালোকে অভিনব তন্ত্র ও কুল উভয় মার্গের আলোচনা করিয়াছেন এবং উভয় মার্গের গুরুকেই নমস্কার জানাইয়াছেন। কৌলমার্গে শম্ভুনাথ তাঁহার গুরু ছিলেন, তাই তাঁহাকেও তিনি নমস্কার জানাইয়াছেন (তদ্বালোক ১।৩১), জালন্ধরে গিয়া অভিনব শম্ভুনাথের

১। অভিনব গুপ্ত—পাণ্ডে (১৯৩৫), পৃঃ ৬, ৭, ৮।

২। Geschichte der Indischen Litteratur—M. Winternitz (1922)—p. 19.

নিকট কৌলিকমার্গ শিক্ষা করেন ও আত্মজ্ঞান লাভ করেন। কুলমার্গ, অর্দ্ধ-ব্রাহ্মক-মথিকা প্রভৃতি একই শাখার বিভিন্ন নাম।

পাণ্ডে সোমানন্দকে অভিনবের প্রপরম গুরুরূপে নবম শতাব্দীর ধার্য্য করিয়া সেই হিসাব-অনুসারে ১৯ পুরুষ পূর্বের ব্রাহ্মককে ৪র্থ শতাব্দীর বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা মৎস্যেন্দ্রের কালনির্ণয়ের কোন সহায়তা হয় না। পাণ্ডপত, কৌল সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতিপত্তি-বিস্তার সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে নহে, অর্থাৎ গুপ্তবংশের পরে, পূর্বে নহে। ইহার আলোচনা পরে করা হইতেছে।

তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত কালিদাসের ‘মঙ্গলশতকে’ মৎস্যেন্দ্রের উল্লেখ থাকিলেও এই পুথি-রচয়িতা যে শকুন্তলা-কাব্যলেখক নহেন ইহা নিশ্চিত।

অতএব এক্ষেত্রে বলা যায়, সোমানন্দ ব্রাহ্মকের যথার্থই ঊনবিংশতিতম বংশধর ছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ কালপ্রভাবে ভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নহে। উপরন্তু গুরুক্রমে ২৫ বৎসরের কম ব্যবধানও দুই গুরুর মধ্যে ধরা যাইতে পারে, যথা জ্ঞানেশ্বরের গুরু তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিরুত্তিনাথ মাত্র দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। একশত বৎসরের মধ্যে ছয়জন গুরু ধার্য্য করিলে ব্রাহ্মকের কাল ৭ম শতাব্দী হয় এবং মৎস্যেন্দ্রকেও ঐ শতাব্দীর বলা চলে। তাহা হইলে লেভি আদির সহিত কাল মিলিলেও প্রচলিত কাহিনী, গাথা, গিরিলিপি প্রভৃতির বিচার দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা চলে না। তুকারাম-শিষ্যা বহীনা বাদ্রিও এইরূপ দীর্ঘ একটি তালিকা দ্বারা তাঁহার গুরুপরম্পরার উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য বহীনা বাদ্রি সপ্তদশ শতাব্দীর, তাঁহার কালও জানা যায় (১৬২৮-১৭০০ খৃঃ) ; তাঁহার গুরুপরম্পরা-মধ্যে :

আদিনাথ

পার্বতী (মৎস্যরূপী মৎস্যেন্দ্রের শ্রবণ)

গোরক্ষনাথ

গৈনানাথ

নিরুত্তিনাথ (বালক যোগী)

ধ্যানেশ্বর (না জ্ঞানদেব ?)

সক্তিদানন্দ

ইহার পরবর্তী কালে

বিশ্বম্ভর বা কৃষ্ণচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৫৩)

রাঘব চৈতন্য

কেশব চৈতন্য

বাবাজী চৈতন্য

তুকা বা তুকারাম (১৬০৮-১৬৪৯ খৃঃ)

বহীনা বাঈ (১৬২৮-১৭০০ খৃঃ) ।^১

কবীর চৌরাসী সিদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন (কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিণী সংস্করণ, পৃ ৫৪, ৯৯, ১৮৯ ইত্যাদি) এবং গোরক্ষ, ভর্তৃহরি, গোপীচাঁদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। গোরক্ষাদির উল্লেখ কবীরের ‘শব্দ’তেও আছে—‘কেতে মুনিজন গোরক্ষ কহিয়ে তিনভী অস্ত ন পায়’ (১৮৮) ‘সিদ্ধ অনন্ত বহিখোজ পরহৈ’ (১৮৬) (বীজক রীবা সংস্করণ ; বঙ্গই, ১৯৬১ সম্বৎ) । এই গ্রন্থের সাথীতে (৪২ নং, পৃ ৫৪৫) ‘গোরখ রসিয়া যোগকে’ ইত্যাদি আছে। এইরূপ বহু স্থলে কবীর গোরক্ষ, ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদের উল্লেখ করায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কবীরের সহিত গোরক্ষের মিলন ও যোগ-সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ হইয়াছিল। ইহাঙ্গ মূলে সত্য থাকিতে পারে না, কারণ কবীর চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, অতএব এই মিলন আধ্যাত্মিকরূপে ব্যতীত সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

এখন গোরক্ষনাথকে যাহারা দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন তাঁহাদের যুক্তির অবতারণা করিব। ভাণ্ডারকার এবং চট্টোপাধ্যায় মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের (ইহার রচনাকাল ১২৯০ খৃঃ) শিষ্যপরম্পরার উল্লেখ হইতে সাধারণ নিয়ম অনুসারে হিসাব করিয়া গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর সিদ্ধ বলিয়াছেন। এই হিসাবে গোরক্ষের গুরু মৎসেন্দ্রকেও দ্বাদশ শতাব্দীর বলিতে হয়। রাণাডের মহারাষ্ট্র-রহস্যবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে ও দেহান্ত হয় ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে। জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্তিনাথ, তিনি জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং বালক বয়সেই গৈনীনাথ হইতে দীক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানেশ্বরীতে যে গুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ :

১। ত্রীগম, পৃ ৭০ ; বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২২ তুলনীয়।

শঙ্কর

পার্ব্বতী (মৎস্যেন্দ্রের শ্রবণ)

মৎস্যেন্দ্রের সহিত মণ্ডুশ্রী পর্বতে বিকলাঙ্গ চৌরঙ্গীর মাফাৎ
এবং তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ করা,

গোরক্ষনাথ

গৈনীন্যাথ

নিবৃত্তিন্যাথ

জ্ঞানদেব (১২৭৫—১২৯৬ খৃঃ) ।^১

জ্ঞানদেব বা শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ-রচিত গীতা-ভাষ্যের নাম
'ভাবার্থ-দীপিকা' বা 'জ্ঞানেশ্বরী' । ইহার রচনা-কাল যে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ তাহা
একপ্রকার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে ১২১২
শকে জ্ঞানদেব ইহা রচনা করেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন ।

রাণাডের মহারাষ্ট্র-রহস্যবাদের মধ্যে নামদেবের দাসী জনাবাঈ-
এর উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহার অভঙ্গীতে নিবৃত্তির জন্ম ১২৬৮ খৃঃ, জ্ঞান-
দেবের জন্ম ১২৭১ খৃঃ, সোপানদেবের ১২৭৪ খৃঃ ও মুক্তা বাঈয়ের ১২৭৭ খৃঃ
বলিয়াছেন ।^২

জ্ঞানদেব মহারাষ্ট্র প্রদেশের সুবিখ্যাত কবি ও রহস্যবাদী । দাস্তে বা
সেন্ট জন অফ দি ক্রসের সহিত ইহার তুলনা করিলেও অত্যায়া হয় না ।^৩
অতএব জ্ঞানদেবের কাল ও তাঁহার রচিত জ্ঞানেশ্বরী লইয়া অনেকেই
আলোচনা করিয়াছিলেন । পণ্ডিত রঘুনাথ মাধব ভাগবতের মতে
জ্ঞানদেবের জন্ম হয় ১১৯৭ শক বা ১৩৩২ সম্বতে, নিবৃত্তিন্যাথের জন্ম হয়
১১৯৫ শকে । ইহাদের পিতা সম্যাস-গ্রহণের পর গুরু রামানন্দের আদেশে
(কারণ গুরু তদীয় পত্নীকে পুত্রবতী হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিয়া-
ছিলেন) পুনরায় গৃহী হওয়ায় সমাজচ্যুত হন । চারিটি পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ
করিবার পর হুঃখে স্বামীপ্রী তাঁহাদের গৃহী-দেহ ত্রিবেণীতে অর্পণ করিয়া

১ । জ্ঞানেশ্বরী ১৮।১৭৪২-৪৩

Mysticism in Maharashtra, p. 31. Hist. of Ind. Phil., Vol. VII, p. 31 (1933).

Or. & Dev. of the Beng. Lang—S. Chatterji, p. 122.

An Outline of the History and Teachings of the Nath Panthiya Siddhas.

Third. Ort. Con. Pro. p. 495 Con. Pro. p. 495.

২ । Mysticism in Maharashtra, p. 190.

৩ । Ibid., Intro., p. 3.

পুনরায় সম্মানসন্ধান। ইহার পূর্বেই নিবৃত্তিনাথের পর্বতগুহায় গৈলীনাথ-দর্শন ও দীক্ষালাভ ঘটে। জ্ঞানদেব উপনয়নার্থে আগ্রহ প্রকাশ করিলে সমাজচ্যুত বালককে কেহ উপনয়ন দিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন জন্মস্থান আলন্দী হইতে ভ্রাতারা ভগ্নীসহ পৈঠান গমন করেন, সেখানে জ্ঞানদেব মহিষের মুখে বেদোচ্চারণ প্রভৃতি সিদ্ধি দেখাইয়া পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ করেন ও অবতাররূপে গণ্য হন। তখন আলন্দীতে ফিরিয়া জ্ঞানদেব ১২১২ শকে মহারাষ্ট্র-ভাষায় ‘ভাবার্থ দীপিকা’ নামক গীতাভাষ্য রচনা করেন। ইহা প্রাচীন মহারাষ্ট্র-ভাষায় রচিত। ‘অমৃতানুভব’ গ্রন্থ ইহার পরে রচিত হয়; ১২১৮ শকে মাত্র ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্ঞানদেব সজ্জানে সমাধি-গ্রহণ করেন, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন। জ্ঞানদেব নিজের রচনাতেই ২১ বৎসর বয়সে সমাধি-গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।^১ নামদেব, বিশোবা, জনাবাদি প্রভৃতি সকলের অভঙ্গীতেই জ্ঞানদেবের ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সমাধি-গ্রহণ করার কথা আছে। সেক্ষেত্রে তাঁহার জন্ম ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে ধরিতে হয়।

জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল ও জ্ঞানেশ্বরের জন্ম ও সমাধিকাল স্থির হইল বটে, ইহা হইতে জ্ঞানদেবের প্রায়শঃ গুরু গোরক্ষের সময় নির্দ্ধারিত হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু এই গুরুপরম্পরা যে নিভুল একথা বলা কঠিন। বাগচী বলেন, গোরক্ষ বা মৎস্তেন্দ্রের মহারাষ্ট্র-দেশের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, অতএব তাঁহারা পাঞ্জাব, গুজরাট, নেপাল প্রভৃতি দেশের সহিত যেরূপ আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত ছিলেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্র-দেশের সহিত যুক্ত ছিলেন, অতএব মহারাষ্ট্র-প্রবাদ আক্ষরিকভাবে নির্ভর-যোগ্য নহে।^২

আমাদের মনে হয় গুরুপরম্পরায় ছেদ থাকা অসম্ভব নহে, এবং গোরক্ষের পরবর্তী কালে কোন গুরুর মহারাষ্ট্র-দেশে গমন ও নাথধর্ম প্রচার করা অসম্ভব নহে। কারণ নাথ যোগীদের ভারতের সর্বত্র গতিবিধি ছিল এবং গোরক্ষের শিষ্য (মতাস্তুরের সতীর্থ) ধরমনাথ কচ্ছ-প্রদেশে মঠ স্থাপনা করেন। ধীনোদরের মঠ অত্য়াপি প্রসিদ্ধ। তিনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছ-প্রদেশে গমন করেন।

১। জ্ঞানেশ্বরী (১৯৩৩, সংশোধিত ২য় সং, এলাহাবাদ), ভূমিকা ৩৫৮।

২। বাগচী—ভূমিকা, পৃ ২৫, ২৬

ধরমনাথের শিষ্য দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বা ত্রয়োদশের প্রথমে জাঠদিগকে দূরীভূত করিয়া রায়ধনকে বরার রাজসিংহাসনে স্থাপিত করেন।^১ থকুর-প্রকাশিত প্রবন্ধে ধরমনাথের শিষ্যপরম্পরায় একশিষ্য ভিখারীনাথের ১৫৪৫ সম্বৎ ও তৎপরবর্তী শিষ্য প্রভাতনাথের ১৬৬৫ সম্বৎ লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১২০ বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে, অবশ্য সিদ্ধগণ দীর্ঘজীবী হইতেন ইহা সর্ববাদি সম্মত।^২

জ্ঞানেশ্বরের জন্মকাল ১২৭৩ খৃষ্টাব্দ

নিবৃত্তির „ ১২৭৫ খৃষ্টাব্দ

গৈনীনাথের „ ১২৭৫ - ১০০ = ১১৭৫ খৃষ্টাব্দ

গোরক্ষের „ ১১৭৫ - ১০০ = ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ

মৎস্যেন্দ্রের „ ১০৭৫ - ১০০ = ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ

থকুরের হিসাবানুসারে ১২০ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধান না ধরিয়া সিদ্ধেরা দীর্ঘজীবী হইতেন এই অনুমানে যদি ১০০ বৎসরের ব্যবধান গুরু-শিষ্য-মধ্যে ধরা যায় (কেবল নিবৃত্তি ২ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত), তাহা হইলে গোরক্ষের জন্মকাল আনুমানিক ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ ও মৎস্যেন্দ্রের জন্মকাল আনুমানিক ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে ‘কৌলজ্ঞান’ পুথির রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর সহিতও সামঞ্জস্য থাকে এবং তদ্বালোক-রচনাকালে অভিনবের পক্ষেও মচ্ছেন্দ্রবিভূকে নমস্কার জানান অসম্ভব হয় না। অতএব আমাদের অনুমানে মৎস্যেন্দ্র দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ দশমের শেষভাগের বা একাদশের প্রথমের। জ্ঞানেশ্বরীর গুরুপরম্পরা অনুসারে প্রচলিত ব্যবধান ধরিয়া গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর ধরিলে অস্বাভাবিক প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটে।

রসরত্নসমুচ্চয় নামক কবিরাজী রাসায়নিক গ্রন্থে নিত্যানাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে, গ্রন্থকর্তা নিজেকে বাগ্‌ভট বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তদনুসারে গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্ব বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিপন্ন

১। গোপীচন্দ্রের গান (২য় খণ্ড)—ভূমিকা, পৃ ১৪

২। ঐ „ পৃ ১৪ থকুরের গ্রন্থের নাম—কসে কানকাটারের ইতিহাস—L. A., Vol. VII, p. 49

করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ অষ্টাদশসদয়-প্রণেতা বাগভট্টের লেখনী-প্রসূত হইতে পারে না, ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ।^১

শব্দপ্রদীপ-রচয়িতা রাজবৈজ্ঞান্য সুরেশ্বর স্বীয় পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা ভদ্রেস্বর রাজা রামপালের প্রধান চিকিৎসক এবং ভদ্রেস্বরের পিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় 'বৈজ্ঞান্যগণাগ্রন্থী' ছিলেন। শব্দপ্রদীপের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও রাজেন্দ্রচোলের গোবিন্দচন্দ্র অভিন্ন হইলে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোপীচন্দ্রের আবির্ভাব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই গোবিন্দচন্দ্র কে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই।^২

গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্যা এবং হাড়িপা বা জালন্ধরি ময়নামতীর গুরুভ্রাতা—এ প্রবাদ বঙ্গদেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া যোগীদের গাথার মধ্য দিয়া বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। গোরক্ষ ময়নামতী ও তাঁহার স্বামী মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক হইলে, তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীর বলিতে হয়। গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম।

গোপীচন্দ্র ঢাকার অন্তঃপাতী সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের জামাতা ছিলেন কি না তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। ভট্টশালী-সম্পাদিত 'ময়নামতীর গানে' আভাস পাওয়া যায় যে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল তদীয় এক কন্যাকে গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরূপে অর্পণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন।^৩ তবে হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অহুনাই প্রধানা মহিষী ছিলেন; গ্রীয়াসর্ন প্রভৃতি সংগৃহীত বঙ্গীয় গাথায় গোপীচন্দ্রের সম্যাস উপলক্ষে অহুনার বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তিরুমলায়ে উৎকীর্ণ গিরিলিপি হইতে রাজেন্দ্রচোলের হস্তে গোপীচন্দ্রের পরাজয়-কাহিনী আছে; এই লিপি ১০১২ খৃষ্টাব্দের (মতান্তরে ১০২৫ খৃঃ)। (গোপীচন্দ্রের কাল-নির্ণয় অশ্রুত করা হইয়াছে) গোপীচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্রকে ধর্মপালের ভ্রাতা বলা হয় এবং পালবংশীয় রাজা দেবপালের সময়ে গোরক্ষের আবির্ভাব হয় এরূপ মতও প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্তমান জ্ঞানে মাণিকচাঁদের যে সময় নির্ধারণ করা হইতেছে (খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) তাহা

১। গোপীচন্দ্রের গান (২য় খণ্ড), ভূমিকা, পৃ ১৩

২। পৃ ১২

৩। ময়নামতীর গান—দীনেশ সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখ, পৃ ৫৬ (৫ম সং.)

পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা ধর্মপালের বহু পরবর্তী। মাণিকচন্দ্রের সহিত ধর্মপালের কোনরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন (হামিল্টন, গ্রীয়ার্সন, গ্লোজিয়ার প্রভৃতি এই মতের প্রবর্তক) প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া স্থাপিত। গ্রীয়ার্সন তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি বলিয়াছেন, কিন্তু এই বিশ্বাসের উপযুক্ত কোন কারণ নাই।^১ গোপীচন্দ্রকে মহীপালের সমসাময়িক বলা হয় (৯৭৮-১০৩০ খৃঃ); ইহা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। (শাস্ত্রীর উল্লেখ, ব্রীগ্‌স, পৃ ২৪৫।) কারণ রাজেন্দ্র চোল দ্বারা উভয়েই পরাজিত হন।

কোন কোন তন্ত্রে মৎস্যেন্দ্রাদির উল্লেখ আছে, শক্তিরত্নাকর-তন্ত্রে মীননাথের নাম আছে, শাবর-তন্ত্রে দ্বাদশ কাপালিক গুরু ও দ্বাদশ শিষ্যের নাম আছে, শিষ্টমধ্যে মীননাথ, গোরক্ষ ও চর্পটীর নাম পাওয়া যায়।^২ চক্রসম্ভার-তন্ত্রের গুরুপরম্পরায় জালন্ধরিপা, কৃষ্ণ, গুহা, বিজয়পা, তিলোপা ও নারোপার নাম পাওয়া যায়। তিলোপা-শিষ্য বিক্রমশীলার বিহারের অধ্যক্ষ নারোপা, দীপঙ্করের গুরু ছিলেন। তিলোপা যে মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন সে সম্বন্ধে সকল তিব্বতী সূত্রই একমত, মহীপালের সময় আনুমানিক ৯৭৮-১০৩০ খৃ। দীপঙ্কর খ্রীজ্ঞান ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৫ বা ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যান তাহাও জানা আছে, অতএব দীপঙ্কর-গুরু নারোপা দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সিদ্ধপুরুষ। জালন্ধরি ও তিলোপার মধ্যে তিনটি নাম পাওয়া যায়; বাগচী বলেন সে ক্ষেত্রে মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষও ৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের হইতে পারেন না।^৩

আদিসিদ্ধাচার্য লুইপার কাল বাংলাপদ হইতে নবম শতাব্দী ধাৰ্য্য করা হইয়াছে, লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে সিদ্ধাচার্য ও সহজিয়া গান রচনা করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের এ কথা জানাইয়াছেন।^৪

লুইপা চর্পটী ও নাগার্জুনের সমসাময়িক এ প্রসিদ্ধিও আছে, তুচী চর্পটীর কাল দশম শতাব্দী স্থির করিয়াছেন, আলবেরুণী রসায়নাচার্য নাগার্জুনকে দশম শতাব্দীর বলিয়াছেন, লুইপা ও মৎস্যেন্দ্র অভিন্ন হইলে মৎস্যেন্দ্রকেও দশম শতাব্দীর বলিতে হয়। (দশম শতাব্দীর শেষে লুইপা

১। গোপীচন্দ্রের গান (২য়), পৃ ৩১, ৩২

২। কৌলজ্ঞান নির্ণয়-ভূমিকা, বাগচী, পৃ ১২

৩। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৭। বৌদ্ধগান ও মোহা, শাস্ত্রী-সম্পাদিত, পৃ ২২।

৪। বৌদ্ধগান ও মোহা, শাস্ত্রী, পৃ: ১০।

দীপঙ্করকে ‘অভিসময়বিভঙ্গ’ নামক পুঁথি মুখে মুখে ব্যাখ্যা করেন (সং, অবতারিত) এবং দীপঙ্কর তাহা লিপিবদ্ধ করেন, পুঁথির ভণিতায় যুগ্ম নাম দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয়। অতএব লুইপা-মৎশ্বেন্দ্র দীপঙ্কর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও দশম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বা একাদশের প্রথমে বর্তমান ছিলেন বলা যায়। শহীদুল্লাহ্, তারানাথ ও লেভির উপর নির্ভর করিয়া লুইপাকে সপ্তম শতাব্দীর বলিয়াছেন।^১

হঠযোগপ্রদীপিকায় (৪।১) মৎশ্বেন্দ্রাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থটি অপ্রাচীন হওয়ায় তাহার সিদ্ধ-তালিকা (১।৫-৮) নির্ভরযোগ্য নহে। এই তালিকা অনুসারে মৎশ্বেন্দ্র ও মীননাথ ভিন্ন ব্যক্তি। চতুর্দশ শতাব্দীর মিথিলা-রাজকবি জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণ (ন) রত্নাকরে ৮৪ সিদ্ধের তালিকা আছে, তন্মধ্যে প্রথমেই মীন, গোরক্ষ, চৌরঙ্গীর নাম আছে, তৎপরে ষষ্ঠ স্থান হাড়িপার ও উনবিংশ স্থান জালন্ধরের।^২

আবার ভোটিয়া গ্রন্থমতে জালন্ধরই আদিনাথ, তিনি ঘণ্টাপাদের প্রশিষ্য এবং মৎশ্বেন্দ্র, কাহুপা ও তাতিপার গুরু, গোরক্ষ জালন্ধরের প্রশিষ্য।^৩

নবনাথের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা দ্বারাও সময়-নির্ণয় সম্ভবপর নহে। “গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে”র তালিকায় আদিনাথ, মৎশ্বেন্দ্র ও গোরক্ষের নাম আছে।^৪

শাস্ত্রী মহাশয় “বেণের মেয়ে”-রচনাকালে রাজগুরু লুইপার কাল আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ ধার্য্য করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। যোগী-সম্প্রদায়ের নানা কথা এই গ্রন্থে আছে।^৫

লুইপা ওড়িয়ানের রাজকর্মচারী ছিলেন, তাহার পূর্বনাম সামন্তশম্ভু ছিল এবং তিনি শবরীর নিকট তত্ত্বে দীক্ষা লন, একটা তিব্বতী গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে। (এই গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা প্রভৃতির জ্ঞান বাগচীর ভূমিকা, পৃ ২৩ অষ্টব্য।) চৌরাশী সিদ্ধের ইতিহাসে লুইপার জন্ম ওড়িয়ানে বলা হইয়াছে। তখন ওড়িয়ানের রাজা ছিলেন

১। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪১ ও ফুটনোট। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৮। বৌদ্ধ গান ও মোহা, পৃ ২১।

২। বৌদ্ধগান ও মোহা পৃ: ৩৫, ৩৬। 4th, Ort Confer : S. Chatterji's বর্ণিতাকর।

৩। গঙ্গা, পৃ ২৫২, জালন্ধরনাথ

৪। গো সি. স. পৃ ৪০

৫। বেণের মেয়ে, ১ম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকৃতি।^১ ওড়িয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল ইহা দাসগুপ্ত প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।^২

আবার লুইপাকে ধর্মপালের কায়স্থ বা লেখক বলা হইয়াছে, ধর্মপালের কাল আনুমানিক ৭৯৬-৮০৯ খৃষ্টাব্দ। শবরপা ধর্মপালের রাজ্যে আগমন করিলে লুইপা তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, দ্বারিকপা ও ঢেঁটীপা লুইপার শিষ্য। বস্তুতঃ লুইপা আদিসিদ্ধাচার্য্য নহেন, তাঁহার অত্যধিক প্রভাববশতঃ তিনি আদি বা প্রথম বলিয়া গণ্য হন। লুইপার রচিত পাঁচখানি গ্রন্থ আছে।^৩

মীননাথ মংশোল্লের পূর্বপুরুষরূপে বর্ণিত হন, তাঁহার রচিত বাংলা পদ আছে। মীনপাদের রচিত 'বোধিচিত্ত' নামক পুথি আছে।^৪

দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ অনুযায়ী গোরক্ষাদি দশম শতাব্দীর শেষপাদ বা একাদশের প্রথমপাদের সিদ্ধ। দে ও বাগচী এই মত সমর্থন করিয়াছেন।^৫ অভিসময়বিভঙ্গের ভণিতা হইতেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়, তত্ত্বালোক অনুসারেও মংশোল্ল একাদশ শতাব্দীর পূর্বের।

কুমিল্লায় চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, ময়নামতী প্রভৃতির নামে পাহাড় ও মন্দির আছে, ইহাদের 'নাথ'-পূজারী আছে। অতএব ইহা দ্বারাও নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্র-বংশের সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, প্রথম রাজেন্দ্র চোল দেবের রাজত্বকাল ১০৩৫ খৃ পর্য্যন্ত। তিনি ১০২৩ খৃ বঙ্গদেশে অভিযান করেন এবং বঙ্গবিহারাদিপতি মহীপালকে পরাজিত করেন। রাজেন্দ্র চোল জয়ী হইয়া 'গঙ্গাইকোণ্ডা' উপাধি গ্রহণ করেন। পালবংশের ইতিহাস অনুসারে—

প্রথম রাজা গোপাল (আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৯৬—৮০৯ খৃষ্টাব্দ)

তৃতীয় রাজা দেবপাল (নবম শতাব্দীর)

১। কদলী রাজা, পৃ ১১

২। I. H. Q. XI, p. 192. N. Das Gupta's article.

৩। গঙ্গা, পৃ ২৪৮

৪। বঙ্গদেশের ইতিহাস (দেব প্রবন্ধ), পৃ : ৩৪৩ ; বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ ২৩

৫। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪১, Ref. B. A Saletore.

ইহার ভগিনী ময়না ধর্মপূজায় রামাই পণ্ডিতকে সাহায্য করেন।

নবম রাজা মহীপাল (৯৭৮—১০৩০ খৃষ্টাব্দ)

রাজেন্দ্র চোল ইহার রাজ্য আক্রমণ করেন।

নয়াপালের রাজত্বকালে ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ অতীশা তিব্বতে যান।^১

তান্ত্রিক আচার খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যম অষ্টম শতাব্দীতে উদ্দাম আকার ধারণ করে (৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউএনৎস্যাং বোধিসত্ত্বের মূর্তির সহিত শক্তিমূর্তি দেখেন, লামাদর্শন, ওয়াডেল, পৃ ১২৮) এবং নবম দশম শতাব্দীতে চরম সীমায় উপনীত হয়। রাজশেখরের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে ‘কৌল-প্রথা’ লোকপ্রিয় ছিল। সমগ্র “কপূরমঞ্জরী” গ্রন্থে কৌল বা ভৈরবানন্দের নিন্দাবাদক একটিও শব্দ নাই, আধুনিক পাঠকের নিকট কৌলের বর্ণনা অরুচিকর হইলেও, তান্ত্রিক গ্রন্থাদি হইতে বর্ণনার সত্যতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভৈরবচক্রে কৌলেরা শক্তির পূজার নিমিত্ত একত্র হইতেন, ইহাতে সর্বশ্রেণীর প্রবেশাধিকার ছিল। সর্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও ইহাতে যোগদান করিত। ইহাদের ‘কৌলাঙ্গনা’ আখ্যা দেওয়া হইত।^২

গৃহসমাজ-নামক বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেক বা দীক্ষার্থীকে প্রজ্ঞা বা শক্তির সহিত যুক্ত করিবার প্রথার বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর। বৈষ্ণব, শূদ্র, রজক প্রভৃতি শ্রেণীর কণ্ঠারাই শক্তি হইত।

সাধকদের মধ্যে সর্বপ্রকার মাংস আহারে বিধি ছিল। সমাজের কোন নিয়ম মান্য করিতে তাহারা বাধ্য ছিল না। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, আকর্ষণ, শাস্ত্রিক ইত্যাদি বিষয়ও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শত্রুনাশ, বৃষ্টিপাত, সর্পবিষ হইতে মনুষ্যকে পুনর্জীবিত করা প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে।^৩

‘মালবিকাগ্নিমিত্রের’ চতুর্থ দৃশ্বে সর্পবিজ্ঞার উল্লেখ আছে, অথর্ব বেদের সময় হইতেই সর্পবিজ্ঞা, যাহুবিজ্ঞা বা মায়া ইত্যাদি প্রচলিত। বাণের ‘হর্ষচরিতের’ অষ্টম গ্রন্থে দেখা যায় যে একাবলী-সাহায্যে বাণ

১। The Oxford History of India, V. Smith, pp. 211, 186 (1923)

২। Magic and Miracle, K. Mitra pp. 34, 35.

৩। Magic & Miracle, K. Mitra, pp. 35, 86.

বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা পান এবং সকল প্রকার কার্যে সাফল্য লাভ করেন। ‘মৃচ্ছকটিক’ নাটকে যোগরোচনা নামক মায়াময় প্রলেপ ব্যবহারে অদৃশ্য হইবার কথা আছে। পালি গ্রন্থাদিতেও এই বিজ্ঞার উল্লেখ আছে। ইচ্ছামত রূপ-ধারণ, আকাশমার্গে গমন ইত্যাদি বিভূতি জৈন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব পিণ্ডোলা ভরদ্বাজকে আকাশমার্গে গমনের জ্ঞান তিরস্কার করেন। কিন্তু জৈনগ্রন্থে আকাশমার্গে গমন করিয়া নিত্য পঞ্চতীর্থ-দর্শনের বৃত্তান্ত আছে।

‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকে কাপালিক-বর্ণনা আছে, ইহা একাদশ শতাব্দীতে রচিত। ভবভূতির ‘মালতীমাধব’ অষ্টম শতাব্দীর, ইহাতেও কাপালিক-বৃত্তান্ত আছে। বাণের ‘হর্ষচরিত’ সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হয়, হর্ষ পাণ্ডপত ছিলেন, গ্রন্থেও যাহুবিজ্ঞার কথা আছে। অতএব কাপালিক পাণ্ডপত আদি সম্প্রদায় গুপ্তবংশের পরে অর্থাৎ সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে প্রতিপত্তি লাভ করে নাই, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র, মীননাথ ভিন্ন না অভিন্ন ?

লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র ও মীননাথ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে বিদ্বৎকূলে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে।

মীননাথ, মৎস্যেন্দ্র

এখানে এই দুই জনের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব। বঙ্গদেশের প্রচলিত মতানুসারে মীননাথ পুত্র, মৎস্যেন্দ্র তাঁহার পিতা, আবার তিব্বতীমতে মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পিতা।^১ অথবা পূর্ব পুরুষ।^২ বাগচী দেখাইয়াছেন যে কোলজ্ঞাননির্ণয় পুথির মধ্যবর্তী অধ্যায়ের ভণিতায় ‘মীননাথ’ এর নাম ও পুথির শেষ দিকের ভণিতায় ‘মৎস্যেন্দ্র’র নাম পাওয়া যায়, অতএব মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পুত্র হইতে পারেন না। তদ্ব্যতীত অকুলবীরতত্ত্ব পুথির এক খণ্ডের ভণিতায় ‘মীননাথে’র নাম এবং প্রায় অনুরূপ আর একখণ্ড অকুলবীরতত্ত্বের ভণিতায় ‘মৎস্যেন্দ্র’র নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝা যায় যে পুথিদ্বয় রচিত হইবার কাল পর্য্যন্ত মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ এই উভয় নাম প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহৃত হইত, অতএব উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।^৩ তিব্বতে ও নেপালে মৎস্যেন্দ্র নাথধর্ম-প্রচারের সময়ে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন, ভারতবর্ষেও তাঁহার প্রতি দেবত্ব আরোপণ করিয়া তাঁহাকে শিবসদৃশ বলা হইয়াছে।^৪ নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ বৃগানের লোহিত অবলোকিতেশ্বর-রূপে পূজা পান। মীননাথ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা সান্ন মৎস্যেন্দ্রনাথ-রূপে পূজা পান। উভয়েই প্রায় তুল্য জাঁকজমক-সহকারে পূজা পাইয়া থাকেন। এই অনুসারে মৎস্যেন্দ্র ও মীননাথ ভিন্ন হইয়া পড়েন।^৫

আমাদের অনুমান হয় মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র অভিন্ন, কারণ তদ্ব্যলোক-ভাষ্যে আছে। (১/২৪)—“ভৈরব্যা ভৈরবাং প্রাপ্তং যোগং

১। গঙ্গা—পুরাতনাক, পৃ : ২৪৪।

২। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪০।

৩। বাগচী, ভূমিকা, পৃ. ৭, ৮।

৪। I. H. Q., 1930, pp. 178-81 Legend of Matsyendranath-Chakravarti.

৫। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ১২।

ব্যাপা ততঃ প্রিয়ে। তৎসকাশাতু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে।
কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছেন্দ্রেন মহাঋণা”—ইহা দ্বারা মীন ও মৎস্যেন্দ্র
এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। আবার তন্ত্রালোকে কোলদের কথা
আছে, মীন বা মচ্ছেন্দ্রবিভূ কামরূপে মহাপীঠে কোলমার্গের প্রতিষ্ঠা
করেন। কোলজ্ঞান পুথিতেও কোলদের কথা আছে, ভণিতায় ‘যোগিনী
কোলের মচ্ছেন্দ্রপাদ অবতারিত’ ইত্যাদি কথা আছে; অতএব মীননাথ
ও মৎস্যেন্দ্র যে অভিন্ন তাহা একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই বলা চলে।

লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র

এখন লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্র ভিন্ন না অভিন্ন তাহাই বিবেচ্য।
তিব্বতীমতে লুইপা ওড়িয়ান-বাসী ও ওড়িয়ান রাজার কর্মচারী ছিলেন,
শাবরীপা সে দেশে গমন করিলে, লুইপা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ
করেন এবং তদবধি তাঁহার পূর্ব নাম ‘সামন্তশোভা’ বা ‘সামন্তশম্ভু’ ত্যাগ
করেন। এই ওড়িয়ান গোহাটীর উত্তরে, আধুনিক হোজাই নামক স্থানে
এবং বঙ্গদেশের মধ্যেই ছিল বলিয়া দাসগুপ্ত স্থির করিয়াছেন।^১
লুইপাদ বাংলায় চর্যা ও গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতীদের মধ্যে ইনি
নিজ অসীম ক্ষমতা বলেই ‘আদিসিদ্ধ’ নাম অর্জন করিয়াছেন, বস্তুতঃ
তিনি ‘আদিসিদ্ধ’ নহেন।^২ তিব্বতীমতে শাবরীপা তাঁহার গুরু,
ভারতীয়মতে শাবরী মৎস্যেন্দ্রের পরবর্তী কালের সিদ্ধ।^৩ ভারতীয়-
মতে মৎস্যেন্দ্র আদিসিদ্ধরূপে বর্ণিত হন, তিব্বতে লুইপা সেই স্থান
গ্রহণ করায় ও উভয়েই জাতিতে কৈবর্ত বিবেচিত হওয়ায় ইহাদের
অভিন্ন বলিয়াই অনুমান হয়।

লুইপার নামান্তর লুইপাদ, লোহিপা, লোহিতপাদ প্রভৃতি।
কামরূপের প্রধান নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র বা ‘লোহিত’, তাই দেশের নাম
লোহিত্য এবং ঐ দেশবাসী বলিয়া মৎস্যেন্দ্রের নাম লুইপাদ বা লুইপা
হওয়া অসম্ভব নহে। তেদুরের ক্যাটালগে লুইকে বঙ্গবাসী বলা
হইয়াছে, তিব্বতী ‘গ্রাব ও টাব’ গ্রন্থে তাঁহাকে কামরূপের কৈবর্ত-সন্তান
বলা হইয়াছে।^৪

লুই অর্থে লোহিত বা রোহিত (রোহিত > লোহিত > লুই)

১। কদলীরাজা, পৃ ২৬, ৩১।

২। গঙ্গা পুরাতত্ত্ব পৃ ২৪৮।

৩। হযো-গ্র, ১৫, ১।

৪। কদলীরাজা, পৃ ১১।

অর্থাৎ মৎস্যদের রাজা হইতে পারে, মৎস্যেন্দ্র পদের অর্থও তাহাই।^১ লুইএর নামান্তর মৎস্যেন্দ্র, তাঁহার নামে রাঢ়দেশে পাঁঠা ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও ময়ূরভঞ্জে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।^২

মতান্তরে মীনপা আসামের কৈবর্ত ও লোহিত্য নদীতে মৎস্য ধরিতেন, ইহার পুত্র মৎস্যেন্দ্র ও শিষ্য গোরক্ষ। চর্পটী মীনপার গুরু ছিলেন, মীনপার বাংলা পদ আছে।

তিব্বতী ভাষায় লুই অর্থে মৎস্যোদর, ভারতীয়মতেও মৎস্যেন্দ্র মৎস্যোদর হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত। তিব্বতী কাহিনীমতে শিবই কোলাগম-প্রচারার্থ কৈবর্তরূপে মৎস্যোদরে আবির্ভূত হন এবং মীন, মচ্ছেন্দ্র, বজ্রপাদ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। তাঁহার মৎশীন্দ বা অতশীন্দ, অচ্ছেন্দ্র প্রভৃতি নামও প্রচলিত আছে। তিব্বতী চিত্রে মৎস্যেন্দ্র মৎস্য-পরিবৃত ও মৎস্য-অস্ত্র আহারে রত দেখা যায়। শাস্ত্রী ইহার সুন্দর চিত্র বর্ণন করিয়াছেন “রাজার গুরু মাছের আঁতড়ি খাইতে ভালবাসেন, পোটা ও তেল খাইতে ভালবাসেন। সুতরাং এত যে গাড়ী গাড়ী মাছ রাজ-বাড়ীতে গেল, সে মাছের দরকার থাক আর না থাক, মাছের তেল, আঁতড়ি ও পোটোর বেশী দরকার।” ইহা ১০০০ খৃষ্টাব্দের এক ভোজ-সভার বর্ণনা। তৎপরে লুইপার বর্ণনা আছে, যথা—লুইপার মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোপ কামান, পরণে আলখাল্লা, তাহার গায়ে ছোট লাল রংয়ের রেশমের ও পাটের বাকলের টুকরা লাগান।^৩

মীননাথের বাংলাপদ ও ‘বোধিচিত্ত’বিষয়ে পুথি আছে, মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র অভিন্ন। অতএব তিনি সহজসিদ্ধির প্রথম আচার্য্য। সহজসিদ্ধি মন্ত্রযান ও বজ্রযানের ব্যতিক্রম এবং ইহাই নাথপন্থের সূত্রপাত। লুইপার নামে বজ্রযানের পুথি আছে, মৎস্যেন্দ্রের নামে নাই। চন্দ্রদ্বীপের মৎস্যেন্দ্র কোল ছিলেন (যোগিনী কোল), তারানাথও বলেন লুইপা যোগিনী-পদ্ধতি প্রচলিত করেন, অতএব চন্দ্রদ্বীপের মৎস্যেন্দ্র ও লুইপা অভিন্ন ব্যক্তি এবং বাঙ্গালী।

হঠযোগের সহিতও যোগিনী-কোলমার্গীদের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল, কারণ মৎস্যেন্দ্রাসন প্রভৃতি হঠযোগ মার্গে আছে। কৃষ্ণানন্দের তত্ত্বসারে

১। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৪।

২। বোধগান ও মোহা, পৃ ১৫।

৩। বেণের মেয়ে, ১ম পরিচ্ছেদ, শাস্ত্রী।

মীননাথ ও মৎসেন্দ্রকে তারার পূজারী বলা হইয়াছে।^১ অতএব লুই, মীননাথ ও মৎসেন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

লুইপাদ ও মৎসেন্দ্রের ধর্মমত-বিচার

বাঙ্গালী বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যেরা অপভ্রংশে সাধন-ঘটিত যে সকল কবিতা বা পদ লিখিয়াছেন তাহা 'দোহা' নামে পরিচিত। এই দোহাগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ, ইহা শ্রীযুক্ত শুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার সাহায্যে নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই দোহাগুলি বিশেষ মাধুর্য্যমণ্ডিত ও ইহাদের বাহ্য অর্থ ব্যতীত গভীর অর্থও আছে, তবে বহুল প্রচারের ফলে পাঠান্তর ও পাঠ-বিকৃতি হইয়াছে মনে হয়। তথাপি যেটুকু বৃষ্টিতে পারা যায়, তাহার গভীর অর্থ সর্বত্র প্রকাশ করা নিরাপদ নহে, কারণ ইহা সাধন-সঙ্কেত ছোতনা করে। ধর্মই সাহিত্যের আদি উপজীব্য, পদকর্তারা জন-সাধারণের জ্ঞান সহজবোধ্য ভাষায় পদ রচনা করেন, এইরূপে তান্ত্রিক বজ্রাচার্য্য ও শৈব নাথ্যচার্য্যদিগের হস্তে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন হইল।^২

পদকর্তারা 'সিদ্ধাচার্য্য' নামে খ্যাত ছিলেন, ইহাদের আবির্ভাব-কাল লইয়া অত্য়পি যথেষ্ট মতভেদ আছে, শহীদুল্লাহ্-এর মতে প্রাচীনতর সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদাদি খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর, বাগচী ও চট্টোপাধ্যায়ের মতে তাহাদের আবির্ভাব-কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে।

চর্যাপদগুলির সমসাময়িক বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্র পাওয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে 'মৎসাবতার-বন্দনা' মূলে প্রাচীন বাঙ্গলায় রচিত ছিল বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন। এই বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্র 'মানসোল্লাস' নামক যে গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ১০৫১ শকাব্দে অর্থাৎ ১২২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে রচিত হয়। ভাষা মূলতঃ বাঙ্গলা হইলেও, যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছে।^৩

নেপালে চর্যাপদের পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেন। ইহার প্রথম পুঁথি 'চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়ে'র ভাষা বাঙ্গলা, অপরগুলি

১। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪১-৪৪। ২। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, হুমুয়ার সেন, পৃ ৩৫।

৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, হুমুয়ার সেন, পৃ ৩৫, ৩৬।

অপভ্রংশে রচিত। চর্যাচর্যাবিনিশ্চয় চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে অনুলিখিত বলিয়া অনুমান হয়। টীকাকার লুইপাদকে পদকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যদিও টীকা-রচনার বহুপূর্বে চর্যাপদগুলি রচিত হয়, কারণ টীকার মধ্যে বহু পাঠান্তর পাওয়া যায়। একটি পদের ব্যাখ্যায় (চর্যা ২১) টীকাকার মীননাথের ভণিতায়ুক্ত এক বাঙ্গলা দোহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

তথাচ পরদর্শনে মীননাথ—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ৭ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥^১

অর্থাৎ গুরু পরমার্থের পথ বলিতেছেন, ইহা কর্মরূপ কুরঙ্গের সমাধিকপাট। কমল ফুটিলে শামুক (জোংরা > জমরা) তাহা কহে না, কিন্তু কমলমধু-পানে ভ্রমরের ভুল হয় না।

চর্যাপদগুলিতে বিভিন্ন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। লুইপাদ-রচিত দুইটি চর্যা ইহাতে আছে (১, ২২ সংখ্যক)। এই লুইপাদ ‘আদি বজ্রাচার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, এই মতে ইনি আদি চর্য্যাকারও। এই লুইপাদ আর মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথ অভিন্ন, ইহা বাগচী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মৎসেন্দ্র বা মীননাথ শৈব তান্ত্রিক ও যোগীদের মধ্যে আদিসিদ্ধ। লুই < লোহি < রোহিত = মৎসেন্দ্র, মীন, এইরূপে অর্থ করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত নহে।

তেদ্বরের ক্যাটালগের মতে লুই বাংলা দেশের লোক, রাঢ়দেশে তাঁহার পূজা প্রচলিত। সিদ্ধাচার্য্য লুই ব্যতীত কাহ্নুপাদের নাম সুপরিচিত, তবে একাধিক কাহ্নুপাদ ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মাণিকচন্দ্র-ময়নামতীর গানের হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরিপাদ, ইনি শৈব তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্য কাহ্নুপা বা কাহ্নুপা (চর্যা ৩৬), বলিয়াছেন ‘শাখি করিব জালন্ধরিপাত’, ইহা দ্বারা জালন্ধরিপাদ তাঁহার গুরু ছিলেন তাহা বুঝা যায়। কয়েকটি চর্যা হইতে কাহ্নুপাকে কাপালিক যোগী বলিয়া অনুমান করা যায়, যথা—নিধিণ কাহ্নু কাপালি

জোই লাঙ্গ' অর্থাৎ আমি নিয়ুগ্ন উলঙ্গ কাপালিক যোগী কাহ্ন। এই কাপালিকের ডোমনী সহ চৌষটি পাপভীযুক্ত পদ্মে চড়িয়া নৃত্য করিবার উল্লেখও দোহায় আছে।

এই চর্যাপদগুলির রচনাকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ১২০০ হইতে ১৪৫০ সাল পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে, কারণ বাঙ্গলা দেশে এই সময়ের ইতিহাস অভূতপূর্ব সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব ও বিকোভের কাহিনী মাত্র। পালবংশের রাজ্যকালে উচ্ছ্রাতীয় ব্যক্তির ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেরই আদর করিতেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধকদিগের জন্ম দক্ষিণ রাঢ়ের কায়স্থ অধীশ্বর পাণ্ডুদাস সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুভূমি-বিহার নির্মাণ করাইয়া দেন। সেন রাজাদের আমলেও জনসাধারণ প্রধানতঃ শৈব ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিল বলিয়া মনে হয়, ইহারা অনাচরণীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। যাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়ে আসিল তাহারা নবশাখরূপে গ্রহীত হইল।^১

দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-সংঘাতের ফলে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম লোপ পাইলে শাক্ত তত্ত্বের মধ্যে তাহার দেবদেবী আশ্রয় গ্রহণ করিল। আবার ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও অনার্য্য দেবতার সমাবেশ হইল।^২ 'ধর্মঠাকুরে'। ইনি ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণু ও শিব, বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক কচ্ছপ-রূপে পূজিত এবং নামহীন অনার্য্য দেবতা, ইহার বাহন উলুক বা বানর। ইহার ধ্যানের মন্ত্র বৌদ্ধ বজ্রযানের 'শূন্য' মন্ত্র। আবার ইহার মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট।^৩ অনার্য্যের দেবতা ক্রুর, অযথা নিষ্ঠুর, পূজা আদায় করিবার জন্য জঘন্য কার্য্যেও তৎপর, যেমন মনসামঙ্গলের মনসা। শৈব নাথপন্থী যোগীদের যেখানে আর্য্যোত্তর ধর্ম-বিশ্বাসে ছাপ পড়িয়াছে যেমন 'গোরক্ষবিজয়' প্রভৃতি কাব্য, সেখানে আর্য্যদেবতাদেরও হীনকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। ইহার উদাহরণ গোরক্ষবিজয়ের দেবী পার্শ্বতীর গোরক্ষকে পরীক্ষা। মুসলমান অভিযানের ফলে স্থানীয় অনার্য্য মনোভাব সুব্যক্ত হইল, তৎফলে মনসার, ছড়া, ধর্মের ছড়া, শিবের ছড়া, রাধাকৃষ্ণের ধামালী প্রভৃতির দ্বারা অপৌরাণিক সাহিত্যের পুস্তন হইল। এই সকল কাহিনীর মূলে যে একই মনোভাব ছিল তাহার প্রমাণ 'সৃষ্টিপুস্তন'-

বর্ণনা। আবার সহজিয়া বাউলপন্থীদের রচনায় ইহার অনুরূপ আর এক ধরনের সৃষ্টিপত্তনের কথা আছে। এই দুই কাহিনীই কোন পুরাণে নাই।^১ চর্যাপদগুলিতে সৃষ্টিপত্তনের কোন উল্লেখ নাই। গোরক্ষ-বিজয়, শৃঙ্গপুরাণাদির সৃষ্টিপত্তন-কথা এই নিবন্ধের অন্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

এই চর্যাপদগুলির সাধনেন্দ্ৰিতির সহিত নাথপন্থীদের সাধনের সামঞ্জস্য বা বিরোধ আছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য। ইহার দ্বারা শাস্ত্রী, টুটী ও বাগচী মহাশয়ের মংস্বেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ অভিন্ন ইহা প্রমাণিত হয় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

গোরক্ষ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হঠযোগের গ্রন্থে মংস্বেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত একটা কষ্টসাধ্য আসন ও তাহার ফলের কথা আছে, যথা—

বামোরুমূলপিপিতদক্ষপাদঃ

জানোর্কহির্কেষ্টিতবামপাদম্।

প্রগৃহ্য তিষ্ঠেৎ পরিবর্তিতাঙ্গঃ

শ্রীমংস্বেন্দ্রনাথোদিতমাসনং স্থাৎ (হ. যো. প্র. ১১২৬)

এই আসন প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, দুঃসহ প্রচণ্ড রোগসমূহ শীঘ্র বিনাশ পায়, কুণ্ডলিনী অর্থাৎ আধার-শক্তির প্রবোধ হয়, কখনও নিজাভাব উপস্থিত হয় না এবং চল্লি যে তালুর উপরিভাগস্থিত হইয়া সর্বদা অমৃতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয়। (১১২৭ হ. যো. প্র.)।

আদিনাথ শঙ্কর হঠযোগের উপদেষ্টা “আদিনাথঃ শিবঃ সর্বেষাং নাথানাং প্রথমো নাথঃ। ততো নাথসম্প্রদায়ঃ প্রবৃত্ত ইতি নাথসম্প্রদায়িনো বদন্তি। মংস্বেন্দ্রাখ্যশ্চ আদিনাথশিষ্যঃ।” (টীকা, হ. যো. প্র. ১১৫)। অন্তত আছে “যেন আদিনাথেন উপদিষ্টা গিরিজাঠৈ হঠযোগবিজ্ঞা —। তথাচোক্তং গোরক্ষনাথেন সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতৌ” (টীকা ১১১ হ. যো. প্র.)।

গোরক্ষ-সংহিতায় গোরক্ষনাথের উপদেশ “আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা” এবং “যোগশাস্ত্রক পরমং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্”—এতদ্ব্যতীত গোরক্ষনাথ কায়সাধনের প্রধান নেতা ছিলেন, যোগের

কঠোর নিয়ম দ্বারা দেহ-সংযম ও চিন্তাবৃত্তি-নিরোধ ছিল মৎসোস্ত্র-গোরক্ষের পন্থা। কিন্তু লুইপাদের চর্যাপদে

“সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।

সুখ দুখেতে নিচিত মরি অই।” (চর্যা ১) অর্থাৎ সকল প্রকার সাধনা দ্বারা কি হইবে, তাহাতে সুখ-দুঃখে নিশ্চয় মৃত হইবে। তিনি মহাসুখ লক্ষ্য করিয়া গুরুর নিকট হইতে সহজানন্দ মহাসুখ লাভের উপায় জানিয়া লইতে উপদেশ দেন “দিড় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুজিঅ জাণ।” অতএব লুইপাদ কষ্টসাধ্য সাধনপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।^১

হঠযোগীর নিকট মূল-বন্ধ, জালন্ধর-বন্ধ ও ওড়িয়ান-বন্ধ, এই কয়টি সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা—

মহাবন্ধঃ সমাসাশ্র উড্ডীন-কুম্ভকং চরেৎ।

মহাবেধঃ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১।৭০

গোরক্ষ-সংহিতা—প্রসন্ন কবিরত্ন।

কিন্তু লুইপাদ পূর্বোক্ত চর্যাতেই বলিয়াছেন—

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণ কপাটের আস।

শুন পাখ ভিড়ি লেছরে পাস।

অর্থাৎ বন্ধাদির সাধনা ত্যাগ করিয়া কেবল শূন্যপক্ষ নৈরাশ্র্য-ধর্মকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন কর।

পরবর্তী কালেও কৌলতান্ত্রিকদের মধ্যে এই ভাবই প্রচারিত হইয়াছে।^২

লুইপাদের সাধনার পদ্ধতিতে জয়ুগলের মধ্যে আঞ্জাচক্রে ইড়াপিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে ধমনচমণ পিঁড়িতে অর্থাৎ অলি ও কালির মিলনস্থলে পদ্মাসনে সমাসীন নিজগুরুর মূর্তি ধ্যান করার কথা আছে। এইরূপ গুরুধ্যান পরবর্তী কালে ‘ঘেরণ্ড-সংহিতায়’ এবং ‘বিশ্বসারতন্ত্রে’ আছে। আরও পরবর্তী কালে কঙ্কালমালিনী-তন্ত্রে ঐ স্থানে গুরুর বাম উরুতে উপবিষ্টা গুরুপত্নী-ধ্যানেরও উল্লেখ আছে।^৩

১। ‘কদলীরাজ’—রাজমোহন নাথ, পৃ ১৪

২। কদলীরাজ, রাজমোহন নাথ, পৃ ১৫।

৩। ঐ পৃ. ১৪।

আঞ্জাচক্রে ত্রিকোণাকার মণ্ডলকে অকখাদি মণ্ডল, হলখ মণ্ডল, ত্রিবেণীর খাট ইত্যাদি বলে। অ-ল বীজ অলি, ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী-বেষ্টিত, ক-ল বীজ ‘কালি’ পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ী-বেষ্টিত। এই খর ও বাহুনের বীজ-বেষ্টিত ইড়া ও পিঙ্গলায় সঙ্গমস্থল জয়ুগলের মধ্যে অবস্থিত।

নাথসম্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ নহে, তাঁহারা আজ্ঞাচক্রে নাদ-বিন্দুর ধ্যান করেন, জ্যোতির্ময় বিন্দুর ধ্যান করিয়া কর্ণে নাদ শ্রবণ করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ মূঢ়গণেরও সম্মত নাদোপাসনা প্রচলিত করিয়া রাজা হইতে ভিখারী সকলেরই পূজ্য হন। মৎশ্বেন্দ্রনাথেরও লক্ষ্য মনের সহিত নাদের বিলয়-সাধন করিয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা (ব্রহ্মেন্দ্রকুমার বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্পাদিত হঠ-প্রদীপিকা, ৪র্থ উপদেশ, ১০০-১০২)। লুইপাদের লক্ষ্য ‘মহাসুখ’। লুইপন্থী সঙ্কীর্ণপাদের দোহায় নাদবিন্দু সাধনের নিষ্প্রয়োজনীয়তার কথা আছে। সদগুরুর বদনামৃতলহরীর প্রভাবে নাদবিন্দুর কল্পনা ত্যাগ করিলেও মহাসুখ পাওয়া যায়—

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।

চিঅরাঅ সহাবে মুকুল। (চর্যা ৩২)

পার উআরৈ সোই মজ্জিই

হুজ্জণ সঙ্গে অবসরি জাই ॥ ঐ

টীকাকার বলিয়াছেন, “পারেতি পরমার্থেন তদেব বোধিচিন্তা যোগিবরৈরনুগম্যতে। তদনু তস্ম গুরুপ্রসাদাৎ মহামুদ্রাসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি তে। দেআর (?) ভবে পৃথক্জনৈরনুগম্যতে। তেন তে মোহাদিভুজ্জনসঙ্গমেন সংসারসমুদ্রে মজ্জন্তীতি।”^১। সরহপাদ আরও বলেন, মনকে বায়ুর সহিত যুক্ত করিয়া রবিশশির মধ্যে চালিত না করিয়া শুধু বটের ছায়ায় অর্থাৎ সদগুরুর আশ্রয়ে থাকিলেই সমস্ত লাভ হয়। (চর্যাপদ-টীকা, পৃ ১৫ “জাহি মণ পবণ ন সঙ্করই” ইত্যাদি)। কাহ্নুপাদও বলেন, “অলি এঁ কালি এঁ বাট কঙ্কেলা”, সদগুরু-প্রসাদে এই বস্তু উন্মুক্ত হইতে পারে। এই প্রকারে নানা পদে গুরুর মাহাত্ম্য-বর্ণন ও তাঁহার কৃপায় সমস্ত লাভের কথা আছে।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে বলিতে হয় মৎশ্বেন্দ্র ও লুইপাদের ধর্মমতে বা সাধনার পদ্ধতিতে সামঞ্জস্য নাই, গোরক্ষসংহিতার কঠোর নিয়মের সহিত, লুইপাদের বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের (কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের) মিল নাই। বৌদ্ধ সহজিয়া লুইপাদকে তাঁহার ভক্তেরা ‘মৎশ্বেন্দ্রাবতার’

বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু নাথপন্থের মংস্বেশ্বরের সহিত তাঁহার ধর্মের কোনও মিল নাই ৷^১ ।

অপরপক্ষে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ভূমিকায় (পৃ ২৩, ২৪) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে লুইপাদ ও মংস্বেশ্বর অভিন্ন। তাহার নিম্নরূপ কারণ তিনি দেখাইয়াছেন :

১। তিব্বতী মতে লুইপা আদিসিদ্ধ। ভারতীয় মতে মংস্বেশ্বর আদিসিদ্ধ।

২। লুইপার শবরীপার সহিত সম্বন্ধ ছিল, হঠযোগপ্রদীপিকার মতে মংস্বেশ্বরের পরেই শাবরানন্দ 'ত্রীআদিনাথ মংস্বেশ্বর শাবরানন্দ ভৈরবঃ'।

৩। লুইপা ও মংস্বেশ্বর উভয়েই কৈবর্ত।

লুই অর্থে লোহিত, রোহিত বা মংসুরাজঃ, ইহা মংস্বেশ্বরের সহিত একার্থবোধক।

৪। লুই শব্দের তিব্বতী অনুবাদ *ña lto pa* অর্থাৎ মংস্বেশ্বরের।

ভারতীয় মতে মংস্বেশ্বরের মংস্বেশ্বাদের জন্ম হয়, ইহার সহিত কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ৩৫, ৩৬ শ্লোক (পৃ ৬০) তুলনীয়। লুইপার অস্থ তিব্বতী নাম মংস্বেশ্বরদ, ইহাও মংস্বেজাত হইবার ইঙ্গিত। তিব্বতী চিত্রে লুইপাকে মংস্বেশ্বর পৃষ্ঠে অঙ্কিত করা হইয়াছে এবং তিনি মংস্বেশ্বর অস্থ আহারে রত এইরূপ দেখান হইয়াছে।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ৩৫ ও ৩৬ সংখ্যক শ্লোক যথা :

अहं सो धीवरा देवि वैवर्त्तत्वं मया कृतः

आकृत्य तु तदा मत्स्य' शक्तिजाल-समीकृतः । ২৫।

मत्स्योदगन्तु तत्स्फोट्य गृहीतञ्च कुलागमे ।

वदन्ति विदिता लोके पशवो ज्ञानवर्तिताः । ২৬।

ধীবররূপী শিব এইরূপে মংস্বেশ্বাদের হইতে কুলাগম উদ্ধার করেন।

এইরূপে বাগচী মহাশয় মংস্বেশ্বর ও লুইপাদের অভিন্নতা-প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে ও নাথসাহিত্যেও ইহাদের অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বহু তাত্ত্বিক গ্রন্থে মংস্বেশ্বর ও

গোরক্ষের উল্লেখ আছে, মংস্ত্রের নামের বিকৃতির কথা অশ্রুত উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

‘মীননাথ, মচ্ছপাদ, মচ্ছপাদ, মোচন্দর প্রকৃতি।’

সুইপাদের ধর্মমত বৌদ্ধ সহজিয়া মত। তাহা কালক্রমে বঙ্গদেশে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বিচার্য। সপ্তম শতাব্দীতে ইয়ুনাচাঙ্গের সময়ে বঙ্গের সর্বত্র বহু বৌদ্ধমঠ ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতই সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ মতের প্রতিকূল ছিলেন। ক্রমশঃ মধ্যবঙ্গেও বেদান্তমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু প্রান্তর ভাগে সমাজের নিম্নস্তরে বৌদ্ধপ্রভাব বলবৎ রহিয়া গেল। পাল রাজাদের সময়ে কিঞ্চিৎ বিকৃত বৌদ্ধমতের সমধিক প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্ত্বের মিশ্রণে নূতন ভাবের সাধনা ও পূজাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়। তাহা রাজা গণেশের পূর্ববর্তী কালে রামাই পণ্ডিত ‘ধর্মপূজা’র নামে প্রচার করেন, ইহাতে বৌদ্ধধর্মের আচারাদির আভাস আছে, কালে ইহা শিবপূজায় পরিণত হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ ধর্মের ‘দেয়াসীন’ হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ সহজ-সাধনা রূপান্তরিত হইয়া কি ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব-মতে প্রবেশ-লাভ করিল তাহা বিবৃত হইতেছে :—

“যেকালে শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্যের বিশেষ প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-যোগের মত কালবশে উত্তর-ভারতে হ্রাসোন্মীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল; প্রাচীন পুরাণ ও তত্ত্বের মহাশক্তিবাদ বৌদ্ধতত্ত্বের মিশ্রণে ক্রমশঃ অর্ধাচীন তত্ত্বোক্ত শাক্ত ও শৈবমতে পরিণত হওয়ায় ধর্মজ্ঞান, শিক্ষা ও সাধনের অপব্যবহারে গোড়ীয় শাক্তসমাজ যখন অর্থশূন্য কর্ম-সাধনায় ব্যাপৃত ছিল, ঠিক সেই সময়েই গণেশের অবতার (চতুর্দশ শতাব্দী)। শৈব বা শাক্ত সাধক সেকালে ফেৎকারিণী বা উজ্জামরেশ্বর তত্ত্বের উৎকট সাধনার সন্ধানে নিরত, কেহবা ‘কামধেনু’র সহযোগে ‘মাতৃকা-ভেদ’ সমাধা করিয়া ‘কুলার্ণবে’ পার্থিব তমু ভাসাইবার উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত।……গৌড়দেশ অতি প্রাচীনকাল অবধি শক্তিসাধনের ক্ষেত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু যে তাত্ত্বিক উপাসনায় ‘পরাম্পর’ জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষায় ‘সর্বশাক্ত পারদক্ষ, জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রমানস’ গুরুদেবের অমুসন্ধান করা আবশ্যক এই নির্দেশ

আছে, যাহাতে 'উত্তমা মানসী পূজা বাহুপূজা কনীয়সী' বলিয়া সাধকের উপাসনার সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভ-কামনায় শিষ্যের ব্রহ্মচর্যা-নিয়ম-পালন সর্বথা বিহিত হইয়াছে, সেই তান্ত্রিক মতেই আবার কালবশে বামাচারে পক্ষতবে (পঞ্চমকারে) আরম্ভ করিয়া কোলাচারের অপব্যবহারে সাধকের রাক্ষসভাব আনিয়া ফেলিয়াছে। বামাচার ও বীরাচারের মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রতিপক্ষকে 'পঞ্চাচারী' সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞারহিত 'বীর' সাধক ভ্রষ্টাচারে নিজেই বিকট পশুভাবে উত্থান করিয়াছেন! কোল, দণ্ডী প্রভৃতিরাই প্রথম প্রথম চক্র করিয়া মকার সাধন করিতেন এবং ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মহাবিজ্ঞা'। শেষে অর্থাদিলোলুপ গৃহীও বামাচারীর সাহায্যে সাংসারিক ফললাভের আশায় অভিচার-ক্রিয়াদি করাইয়া লইত। সাধারণ গৃহী ব্রাহ্মণ বা অপর সংজ্ঞাতীয় লোক অবশ্য কোন কালেই বামাচারের পক্ষপাতী ছিল না।.....শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলের জন্মই তত্ত্বমস্ত্রের বিধান ছিল, কালবশে সহজ পূজা উৎকটভাব ধারণ করিতেছিল। বৌদ্ধভাবের সহজ-সাধনাও বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। কেহ কেহ মনে করেন সহজ-সাধনা এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবের উন্নতি করিয়াই বঙ্গদেশে নবীন তান্ত্রিক সাধনাকে গঠন করিয়া লওয়া হইতেছিল। বৌদ্ধগান ও দৌহা হইতে ঠিক এতটা সপ্রমাণ হয় মনে হয় না।^{১২}

ধর্মভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, সুতরাং উভয়ে মিলিতে অধিক সময় লাগে না। তাই অর্ধাচীন বৌদ্ধের সহজ-সাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শাক্ত তান্ত্রিকের পক্ষতবে যোগিনী-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে বাঙ্গালার নরম মাটিতে সর্বর পুষ্প ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার অপব্যবহারে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শাক্ত-সাধক ইন্দ্রিয়সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল। মাধুর্য্যরসে পতিভাবের ভজন, হৃদয়ের ব্যাকুলতা, একান্ত নিষ্ঠার জ্ঞাপক, ইহা ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালী সমাজে পরতত্ত্বা নারীর ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। তাই বাঙ্গলায় পরকীয় মতের কল্পনা, যোষিং-সম্ভোগরূপ প্রেমের ভিতর দিয়া সহজ-পন্থার 'মহাপ্রথ'বাদের সহিত মিলিয়াছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি

যাহা হিন্দু বৈষ্ণবের প্রধান কাম্য, তাহাই এইভাবে বিকৃত হইয়াছে। ভোগাসক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পরকীয়া সাধনার পক্ষপাতী হইয়াছে। সেইজন্যই বৌদ্ধ দৌহায় 'সহজসুখ' ধর্মের অঙ্গীভূত, শাক্ততন্ত্রে পক্ষপাত 'মকার-সাধনা'য় এবং বৈষ্ণবের প্রেম 'কামে' পরিণত হইয়াছে। সময়ে সময়ে আগমবাগীশের মত সাধক শাক্তমতের এবং নরোত্তম প্রভৃতির মত সাধু বৈষ্ণবের মধ্যে প্রাণ-সংস্কারের উদ্ভব করিলেও অধঃপতিত বঙ্গীয় সমাজে সাধারণ লোক ধর্মবিষয়ে নিজীব অবস্থাতেই কালান্তিপাত করিয়াছে।”^১

নব মৎস্যেন্দ্রনাথ ও নব গোরক্ষনাথ-বৃত্তান্ত

শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় হঠযোগী ও নাথসম্প্রদায়ের প্রবর্তক মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক ধর্মের প্রবর্তক লুইপাদ (মৎস্যেন্দ্র)-মধ্যে যে ভেদ বর্ণন করিয়াছেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ওড্ডিয়ান রাজকর্মচারী সামন্ত শোভা বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া লুইপাদ নামে খ্যাত হন, কারণ তিনি লোহিত্য দেশের লোক ছিলেন। লুইপাদ সহজ-ধর্ম প্রচার করেন ও দৌহা রচনা করেন। এই নব মৎস্যেন্দ্র বা লুইপাদ 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়'ও রচনা করেন, কিন্তু নাথপন্থের মৎস্যেন্দ্র বা মীননাথ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন এবং পরবর্তী কালে নারীর মায়াপাশে আবদ্ধ হন ইত্যাদি কাহিনী সুপরিচিত। ইনি ভুবনবিজয়ী সিদ্ধ নামে পরিচিত। নাথধর্মে কঠোর হঠযোগ-প্রণালী প্রচলিত আছে। নাথধর্মের প্রবর্তক মৎস্যেন্দ্রই আদি মৎস্যেন্দ্র, আর সহজ-ধর্মের প্রচারক লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্র নব-মৎস্যেন্দ্রনাথ রূপে নাথমহাশয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব:—

(ক) মৎস্যেন্দ্র (মীননাথ)—নাথধর্মের আদিগুরু।

(খ) মৎস্যেন্দ্র (লুইপাদ)—দৌহা ও কৌলজ্ঞান-রচয়িতা নব-মৎস্যেন্দ্রনাথ।

নব গোরক্ষনাথ—নাথধর্মের প্রচারক গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের নেতা, এবং বৌদ্ধ রমণবজ্জ স্বধর্মত্যাগী গোরক্ষনাথ 'নব গোরক্ষনাথ'। এই নব-গোরক্ষ লুইপাদের সহজধর্মে আকৃষ্ট হন, এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান বাথরগঞ্জের চন্দ্রদ্বীপ। প্রাচীন নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি।গোরক্ষ-সংহিতা,

গোরক্ষ-শতক ও গোরক্ষসহস্রনামের অনুরূপে ইহারও ভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় ঐরূপ গ্রন্থ রচনা করেন, এই সকল গ্রন্থ চন্দ্রবীপে রচিত হয়। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়'ও তখন রচিত হয়।

নাথপন্থের এবং সহজিয়াপন্থের গোরক্ষ-সংহিতায় ভেদ আছে। প্রসন্ন কবিরত্ন কর্তৃক সূত্রাকার নাথ-গোরক্ষ-সংহিতা অনূদিত হইয়াছে, অষ্টটি দেবীম্বর-সংবাদ আকারে রচিত। নাথমহাশয়ের মতে নাথপন্থের গোরক্ষ গোপীচাঁদের সম্যাসের সহিত জড়িত নহেন। নব-গোরক্ষই গোপীচাঁদকে সম্যাসী করেন ও বাঙ্গলাদেশে নাথসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। আদি মংসেন্দ্র বা গোরক্ষ-প্রবর্তিত নাথধর্ম যোগশাস্ত্রানুযায়ী। অতএব :—

- (ক) গোরক্ষনাথ—নাথধর্মী কায়সাধনের নেতা।
- (খ) নব-গোরক্ষনাথ—রমণবজ্র—সহজিয়াধর্মের প্রচারক ও গোপীচাঁদের সম্যাসের সহিত জড়িত। বঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য নাথযোগীদের কালনির্ণয়-চেষ্টা

গোপীচন্দ্রের কালনির্ণয়

ঐতিপূর্বে গোরক্ষ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদিগের সহিত গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধ কি ও গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা কতটুকু সে সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন তুলিয়াছি (পৃ ২৪)। রাজা গোপীচন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন, এই কাহিনী অজ্ঞাপি সুপ্রচলিত। ময়ূরভঞ্জের গীত-গায়কের বর্ণনায় গোপীচন্দ্রকে ব্রহ্মচন্দ্রের পুত্র ও তারাচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া মনে হয়।^১ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, দুর্গাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-সম্বন্ধীয় পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কাহিনীসকল পালরাজাদের গৌরবময় যুগের। একটি গাথায় আছে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল পাটিকানগর—এই পাটিকানগর সম্ভবতঃ কমলাঙ্গ বা বর্তমান কুমিল্লার রাজধানী ছিল।^২ ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে (১১৪১ শকের) পট্টিকেরা নগরের উল্লেখ আছে।^৩ রংপুরেও অজ্ঞাপি পাটিকাপাড়া বর্তমান। শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে কুমিল্লার রাজধানী 'চাটিগ্রাম' ছিল।

তিরুমলায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক গোবিন্দচন্দ্রের পরাজিত হইবার কথা আছে। এই লিপির কাল ১০১২ খৃঃ (মতাস্বরে ১০২৫ খৃঃ)। এই গোবিন্দচন্দ্র ও বঙ্গীয় গীতিকার গোপীচন্দ্র যিনি 'ষোলদণ্ডের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারী' এক ও অভিন্ন হইলে কালনির্ণয়-সমস্যা দূর হয়।

চন্দ্ররাজাদের প্রথম রাজা চন্দ্রদেব, তিনি প্রধান বলিয়া ধাড়ী, জল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে আছে—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়ীচন্দ্র পিতা—

তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা

একাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে চন্দ্রবংশের পরিচয় পাওয়া

১। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (১ম), পৃ ২০ ২। যোগী, যাব, পৃ ১০১ ৩। যোগী, যাব, কুমিল্লা, পৃ ২৭

যায়।^১ মাণিকচন্দ্র রাজাই গোবিন্দচন্দ্রের পিতা, এ কথা সুকুর মামুদ প্রণীত গোবিন্দচন্দ্রের সন্মানে পাওয়া যায়, কিন্তু শরৎ দাস মহাশয় অন্তরূপ বংশাবলী দিয়াছেন।^২

অধুনা দুইটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে—‘পাইকাপাড়া’ ও ‘সন্দ্বীপে’র। এই পাইকাপাড়া ঢাকার মুন্সীগঞ্জে, ইহাতে বাসুদেব মূর্তি আছে ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালের বলিয়া উল্লিখিত আছে।^৩ ইহার দ্বারাও কোন সমাধান হয় না। ঢাকা জেলার সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাল একাদশ শতাব্দী। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র-পুত্র মহেন্দ্রের যে লিপি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা হরিশ্চন্দ্র রাজা ও গোপীচন্দ্রের সময়ের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।^৪

গোপীচন্দ্র পালরাজাদিগের সমসাময়িক হইলে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বের, কারণ বখতিয়ার খিলজী দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজাদের উচ্ছেদ-সাধন করেন। অতএব ময়নামতীর গুরু গোরক্ষনাথও একাদশ শতাব্দীর প্রতিপন্ন হন। রাজা মাণিকচন্দ্র ধর্মপালের ভ্রাতা-রূপেও খাত। কিন্তু এই ‘ধর্মপাল’ নাম প্রকৃত নহে, গৌরব-বর্জনার্থ পূর্ববর্তী কোন স্বনামধন্য রাজার নাম ব্যবহার করা রীতি ছিল, এক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে।^৫ গোবিন্দচন্দ্র রাজা মহীপালের (৯৭৮-১০৩০ খৃঃ) সমসাময়িক, গোবিন্দচন্দ্রের পর তদীয় মন্ত্রী ভবচন্দ্র (১০৩৯-১০৫০ খৃঃ) রাজা হন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। ‘হবুচন্দ্র’ রাজার ‘গবুচন্দ্র’ মন্ত্রী। গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী রংপুর জেলায় পাটিকা-নগরে ছিল, গোড়ের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে।

শব্দপ্রদীপ-রচয়িতা সুরেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্রের রাজ-বৈজ্ঞানিকপ্রণী ছিলেন, সুরেশ্বর একাদশ শতাব্দীর শেষপাদের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গোবিন্দচন্দ্র কে? কনৌজের গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে তাহার সভায় শ্রীহর্ষ ছিলেন। অতএব এই গোবিন্দ বঙ্গীয় গোপীচাঁদ হইবেন তাহার স্থিরতা কি?

উপসংহারে বলা যায় গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীগুলিতে খৃষ্টীয় দশম ও

১। গোপী. গান, ভূমিকা, পৃ ২৭

২। গোপী. গান, ভূমিকা, পৃ ৪

৩। Some Hist. Aspects of the Inscriptions of Bengal by B. C. Sen, p. xxxii.

৪। গোপী. গান, ভূমিকা, পৃ ১২

৫। Cal. Review, Aug. 24, 1919, p. 359. ‘Ramai Pandit’.

একাদশ শতাব্দীর যে সকল বর্ণনা আছে তাহা পালরাজাদিগের রাজত্ব-কালের। পালরাজাদের গৌরবের অবসানে তাঁহাদের কীর্তিগায়ক যোগি-জাতি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিত ও গোপীচন্দ্রের গীত গাহিয়া ভিক্ষার্জন করিত। গোপীচন্দ্রের মাতা গুরু গোরক্ষনাথের নিকট 'মহাজ্ঞান' লাভ করেন, ইহার উল্লেখও গীতিকায় পাওয়া যায়। অতএব গোরক্ষের কাল একাদশ শতাব্দী হইলে ময়নামতীর ও গোপীচন্দ্রের কাল উহার বহু পরবর্তী নহে ইহা নিশ্চিত।

চৌরঙ্গীনাথের কালনির্ণয়

মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য-মধ্যে গোরক্ষনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহার অন্ততম শিষ্য চৌরঙ্গীনাথও অজ্ঞাত নহেন। বিমাতার আদেশে চারি হস্তপদহীন হওয়ায় ভারতের পূর্বদেশের দেবপাল রাজার পুত্র 'চৌরঙ্গী' নামে খ্যাত হন। মীনপাদ বা নামাস্তুরে অচিন্ত্য দেশ-ভ্রমণ-কালে ইহাকে দীক্ষাদান করেন, ও জ্ঞানেক রাখাল বালককে ইহার সেবার ভার দেন। এই বালকই ভবিষ্যতে 'গোরক্ষনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হন। চৌরঙ্গী ছাদশবৎসর ধ্যানাস্থে সিদ্ধিলাভ করিলে তাঁহার হস্তপদ পূর্ববৎ হয়।^১

সম্ভবতঃ চৌরঙ্গীনাথের পিতা দেবপাল বঙ্গীয় পালরাজাদের তৃতীয় রাজা। ডাঃ মোহন সিংএর মতে তিনি সালবাহনের পুত্র ও গোরক্ষ-মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য। পাঞ্জাবের ইতিবৃত্ত অমুযায়ী সালবাহন-পুত্রের নাম পূরণ-ভগত; চৌরঙ্গীনাথেরই পূর্বনাম পূরণ। গিরীশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক ইহাকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। যদি পূর্বোক্ত তিব্বতীয় বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে চৌরঙ্গীনাথ খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন বলিতে হয়। দেবপালের পুত্র বা পৌত্র কেহ রাজত্ব করেন নাই, সম্ভবতঃ চৌরঙ্গীনাথের রাজ্যতাগই ইহার কারণ।^২

দেবপালের ভগিনী ময়না ধর্মপূজার প্রতিষ্ঠাতা রামাই পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, শাস্ত্রী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (শাস্ত্রী, উল্লেখ ত্রীগ্‌স, পৃ ২৪৫)।

১। শহীদুল্লাহ, চৌরঙ্গীনাথ, উদ্‌ঘাটন—আখিন, ১৩৪৮—Grünwedelএর উদ্‌ঘাটন।

২। ঐ, আখিন, ১৩৪৮

হঠযোগ-প্রদীপিকাতে

“শ্রী আদিনাথ-মৎস্যেন্দ্র-শাবরানন্দ-ভৈরবাঃ ।

চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ ॥”

ইত্যাদি মহাসিদ্ধারা হঠযোগের প্রভাববশতঃ কালজয়ী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে ।

শূন্যপুরাণে ‘আগুনাথ মীননাথ সিদ্ধা চরঙ্গিনাথ দণ্ডপাণি আর কিল্লরী’র (বসুমতী সাহিত্যামন্দির সংস্করণ, পৃ ২২৩) উল্লেখ আছে । সিদ্ধা অর্থে সর্ব্বাঙ্গনাথ নামে ৮৪ সিদ্ধের অন্ততম ও ধর্ম্মপূজার দ্বারপাল মহাসাঙ্গই বা সাঙ্গরাজ্য । চরঙ্গিনাথ = চৌরঙ্গীনাথ, ইহার নামে কলিকাতার ‘চৌরঙ্গী’ নামে পথ কি ? কালীঘাটের ‘কালী’ কাহারো মতে চৌরঙ্গীনাথের প্রতিষ্ঠিত । দণ্ডপাণি অর্থে যম^১ । মহাদেবের সহিত এই সকল সিদ্ধপুরুষ যজ্ঞস্থানে আসিয়া ভোজনে বসিলেন । এই সিদ্ধগণের উল্লেখ কি শূন্যপুরাণের নব্য অংশে পরবর্ত্তী কালের যোজনা ?

গোরক্ষবিজয়ে আছে অনাদ্যের শরীর হইতে শিব, মীননাথ, হাড়িকা, কানকা, গাভুর, গোরক্ষনাথ ও গৌরী জন্মগ্রহণ করেন । গাভুর অর্থে যুবক, এই গাভুর সিদ্ধাই নামান্তরে ‘চৌরঙ্গীনাথ’ । মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

এক সিদ্ধ আছে মোর জতি গোরখাই ।

আর সিদ্ধ আছে মোর গাভুর সিধাই ॥ (সিদ্ধাই)

ছুই সিদ্ধ যাছে মোর আঙ্গি জানি ভালে ॥২।

সিদ্ধগণ মহাদেবের ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে পার্শ্বতী কামবাণে সকলকে বিদ্ধ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, একমাত্র গোরক্ষনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অত্বেরা তাহাদের কল্পনা অনুযায়ী অভিশাপ প্রাপ্ত হইলেন । গাভুর সিধাই ছদ্মবেশী দেবীকে পাইলে হস্তপদহীন হইতেও স্বীকৃত হওয়ায় দেবীর অভিশাপে গাভুর সিধাই এমন স্থানে জন্মলাভ করিলেন যে রাজ্যী বিমাতা তাহাকে কামনা করেন, যুবরাজ সে প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় রাজ্যীর মিথ্যা দোষারোপে নির্দোষ যুবরাজ জহ্লাদ-কর্ত্তৃক হস্তপদবিহীন হইয়া নগরের বাহিরে পড়িয়া থাকেন ।

(গোরক্ষবিজয়, পৃ ২১, ভূ. মীনচেতন, পৃ ৪)

কদলীরাজ্যে মীননাথের চেতনা হইলে গোরক্ষনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তোমাতে দেখিয়া মোর পাট্টা হেন বুক ।

মিন্তুকালে না দেখিলুম গাভুর সিধার মুখ ॥

(গোরক্ষবিজয়, পৃ ১১৬)

ইহা হইতেও মৎস্যেশ্বরনাথের সহিত গাভুর সিধা বা চৌরঙ্গীর সম্বন্ধ বুঝা যায় । চৌরঙ্গীর পিতা দেবপাল হইলে, নবম শতকের প্রথমার্ধে চৌরঙ্গীনাথ বর্তমান ছিলেন এই সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত উপায় নাই । তৃতীয় পালরাজা দেবপালের সময়ে বঙ্গদেশে ‘ধর্ম’পূজার প্রচলন হয় । ইহার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর ।

এই গাভুরী সিদ্ধকে ‘হে বজ্রতন্ত্র’-লেখক ও বজ্রযানের ভাষ্যকার বলিয়া ডাঃ সুশীল দে উল্লেখ করিয়াছেন^১ । গাভুর ব্যতীত কালীপাদ (লুইপার বংশধর), অমিতাভ কামারী (বিরূপার বংশধর), বীণাপাদ (বঙ্গীয় রাজপুত্র), কঙ্কণ, দারিক (লুইপা ও নারোপার শিষ্য) এবং ধর্মপদ (কৃষ্ণের বংশধর)-রচিত বজ্রযানের পুথির উল্লেখ ডাঃ দে করিয়াছেন । ইহারা সকলেই পূর্বদেশীয়, তবে বঙ্গদেশের কি না বলা কঠিন । পালরাজাদের সময়ে ইহারা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে সহায়তা করেন । দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মই ধর্মপূজার আবরণ গ্রহণ করে । ইহা দেবপালের রাজত্বকালের কথা ।

হাড়িসিদ্ধা বা জালন্ধরিনাথের উৎপত্তি-কথা

তিব্বতী ভাষায় লিখিত ‘পুগ্‌খাম্‌জোনবজান’-নামক গ্রন্থে আছে—বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র সিদ্ধা বালপাদকে (অপর নাম হাড়িপা বা জালন্ধর সিদ্ধ) জীবন্তে মাটিতে পুতিয়া রাখেন । দ্বাদশবর্ষ পরে হাড়িপার শিষ্য কানফা সিদ্ধ (কানুপা বা কুম্ভাচার্য্য) গুরুকে মুক্ত করেন । বালপাদ বা হাড়িপা সিদ্ধের সিদ্ধ-দেশে জন্ম, ‘হাড়িফার যতগুণ কর্ণ পাতিয়া শুন যেকপ জন্মিল জলন্ধর’ (গোপীচন্দ্রের সম্বাস, পৃ ৪৪১)—তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন, ওড়িষ্যানে থাকিয়া তিনি যোগধর্ম শিক্ষা করেন । বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও ঐন্দ্রজালিক শাস্ত্রে তাঁহার এত অধিকার জন্মিয়াছিল যে,

একবার অবস্থ দেশে দেবতার নিকট বলি দিবার নিমিত্ত আনীত কয়েক হাজার পাঠা তাঁহার মন্ত্রবলে নেকড়ে বাঘে পরিণত হইয়া যায়। তাঁহার মন্ত্রবলে নেপাল মন্দিরের প্রধান শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইয়া যায়।^১ ময়নামতীর উজ্জানে বসিয়া জলপানের ইচ্ছা হইলে তাঁহার ইচ্ছায় ডাব গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার মুখে জলপ্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। এহেন সিদ্ধ হাড়িপার নিকট ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র সম্মাসম্বন্ধ লইতে অসম্মত হইলে ময়না তাঁহার পুত্রকে বলিতেছেন—

“এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি জ্ঞান না শোনে।

মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাড়ি মরবু আপনে ॥

এ দেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।

চান্দ সুরজ রাখছে হুই কানের কুণ্ডল ॥

আপনি ইন্দুরাজা চুলায় চন্দর (চামর)।

চন্দ্রের পিঠে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিঠে খায়।

আপনি মাও লক্ষ্মি রসই করি ছায় ॥

‘বঙ্গদেশে’ ঘর অর্থে বিদেশী, কারণ সেই-দেশীয়েরা আগন্তুক মাত্রেয় নিবাস ‘বঙ্গদেশ’ ও তাহার। জ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ এইরূপ ভাবিত। ময়না পুত্রকে বলিতেছেন—

গোরক্ষনাথ হয় গুরু, হাড়ি ধর্মের ভাই,

দোন জনে জ্ঞান শিখেছি এক গুরুর ঠাই।

বৃক্ষান খণ্ড, পৃ ৬৪

ইহা দ্বারা হাড়িপার গুরু যে ‘গোরক্ষনাথ’ তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। মাতাকে বহুপ্রকারে অগ্নি, জল ইত্যাদির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া গোপীচন্দ্র তাঁহার মহাজ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হাড়িপার শিষ্য হইতে সম্মত হইলেন। রজনী-প্রভাতে গোপীচন্দ্র হাড়িপার নিকট গিয়া দেখেন হাড়ি কাঁধে কোদাল লইয়া কাজে চলিয়াছেন, যমের পুত্র মেঘনাল (মেঘের নাল হইতে অভ্যের উৎপত্তি) তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়াছেন, স্বয়ং মাতা বসুমতী তাঁহার বসিবার জন্ত খাট আনিয়া দিলেন, তারপর—

এক ছদ্মার সিদ্ধাএ দিলেন ছাড়িয়া ॥

উনশত কোদাল মাত্র দখল চাছিয়া। (দখল = গত্তী)

সোনার ঝাড়ু এ জাএ খলা ঝাড়ু দিয়া । (খলা = আবর্জনা)
 সুবর্ণ কেটেরা এ জাএ চন্দন ছিটিয়া ॥
 চন্দন ছিটিয়া পুনি গেলেন উড়িয়া
 উনশত টুকরি আনি সব ফেলাইল ।
 তা দেখি গুণিচান্দে আশ্চর্য্য হইল ॥

তাহার পর আড়াই প্রহর বেলা হাড়িসিদ্ধার ‘পঞ্চ কামিনী’ লইয়া স্নান করিতে ব্যতীত হইল (এই পঞ্চ কামিনী শক্তি লইয়া সাধনের ইচ্ছিত কি ?) স্নানান্তে সিদ্ধা ভাঙ্গ খাইয়া ক্ষুধায় অন্ত্র হইয়া রাজোচ্ছানের নারিকেল, আম, কাঁটাল, কলা, শশা ইত্যাদির সম্ভাবহার করিয়া নারিকেল-মালা খোলাসহ আবার গাছে লাগাইলেন । তাহা দেখিয়া রাজা গুণিন্দাই বলিলেন “হেন জ্ঞান পাইলে আমি জুগী হইয়া যাই” ।

ইহার পরেও হাড়িপা কাটামুণ্ড মহুয়ের মুণ্ড জুড়িয়া দেখাইয়া মেহেরকুলের রাজাকে পরীক্ষা দিয়াছেন । মহানদী হাড়িপার হাঁটুর সমান জল হইয়া গেল, গঙ্গাদেবী বসিতে খাট দিলেন, গোবর্ধন স্বরণ করা মাত্র বসুমতী তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন, তখন সিদ্ধার ছদ্মারে ‘কষ্ট পরে মুণ্ড গোটা পড়ে লক্ষ দিয়া’ ও সিদ্ধা হাসিয়া এক লাথি মারিলেন,—

“লাথি খাই ম্রেতা মনিষ্য উঠিল শীঘ্র গতি,
 চারিদিকে হেরিয়া উঠি লড় দিল,
 তা দেখি গুণিচান্দে হাসিতে লাগিল” ।^১

শিষ্য গোপীচন্দ্রকে সুরিপুনগরে জনৈকা নটীর নিকট হাড়ি সিদ্ধা বান্ধা রাখিয়াছিলেন, নটী তাঁহাকে অশেষ কষ্ট দেওয়াতে হাড়ির শাপে নটীর অবস্থা হইল—

“বাহুর হইয়া রহ ভুবন ভিতরে
 দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভৈক্ষন
 দিবসে উলটা হইয়া টাঙ্গনে রহিবা ।” (টাঙ্গনে = শৃঙ্গে)

গোপীচন্দ্রও হরষিত মনে গৃহে ফিরিলেন ।

শবল-রচিত জলধর-স্তোত্র আছে । কেরলী-নামক স্থানে জলধর শবলের প্রতি কৃপা করেন এবং শবল পদরচনা করিয়া ইহার বন্দনা

১ । গোপী পাঠানী, ২৪ খণ্ড, পৃ ৩৭৪, ৩৭৫

২ । Report on the Search of Hindi Mss. (1902), p. 4

করেন। যোধপুর-রাজ মানসিংহের প্রতিও জলন্ধর কৃপা করেন বলিয়া মানসিংহ জলন্ধরকে বন্দনা করিয়া যোড়শটি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নিরঞ্জন-পুরাণ গ্রন্থে জলন্ধরের কথা আছে। বঙ্গীয় গোপীচাঁদ, উজ্জয়িনীর ভর্তৃহরি, চর্পট প্রভৃতির সহিত জালন্ধরের নাম সংশ্লিষ্ট। গোগা, ছটীক নাথ, রামসিংহ, ভীম, বণিক অগিল, পালানপুরের বণিক-সন্দহারা প্রভৃতি ইহার শিষ্য। ইহার বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে; যথা, কাহ্না নামক জন্মমূককে কবিত্ব-ক্ষমতা-অর্পণ, জৈনিক রাজ-পুত্রকে রামচন্দ্র নামে অদ্বুত তরবারি-দান ইত্যাদি।

চর্পট-রচিত অনন্তবাক্যে জলন্ধরকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘সত্যং সত্যং বদতি চর্পটো রাজেতি।’ মহাশাস্ত্র বাক্যে ময়নামতী ইহাকে ভ্রাতা বলিয়াছেন। ভর্তৃহরিও রাজা হইয়া জলন্ধরের আদেশে রাজ্যত্যাগ ও সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধসাহিত্যে ইহার নাম ‘বিচারনাথ’।

গোগা-সম্বন্ধেও বহু কাহিনী প্রচলিত; যথা—

- ১। গোরক্ষের বরে চৌহান রাজবংশে জন্ম হয়।
- ২। ১১৫০ খৃঃ জীবিত ছিলেন।
- ৩। পৃথ্বীরাজ চৌহানের সমসাময়িক ছিলেন।
- ৪। ১০২৪ খৃঃ মহম্মদ গজনীর সহিত যুদ্ধে স্বীয় পুত্রসহ নিহত হন।

রামসিংহ গোড়-জাতীয় ছিলেন। জালন্ধর কালিয়নদীর তীরে ইহার প্রতি কৃপা করেন। শিষ্য ভীমকে জালন্ধর সমস্ত ঋদ্ধি একাধারে অর্পণ করেন। বর্ণরত্নাকরে সিদ্ধ-তালিকায় ইহার নাম আছে।

বঙ্গীয় রাজা তিলকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ মাতৃ-আজ্ঞায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া জালন্ধর-শিষ্য হন। মহাশাস্ত্র-বাক্যে ও মারহাটী-প্রবাদে ত্রিলোকচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। হিন্দীতে উহা তিলকচন্দ ও পুরাতন বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র রূপ ধারণ করিয়াছে। মহাশাস্ত্র-বাক্যে রাজার বৈরাগ্যকাহিনী সংক্ষেপে আছে। মাতা ময়নামতীর উপদেশ অতুলনীয়, তাঁহার দৃষ্টান্তও বিরল। এই কাহিনী সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়া বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে।

গোপীচাঁদে সিদ্ধরূপে 'শৃঙ্গারীপাব' নামেও পরিচিত। সিদ্ধাস্ত-বাক্যে জালন্ধরের সহিত গোপীচাঁদের প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

গোপীচন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন—

ভো স্বামিন্! পৃচ্ছামি কথয় অন্তর্ধানিন্—
বসতো স্থীয়তে তদা কন্দর্পো ব্যাপ্নুতে।
বনে স্থীয়তে তদা কুং সন্তাপয়তি।
আসনে স্থীয়তে তদা স্পৃশতি মায়া।
পথি গম্যতে তদা ছিচ্ছতে কায়ঃ।
মিষ্টে ভক্ষ্যতে তদা বর্ধতে রোগঃ।
কথয় কথং সাধ্যতে যোগঃ।

জালন্ধর উত্তর দিতেছেন—

শ্রোতব্যোহিবধূত তত্ত্বস্ত বিচারঃ
য এষ সকল-শিরোমণি-সারঃ।
সংযতাহারে কন্দর্পো ন ব্যাপ্নুতে।
বাহ্যারম্ভে কুং সন্তাপয়তি।
সিদ্ধাসনে নহি স্পৃশতি মায়া।
বাদপ্রমাণে ন ছিচ্ছতে কায়ঃ।
জিহ্বায়াঃ সুখায় ন কণ্ঠব্যো ভোগঃ।
মনঃ পবনো চ গৃহীত্বা সাধনীয়ো যোগঃ।

তৎপরে নাথমার্গের আদর্শ বলিতেছেন—

অন্নমশ্নাতি স তু কল্লয়তি জল্লতি
বহু ভুনক্তি স তু রোগী।
দ্বয়োরপি পক্ষয়োর্থঃ সন্ধিং বিচারয়তি
স তু কোহপি বিরলো যোগী।^১

অন্যত্র জালেন্দ্রনাথের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে
হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজা পুত্রোষ্টি যজ্ঞ করাতে অগ্নিদেবতা প্রসন্ন হইয়া
এক সুন্দরকান্তি পুত্র দান করেন, রানী ইহার লালন-পালন করেন।
ইহার উৎপত্তির পরে মৎশ্রেষ্ঠ বিহুতি লইয়া তাহার মুখে দান করেন

যাহাতে বালক কখনও ব্যাধিগ্রস্ত না হয় ও সমস্ত ভারতে তাহার নাম চিরস্থায়ী হয়। এই বালক অস্তুরীক্ষ নারায়ণের অবতার ছিলেন। কুমারের ষোড়শ বর্ষ উপস্থিত হইলে তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতে থাকে। বিবাহ দ্বারা সংসারের চক্রে আবদ্ধ হইতে হয়, মিত্রদের নিকট বিবাহের এইরূপ ব্যাখ্যা-শ্রবণে কুমার দেশত্যাগী হন। বনমধ্যে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া কুমার ভীত হইলে, অগ্নি তাহাকে পুত্র-সম্বোধনে আশ্বস্ত করেন ও বালকের ইচ্ছায় মহাদেবের নিকট দীক্ষার্থে লইয়া যান। মহাদেব কুণ্ডলাদি দিয়া উপদেশ দান করেন ও 'জালেন্দ্র' নামকরণ করেন এবং মৎস্যেশ্বরের সাধনস্থল মার্ত্তণ্ড পর্বতের নাগবৃক্ষের তলে তপস্বী করিতে বলেন। তাহার উপদেশানুসারে বালক দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী ঘোর তপস্বায় নিমগ্ন হইলেন। অজপা নামক হংসমন্ত্রের ধ্যানে বালক লীন হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইলেন। দ্বাদশবৎসরান্তে মৎস্যেশ্বর ঐ স্থানে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া জালেন্দ্রনাথকে আসন হইতে বিমুক্ত করিয়া ঘোর তপস্বী হইতে নিবৃত্ত করেন। কিয়ৎ দিবস তথায় অবস্থানের পর উভয়ে আবার ভ্রমণে নির্গত হন।

(যোগিসম্প্রদায়াবিকৃতি, পৃ. ৮৬-৯২)

ভর্তৃহরিনাথ

নাথসম্প্রদায়-মধ্যে ভর্তৃর বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি রাজা ছিলেন এবং বৈরাগ্যের নিমিত্ত সংসারত্যাগী হন। গোরক্ষনাথ ইহার গুরু ছিলেন। ভর্তৃহরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কারণ তিনি রাজা, অতএব ভর্তৃহরিকে মূল করিয়া গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করা সহজসাধ্য হওয়া উচিত। কিন্তু একাধিক ভর্তৃর উল্লেখ আছে এবং ভর্তৃ-ভ্রাতার নাম 'বিক্রম' হইলেও, কোন্ বিক্রম ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

কথিত আছে ভর্তৃ উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, অতএব উজ্জয়িনী হইতে প্রাপ্ত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ইহা দ্বারা একাধিক ভর্তৃ ও বিক্রমের সমস্তার হয়ত সমাধান হইতে পারে।

উজ্জয়িনীতে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন, তাহার একমাত্র কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে সর্বগুণসম্পন্ন ও পুত্রস্থান অধিকার

করিবার যোগ্য জামাতার অনুসন্ধান করিয়া কন্যা সমর্পণ করা হইল। এই জামাতার নাম গোবিন্দ ভগবান, তিনিও উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন। কিন্তু বিজাতীয় ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করার দরুন জামাতা পুনর্ব্বার এক ব্রাহ্মণকন্যা ও তৎপরে বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাও বিবাহ করিলেন। এই চারি স্ত্রীর যথাক্রমে চারিটা পুত্র হইল। ব্রাহ্মণীর ভর্তৃ, ক্ষত্রিয়ার বিক্রম, বৈশ্যার ভট্ট, ও শূদ্রার শংখ। এই চারি পুত্রকে বিংশতি বৎসর লালন-পালন করিয়া তাহাদের রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল, রাজা তাহাদের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ যুদ্ধবিদ্যায় ইহারা নিপুণ হইলেন। এমন সময়ে কোন পূর্বদেশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। চারি পুত্র অসম সাহসের সহিত সেই রাজার রাজধানী পাটনা হস্তগত করিলেন। ইহার পরে ভর্তৃকে উজ্জয়িনীর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত পাটনাবাসী হইলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই স্বর্গগত হইলেন। তখন ভর্তৃ এক বিশাল রাজ্যের অধিকারী হইলেন, তাহা সত্ত্বেও তাহার ব্যভিচারিণী পত্নী সৈন্ধসেনা বা সিন্ধুমতীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজ্য বনবাসী হইলেন। তখন সিংহাসনে বিক্রম অধিষ্ঠিত হইলেন। বিক্রমের শালিবাহনের সহিত যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে বিক্রম নিহত হন। শালিবাহন বিজয়ী হইয়া নিজ সম্রাটের প্রতিষ্ঠা করিলেন, এই সম্রাট আজ ১৮৪৫ (সন ১৯২৪, বি. স. ১৯৮০)। অতএব বিক্রমাদিত্য-সম্রাট-প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম শালিবাহন-কর্তৃক যুদ্ধে নিহত বিক্রম অপেক্ষা ১৩৫ বর্ষের পূর্বের লোক। চন্দ্রগুপ্তের পুত্রবৎ ভর্তৃ বনবাসী হইয়া পতঞ্জলি-রচিত বৈয়াকরণ-মহাভাষ্যের বাক্যপদীয় রচনা করেন, ইহার ভ্রাতা ভট্ট ভট্টিকা বা রচনা করেন, এই ভর্তৃ গোরক্ষের শিষ্য হওয়া সম্ভব নহে, কারণ যোগীরা নিজ নামে পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইবার চেষ্টা মাত্র করেন না, শিষ্য হইবার পূর্বের রচনা হইলেও অন্য তথ্যে মিল নাই; যথা, ইহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিলেন ও তাহার নাম ছিল 'সিন্ধুমতী'।

গোরক্ষশিষ্য ভর্তৃর পত্নীর নাম পিঙ্গলা। তিনি পতিব্রতা ছিলেন, তাহার পতিব্রতা ধর্ম্মই ভর্তৃকে সম্রাট লইবার প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত করিতে থাকে, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাচীনকাল হইতেই যোগিসমাজে ও অন্ত্য প্রসিদ্ধ আছে। ইহার অতিরিক্ত এই ভর্তৃ গোপীচন্দ্রের মাতুল ছিলেন।

এই ভর্তৃ গোবিন্দ ব্রাহ্মণের পুত্র, যদি গোরক্ষ-শিষ্য হন, তবে গোপীচন্দ্রের জন্মদাত্রী মাতা কোথায় ছিলেন? ইহার পিতা গোবিন্দ ব্রাহ্মণের যদি কোন কন্যা থাকিয়া থাকে, তবে তাহার ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আর চন্দ্রগুপ্তের যদি অন্য কন্যা হইয়া থাকে তবে সে ভর্তৃর ভগিনী হইতে পারে না। এই সকল কারণে মনে হয় আমাদের অভীষ্ট প্রথম ভর্তৃ ও বিক্রমই ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তথাপি এই যুক্তির উপর নির্ভর করা কঠিন, কারণ ইতিহাসে যাহা লিপিবদ্ধ থাকে, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু যথার্থ ইতিহাসও পাওয়া কঠিন। অলবার রাজা ভর্তৃকাহিনীর অনুসন্ধানে উজ্জয়িনীতে লোক প্ররণ করিয়াও যথায়থ তথা-লাভে সমর্থ হন নাই। উপসংহারে বলা হইতেছে যে, প্রথম ভর্তৃ ও বিক্রম পরস্পরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ ছিল ও এই ভর্তৃই শ্রীনাথজী গোরক্ষনাথজীর শিষ্য হন।^১

অতএব উক্ত লেখকের মতে গোপীচন্দ্রের মাতুল ভর্তৃ গোরক্ষশিষ্য ছিলেন না। গোবিন্দ ব্রাহ্মণের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের দৌহিত্র ভর্তৃই গোরক্ষ-শিষ্য ছিলেন। এই ভর্তৃর ভ্রাতা বিক্রমকে শালিবাহন পরাজিত করিয়া নিজ সম্বৎ প্রতিষ্ঠা করেন, এই শালিবাহন-সম্বৎ আজ ১৮৬৫ (খৃঃ ১৯৪৪এ)। অতএব ইহা দ্বারা গোরক্ষের সময় নির্ণয় করিতে হইলে ভর্তৃ-বিক্রমেরও কিছু পূর্বে তাহার কাল-নির্ণয় করিতে হয়, ইহা অসম্ভব মনে হয়।

অন্য ভর্তৃর জন্ম-কাহিনী,—তিনি দেবতা মিত্রাবরুণের পুত্র, যুজিকা-ভাণ্ডে তাহার জন্ম হয়, এই ভাণ্ডের নাম ভর্থী, তাই পরে তাহার 'ভর্থী' নাম হয়। এক হরিনী ইহাকে স্তনদানে বর্দ্ধিত করে। কালক্রমে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমের সাহচর্যে ভর্তৃ রাজনীতিতে পটু হন। একদা যুগয়াকালে এক হরিনী বধ করিয়া তিনি হরিনীর ত্বগ্ধে অভিভূত হইয়া পড়েন ও অকস্মাৎ গোরক্ষের সহিত বনমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় হরিণের জীবনদান-অনুরোধের প্রতিদানে নিজে সম্মান লইতে প্রতিশ্রুত হন। গোরক্ষও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভর্তৃ গোরক্ষ-সমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী পিঙ্গলার অভিশাপ-ভয়ে দীক্ষা লইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিক্রমের রাজ্যে ভর্তৃর ধর্মভগিনী ও গোপীচন্দ্রের জন্মদাত্রী

মৈনাবতী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে গোরক্ষ কিয়ৎকাল উজ্জয়িনীতে বাস করেন। ভর্তৃ পিঙ্গলার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেও সম্মাসগ্রহণ করিলেন না। অন্ত্যদিন মৃগয়ায় গিয়া তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল, তখন মৃগবধ করিয়া সেই রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া মৃত্যুসংবাদ-সহ তাহা প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন, তাহা দর্শনে পিঙ্গলা প্রাণত্যাগ করিলেন। ভর্তৃও সেই শোকে গোরক্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, সেই অবধি ভর্তৃ 'ভর্তৃনাথ'।

এই ভর্তৃর ধর্মভগিনী মৈনাবতীই (বা ময়নামতী) গোপীচন্দ্রের মাতা ছিলেন, গোপীচন্দ্র জ্বালেন্দ্রনাথকে কূপে নিক্ষেপাদি কষ্টে দিবার পর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই কাহিনী বঙ্গদেশের গীতিকার বিষয়বস্তু।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ

পাঞ্জাব ও সংযুক্ত-প্রদেশে নানক ও কবীরের যেরূপ আদর, মহারাষ্ট্র-প্রদেশে জ্ঞানদেবের সেইরূপ আদর। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতা-ভাষ্যে পাওয়া যায়। ইনি যোগেন্দ্র-গোরক্ষনাথের শিষ্য ও মহাত্মা গৈনানাথের প্রশিষ্য ছিলেন। মহারাষ্ট্র-ভাষায় ইনি 'যোগিসম্প্রদায়াবিকৃতি', 'গীতাভাষ্য', 'অমৃতানুভব' আদি গ্রন্থ রচনা করেন।^১ অতএব জ্ঞানদেবকৃত জ্ঞানেশ্বরীতে যে নাথগুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে ইতিপূর্বে তাহা হইতে গোরক্ষের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। গোরক্ষনাথ জ্ঞানদেবের পিতামহ গোবিন্দপন্ডের গৃহে আগমন করেন ও কয়েক পুরুষ ধরিয়া ইহাদের নাথসম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। জ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল ১২৯০ খৃঃ।^২ জ্ঞানদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিবৃত্তিনাথ, একস্থলে নিবৃত্তিনাথ বলিয়াছেন গোরক্ষনাথ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসায়নের গুঢ় রহস্য বুঝাইয়াছেন, অতএব নিবৃত্তিনাথের সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় (নিবৃত্তিনাথের কাল ১২৭৩-১২৯৭ খৃষ্টাব্দ)।^৩

১২৭৫ খৃঃ জ্ঞানদেবের (পরে জ্ঞানেশ্বর) জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রে

১। যোগিসম্প্রদায়াবিকৃতি, ভূমিকা, পৃ ৫।

২। ব্রীংস—গোরক্ষনাথ, পৃ ২৪২।

৩। কল্যাণ, সম্বৎ ১৮৫৬, শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্তিনাথ, পৃ ৪৮৭, ৪৯০। History of Indian Philosophy Vol. VII, p. 31. Indian Mysticism by Ranade.

আলন্দী নামক স্থানে বিট্ঠেল পন্থ ও কৃষ্ণগীবাঙ্গি ব্রাহ্মণ-দম্পতীর তিন পুত্র ও এক কন্যা হয়। সম্রাস অবলম্বনের পর গুরুর আদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর এই চারি সন্তানের জন্ম হয়, তাই এই পরিবার সমাজচ্যুত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র নিবৃত্তিনাথ নাথগুরু গহনীর কৃপা লাভ করেন এবং নিবৃত্তিনাথ স্বীয় ভ্রাতাভগিনীদের দীক্ষা দান করেন। আলন্দীর ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানদেবকে দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, জ্ঞানদেব যোগশক্তি-বলে যাকে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করাইতে লাগিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে 'জ্ঞানেশ্বর' অর্থাৎ জ্ঞানের যথার্থ অধিকারিক্রমে মান্য করিতে লাগিলেন। মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্ঞানেশ্বর ভগবদগীতার ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, তাহা জনৈক সচ্চিদানন্দকর্তৃক 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে সংগৃহীত হয়। নামদেব জ্ঞানেশ্বরের পরমবন্ধু ছিলেন, ইহারা একত্রে তীর্থ-পর্যটন ও ভাগবতধর্ম প্রচার করেন। কায়সিদ্ধ মহাযোগী ছদ্মা বটেশ্বরও জ্ঞানেশ্বরের যোগবলের নিকট মস্তক নত করেন। জ্ঞানেশ্বর মাত্র ২১ বৎসর বয়সে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন।^১

জ্ঞানেশ্বরের শ্রায় তদীয় ভগিনী মুক্তাবাঙ্গি যোগধর্ম-পরায়ণা ছিলেন, তাঁহার রচিত অভঙ্গীগুলিতে যোগবিষয়ক নাদবিন্দু, শূণ্যশূণ্য, অনাহতধ্বনি, সহস্রদল, অজপা প্রভৃতি বহু কথা আছে।

গহনীনাথ, চর্পটনাথ প্রভৃতির উৎপত্তি-কথা

প্রবাদ যে কতিপয় বালকের অনুরোধে গোরক্ষ তাহাদের মূর্তিকা দিয়া মনুষ্যমূর্তি নিশ্চিত করিয়া দেন ও তাহাতে প্রাণসঞ্চার করেন। এই মূর্তিরূপী কালে 'গহনীনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনি নবনারায়ণের একজন।

ব্রহ্মার কৃপায় বালুকারাশির মধ্যে নবনারায়ণের পিঙ্গলায়নের অবতার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গুরু মৎস্যেশ্বর-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। দ্বাদশ বৎসর অস্ত্রে ইনি 'চর্পটনাথ' নামে খ্যাত হন। ইহার অষ্ট মহাসিদ্ধ যোগী শিষ্য হয়।^২

নাথসম্প্রদায়ে বাবা আমনাথজী সিদ্ধরূপে গণ্য। ইনি গোদাবরী

১। কলাণ-কবিতক, জাম্বারী, ১৯৪১, 'জ্ঞানেশ্বর'; জ্ঞানেশ্বরী-ভূমিকা

২। যোগিসম্প্রদায়বিভূতি, পৃ ৭২-৭৪, ১০৭-১১৪

তটে যোগাভ্যাস করিতেন। ইহার পঞ্চশিষ্যসহ ইনি সমাধি গ্রহণ করেন এইরূপ খ্যাতি আছে।’

শ্রীগন্তীরনাথজী

যোগিরাজ শ্রীগন্তীরনাথজী শ্রীগোরক্ষনাথের আধ্যাত্মিক বংশধর-রূপে প্রসিদ্ধ। বর্তমান যুগে ইনি মহাসিদ্ধ পুরুষরূপে খ্যাত। ইহার পূর্বজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “প্রপঞ্চ সে ক্যা হোগা ?” অর্থাৎ এ সব বিষয় জানিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের কি উন্নতি হইবে ?

গন্তীরনাথজী গোরক্ষপুরের মোহন্ত বাবা গোপালনাথজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গন্তীরনাথ দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার চরিত্রবলও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। যৌবনে নাথযোগি-সম্প্রদায়ের জনৈক অওঘর মহাপুরুষের সঙ্গলাভে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে। একরাতে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে সংসার ত্যাগ করেন। গোপালনাথজী তাহাকে সন্ন্যাস দেন এবং দেবীপাটানের শিবনাথজী তাঁহাকে কুণ্ডল ধারণ করান। তাঁহার স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গ গান্ধীর্যের নিমিত্ত তাঁহার গন্তীরনাথ নাম হয়।

দীক্ষান্তে গন্তীরনাথ তীর্থ-পর্যটন ও সাধনে নিযুক্ত থাকেন। কালক্রমে গোরক্ষপুরের মঠে উপযুক্ত মোহন্তের অভাব হয় এবং গন্তীরনাথকে মোহন্তপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি পদগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে সুন্দরনাথ মোহন্তপদে বৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে গোরক্ষপুরের মঠের তত্ত্বাবধান ও সেবার ভার লইয়া মঠাধ্যক্ষরূপে গন্তীরনাথকে গোরক্ষপুরেই বসবাস করিতে হয়। এই সময়ে তাঁহার সেবা ও ব্যবহারে জনসাধারণ ও ভক্তগণ মুগ্ধ হন। কালীনাথ, শক্তিনাথ, নিবৃত্তিনাথ, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় ছয়শত বাঙ্গালী গন্তীরনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ‘আশাবতীর উপাখ্যানে’ বাবাজীর গুণ-কীর্তন করিয়াছেন—তবে তাঁহার নাম দেন নাই।

বাবা গন্তীরনাথ দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ইহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গোরক্ষ-

পুরেও ইনি অতিথি-সেবার জন্ম খ্যাত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে অলৌকিক উপায়ে অপ্রত্যাশিতরূপে আগত বহু অতিথিকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইয়া বিদায় দিয়াছেন।

বাবাজী কলিকাতায় আগমন করিলে শত শত ধর্মার্থী ইহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে বাবা গম্ভীরনাথজীর ব্যবহারিক জীবনের অবসান হয়, তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপ্রাপ্ত বাঙ্গালী ভক্ত সাধু শাস্তিনাথ ও নিবৃত্তিনাথ অद्याপি গোরক্ষপুরের মঠে সাধন-ভজনে নিরত আছেন। সেখানে শাস্তিনাথজীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়।

(গম্ভীরনাথজীর জীবনী—‘গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ’—অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘প্রয়াগধামে কুন্তমেলা’—মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ও ‘আশাবতীর উপাখ্যান’—বিজয়কৃষ্ণ রচিত দ্রষ্টব্য।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন নাথ সিদ্ধ যোগীদের নাম ও শ্রেণী-বিভাগ

সাধারণতঃ 'নবনাথ' নামে কানফাটা-সম্প্রদায়ের সিদ্ধ যোগীদের প্রসিদ্ধি আছে। তাহাদের মংস্বেন্দ্র, গোরক্ষ, চর্পট, মঙ্গল, ঘুগো, গোপী, প্রাণ, সুরত, ও চম্ভা এই তালিকা পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের তালিকা-মতে প্রকাশ, বিমর্ষ, আনন্দ, জ্ঞান, শল্য, পূর্ণ, স্বভা, প্রতিভা ও সুভগ এই নাম দিয়াছেন। এই নামসকল রূপক-বিশেষ। তদ্ব্যতীত নয়টি চক্রের অধীশ্বর-রূপে নবনাথের কল্পনা করা হইয়াছে ইহাও সম্ভব। গোরক্ষনাথ তালুচক্রের সাধনা-দ্বারা ক্রোধ ও লিঙ্গ-জয়ী হইয়া তালুচক্রের অধীশ্বর হইয়াছেন, মংস্বেন্দ্র খেচরী-মুদ্রা-সাধনে জিহবার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব মংস্বেন্দ্র ও গোরক্ষ প্রকৃত নাম নহে এইরূপ মতামত প্রচলিত আছে। নবদ্বারের নাম 'নবনাথ' হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

গোরক্ষ তালুচক্রের দেবতা ও তাঁহার শক্তির নাম 'সিদ্ধাস্ত', আদিনাথ হইতে মংস্বেন্দ্র যে জ্ঞানলাভ করেন তাহা ঈশ্বর-সন্তান গোরক্ষনাথকে দান করেন, উদয়নাথাদি মংস্বেন্দ্রের পুত্র—এইরূপ বিবৃতিও আছে। আদিনাথ, উদয়নাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, গজকর্ণ, অন্তর্ঘোর, মচ্ছেন্দ্র, চেরঙ্গ, গোরক্ষ—এই নবনাথ-তালিকাও প্রচলিত।

গোরক্ষ-সিদ্ধাস্ত-সংগ্রহে (পৃ ৪০) আদিনাথ, মংস্বেন্দ্রনাথ, দণ্ডনাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, কুর্ম্যনাথ, ভবনার্জি ও তাঁহার ঈশ্বর-সন্তান-শ্রীগোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। রোজ ও কীটস সাহেবও বিভিন্ন তালিকা দিয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন তালিকায় বিভিন্ন নাম পাওয়া গেলেও আদিনাথ, মংস্বেন্দ্র ও গোরক্ষের নাম সাধারণ। কল্পদ্রুম তন্ত্রের 'গোরক্ষ-সহস্রনাম-স্তোত্রে' এক গোরক্ষনাথই নবভাবে নবনাথরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনিই নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্বিকল্প, নিরাময়, বিধি, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। গোরক্ষ-সিদ্ধাস্ত সংগ্রহে (পৃ ৫১) নবনাথ-পরিচয় আছে এবং নবনাথের স্থিতিবর্ণনাও আছে (পৃ ৪৪, ৪৫); অষ্ট দিকে অষ্ট নাথ, মধ্যে এক নাথ—এইরূপে নবনাথের স্থিতিব্যবস্থা হইয়াছে।

নবনাথ ব্যতীত দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ সিদ্ধা, দ্বাদশ পন্থ ও অনন্ত সিদ্ধারাও কানফাটা যোগী-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধারা হিমালয়বাসী, ৮৪ সিদ্ধা নানককে তাঁহাদের অলৌকিক বিভূতি দেখান, নানকসাখীতে নানকের সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত আছে। ৮৪ সিদ্ধা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে অবতীর্ণ হন, ও তাঁহারা এখনও ভূমণ্ডলে সিদ্ধ-দেহে বিচরণ করেন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। গ্রাম্য লোকদের মধ্যে সিদ্ধাদের পূজা প্রচলিত আছে।

হঠযোগ-প্রদীপিকায় (পৃ ২) আছে—আদিনাথই প্রথম সিদ্ধ, তিনি পার্শ্বতীকে হঠযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে (পৃ ৬) হঠবিজ্ঞানিকারীদেরও নাম আছে। নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র তাঁহার শিষ্য, শবর, ভৈরব, চৌরঙ্গী, বিরূপাক্ষ, কাণেরী, নিত্যনাথ, বিন্দুনাথ, অল্লাম, ঘোড়াচোলী, টিংটিগি ইত্যাদি মহাসিদ্ধা হঠযোগ-প্রভাবে “খণ্ডিহা কালদণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তিতে।” সন্তদের-বচনেও নাথসিদ্ধদের উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়।

নাথ-সাহিত্যে ‘নাথ’ নামটি অনেক সময়ে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের ব্যবহৃত হয়, মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের নামের ব্যাখ্যায় যোগলব্ধ তুরীয় অবস্থারূপে বর্ণিত হয়, যথা যিনি পাশ (মৎস্য) বা বন্ধন ছেদ করিতে সমর্থ তিনিই মৎস্যেন্দ্রনাথ।

ভারতীয় নীতি অনুযায়ী নাথদের অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা করা হয়, নাথ-মার্গের নামান্তর সিদ্ধ-মার্গ, অবদুত-মার্গ বা যোগ-মার্গ। বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে বহু নাথ সিদ্ধের নাম পাওয়া যায়। রসেশ্বর সিদ্ধ মধ্যেও কয়েকজন সিদ্ধের নাম নাথ সিদ্ধদের সহিত সাধারণ, যথা—কপিল, নাগার্জুন, চর্পটি ইত্যাদি। কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তকও আদিনাথ বা শিব, ইহাদের দ্বাদশ গুরু ও দ্বাদশ শিষ্যের নামের সহিত নাথ সিদ্ধদের নামের ঐক্য আছে, যথা—নাগার্জুন, সত্যনাথ, ভীমনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধর ইত্যাদি। বঙ্গীয় গীতিকায় গোরক্ষ, হাড়িপা, জালন্ধরিপা প্রভৃতির বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও শৈবযোগী মধ্যে বহু নাম সাধারণ, নাথ ও জৈনদের মধ্যেও কয়েকটি নাম সাধারণ, যথা আদিনাথ। তান্ত্রিক সাহিত্যে বিশেষতঃ ত্রিপুরাখণ্ডে বহু সিদ্ধের নাম আছে। ১৮৯১ খ্রষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে যে জৈন তীর্থঙ্করদের নামের সহিত দ্বাদশপন্থী যোগীদের কতক নামের ঐক্য আছে

শ্রেণী-বিভাগ—কানফাটা বা নাথযোগীদের গুরুপরম্পরা-নির্ণয় কঠিন হইলেও প্রধান প্রধান গুরুর নামে দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শাখা আছে, যথা :—সংনাথ, রামনাথ, ধরমনাথ, লক্ষ্মণনাথ, দারিয়ানাথ, গঙ্গানাথ, বৈরাগ (ভক্তহরি) রাওল (নাগনাথ), জালন্ধরিপা, ঐপন্থ, কপলানী, ধজ্জননাথ, (ও কানিপা)। এই যোগীরা সকলেই শক্তির উপাসক, প্রবাদ আছে যে স্বয়ং শক্তি হইতেই এই বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে।

পাঞ্জাবের টিলামঠে প্রবাদ আছে যে, অষ্টাদশ শ্রেণী শৈবপন্থী ও দ্বাদশ শ্রেণী গোরক্ষনাথীর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া শ্রেণী অবশিষ্ট থাকে, তাহারা সকলেই গোরক্ষনাথের পন্থ মানিয়া লয়। শৈবদের মধ্যে—

- ১। কচ্ছপ্রদেশের কান্ধারনাথ
- ২। পেশোয়ার ও রোটকের পাগলনাথ
- ৩। আফগানিস্থানের রাওল
- ৪। পংথ
- ৫। মাড়ওয়ারদের বন
- ৬। গোপাল বা রামকে

গোরক্ষপন্থীদের মধ্যে

- ১। হেথনাথ
- ২। বোম্বাইয়ের দেবী বিমলার 'ঐপন্থ'র কোলিনাথ
- ৩। চাঁদনাথ কাপলানী
- ৪। জয়পুরের পাওনাথ (জালন্ধরিপা, কানিপা, গোপীচাঁদ এই শ্রেণীর)
- ৫। বৈরাগ রতন নাথ
- ৬। ধজ্জননাথ, (মহাবীর), ইহারা বিদেশীয়।

এই দ্বাদশ পন্থ হইতে কানফাটা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ শৈবরা গোরক্ষনাথের রীতিনীতিও মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হওয়ায় উহারাও গোরক্ষপন্থী-মধ্যে গণ্য হয়।

১। সং-নাথী—পুরীতে ইহাদের প্রধান মঠ, থানেশ্বর, কর্ণাল, ভেওয়াতেও ইহাদের মঠ আছে। মূলতঃ ইহারা শৈবপন্থী। বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রখণ্ড-নির্মিত টুপী, আলখাল্লা ও চাদর-ধারণ ইহাদের বিশেষত্ব। ধর্ম্মনাথ ও তাঁহার কচ্ছ সহযাত্রী গরীবনাথ এই সম্প্রদায়ের।

২। রামনাথী—ইহারা শৈব, দিল্লীতে ইহাদের মঠ আছে, দাস গোপালনাথীরা প্রধানতঃ যোধপুরে বাস করে। রামচন্দ্রের সহিত সম্পর্ক নাই, ভুলক্রমে রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের নাম জড়িত করা হয়।

৩। ধর্ম্যনাথী—এই সম্প্রদায় সং-নাথী রাজা ধরমের প্রবর্তিত, ইনি যোগী ছিলেন। কচ্ছ প্রদেশের প্রসিদ্ধ মঠ ধীনধোর ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মতান্তরে ধর্ম্যনাথ গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন।

ধীনধোর মঠে ইহার পূজা হয়। এই মঠের যোগীরা এবং মোহন্ত স্বয়ং ব্রহ্মচারী। পার্শ্বতা অঞ্চলের বামাচারী তান্ত্রিকেরা নিজেদের ধর্ম্যনাথী বলে।

৪। লক্ষ্মণনাথী—গোরক্ষনাথের পর ইনি পাঞ্জাবের টিলা মঠের মোহন্ত হন। এই পন্থের দুইটি বিভাগ আছে নটেত্রী ও দরয়া, প্রথম দল টিলাতে ও দ্বিতীয় দল সমতল ভূমিতে বাস করে।

৫। দরয়ানাথী—সিদ্ধু প্রভৃতি পশ্চিম ভারতে ইহাদের পীঠস্থান। দরয়ানাথীরা মূলতঃ হেথনাথী অর্থাৎ গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের আদিম পন্থী। সিদ্ধুদেশে প্রতিবৎসর ইহাদের মহোৎসব হয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি এই মহোৎসবে যোগদান করেন।

৬। গঙ্গানাথী—কপিলমুনির শিষ্য গঙ্গানাথ-প্রবর্তিত পন্থ। ইহাদের সহিত কায়নাথী ও রতননাথীদের সম্বন্ধ আছে।

৭। বৈরাগী (ভর্জুহরি)—ভোজরাজের পুত্র ভর্জুহরি উজ্জয়িনীর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন, রতননাথ ইহার শিষ্য। প্রবাদ আছে যে, পত্নীর শোকে ইনি গোরক্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুসলমানেরাও ইহাকে শ্রদ্ধা করেন। কাবুলে ইহাদের পীঠস্থান আছে।

৮। রাওল (নাগনাথী)—মুসলমান যোগীরাই 'রাওল' নামে প্রসিদ্ধ, ইহারা যাযাবর বৃত্তির জন্ত খ্যাত। রাওলপিণ্ডে ইহাদের প্রধান আশ্রম।

৯। জালন্ধরিপা-পন্থ—জালন্ধর নাথ-পন্থ ত্যাগ করিয়া 'পা'-পন্থের প্রবর্তন করেন। 'পা' শব্দটি তিব্বতী, ইহার অর্থ অধিকারী। পা-পন্থীরা শৈব। কানিপা, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পন্থের।

১০। 'ঐ'পন্থী—গোরক্ষের শিষ্যা বিমলা মাই ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী, 'মাই'শব্দ 'ঐ'শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহারা বক্র খঞ্জ-যষ্টি ব্যবহার করেন। রোটকে ইহাদের মঠ আছে, তন্মধ্যে কোন মূর্তি নাই।

হরিদ্বারেও ইহাদের বৃহৎ মঠ আছে। দাবিস্থানে 'ঐ'পন্থীর উল্লেখ আছে, দাবিস্থান-রচয়িতা 'ঐ'পন্থীর সিদ্ধদেহ যোগীদের স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার বর্ণনা আছে।

১১। কাপালানী - গোরক্ষ-শিষ্য কপিলমুনি-দ্বারা প্রবর্তিত।

গঙ্গাসাগরে ইহাদের আশ্রম। দম্ভমের নিকট ষাটগাছি গ্রামের 'গোরক্ষ বাসলী' নামক স্থানের মোহন্তেরা এই শ্রেণীর। প্রবাদ আছে যে গোরক্ষনাথ এই স্থানে ধ্যান করিবার মানসে কপিলমুনিকে গঙ্গা-সাগরে গিয়া অবস্থান করিতে উপদেশ করেন, বর্তমান পূজারীর নিকট আমি এই কিংবদন্তীর কথা শুনিয়াছি।

১২। ধ্বজনাথী—ইহারা ধ্বজাধারী, মহাবীর হুমানের সহিত ইহাদের যোগ আছে। সিংহল, পেশোয়ার, অম্বালাতে ইহাদের বসবাস।

১৩। কানিপা-পন্থ—জালন্ধরিপা গোপীচাঁদ-কর্তৃক কৃপমধ্যে আবদ্ধ থাকাকালে, কানিপা মোহন্ত-পদ গ্রহণ করিয়া এই পন্থ প্রবর্তিত করেন। কথিত আছে কানিপা বামাচারী ছিলেন, 'গোপীচাঁদ' বা 'সিদ্ধ-শৃঙ্গারী' এই সম্প্রদায়ভুক্ত। গোপীচাঁদ হইতে বঙ্গীয় শেপলা বা সাপুড়ে জাতির উদ্ভব। তৎকালে বঙ্গদেশে ও আসামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল।

নাথ-যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়

গোরক্ষনাথীদের ব্রহ্মচর্য-পালন বিধি। ধীনোদর, দেবীপাটান ও গোরক্ষপুরে বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোক মঠের বাহিরে কাৰ্য্য করিলেও মঠ-মধ্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। সন্ন্যাসই যোগীর আদর্শ, তথাপি বিবাহিত যোগীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

কাশীধামের কাল-ভৈরবের মন্দিরের পূজারী বিবাহিত, তিনি-সঙ্গীক মন্দিরের বাহিরে বাস করেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা কানফাটা-যোগীদের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ মঠ-মধ্যেও বিবাহিত যোগী দেখা গিয়াছে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বুকানন গোরক্ষপুরের মঠে বিবাহিত যোগীদের বাস ও তাহাদের শিক্ষা-সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। বিবাহিত যোগীদের নাম ঘরবারী, বিন্দিনাগী, সমযোগী ও গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচারীদের নাম 'মঠধারী'। বিবাহিত যোগীরাও কুণ্ডলাদি ধারণ করেন ও যোগাভ্যাস করেন, ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে কিন্তু স্বজাতির মধ্যে বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে।

নৈনিতাল, আলমোরা, সিমলা পাহাড়ে ধর্মনাথী ও সং-নাথী গার্হস্থ্য যোগী আছে। ইহাদের সম্ভাব্যনাও কেহ কেহ যোগী হয়। এই যোগীরা তন্তুবায়ের, মণিহারীর, সৈন্তদলে যোগদানের বা উত্তমর্ণাদির কার্য্য-দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে। সিমলা পাহাড়ের শবদাহী যোগীদের সহিত অন্য যোগীরা আহারাদি করে না। সিমলা পাহাড়ের উত্তরে কুণ্ডলধারী নাথ-যোগীদের বাস, ইহারা সামান্যতঃ সাধন ও শিবপূজা করে, প্রধানতঃ শাক-সব্জী-উৎপাদন ও অস্ত্যোষ্টি-ক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করে।

পাঞ্জাবের গার্হস্থ্য যোগীদের নাম 'রাওল,' ইহারা গীত গাহিয়া ভিক্ষা করে ও হস্তগণনা-দ্বারা জীবিকার্জন করে। 'সংযোগ' নামে আর একটি বিবাহিত সম্প্রদায় আছে। কুলুর গার্হস্থ্য যোগীদের নাম 'নাথ,' আন্ধালাতে বিবাহিত যোগীদের নাম 'যোগীপদ'। বিধবা-বিবাহও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কাংরাতে 'অন্দরলা' এবং 'বাহিরলা' নামে দুইটি গোরক্ষ-সম্প্রদায় আছে, প্রবাদ যে গোরক্ষ মৎস্যেশ্বরের দুই পুত্রকে কাহারও অলক্ষ্যে বলি দিবার নিমিত্ত দুইটি ছাগ প্রদান করেন, দ্বিতীয় পুত্র আসিয়া বলিল চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী নাই এরূপ স্থান নাই, সেই প্রিয় হইল, গোরক্ষ তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, অষ্টটিকে বিতাড়িত করিলেন, সেই হইতে 'অন্দরলা' ও 'বাহিরলা'-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।

যুক্ত প্রদেশের যোগীরা নিম্ন শ্রেণীর উপযোগী কার্য্য করে। বোম্বাই প্রদেশের যোগীরা মনিহারী ও মুক্তাপ্রবালাদি বিক্রয় করে।

বঙ্গদেশ ও আসামের যোগীজাতির বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায়।^১ বুকাননের মতে গোপীচন্দ্রের সময়ে ইহারা পুরোহিতের কার্য্য করিত, কিংবা উত্তর-পূর্ব বঙ্গের প্রবাদ-মতে ইহারা শঙ্কর-শিষ্য ছিল, মত্তপানাসক্ত হওয়ায় শঙ্কর-কর্তৃক জাতিচ্যুত হয়। রংপুরের চুণোযোগীরা নিজেদের গোপীচাঁদের পুরোহিতের বংশধর বা শিবগোত্র বলে, ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। ময়নামতী, মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গীত ইহারা গাহিয়া থাকে। এই সকল গীতিকায় হাড়িপা গুরু হইয়াও নিম্ন শ্রেণীর বা বৌদ্ধমতালম্বী ছিলেন দেখা যায়, অতএব শঙ্কর-কর্তৃক জাতিচ্যুত হইবার কাহিনীর মূলে হয়ত কিঞ্চিৎ সত্য আছে। হাড়িপা, কানিপার

শিষ্য ছিলেন। হাড়িপা দীর্ঘকাল জালন্ধরে বাস করেন বলিয়া 'জালন্ধারীপা' নামে অভিহিত হন।

বঙ্গীয় যোগী জাতির মধ্যে বহু বিভাগ আছে, হেলয়রা কৃষিকার্য্য ও তন্তুবায়েয় কার্য্য করে। থিয়রেরা ভিক্ষা করে ও চূণ তৈয়ারী করিবার জন্য ঝিছুক পোড়ায়। ইহারা নিরক্ষর মগ্গপানাসক্ত, এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। রংপুরের চূণোতি যোগীরা চূণ তৈয়ারী করে, এবং পানাতি যোগীরা পান উৎপাদন করে।

পূর্ববঙ্গে মাস্ত্র ও একাদশী নামে দুইটা যোগী-সম্প্রদায় আছে। ইহারা পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করে না, কিন্তু পরস্পরের জলপাত্র হইতে জলপান করে, ইহাদের মধ্যেও অন্তর্বিবাহ প্রচলিত নাই। মাস্ত্র যোগীরা ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বিক্রমপুরের দক্ষিণে বাস করে, একাদশীরা বিক্রমপুরের উত্তরে ও অধিকাংশ ঢাকায় বাস করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একমাত্র ত্রিপুরাতেই প্রায় ৬৮,০০০ যোগী ছিল।^১ মাস্ত্ররা অষ্টসিদ্ধার বংশধর, একাদশীরা নাথ-শিষ্যের বংশধর-রূপে পরিচিত। মাস্ত্র ও একাদশী যোগীর মধ্যে অশৌচকাল লইয়াও মতভেদ আছে। মাস্ত্ররা মাসাবধি এবং একাদশীরা একাদশ দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ পালন করে। যোগীদের মধ্যে যাহারা দ্বীপে বাস করে তাহাদের নাম 'সন্দ্বীপ' যোগী ও যাহারা স্থলে বাস করে তাহাদের 'ভুলুয়া' আখ্যা দেওয়া হয়। যাহারা কৃষিকার্য্যরত তাহাদের হালোয়া যোগী বলে, সম্ভবতঃ 'হাল' শব্দ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তন্তুবায়েয়-কার্য্য ত্যাগ করায় জাতিচ্যুত হয়।

বিবাহ-উৎসবে মাস্ত্র যোগীরা মাতামহী প্রমাতামহী প্রভৃতির পূজা করে, ইহারা উপবীত ধারণ করে, মৃতকে সমাধিস্থ করে ও পুত্র কর্তৃক মুখাগ্নি করায়। মাস্ত্র যোগীদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই, অধিকারী পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করে। এই অধিকারীরা যোগী কন্যাও বিবাহ করিতে পারে। একাদশী যোগীদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে, ইহাদের 'বর্ণশ্রমণ' বলা হয়, 'মহাঘা' নামেও ইহারা পরিচিত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এক বিক্রমপুরেই শতাধিক মহাঘা বাস করিত। একাদশী যোগীরা কুষোপাসক, কেহ কেহ শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে, বৈষ্ণব যোগীর সংখ্যাও ইহাদের মধ্যে কম নহে। বুদ্ধ-শাতাতপীয়-সংহিতা ও

চন্দ্রাদিত্য পরমাগমসংহিতা ইহাদের শাস্ত্ররূপে গণ্য।^১ মাস্ত ও একাদশী উভয় শ্রেণীর পূর্বপুরুষই যোগী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। ইহারা সাধারণতঃ তন্তুবায়, এক্ষণে কৃষিকার্য্য, স্বর্ণকারের কার্য্য, বিম্বুক দাহের কার্য্য ও সরকারী বিভাগে সামান্য বেতনের কার্য্য করিয়া থাকে।

যুক্ত প্রদেশের মাস্ত যোগীদের প্রধান বাসস্থান বৃন্দাবন, মথুরা ও গোকুল। ইহাদের প্রধান তীর্থ কানী, गया ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড।

পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি বিভাগের দালাল বাজারের জমিদারেরা মাস্ত যোগীদের শীর্ষস্থানীয়, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের এক যোগী সরকার কর্তৃক রাজা উপাধি ও নিম্ন জমি প্রাপ্ত হন।

পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম-ঘোরিরা যোগীদের অন্যান্য যোগীরা অবজ্ঞা করে, কারণ ইহারা ধর্ম, শীতলা প্রভৃতির উপাসক। ইহাদের মধ্যে মৎস্তেন্দ্র, গোরক্ষাদি শ্রেণী-বিভাগ আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৩,৫০,০০০ র অধিক যোগী বাস করিত। নিজামরাজ্যে 'দাভরে' ও 'রাওল' নামে গোরক্ষসম্প্রদায়ের দুইটি বিভাগ আছে। দভর নামক ঢোল সহ গীত গাহিবার নিমিত্ত ইহাদের নাম দাভরে হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভৈরবের মন্দিরে উৎসর্গীকৃত বালক-বালিকাদের ইহারা দীক্ষা দেয় ও কুণ্ডল ধারণ করায়। ইহাদের বিবাহে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। ইহারা মন্ত্রমাংসাদি ভক্ষণ করে ও ভিক্ষাবৃত্তি করে। রাওল যোগীরাই সংখ্যায় অধিক। ইহারা কর্ণে শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করে। ইহারা কুলবী, রাজপুত ইত্যাদি জাতি হইতে দীক্ষিত হইয়াছে। দাভর ও রাওলদের মধ্যে ভৈরবাদি হিন্দু দেবতার পূজা প্রচলিত আছে, হিন্দুর উৎসবাদিতে ইহারা যোগদান করে, মৎস্তেন্দ্র-গোরক্ষ-প্রবর্তিত পন্থানুসরণ করে এবং ত্রিশূল ও লিঙ্গ ধারণ করে।

বোম্বাই প্রদেশে যোগীদের 'গুজরাট' ও 'মারাঠা' ভেদ আছে। আবার কর্ণাটক ও কানাড়া যোগীও আছে। ইহারা ব্রহ্মচারী ও গার্হস্থ্য উভয় শ্রেণীর। মারাঠা যোগীদের দ্বাদশ শাখা আছে, প্রবাদ যে গোরক্ষ-নাথই ইহার প্রবর্তনকারী। বহু বিবাহ বা বিধবা বিবাহে ইহাদের আপত্তি নাই, ইহারা যাযাবর শ্রেণীর, পুরুষেরা গেরুয়া ধারণ করে ও হস্তিদন্তের কুণ্ডল পরে, মেয়েরা ঘাঘরা পরিয়া অশ্বোপরি গৃহসামগ্রী-সহ গ্রাম হইতে

গ্রামান্তরে স্বামী-সহ ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা ইন্দ্রজাল-পারদর্শী, গোরক্ষ ও মৎশ্বেন্দ্র ইহাদের দেবতা, গোপীচাঁদের গাথা ইহাদের প্রিয় গীত।

কাঙ্ক্ষাণের সাবন্তবাদীর নাথ-গোস্বামীরা কুণ্ডল ধারণ করে ও বিবাহাদিতে 'শ্রীগোরক্ষ' মন্ত্র উচ্চারণ করে।

পুণাতে গার্হস্থ্য যাযাবর যোগী-সম্প্রদায় গোপীচাঁদের গীত গাহিয়া ভিক্ষা করে, ইহারাও কুণ্ডলধারী ও গোরক্ষ-মৎশ্বেন্দ্রের উপাসক। মগ্ন-মাংসাদি-ভক্ষণ ও অহিফেন-সেবন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত।

বেলগাঁওতে এক যোগী-সম্প্রদায় সত্রীক বাস করে, ভিক্ষা ও কৃষি-কার্য ইহাদের উপজীবিকা।

বেরার প্রদেশের নাথ-সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা বর্তমান, তন্মধ্যে অবধূত, কানফাটা ও গোরক্ষ-শাখাই প্রধান। নব নাথের নাম অমুযায়ী নব শাখাও দৃষ্ট হয়। পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিতে হইলে ইহারা আদি-নাথ, মৎশ্বেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নাম করে। কানফাটা-যোগীরা কর্ণের কোমল নিম্ন ভাগ ছেদন করে ও গোরক্ষ-যোগীরা কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডল ধারণ করে। উৎসবাদিতে গোরক্ষ শাখার যোগীদের স্থান উচ্চতর।

বেরারের বিবাহিত যোগীদের নাম 'সম্যোগী', ইহারা বয়নাদি করে ও কবচ-বিক্রয়, ভাগ্য-গণনা ও যণ্ড-প্রদর্শন দ্বারা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

শিবরাত্রিতে ইহারা গোরক্ষ-মৎশ্বেন্দ্রের গীত গাহে, দেবী-পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এই যোগীরা সমাজের সকল শ্রেণী হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। কেবল অবিবাহিত যোগীরা 'যোগী' নামে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের যোগীরা ইন্দ্রজাল-প্রদর্শন ও ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া থাকে। সর্পাদির ক্রীড়া দেখান ও কাঁচের পুঁতি বিক্রয়ও ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা অধিকাংশই দারপরিগ্রহ করে, ইহাদের স্ত্রীরা উল্কীর কার্যে বিশেষ পারদর্শিনী। ইহারাও যাযাবর, কুস্তীরাদির মাংস ইহারা ভক্ষণ করে। বিবাহ-সময়ে বরপক্ষ মুদ্রা ও শূকরদান করে, সেই শূকরবধে উৎসব ও ভোজনাদি হয়। এই যোগীদের নাম 'পামূল' অর্থাৎ সর্প। ইহারাও মৃত দেহ সমাধিস্থ করে।

মহারাত্রি ও টুলুভাষী এক 'যোগী পুরুষ'-সম্প্রদায় আছে, ইহাদের প্রধান মঠ কাদিরীতে। ইহারা ভৈরব ও গোরক্ষের পূজা করে। ইহাদের

মধ্যে বিবাহিত যোগীরা কর্ণবেধ করে না, অপরেরা করে। ইহারা কণ্ঠে উপবীত-সহ শিঙ্গা ধারণ করে, ইহাদের বিবাহে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করে। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে না, ব্রাহ্মণকে দান করে ও কাককে আহাৰ্য্য দেয়, ভিক্ষা ও মাল-বহন ইহাদের উপজীবিকা।

যুক্ত প্রদেশের পশ্চিমে ভাদ্রী যোগী ও নন্দী যোগীরা সূচীজীবী, রেশমের সূতা-কর্তন ইহাদের ব্যবসায়। চোহান, গছেলাট প্রভৃতি রাজপুত নামের গোত্র ইহাদের মধ্যেও আছে। ‘ডোমযোগী’ নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা ভিক্ষুক। নেপালের পর্বতের নিম্ন দেশে হারুজাতিরা বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম যোগী।

শেপালা নামে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের যোগীরা সালুসাপের অস্থি-নির্মিত কুণ্ডল ধারণ করে, ইহারা সাধারণতঃ তাঁবুতে বাস করে ও সর্প-ক্রীড়া প্রদর্শন করে। কর্ণবেধ-সময়ে ইহারা গোরক্ষনাথকে নৈবেদ্য অর্পণ করে। হিন্দুস্থানের মধ্যেই হিংলাজ-গুটিকা ক্রয় করিয়া ইহারা ধারণ করে। ইহাদের উপবীত নাই, শিখদের ছায়া কেশ ও শ্মশ্রুধারণ ইহাদের রীতি। ইহারা নিজেদের কানিপা শিষ্টরূপে পরিচয় দেয়, কিন্তু যোগসাধন করে না। ভারতের সর্বত্র ইহারা সস্ত্রীক ভ্রমণ করে, মুসলমানের আহাৰ-গ্রহণে ইহাদের আপত্তি নাই বলিয়া ইহারা হিন্দুর ঘৃণ্য। কানিপা রুশিক ও সর্পাহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গোরক্ষনাথ-কর্তৃক এক ভোজ-সভা হইতে বিতাড়িত হন—এই কাহিনী প্রচলিত আছে। অতএব কাণিয়োপা বা শেপালাদের সম্পূর্ণরূপে গোরক্ষপন্থী বলা চলে না।

বগুড়ায় এক বৌদ্ধ যোগী-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাহারা তান্ত্রিক ও শৈব আবরণে আয়গোপন করিয়া আছে। বগুড়া এক সময়ে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। বগুড়ার তিন ক্রোশ উত্তরে মহাস্থান নামক স্থানটাই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন। বুদ্ধদেব এক পৌণ্ড্র-রাজকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। পৌণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত কোটিকপুর জৈনতীর্থ-বিশেষ, খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে পার্শ্বনাথ স্বামী এই রাজ্যে জৈনধর্ম প্রচার করেন। চীন পরিব্রাজক য়ুনচঙ পৌণ্ড্র-রাজ্যে দিগম্বর-জৈনদের আবাসস্থল, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম ও হিন্দুদের দেবালয় দেখেন। বৃহন্নীলতন্ত্রমতে পুণ্ড্রবর্ধন পীঠস্থান, স্ত্রবেশাদেবীর পীঠ এ স্থানে আছে। কাশ্মীর-রাজ এখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, বঙ্গের রাজকুমারী কল্যাণ দেবীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির অত্যাধি কাশ্মীরে

বর্তমান। নয়পালের সময়ে ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে, বঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রাধান্যের যুগে, হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের আচার-ব্যবহার অনেকটা শিথিল হইয়া উঠে, তৎপরে শৈবমতের প্রচারের যুগে বৌদ্ধ-যোগীরা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মগোপন করে, লবঙ্গ বা লক্ষ্মণসেনের সময়ে বৌদ্ধ-যোগী গোরক্ষ-শিষ্যেরা শৈব-সন্ন্যাসী হয়। বর্তমান যুগী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আভাস পাওয়া যায়, বগুড়ায় প্রচলিত ‘যুগীয়া কাচ’ নামক গ্রাম্য সঙ্গীত বৌদ্ধ শূন্যবাদের পরিচায়ক। বগুড়ায় যোগীর ভবন নামে গ্রাম ও মঠ আছে, ভবন-শব্দ হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে, হিন্দুরা আশ্রম, মঠ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে। যোগীর ভবনের মোহন্ত কানকাটা-সম্প্রদায়-ভুক্ত, এখানে গোরক্ষমন্দির ও গোরক্ষকুই নামে একটি মঠ বর্তমান।^১

নাথ-পন্থের সহিত যুক্ত অন্যান্য যোগী-সম্প্রদায়

পুণায় মুসলমান সিদ্ধ ‘হাণ্ডী ফরঙ্গনাথ’ গোরক্ষনাথ ও আরঙ্গজেবের শিষ্যরূপে পরিচিত। পাক্ষাবের সং-নাথীর জাফির পীরেরাও মুসলমান। ইহারা রঞ্জ ও বালকেশ্বরনাথের শিষ্য, কিন্তু ইহারা হিন্দুদের সহিত আহালাদি করে না।

রাজা রসালুর শিষ্য সম্প্রদায় ‘মাননাথী’ নামে পরিচিত। ইহারা পেশোয়ার ও কিলাম নদীতীরে বাস করে। জ্বালামুখীতে ইহাদের মঠ আছে। পঙ্গলনাথ বা অর্কনাথ এই পন্থের। ইনি এক্ষণে যুক্ত পুরুষ কৈলাসবাসী যোগী, দমদম ‘গোরক্ষ বাসলী’তে ইহার চিত্র দেখিয়াছি।

অঘোরী যোগীরা অওঘড় বা অওঘর যোগী হইতে উদ্ভূত, ইহারা শবাহারী, ইহারা গোরক্ষপূর্ব্ব যুগের যোগী।

নিমনাথ ও পরেশনাথ জৈন, ইহারা মৎস্তেন্দ্র-পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহারা সরোতোরা ও পুঞ্জ নামে দুই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

কম্বরনাথীরা ব্রহ্মচারী, ইহারা ধীনোদরের মঠের অমুরূপ রীতি-নীতি পালন করেন। গোরক্ষ-শিষ্য শরঙ্গনাথ ‘বাওয়াজী-কা পন্থের’ প্রবর্তক। ইহাদের দশটি শাখা আছে।

দস্তাত্রেয়-শিষ্য লালপাদরীরা গোরক্ষনাথীদের সংস্পর্শে থাকে। দস্তাত্রেয় কৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণ দস্তাত্রেয়-রূপে দশম শতাব্দীতে অত্রীর

১। গ্রন্থাগার, আধাট, ১০১৭, বগুড়ায় বৌদ্ধ-যোগী, লেখক—হরগোবিন্দ দাস কুহু।

দ্বীপ সতীত্ব পরীক্ষা করেন এই রূপ কিংবদন্তী আছে। পুণার বহু-স্থানে দস্তাত্রেয়ের মন্দির আছে। ত্রিমূর্তির প্রতীকরূপে ত্রিমুণ্ডারী দস্তাত্রেয়-মূর্তিও একটি মন্দির-মধ্যে আছে। দস্তাত্রেয় জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ ও অঘোরী ছিলেন।

৩/অক্ষয় দত্ত লিখিয়াছেন—সচরাচর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ প্রকার যোগী গণিত হইয়া থাকে (পৃ ১৩২, ভা-উ-স, ২য় ভাগ), তন্মধ্যে রামপন্থী যোগী, সিক্কিকাবলী যোগী, কান্ফট, অণ্ডঘড়, মচ্ছেন্দ্রী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভর্তৃহরি, কানিপা, অঘোরপন্থী, প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে।

ইহা বাতীত বহু ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে যাহারা গোরক্ষনাথকে নিজেদের গুরু বলিয়া গণ্য করে, যথা :—

রুখড়, সুখড়, গুদড়াদি সম্প্রদায়। ইহারা কানফাটাদের শ্যায় কুণ্ডলধারী।

সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধ-নামক শ্রেণী গোরক্ষের উপাসক, ইহাদের মঠে গোরক্ষের নাম অঙ্কিত আছে, আবার কাবুলের বহু মুসলমান গোরক্ষ-শিষ্য বাবা রতন হাজি দ্বারা ‘যোগী’-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। রতন হাজি সম্ভবতঃ মুসলমান ছিলেন, তিনি গোরক্ষের গুরু নামেও পরিচিত।

ভেক বরাহ-পন্থ বা কার্যনির্বাহক-সমিতি—ইহারা বিভিন্ন মঠের পরিদর্শন, মোহন্ত-নির্বাচন আদি কার্য্য করিয়া থাকেন। হরিদ্বারে ইহাদের মঠ আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে ইহার দ্বাদশ সভ্য নির্বাচিত হন, দ্বাদশ বৎসরান্তে কুম্ভমেলায় পুনর্নির্বাচন হয়। ইতিমধ্যে কোন মীমাংসার প্রয়োজন হইলে প্রয়াগ বা উজ্জয়িনীর মেলায় তাহা নিষ্পন্ন হয়; সভাপতির নাম যজ্ঞেশ্বর, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পদ থাকে। মোহন্ত-নির্বাচন পূর্বে মোহন্ত-দ্বারা হইলেও সমিতির অনুমোদন-সাপেক্ষ। ধীনোদরের মোহন্তের নাম ‘পীর’, প্রথামুযায়ী রাও কর্তৃক নূতন মোহন্ত নির্বাচিত হন, প্রকৃত পক্ষে পূর্বে মোহন্তই উহাকে নির্বাচন করিয়া যান। দেবী পাটানের মোহন্ত উক্ত সমিতি দ্বারা নির্বাচিত হন। কানফাটাদের মধ্যে টিলা মঠের মোহন্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কিছুদিন পূর্বে গোরক্ষ-পুরের মোহন্ত-নির্বাচন-সম্বন্ধে বিবাদ হইলে সরকারী কর্মচারী এই দ্বাদশ যোগীর স্বাক্ষরসহ অনুমোদনপত্র অনুযায়ী কার্য্য করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মঠ ও তীর্থস্থানাঙ্গ

হিন্দুদিগের তীর্থস্থানসমূহ কানাফাটাদিগেরও তীর্থবিশেষ, ইহারা হিন্দুর শিব, ভৈরব ও শক্তির মন্দির দর্শন করে, ইহাদের নিজেদেরও বহু মন্দির এবং মঠ সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত। তন্মধ্যে কয়েকটি মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ, এমন কি গোরক্ষ যুগের পূর্বেও সেগুলি তীর্থরূপে পরিগণিত হইত।

বঙ্গদেশে—দমদমের নিকট ‘গোরক্ষ বাসলী’ নামক গোরক্ষ ক্ষেত্র আছে। এখানকার গোরক্ষ মন্দির মধ্যে তিনটি নরমূর্তি আছে, উহারা দস্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেশ্বরনাথের বলিয়া কথিত হয়। উপস্থিত (১৯৪৪ খৃঃ) এখানকার মোহন্তর নাম বৃধনাথ, তিনি কপলানী শ্রেণীর নাথপন্থী, অপর কয়েকজন যোগী, অওধর ইত্যাদিরও এখানে বাস। মূর্তি তিনটির অঙ্গে গেরুয়া বসন, শেলীনাথ ও কুণ্ডল পরিহিত। গোরক্ষ মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে একটি ধুনী প্রজ্জ্বলিত, কথিত আছে স্বয়ং গোরক্ষনাথ দ্বারা ইহা প্রজ্জ্বলিত হয়। গোরক্ষের পূর্বে কপিলমুনি এই স্থানে সাধনা করিতেন, গোরক্ষের অনুজ্ঞায় তিনি গঙ্গাসাগরের তীরে চলিয়া যান, মন্দির মধ্যে কপিলমুনিরও একটি ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্তরের মূর্তি আছে। গোরক্ষ মন্দিরের বিপরীতে শিব মন্দির আছে, ভৈরব, হনুমান, কালী, মনসা প্রভৃতিও বিস্তৃত। মনসার মন্দিরে মানতের পুঁতি বীধা থাকে, মানত পূর্ণ হইলে উহা গোরক্ষনাথকে অর্পণ করা হয়। মন্দির উচ্চানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বৃহৎ লাল সমাধি আছে, তদ্ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধিতে উচ্চানের কিয়দংশ পূর্ণ। মন্দিরের ভাঙার ঘর, অতিথিগৃহ, মোহন্তর বাসস্থান আদি দেখিয়া ইহাদের অবস্থা মন্দ নহে বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। অধুনা বহু মাড়োয়ারী ভক্ত এই স্থানে বাতায়াত করেন ও দক্ষিণাদি দিয়া থাকেন। জগলী জেলায় ত্রিবেণীর চারি ক্রোশ পশ্চিমে, মহানাদ গ্রামে জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্ঠগঙ্গা নামে জলাশয় আছে। ইহাও গোরক্ষ ক্ষেত্র। কথিত আছে একটি দক্ষিণাবর্ত শংখ ঐ স্থানে পতিত হইয়াছিল তাতে বায়ু লাগিয়া মহান্যূদের উৎপত্তি হয়, উহা

শ্রবণ করিয়া দেবতারা তথায় আসিয়া জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্ঠ গঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানটির নাম 'মহানাদ' রাখেন। এইস্থানে নাথপন্থী যোগীর নিবাস আছে, তাহার শিষ্যমণ্ডলী হইতে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়।

৬দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন ৬কালীঘাটের কালী গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহা কত দূর সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রতাপাদিত্যের সময়ে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ দলিলাদি পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরে গোরক্ষকুই, রঙ্গপুরে গোরক্ষ মণ্ডপ আছে, ঐ সকল স্থানে বৃক্ষমূর্তিও দেখা যায়। গোরক্ষপুর, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কাজলী, পেশোয়ার ও দ্বারকায় এই চারি স্থানে নাথপন্থীদের প্রধান তীর্থ। হরিদ্বারের গোরক্ষ সুরঙ্গ, নেপালের পশুপতিনাথও গোরক্ষর নামের সহিত যুক্ত।

সিকিমে—চঙ্গচিলিঙ্গ মঠে যে ত্রিমূর্তি আছে, তন্মধ্যে গোরক্ষমূর্তিই বিশেষ ভাবে সজ্জিত।

নেপালে—পশ্চিম নেপালে গোরক্ষ গুহা আছে, হাঁটু গাড়িয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, গুহা মধ্যে গোরক্ষনাথের মূর্তি আছে, কথিত আছে গোরক্ষ এই স্থানে বাস করিতেন, সেই জন্য ঐ স্থানের নাম 'গোরখ' ও অধিবাসীদের নাম 'গুর্খা' হইয়াছে।

কাঠ মাণ্ডু অর্থে কাঠ মন্দির, ১৬০০ খৃঃ ঐ স্থানে গোরক্ষের নামে মন্দির স্থাপিত হয়। ইহার চতুষ্পার্শ্বে মৎস্যেশ্বর-গোরক্ষ সম্পর্কিত বহু মন্দিরাদি আছে। কাঠ মাণ্ডু বা পাটনের তিন মাইল দূরে বাগমতীতে মৎস্যেশ্বর মন্দির আছে। শিব পশুপতি নাথেরও ঐ স্থানে মন্দির আছে। সাওয়ারী কোটে রতননাথ মঠে একটি প্রস্তরখণ্ড আছে। তন্মধ্যে গোরক্ষ আত্মা বদ্ধ আছে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কুমায়ুন ও ঘরওয়াল পাহাড়ে ভৈরবের বহু মন্দির আছে, বিভিন্ন যোগীদের নামের সহিত তাহারা সংশ্লিষ্ট। খৃঃ পূর্ব ২৪৯ অব্দে অশোক তাহার কন্যা চারুমতী সহ নেপাল ভ্রমণে যান। চারুমতী পশুপতি নাথ মন্দিরেই তৎপরে বাসারম্ভ করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

তুলসীপুর—নেপালের অনতিদূরে হিমালয়ের তলদেশে কানকাটা সম্প্রদায়ের 'দেবীপাটান' নামক মন্দির বিদ্যমান। উহা যুক্ত প্রদেশের বলরামপুরের রাজ্যের তুলসীপুরে অবস্থিত। দেবীর ৫১টী পীঠের মধ্যে

দেবীপাটান একটি, এইস্থানে দেবীর দক্ষিণহস্ত পতিত হয়। পত্ ধাতু হইতে ‘পাটান’ শব্দের উৎপত্তি, দেবীপাটানের আর একটি নাম পাতালেশ্বরী, সীতাদেবীর এই স্থানে নাকি পাতাল প্রবেশ হয়। প্রাচীনতম শৈব মন্দির মধ্যে এই স্থানের মন্দির গণ্য। কর্ণের নামের সহিতও এই স্থান যুক্ত, কর্ণের নামে মন্দিরও আছে। শীতলা ও হোলীর দেবী ভুলীকার পূজাও এখানে হইয়া থাকে।

চৈত্র মাসের শেষে দেবীপাটানে বিপুল মেলা বসিয়া থাকে, তখন লক্ষাধিক জনসমাগম হইয়া থাকে। বলরামপুরের রাজারাই এই মেলার পৃষ্ঠপোষক। মেলার উদ্বোধনকার্য্য নেপালের সওয়ারীকোট বা ড্যাং কাংড়ার কানফাটা যোগীদের মঠের মোহন্ত দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। মন্দির হইতে তাঁহার বাসস্থান ঘাইট মাইল, এই দীর্ঘ পথ বহিয়া মেলার সময়ে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া গোরক্ষ-আত্মাবদ্ধ প্রস্তরখণ্ডটী লইয়া যাওয়া হয়। মোহন্তেরা সুসজ্জিত হইয়া তৎসহ গমন করেন ও পথিমধ্যে অর্ঘ্যাदि গ্রহণ করেন। বলরামপুরের রাজমোহন্তেরা বাতাসহকারে ইহাদের অভ্যর্থনা করেন, দেবী পাটানের মোহন্ত মন্দির সোপানতল হইতে অভ্যর্থনাদি করিয়া ইহাদের লইয়া যান। তৎপরে চারি দিবস ধরিয়া পূজাপাঠ, প্রসাদ বিতরণাদি চলে। মন্দিরের চতুর্দিকে ভক্তদল পরিক্রমা করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করেন ও দেবীকে কি কি পূজা দিতে হইবে তাহা দেবী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলিতে থাকেন। দেবী মন্দিরের রক্ষক হিসাবে ভৈরববেরও পূজা হয়। পূজা শেষে ভোগ্যাदि ভৈরব সহচর কুকুরদিগকে প্রদান করা হয়।

দেবীপাটান মন্দির ও মঠের অধিবাসীরা হঠযোগে পারদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ, নয়টী নিষ্কর গ্রাম হইতে ইহাদের ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। গোরক্ষের প্রশিষ্য রতননাথ কর্তৃক দেবীপাটানের মন্দির স্থাপিত হয়। রতননাথের পূজা নেপালে হইয়া থাকে; মন্দিরের সম্মুখে নাগরী শিলালিপি আছে, তাহা দ্বারা গোরক্ষের সময় হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচারিত আছে তাহা প্রমাণিত হয়।

কাশ্মীর ত্রীনগর—শিবাবতার রূপে এস্থানে গোরক্ষের পূজা হয়, একটি গৃহ মধ্যে ছয় ইঞ্চি পরিমিত গোরক্ষ মূর্তি আছে, তদ্ব্যতীত উপস্থিত বিশেষ কিছু নাই, ইহা পূর্বে গোরক্ষ-ক্ষেত্র ছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অমরনাথ কানফাটাদের বিশেষ তীর্থ, এস্থানে বরফের শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

নৈনিতাল আলমোরা—ধর্মনাথ সম্প্রদায়ভূক্ত যোগীদের এখানে বাস, নন্দীদেবীর মন্দিরটি তিনশত বৎসরের প্রাচীন। ভৈরব, পার্বতী, ও গোরক্ষের ত্রিমূর্তিও একটি মন্দির মধ্যে আছে। মন্দির মধ্যে লিঙ্গ পূজাও প্রচলিত, এই মন্দিরের যোগীরা সৎনাথী সম্প্রদায়ের।

‘কান’ নামক স্থানে আলমোরার পীর বাস করেন, ইনি ধর্মনাথী, কথিত আছে গোরখালীরা আলমোরা জয় করিয়া দুর্গ স্থাপন করে ও মন্ডিকাতলে প্রাপ্ত অস্ত্র ও কুণ্ডলাদি কান সহরে প্রোথিত করিয়া যোগীদের জন্য নূতন আশ্রম নির্মাণ করাইয়া দেয়।

হরিদ্বার—গোরক্ষনাথের সহিত হরিদ্বার বিশেষভাবে যুক্ত। এই স্থানের একটি গুহা ও সুরঙ্গ কানফাটাদের নামে প্রচলিত। ‘ঐ’ পন্থীদের প্রসিদ্ধ মঠ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। দরিয়াপন্থ ও ছাদশপন্থদের মঠের জন্যও হরিদ্বার প্রসিদ্ধ।

যুক্তপ্রদেশ—চুণারে ভর্তৃহরির দুর্গ আছে। এলাহাবাদের গোরক্ষ পন্থীর জীর্ণপ্রায় প্রতিষ্ঠান ও ভৈরবের মন্দির আছে।

বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, মাস্তা যোগীদের তীর্থ বা থান রূপে গণ্য, ইহারা শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী পালন করে, বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজাও করে। যজ্ঞভূমুর, বট, তুলসী ইহাদের নিকট পবিত্র। (প্রবাসী, ‘যোগিজাতি’—চৈত্র ১৩২৯)।

গোরক্ষ ত্রেতাযুগে গোরক্ষপুরে আসেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও এই স্থানে দেহরক্ষা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন উক্ত মন্দিরটিকে মসজিদে পরিণত করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরঙ্গজেব কর্তৃক পুনর্গঠিত নবমন্দির পুনরায় মসজিদে পরিণত হয়। অবশেষে ১৮০০ খঃ বুদ্ধনাথ তৃতীয়বার মন্দির স্থাপিত করেন, ইহা অষ্টাপি পুরাতন গোরক্ষপুর নামে প্রসিদ্ধ ও নূতন গোরক্ষপুরের পশ্চিমে অবস্থিত।

গোরক্ষপুরের গোরক্ষ মন্দির সুসজ্জিত, গদির উপর চরণ রক্ষিত, উহা পুষ্পাদি দ্বারা নিত্য পূজিত হয়। গোরক্ষ প্রজ্জলিত একটি প্রদীপ অষ্টাপি মন্দির মধ্যে জ্বলিতেছে দেখিয়াছি। মন্দিরের পশ্চিমে কালীমূর্তি ও সম্মুখে লিঙ্গ স্থাপিত আছে। ভৈরব এই মন্দিরের প্রহরী, প্রত্যহ তিনবার পূজা হয়। আগ্নিমা মধ্যে বিভিন্ন সমাধি ও গম্ভীরনাথজীর মন্দির আছে। দক্ষিণে হনুমান, উত্তরে পশুপতি নাথের

মন্দির। পূর্বদিকে তৃণাচ্ছাদিত গৃহমধ্যে গোরক্ষ-ধূনি জ্বলিতেছে, মন্দিরোষ্ঠানে বহু সমাধি দৃষ্ট হয় তথায় নিত্য সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হয়। মন্দির-আগ্নিনার বাহিরে ভীমের প্রকাণ্ড শায়িত মূর্তি আছে। গোরক্ষপুরে ভৈরব ও বালাসুন্দরীর (সম্ভবতঃ শাক্তদের ত্রিপুরাসুন্দরী ?) পূজা হয়।

গোরক্ষপুরের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মোহন্ত-নির্বাচন পূর্ব মোহন্ত দ্বারা হয়, অন্যথা জনসাধারণের মতানুযায়ী হয়। বালকবালিকাদের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানের মোহন্তদের পূজা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই মঠের ব্যয়-নির্বাহার্থ আটটি গ্রাম দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে আছে। গোরক্ষ-মঠের মোহন্ত ৩৬০টি বিভিন্ন মঠের স্বত্বাধিকারী হইলেও নিকটবর্তী তুলসীপুরের মঠের উপর তাঁহার অধিকার নাই, মোহন্ত ধর্মনাথ-সম্প্রদায়ের।

বারাণসী—এ স্থানে ভৈরবের লাঠ, কালভৈরবের মন্দির ও সহর হইতে কিছু দূরে গোরক্ষের টিলা অবস্থিত। কানকাটাদিগের আশ্রমের এখানে ধ্বংসোন্মুখী অবস্থা—টিলার পুথি, মূর্তি প্রভৃতি অপহৃত হইয়াছে, সন্ধান করিয়াও আমি কোন পুথি পাই নাই। মন্দিরটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ও মন্দির-মধ্যে প্রস্তরে অঙ্কিত জালন্ধরিনাথের চরণ আছে, প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটিতে গোরক্ষ-চরণ আছে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে ১৫২ জন কানকাটা যোগী ছিল, তন্মধ্যে ৬৩টি যোগিনী ছিল। তাহারা টিলা ও কালভৈরবের মন্দিরে বাস করিত।

পেশোওয়ার—এই স্থানে ‘গোরক্ষক্ষেত্র’ নামে কানকাটা যোগীদের আশ্রম ছিল, ইহার বৃত্তান্ত বাবর ও আবুল ফজলের বর্ণনায় পাওয়া যায়। পেশোওয়ারের ‘রতননাথ’ যোগী বিখ্যাত ছিলেন, তিনি কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিতেন না, বলিতেন উহা তাঁহার হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে। কোহাট, জালালবাদ ও কাবুলে নাথ যোগীদের মন্দির আছে। সেয়ালকোটে গোরক্ষের শিষ্য পুরাণ ভাগতের নামে একটা প্রসিদ্ধ কূপ আছে। পালামপুরের নিকট যে গোরক্ষ মন্দির আছে, সেই স্থান-সম্বন্ধে কিংবদন্তী যে, গোরক্ষনাথ ঐ স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া যান, তাই মন্দিরের নাম ‘বিরাগলোক’ অর্থাৎ বৈরাগীর অলোপ। মন্দিরমধ্যে গুগা, গোরক্ষ প্রভৃতির অশ্বারোহী মূর্তি আছে।

লাহোর—এই স্থানে ‘ঐ’-পন্থের মঠ, সমাধি ও শিবমন্দির আছে।

অমৃতসহর—ইহা ‘দ্বাদশপন্থী’দের মিলনক্ষেত্র। এই স্থানে শিবের মন্দির আছে।

অম্বালা—এই স্থানে গুগা ও গোরক্ষের মন্দির আছে। প্রবাদ যে গুগা গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন।

রোটার্স—রোটার্স দুর্গ সন্নিকটে কালনাথ যোগীদের আশ্রম ছিল।

কিরাণা—এই স্থানে অওঘর যোগীদের মঠ আছে। এখানকার ‘পীর’ একবার নির্বাচিত হইয়া গেলে আর পাহাড়ের নিম্নে নামিতে পারেন না।

টিলা—পাঞ্জাবে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ ঝিলামের ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত, ইহার নাম ‘গোরক্ষ টিলা’, ইহার উচ্চতা ৩,২৪২ ফুট, পর্বতগাত্র অমল্লগ ও ছুরারোহ, এই স্থান হইতে হিমালয়ের দৃশ্য অতীব মহান্। এই টিলা বহুপুরাতন তীর্থবিশেষ। বাল্মীকি-কন্যার বিবাহ-বর্ণনায় টিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। গোরক্ষের নিকট রঞ্জ এই টিলামধ্যে দীক্ষা নেন। চৈত্রমাসে টিলায় মেলা হয়। সম্রাট আকবর এই টিলার বায়-নির্বাহার্থ কয়েকটি গ্রাম অর্পণ করিয়া যান।

সিদ্ধুদেশ—করাচী হইতে ৭০ মাইল দূরে মাকলী পাহাড়ের উপত্যকা-ভূমিতে হিংলাজ-তীর্থপথে ‘নগর ঠঠ’ নামক স্থানে ঠুমরা নামক এক প্রকার ধ্বংসপ্রস্তরের পুঁতি সংগ্রহ করা নাথপন্থীদের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থানে পার্শ্বতী শিবাদেশে খেচরান প্রস্তুত করেন, কিন্তু অশুর-হত্যার ফলে উহা রক্তকলুষিত হওয়ায়, পার্শ্বতী উহা ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করেন,—ফলে চাউল হইতে যে ছোট ছোট প্রস্তর হয় তাহার নাম ‘হিংলাজ’ বা ‘ঠুমরা’ ও ডাইল হইতে তাহা অপেক্ষা সামান্য বড় যে প্রস্তর হয় তাহার নাম ‘আশাপুরী’। উভয় পুঁতিই যোগীরা সাদরে ধারণ করেন।

বেলুচীস্থান—মকরান-কূলে হিংলাজতীর্থ, ইহা সিদ্ধুনদীর উৎপত্তির স্থান হইতে ৮০ মাইল দূরে। হিন্দুল-নদীর তীরে হিংলাজ পাহাড়ের নিম্নে মন্দির আছে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাসেন সাহেব পর্বতগাত্রে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতীক অঙ্কিত থাকিতে দেখেন।^১ ৫১টি দেবীর পীঠের

১। ব্রীজসু, পৃ ১০০। E. R. E., Vol. VI, p. 715. গোভিন্দ সাহেবও ১৮৬১ খঃ উক্ত চিহ্ন দেখেন।

মধ্যে হিংলাজ অন্যতম, ইহা অতি পুরাতন তীর্থ, যোগীদের বিশ্বাস হিংলাজের তীর্থ না করিলে যোগসিদ্ধ হওয়া যায় না। মুসলমানেরাও এখানে আগমন করে ও পার্শ্বতীর্থেবীকে 'বিবি নানী' বলে। খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দেও 'নানী দেবী' পূজিত হইতেন, গঙ্গা হইতে ইউফ্রেটীস পর্য্যন্ত তাহার পূজা প্রচলিত ছিল। সমগ্র ভারতে এই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইত।

কোটেশ্বর—হিংলাজ-তীর্থ এক্ষণে মুসলমানের অধিকারে বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে গোরক্ষনাথীরা দক্ষিণ বাহুতে 'যোনিলিঙ্গ' অঙ্কিত করিয়া হিন্দু প্রতাপন করেন। করাচীর অনতিদূরে কোটেশ্বর নামক স্থানে শিবমন্দিরে এই চিহ্ন-কার্য্য সমাধা করা হয়। এই চিহ্নটি এইরূপ ৩, এই নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্রে উহা দেখান হইয়াছে।

কচ্ছপ্রদেশ—এই স্থানে ধীনোথের দ্বিতল মঠই প্রসিদ্ধ। পর্ব্বতোপরি জঙ্গলবেষ্টিত মন্দিরের মধ্যে ধর্ম্মনাথের প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত আছে, পর্ব্বতটি ১,২৬৪ ফুট উচ্চ, ইহাতে আরোহণ কষ্টসাধ্য। ধীনোথ অর্থে 'সহিষ্ণুতার ধারক', ধর্ম্মনাথ দ্বাদশ বৎসর মস্তকেপরি দণ্ডায়মান হইয়া এই স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাই ধীনোথ ধর্ম্মনাথের পাপ ও অনুতাপের ভার ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মনাথ ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার হইতে কচ্ছপ্রদেশে আসিয়া মঠ স্থাপন করেন।

কাঠিওয়াড়—ইহার বহুস্থান গোরক্ষনাথের সহিত যুক্ত। কথিত আছে ইহার পাহাড় গোরক্ষনাথের প্রিয় আবাসস্থল ছিল। এই স্থানে 'গোরক্ষমণ্ডী' প্রসিদ্ধ, গুহামধ্যে মংগেশ্বর ও গোরক্ষের মূর্ত্তি আছে।

বোম্বাই—সাতপুরা, সাতারা প্রভৃতি স্থান গোরক্ষের সহিত যুক্ত, পায়েধুনী যোগীদের পুরাতন আবাসস্থল। এই স্থানের মন্দিরের ভার কানফাটা যোগীদের উপর স্তম্ভ। পায়েধুনীতে চরণ বা পা আছে। গণেশপুরী নামক স্থানে বহু উচ্চ প্রস্তর আছে, তাহার একটির নাম 'গোরক্ষমচ্ছিন্দর'। এই স্থানে দুইটি দুর্গ আছে, তাহাদের নাম 'গোরক্ষগড়' ও 'মচ্ছিন্দরগড়'। নিকটবর্ত্তী গুহাগুলিতে প্রাচীনকাল হইতে বসবাসের নিদর্শন আছে।

রাজপুতানা—একলিঙ্গজীর মন্দিরের সহিত বাম্বারাও ও কানফাটা যোগীদের নাম যুক্ত। সকল শ্রেণীর কানফাটা যোগী এই স্থানে বাস করে। মন্দিরের অধিকারীর নাম 'গোসাই', তিনি ললাটে রক্তবর্ণ

শিব-চিহ্ন ধারণ করেন, ইহার অধীনে বহু কানফাটা যোগী আছে। উজ্জয়িনীতে একটি গুহামধ্যে গোপীচাঁদ ও গোরক্ষের মূর্তি আছে, মৎস্যেশ্বরের চরণও ঐ স্থানে বিদ্যমান। গুহার উল্লম্বদিকে একটি সুউজ্জ-মুখ আছে, উহার দ্বারা বারাণসী পর্য্যন্ত গমন করা যায়—এইরূপ জনশ্রুতি।

উড়িষ্যা—পুরীতে কানফাটাদের সং-নাথী সম্প্রদায়ের যোগীদের ক্ষুদ্র মঠ ও মন্দির আছে। মোহনেশ্বরের পরিধানে কন্যার বস্ত্র, এবং তিনি টুপী ও তৃণনির্ম্মিত বস্ত্রাচ্ছাদিত 'সুদর্শন' নামক গদা ধারণ করেন, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

দাক্ষিণাত্য—আমেদাবাদের উত্তরে গোরক্ষনাথের নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে।

ভারতের বহু স্থানে গোরক্ষনাথের নামে যোগাশ্রম আছে। তন্মধ্যে গোড়া জিলায় পাটেশ্বরী, গোরক্ষপুর, মহারাষ্ট্রপ্রান্তে ওড্যা, ভোগমতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (কল্যাণ সন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৭৯)।

নাথ-সম্প্রদায়ের উপাস্ত্র দেবতা

যোগীরা প্রধানতঃ শৈব, কিন্তু ধীনোদরের মঠে ধর্ম্মশালায় বিষ্ণুমূর্তি আছে। গোরক্ষমন্দিরের সহিত হনুমান, রামচন্দ্র, কালী প্রভৃতিরও মন্দির দেখা যায়।

বঙ্গদেশে গোরক্ষ, মৎস্যেশ্বর, হাড়িপা প্রভৃতিকে বৌদ্ধ যোগী বলা হয়। নেপালে মৎস্যেশ্বর অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে পূজা পান। নবনাথ ও ৮৪ সিদ্ধার পূজাও নাথযোগীরা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে গোরক্ষের পূজাই প্রধান এবং শিব আদিনাথরূপে মান্য। কানফাটা যোগীরা মৎস্যেশ্বর ও গোরক্ষের পূজা করেন, এমন কি সমুদ্রাও তাঁহাদের নমস্কা বলিয়া গিয়াছেন।

হিংলাজদেবী যোগীদের উপাস্ত্র, মন্দিরটি এক্ষণে মুসলমানদের অধিকারে।

শিবকেই নাথযোগীরা ভৈরব, কালভৈরব, নন্দভৈরব, একলিঙ্গ প্রভৃতি নানামূর্তিতে পূজা করিয়া থাকেন। ভৈরবমূর্তি শৈব ও শাক্ত

(১) এই বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বনবন, কালী, গোরক্ষপুর ইত্যাদি বড় বর্ণন করিয়াছি।

উভয়ের উপাস্ত। কালভৈরবের মূর্তি শ্রেষ্ঠ। গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ‘সিদ্ধসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে’ ভৈরবের ‘অষ্টমূর্তি’র নাম আছে। যথা—

শিবাদ্ ভৈরব এতস্মাৎ শ্রীকণ্ঠোহতঃ সদাশিবঃ।

ঈশ্বরোহস্মাদ্রুদ্র আসীন্ততো বিষ্ণুস্ততো বিধিঃ ॥১১৩

নাথপন্থীরা শিব ও গোরক্ষ উভয়েরই পূজা করেন, ইহাদের মন্দিরে পশুবলিও প্রচলিত। নাথপন্থীরা যোগী নামে প্রসিদ্ধ ও ইন্দ্রজাল-প্রদর্শনে সিদ্ধ।^১

সাধারণতঃ কাপালিকেরা ভৈরবের পূজা করেন। “প্রবোধচন্দ্রোদয়ে” ইহার বর্ণনা আছে। “গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে” (পৃ ১৮) নাথ-দ্বারা কাপালিক পন্থা প্রবর্তিত হইবার কথা আছে।

ভৈরবের মূর্তিতে অষ্ট হস্ত ও মুণ্ডমালা, সর্পের অনন্ত ও কুণ্ডল দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণকুকুর-বাহন ভৈরবমূর্তিও দেখা যায়। কাশীর শিবমন্দিরের গ্রহরী ভৈরব, সমগ্র কাশীধামের ভারও তাহার উপর স্থাপ্ত। পাঞ্জাবের প্রতি সহরে ভৈরবের মন্দির আছে। দেবীপাটানে ভৈরবের পূজাস্থে কুকুরদের প্রসাদ-বিতরণের রীতি আছে, কারণ স্বাই ভৈরবের সহচর।

কানকাটাদের মধ্যে অম্বা ও জগদম্বা-পূজা প্রচলিত আছে। তিনি শিবের শক্তি, তাহার জননক্রিয়া ও যোগীর সিদ্ধিলাভের সহায়রূপ দুইটি ক্রিয়া আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে দেহস্থ চক্রসাধনে প্রতিচক্রের আধষ্ঠাতা দেবের সহিত দেবীরও উল্লেখ আছে। নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ একটি প্রধান অঙ্গ। এই কুণ্ডলিনী ‘পিণ্ডসংসিদ্ধিকারণী, পুরুষের নিবৃত্তি উত্তমরূপিনী’ এবং শক্তিরূপা। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি মানবের দেহরক্ষায় সিদ্ধিদাত্রী এবং পুরুষের নিবৃত্তিমার্গের সহায়স্বরূপ। নবচক্রসাধনে নাথগণ কুণ্ডলিনীকে একমাত্র সহায় বলিয়া জানেন।^২

নাথদিগের মহাপীঠস্থান কামাখ্যা, সেখানে দেবীর পূজা হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-সাং এই তীর্থ দর্শন করেন। মহাভারতে কামরূপ-রাজধানীর উল্লেখ আছে।

শক্তিপূজার প্রণালী দ্বিবিধ—দক্ষিণাচার ও বামাচার, বামাচারে পঞ্চমকার-সাধনা আছে, দক্ষিণাচারে তাহা নাই। কাপালিকেরা

(১) Monograph of the Religious Sects of India. Pai. p. 70.

(২) সি. সি. প. ৪১৮২০, নিবন্ধের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

বামাচারী, তুর্গাপূজা, চক্রপূজা তাহাদের সাধনা।^১ কানফাটাদের মধ্যে যোনি ও লিঙ্গপূজা এবং শ্রীচক্রপূজা প্রভৃতি আচার রহিয়াছে। শ্রীযশ্বেশের পূজারী দেবীর সহিত একাত্মা হইয়া আত্মোপলব্ধি করেন। নাথপন্থের অনুমোদিত গ্রন্থে পঞ্চমকার-সাধনের ইঙ্গিত নাই, ইহারা শক্তির উপাসক হইলেও মাতৃকা বা মন্ত্ৰের উল্লেখ ইহাদের সাধনে নাই। সহজোলী প্রভৃতি কয়েকটি মুদ্রাসাধন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, স্পষ্টতঃ শক্তি লইয়া সাধনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে অনুরূপ সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল মুদ্রাসাধনে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি ও সঙ্গ অনিবার্ধ্য ছিল। ভৈরবীচক্রে শক্তি-সাধনার সহিত তিব্বতী yab-yum বা যুগনন্দরূপ পূজা তুলনীয়।

নবম পরিচ্ছেদ

মৎশ্বেন্দ্র ও গোরক্ষনাথাদি-সম্পর্কিত কয়েকটি স্থানের নির্দেশ

অধুনা বহুশতাব্দী পরে সুনিশ্চিতভাবে কোন স্থানের নির্দেশ সম্ভবপর নহে, তথাপি নিম্নলিখিত স্থান কয়টির নির্দেশের চেষ্টা করিতেছি :—

পূর্বদেশ—ষোড়শ শতাব্দীর ভোটিয়া গ্রন্থ রত্নাকরজ্যোপমে মীননাথ ও মৎশ্বেন্দ্র পূর্বদেশের লোক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে পূর্বদেশে লৌহিত্য নদীতে মীননাথের পুত্র ‘মৎশ্বেন্দ্র’ দ্বাদশ বৎসর মৎশ্বেন্দ্রের বাস করেন, পিতা ও পুত্র উভয়েই কৈবর্ত ছিলেন (গঙ্গা-পুরাতত্ত্ব, পৃ ২৪৩-৪৪)। কামরূপের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র ‘লৌহিত্য’ নামে পরিচিত, এই দেশের অধিবাসী-রূপে মৎশ্বেন্দ্রের নাম লৌহিত্যপা ও ক্রমশঃ লুইপা হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব ‘পূর্বদেশ’ যে কামরূপে ছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

নাথমহাশয়ের মতে বৌদ্ধসহজিয়া লুইপাদ-মৎশ্বেন্দ্রের জন্মস্থান কামরূপের নগাঁও জিলার হোজাই অঞ্চলে। (কদলীরাজ্য, পৃ ৪০)। মৎশ্বেন্দ্র বা মীননাথ কদলীদেশের অধিপতীর মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া যোগধর্ম ভুলিয়া যান, বঙ্গীয় গীতিকাব্যে বারবার এই কথার উল্লেখ পাই। এই কদলীদেশ কোথায় ?

কদলীদেশ—এই কদলীদেশ স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার বর্ণনা যথা—

এস্থানে স্ত্রীরাজ্য স্ত্রীপ্রজা স্ত্রী রাজ্যের দেওন।

নারী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের ভ্রাণ ॥

(গোপী-সম্বাস, ভট্টশালী, পৃ ১৫)

এই কদলীরাজ্যের অবস্থিতি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে, যথা :—

(ক) ভট্টশালী-মতে উহা কামরূপ, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ।^১

(খ) শহীদুল্লাহ্-মতে উহা কাছাড় জিলায়।^২

(১) ময়নামতীর গান, ভট্টশালী-সম্পাদিত, পৃ ১২২ পাদটীকা।

(২) Les chantes Mystiques, p 27.

(গ) চাকলাদার-মতে উহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ।^১

(ঘ) (রাজমোহন) নাথ-মতে উহা কামরূপের নর্গাঁও জিলায় ।^২

ভারানাতের ঐন্দ্রে আছে কান্কাসিদ্ধা কদলী যাওয়ার পথে বঙ্গদেশে গুরু বালপাদ বা হাড়িসিদ্ধাকে যুক্তিকা-মধ্য হইতে উদ্ধার করেন। গোরক্ষ-বিজয় ঐন্দ্রে আছে কান্কা যোগী কামরূপ, পাটন, লঙ্কাপুরী ও ডাছকা হইতে ফিরিবার পথে বকুলেতে গোরক্ষনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোরক্ষ গুরুর উদ্ধারার্থ বকুল হইতে কদলীদেশে গমন করেন। প্রাচীনকালে বঙ্গের কিয়দংশ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপের সন্নিহিত ভূভাগ ‘কদলীর দেশ’ নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের বনপর্বে ও যোগিনীতন্ত্রের উত্তরখণ্ডে কদলীবনের উল্লেখ আছে।^৩ বর্তমানেও কামরূপের নর্গাঁও জিলায় ‘কদলী’ নামে একটি মৌজা আছে এবং সেই মৌজার নিকটবর্তী স্থানে হাজার হাজার নাথ-যোগীর বাস আছে। কদলী পর্বতে বাহুড়-পূর্ণ ‘বাহুলী কুরু’ নামে গুহা আছে।^৪ সুতরাং প্রাচীন কদলীর দেশ বর্তমান নর্গাঁও জেলার ‘কদলী’ হওয়া বিচিত্র নহে। গীতিকাব্যে আছে গোরক্ষনাথ গুরু উদ্ধার করিয়া কদলী-রমণীদের বাহুড় হইয়া বৃক্ষে ঝুলিয়া থাকিবার অভিশাপ দেন, নর্গাঁওবাসীরা বাহুড়কে বান্দুলী বা বাহুলী বলে, সংস্কৃত—বাহুলি। ‘বাহুলী কুরু’এর অসংখ্য বাহুড় হইতেই কি ষোলশত অভিশপ্ত রমণীর বাহুড় হইয়া যাইবার কল্পনা করা হইয়াছে ?

কান্কা কামরূপ হইতে পাটন ও তথা হইতে লঙ্কাপুরী গিয়াছিলেন। বর্তমান গোহাটির কুড়ি মাইল পূর্বদিকে ‘পাটন’ নামক গ্রাম এবং ৯৫ মাইল পূর্বে ‘লঙ্কা’ মৌজা আছে। এই লঙ্কার সন্নিকটে হোজাই, বকুলিয়া প্রভৃতি স্থানে অষ্টাপি বহু ভগ্ন মন্দির আছে। নাথমহাশয় অনুমান করেন এই ‘হোজাই’ বৌদ্ধতান্ত্রিকদের উড়িয়ান বা ওড়িয়ান। গোহাটির উত্তরে বর্তমানকালেও ‘উদীয়ানা’ নামে একটি গ্রাম আছে।^৫

বিজয়নগর—গোরক্ষ-বিজয় ঐন্দ্রে আছে গোরক্ষ ‘বিজয়নগর ছাড়ি বকুলেতে যাইলা’। বর্তমান বিজনীরাজ্যের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া

(১) Social Life in Ancient India—pp. 59, 60. ‘কদলীরাজ্য’ উল্লেখ।

(২) কদলীরাজ্য—পৃ ৩৮।

(৩) গোপীচন্দ্রের গান—২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ ১০১ ‘ভৌগোলিক সংস্থান’।

(৪) কদলীরাজ্য—রাজমোহন নাথ, পৃ ৩৫-৩৭।

(৫) ঐ —পৃ ২৭, ৩১।

অঞ্চলে গোরক্ষ-পর্বত, যোগিগুফা ইত্যাদি স্থান আছে। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেই পূর্বে 'বিজয়নগর' ছিল।^১

ওড়িয়ান, লঙ্কাপুরী, জাহোর—তিব্বতীমতে সিদ্ধাচার্য্য লুইপা প্রথম জীবনে সামন্তশোভা নামে পরিচিত ছিলেন ও ওড়িয়ান-নৃপতি ইন্দ্রভূতির কণ্ঠ্যচারী ছিলেন।^২ ওড়িয়ানে তিনি বাঙ্গালী শবরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।^৩ ওড়িয়ান এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের একটি প্রধান পীঠস্থান ছিল। যাত্রাবিহার জন্ত ওড়িয়ান খ্যাত ছিল। ওড়িয়ান-রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবী ও তাহার ভ্রাতা ইন্দ্রভূতি উভয়েই যাত্রাবিহায় পারদর্শী ছিলেন এবং পরে উভয়েই ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় স্থান পাইয়াছিলেন।

এই ওড়িয়ানের অবস্থিতি-সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতামত আছে :

- (ক) শাস্ত্রী-মতে উহা উড়িষ্যায়। ভট্টাচার্য্য-মতে উহা আসামে।
- (খ) লেভি-মতে উহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপত্যকায়।
- (গ) (নলিনী) দাসগুপ্ত-মতে উহা বঙ্গদেশে।

কথিত আছে ওড়িয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি জাহোরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং লঙ্কাপুরীর যুবরাজ ওড়িয়ান-রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। অতএব ওড়িয়ান, জাহোর ও লঙ্কাপুরী একই অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের অনুমান।^৪ কামরূপ বা কামাখ্যা অজ্ঞাপি যাত্রাবিহার জন্ত প্রসিদ্ধ, সেই নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যমহাশয় ওড়িয়ান রাজ্য আসামে ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের পিতা শাস্ত্রীমহাশয় 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের পীঠস্থানের নাম হইতে ওড়িয়ানকে উড়িষ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রসারের উড্ডীশ নামটি উড়িষ্যার এবং উড়িয়ান পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত থাকায়, ওড়িয়ান উড়িষ্যায় হইতে পারে না।

চীনদেশের গ্রন্থ হইতে সোবাট উপত্যকায় ওড়িয়ানের অবস্থিতি-সম্বন্ধে জানা যায়। লেভির মতামত উল্লেখ করিয়া বাগচীমহাশয় তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।^৫ কিন্তু প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে ওড়িয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপত্যকায় অবস্থিত হইলে

১। কমলীরাজা—পৃ ৫৮।

২। Studies in the Tantras—Bagchi, p. 39

৩। কমলীরাজা, পৃ ১১।

৪। সাধনমালা—দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃ ৫৮।

৫। Studies in the Tantras, p. 38

জাহোর ও লঙ্কাপুরী কোথায়? ওড়িয়ান-রাজকর্মচারী লুইপা বাংলা ভাষায় পদ রচনা করিলেন কিরূপে? বাগচীমহাশয় জানাইয়াছেন— ওড়িয়ান-নৃপতি ইন্দ্রভূতি জাহোর ও তথায় অবস্থিত লঙ্কাপুরী নামে একটি সমাধি-দর্শনে গমন করেন। এই জাহোর কাশ্মীর ও নেপালের সীমান্তে অবস্থিত। ভট্টাচার্য্যমহাশয় সাধনমালার ভূমিকায় ঢাকার সান্তারকে জাহোর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার নিজেই বলিয়াছেন লঙ্কাপুরী আসামের ‘লঙ্কা’ হইলে, ওড়িয়ান তাহার সন্নিকটে হইবে। নাথমহাশয় অধ্যাপক জেকবির উল্লেখ করিয়া আসামের লঙ্কাকে লঙ্কাপুরী স্থির করিয়াছেন এবং তাহার সন্নিকটে জাহোর দেশ ছিল বলিয়াছেন। লঙ্কার সন্নিকটে বর্তমান হোজাই অঞ্চল তাঁহার মতে প্রাচীন ওড়িয়ান।^১ দাসগুপ্তমহাশয় অনেক যুক্তির দ্বারা ওড়িয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।^২ কিন্তু লুইপার জন্ম বঙ্গদেশে এবং প্রথম কর্মস্থল ওড়িয়ানে এই প্রবাদই প্রচলিত, তাঁহার জন্ম ওড়িয়ানে এ কথা ৮৪ সিদ্ধার ইতিহাস হইতে নাথমহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব ওড়িয়ানের উপস্থিতি বঙ্গদেশে একথা প্রমাণ করিবার সার্থকতা নাই।^৩ সিদ্ধদের জন্মস্থান-সম্বন্ধে কিংবদন্তীরও বিশেষ মূল্য নাই, কারণ যখন যে দেশে যে সিদ্ধা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মস্থানের নির্দেশও সেখানে করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ সর্বত্রই দেখা যায়। বুদ্ধদেব মগধ-কোশলের বাহিরে কোথাও যান নাই, কিন্তু পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার বঙ্গদেশ-ভ্রমণের কথা পাওয়া যায়। অতএব জন্মস্থান-সম্বন্ধে কিংবদন্তীও এই আলোকে গ্রহণ করিতে হইবে। লুইপাদের জন্মস্থান ‘বরণা বঙ্গদেশে’ তাহা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, ভোটিয়া-গ্রন্থ-মতেও তিনি পূর্বদেশের লোক, এ কথাও এই অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে তিনি ওড়িয়ানে রাজকর্ম্য করিতেন অতএব বাঙ্গালী লুইপা ওড়িয়ানের রাজকর্ম্যচারী হইলেও তাঁহার পক্ষে বাংলায় পদ-রচনা অসম্ভব ব্যাপার নহে। নাথযোগীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেন ইহাও সুবিদিত। গোরক্ষবিজয়ে (পৃ ১৫) আছে “পশ্চিমে গেলেন গোর্খ, উত্তরে মিনাই” তুলনীয়— গোপীচন্দ্রের পাঁচালী (পৃ ৩৯৪) “পশ্চিম কুলের যোগী গোরক্ষনাথ”।

কামলাক গোড়ের সহর

রাজা গোপীচন্দ্রের জন্ম গোড়বঙ্গদেশে। গোপীচন্দ্রের পৈত্রিক দেশ ত্রিপুরা জিলায়, তিনি সেখান হইতে গোড়, কামলাক ইত্যাদি যাইবার কথা বলিতেছেন এই উল্লেখ গোপীচন্দ্রের গানে (পৃ ৩২৫) পাওয়া যায়। এই গোড় প্রাচীন শ্রীহট্ট, উহা উত্তরবঙ্গের রাজধানী গোড় নহে এবং কামলাক বর্তমান কুমিল্লা। অত্য়াপি কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড় ইত্যাদি বর্তমান। বঙ্গদেশের বাহিরে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতেও গোপীচন্দ্রের জন্মস্থান গোড়বঙ্গে বলা হইয়াছে, পদ্মপুরাণে শ্রীহট্ট-গোড়ের উল্লেখ আছে।^১ অতএব মৎস্যেন্দ্রের আদিনিবাস ও প্রচারস্থল বঙ্গদেশে একপ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। তবে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান অত্য়াপি রহস্যাবৃত। পরবর্তী কালের বিভিন্ন প্রবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত নবনব রূপ ধারণ করাতে পূর্ব কথা সকলে বিস্মৃত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ গুরু অপেক্ষা শিষ্যের প্রসিদ্ধি; এবং সম্ভবতঃ অজ্ঞাতকুলশীলে তাঁহার জন্ম। এই নিমিত্ত তাঁহাকে ঈশ্বর-সন্তান বলা হইয়াছে।^২

ডাড়ার সহর

গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে (পৃ ৩২৯) পাই মীননাথ কদলীর দেশে, কানুপা ডাড়ার সহরে ও হাড়িপা গোড় সহরে যাইবার অভিশাপ পান, কেবল গোরক্ষনাথের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম লইবার কথা। এই ডাড়ার সহর কি রাত বা বর্তমান বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের কোন সহর? প্রবাদ আছে হাড়িপার জন্ম সিদ্ধদেশে, বুঝান খণ্ডের (পৃ ৬১) ময়নামতী বলিতেছেন :

এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি জ্ঞান না শোনে।

মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাড়ি মরুবু আপনে ॥

এ দেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।

চাঁদ সুরজ রাখছে তুই কানের কুণ্ডল ॥

এই বঙ্গদেশ অর্থে পূর্বোক্ত শ্রীহট্ট না জ্ঞানবুদ্ধিতে বঙ্গদেশের লোক শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বাসে কথাগুলি উচ্চারিত ?

১। গোপীচন্দ্রের সমাঙ্গ, টীকা, পৃ ১০১। গোপীচন্দ্রের গান (২য় ভাগ) ৩২৫।

২। গো, সি, সি, পৃ ৪০।

দশম পরিচ্ছেদ

নাথ-সম্প্রদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি
ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল

নাথ-যোগীদের মধ্যে খাড়াখাড়া-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ধীনোদরের যোগীরা নিরামিষ-ভোজী। স্থানান্তরের যোগীরা ‘মৎস্য’ আহার করেন না, কারণ মৎস্যে ‘মৎস্য’ হইতে জাত হন, কিন্তু মাংসাহার ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। যোগীদের মধ্যে জাতি-বিচার না থাকিলেও মুসলমান যোগীদের সহিত হিন্দু যোগীদের একত্রে আহার করিতে দেখা যায় না। অন্নবিতরণ নাথপন্থীদের মধ্যে বিশেষ গৌরবের বিষয়, ধীনোদর, দেবীপাটান, কামাখ্যা, গোরক্ষপুর, টিলা প্রভৃতিতে দশহরার দিন উৎসব ও প্রসাদ-বিতরণ প্রচলিত আছে।

কানফাটাদের মধ্যে ঔষধ ও কবচাদি-বিতরণের প্রথা দেখা যায়। কাশীধামে ময়ূরপুচ্ছ-বাজনী দ্বারা কুদৃষ্টির ক্ষমতা রোধ করিতেও দেখা যায়। গোরক্ষপুরের মোহনজী শিশুদের কঠিন রোগ দূর করিতে সমর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে কার্য্যের শুভাশুভ ফলাফল-নির্ণয় যোগীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কমলাকান্তের ‘সাধক-রঞ্জন’ গ্রন্থের শেষভাগে শ্বাসপ্রশ্বাস-বিচার-করা আছে।

পাঞ্জাবে যোগীরা ‘আঙ্গোলা’ বৃক্ষের পূজা করেন। ইহা শিবের নামের সহিত যুক্ত, ব্রাহ্মণেরা এই পূজার প্রসাদ গ্রহণ করেন না।

শিবরাত্রিতে প্রধান প্রধান মঠে শুরু গোরক্ষাদির চরণ-পূজা হয়, নাগপঞ্চমীর দিনও প্রয়াগ, কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে বিশেষ উৎসব হয়, এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান যোগীরা ‘গুণাগীত’ গাহিয়া ভিক্ষা করেন। কথিত আছে গুণা বাসুকির জামাতা ছিলেন। শিবরাত্রিতে সমস্ত রাত্রি ‘গোরক্ষগীত’ গাহিবার রীতি আছে।

নেপালে কার্তিক মাসে কালভৈরবের পূজা ও শোভাযাত্রা হয়। তবে মৎস্যেশ্বরের রথযাত্রাই নেপালের বিশেষ উৎসব। আমাদের দেশের জগন্নাথের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রার স্থায় মৎস্যেশ্বরের উৎসব হইয়া থাকে।

নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরকে ‘আদেশ’ শব্দ দ্বারা অভিবাদনের রীতি আছে। ইহার অর্থ ‘তুমি ব্রহ্মস্বরূপ’ এই আদেশ শব্দ ‘আদীশ’ শব্দের অন্তর্ভুক্তরূপ, কারণ ‘আদেশ’ শব্দ অনুজ্ঞাসূচক, ইহা নমস্কার বা ঈশ্বরবোধক হইতে পারে না।’

দীক্ষা-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি-সংস্কার

গোরক্ষনাথীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি আছে, মুসলমানরাও এই পন্থে দীক্ষা গ্রহণ করে। পৌষ হইতে চৈত্র মাসাবধি নাথপন্থীদের দীক্ষা-গ্রহণের প্রশস্তকাল। ছয়মাস পর্য্যন্ত সংযম শিক্ষা দিয়া গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন। ইহার পর কর্ণবেধের নিমিত্ত গুরু তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা তিনবার শিষ্যকে দেখাইয়া নিবৃত্ত হইতে বলেন, শিষ্য অসম্মত হইলে তাহাকে ‘অওঘর’ করা হয়, ইহা দীক্ষার নিম্নস্তর-বিশেষ। ইহাতে ছুরিকা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া শিষ্য প্রতিজ্ঞা করে যে, সে বিবাহ করিবে না, কার্যাগ্রহণ বা ব্যবসা করিবে না, হিংসা করিবে না, অপমানিত হইলেও রাগ করিবে না ও কর্ণদ্বয় সময়ে রক্ষা করিবে। এই ‘কুণ্ডল’ শিব ধারণ করেন বলিয়া নাথযোগীদের ইহা প্রিয়। তৎপরে শিষ্যকে গেরুয়া বস্ত্র দেওয়া হয়। পার্শ্বতী স্বীয় রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া গোরক্ষনাথকে উহা প্রদান করেন, এই বিশ্বাসে যোগীরা গেরুয়া বসন ধারণ করেন।

নাথপন্থীদের শিখাচ্ছেদ অর্থে জাতিত্যাগ করা। অওঘররূপে ছয়মাস অতীত হইলে ভৈরোর সম্মুখে ‘শিব-গোরক্ষ’ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিষ্যের উভয় কর্ণে এক ইঞ্চি পরিমাণ ছিद्र করা হয়। এই ছিद्र শুদ্ধ হইলে কুণ্ডল ধারণ রীতি। তখন গুরু কর্ণে মন্ত্র দেন, “ধার্মিক হও, উপযোগী হও,” এবং তাহাকে ‘শিংনাদ’ সহ উপবীত পরাইয়া দেন। তৎপরে শিষ্যের অঙ্গে ভস্ম লেপন করা হয় এবং তাহার নূতন নামকরণ হয়। এইরূপে দীক্ষা-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। দীক্ষান্তে কেহ কেহ আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকেন, কেহবা গার্হস্থ্য ধর্ম্য পালন করেন। জ্বীলোকেরাও দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহারা ‘যোগিনী’ বা ‘নাথিনী’ নামে পরিচিত হন।

কোন যোগীর মৃত্যু ঘটিলে, তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য মুখাগ্নি করা হয়। মৃতদেহ

ধ্যানোপযোগী আসনবন্ধ করিয়া ধৌত করিয়া ভস্ম লেপন করা হয়। তৎপরে নূতন বস্ত্র, জপমালা, চন্দন ও দেহটি উন্নত রাখিবার জন্ত খঞ্জযষ্টি দেওয়া হয়। জলপূর্ণ অলাবুপাত্র ও ভোজ্যজব্য স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা দেহটি আচ্ছাদিত করিয়া তৎপরি সমাধি রচিত হয়। যোনিলিঙ্গ দ্বারা সমাধি চিহ্নিত করিয়া মৃতের পাছুকা ও বিষপত্র স্থাপিত হয় এবং প্রদীপ জালিয়া রাখা হয়। ত্রয়োদশ দিবসে শংখধ্বনি করিয়া সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ঐদিন সমাগতদের ভোজন করান ও অর্থদান করা হয়।’

নাথযোগীদের ব্যবহার্য জব্যসকল

কানফাটা যোগীরা ‘কুণ্ডল’ ব্যতীত এক প্রকার ঔর্ণ উপবীত ধারণ করে, তাহার নাম ‘সেলী’। তাহাতে নয়টি করিয়া সূত্র থাকে। সেলীর মধ্যে ‘নাদ’ নামে দুই তিন অঙ্গুলি প্রমাণ কৃষ্ণ বর্ণ শিংএর প্রস্তুত বংশীর আয় বস্ত্র থাকে ইহার নামান্তর শিংনাদ, উহা গলদেশে ধারণ করিবার নিয়ম। ব্রাহ্মণের উপবীত ও শিখাকে নাথপন্থীরা মিথ্যা বলেন, কিন্তু নিজেরা কুণ্ডল ও সেলী-নাদ ধারণ করেন। শৈব ধর্মের নিয়ম অনুসারে গেকুয়া বস্ত্র-পরিধান, জটা-ধারণ, ভস্ম-লেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত। মতান্তরে ঔর্ণ উপবীতে গ্রথিত ‘পবিত্রী’ নামক বলয়াকার জব্য থাকে, তাহা পার্শ্ববর্তী প্রতীক। এই পবিত্রী হইতে শিংনাদ লব্ধিত থাকে। ‘শিংনাদ’ ও ‘পবিত্রী’ জগৎকারণের প্রতীকরূপে যোগীরা ধারণ করেন। শিব এই শিঙ্গা-ধারণের আদেশ দেন এইরূপ প্রবাদ আছে। ইহা কৃষ্ণহরিণের শৃঙ্গে নির্মিত হয়। পবিত্রী গণ্ডারের শৃঙ্গে বা ধাতুর দ্বারা নির্মিত হয়।

নাথযোগীদের কঙ্ক্রাক্ষের মালা অপেক্ষা হিংলাজ-তীর্থের ঠুমরা ও আশাপুরীর মালা-ধারণ অধিক প্রিয়। এই মালায় ১০৮টি বা ততোধিক গুটিকা থাকে। সপ্ত নক্ষত্রসহ চন্দ্রের উদয় ও অস্ত গণনা করিয়া ৯ সংখ্যা ধরিলে তাহার সহিত দ্বাদশ রাশির যোগে $৯ \times ১২ = ১০৮$ বীজ-সংখ্যা হয়। তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই সংখ্যাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে, এই স্থানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

শৈবসম্মাসীর একটি নাম 'সন্তপ্তজ', কানফাটা যোগীরাও ধূনি বা শ্মশানের ভস্মদ্বারা দেহ লেপন করেন, ও ললাটে 'ত্রিপুণ্ড্র' ধারণ করেন। হিংলাজ-তীর্থপ্রত্যাগত যোগীরা দক্ষিণ বাহুকে 'যোনিবিন্দু'-চিহ্নিত করেন। দীক্ষার সময়ে মস্তক-মুণ্ডনের রীতি থাকিলেও তৎপরে যোগীরা প্রায়ই জটা ধারণ করেন। যোগীদের হস্তে কেদার-বদরীর পিত্তল, স্বর্ণ, লৌহ বা গুণ্ডারের চর্মে নির্মিত বলয়ও দেখা যায়।

যোগীদের সাধনের পক্ষে 'ধূনি' অত্যাবশ্যক। প্রসিদ্ধ মঠ-সকলে অত্য়পি গোরক্ষ বা ধর্ম্মনাথের নামের সহিত যুক্ত ধূনি দেখা যায়। যোগীরা যে ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করেন, তাহা পশ্চিম-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নারিকেলমালার বা অলাবুর। চিবুকভার স্তম্ভ করিবার জন্য 'আচল' নামক খঞ্জ-যষ্টিও ব্যবহৃত হয়। পূজার সময়ে 'দৌর' নামক ঢোল বাজাইয়া যে সকল যোগীরা ভিক্ষা করেন তাহাদের নাম 'দৌর-গৌসাই'। (E. R. E. Kanphatās ভট্টব্য)

যোগী-জাতির পরিচায়ক চিহ্নরূপে যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, শিখা ইত্যাদি ধারণ-সম্বন্ধে নাথযোগীরা বলেন শুভ্র উপবীত হইতে বল ও তেজ বৃদ্ধি পায়। সূত্র মানবের ব্রহ্মভাবের সূচনা করে, তাই উহার নাম 'সূত্র'। এই যথার্থ সূত্রধারক যোগীর চেতনা হইয়াছে বৃদ্ধিতে হইবে। এই সূত্র কদাপি অশুচি হয় না, কারণ এই সূত্রের নাম 'জ্ঞানযজ্ঞোপবীত' এবং ইহা দেহের অন্তর্গত। অগ্নির যেমন একটি 'শিখা' থাকে তেমনি যোগীর শিখা 'জ্ঞানময়ী শিখা', সেইরূপ যোগীই যথার্থ 'শিখী', অন্তেরা মাত্র কেশধারী। যথার্থ ব্রহ্মবিদের জ্ঞানময়ী শিখা ও তন্ময়তারূপ উপবীত আছে। জ্ঞানরূপ 'দণ্ড' যাহার আছে সেই যথার্থ দণ্ডী, যে পরমাত্মা ও আত্মার ভেদ ভুলিয়া মিলন বা 'সন্ধ্যা' করিতে সমর্থ সেই যথার্থ সন্ধ্যাকারী। যে যোগী মনোদণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও বাগ্‌দণ্ডধারী, সেই যথার্থ 'ত্রিদণ্ডী', বাগ্‌দণ্ডসম্পন্ন ব্যক্তি নিরঞ্জন দেবকে জানিতে সমর্থ হন।'

যোগীদের দীক্ষা-গ্রহণ-সময়ে 'বিভূতিস্নান' বিধি, ইহার অর্থ পৃথিবী-তুলা সহিষ্ণু হও, 'জলস্নান' অর্থে মেঘের জল-বর্ষণের দ্বায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও। 'নাদ'ধারণ অর্থে শব্দ-ধারণ, কারণ শব্দই গুরু। উর্ণাদি-নির্ম্মিত 'জনেউ' (সূত্র) ধারণ-দ্বারা সংসার হইতে পৃথক্‌করের স্বরণ হইবে এবং

‘কুণ্ডল’ধারণ দ্বারা আদিনাথের স্মরণ হইবে^১, এই নিমিত্ত এই সকল ব্যবহার বিধি। এই কুণ্ডলের এক নাম ‘দর্শন’ ও যোগীর নাম ‘দর্শনী’, অর্থাৎ যোগীর পরমাত্মা-দর্শন হইয়াছে। প্রবাদ যে পাণ্ডবেরা মৃত আত্মীয়দের পিণ্ডদান-সময়ে গণ্ডারচক্ষু-নির্ম্মিত পাত্রে জলদান করেন, সেই নিমিত্ত গণ্ডারের শৃঙ্গে নির্ম্মিত কুণ্ডলকে নাথযোগীরা পবিত্র জ্ঞানে ধারণ করেন^২। ‘দর্শন’ বৃহদাকার, ইহার পরিধি ৭ ইঞ্চি ও গুরুত্ব ৫ তোলা, অতএব কর্ণের উপাধি ভেদ না করিলে উহা ধারণ করা সম্ভব নহে। যদি কোন প্রকারে ‘দর্শন’ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে অস্ত্রের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ আছে। যদি ‘কুণ্ডল’ অপহৃত হয় তবে সে যোগীর পক্ষে মুখ-প্রদর্শনও নিষিদ্ধ। কুণ্ডলের সাধারণ নাম ‘মুদ্রা’। অঙ্গুল আয়ত মুদ্রার নাম ‘দর্শন’, ও নলাকৃতি মুদ্রার নাম ‘কুণ্ডল’, কুণ্ডলকে পবিত্র জ্ঞানে পবিত্রীও বলা হয়।

১। - যোগিসম্প্রদায়বিহুতি, পৃ ১২, ২০, ৪০-১।

২। - গোরক্ষনাথ-ত্রীপট, পৃ ৮।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

ইতিপূর্বে আমরা লুইপাদ-রচিত 'দোহা' বা 'পদে'র কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। শৈবযোগীরাই প্রথমে সহজবোধ্য অসংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করেন, তথাপি মৎস্বেন্দ্র-গোরক্ষাদির নামে কয়েকখানি সংস্কৃত পুথি প্রচলিত আছে, আজ বহু শতাব্দী পরে তাহারা প্রামাণ্য কিনা সে বিচার পণ্ডিতবর্গ করিয়াছেন এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রাচীন পুথিগুলিকে কৃত্রিম বলা চলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা হিসাবে বাংলা 'গোরক্ষ-বিজয়' 'ময়নামতীর গান' ইত্যাদি ধরিলেও, কাহিনীগুলিকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপা এই চারি সিদ্ধার মাহাত্ম্য বহুপূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। অথচ 'মীনচেনন' প্রভৃতি পুথি ১২২৪ সনে রচিত, গোরক্ষ-বিজয়ের পুথিখানি তাহার কিছু পূর্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়, সম্ভবতঃ উহা ১১৮৪ সনের। গোরক্ষ-বিজয়ের ভূমিকায় (পৃ ১৯, ২০) এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। (সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী—সং ৬৪, ১৩২৪)। এই সকল সিদ্ধার স্বরচিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থমধ্যে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদিত 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' অগ্রতম। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীমহাশয় নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে মৎস্বেন্দ্রের ভণিতা-যুক্ত পাঁচটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুথি পান, তন্মধ্যে 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' প্রাচীনতম। ডাঃ বাগচীর মতে ইহা ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত, শাস্ত্রীমহাশয় ইহার লিপি দেখিয়া ইহাকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের বলিয়া স্থির করেন।^১ কৌলজ্ঞাননির্ণয় ব্যতীত অকুলবীরতত্ত্বের দুইখানি পুথি এবং 'কুলানন্দতত্ত্বম্' ও 'জ্ঞানকারিকা'—মোট এই কয়টি পুথি বাগচীমহাশয় দেখিয়াছেন। কোন পুথিতেই লেখকের নাম নাই, ভণিতায় মচ্ছেন্দ্রপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, মৎস্বেন্দ্রপাদ, মীনপাদ, মীননাথ, মৎস্বেন্দ্র ও মচ্ছিন্দ্রনাথপাদ আছে। পুথির মধ্যে মীননাথ ও শেষে

১। কৌলজ্ঞাননির্ণয়—বাগচী, ভূমিকা, পৃ. ৩।

মৎস্যেন্দ্রনাথ থাকায় উভয় নামই একই ব্যক্তির বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ সাধারণ্যে তিনি দুই নামেই পরিচিত ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পুত্র, পুত্রির শেষে ‘মীননাথ’ নাম পাইলে উহা অসম্ভব মনে হইত না। এতদ্ব্যতীত অকুলবীরতত্ত্বের অনুরূপ দুই খণ্ড পুথিতে মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ নাম পাওয়ায়, দুইটি নাম একই ব্যক্তির বলা যায়।

মৎস্যেন্দ্রসম্প্রদায়ের আরও কয়েকটি পুথির অংশমাত্র ডাঃ বাগচী নেপালের পুথিশালায় পান, তন্মধ্যে :

১। শ্রী কামাখ্যাগৃহ সিদ্ধির—কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা আছে। উহাতে কয়েকটি গুরুর নাম ও অষ্টম পটলের ভণিতায় ‘মৎস্যেন্দ্র’র নাম আছে।

২। অকুলাগমতত্ত্ব—ইহাতে মৎস্যেন্দ্রের নাম নাই, লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। ‘অকুল’ শব্দ, আসনাদি, সমাধি ইত্যাদি, পঞ্চমকারের গুঢ়ার্থ, যজ্ঞোপবীত-বর্জনাди বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৩। গোরক্ষশতকম্—ইহাতে যোগবর্ণনা, চক্রাদি-বর্ণনা ও হঠযোগ আছে।

৪। গোরক্ষভূজগম্—১৭৩০ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্মীধার-রচিত নয়টি গোরক্ষস্তব।

৫। গোরক্ষসহস্রনামস্তোত্রম্—বিশেষ কিছু নাই।

৬। গোরক্ষ-সংহিতা—ষোড়শ শতাব্দীর লিপি। দেবী ও ঈশ্বরে কথোপকথন, সৃষ্টিবিধি, নাড়ীকথন, দেহমধ্যস্থ ছয়টি দ্বীপ, লবণাদি সমুদ্রের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের সহিত অকুলবীরতত্ত্বের মিল আছে, ইহাতে সাম্প্রদায়িক নীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৭। নিত্যাহ্নিক-তিলকম্—১৩২৫ খৃষ্টাব্দের। শাক্তীও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ‘কৌল’ বা পশ্চিম শাসন-সম্প্রদায়ের, ইহাতে গুরুপরম্পরা ও তাঁহাদের জন্মস্থান দেওয়া আছে। ইহাতে মৎস্যেন্দ্র-সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে তাহার উল্লেখ এই নিবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে।

শাক্তীমহাশয়ের সম্পাদিত বৌদ্ধগান ও দোহার পরিশিষ্টে (পৃষ্ঠা ৪৮) লুইপাদ-রচিত শ্রীভগবদভিসময়নাম, অভিসময়বিভঙ্গ ইত্যাদি পঞ্চ গ্রন্থের নাম আছে।

‘মৎস্যেন্দ্র-সংহিতা’ নামে যোগবিষয়ক এক পুথি (মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত) পাওয়া যায় বলিয়া ‘কল্যাণে’ উল্লিখিত হইয়াছে।^১ আমি ইহার সন্ধান পাই নাই। এই পুথির উল্লেখ চন্দ্রনাথ যোগীকৃত ‘গোরক্ষ-বিকাশের’ পরিশিষ্টে আছে। ‘গোরক্ষ-সংহিতা’-সম্বন্ধে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীমহাশয় কোলজ্ঞাননির্ণয়ের পৃ ৬৪র ফুটনোটে বলিয়াছেন প্রসন্ন কবিরত্নের সংকলিত গ্রন্থ তিনি পান নাই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ হুপ্রাপ্য নহে, তবে ইহার বিষয়বস্তু ভিন্ন। নাথপন্থের এই গোরক্ষ-সংহিতা সূত্র আকারে রচিত। ইহাতে যোগাঙ্গ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির বিষয় আছে। ডাঃ বাগচীর নেপালে প্রাপ্ত গোরক্ষ-সংহিতা পুথির বর্ণনা পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে।

গোরক্ষনাথের নামে আরও কয়েকখানি সংস্কৃত পুথি প্রচলিত আছে যথা :—

(ক) গোরক্ষ-শতক	(খ) গোরক্ষকলা
চতুরশীতাসন	গোরক্ষসহস্রনাম
জ্ঞানামৃত	গোরক্ষপিষ্টিকা
যোগচিন্তামণি	গোরক্ষগীতা
যোগমহিম	ইহা ব্যতীত হিন্দীতে
যোগমার্গও	বহু কবিতা পাওয়া
যোগসিদ্ধাস্তপদ্ধতি	যায়। ^২
বিবেকমার্গও	
সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতি। ^৩	

কাশ্মীর মহারাজের গ্রন্থাগারের সংস্কৃত-সিরিজ মধ্যে ১৯১৯ সালে ‘জন্মমরণ-বিচার’ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ‘অমরৌঘ-শাসনম্’ নামে সংস্কৃত পুথি সিদ্ধ গোরক্ষনাথকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

‘গোরক্ষ-বোধ’ পুথি প্রাচীন হিন্দীতে রচিত। তেসিতরির মতে ইহা চতুর্দশ শতাব্দীর। ‘গোরক্ষনাথকী বচন’ সপ্তদশ শতাব্দীতে বনারসী দাস নামক জনৈক জৈন দিগম্বর পুরোহিত কর্তৃক প্রণীত হয়।^৪

১। কল্যাণ, যোগাঙ্গ, পৃ ৭৮৩।

২। E. R. E., Vol. VI, Gorakhnath.

৩। কল্যাণ, যোগাঙ্গ, পৃ ৭৮৪।

৪। E. R. E., Vol XII, p. 834. ব্রীং.স. পৃ ২৪২, ফুটনোট।

শিব-সংহিতা, শিবপুরাণ, শিবরহস্য প্রভৃতি গোরক্ষনাথীদের মধ্যে প্রচলিত গ্রন্থ। ঘেরণ্ড-সংহিতা ১৮৭৭ সালে কলিকাতা হইতে ভুবনচন্দ্র বসাক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের রীতিনীতি শিব-সংহিতা ও ঘেরণ্ড-সংহিতায় আছে। ঘেরণ্ড বাঙ্গালী বৈষ্ণব ছিলেন, চণ্ড কপালী নামক শিষ্যের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাতে ষট্‌কর্মাদি বর্ণিত হইয়াছে। শিবসংহিতা তাত্ত্বিক গ্রন্থ, ইহার ৫ম অধ্যায়ে শিবপার্বতীর কথোপকথন আছে, হঠযোগ-প্রদীপিকার দ্বায় ইহাও গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ।

মৎস্বেন্দ্র হঠযোগের আদি প্রচারকর্তা—এইরূপ প্রবাদ আছে। শিব ইহার আদি বক্তা। হঠযোগে মৎস্বেন্দ্রাসনম্ মৎস্বেন্দ্রনাথাভিমতম্, পদ্মাসনম্ ইত্যাদি আছে, কৌল-জ্ঞাননির্ণয়ের তৃতীয় পটলে (২-৩) কুললক্ষণ-বর্ণনা আছে। হঠযোগ-প্রদীপিকায় (৪।১৪) ইহার অনুরূপ শ্লোক আছে।

অতএব হঠযোগ মৎস্বেন্দ্র-প্রবর্তিত বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে বলা যায়। (বাগচী কৌলজ্ঞান-ভূমিকা, ১৮/০)।

সাম্ভারাম যোগীন্দ্র বা চিন্তামণি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে হঠযোগপ্রদীপিকা রচনা করেন—ইহার মূল গোরক্ষের রচিত গোরক্ষ-পদ্ধতি 'গোরক্ষ-শতক' প্রভৃতি সংস্কৃত পুথি। কাশীধামে গোরক্ষ-শতক পুথি 'জ্ঞানশতক' নামে প্রচলিত,—ইহাও গোরক্ষনাথ-বিরচিত। 'গোরক্ষ-শতক' ও 'গোরক্ষ-সংহিতা'র মিশ্রণে 'গোরক্ষ-পদ্ধতি'র উৎপত্তি হইয়াছে, গোরক্ষ-পদ্ধতির মধ্যেই গোরক্ষ-সংহিতা ও গোরক্ষ-শতক উভয় নাম পাওয়া যায়, আবার পুণায় প্রাপ্ত পুথিতে 'শিব-যোগশাস্ত্র' নামও আছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে গোরক্ষ-পদ্ধতি ও গোরক্ষ-শতক হইতে নাথমার্গীদের সাধনপদ্ধতি বুঝা যায়, কিন্তু ডাঃ মোহন সিং ইহার প্রতিবাদস্বরূপ বলিয়াছেন গোরক্ষ-নাথের সাধন-পদ্ধতি পরবর্তী কালের উপনিষদের দ্বায়, বামাচারীদিগের সহিত তাহার কোন সংশ্লিষ্ট ছিল না, যদিও গোরক্ষ-বোধের ১৩১ ও ১৩২

শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ হইতে তাঁহাদের হঠযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়।^১ হিমালয়স্থ গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত টেহরী রাজধানীতে হিন্দীতে রচিত 'গোরক্ষ-পদ্ধতি' হরিদ্বার হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়। Farquhar মতে গোরক্ষ-কল্প নামক পুথি হিন্দীতে গোরক্ষ-পদ্ধতিরূপে প্রচারিত হইয়াছে।^২ ইহার প্রথম একশত শ্লোক গোরক্ষ-শতকের অনুরূপ, দ্বিতীয় শতকে হিন্দীতে প্রাণায়াম-প্রত্যাহারাদির বর্ণনা আছে, ইহার কাল নিরূপণ করা কঠিন। গোরক্ষ-শতকের টীকা শঙ্কর কর্তৃক কাশীবাসকালে রচিত হয় স্বীকার করিলে, মূল পুথি শঙ্কর-পূর্ব যুগের বলিতে হয়। গোরক্ষ-শতকে যোগ ও তন্ত্রের সমন্বয় আছে।

গোরক্ষ-সংহিতা, গোরক্ষ-কৌমুদী, বিবেকমার্গঃযোগ (রামেশ্বর ভট্ট প্রণীত), গোরক্ষ-গীতা, গোরক্ষ-সহস্রনাম ইত্যাদি সংস্কৃতে রচিত।^৩ বলভদ্রকৃত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' ও 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' এই উভয় পুথি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজমহাশয়ের সম্পাদনায় ১৯২৫ সালে সরস্বতী-ভবন, বেণারস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের নানা বিষয়ের অবতারণা এই পুথিদ্বয়ে আছে।

গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে নাথ, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির বর্ণনা, ত্যাগ ও ভোগের রহস্য, নবনাথ, ৮৪ সিদ্ধ, পুরুষ-লক্ষণ, অবদূত-লক্ষণ, কাপালিক-মার্গ, দ্বৈতাদ্বৈতমত, সিদ্ধমত, নাদ ও বিন্দুসম্বন্ধ, নাদাসুসম্বন্ধ, কায়াসিদ্ধি প্রভৃতি বহুবিষয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে,—ইহা হইতে নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুথি প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায় :—

শ্রীনাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি	অমনস্ক	গীতা
নিত্যানাথকৃত-সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি	বিবেকমার্গঃ	তন্ত্রমহার্ব
অবদূতগীতা	ধ্যানবিন্দুপনিষৎ	কুরিকোপনিষৎ
স্মৃতসংহিতা	মুক্তিকোপনিষৎ	গোরক্ষোপনিষৎ
ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ	মনুস্মৃতি	বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
কৈবল্যোপনিষৎ	উত্তরগীতা	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তোজোবিন্দুপনিষৎ	বায়ুপুরাণ	কালাগ্নিক্রোধোপনিষৎ

১। ডাঃ সিং, পৃ ১০, ত্রীগ.স, পৃ ২৫০

২। যোগি-সংখ্যা, ১৩২৮, পৃ ২৫; ৩-৪। ত্রীগ.স, পৃ ২৫০।

৩। ত্রীগ.স, পৃ ২৫২, ইহাতে ২৬টি গ্রন্থের নাম আছে।

পরমহংসোপনিষৎ	ত্রয়োপনিষৎ	কপিলগীতা (পদ্মপুরাণ)
নাথসূত্র	সর্বোপনিষৎসার	তত্ত্বমহার্ব
ভর্তৃহর্যুক্তি	রাজগুহ্য	ষোড়শনিত্যাতন্ত্র
বৃহৎ চত্রাক্ষণ	শক্তি-সংগমতন্ত্র	তারাসূত্র
শিবোপনিষৎ	সনৎসুজাতীয়বচন	শিবপুরাণ
শ্রীগোরক্ষসহস্রনামস্তোত্র	(মহাভারতে)	
(কলপক্রমতন্ত্রে)	হঠপ্রদীপিকা	
(রাজগুহ্যে শ্রীকৃষ্ণকৃত)	শাবরতন্ত্র	
ললিতাথও	ষট্শাস্ত্রবরহস্য	
(ত্রয়োপুরাণের সারসংগ্রহে)	কাবেষয়গীতা	
একাদশস্কন্ধ ভাগবত	যোগবীজ	
ত্রয়োবৈবর্তপুরাণ	সিদ্ধান্তবিন্দু	

উক্ত 'অমনক' পুথিটি ১২৯৯ সালে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'শাস্ত্রশতক' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে (১ম সংস্করণ, ২নং হরি-মোহন বসু লেন, কলিকাতা) । 'যোগবীজম্' পুথিটি ১৮৮৬ সালে ভুবন-চন্দ্র বসাক প্রকাশিত করেন ।

বলভদ্রকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে পিণ্ডোৎপত্তি-বিচার, পিণ্ডবিচার, পিণ্ডসংবিত্তি, পিণ্ডাধার, পিণ্ড ও পরমপদ, অবদ্যুত ও সিদ্ধিবর্জনে নিরুত্থান-দশালাভ-বৃত্তান্ত রহিয়াছে । গোরক্ষসম্প্রদায়ের যোগবৃত্তান্ত, যথা—ষট্‌পিণ্ডের বিচার, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য, পঞ্চব্যোমসাধন, গোরক্ষমতে প্রচলিত চতুঃপীঠতত্ত্ব, পিণ্ডত্রয়োত্তর একতা, কুলাকুলের বিচার, শিবশক্তির সম্বন্ধ, নিরুত্থানদশা, সামরসসাধন প্রভৃতি ইহাতে আছে । ক্ষপণক, যোগী বা সিদ্ধই অবদ্যুত, তিনি পরমহংস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত যোগী, এইরূপ মূল্যবান সংজ্ঞা এই পুথিতে আছে । শাণ্ডিল্য গোত্রের বলভদ্র কাশীধামে এই পুথি কৃষ্ণরাজার আদেশে রচনা করেন, বলভদ্রের কাল-নির্ণয় হয় নাই । পুথির চতুর্থ ও পঞ্চম উপদেশে নিম্নলিখিত পুথির উল্লেখ আছে—

ললিতস্বচ্ছন্দ

তত্ত্বসার

জঠরসংহিতানিবন্ধ

কিন্তু এই পুথিগুলিরও কাল-নির্ণয় না। হওয়াতে বলভদ্রের কাল-নিরূপণ সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি এই পুথি যে সাম্প্রদায়িক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হঠযোগপ্রদীপিকার (পৃ ২) টীকায় আছে ‘তথা চোক্তং গোরক্ষ-নাথেন সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতৌ’—এই পুথি হরিদ্বার নাথব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনুলিপি-সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পুথিমধ্যে আছে তাহা জানা যায় :

মহেশ্বরাবতার গোরক্ষকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি ছয়টি অধ্যায়ে উপদেশাকারে গ্রথিত হইয়াছে, যথা—পিণ্ডোৎপত্তি, পিণ্ডবিচার, পিণ্ড-সংবিত্তি, পিণ্ডাধার, পিণ্ড(পরম)পদ, সমরসভাব ও ত্রীনিত্যাবধূত।

গ্রন্থটি প্রধানতঃ পণ্ডে লিখিত। অন্যান্য মাণ্ড গ্রন্থ হইতে শ্লোকোদ্ধারও আছে। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ নামক যে গ্রন্থের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে উহা ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’র সংক্ষেপসার-সংগ্রহ মাত্র। ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ গোরক্ষনাথকৃত বলিয়া নাথসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে, ইহা একটি গুরুত্ববিশিষ্ট পুথি। ইতিপূর্বে যে গ্রন্থতালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিত্যনাথকৃত ও ত্রীনাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বিভিন্ন গ্রন্থকর্তার নাম সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত অন্য প্রমাণাভাব। পুথিটি বিভিন্ন স্থান হইতে আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে একমাত্র গোরক্ষনাথের নাম পাইয়াছি। ইহাতে নাথসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দার্শনিক মত ও যোগপদ্ধতির অনেক তথ্যের ইঙ্গিত আছে। নাথধর্ম যে অদ্বৈতবাদ এবং শক্তির প্রসার-সঙ্কোচভাবে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সংহারকে আভাস রূপে গণনা করে তাহারও ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থের ৬ষ্ঠ উপদেশে সাম্প্রদায়িক বহু নাম ও সংজ্ঞার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ বিচার করিয়া আধ্যাত্মিক আদর্শই যে তাঁহাদের অভিপ্রেত তাহা সুস্পষ্টভাবে দর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের বাহিরে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রচলিত আছে :—

ময়ূরভঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র-গীত, উড়িয়া ভাষায় রচিত।

পদ্মাবৎ—মালিক মহম্মদ জৈয়সী রচিত।

গাথা—লক্ষ্মণদাস-রচিত।

সিহরকি গোপীচন্দ্র—গঙ্গারামকৃত।

গোপীচন্দ্র রাজাকে খেল—প্রহ্লাদীরাম পুরোহিত।

সন্তুলীলাগুত—মহারাষ্ট্র-কবি মহীপতি (১৭১৫-৯০ খৃঃ) ।

গোপীচাঁদ নাটক—পুণার আশ্বাজি গোবিন্দ-রচিত (১৮৬৯ খৃঃ) ।

গোপীচাঁদ পুথি—হিন্দীতে রচিত ।^১

অক্ষয় দত্ত লিখিয়াছেন—গোরক্ষনাথ নয়নাথের একনাথ, অর্থাৎ নয়জন প্রধান গুরুর একটি গুরু । ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন । গোরক্ষ-সংহিতা ব্যতিরেকে ‘গোরক্ষ-শতক’ ও ‘গোরক্ষ-কল্প’ নামে তাঁহার দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে । ‘গোরক্ষসহস্র’ নামক গ্রন্থও তাঁহারই কৃত বোধ হয় ।^২

৩। অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণমহাশয় লিখিয়াছেন—জ্ঞানৈক কবি বানারসি দাসের ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক গোরক্ষনাথকে বচন, গোরক্ষনাথকী গোপী, কুলাজিপটল, যোগসার, যোগাস্ত্র আগমসার, ব্রহ্মবোধ, পুণ্যনাথ-রচিত অর্জুনগীত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নাথদের মূলনীতি-সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারা যায় । গ্রন্থগুলি হইতে এই মাত্র জানা যায় যে শিব তাঁহাদের পরমেশ্বর এবং তাঁহাদের মতে শিবের সহিত এক হইতে পারিলেই জীবের মুক্তি । তবে এই মুক্তি যোগ-সাধনের দ্বারা লভ্য ।^৩

যোধপুরের বাণীভাণ্ডারে ‘গোরক্ষবোধ’র অনুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞানভূষণমহাশয় জানিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি আর বাণীভাণ্ডারে নাই, বহু অনুসন্धानে তিনি আর একখানি গোরক্ষ-বোধের সন্ধান পাইয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন । পূর্বোক্ত গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থের পার্থক্য আছে, কারণ ইহাতে কবীর-পন্থীদের মতামত প্রবেশ করিয়াছে । কবীর ও নানকপন্থীরা নাথমতের সহিত ভাবের বিনিময় করায় প্রকৃত নাথমতের অর্ধেকেরও বেশী লোপ পাইয়াছে, পরবর্তী নাথগুরুরা স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে মতামতের পরিবর্তন করিয়াছিলেন । অথচ ডাঃ মোহন সিং যোধপুর গ্রন্থাগার হইতে ‘গোরক্ষ-বোধ’ পুথি পাইয়াছেন, ডাঃ সিং তাঁহার রচিত ‘গোরক্ষনাথ’ গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি—বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া উভয় গোরক্ষ-বোধে প্রভেদ দেখাইতেছি :—

১। জ্ঞান-ভারতী—গ্রন্থাত মুখোপাধ্যায় সংকলিত, শান্তিনিকেতন । বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ সেন (৫ম সং), পৃ ৩৪ ।

২। “জা. উ. স. (২য় খণ্ড) পৃ ২১৩ ‘কন্দট-গোপী’ ।

৩। প্রবাসী, ১৩২২ চৈত্র, যোগিজ্ঞানি গ্রন্থ, অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ ।

গোরক্ষের প্রথম প্রশ্ন—মন কি? মৎস্তেশ্বরনাথের উত্তর—মন চঞ্চল, বিজ্ঞান হইতেও উহা চঞ্চল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—মন কোথায় থাকে? উত্তর—জীবহৃদয়ে মনের বাস। হৃদয়াভাবে মন অনুপত্রক্ষে বাস করে, ব্রহ্মের উপমা নাই বলিয়া তিনি অনুপ।

পবন মনের জীবনস্বরূপ, ইহা জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল, নাভিমূল ত্যাগ করিয়া পবন নিরঞ্জে অবস্থান করে। পবনের উৎপত্তি শব্দ হইতে। শব্দ ঔকারধ্বনি। আকাশ স্পন্দিত হইলে ধ্বনির উদ্ভব হয়। সুতরাং বায়ুর উৎপত্তি ও লয়স্থান নাদ। স্থির বায়ু মাতাস্বরূপ ব্রহ্ম। চঞ্চল মন স্থির হইয়া শূন্যে থাকে, তখন ঔকারধ্বনি শ্রুত হয়। ঔকারধ্বনি শব্দের পরাবস্থা। (বিজ্ঞানভূষণসংগৃহীত প্রবাসী, পৃ: ৭৬২, চৈত্র ১৩২৯)

গোরক্ষের প্রশ্ন (৩৯-তম শ্লোক)—নাদের উৎপত্তি কোথায়, ইহার স্থিতি ও বিলয় কোথায়?

মৎস্তেশ্বরের উত্তর (৪০-তম শ্লোক)—নাদের উৎপত্তি অবগতিতে (unknowable) বা ঔকারে, ইহার শূন্যে স্থিতি, পবনের মধ্যে লয় ও নিরঞ্জন (formless) এর সহিত বা আকাশের সহিত মিলন সম্ভব।

প্রশ্ন ৪১। নাদের যদি শব্দ না থাকে, শক্তির যদি গতি না থাকে, আমাদের আশার নিমিত্ত যদি স্বর্গ না থাকে তাহা হইলে প্রাণপুরুষ কোথায় বসতি করিবে?

উত্তর ৪২। নাদে শব্দ আছে, বিন্দুতে গতি আছে, গগন আমাদের মধ্যে আকর্ষণ আনে, কিন্তু এই সকল না থাকিলে বায়ু বা প্রাণপুরুষ নিরন্তরে বাস করিত। নিরন্তর = within (সিং সংগৃহীত)। বিজ্ঞানভূষণমহাশয়ের 'গোরক্ষ-বোধে' পবনের উৎপত্তি শব্দ হইতে, বায়ুর উৎপত্তি ও লয়স্থান নাদ ইত্যাদি বুঝায়। ডাঃ সিংএর 'গোরক্ষ-বোধ' হইতে নাদের শূন্যে স্থিতি পবনের মধ্যে লয়, ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায়।

তনুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়া যায়, শব্দ প্রাণে মিশিয়া যায়, প্রাণ ব্রহ্মে মিশিয়া যায়, ব্রহ্ম হংসে মিশিয়া যায়। হংস সুরতিতে মিশে, শূন্য ঔকারে মিশে। ঔকার কালে মিশে, কাল জীবে মিশে, জীব শিবে মিশে। শিব নিরঞ্জে মিশে, নিরঞ্জন-জলে মিশে। (অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, পৃ: ৭৬৩)

ইহার সহিত ডাঃ সিং-এর পুস্তকের প্রস্তোত্তর-শ্লোক ৪১, ৪২, তুলনীয়। শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানভূষণের দ্বারা প্রাপ্ত গোরক্ষ-বোধে ৬০টি শ্লোকসংখ্যা আছে, ডাঃ সিং দ্বারা প্রাপ্ত গোরক্ষ-বোধে, ১৩৩টি শ্লোকসংখ্যা আছে। হিন্দী ‘গোরক্ষ-বিকাশ’ নামক গ্রন্থে গোরক্ষবোধের ১২২টি শ্লোক আছে। এই গ্রন্থ সদানন্দ যোগী জালন্ধর হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তেসিত্তরির মতে ‘গোরক্ষ-বোধে’ শৈব ও যোগতত্ত্ব সম্মিলিত। মাধবাচার্য্যের শৈব-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একথা বলা যাইতে পারে। পতঞ্জলির যোগতত্ত্ব ও উপনিষদের যোগতত্ত্বের সহিত ইহাদের যোগতত্ত্বের যে নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা চক্র, কৌশল, নাদ, পবন ও হংস প্রভৃতির আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।^১ ‘চক্রাদির বর্ণনা’ নিবন্ধের সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশে করা হইয়াছে, এস্থলে কেবল কয়েকটি প্রস্তোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

প্রশ্ন ৫৭।	কোন্ চক্রে চন্দের নিরোধ কর্তব্য ?	উত্তর—উর্দ্ধচক্রে।
	কোন্ চক্রে সন্ধি (Union) কর্তব্য ?	উত্তর—অধঃচক্রে।
	কোন্ চক্রে পবন-নিরোধ কর্তব্য ?	উত্তর—পশ্চিমচক্রে।
	কোন্ চক্রে জ্ঞানের উদয় হয় ?	উত্তর—হৃদয়চক্রে।
	কোন্ চক্রে ধ্যান কর্তব্য ?	উত্তর—কণ্ঠচক্রে।
	কোন্ চক্রে বিশ্রাম কর্তব্য ?	উত্তর—আজ্ঞা বা জ্ঞানচক্রে।

প্রশ্ন ৩৭। চন্দ্রসূর্য্য কোথায় থাকে, নাদবিন্দু কোথায় থাকে, হংস কোথায় চড়িয়া জল খায়, উল্টা-শক্তিকে কোন্ ঘরে আনিয়া বিশ্রাম করান হয় ?

উত্তর ৩৮। চন্দ্র উর্দ্ধে, সূর্য্য অধে, নাদবিন্দু হৃদয়ে, হংস আকাশে চড়িয়া জলপান করে, উল্টা-শক্তিকে (Reserved power) নিজ ঘরে আনিয়া বিশ্রাম করান হয়।^২ এই প্রস্তোত্তর ৩৭, ৩৮, ডাঃ সিং-এর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। গোরক্ষবিকাশ গ্রন্থের শ্লোক ২৫ ও ২৬ ইহার অনুরূপ।

গ্রীয়ারসনের মতে ‘গোরক্ষ-বোধ’ একাদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হয়। ডাঃ সিং এরমতে উহা একাদশ শতাব্দীর বা তৎপূর্ব্বের। ইহার ভাষা মারাঠী, গুজরাটী, রাজস্থানী-মিশ্রিত পাঞ্জাবী, তথাপি সরল ও

১। E. R. E., Vol. VI, Gorakhnath, Grierson.

২। Gorakhanath—Singh, Appendix, pp. 6 ff.

স্পষ্ট, মাঝে মাঝে আরবী, ফারসী শব্দও আছে। কাশী কারমাইকেল লাইব্রেরীতে ইহার একটি খণ্ডিত মুদ্রিত পুস্তক আছে। শিবরাম শর্মা ১৯১১ সালে বেনারস হইতে উহা প্রকাশিত করেন।^১

যোধপুর বাণীভাণ্ডারে রক্ষিত ‘শিস্ত প্রমাণ গ্রন্থ’ নামক পুথিখানি মাত্র ডাঃ মোহন সিং-এর মতে গোরক্ষের রচনা, কিন্তু ডাঃ সিং উহা দেখেন নাই। তবে গোরক্ষনাথের নামে নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রচলিত বলিয়া ডাঃ সিং তাঁহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে জানাইয়াছেন (পৃ ১১):—

১। তিব্বতী পুথি, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক অধ্যাপকের নিকট আছে। ডাঃ সিং পুথির নাম দেন নাই।

২। গাথা ও পদ্য, রাগ রামকেলী—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত, ১৭০১ খৃষ্টাব্দের। অমূল্যপি নম্বর ৬৭৪।

৩। লাহোরে প্রাণসঙ্গলী পুথির অমূল্যপি ১৭০১, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের। মাঙ্গাতে প্রাণসঙ্গলীর অমূল্যপি ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের।

৪। শব্দ শ্লোক—লাহোরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুরুমুখীতে মুদ্রিত।

৫। বনবশী বিলাস,—বনারসী দাসকৃত, ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে মুদ্রিত।

৬। জনমশাখী, নানক, লাহোর হইতে মুদ্রিত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বনবশী বিলাসের উল্লেখ কল্যাণ-যোগাঙ্গে দ্রষ্টব্য।

জৈসীকৃত পদ্যমাঝে কাব্যো (১৫২০ খৃষ্টাব্দ) গোরক্ষের ‘শ্রুত-শব্দ-যোগ’ কথা আছে। নামদেব, কবীর, নানক প্রভৃতির রচনাতেও ‘অনহদ-যোগ’ বৃত্তান্ত আছে, উল্টা-সাধনের ইঙ্গিতও আছে। এই ‘উল্টা-সাধন’ নাথযোগীদের বৈশিষ্ট্য।

ডাঃ সিং গোরক্ষের রচনার নমুনা-স্বরূপ কয়েকটি পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা :—অনত ন ভরমো সিধা তেরী কাইআং মধে সার। রহাউ। বোলতে কা খোজ করনা।

জীবতে হী উলটি মরণা। সহিজ হী অকাস চরনা। কাহে জম কা দণ্ড ভরনা উতর পরনা পার।^২

অর্থাৎ হে সিদ্ধ, অত্যাঙ্গানে গমন করিও না, তোমার দেহমধ্যেই সত্য আছে।

১। E. R. E., Vol XII (pp. 834-35). গোরক্ষবাণী—শ্রীতারক বড়লাল, ভূমিকা, পৃ ১২।

২। Gorakhnath—Singh, Appendix.

যে কথা কয় (অর্থাৎ 'শব্দ') তাহার সন্ধান কর, উল্টা সাধন দ্বারা জীবন্তে মর, সহজভাবে আকাশে গমন কর, তাহা হইলে মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া তুমি পারে যাইবে।

গোরক্ষের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের নাথযোগীদের, 'পা' সিদ্ধাদের, আচার্য্য ও অবধূতদের, হিন্দু ও মুসলমান ভক্তদের ও শিখ গুরুদের ভাষা একটি বিশেষরূপ ধারণ করিয়াছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত রহস্যবাদীরা একই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে ভাবের যে আদান-প্রদান করিতেছিলেন ও মধ্যযুগের রহস্যবাদের প্রসারক্ষেত্রের বৃদ্ধি করিতেছিলেন, তাহারই ফলে এইরূপ একটি ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হয়। নাথদিগের ভাষা অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী ও রাজপুত ভাষা মিশ্রিত, পা-দিগের ভাষা অধিকাংশই প্রাকৃত। ভাষাদ্বারা বিচার করিলে গোরক্ষনাথ ও গোপীচাঁদকে রাজপুতানার অধিবাসী বলিতে হয়।^১

গোরক্ষ-গোপীচাঁদ কাহিনী নাট্যাকারেও ভারতে প্রচলিত। গোপীচাঁদের গৃহত্যাগ বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের ছায়াই হৃদয়স্পর্শী, এই কারণে কাহিনী অন্বালা-প্রদেশের জগাধীনগরে অভিনীত হইয়া থাকে।

নেপালে নেওয়ারী ভাষায় রচিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-বিষয়ক একটি বাংলা নাটক পাওয়া উহা কেন্দ্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। (উহা ১৬২০-৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়)।^২

নেপালের এই নাটকের শেষাংশের সহিত ছল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতের শেষাংশের বেশ মিল আছে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে হরিহর কর্তৃক ভর্তৃহরি-নির্ভেদ নাটক রচিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রাচ্য সভার পত্রিকায় এে সাহেব উহা প্রকাশিত করেন।^৩

ডাঃ পীতাম্বর বড়হুলা এলাহাবাদ হইতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাহার সংকলিত 'গোরক্ষ-বাণী'র ভূমিকায় (পৃ ১৯) লিখিয়াছেন যে 'সব্দী' গোরক্ষের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক রচনা, কিন্তু উহা গোরক্ষ-বোধের ছায় পরিচিত নহে। সব্দীর ভাষার নমুনাস্বরূপ কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

বসতী ন সৃষ্টি সৃষ্টি ন বসতী অগম অগোচর এসা।

গগন সিমর মহি বালক বোলৈ তাকা নাব ধরহুশে কৈসা।

১। Ibid., pp. 38-40. Re Goraksha's language.

২। Briggs, p. 206. বা. সা. ই. হুম্মার সেন, পৃ ২০৫, ২০৬

৩। E. R. E., Vol. VI. Gorakhnath.

অর্থাৎ পরমতত্ত্ব অগম ও অগোচর উহাকে বস্তু অর্থাৎ আছে বা শূন্য অর্থাৎ নাই, এক্রূপ বলা যায় না, উহা ভাবাভাব সং ও অসং-এর উর্দ্ধে। উহা আকাশে কথা কহিবার বালক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের ব্রহ্ম, তিনি পাপ-পুণ্যহীন বালকের দ্বায় বিরাজ করেন, তাঁহার নাম কি প্রকারে রাখা যাইতে পারে? কারণ তিনি নাম ও রূপের অতীত বস্তু।

অদেখি দেখিবা দেখি বিচারিবা অদিসিটি রাখিবা চীয়া।

পাতাল কী গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ড চড়াইবা, তহা বিমল জল পীয়া।

ইহা হী আছৈ ইহা হী অলোপ। ইহা হী রচিলে তীনি ত্রিলোক
অছৈ সগৈ রহৈ জুবা। তা কারণি অন ত সিধা জোগেশ্বর হুবা।

অর্থাৎ অদেখাকে (পরব্রহ্মকে) দেখিবে, দেখিয়া বিচার করিবে। যাহা আখি দ্বারা দেখা যায় না, তাহাকে চিত্তে রাখিবে। পাতালের (মণিপুর-চক্র) গঙ্গাকে (কুণ্ডলিনী) ব্রহ্মাণ্ডে (মহাস্রারে) প্রেরণ করিয়া যোগী নির্মল জল পান করিবে।

এইখানে মহাস্রারে পরব্রহ্ম অলোপ বা লুপ্ত হইয়া আছেন, ত্রিলোকের রচনা এইখান হইতে হইয়াছে। অক্ষয় পরব্রহ্ম সর্বদা সঙ্গ্রে আছেন, সেই কারণে অনন্ত সিদ্ধ যোগমার্গে প্রবেশ করিয়া যোগেশ্বর হইয়াছেন।^১

পণ্ডিত সদানাথ যোগী “গোরক্ষ-বিকাশ” নামে যে গ্রন্থটী জালন্ধর হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে গোরক্ষনাথ মৎস্বেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রচিত গ্রন্থের এক তালিকা দিয়াছেন, তন্মধ্যে গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত আছে :—

গোরক্ষসংহিতা	কায়বোধ
যোগমহিমা	ব্রহ্মজ্ঞান
যোগ সিদ্ধাস্ত পদ্ধতি	সিদ্ধাস্তভাস্কর
বিবেক মার্গণ্ড	নামলক্ষণাবলী
চতুঃ শীতাসন	যোগপ্রদীপিকা
সিদ্ধ-সিদ্ধাস্ত-পদ্ধতি	অমৃত-সিদ্ধি
গোরক্ষ-পদ্ধতি	গোরক্ষশতক
ইষ্টযোগ-প্রদীপিকা	গোরক্ষবোধ
জ্ঞানদীপবোধ	খেচরী বিজ্ঞা

প্রভৃতি অর্দ্ধশতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত—মৎস্যেন্দ্রনাথ-সংহিতা, মৎস্যেন্দ্রনাথ-পদ্ম-শতক, মহাদেব-মৎস্যেন্দ্রসংবাদ, নাড়ীতত্ত্ব—এই কয়টির নামোল্লেখ করিয়াছেন।^১ সিদ্ধগণ-মধ্যে ঘোড়াচলী, চতুরঙ্গীনাথ, ভর্তৃহরি, চরপটী, গোপীচাঁদ প্রভৃতির রচনাবলী প্রচলিত আছে।

দস্তাত্রেয়ের সহিত গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহার পুঁথি দস্ত-গোরক্ষগোষ্ঠী নামে খ্যাত। কবীরের সহিত তর্কগ্রন্থও গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ-২১) ও শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে (১।৩, ২।৭) দস্তাত্রেয়-বৃত্তান্ত আছে, ইনি মহর্ষি অত্রির পুত্র, অলক ও প্রহ্লাদকে আত্মবিজ্ঞা উপদেশ দেন।^২

Prof. Theodore Aufrecht তাঁহার Catalogus Catalogorum এ গোরক্ষের রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং গোরক্ষকে মীননাথের শিষ্য বলিয়াছেন :—

- ১। গোরক্ষশতক বা জ্ঞানশতক
- ২। চতুরঙ্গীতাসন
- ৩। জ্ঞানামৃত
- ৪। যোগ-চিন্তামণি
- ৫। যোগ-মহিমা
- ৬। যোগ-মার্গশু
- ৭। যোগ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি
- ৮। বিবেক-মার্গশু
- ৯। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি*

জালন্ধরিনাথের কুপায় যোধপুর রাজবংশের মানসিংহ মাড়োয়ারের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাই তিনি গুরুর প্রশংসা করিয়া স্বয়ং নাথ-প্রশংসা, নাথচরিত, ইত্যাদি ষোড়শটি গ্রন্থ রচনা করেন ও তাঁহার সপ্তদশ সভাসদেবরাও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল পুঁথি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের রচনা। গোরক্ষনাথের প্রচলিত গ্রন্থ সকলও মানসিংহ সংগ্রহ করেন। তাহাদের ভাষার সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালের ভাষার সাদৃশ্য আছে।*

১। গোরক্ষ-বিকাশ, সদানাপ বোদী (কৈলাস আশ্রম, জালান্ধর) পরিশিষ্ট গ্রন্থ।

২। জীবনী-কোষ, শশী বিজালঙ্কার, দস্তাত্রেয় গ্রন্থ। রেবু, ১৯৩৩ খঃ প্রকাশিত।

৩। Report on the Search of Hindi—M. S. S., 1902, p. 5,

৪। Report on the Search of Hindi—M. S. S., 1902, pp 44, 4, 26.

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত কবীরের বাণীর জয়পুরের এক সংগ্রহ-গ্রন্থে গোরক্ষনাথের কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় আছে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (দাদু, পৃ ১৭৬)। যথা—পদ্মহতিখি গ্রন্থ, নির্ভর-বোধগ্রন্থ, প্রাণসংগলী, মিথাদর্শন-যোগগ্রন্থ, অনভয়মাত্রবোধ-গ্রন্থ, মচ্ছন্দগোরখবোধ-সংবাদ, আত্মবোধ, যোগগ্রন্থ, রোমাবলীগ্রন্থ জ্ঞানবতীক বা সারিকবোধ ইত্যাদি। যোগেশ্বরী-সঙ্গী নামে গোরক্ষ-রচিত একটি পুথি ও নবনাথ-রচিত পদাবলী ক্ষিতিবাবু জয়পুরের জনৈক অবধূতের নিকট দেখেন। পদাবলীতে গোড়ীয় নাথপদও আছে যথা—

“অদেখ দেখিবা, দেখি বিচারিয়া, আকৃষ্ট রাখিবা” ইত্যাদি,

“পাতাল গঙ্গা স্বর্গে চড়াইবা” ইত্যাদি।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে রচিত মচ্ছন্দনাথজী কা পদ যোধপুরে গ্রন্থাগারে আছে এবং গোরক্ষের নামে প্রচলিত যোধপুর গ্রন্থাগারে এই সকল পুথি আছে—

	শ্লোকসংখ্যা
১। জ্ঞান-সিদ্ধান্ত-যোগ	৭৫ শ্লোক
২। যোগেশ্বরী সাথী	৬১৫ „
৩। গোরক্ষনাথজী কা পদ	৩৫০ „
৪। জ্ঞান-তিলক	৭৫ „
৫। দত্ত-গোরক্ষ-সংবাদ	১০১ „
৬। বিরাট-পুরাণ	২৭০ „
৭। নরবে বোধ	১৬০ „

এতদ্ব্যতীত গোরক্ষের নামে প্রচলিত আরও যে সকল পুথি উক্ত গ্রন্থাগারে আছে তাহাদের নাম—

গোরক্ষনাথজী কা পদ

গোরক্ষনাথ জীকে ফুটকারা গ্রন্থ ১৩৫০ খৃঃ

গোরক্ষ-সংহিতা ১৮১০ খৃঃ

গোরক্ষ-সংহিতা-ভাষা ১৮১০ খৃঃ

যোগেশ্বরী-সাথী ১৩৫০ খৃঃ। ২০

যোধপুর রাজ মানসিংহ গোরক্ষ-রচিত গ্রন্থাদির সংগ্রহ করেন,

গোরক্ষের নামে সপ্তবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আছে, ইহাদের অক্ষর দেবনাগরী।

১। গোরক্ষবোধ	১৫। আত্মবোধ
২। রামবোধ	১৬। প্রাণ-সংকলী
৩। গোরক্ষ-গণেশ-গোষ্ঠী	১৭। জ্ঞান-চৌতীয়া
৪। মহাদেব-গোরক্ষ-সংবাদ	১৮। জ্ঞান-তিলক
৫। গোরক্ষ-দত্ত-গোষ্ঠী	১৯। সংখ্যা-দর্শন
৬। কনুড়বোধ	২০। রহরাস
৭। নষ্টমুদ্রা	২১। নাথজী কা তিথ
৮। পঞ্চমাত্রী-যোগ	২২। বত্রীশ লছণ
৯। অভয়-মাত্রা	২৩। গ্রন্থ রোমাবলী
১০। দয়াবোধ	২৪। ছন্দ গোরক্ষনাথজী কা
১১। নরবেবোধ	২৫। কিসন অসতুতি করি
১২। অংকলিশ্রিলোক	২৬। সিদ্ধইকবীস গোরক্ষনাথজী কা
১৩। কাকরবোধ	২৭। শিষ্ট প্রমাণ গ্রন্থ। ^১
১৪। গোরক্ষনাথজী কা সতরাকলা	

ইহা ব্যতীত ‘গোরক্ষ-গোষ্ঠী’ নামক একটি হিন্দী পুস্তিকা পাইয়াছি। তাহা বাবা লক্ষণদাসজী কর্তৃক বেনারস হইতে প্রচারিত হইয়াছে। যোধপুর, মান্দ্রাজ, কাশী, হরিদ্বার, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে সংস্কৃতে গোরক্ষনাথ-রচিত ‘সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি’ ‘অমরৌঘ-প্রবোধ’ ‘যোগমার্গ’ ‘আত্মবোধ’ ‘গোরক্ষ-উপনিষদ্’, ‘যোগ-বিষয়’ (মৎসেন্দ্র বিরচিত) ও গোপীচাঁদ প্রভৃতি বিভিন্ন সিদ্ধাদের রচিত যে সকল পদ ও পুথি আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা সাধারণে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে। নাথ-সাহিত্যের সমালোচনামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যে এইগুলি লইয়াই এক্ষণে আমি আলোচনা করিতেছি।

এক্ষণে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় রচিত মীননাথ, গোরক্ষনাথ, গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করিব। মৎসেন্দ্র বা মীননাথের নাম চলিত বঙ্গভাষায় ‘মোচন্দরে’ দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বঙ্গভাষার পুথিগুলি অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত।

১। গোরক্ষ-বিজয়—প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল, ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত, আব্দুল করিম সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত।

২। মীন-চেতন—প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১২২৪ সাল, শ্যামাদাস সেন প্রণীত। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ, ১৩২২।

৩। গোপীচন্দ্রের পাঁচালী—ভবানীদাস বিরচিত	কলিকাতা বিশ্ব- বিদ্যালয় কর্তৃক গোপীচন্দ্রের গান নামে প্রকাশিত, ১৯২৪
৪। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস—শুকুর মহম্মদ বিরচিত	

৫। গোপীচন্দ্রের গীত	নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত।
৬। ময়নামতীর গান	

৭। গোবিন্দচন্দ্রগীত—ছল্লভ মল্লিক সংকলিত, শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১৩০৮ সাল।

৮। মাণিকচন্দ্রের গান—রংপুর হইতে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ও সংকলিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত।

৯। নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক 'গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস'-বিষয়ক। পুথিটি কেণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

বঙ্গভাষায় রচিত গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতিতে গোরক্ষের পরিচয় অল্পাধিক পাওয়া যায়। যথা—দেবী মহাদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন :—

“সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার।

একবার মর তুমি একখানি হাড় ॥

* * * * *

তুষ্টি কেনে তর গোসাঞি আশ্রি কেন মরি।

হেন তব্ব কহ দেবজোঙ্গে জোঙ্গে ধরি ॥” (গোরক্ষ-বিজয়, পৃঃ ১২)

অর্থাৎ আমি যতবার জন্মাই ততবার মরি, তুমি অমর, তোমার কোন পরিবর্তন নাই কেন? তুমি কেন পরিত্রাণ পাও, আমি কেন মরি? এই তত্ত্ব যুগে যুগে অপরিবর্তনীয়, তুমি ইহার কারণ বল। দেবীর প্রশ্নে মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরে গিয়া তাঁহাকে পরমতত্ত্ব কথা শুনাইলেন, নিজ্জিতা দেবী তাহা শুনিতে পাইলেন না। ‘মহাজ্ঞান’ লাভ করিলেন মৎস্যরূপী মীননাথ। এই ‘মহাজ্ঞান’ দ্বারাই মরণশীল দেহের পরিবর্তন সাধিত হয় ও অমরত্ব লাভ হয়, সেই শুদ্ধ বা পবিত্র দেহই শিবতত্ত্ব নামে খ্যাত।

শিবভক্ত চারিসিদ্ধা যোগসাধনে রত, দেবী, মহাদেবের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের ছলনা করিলেন। সিদ্ধারা দেবীর ছলনায় মুগ্ধ হইলেন ও “ভ্রমত মাগিলা তবে ভ্রমত পাইলা বর” (পৃ ২১)। একমাত্র গোরক্ষ দেবীকে মাতৃরূপে কামনা করিলেন এবং দেবীর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরাজিতা দেবী গোরক্ষের উদরে মক্ষিকারূপে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন, গোরক্ষ দশমীদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসনে বসিলেন, পরে দেবীর অনুরোধে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন, কিন্তু দেবীর তাহাতে কাকলি ভাঙ্গিল। দেবী প্রতিশোধ লইবার জন্য এক বরপ্রার্থিনী কন্যাকে গোরক্ষনাথকে বর দিয়া বসিলেন। গোরক্ষ বিবাহে বাধ্য হইলেন, কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে কন্যাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেন এবং ছয় মাসের শিশুর রূপ ধারণ করিয়া স্তন্যপান করিতে চাহিলেন। কন্যা ক্রুদ্ধা হইয়া অভিযোগ করিলে, গোরক্ষ নিজ বস্ত্রাস্ত্র বর্ণনা করিতে লাগিলেন “আন্ধি নহি স্ত্রী-পুরুষ”, দেবী তোমাকে বর দিয়া তোমার সহিত কপটতা করিয়াছেন, কারণ আমার শরীর (যোগ-সাধনার দ্বারা) কাষ্ঠবৎ শুদ্ধ হইয়াছে, আমি গন্ধহীন পুষ্পের ন্যায়। তুমি পুত্রবতী হইতে চাহতো আমার এই ‘কর্পটী’ ধৌত করিয়া জলপান কর। (পৃ ৩৭, ৩৮)

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় গোরক্ষ সংযমী পুরুষ ছিলেন এবং যোগসাধনায় তাহার শরীর শুদ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় হইয়াছিল। দেবী বারংবার পরীক্ষা করিয়াও তাহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, কন্যার বরপ্রার্থনা পূর্ণ করাও দেবীর পরীক্ষা।

মীননাথ কিন্তু দেবীর আজ্ঞায় কদলীর দেশে যোলশত কদলী লইয়া দিন যাপন করিতে করিতে হীনবীৰ্য্য হইলেন, কানফা যোগীর নিকট

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গোরক্ষ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন। গোরক্ষ 'কর্ণে কৌড়ি' দিয়া যোগীর বেশ ধারণ করিলেন ও শূণ্ণে ভর করিয়া বায়ুপথে চলিতে লাগিলেন। শূণ্ণে বিচরণ-ক্ষমতা হইতে গোরক্ষের সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে ধোপার পাটে আছড়াইয়া মারিয়া পুনরায় জীবিত করাও তাঁহার অশ্রুতম সিদ্ধিপ্রদর্শন। (পৃ ১৮২)

অবশেষে নটীর বেশে গোরক্ষ মীননাথের সভায় প্রবেশের পথ পাইলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া গুরু মুগ্ধ হইলেন, গোরক্ষ বলিলেন “আমি তোমার পুত্রবধূ, তোমার পাটেশ্বরী হইব কিরূপে?” গোরক্ষ নৃত্য করিতে করিতে নিজের সত্যকার পরিচয় দিলেন। মীননাথ অবিশ্বাস করিলে গোরক্ষ শূণ্ণে ভর করিয়া নৃত্য করিলেন, তৎপরে জলমধ্যে থালা রাখিয়া নৃত্য করিলেন। তথাপি মীননাথ কদলীদের মোহ ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন গোরক্ষ গুরুকে বলিলেন “তুমি গুরু অজ্ঞান হইয়া এ কিরূপ কাজ করিলে? তুমি দ্বারমুক্ত করিয়া রাখিলে এবং সেই পথে চোর প্রবেশ করিল, তুমি গুরু হইয়া

“আপনে ডুবালা গুরু কায়া আপনার।

ডুবিল.তোম্মার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি।

তোম্মার সকল ভরা করিলেক চুরি ॥

আম্মার বচন তুম্মি কিছু নাহি লও।

পড়িছ কদলির ভোলে মনে ভাবি চাও।” ইত্যাদি।

(পৃ ১০৬-১০৮)।

মীননাথ স্বীয় গুরু মহাদেবের দোহাই দিয়া বলিলেন তিনি গঙ্গা গোঁরী ছই নারী লইয়া বাস করেন। গোরক্ষ বলিলেন “তোমার গুরু নিরন্তর ভোগ-সাধনে রত, তথাপি কোন সময়ে তাঁহার বিস্মৃতি ঘটে না। “হরি মনিষ্মি নহে, জ্ঞান অনাদিনিধন, ভাবিআ দেখহ গুরু তুমি কোন জন।”(পৃ ১১২)। শিবের অঙ্গে চারিচন্দ্রের সঙ্কেত ব্যাপিয়া আছে, এই সাধন করিতে পারিলে পরিত্রাণ লাভ হয়। এই শিব একমূর্ত্তি নহেন, তিনি জগৎ জনের জীব, সর্বভোগ তিনি আহাৰ করেন।”(পৃ ১১৩) আদি, নিজ, উদ্ধাত্ত ও গরল এই চারিচন্দ্র-মধ্যে যে তিনচন্দ্র সংবরণ করিয়া গরলচন্দ্র ভক্ষণ করে সেই রক্ষা পায়। তুমি গুরু কোন কৰ্ম্ম করিলে,

জ্ঞান ভুলিয়া শক্তিহীন হইলে। তুমি আপনার ধন দিয়া ঘর শূন্য করিলে “প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে?” (তুলনীয়-প্রদীপ নিবিলে কি করিবে তৈলে-গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, পৃ ৩:৬, গোপীচন্দ্রের গান, ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)। তুমি গুরু উলটিয়া যোগ ধর (ইহা উল্টা সাধনের ইঙ্গিত), কায়া স্থির কর, নিজ মস্ত্র স্মরণ কর, গোরক্ষের বাক্যে নিজ পিও রক্ষা কর (পৃ ১১৫), কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহকে ‘খেমাই’এর চাকরি করিতে দাও, অর্থাৎ অধীন কর, সকল ছাড়িয়া ‘খেমাই’কে রাজা কর (পৃ ১৫২)। ‘খেমাই’ অর্থে সংযম, সংযমই দেহের রাজা, গরলচন্দ্র অর্থে শুক্র (তুলনীয়-“কদাচিৎ নিজচন্দ্র না করিবা ব্যয়, বার বৎসরের আয়ু একদিনে ক্ষয়” [পৃ ১৮৮])।

✓ এই চারিচন্দ্র-সাধনের কথা বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে। শোণিত, শুক্র, মল ও মূত্র, এই চারিটি দেহনির্গত পদার্থকে জীব পিতা ও মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, অতএব উহাদিগকে ত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহাই ‘চারিচন্দ্র-ভেদ’ বা ‘গায়ত্রী-ক্রিয়া’ নামে প্রচলিত। ইহা অতীব গুরু ব্যাপার। মল, মূত্র ও শুক্র এই তিনের সমবেত নাম ‘ত্রিবেণী’ বা ‘ত্রিকুটি’ বীজমার্গী সম্প্রদায় শুক্রকেই ‘পরব্রহ্ম’ বলিয়া বিশ্বাস করে, কারণ শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাদের ভজনালায়ে গোরক্ষ প্রভৃতি বিরচিত ভজন গীত হয়।^১ গোরক্ষ-বিজয়ের উল্লিখিত স্থানে (পৃ ১১৩) এই চারিচন্দ্র-ভেদের কথাই উক্ত হইয়াছে মনে হয়।

অন্যত্র গোরক্ষ বলিতেছেন ‘উল্টা সাধন’ দ্বারা অর্থাৎ শুক্রের প্রবাহ উর্দ্ধমুখে নীত করিয়া দেহমধ্যে মহারসের সঞ্চার কর। “যদি সে সাধিবা কায়া উলটি ধর জোগ উলটিয়া ধর গুরু স্মরণের কলা। দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল উজাউক মহারস ভরোক খালজোর (পৃ ১৪৫)।” ‘উল্টা-যোগ’ অর্থে সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উর্দ্ধে নীত করা, তাহার ফলে মহারস অর্থাৎ শুক্র ক্ষয় না হইয়া দেহস্থ শক্তি বৃদ্ধি করিবে, আয়ু বর্দ্ধিত হইবে। ইহাই পূর্বোক্ত হিন্দী সাহিত্যে বর্ণিত “জীবতে হি উলটি মরণা” অর্থাৎ উল্টা সাধন দ্বারা জীবন্ত হও। যোগধর্মের প্রধান লক্ষ্য আয়ু-রক্ষা, বীৰ্য্য-রক্ষার দ্বারাই আয়ু বর্দ্ধিত করা সম্ভব। ইহাতেই

জীবিত থাকিয়াও মৃতের স্থায় ব্যবহার বা সংযত জীবন, ইহাই নূতন জীবন। তাই গোরক্ষ বলিতেছেন : “হে গুরু, সংযম না করিয়া তুমি কামরসে তমু ভাসাইলে (পৃ ১২৩, ১২৪) এখনও ভাবিয়া দেখ—

“কায়া সাধ, কায়া সাধ, মাদলে হেন বোলে” (পৃ ৯৪)।

তুলনীয়—পৃ: ৯৫, ৯৯, ১৩০, ১৫০।

গোরক্ষ বারংবার গুরুকে কায়া সাধন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, কারণ ইহার দ্বারা অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ হয়। এই কায়া-সাধনে ‘সংখিনী’ নাড়ী সহায়।

সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল

পরিচয় করি হাসা বন্দি কর কাল ॥ (পৃ ১৪৪)।

এই ‘সংখিনী’ বা নাগিনীর সাহায্যে কালজয়ের বিবরণ অতঃপর দেওয়া হইতেছে।

গুরু মীননাথ বলিতেছেন, “উলটি সাধিতে যোগ গাত্র-বল নাই, কেমতে সাধিব যোগ বিপতে (বিপথে) মরিমু” (পৃ ১১৬)। তথাপি গোরক্ষের অদম্য উৎসাহ, গুরুকে তিনি বলিতেছেন—

“মট্চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান ॥

মেরু মূলে রহিবে চন্দ্র না টুটিনে কলা।

বেঙ্কা নালে সাধ গুরু না করিয় হেলা ॥

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বুঝিবা বাউ সন্ধি।

রবি শশি চলিয়াছে তারে কর বন্দি ॥

* * *

উলটিয়া হোক পুষ্প পুনি কর ধায়ান।

বুঝ বুঝ যাএ গুরু তব ব্রাহ্ম জ্ঞান।

চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া জাউক ধুয়া।

আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া।

ত্রিপিণী করিয়া স্থির কর্ণে দেঅ তালী ॥”

(পৃ ১৪৭, ১৪৮)।

ইহা মট্চক্র-ভেদের সঙ্কেত, বেঙ্কানাথ-পথে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উর্দ্ধে নীত করিবার ও স্বাসপ্রশ্বাস (রবিশশি) বশ করিয়া, অধোমুখী পুষ্প অর্থাৎ সহস্রার-মধ্যে ধ্যান-নিমগ্ন হইবার ইঙ্গিত। সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইলে অনল জ্বলিয়া উঠিবার স্থায় অনুভূতি হয়, এইরূপে

অক্ষয় বীর্ষাভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়া কায়াসাধন কর্তব্য। ইহার সহিত তুলনীয় চর্যাপদ ৪নং তিঅড্ডা চাপী জোইনী দে অঙ্কবালী ইত্যাদি, অর্থাৎ ললনা, রসনা ও অবধূতিকা (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার নামাস্তর) নাড়ীত্রয়কে চাপিয়া নিরাভাস কর, এইরূপে ‘মহামূদ্রা’ সাক্ষাৎকার হইবে। নাথযোগীদের মধ্যে ‘মহামূদ্রা’ সাক্ষাৎকার হওয়া অর্থে ‘মহাজ্ঞানে’র বা যোগযুক্তজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হওয়া। এই জ্ঞান-লাভের জন্য ‘উন্টা সাধন’ নামক একটি অতীব কঠিন সাধন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই সাধনে নাড়ীত্রয়কে স্ববশে আনিয়া ‘মহারস’ বা বীর্ষাকে উর্দ্ধমুখে নীত করিয়া রক্ষা করিতে হয়। এই সাধনের উপর নাথযোগীরা বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন, ইহাই তাহাদের জীবন্মৃত অবস্থা বা সাধন-দ্বারা নতুন জীবন লাভ, এই জীবন্মুক্তির জন্য নাথযোগিগণের যোগমধ্যে ‘কালজয়’ ও ‘কায়াসাধনে’র বৈশিষ্ট্য ছিল (সাধনা-অংশে দ্রষ্টব্য)। যোগীদের উন্টা সাধনের নিমিত্ত ‘বন্ধনালে’র অবস্থিতি জানা কর্তব্য। ‘ব্রহ্ম-সংকলী’ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্যেও ‘বন্ধনালে’র কথা পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মধ্যে সুফী, বাউল প্রভৃতি উত্তর ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে, নাথযোগীদের মধ্যে এবং উড়িষ্যা-প্রদেশেও এই উন্টা সাধন প্রচলিত ছিল। লিঙ্গজয়ের প্রধান সহায় এই সাধন। অতএব সাধকদের মধ্যে গুপ্তভাবে ‘বন্ধনালে’র সাহায্যে সাধনতত্ত্ব প্রচারিত হইত। ‘কায়াসাধন’ বা শারীরিক পরিবর্তন-দ্বারা দীর্ঘজীবী হওয়ার উপর নাথযোগীর প্রাধান্য দিতেন, তাহাও বন্ধনালের অবস্থিতি না জানিলে সম্ভবপর নহে।

গোরক্ষ গুরুকে উপরোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন :

“মেরুমূলে রহিবে চন্দ্র না টুটিবে কলা।

বেন্ধনালে সাধ গুরু না করিও হেলা ॥”

ইহার দ্বারাও বন্ধনালের অবস্থিতি ও তাহার দ্বারা সাধনের বিষয় গুরুকে সচেতন করিয়া দিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সাধন-ফলে ‘মেরুমূলে রহিবে চন্দ্র’ অর্থাৎ বীর্ষ বা চক্র রক্ষা হইবে এবং ‘না টুটিবে কলা’ অর্থে দেহ ভগ্ন হইবে না, এইরূপ ইঙ্গিত বুঝা যায়। চন্দ্রের ষোড়শ কলার মধ্যে অমৃত অন্ততম, তাহা রক্ষা করিলেই দেহ-রক্ষা সম্ভবপর হয়। গোরক্ষ-বিজয়, ময়নামতীর গান, রূপকথা প্রভৃতিতে সর্বত্র “প্রদীপ নিবিলে তেল দিয়া কি হইবে? জল চলিয়া গেলে আইল বাধিয়া ফল কি?” প্রভৃতি

উপদেশ পাওয়া যায়। সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাতেও ‘নির্ঝাণদীপে কিমু তৈলদানম্’ প্রভৃতি আছে। নাথযোগীরা চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা ইড়া-পিঙ্গলার ইঙ্গিত করিতেন, ইহার একটির দ্বারা ক্ষয় (সূর্য্য দ্বারা) ও অণুটির দ্বারা রক্ষা হয়। এই ‘চন্দ্র’ই ‘মহারস’ নামে পরিচিত, ইহাই সোম বা অমৃত রস। মানব-দেহ মস্তক-মধ্যে সহস্রার চক্র হইতে তালুমূল পর্যন্ত একটি ক্ষীণ নাড়ী আছে, তাহার নাম ‘শঙ্খিনী’, এই নাড়ীর পথ বক্র বলিয়া ইহা ‘বন্ধনাল’ নামেও পরিচিত। এই শঙ্খিনী নাড়ীকে দুইটি মুখযুক্ত সর্পরূপে গোরক্ষবিজয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে—“ফিরাও খেলাও গুরু দুই মুখ সাপে”। (পৃ ১৪১) ইহার একটি মুখ ‘দশমীদ্বার’ নামে পরিচিত (সাধনা-অংশে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই পথে সহস্রার হইতে মহারস দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়, অজ্ঞান মানবের দেহস্থ অণুাণু নবদ্বার-পথে উহা বিনষ্ট হয়, একমাত্র যোগীরা এই ‘নবদ্বার’ রুদ্ধ করিতে জানেন। শঙ্খিনী নাড়ীর অণু মুখ দ্বারা বীৰ্য্য উর্দ্ধমুখে নীত হয় এবং দেহরক্ষা হয়, ইহাই উল্টা সাধন বা বিপরীত সাধন। অমৃত বা চন্দ্র যাহাতে সূর্য্যের অগ্নিতে পড়িয়া নষ্ট না হয় এবং মৃত্যু না ঘটে, সে বিষয়ে যোগীরা সর্ব্বদা সচেতন। এই নিমিত্ত দশমীদ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগীরা মহারস রক্ষা করেন। গোপীচন্দ্রের গানে মাতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ ইহার পরেই করা হইয়াছে, তাহাতে “তুমা লাগিলে জল কোথা হইতে আসে, সে জল কে খায়” ইত্যাদি প্রশ্ন আছে। উত্তরে মাতা বলিতেছেন :

“তুমা লাগিলে জল আইসে শূন্য হইতে।

তুমা লাগিলে জল তোর খায় ছতাশনে ॥”

ইহার অর্থ অমৃত সহস্রার-রূপ শূন্য হইতে ক্ষরিত হয়, তোমার দেহমধ্যস্থ কালাগ্নি তাহা শোষণ করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করে। চর্যাপদ নং ৩, অমরৌঘশাসন প্রভৃতি গ্রন্থেও ‘দশমীদ্বার’ কথা আছে। ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা নিবন্ধের চক্রাদি অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ‘খেচরী’মুদ্রা-সাধন-দ্বারা যোগীরা কিরূপে ‘মহারস’ রক্ষা করিয়া অমর বা দীর্ঘজীবী হইতেন, উল্টা সাধনের পদ্ধতি কি, ইত্যাদি সাধনা-অংশের ‘কায়সিদ্ধি’র মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখ করা হইল না।

বৌদ্ধ সহজিয়া দোহায় মন্ত হস্তী, নৌকা প্রভৃতির উপমা পাওয়া যায়। গঙ্গা, যমুনার মধ্য দিয়া নৌকা বাহিত করিয়া চক্রে উদ্দেশ্যে গমন ইত্যাদি বর্ণনা চর্যাপদে আছে। (চর্যাপদ ১৩, ১৪, ৯, ১০ (ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

গোরক্ষবিজয়ে “ডুবিল তোমার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি” এবং নৌকা যথাযথভাবে বাহিত করিতে না পারিলে দৃঢ় দাঁড়ও খসিয়া যায় ইত্যাদি বর্ণনা আছে। গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন : “তুমি স্বেচ্ছায় অঘাটে নৌকা আনিয়া ডুবাইয়াছ। গঙ্গা-যমুনা শুষ্ক হইয়াছে, অর্থাৎ তুমি যোগ-সাধন ভুলিয়াছ। মন্ত্ৰ হস্তী (পৃ ১৪১) ও সর্পের উল্লেখ (১৪১ পৃ) গোরক্ষবিজয়েও পাওয়া যায়। ইহাতে ‘ব্রহ্মনালা’র যে উল্লেখ আছে ‘ব্রহ্মনালা উজ্জানে সুধিব সুনিশ্চিত’ (পৃ ১৪২), তাহার সহিত চর্যাপদের ‘অবধূতি মার্গ’ তুলনীয়, ইহাই ‘সুসুম্না’পথ, ইহা যোগিগণের সর্বদা চিস্তনীয় (ছই হোই যাই সো ব্রাহ্ম নাড়িয়া, চর্যা ১০)। কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে প্রেরণফলে অমরত্ব-লাভ হয়। সহস্রদল কমলই বৌদ্ধ সহজিয়াদের মহাস্থের আবাসস্থল, ইহাই শৈবগণের ‘শিবস্থান’, ও বৈষ্ণবের ‘হরিস্থান’। গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন : “তুমি ডাকাতেই হাতে ধন সমর্পণ করিয়াছ” (পৃ ১২১) ইত্যাদি—“অতএব আমার সহিত পুনরায় যোগ-পরিচয় কর।” (পৃ ১৩৭)।

ইঙ্গিতে গোরক্ষ মীননাথকে বলিতে লাগিলেন :

মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল ।
অমর পাটনে জেন যেত করে হাল ॥
উচ্চ নীচ জমিখানি তাতে কৃষি হয় ।
জদি হয়ে গৃহবাসী সে জমি চসয় ॥

(গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩৭, ১৩৮)।

তত্ত্বমতে মন্ত্ৰমাংস পানাহারের বিধি আছে, ইহাতে খেচরী মূদ্গা-সাধন ও তাহার ফলে অমৃত-পানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছে (গৃহবাসী জন) সে ইহার সাধন করিয়া থাকে। ইহার পর চন্দ্রসূর্য্য বশীভূত করিয়া যোগ-সাধন ও বিন্দু-রক্ষার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তৎপরে কায়া-পরিচয়, অঙ্গপা-জপ, শরীর-বিয়েগে প্রাণ কোথায় যায় ? শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোথায় যায় ? ইত্যাদি হিন্দী গোরক্ষ-বোধের অনুরূপ প্রশ্নোত্তর আছে (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৮৯, ১৯১ ইত্যাদি)। গোরক্ষ বলিয়াছেন :

“গুরুজী এসা কাম ন কীজৈ জাতে অমী মহারস ছীজৈ ।

নদী টিগ বিরখা নারী সঙ্গ পুরখা অলপু জীবণু কী আসা ॥”

ইত্যাদি বাক্যে গুরুকে মহারস রক্ষা করিবার ও উষ্টা সাধন করিবার

অমুরোধ পাওয়া যায়। “জীবতে হি উলটি মরণা” (গোরক্ষ-পদ্ম) দ্বারাও উল্টা সাধনে জীবন্তে মৃত হইবার উপদেশ পাওয়া যায়। অন্ততঃ গোরক্ষ বলিতেছেন :

দিবস কৌ বাঘনি সুরিনরি মোহৈ, রাতি সাইর সোথৈ।

মুরখ লোকা অঙ্কলা পশুআ নিতি প্রতি বাঘিনী পোথৈ।

(সমুদ্র শোষে)।

ইহার সহিত তুলনীয়—

“অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নহি বুঝে।

ঘরে ঘরে পালন্তে বাঘিনী।” ইত্যাদি (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৮৭)।

তাই সাধন-তত্ত্বে বারংবার প্রদীপ নিভিতে না দিবার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ বিন্দু ক্ষয় হইলে দেহ-রক্ষা অসম্ভব।

গোরক্ষ এইরূপে গুরুকে ‘শূন্য’ জ্ঞান দিয়া পাগল করিয়া তুলিলেন এবং কদলীদের বাতুর হইয়া থাকিবার অভিশাপ দিলেন। ইহাতে ক্রমশঃ মীননাথের চেতনা হইল। তিনি তাঁহার পুত্র বিন্দুনাথ ও গোরক্ষনাথের সহিত বায়ুপথে অন্তর্হিত হইলেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে “রাধাকান্থ বঞ্চিল এহি থিতিতলে” দ্বারা বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় (পৃ ১৬৮)। বৈষ্ণব ‘সখী’ বা ‘মঞ্জরী’ সহ প্রেমসাধনা করেন, বৌদ্ধ সহজিয়া ‘উত্তর-সাধিকা’ লইয়া ভজন-সাধনা করেন, তান্ত্রিক ‘শক্তি’ লইয়া সাধনা করেন, নাথমার্গে ‘মুদ্রা’-সাধন থাকিলেও শক্তি লইয়া সাধনার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, অতএব ‘বৈষ্ণব’ অর্থে ‘সাধু’ হইতে পারে (পৃ ৪৩)। দেখা যায় এই গ্রন্থের বহুস্থানে ‘বৈষ্ণব মিনাই’ বলা হইয়াছে। গোরক্ষ জ্ঞীকে মাতৃ-সম্বোধন করাতে বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবের ও নাথদের সাধন-পদ্ধতি ভিন্ন ছিল।

গোরক্ষের স্থায় বায়ুপথে গমন, দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত্র প্রভৃতি সিদ্ধি বৌদ্ধদের মধ্যেও আছে। বুদ্ধের ‘দশবল’-কথা চর্যাপদেও আছে।

এই নিবন্ধে সৃষ্টি-পত্তনের প্রসঙ্গে ‘শূন্যপুরাণে’র উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লুকের উপদেশে প্রভু সৃষ্টি করিলেন, প্রভুর কনক পৈতা ছিঁড়িয়া জলে ফেলা হইল, তাহা হইতে সহস্র মন্তকযুক্ত ‘বাসুকি নাগে’র

জন্ম হইল। তাহার আহারের নিমিত্ত কানের কুণ্ডল ফেলিয়া ভেকের সৃষ্টি করা হইল, তাহাতে বাসুকি তুষ্ট হইলেন। তৎপরে বাসুকির মস্তকে প্রভুর গলার মলদ্বারা নবদ্বীপা পৃথিবী সৃষ্টি হইল। প্রভুর ঘর্শ্বে আত্মা দেবীর ও আত্মা হইতে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের জন্ম হইল। এখানে 'বাসুকি' অর্থে 'কুণ্ডলিনী শক্তি'। তাহার জাগরণ 'শব্দব্রহ্ম' দ্বারা হয়, ইহা বুঝাইতে 'কানের কুণ্ডল' জলে নিক্ষেপ করা হইল। তাহাতে বাসুকির তুষ্ট হইল বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দ দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেন। কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করা হয়, অর্থাৎ কর্ণ হইতে শব্দজ্ঞান হয়, বাসুকি নাগের জন্ম ও কর্ণের কুণ্ডল দ্বারা শব্দব্রহ্ম-দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ-দ্বারা যোগসাধনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

✓ শৃঙ্গপুরাণের "সোনার সে নৌকা রূপার কেরআল" এবং লোহ মোহ কাম ক্রোধ" ইত্যাদির সহিত (পৃ ১০৩, ৫১, ২২৬) বৌদ্ধগান ও দোহার পাঞ্চকেডুআল (১৪১৩) ও নৌকার উপমা এবং রাগ দেশ মোহ লইয়া ছার। পরম মোহ লবএ মুক্তি হার" (চর্যা ১১) তুলনীয়।

✓ শৃঙ্গপুরাণে আছে গোসাঞি কৃষিকর্মে মন দিলেন, প্রথমে মন ও পবন হেলায় সৃজন করিলেন (পৃ ১৮৩, বসুমতী সংস্করণ)। এস্থলে মন অর্থে চেতনা, পবন অর্থে প্রাণবায়ু। যোগমতে তনুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশে। শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর সামঞ্জস্যে 'প্রাণ' সম্ভব, প্রাণের লক্ষণ 'মনন', জীবহৃদয়ে মনের বাস, পবন মনের জীবন-স্বরূপ, অতএব জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল হইল 'পবন', যোগের এই ইঙ্গিত বঙ্গভাষায় রচিত শৃঙ্গপুরাণে করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে (পৃ ১৮৮) মৃতকে জীবনদানরূপ সিদ্ধি-বর্ণনা ও নাথপন্থের পবিত্র পীঠস্থান 'হিংলাজ' ও হিন্দুলা দেবীর উল্লেখও আছে (পৃ ১৮৯)। শৃঙ্গপুরাণাদিতে সৃষ্টিকথা ও নাথসম্প্রদায়ে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনা সিদ্ধান্ত অংশের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে যোগসাধনায় 'নামজপে'র মাহাত্ম্য-বর্ণনা আছে—'নিজ নামের বলে, পাথর ভাসিল জলে' (পৃ ৪১৩)। ইহাতে 'অজপা' নামের ধ্বনির কথাও আছে (পৃ ৪৫১, ৪৯৮ ইত্যাদি)। এই 'নিজনাম-সাধন'ই যোগধর্মের 'অজপাজাপ' নামে খ্যাত, ইহার দ্বারা মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি-লাভ হয় (পৃ ৪৯৯)।^১ হিন্দীতেও বচন আছে:

“ভয়ো মোঁ নিজ নামকা বন্দা ।” গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে বিন্দু, মন, পবন, শরীরতত্ত্ব, চন্দ্রসূর্য্য, চৌদ্দভূবন, ভেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা আছে (পৃ ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৪৯৯) । হাড়িপা নীচকর্ষ করিলেও সর্বদা নাম-জপে মগ্ন থাকিতেন ।

এই অজপাজপ অর্থে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা সাধ্য ‘হংস’ বা ‘সোহং’ মন্ত্র । নাথজ্ঞানার্গে মহাজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান আছে, নিজ সাধনার সহিত গুরুপদে জ্ঞানযুক্ত হইলে জীবের ‘মহাজ্ঞান’ হয় অর্থাৎ ‘যোগযুক্ত জ্ঞান’ লাভ করিয়া সাধক অমর হন । এই মহাজ্ঞানের স্বরূপ-ব্যাখ্যা নিবন্ধের সাধন অংশে করা হইয়াছে । বঙ্গীয় গীতিকাব্যে ময়নামতীর গুরুকৃপায় ‘মহাজ্ঞান’-লাভের কথা আছে । স্বামীকে ময়নামতীর এই আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান দিয়া অমর করিতে চাহিলে, স্বামী তাঁহার শিষ্যদ্ব-গ্রহণে অস্বীকৃত হন । তথাপি যোগবলে তিনি স্বামীকে একশত বৎসর বাঁচাইয়া রাখেন (পৃ ৪৫০, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস) এবং গুরুর কথায় পুত্রের মাত্র ঊনবিংশতি বৎসর আয়ু জানিয়া তাঁহাকে হাড়িপার শিষ্যদ্ব গ্রহণ করিতে বলেন । হাড়িপা শঙ্করের নাম-জপে সদা মগ্ন এবং মহাজ্ঞানের অধিকারী, তথাপি তিনি নীচ কর্ষ (হাড়ি বা মেথরের কাজ) করেন, রাজপুত্র হইয়া গোপীচন্দ্র তাহার শিষ্যদ্ব-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন । পুত্র বলিলেন : হাড়িপার যদি মহাজ্ঞান থাকিবে তবে সে নীচ কর্ষ করে কেন ? মাতা উত্তর দিলেন : “মহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে খাটে” (পৃ ৩৬৯, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী) । তবু পুত্র বুঝিয়াও বোঝেন না, অবশেষে গোপীচন্দ্র হাড়িপাকে ত্রিবেণীর ঘাট কি ? নিরঞ্জনের বাস কোথায় ? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । স্বীয় মাতাকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া অগ্নিপরীক্ষা, জল-পরীক্ষা, কেশের সাঁকোতে পার হওয়া প্রভৃতি দুর্লভ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । রাণী ময়নামতী গুরুর নাম স্মরণ করিয়া সকল-পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইলেন । ইহাতেও পুত্র সন্তুষ্ট না হইয়া মাতাকে বলিলেন : তুমি যদি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পার তবে “কাল প্রাতে সন্ন্যাস হব বন্ধের বিনোদিয়া” (পৃ ৮০, বৃন্দাবন) ।

পুত্র একে একে নিয়রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন :

“চারি চকরি পুকুরখানি মা মধ্যে ঝলমল ।

কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল ॥

কেবা আন্ধি কেবা বাড়ি মা কেবা বসিয়া খাই ।
 কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা নিজা যাই ॥
 আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি
 সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোন থানি ।
 কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বানারসি
 কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসি ॥
 কোনঠে রইল বড়সি মা কোনঠে রইল সূতা ।
 কোনঠে রইল বড়সির দ্বিপ কোনখানি ফুলতা ॥
 তুসা নাগলে মা তুসা আইসে কথা হানে ।
 তুমার জল ফুটিক মা যায় কোন জনে ॥
 বাও নাই বাতাস নাই মা পাতা ক্যান নড়ে ।
 ছুই বিরিখের এক ফল কোন বিরিখে ধরে ॥”

(পৃ ৭৭, বুঝানখণ্ড)

পুত্রের ইত্যাকার প্রশ্নে মাতা হরষিত হইলেন, পুত্রের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন । তাই উত্তরে বলিলেন : “বাছা, তুমি উত্তম প্রশঙ্গ করিয়াছ, রাজা হইলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না,” এই বলিয়া তিনি একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন, যথা—

ওরে যাদুধন, তুমি মনবৃক্ষের বোটা ও তলুবৃক্ষের ফল, ছুই বৃক্ষের একটীমাত্র ফলকে জননী যত্নে ধারণ করেন, অর্থাৎ পিতার রেত ও মাতার রক্তে সম্ভানের উৎপত্তি ও মাতৃগর্ভে স্থিতি হয় । চারি চকরি পুকুরখানির মধ্যে প্রকৃতিদেবী ব্যক্ত হইয়া (ঝলমল করিয়া) বিরাজ করিতেছেন, (বৌদ্ধমতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিভূতের দ্বারা বেষ্টিত চতুষ্কোণ পৃথিবী কল্পিত হইত) তন্মধ্যে মাতা সময়ে পুত্রকে ধারণ করেন, সম্ভানের নিমিস্ত ও উপাদান-কারণ তাহার পিতা ও মাতা । সেই গাছের নাম মনুহর অর্থাৎ মন, আর ফলের নাম রসিয়া অর্থাৎ জীবদেহ । আর “কাটিলে বাঁচে গাছ না কাটিলে মরে” অর্থাৎ পুত্রের নাড়ীচ্ছেদ করিলে তবেই সে বাঁচে, নহিলে মরে । এইরূপে “ছুই বিরিখের একটি ফল” জননী ধারণ করেন । তোমার হৃদয়-মধ্যেই গয়া, গঙ্গা ও বারাণসী অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ দেহমধ্যেই ইড়া, পিঙ্গলা ও তাহাদের মধ্যবর্তী শুম্বুয়া (বারাণসী) অবস্থিত রহিয়াছে, আর তোমার মুখই তোমার

জপতপ বা ইষ্টমন্ত্র-সাধনের সহায়, তোমার মস্তকে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে তোমার তুলসী অর্থাৎ উপাশ্র-দেবতার বাসস্থান।

পুত্র প্রশ্ন করিয়াছেন : “কেবা অন্ধি কেবা বাড়ি ইত্যাদি, অর্থাৎ কৰ্ত্তা ও ভোক্তা কে ? শয়ন ও নিদ্রা কাহাকে বলে ? জগতে সমস্তই চঞ্চল, স্থির কোন্টী ? গয়াগঙ্গাদির অবস্থান কি ? নামজপাদির কারণ কি ? পরদেবতা (তুলসী) কোন্ স্থানে থাকেন ? বড়শি (শুষুমা) কোথায়, সূতা অর্থাৎ বায়ু কি ? বড়শির ছিপ (মেরুদণ্ড) কোথায় এবং ফুলতা বা চোখই বা কোথায় আছে ? ক্ষুংপিপাসাদি শারীরিক চেষ্টা কিরূপে হয়, তাহা নিবারিত হয়ই বা কিরূপে ? বিনা বাতাসে কোন্টী নড়ে, বাতাস নাই তবু চোখের পাতা কেন নড়ে ? আকাশ, জমিন, সপ্ত হাজার অনল সবই নড়ে, তবে নিনড় কোন্টী ?”

উত্তরে মাতা বলিলেন : “তুমি মনে আনন্দ, তনে বাড়, আত্মময় বসি থাক”। মানব জীবিত হইয়া শয়ন করে, এবং মৃতরূপে মানবের মহানিদ্রা-প্রাপ্তি হয়। জগতে সবই চঞ্চল, কিন্তু ‘নিনড় কপালখানি’, গয়াগঙ্গাদি তোমার শরীরে, মস্তকে যে তুলসী (দেবতা) তাঁহাকে জপাদির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার শুষুমাও দেহমধ্যে, আর বায়ুই তাহার সূতা “মিরডারা তোর বড়শির ছিপ, পবন হইল ডোর সূতা, মূলকণ্ঠ তোর বড়শির পোট, ছই রাঙ্কি ফুলতা”—যেদিন এই ফুলতা জলে ডুবিলে সেইদিন তোমার মা অনাথ হইবে। যোগসাধনের প্রধান সহায় শুষুমা নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, পবন-সাহায্যে শুক্র বা মহারসকে এই পথে উর্দ্ধে নীত করিতে হয়। বড়শির পোট অর্থাৎ গ্রন্থিস্বরূপ তোমার মূলকণ্ঠ, এবং তোমার ছই চক্ষু (রাঙ্কা) তোমার ফুলতা (ফাতনা) স্বরূপ, উহা ডুবিলেই তোমার মৃত্যু ঘটিবে ও তোমার মা অনাথ হইবেন। ক্ষুংপিপাসাদি শারীরিক চেষ্টা আপনি ঘটে ও আপনি নিবারিত হয়। বিনা বাতাসে চোখের পাতা নড়ে, আকাশ, পৃথিবী ও সপ্ত **হাজার** তেজ-পদার্থ সবই নড়ে, কিন্তু বাছা তোমার অদৃষ্টখানি নিনড়, তাই কথা শোন, হাড়ির শিথিল গ্রহণ করিয়া কালজয়ী হও, অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় কর।

যোগসাধনে মহারস বা শুক্র সহস্র কোটা রত্নসদৃশ মূল্যবান (গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃ ৪৩৮)। স্বর্গেদে মানুষের আয়ুর পরিমাণ শত বৎসর, কিন্তু যোগসাধনে অমর হওয়া যায়। এই সাধনের সহায় তিনটি প্রধান নাড়ী, যথা—

মেরুদণ্ড পাশে

উজ্জল প্রকাশে

রবি শশী হুই জনা ।

ইড়া বামস্থানে

পিঙ্গলা দক্ষিণে

মধ্যে নাড়ী সুষুমনা ॥

বামে ভাগীরথী

মধ্যে সরস্বতী

দক্ষিণে যমুনা বয় ।

মূলাধারে গিয়ে

একত্র হইয়ে

ত্রিবেণী তাহারে কয় ॥

(সাধকরঞ্জন)

এই মূলাধারকে লক্ষ্য করিয়া “বড়সির পোট” বা গ্রন্থি বলা হইয়াছে । রাজা অবশেষে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, যোগবলে স্বর্গমর্ত্য-পাতাল-দর্শন, শব্দচক্রভেদ, চৌদ্দভুবন-ভেদের তত্ত্ব, দেহমধ্যে নিরঞ্জন বা ধর্মের বাস প্রভৃতি তত্ত্বকথা জানিলেন । চন্দ্রসূর্য বা ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ করিয়া সুষুমা-পথে সাধন করিয়া যোগসিদ্ধ হইলেন । এইরূপে ভোগী রাজা যোগী সাজিলেন ।

আমার স্বল্পজ্ঞান-দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যে নিহিত ‘নাথ-যোগতত্ত্ব’র ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, যোগবৃত্তান্ত অপ্রকাশ্য বলিয়া সাক্ষেতিক ভাষার ব্যবহারে অর্থনির্ণয়-ব্যাপারও এক কঠিন সমস্যা হইয়া উঠে । তথাপি নাথযোগীদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-জাগরণ, ষট্চক্রভেদ, ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ ইত্যাদি ও ব্রহ্মচর্যা-সাধন যে প্রচলিত ছিল তাহার নিদর্শন ও অকাটা প্রমাণ এই বঙ্গগীতিকা-সমূহে যে ছুপ্রাপ্য নহে তাহা দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নাথপন্থের সহিত তন্ত্র, কোলমার্গ, রহস্যবাদী বৌদ্ধ
ও শৈব-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ-বিচার

পূর্বে তৃতীয় পরিচ্ছেদে নাথপন্থের মূল কোথায় সে সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন তুলিয়াছি, মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক পন্থাদির সহিত নাথপন্থের কি সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। আমরা নিম্নলিখিত অধ্যায়ে একে একে সেই সম্বন্ধে বিচার করিতেছি :—

(ক) নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ

নাথপন্থীদের শৈবতান্ত্রিক বলা হয়, বৌদ্ধধর্মোৎ তন্ত্র প্রবেশলাভ করিয়াছিল, অতএব সহজিয়াদের বৌদ্ধতান্ত্রিক বলা হয়, কিন্তু বৈষ্ণব-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। নাথপন্থের উপরেও তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার্য্য।

তন্ত্র ও তাহার উপাসনাপদ্ধতি কেবল বাংলার নহে, ইহার গূঢ় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রহস্য সমগ্র ভারতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিমানের শ্রদ্ধাকর্ষণ করে। তন্ত্রের বিকৃত আচারই ইহার মূল ও মুখ্য আদর্শ নহে।^১

ভারতের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়—কাশ্মীরে অভিনব গুপ্ত, দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর রায়, লক্ষণ দেশিক, রাঘব ভট্ট প্রভৃতির নাম সুপ্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের ‘প্রপঞ্চসার’ ও লক্ষণ দেশিকের ‘সারদাতিলকে’র নির্দেশ অনুসারে তান্ত্রিককৃত্য সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশে কৃষ্ণানন্দের ‘তন্ত্রসার’ প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যায় পূর্ণানন্দের ‘তত্ত্বানন্দতরঙ্গিনী’, কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ‘শ্রামাসপর্ধ্যাবিধি’ সুবিদিত। পূর্ণানন্দের ‘পুরশ্চর্য্যাবলি’ নামক বৃহৎ গ্রন্থ অद्याপি বর্তমান। গয়া, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, নেপাল, বোম্বাই প্রভৃতি বাংলার বাহিরে বহুস্থানে শাক্ত-মন্দির আছে।^২

বঙ্গদেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা এক সময়ে যে বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি

১। প্রবাসী, প্রাবণ, ১৩৪১, শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ।

২। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ এ এ এ

করেন তাহার মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি লুপ্ত হইলেও, তিব্বতী ভাষায় তাহাদের অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর চীন পরিব্রাজকেরা ভারতে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে পাল-নৃপতিদের রাজত্বকালে বহু বজ্রাচার্য্যের প্রাভু্য হইয়া যায়, তাহারা সিদ্ধিবলে নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সময়ে রচিত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থও তৎকালীন প্রভাবের সাক্ষী দেয়।

বৌদ্ধধর্মে ক্রমশঃ ক্রীড়ার প্রবেশলাভ ঘটে, তাহার বিবরণ ওয়াডেল সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, পাতঞ্জল যুঃ পুঃ ১২০ অঙ্কে যোগধর্মের প্রচার করেন, বুদ্ধ তৎপ্রতি দৃষ্টি দেন এবং ধ্যানের প্রচার করেন, আসন্ন মহাদল বৌদ্ধদের মধ্যে উহার প্রচলন করেন। আসন্ন পেশওয়ারের বৌদ্ধসন্ন্যাসী ছিলেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি অষ্টসিদ্ধির ব্যবহার করিতেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

(খড়্গা, অঞ্জনা, পাদলেপা, অস্ত্রকান, রসরসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল বৌদ্ধ-তন্ত্রের অষ্টসিদ্ধি। সাধনমালা, ভূমিকা ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৫০ দ্রষ্টব্য)। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সিদ্ধদের যোগাচার্য্য বলিত। এইরূপে বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রবেশ-লাভ হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মে শক্তিপূজা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। শক্তিপূজার সহায়ে সিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্য ছিল। হিযুন স্যাং ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বোধিসত্ত্বদের মূর্তিসহ শক্তিমূর্তি দেখেন। তিব্বতে আনুমানিক ৬৪০ খৃঃ হইতে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অধোগতির পথে অগ্রসর হয়। নাগার্জুন 'মন্ত্র'-সহায়ে সিদ্ধিলাভ-কথা প্রচার করেন, ইহাই 'মন্ত্রযান'-নামে পরিচিত। কথিত আছে নাগার্জুন দক্ষিণ ভারত হইতে ইহা শিক্ষা করেন। যোগাচার্য্যদের মধ্যে চক্র, মন্ত্র প্রভৃতি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহল দেশে^১ অজস্তা গুহার চিত্রে আকাশ-গমনাদি সিদ্ধি দৃষ্ট হয়।

দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে কাশ্মীর ও নেপালে কালচক্র-যান নামক তান্ত্রিকতার প্রচার হয়, ইহাদের উপাস্ত দেবতা ও দেবী হেবজ্ঞ ও কালী। ইহারা বজ্রযানের পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিলেও নিজেদের 'বজ্রযান'-সম্প্রদায় বলিত, সিদ্ধদের নাম ছিল 'বজ্রাচার্য্য'। বজ্রযান হইতেই লামাধর্মের উৎপত্তি, ইহাতে ভূতপিশাচাদির পূজা আছে।

বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। বেণ্ডল সাহেব ১৪৪৬ পূঃ পর্য্যন্ত রচিত বৌদ্ধপুঁথি বঙ্গদেশে পাইয়াছেন।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তিব্বতে চীনদেশের 'তাও'-ধর্মের অনুরূপ 'বন' (Bon)-ধর্মের প্রাধান্য ছিল। ইহাতে দৈত্য-দানবের মূর্ত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল। তিব্বতরাজ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তিব্বতরাজের নেপালী ও চীনদেশীয় রাজস্বয়ের সহায়তায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ভারত হইতে গুরু পদ্মসম্ভব আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতে যান ও লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক যোগাচার্য্য ছিলেন, তিনি যাত্ৰবিজ্ঞায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পঞ্চবিংশতি শিষ্যও বিভিন্ন সিদ্ধিলাভ করেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস পদ্মসম্ভব অজ্ঞাপি যোগদেহে বিরাজ করিতেছেন। তিব্বতীদের ধর্ম মূলতঃ শৈব হইলেও তৎসহ যন্ত্র, মন্ত্র, দেব, দানব, সর্কোপরি মহাযান বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণে যাহা সৃষ্ট হইল তাহার সহিত কর্মবাদ যুক্ত হইয়া তিব্বতীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠিল। অতীশ এই বিকৃত লামাধর্মের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করেন। অজ্ঞাপি লামাধর্মে বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সমাবেশ দেখা যায়।^১ গুরু পদ্মসম্ভবের তিব্বতী চিত্র যথা—তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল এবং তাঁহার পূজায় নরবলির ব্যবস্থা। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই দ্বীমূর্তি আছে।

নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, জগদল, সোমপুরী ও পাণ্ডুভূমির মহাবিহারসমূহ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি বিহার-প্রদেশে ও অন্তর্গত বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল। গৌড়েশ্বর পালরাজারা ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষও তাঁহার নিযুক্ত করিতেন। ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলার বিহার ক্রমশঃ নালন্দার প্রভাব ক্ষয় করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হয়।

উত্তরবঙ্গে একাদশ শতাব্দীতে রামপাল জগদল বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল মহাবিহারে খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত। বিহারের মঠের অধ্যক্ষেরা তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে তিব্বতে গমন করিতেন এবং রাজার উৎসাহ

১। লামাধর্ম—ওরিয়েন্টাল, পৃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১২৮, ১৩১, ১৪১।

প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় তান্ত্রিক গ্রন্থাদির অনুবাদ করিতেন। গ্রন্থকারগণ অনেকেই পূর্বভারতের তথাপি তিব্বতে তাঁহারা পূজা পাইয়াছেন। ডাক্তার পি. কর্দিয়ে এই সকল অনুদিত গ্রন্থের একটী তালিকা করিয়াছেন। এই তালিকার দুইটী বিভাগ আছে, যাহাতে বুদ্ধের বচন আছে তাহাকে 'কেদ্র' বলে, অবশিষ্ট সমস্ত গ্রন্থের নাম 'তেদ্র' ; তেদ্রের এক অংশে তন্ত্রের পুথির টীকার নাম আছে।^১

বৌদ্ধতন্ত্রে তারা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি দেবদেবী ও ইন্দ্রজাল, মারণ, উচাটন প্রভৃতি যে সকল আচারাদির বর্ণনা আছে, তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মধ্যযুগের সংস্কৃতির ধারা বৃদ্ধিতে হইলে তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন। সাক্ষ্যভাষার ব্যবহার ও যৌনমগ্নত্বের ইঙ্গিত মধ্যযুগের সকল ধর্মসাধনায় দেখিতে পাইবার কারণ—সাধাবস্তুর প্রতি সাধকের আকর্ষণ বর্দ্ধিত করা। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকাচার্যেরা অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন ও দর্শনগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের শীলভদ্র, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, শাস্তুরক্ষিত, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতির নাম কে না জানেন, ইহারা বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। ইহারা ব্যতীত শান্তিদেব, জ্ঞানশ্রী মিত্র, দিবাকরচন্দ্র, কুমারচন্দ্র, পুস্তলি, নাগবোধি, উদ্বদাস, প্রজ্ঞাবর্মান, কদম্বল, কুকুরি প্রভৃতি বাদ্বালী ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ ৮৪ সিদ্ধার অন্তর্গত এবং মহামায়া যোগিনীকৌল ও নাথপন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।^২

মৈত্রেয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অসঙ্গ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাযান-বৌদ্ধধর্ম-মধ্যে তন্ত্রের প্রচলন করেন। অসঙ্গের সময় হইতে মহাযানী বৌদ্ধ নির্বাণের জন্ত কামনা না করিয়া বোধিসত্ত্বরূপে পুনর্জন্ম-লাভের কামনা করেন, এইরূপে তাঁহারা হীনযানদের অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন।^৩

তত্ত্বপূর্ব-যুগে ভারতে যাহা-কিছু সুন্দর ও উচ্চ আদর্শ বিশিষ্ট ছিল, তত্ত্বশাস্ত্রে তাহা গৃহীত হইয়াছে। ইহাই ভারতীয় তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

১। বৌদ্ধগান ও দোহা, পরিশিষ্ট, পৃ ৮০ ত্রুটী।

২। উদ্বোধন—বৈশাখ ১০৪২, 'তান্ত্রিক বৌদ্ধসাহিত্যে বাদ্বালীর অবদান' রামমোহন চক্রবর্তী

৩। Bud. Art in India.—Grunwedel, Trans. by Jas Burgess, p. 190.

জ্যোতিষী, ফলিতজ্যোতিষ, রসায়নবিজ্ঞা, সামুদ্রিক বিজ্ঞা, জন্মকুণ্ডলী প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া ভারতীয় তন্ত্র ধর্ম, দর্শন, কুসংস্কার, নীতি ও পঞ্চমকারের বিচিত্র সমন্বয়-স্বরূপ হইয়াছে। মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাস এই শাস্ত্রেই আবদ্ধ।^১

✓ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাথধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় জাতিই নাথদের পূজা করিত। মংস্তোল্লনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের নাম না থাকিলেও তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা, তাঁহার রথযাত্রা নেপালের একটি প্রধান উৎসব। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে সম্মতি না থাকিলেও তাঁহার পূজাও অনেকে করিয়া থাকে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

জৈন, বৌদ্ধ, আজীবক ইত্যাদি যে সকল ধর্মকে বৌদ্ধেরা তৈথিক বলিত, তাহারা আর্ধ্যধর্মের উপর নির্ভর করে না, বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্মের উপরই ইহারা স্থাপিত, বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা কম গৌরবের নহে। ইহাদের উৎপত্তি পূর্বভারতে, বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির মধ্যে বৈদিক ধর্মে বৈরাগ্য নাই, সন্ন্যাস আশ্রমে ভিক্ষাবৃত্তি আছে, কিন্তু জৈন ইত্যাদি ধর্মে গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগ আছে, জন্মজরামরণ বা ত্রিতাপ-নাশের বিষয় আছে, ‘আমি কে’ ‘কোথা হইতে আসিলাম’ ইত্যাদি দর্শনের বা চিন্তার কারণ আছে।^২

আচার-ব্যবহার হইতেও আর্ধ্য ও জৈন-বৌদ্ধদের ভেদ লক্ষণীয়। আর্ধ্যদের নিত্যস্নান বিধি, জৈনরা ‘মলধারী’; আর্ধ্যেরা উষ্ণীষ, উপবীত এবং উপানং ধারণ করিতেন, জৈনরা উষ্ণীষ ও উপানং ত্যাগ করিতেন এবং একবস্ত্র ধারণ করিতেন। আর্ধ্যেরা দুইবার আহার করিতেন, বৌদ্ধেরা বারটার মধ্যে একবার আহার বা উপবাস করিতেন। আর্ধ্যেরা উচ্চাসুন ব্যবহার করিতেন, বৌদ্ধদের উচ্চাসন-গ্রহণ বিধি ছিল না, আর্ধ্যেরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন, বৌদ্ধ ও জৈনরা মাতৃভাষাতেই লেখাপড়া করিতেন। অতএব উত্তর বা দক্ষিণ ভারত হইতে বৌদ্ধ বা জৈনধর্মের উৎপত্তি হয় নাই, পূর্বাঞ্চল হইতেই হইয়াছে। ইহা বলা অনুচিত হইবে না যে সাংখ্য-মতের উপর বৌদ্ধ-জৈন-মত প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রবর্তক

১। সাধনমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৮৮।

২। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিপ্রায় ‘নাথপন্থ’। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন।

কপিল মুনি ও পঞ্চশিখও পূর্বাঞ্চলের। মহাবীর পার্শ্বনাথ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিয়াছেন।^১

নাথধর্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধযোগতন্ত্রের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। তন্ত্রের উৎপত্তি কোথায় তাহাই আমাদের বিচার্য্য। তন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্রজালের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, দেবীর পূজা দ্বারা শক্তি লাভ করিবার জন্য মন্ত্র ইত্যাদির আবশ্যকতা আছে। বৈদিকযুগ হইতেই ইন্দ্রজালের ব্যবহার ও তৎপ্রতি সাধারণের আঁকার নিদর্শন দেখা যায়। পুরোহিতেরা মন্ত্রদ্বারা দেবদেবীকে বশীভূত করিতে পারেন ইহা সমাজে স্বীকৃত হইত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বহু মন্ত্র রহিয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালের পুরোহিতেরা এইরূপ বহু মন্ত্রই জানিতেন, তাহার কয়েকটি মাত্র বেদে স্থান পাইয়াছে।^২ পুরোহিতেরা উত্তম দর্শনীর লোভে দার্শনিক মন্ত্রগুলিকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিতেন ও ভোজবিদ্যার জন্য নূতন নূতন মন্ত্রের সৃষ্টি করিতেন।

তন্ত্রাদির প্রচলনে দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশে অলৌকিক কাহিনীর প্রচলন হয়, দেখা যায় বিদেশীয় লোকগীতির মধ্যেও এই সকল কাহিনীর সহিত সাদৃশ্য বর্তমান। ময়নামতীর গোদা যমকে মন্ত্রের দ্বারা তাড়না করিবার সহিত দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত যুরোপীয় গল্পের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ ভারত হইতে উপাখ্যানগুলি বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।^৩ ভোজবিদ্যার প্রাধান্য সর্বত্রই,—যজ্ঞে, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে, বাণপ্রস্থের নিয়মে। নৈতিক চরিত্রের এই অবনতিতে জ্ঞানীব্যক্তি দিগের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহার ফলে ত্রাশ্ব, আত্মা প্রভৃতি দার্শনিক বিচারের পুনরালোচনা হইতে লাগিল।^৪

ভোজবিদ্যার বিষয় চারিটি গ্রন্থে ছিল, তন্মধ্যে অথর্ববেদের ‘কৌশিক সূত্রে’ ভোজবিদ্যার অনুষ্ঠান-বিষয়ে বহু বিবরণ আছে, ‘ঋগ্বেদবিদ্যানে’ ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা যে কুহকের বিস্তার হয় তাহার বিবৃতি আছে। ‘সামবিদ্যানে’ সামবেদের মন্ত্র, অন্ধবিশ্বাসীদের জন্য কিভাবে

১। পূর্বপৃষ্ঠার ২এর নির্দেশ স্রষ্টব্য।

২। কারকার, পৃ ২১।

৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন, ৪ম সং, পৃ ৬৫।

৪। Oldenburge Die Lehre des Upanishaden—কারকার, পৃ ৩২ উল্লেখ।

প্রযোজ্য তাহা নির্দেশিত হইয়াছে। সামবেদের অন্তর্গত ‘অদ্বুত ব্রাহ্মণে’^১ কুপ্রভাবের শক্তিনিরোধের ব্যাখ্যা আছে।^২

ক্রমশঃ বৌদ্ধযুগেও ভোজবিহার প্রভাব দেখা যায়। দীঘনায়কের ৩২ সূক্তে ও Khuddakapathaতে সর্প, ছুষ্টাস্মা, দানব প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।^৩

শাক্তধর্মেও ইন্দ্রজালের ব্যবস্থা আছে। মালতীমাধব গ্রন্থে বলিদান, চক্রপূজা বা বামাচার, পঞ্চ-মকার-সাধন প্রভৃতির বর্ণনা আছে। চক্রপূজার দ্বারা পুনর্জন্ম-নিরোধ হয়, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দেবীপূজা আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। দেবীপূজায় মন্ত্রসাধন, নাড়ীতত্ত্বের জ্ঞান, বিশেষভাবে দেহমধ্যে সূপ্তা কুণ্ডলিনীর জাগরণ ইত্যাদির অমুষ্ঠান আরম্ভ হয়।^৪ জনসাধারণকে দেবীমূর্তি-গঠন, মন্দির-নির্মাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা ও মন্ত্রদ্বারা দীক্ষা দেওয়া হইত। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম জাপান তিব্বতাদিতে প্রচারিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ খৃঃ ৭৮৮ অব্দে শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন, বেদান্ত-সূত্রের, গীতার ও উপনিষদের ভাষ্যাদি ইহার দ্বারা রচিত হয়। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন, মাণ্ড্যুকা-কারিকা ও উপনিষদের বহু ভাষ্য ইনি রচনা করেন। গৌড়পাদ ও শঙ্করের শিক্ষার সহিত মহাযান-দর্শনের অদ্বুত মাদৃশ্য লক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা বহু হিন্দু তার্কিক তাহাদের ছদ্মবেশী বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের মতে শঙ্করের প্রচলিত মায়াবাদ বৌদ্ধমত, কিন্তু প্রথম যুগের উপনিষদে অদ্বৈতবাদ আছে ও ষ্বেতাস্বতর উপনিষদে মায়াবাদও আছে। তথাপি শঙ্কর ও তাহার পরমগুরু গৌড়পাদের মহাযান-দর্শন-দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া বিচিত্র নহে।

শঙ্করের প্রভাব উত্তর হইতে দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহার প্রমাণ দাক্ষিণাত্যে রামায়েণ সম্প্রদায় ও উত্তরে শৈবাদ্বৈতবাদীরা বহুদিন পর্য্যন্ত শঙ্কর দর্শন-রূপান্তরিত ভাবে শিক্ষা দেন। শাক্তদের মধ্যে শঙ্কর সম্ভবতঃ দক্ষিণাচার প্রচার করেন, ইহাদের মধ্যে পশুবলি প্রভৃতি অমুষ্ঠান

১। কারকার, পৃ ৪১, ৪২

২। কারকার, পৃ ৭১।

৩। ই পৃ ১০৭ ইত্যাদি পৃ ২১০ পর্য্যন্ত।

নাই। দাক্ষিণাত্যের কাকিভারাম নামক স্থানে দেবীমন্দিরের পুরোহিতেরা নিজেদের শঙ্করের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, ইহারা দক্ষিণাচারী, প্রবাদ আছে—শঙ্কর এই দেবীকে পশুবলি গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন।

দাক্ষিণাত্যে বহু ভাগবত-পুরোহিত আছেন, ইহাদের মতে বিষ্ণু ও শিব অভিন্ন, ইহারা সকলেই বৈষ্ণব। ইহাদের মধ্যে ‘পাঞ্চরাত্র-সংহিতা’ ও কয়েকটি মন্দিরে ‘বৈখানস-সংহিতা’ ব্যবহারের রীতি আছে। কাশ্মীরে দশম শতাব্দীতে ও তামিল-প্রদেশে একাদশ শতাব্দীতে পাঞ্চরাত্র-সংহিতার প্রচার হয়। ইহার মতের সহিত শৈবাগম ও পূর্বকালীন তত্ত্বের (হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তত্ত্বেরই) বিষয়জনক সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় প্রথম পাঞ্চরাত্র-সংহিতা খৃঃ ৬০০-৮০০র মধ্যে রচিত হয়। এই সময়ের মধ্যে শৈবাগম, হিন্দু ও বৌদ্ধতত্ত্ব-সকলও রচিত হয়।

গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে (পৃ ১৩) প্রাচীন বৈখানস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, ইহা দ্বারাও উহাদের প্রাচীনত্ব বা গোরক্ষ-পূর্ব যুগে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

উক্ত সংহিতাগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-মধ্যে শাক্ত-ধর্ম-প্রবেশের পরিচায়ক। এই হিসাবে ইহাদের মূল্য আছে। শৈবাগমের ছায় সংহিতাতেও জ্ঞানপাদ, যোগপাদ, ক্রিয়াপাদ ও চর্যাপাদ নামে চারিটি বিভাগ আছে। শাক্ত-মতের যোগ, নাড়ীতত্ত্ব প্রভৃতিও বৈষ্ণব-সংহিতায় পাওয়া যায়। মন্ত্র, ইন্দ্রজাল, কবচ প্রভৃতিরও ব্যাখ্যা বহুস্থানে আছে। মন্ত্র-যন্ত্রাদির ব্যবহারের কথাও আছে। দাক্ষিণাত্যে ললাটতিলকে শুভ্রমধ্যে রক্তবর্ণ চিহ্ন ধারণ করিতে দেখা যায়, উহা শক্তির চিহ্ন।

শৈবমতের মধ্যে শাক্তমতের আবির্ভাব আগম-শাস্ত্রের প্রভাবের পরিচায়ক।

সংহিতার ছায় আগমেরও চারিটি বিভাগ আছে। ‘শিব-শক্তি’ হইলেন চিৎস্বরূপ, তিনি শিব ও জড়জগতের মধ্যবর্তী ধর্মবিশেষ, তিনিই মানবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, তিনিই পরা বাক্য, শব্দের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবের যোজনাকারী, ইহাই মন্ত্র-তত্ত্বের মূল।

শিব পশুপতি, জীব পশু, জীবমধ্যে চিৎশক্তির আবাস। কিন্তু জীব পাশবদ্ধ, এই পাশ তিনপ্রকার আগর (বা অবিজ্ঞা), কার্ম্য (কর্ম্মের ফলাফল), ও মায়ীয়া (সংসারের কারণস্বরূপ মল)। এই মায়ীয়া মল শঙ্করের মীয়াবাদ নহে।

শৈবদের মধ্যে কাশ্মীর-শৈবাগম যেরূপ প্রচলিত ছিল, শাক্ত-সম্প্রদায়-মধ্যে তন্ত্রের সেরূপ প্রচলন ছিল। নবম শতাব্দী হইতে তিন শত বৎসর ধরিয়া শৈবাগমের নব নব রূপ দেখা যায়, এই মতে জগৎ 'মায়া' নহে, উহা শিবের 'আভাস', ইহাদের মতে সৃষ্টিতত্ত্ব অনেকাংশে সাংখ্যের অনুরূপ হইলেও 'ত্রিক' বা শিবশক্তি ও অণু বা পতি-পাশ-পশু সম্বন্ধেও ইহারা বিচার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শঙ্করের কাশ্মীর-ভ্রমণের পর বস্তুগুপ্তের 'শিবসূত্র' ৮৫০ খৃঃ রচিত হওয়ায় পূর্ববর্তী আগম হইতে ইহাতে অদ্বৈতবাদ স্পষ্টতররূপে বর্তমান। আগম-মতে দ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল ও কাশ্মীর-শৈব-সাধনার উহাই ভিত্তিস্বরূপ।^১

তন্ত্রমধ্যে ৬৪টি তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুজিকামত-তন্ত্রের রচনা-কাল ৭ম শতাব্দী, লিপি হইতে এইরূপ অনুমান করা যায়। এই পুঁথি হইতে তন্ত্র যে ৬০০ খৃষ্টাব্দেও প্রচলিত ছিল, এইরূপ ধারণা হয়। বাণের 'চণ্ডী-শতক' ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত, ভবভূতির 'মালতী-মাধব' ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত। সংহিতা ও আগমের স্থায় তন্ত্রেরও চারিটি বিভাগ আছে—জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও চর্য্যা। ক্রিয়াতে মন্দির-নির্মাণাদি বিধি আছে ও চর্য্যাতে সাধনপ্রণালী আছে।

শিবপত্নী শক্তিই শাক্তের প্রধান উপাস্ত্র দেবী। শক্তি বিনা শিব শববৎ, শক্তিই মূলা প্রকৃতি। ইহাতে বেদান্তের মায়াবাদের অনুরূপ কিছু নাই। 'যোগ' শাক্তদিগের সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ। উপনিষদের 'ও' মহামন্ত্র-সাধনে শক্তির সিদ্ধিলাভ হয়, 'ও'-এর প্রতিবর্ণের সহিত শক্তি জড়িত আছে। নাদ, বিন্দু, বীজ সৃষ্টির মূলস্বরূপ, তন্মধ্যে শক্তিই শব্দ, ইহাই অনন্তবাক্, বা পরাবাক্। শক্তিমন্ত্রের বর্ণগুলি অথর্কবেদের সময় হইতেই উচ্চারিত হইতেছে, মন্ত্রদ্বারাই শক্তির বিকাশ হয়। ষট্চক্র-সাধন-দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণও শাক্তসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চক্রপূজা ৬০০ খৃঃ হইতে প্রচলিত হয়, ইহাতে সর্বশ্রেণীর অধিকার আছে। মন্ত্র, যন্ত্র ও মুদ্রা শাক্তসাধনের অঙ্গ, শাক্ততিলক শৈব ত্রিপুরের স্থায়, মণ্ডল ও স্ত্রাস বা হস্তভঙ্গীর দ্বারা দেহমধ্যে দেবীর আবির্ভাব-রীতিও শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শাক্তধর্ম্মে সর্বশ্রেণীর প্রবেশা-ধিকার থাকায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকে। বৌদ্ধেরাও ক্রমশঃ হিন্দুর দেবদেবীতে ও মন্ত্রশক্তিতে আস্থাবান্ হইতে

লাগিল। তৎকালে মহাযান-বৌদ্ধদিগের মধ্যে পঞ্চবোধিসত্ত্ব ও তাঁহাদের শক্তির আবির্ভাব হইল। চক্রপূজা প্রভৃতি বামাচারও বৌদ্ধদিগের মধ্যে দেখা দিল। তারনাথের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইল, তাহার প্রমাণ ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত 'তথাগত-গূহ্যক', হিন্দুদিগের কুজিকাতন্ত্রও এই সময়ে রচিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর রচিত 'মহাদেব-সূত্র' মন্ত্র-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ, নবম শতাব্দীর 'পঞ্চকর্ম্ম' তান্ত্রিক যোগবিষয়ে রচিত। মহাযানদিগের 'ধারণী' অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণে ধর্ম্মজীবন রক্ষিত হইবে এই বিশ্বাস তন্ত্রমধ্যে বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র 'ও মণিপদ্মে হ্রম্' উচ্চারণে সিদ্ধিলাভ হয় এই বিশ্বাসও আছে। ৭৪৭ খৃঃ পদ্মসম্ভব তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম, গুরু পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রের প্রবেশ হইলেও জৈনধর্ম্মে হয় নাই। জৈনমন্দিরে দেবীমূর্ত্তি থাকিলেও তাঁহার পূজা-বিধি নাই, জৈনরা নাড়ীতন্ত্র ও দেহস্থ চক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের বিশেষ সাধন করেন না।

মধ্যযুগের (৫৫০-৯০০ খৃঃ অঃ) শৈবদের এইরূপ বিভাগ করা যায়। (ফারকার, পৃ ১৯০ দ্রষ্টব্য) :—

পাণ্ডপাত শৈব—

পাণ্ডপাত
লকুলীশ পাণ্ডপাত
কাপালিক
নাথ
গোরক্ষনাথী
রসেশ্বর

ছয়টি বিভাগ

আগমিক শৈব—২৮টি আগম আছে
তন্মধ্যে শৈবাগম স্বল্প, রুদ্রাগম
অধিক-সংখ্যক। যথা :—

শৈব সিদ্ধান্ত (সংস্কৃত সম্প্রদায়)

তামিল শৈব

কাশ্মীর শৈব

বীর শৈব

তামিল ও বীর শৈবরা নিজেদের
'মাহেশ্বর' বলে। পাণ্ডপাত না
বলিলেও ইহাদের দর্শন পৌরাণিক
পাণ্ডপাত দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত।

কাপালিক—অষ্টম শতাব্দীতে রচিত 'মালতীমাধবে' কপালকুণ্ডলা
অঘোরদেবতার শিষ্যা, উভয়েই যোগসাধক। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে কাপালিকদের
অভ্যুদয় হয়, ইহাদের আচার বামাচারী শাক্তদের অনুরূপ।

নাথ—ইহাদের মূল অনুসন্ধান অতীব কঠিন। গোরক্ষনাথীরা শৈব, কিন্তু আধুনিক নাথেরা, যথা—তাজোরের ভাস্কর রায় শাক্ত। পাশ্চপত শৈবের শাখা বিশেষ।

পাশ্চপত শৈব—বাণ ও হিযুস্তাং ইহাদের উল্লেখ ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর ইহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, কারণ ইহাদের মতে ঈশ্বর ক্রিয়মাণ হইলেও জগৎসৃষ্টির মূল কারণ নহেন, ইহা উপনিষদের বিরুদ্ধ মত।

লকুলীশ—ইহারা পাশ্চপতের শাখা, গুজরাটের। ৭ম শতাব্দীর পূর্বেই ইহাদের দর্শন প্রচলিত থাকায় নব শৈবাগম ইহারা গ্রহণ করে নাই। লকুলীশ শিবের অবতার। মহীশূর, রাজপুতানায় ইহাদের প্রচার আছে।

কানফাটা—ইহারা নাদ মুদ্রা ধারণ করে, ইহাদের মন্ত্র ‘শিব-গোরক্ষ’। গোরক্ষনাথ ‘হঠযোগ’ ও ‘গোরক্ষশতক’ রচনা করেন। হঠযোগ-প্রদীপিকা গ্রন্থ, ঘেরঙসংহিতা ও শিবসংহিতা পুস্তকদ্বয় হইতেই রচিত। ঘেরঙসংহিতা ও প্রদীপিকার বর্ণনীয় বিষয় অনুরূপ। শিবসংহিতায় হঠযোগ ও শাক্তযোগের কথা আছে। (ফারকার, পৃ ৩৪৮)।

উইলসন সাহেবের মতে কাপালিক সম্প্রদায় অধুনা কানফাটাদের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্বে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। কাপালিকদের ছয়মুদ্রা ধারণ রীতি ছিল—কণ্ঠী, স্বর্ণালঙ্কার, কুণ্ডল, শিরোভূষণ, ভস্ম ও উপবীত ধারণ। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মুদ্রা হইতেছে ভগাসনে বসিয়া ধ্যান, তাহা হইতেই নির্বাণলাভ হয়।^১

দাবিস্তানে উক্ত হইয়াছে গোরক্ষনাথ হইতেই সকল যোগী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।^২

নাথসিদ্ধেরা সিদ্ধযোগী ছিলেন, প্রাচীন কাল হইতেই বিভূতিসম্পন্ন যোগীর বর্ণনা পাওয়া যায়। অথর্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ত্রাত্য যোগীর বর্ণনা আছে, ইহারা বৈদিক সংস্কার মানিতেন না, তথাপি বিশেষ প্রকার দীক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন। ত্রাত্যরা শিবের উপাসক ছিলেন, খাসপ্রখাসের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগসাধনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহারা গীত গাহিয়া দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিতেন, ইহাদের বেশ অদ্ভুত ছিল, হস্তে বর্শা ও করদ্ব ধারণ করিতেন। ত্রাত্যের

শক্তিও দেবীরূপে পূজিত হইত, তাত্ত্বিক সাধন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তৎসহ যোগসাধনও ছিল।^১

প্রোফেসার রাধাকৃষ্ণ তাঁহার ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে অথর্কবেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে যোগীরা তপস্তার দ্বারা পঞ্চভূতকে জয় করিতেন, ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে পরমানন্দে মগ্ন হওয়া যায়, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। বৈদিকযুগে ইন্দ্রজালের বিশিষ্ট স্থান ছিল, পঞ্চধুনির মধ্যে বসিয়া জপ বা উর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে দণ্ডায়মান হওয়ার লক্ষ্য একই ছিল,—প্রকৃতিকে জয় করিয়া দেবতাকে স্ববশে আনা। ঋগ্বেদেও মন্ত্রাদির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি দেখা যায় কিন্তু অথর্কবেদে ইহার অধিক প্রচার হয়।^২

আলবেরুণীও অষ্টসিদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন।^৩ তাঁহার কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী।

যোগীরা প্রধানতঃ শৈব, শিব যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হন। যোগীদের পাশুপত-শৈব নামে প্রসিদ্ধি আছে, নেপালে গোরক্ষনাথীদের কাহিনীতে ও বঙ্গদেশের গীতিকায় তাত্ত্বিকতার সহিত বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। পাশুপত-শৈবদের চারিটা বিভাগ আছে—পাশুপত, লকুলীশ, কালামুখ ও কাপালিক। অঘোরী শৈব অজ্ঞাপি মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, পাশুপত প্রভৃতি শৈব সম্প্রদায় অধুনা লুপ্ত। কানফাটারা অবশ্য পাশুপতদের চ্যায় মহেশ্বরের পূজা করেন। দাক্ষিণাত্যে পাশুপতদের আদিগুরুরূপে লকুলীশের পূজা হয়। ডাঃ ভাণ্ডারকার মতে শৈব মাত্রই লকুল বা পাশুপত নামে অভিহিত হইত। ক্রমশঃ তাহা হইতে পাশুপত, কালামুখ ও কাপালিক এই তিন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়।^৪ ক্রোধ, লৌভ প্রভৃতি জয়, ক্ষমা শিক্ষা, ওঁকার জপ ও ধ্যান দ্বারা পশুর পাশ বা বন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভই ইহাদের সাধন।

আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে রচিত বায়ুপুরাণে লকুলীশদের পাশুপতদের শাখারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সম্প্রদায় মধ্যে শরীর ও মন জয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। পঞ্চম শতাব্দীর শিলালিপিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা অষ্টম শতাব্দীতে

১। ব্রীক্স, পৃ ২১২।

২। ভারতীয় দর্শন—রাধাকৃষ্ণ, ১ম ভাগ, পৃ ১২১।

৩। Alberuni's India, Vol I, Ch. VII, p. 69. যোগীর ঋগ্বেদাদি সিদ্ধি বর্ণন।

৪। Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, p. 121, Bhandarkar.

নেপালে প্রবেশ করেন, ইহা যাহ্বরে রক্ষিত মুদ্রার বিবরণ হইতে জানা যায়। শঙ্কর ও রামানুজ পাশুপতদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈবদের বিষয় বলিয়াছেন। অতএব খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার্য। ডাঃ ভাণ্ডারকারও বলিয়াছেন, খৃঃ ৯৩৪-১২৮৫ পর্য্যন্ত শিলালিপিতে লকুল নামে শৈবদের অভিহিত হইতে দেখা যায়।^১ কার্য্য, কারণ, যোগ, আচার ও ছুঃখাস্ত, পাশুপতদের এই পঞ্চসাধন। পাশুপতিই পতি, জীব তাঁহার পশু, জীব পাশদ্বারা আবদ্ধ। ‘ছুঃখাস্ত’ অর্থে মোক্ষ বা পাশ মোচন। ভস্ম দ্বারা দেহ আচ্ছাদন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষ ও ক্ষমতালাভ হয়।

মহাকাব্যে পাশুপতদের স্থান বিশেষ উল্লেখ নহে। মহারাষ্ট্র গীতিকায় পাশুপত শৈব দম্ভ্যরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, উইলসন সাহেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ফারকার সাহেব বলিয়াছেন, লকুলীশরা লিঙ্গপূজার প্রাধান্ত স্বীকার করিত এবং দেহের নানা স্থানে লিঙ্গচিহ্ন অঙ্কিত করিত। বরোদা রাজ্যে লকুলীশ মন্দিরের কথাও ফারকার সাহেব বলিয়াছেন। বরোদার লাট প্রদেশে শিব গদাধারী মূর্তিতে দেখা দেন। পাশুপত সাধনপ্রণালী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। সুবিখ্যাত হর্ষ এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মাড়োয়ার, রাজপুতানা প্রভৃতিতে ইহা প্রসার লাভ করিয়া ৫৫০-৯০০ খৃঃ মধ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করে। তথায় দশম শতাব্দীতে লকুলীশের অবতার দেখা দেয় এবং একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালামুখদের আধিপত্য থাকে। উত্তর ভারতেও দশমশতাব্দীর লকুল মূর্তি কাশ্মীরের নিকটবর্তী মন্দির মধ্যে দেখা যায়। মন্দির গাত্রে শিলালিপিতে লকুলীশের প্রশংসা আছে। এই মন্দির ৭৯১ খৃষ্টাব্দের। দ্বাদশ শতাব্দীর শিলালিপি হইতে লকুলীশ ও কালামুখকে অভিন্ন বলিয়া ডাঃ ভাণ্ডারকার অনুমান করেন। উভয়কেই আবার পাশুপত বলা হইয়াছে। ‘কালামুখ’দের ললাটে কৃষ্ণ চিহ্নমাত্র পার্থক্য আছে। ইহারা মহাকালের উপাসক, ভৈরবের ইহারা ভৃত্য। ইহাদের সহিত নরভুক্ত ‘অঘোরী’রাও জড়িত। বঙ্গদেশে ও আসামে এখনও বামাচারী অঘোরীদের অসাধ্য সাধন করিতে দেখা যায়, খাচ্চা-খাচ্চোর বিচার ইহাদের নাই।^২

ষষ্ঠ শতাব্দীর ‘দশকুমার চরিতে’ কাপালিকদের বর্ণনা আছে, সপ্তম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ইহাদের প্রভাব ছিল। হিউ-এন-ৎস্যাং (খৃ ৬৩০-৬৪৫) ভারতে থাকেন, তিনিও ইহাদের নরকপালধারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‘মালতীমাধব’ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়, ইহাতেও কাপালিকের দর্শন পাই। উহারা নগ্ন, মৃতদেহের ভস্মাচ্ছাদিত, ত্রিশূল ও কমণ্ডলধারী, মণ্ডপায়ী, রক্তাক্তধারী; নরবলি ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কাপালিকের সঙ্গিনী কাপালিনী, ভৈরবাদেশে ইহারা অষ্টসিদ্ধিলাভ করে। ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটক একাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়, ইহাতেও কাপালিক বর্ণনা আছে। এই কাপালিক কপালধারী, কপালপাত্র হইতে মণ্ডপানরত ও নরখাদক। এই কাপালিক হরি, হর প্রভৃতি দেবতাকে স্বীয় বশে আনিয়াছে এবং পার্শ্বতীর স্থায় সুন্দরী কামিনীকে সে ভোগ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। অষ্টসিদ্ধি কাপালিকের আয়ত্তাধীন। ভবভূতির মালতীমাধবের কাপালিকের নাম অঘোরঘণ্টা, তিনি চামুণ্ডার উপাসক, কপালকুণ্ডলা অঘোর ঘণ্টার শিষ্যা, উভয়েই যোগের সাধক। কাপালিকের চিত্র ভয়াবহ। নায়ক মাধব ইহাকে হত্যা করিয়া নায়িকাকে উদ্ধার করেন। দশকুমার চরিতে বর্ণিত কাপালিক চিত্রও ভয়াবহ, তিনি রাজকন্যা কনকলেখাকে বলি দিতে উদ্যত, কিন্তু তৎসহ রাজকন্যার উদ্ধার কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে রচিত ‘তথাগত গৃহক’ প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ হইতে বলা যায় যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই তন্ত্রের প্রবেশ লাভ ঘাটে, তৎফলে বৌদ্ধতান্ত্রিকাচার্য্য ও হিন্দু কাপালিক প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়। পাশুপত শৈবদের সহিত নাথপন্থের সাধনায় সাদৃশ্য ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, পাশুপতেরা পাশুপতি বা মহেশ্বরের উপাসক। পাশুপতিই শিব। যোগসাধন নাথদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তথাপি তন্ত্রের সহিত যোগা-যোগও ছিল। অতএব নাথধর্মকে তন্ত্র ও যোগ তন্ত্রের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। মূলতঃ নাথেরা শৈব। তন্ত্রের পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব-অনুভূতি সাধন, ও শক্তি-পূজা নাথদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। জৈনধর্মে এইরূপ কোন সাধনার কথা পাওয়া যায় না। জৈনগ্রন্থ ‘পার্ব’ ডা দৌহা’তে ইন্দ্রিয় বিষয় ত্যাগ ও যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত মাত্র আছে। এই গ্রন্থ একাদশ শতকে রচিত হয়, মুনি রামসিংহ ইহার প্রণেতা। তন্ত্র

সাধনার দ্বারা দেবতাদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ নাথদের অমৃতম লক্ষ্য। বৌদ্ধরাও সূত্র ও ত্রৈলোক্য প্রাপ্তির নিমিত্ত তত্ত্বের সাধনা করিতেন। যোগ-তত্ত্বে ও অনুরূপ যোগতত্ত্বে দেবতাদের শক্তির আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া নির্বাণ সূত্রে মগ্ন থাকার বর্ণনা আছে।^১

তত্ত্ব হিন্দুর পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত। ইহাতে আগম ও নিয়ম এই দুই বিভাগ আছে, আগমে সদাশিব দেবীকে উপদেশ দিতেছেন, নিয়মে দেবী সদাশিবকে উপদেশ দিতেছেন। সারদাতিলক তত্ত্বে যন্ত্র, মন্ত্র, চক্র, কুণ্ডলী ও পাশুপতদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘গণকারিকা’ নামক গ্রন্থে পাশুপতদর্শনের সিদ্ধান্তের বিশদ বিবরণ আছে।^২ মাধবচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহেও ইহার উল্লেখ আছে। তাহার বহুপূর্বে মহাভারতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।^৩ গণকারিকার সারতত্ত্ব—‘চর্যাবিধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং পরমৈশ্বর্যপ্রাপ্তি ও চরম দুঃখনিবৃত্তি এই উভয় বিষয় মুক্তি লাভ করিতে পশু সক্ষম’। শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগানুষ্ঠান উভয়ের আবশ্যিকতা আছে। শিবসামীপ্যলাভ হইলে ক্রিয়ার উপশম বা শাস্তি হয়। মুক্তির প্রথম উপায় ‘প্রসাদ’, ইহাই নাথ ও কাশ্মীর শৈবত্বের মতে ‘শক্তিপাত’।

বাসশ্চর্য্য জপধ্যানং সদাকুর্জস্বতিস্তথা।

প্রসাদশ্চৈব লাভানামুপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিতঃ ॥^৪

শব্দর ৬৪টি তত্ত্ব দেখেন, দস্তাত্রেয় উহাদের রচয়িতা। মন্ত্রসাধনই তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। তত্ত্বের সাধক পশু, বীর ও দিব্য ভেদে ত্রিবিধ, তন্মধ্যে দিব্যসাধকই ‘কোল’ নামে পরিচিত। কোলের পক্ষে ভাল বা মন্দ নাই, পাপ বা পুণ্য নাই, বিষদ্বারা বিষক্ষয়ের দ্বারা কোলপক্ষে যে পথ পিচ্ছল ও দুর্গম সেই পথ অবলম্বন করিয়াই শিবত্ব প্রাপ্তি লক্ষ্য, ইহাই কোলনীতি বা নাথনীতি, কারণ নাথসিদ্ধেরা ‘কোল’ নামেই পরিচিত ছিলেন। ইহার দ্বারা নাথপন্থের সহিত তত্ত্বের যোগাযোগ সূচিত হইতেছে।

(খ) নাথমার্গের সহিত কোলমার্গের সম্বন্ধ বিচার

নাথসিদ্ধগণ কোল ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আমাদের আধুনিক জ্ঞানে বিভিন্ন কোল-সম্প্রদায়-নির্ণয় কষ্ট সাধ্য হইলেও একাদশ

১। সাধনমালা ২য় খণ্ড, ভূমিকা পৃ ১৪৭। ২। গণকারিকা আচার্য ভাস্কর্য্য বিবর্তিত।

৩। কলাগ বৈদ্যনাথ পাশুপত সিদ্ধান্ত ও বৈদ্যনাথ পৃ ৪৪৭। ৪। গণকারিকা শ্লোক ৭।

শতাব্দীতেও ভারতে উহারা অপরিচিত ছিল না। কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথিতে সিদ্ধপংক্তি ও গুরুপংক্তির উল্লেখ আছে (নবম পটল), মহাকাল, দেবী কোট, বারাগমী, প্রয়াগ, অটুহাস্ত ও জয়স্বীক্ষেত্রে এবং কামাখ্যা, পূর্ণগিরি, ওড়িয়ানা ও অর্কুদ নামক চতুষ্পাঠে যে সকল সিদ্ধার পূজা হইত তাহা উক্ত পংক্তিদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীবিষপাদ, বিচিত্রপাদ, শ্বেতপাদ, ভট্টপাদ, মছেন্দ্রপাদ, বৃহীষপাদ, বিদ্যাপাদ, শবরপাদ প্রভৃতি অষ্টাদশ গুরু এবং মুক্তিপাদ সূর্যাপাদ প্রভৃতি দশ সিদ্ধার উল্লেখ আছে। গুরুদের মধ্যে মছেন্দ্রনাথ যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন তাহা পুরুষানুক্রমিক কিম্বদন্তী হইতে নিশ্চিত রূপে বলা যায়। প্রাচীন উপাখ্যানেও মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক কুলাগম বা কুলশাস্ত্রের উপদেশ দানের বৃত্তান্ত আছে।^১

কৌলজ্ঞান নির্ণয় পুথির রচনাকাল ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে একাদশ শতাব্দী। এই পুথি রচিত হইবার বহু পূর্বেই কৌলসম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়, একথার উল্লেখ উক্ত পুথিতেই পাওয়া যায় যথা—

দুর্লভং সিদ্ধিসন্দোহং গোপিতব্যং প্রযত্নতঃ ।

দাতব্যং পূর্বসিদ্ধস্ত অঙ্গমেকপরীক্ষিতম্ ॥৫৩৫

শ্রুয়তে দেবি পারম্পর্যাক্রমাগতম্ ॥৬৮

কৌলিকস্ত ইদং দেবী কর্ণাৎ কর্ণাসমাগতম্ ॥৬৯

এতত্ত্ব কুলবিজ্ঞানম্ পারম্পর্যাক্রমাগতম্ ॥১৪৭৯

বিশিষ্ট কৌল সম্প্রদায়গুলি ও তাহাদের গুরুদের নাম উক্ত পুথিতে আছে। যথা বৃষগোথ কৌল, বহ্নিকৌল, মহাকৌল, সিদ্ধকৌল সিদ্ধামৃত কৌল, মৎস্যেন্দ্র ও যোগিনীকৌল।^২

পঞ্চ পঞ্চাশিকা যোগপ্রণালীর ব্যাখ্যাও কৌলশাস্ত্রে আছে, এই বিভিন্ন যোগপ্রণালীর নাম কুলসাগর, কুলোঘো, হৃদয়, সম্বর, সৃষ্টিকৌল, মহাকৌল, তিমির, সিদ্ধামৃতকৌল, শক্তিভেদকৌল, জ্ঞানকৌল, সিদ্ধেশ্বর, বজ্রসম্ভব ইত্যাদি।^৩

১। কৌলজ্ঞান নির্ণয়—১৬ পটল।

২। কৌলজ্ঞান নির্ণয় ১৪৩০, ৩৪, ১০৪৭—৪৯

৩। ই ই পটল ২১

উপরোক্ত যোগিনীকৌলের নামে মৎস্যেন্দ্র সম্প্রদায় পরিচিত ছিলেন। কারণ কোলজ্ঞান নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে আছে—

মহাকৌলাং সিদ্ধকৌলাং সিদ্ধকৌলাং মৎস্যেন্দ্রদরম্।

চতুষ্টয়বিভাগেন অবতারকোদিতং ময়া ॥৪৭॥

জ্ঞানাদৌ নির্ণীতিঃ কৌলাং দ্বিতীয়ে মহৎ সংজ্ঞিতম্।

তৃতীয়ে সিদ্ধামৃতম্নাম কলৌ মৎস্যেন্দ্রদরং প্রিয়ে ॥৪৮॥

যে চান্দ্রান্নির্গতা দেবি বর্ণয়িষ্যামি তেহখিলম্।

এতস্মাদ্ যোগিনীকৌলাম্নাম্না জ্ঞানস্বা নির্ণীতো ॥৪৯॥

ইহা দ্বারা অনুমান করা অসম্ভব হইবে না যে মৎস্যেন্দ্র সিদ্ধ বা সিদ্ধামৃত কৌলাস্তর্গত যোগিনীকৌল ছিলেন। ইহার পদ্ধতি সকল ‘জ্ঞাননির্ণীতি’তে বিবৃত হইয়াছে।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ভণিতায় আছে—

মহাযোগিনী কৌলে মৎস্যেন্দ্রপাদাবতারিতে।

এই কুলশাস্ত্র কামরূপে যোগিজনের গৃহে গৃহে বিরাজ করিত।^১ গোরক্ষনাথাদিও কোলমতের সহিত নিঃসন্দেহে যুক্ত ছিলেন।

অকুল বীরতন্ত্র পুথির এক খণ্ডে কৌলদের দুইটা শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়, ‘কৃতক’ ও ‘সহজ’।^২ কৃতকেরা দ্বৈতবাদী ও জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, সহজেরা আরাধ্য দেবতার সহিত একাত্ম হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য মনে করিতেন। যথা—

কৌলমার্গে দ্বয়ো সন্তি কৃতকা সহজা তথা।

কুণ্ডলী কৃতকা জ্যেয়া সহজা সমরসে স্থিতা ॥ ৩৥

প্রিয়প্রেরকভাবস্থা কৃতকা সাহিভীযতে।

কৃতক ও সহজ মধ্যে সহজকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। সাধক ও শিব মধ্যে যে তন্ময়তা বা সামরস তাহাই সাধনদ্বারা লভ্য।

বৌদ্ধসিদ্ধেরাও সহজপন্থার সাধক ছিলেন। মৎস্যেন্দ্র ও লুইপা যদি অভিন্ন হন, তবে মৎস্যেন্দ্রের যোগিনীকৌল ও সিদ্ধাচার্য্যদের নীতিতে সাদৃশ্য থাকিবার কথা।

সিদ্ধাচার্য্যদের নীতির পরিচয় বৌদ্ধ দৌহাকোষে পাওয়া যায়। সিদ্ধাদের লক্ষ্য ‘শূন্যাবস্থা’ প্রাপ্ত হওয়া, উহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি

১। বাগচী, ভূমিকা কোলজ্ঞান নির্ণয় পৃ ৩২

২। অকুলবীরতন্ত্র, বি, পৃ ২৩ ইত্যাদি

ভাব বর্জিত অবস্থা ও একাত্মা হইবার সাধনা। এই সহজ সাধন কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে ও অকুলবীরতন্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। এই সহজাবস্থা লাভ হইলে সাধক স্বয়ং ব্রহ্মা, হরি, রুদ্র, ঈশ্বর, শিব, পরমদেব, সাংখ্য, পুণ্য, অর্হন্ত, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, এবং সাধক স্বয়ং দেবী, স্বয়ং গুরু, স্বয়ং ধ্যান, স্বয়ং ধাতা, স্বয়ং সর্বত্র দেবতারূপে বিরাজ করেন। (অকুল বীরতন্ত্র ‘এ’ ২৪-২৬ শ্লোক)।

বৌদ্ধসিদ্ধারা ‘আগমপোথী ইষ্টমালা’ (চর্যা ৪০), প্রভৃতিকে সহজ সিদ্ধিলাভের পথের অন্তরায় স্বরূপ মনে করেন। পঞ্চ শ্রীফলের বাহিরে গন্ধলুক্ক ভ্রমর যেরূপ ভ্রমণ করে, বাহ্য আগমাদি জ্ঞানদ্বারা লভ্য পরমার্থসত্য্যভিমানী পণ্ডিতেরাও সেইরূপ।^১

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের তৃতীয় পটলে (৩০, ৩১) লৌকিক মার্গ বর্জনের কথা ও আধ্যাত্মিক মার্গে উৎকর্ষ সাধনের কথা আছে, লৌকিক-মার্গসকলে সিদ্ধি বা মুক্তি নাই। অকুলবীরতন্ত্রে “ন যজ্ঞঃ নোপবাসঞ্চ ন ক্রিয়া বর্ণভেদকম্ ন জপো নার্চনং স্নানং ন হোমং নৈব সাধনম্” ইত্যাদি দ্বারা লৌকিক বিধি ত্যাগ ও ‘বেদসিদ্ধান্ত শাস্ত্রাণি কায়ক্লেশপরাণি’ বিজ্ঞাহঙ্কার পাণ্ডিত্য গর্বিতদের অকুলবীর জানিবে না ইত্যাদি আছে।^২

বিভিন্ন কৌল ও বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মধ্যে পঞ্চ কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা,—নটী, রাজকী, ডোম্বী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। বিভিন্ন তীর্থে যে সকল যোগিনী ও ডাকিনী বাস করে তাহারাও শক্তির অংশ, এইরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত আছে। এই তীর্থ সকল দেহমধ্যেই অবস্থিত আছে ও যৌগিক নাড়ীগুলির সহিত দেহস্থ তীর্থ বা পীঠের যোগাযোগ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রে পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র ও ছন্দঃ এই চারিশ্রেণীর তীর্থের উল্লেখ আছে। উপক্ষেত্র ও উপছন্দের উল্লেখও আছে।

পীঠ—জালন্ধর, ওড়িয়ান, অর্কুদ বা কামরূপ, পূর্ণগিরি।

উপপীঠ—মালব, সিদ্ধুনগর।

ক্ষেত্র—মুম্বনি, দেবীকোট, কমরিপাঠক।

উপক্ষেত্র ও ছন্দ, উপছন্দ। গোদাবরী উপক্ষেত্র, হরিকেল, সৌরাষ্ট্র, কলিঙ্গ ও চরিত্র ছন্দ ও উপছন্দ। (হে বজ্রতন্ত্র)।

১। কৃষ্ণাচাৰ্য্য পাদের দৌহাকোষ ২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২। অকুলবীরতন্ত্র-এ-শ্লোক ৪০ ইত্যাদি ও শ্লোক ৫০, ৫১, ৫২।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়েও পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র, ডাকিনী ও যোগিনীর উল্লেখ আছে। চতুঃপীঠ যথাক্রমে কামাখ্যা, পূর্ণগিরি, ওড়িয়ান ও অর্কবৃন্দ।^১

ক্ষেত্র,—করবীর, মহাকাল, দেবীকোট, বারাগসী, প্রয়াগ, অট্টহাস্ত, চরিত্র, একাম ও জয়ন্তী। যোগিনীর ক্ষেত্রজা ও পীঠজা, তদ্ব্যতীত যোগজা, মন্ত্রজা, সহজা, কৌলজা ও অন্ত্যজা। বিবাহিতা শক্তির নাম 'সহজা' অন্ত্র জীর নাম 'কৌলজা' ও 'অন্ত্যজা'। কৌলজ্ঞাননির্ণয় মতে এই শক্তি দ্বিবিধা—বহিঃস্থা ও আধ্যাত্মা, দেহ মধ্যেই ইহাদের উপলব্ধি করিবার নির্দেশ আছে। এই শক্তির সহিত দেহস্থ পীঠাদির সম্বন্ধও বর্ণিত হইয়াছে।^২

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের পঞ্চদশ পটলের নাম 'পরমবজ্রকরণম্' অর্থাৎ পরমবজ্রে দীক্ষা ('বজ্র' শব্দ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে নাই, অতএব উহার মূল সম্ভবতঃ বৌদ্ধ)। তদ্ব্যতীত 'শাস্তিকা', 'পোষ্টিকা' আদি শব্দ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে নাই, কিন্তু বৌদ্ধ 'জ্ঞানসিদ্ধি' ও 'তথাগত গৃহকে' আছে (১৮, পৃ ১৬৮) কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে শাস্তিকা (যাহা মনের শাস্তি আনে), এবং পোষ্টিকা (যাহা মনের শক্তি বৃদ্ধি করে) শব্দ থাকাতে বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কৌলজ্ঞানের একাদশ পটলে যে পঞ্চ পবিত্রাণি 'বিষ্ঠা ধারামৃতং শুক্রং রক্তমজ্জাবিমিশ্রিতম্' ও গোমাংসাদি ভক্ষণের কথা আছে, তাহা স্থূলার্থে গ্রহণ বিধি কি না সন্দেহ। বৌদ্ধ অনঙ্গবজ্রের 'প্রজ্ঞোপায় বিনিশ্চয়া সিদ্ধি'তে, ইন্দ্রভূতির 'জ্ঞানসিদ্ধি'তে ও 'তথাগত গৃহকে' রহস্যময় খাত্ত ও পানীয়ের বর্ণনা আছে।^৩

পরবর্ত্তী বৌদ্ধতন্ত্র ও যোগিনী কোলে উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকিবার নিমিত্ত ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উভয় মতই কোন সাধারণ মূল ভিত্তির আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান তন্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন।^৪

‘কর্দমে চন্দনেহ ভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে’—

ইত্যাদি ভেদাভেদ জ্ঞানদূর এবং উচ্চতর সাধন কুলাচারের প্রাথমিক শিক্ষা, ইহা শেষে ‘কুলার্ণব’ নামক বর্ত্তমান তন্ত্রের বীর বা কৌল আচারে পরিণত

১। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, অষ্টম পটল, শ্লোক ২০ ইত্যাদি।

২। ঐ ঐ ঐ ১-১০ ইত্যাদি।

৩। অগ্নিধর্মকোশঃ, ভূমিকা পৃ ২১এ তথাগতগৃহকের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

৪। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা পৃ ৫৫—৫২ ডাঃ বাগচী।

হইয়াছে। দক্ষিণাচারের মতে বৈদিক নিয়মে দেবীর আরাধনা করিয়া সাংস্কৃতিক বা রাজসিক বলিদানের ব্যবস্থা আছে, মজ্জাদি নিষেধ। বামাচারে পঞ্চ-মকার বিধেয়।^১

বর্তমান কুলার্ণব তন্ত্রে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধাস্তাচার এবং কৌলাচার (২য় উল্লাস) এই সপ্তবিধ আচারের বর্ণনা আছে। বিশ্বসার তন্ত্রে ‘আচারো দ্বিবিধো দেবি বাম-দক্ষিণ-ভেদতঃ’ বলা হইয়াছে।

মজ্জং মাংসং চ মংস্তং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।

মকার-পঞ্চকং দেবী দেবতা প্রীতিকারকম্ ॥^২

এই পঞ্চ-মকার সাধনা ‘বামাচার’ ও এই পঞ্চ মুদ্রা রহিত যে আচার তাহাই ‘দক্ষিণাচার’।

কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেখানে পঞ্চ-মকারের ‘বাসনা’ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বাসনা অর্থে সংস্কার বা সূক্ষ্মরূপ, ইহার অর্থ ইচ্ছা বা ভাবনা নহে। সতীশচন্দ্র সিদ্ধাস্তভূষণ মহাশয় ‘কৌলমার্গ রহস্ত্রে’ বাসনার অর্থ ‘ভাবনা’ করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত মনে হয় না।^৩ সূক্ষ্মরূপ অর্থ ধরিলে পঞ্চমুদ্রার এইরূপ ব্যাখ্যা হয়,—মূলাধারস্থিত সূপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সুষুম্নাপথে সহস্রদলে নীত করিলে শিবের সহিত (কুণ্ডলিনী) শক্তির যে আত্মাত্মিক সম্মেলন বা সমরসতা প্রাপ্তি হয় ও তাহার দ্বারা যে আনন্দের অনুভূতি সাধকের হৃদয়ে হয়, তাহাই ‘মৈথুন’। এই সুখের বা আনন্দের অনুভূতির অবস্থায় সহস্রার হইতে যে অমৃতক্ষরণ হয় তাহাই ‘মজ্জা’। জ্ঞান খড়্গের দ্বারা পাপ ও পুণ্যরূপ পশুবলিই ‘মাংস ভক্ষণ’, বলির পর মাংস ভক্ষণ প্রথা, অর্থাৎ সাধকের পাপপুণ্য দূর করিয়া পরমাত্মাতে চিত্ত লয় বিধি। চিত্তলয়ের জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া অন্তর্মুখী করাই ‘মংস্তাশী’ হওয়া ও কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধনে তাহার সেবা করিতে পারাই শক্তি সাধনা।^৪

শ্রীগুরুর মুখ হইতে এই পঞ্চ-মকারের বাসনা উপলব্ধি কর্তব্য, যে সাধক যথাযথ আচরণ দ্বারা যোগ সাধনার চরম অবস্থায় পৌছাইতে

১। মধ্যমুগে বাঙ্গালা কালীপ্রসন্ন, পৃ ২০। ২। কুলার্ণবতন্ত্র ১ম উল্লাস।

৩। কৌলমার্গ রহস্ত্র; সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী, সং ৭৬, ৩১ পৃ।

৪। কুলার্ণবতন্ত্র ৩।১০৫-১১০।

সক্ষম তিনিই 'জীবমুক্ত'। পূর্ণাভিষিক্ত জীবমুক্ত যোগীর পক্ষে পঞ্চ-মকারের বাহ্য অনুষ্ঠানেও আপত্তি নাই, যद्यপি বাসনা উপলব্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যই কুলার্ণবের পঞ্চম ও ষষ্ঠাদি উল্লাসে বাহ্য পঞ্চমুদ্রার কথা আছে। তৎসহ সাধককে সাবধান করাও হইয়াছে যে দুইখানি তীক্ষ্ণ অসির মধ্য দিয়া গমন বা ব্যাজের কণ্ঠালিঙ্গন বা বিষধর সর্পকে ধারণ যেরূপ কঠিন, এ সকল আচরণ বা কুলসাধনা তাহা অপেক্ষাও অসাধ্য ব্যাপার। অতএব বুঝা যাইতেছে, চিন্তে সাধিক বৃত্তির উন্মেষ হইয়া চিন্তা বিশুদ্ধ না হইলে কুলসাধন অকর্তব্য। চৈতন্যরূপ অগ্নিতে স্নমুদ্রাপথে বিশ্ব প্রপঞ্চকে বা বৃত্তি সকলকে আহুতি দিতেছি, সাধকের এইরূপ ভাবনা করাই শ্রেয়ঃ। সারদাতিলকের মঙ্গলন-কর্তা লক্ষণেন্দ্র দেশিক, 'সৌন্দর্য্য লহরী'র টীকাকার লক্ষ্মীধর, মহাপণ্ডিত তাত্ত্বিক দার্শনিক ভাস্কর রায় (ললিতসহস্রনাম ভাষ্যকার) বামাচারী হইয়াও বামাচারের অনুকূল ছিলেন না। উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া কুলাচার দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে তাহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক নিবন্ধকার তন্ত্রসার লেখক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও কুলাচারের অনুষ্ঠানে শিবসদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন, এ কথা বলিয়াছেন।^১

বৈদিক যোগ সাধন প্রণালী ও তাত্ত্বিক যোগ সাধন প্রণালীর চরম লক্ষ্য এক হইলেও অনুষ্ঠান পদ্ধতি ভিন্ন, জীবের মুক্তিই উভয়ের লক্ষ্য হইলেও বৈদিক সাধনে কুণ্ডলিনী উদ্বোধন বা ষট্চক্রসাধন তত্ত্ব নাই, তাত্ত্বিক মতে ষট্চক্রভেদ ও দেহস্থ সপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য সম্পাদন একটি প্রধান ব্যাপার। কঠ, শ্বেতাস্বতরাদি উপনিষদে ও পাতঞ্জল দর্শনে বৈদিক যোগকথার আলোচনা আছে।

তন্ত্রের অনুশীলন কর্তা কতিপয় বিদ্বানের মত যে শাক্তমার্গ পঞ্চ তন্ত্রের নিমিত্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের নিকট স্বামী, কারণ বামদেব্যাদি অনেক বিধানে পরযোষ আদি প্রয়োগ মান্ত ছিল; (Shakti and Shakta p. 440—448) খুব সম্ভবতঃ কৌলাচারের উপর অনাধ্য বিশেষতঃ তিব্বতী তন্ত্রের প্রভাব পড়ে, কারণ কুলার্ণব নামক কৌলদের প্রধান তন্ত্রে মন্ত্রমাংসাদির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের নিন্দা আছে (২।১১৭—১৩৬ শ্লোক)। কৌলাচারের মুখ্য কেন্দ্র কামাখ্যা ভারতের পূর্ব সীমান্তে স্থিত, সম্ভবতঃ এই কারণেই

তিব্বতী প্রভাব পড়ে। গান্ধর্বতন্ত্রে, তারাতন্ত্রে (১।২), রুদ্র যামলে (১৩ পটল), বিষ্ণু যামলে (১-২ পটল), মহাচীন তিব্বতে পঞ্চ-মকার বিশিষ্ট পূজা বিশিষ্টদ্বারা কৃত হয় ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই উল্লেখ দ্বারা তিব্বতী প্রভাবের কথা স্বীকার করা যায়। এই পঞ্চ তত্ত্ব অস্তুর্যোগ বিশিষ্ট। এই মংস্র মাংস আহারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কৌল দ্বিবিধ—‘উত্তরকৌল’ ও ‘পূর্বকৌল’। পূর্বকৌল শ্রীচক্রে স্থিত যোনিপূজা করেন, উত্তরকৌল ইহার ও অন্তর্মুদ্রার প্রত্যক্ষ সাধন করেন, তাই সমাজে এই বামাচার নিন্দনীয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্বকৌলের সাধনা অসম্ভব কিছু নাই।^১ কোলাচারের অতিরিক্ত শ্রীবিচার উপাসক ‘সময়াচারী’ নামে বিখ্যাত, শঙ্কর এই মতানুসারী ছিলেন, ‘সময়’ অর্থে হৃদয়াকাশে চক্রভাবনা দ্বারা পূজা বিধান বা শিব শক্তির সামরস্র সাধন। লক্ষীধর সময়মার্গী ছিলেন, তিনি কৌলমার্গের নিন্দা করিলেও কৌল ও সময়মার্গে নিতাস্ত্র ঘনিষ্ঠতা আছে, যিনি পরমকৌল তিনি সত্যকার সময়মার্গী। লক্ষীধরের বর্ণনা অনুযায়ী আধারচক্র বা যোনির প্রত্যক্ষ রূপে পূজাকারী ‘কৌল’ ও ভাবনাকারী ‘সময়মার্গী’। অতএব সময়মার্গে অস্তুর্যোগকে মহত্ব দেওয়া হয় ও পঞ্চমুদ্রার অনুকল্প ব্যবহার সমর্থিত হয়। ভাস্কর রায় ললিত সহস্রনাম ভাষ্যের প্রথমেই ‘কুল’ শব্দের অর্থ দিয়াছেন ‘মূল্যধার চক্র’ “কুঃ পৃথিবীতত্ত্বং লীয়েতে যশ্মিন্ তদাধারচক্রং কুলম্” ইহার ত্রিকোণ বা যোনিও সংজ্ঞা। ভাস্কর রায় ‘কুল’ শব্দে আরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—“কুলঃ সজ্জাতীয়সমূহঃ। স চ একঃ বিজ্ঞানবিষয়-স্বরূপঃ স্বজ্জাত্যাপন্ন জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানরূপত্রয়াস্বকঃ। ততঃ সা ত্রিপুটী কুলম্।”^২

যে সাধকের পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে তিনিই কৌল। তাহা হইলে সাধকের অভিন্নত্ব জ্ঞান হয়, যথা—

কর্দমে চন্দনেহভিন্ন পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।

শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।

ন ভেদো যস্ত দেবেশি। স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

(ভাবচূড়ামণিতন্ত্র)

এই কৌল সাধনা বেদাগম মহোদধির সার স্বরূপ। এই সাধন

১।* ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায় পৃ ২০৬

২। এ. এ. পৃ ২০৪-০৫, ২০৬।

গুপ্ত বলিয়া কোল বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করেন না। নিম্নলিখিত শ্লোকে কোলের যথার্থ বর্ণনা আছে,—

অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ ।

নানারূপধরাঃ কোলা বিচরন্তি মহীতলে ॥^১

বৈদিককাল হইতেই তন্ত্র সাধন প্রচলিত কিন্তু ইহা সর্বদা গোপনীয় ছিল। সর্বসাধারণে বৈদিক পূজা করিতেন, তান্ত্রিক পূজার অধিকারী অল্প ব্যক্তি ছিলেন। উপনিষদে বর্ণিত বিভিন্ন বিজ্ঞার আধার ভিত্তি তান্ত্রিক বলিয়া প্রতীতি হয়। বৃহদারণ্যক (৬২) ও ছান্দোগ্য (৫৮) বর্ণিত পঞ্চাগ্নি বিজ্ঞার প্রসঙ্গে ‘যোষা বা গৌতমাগ্নিঃ’ আদি রূপকের অর্থ কি? ছান্দোগ্যের (৩১—১০) মধু বিজ্ঞার রহস্য কি? সূর্য্যের উর্দ্ধমুখী রশ্মি সকল মধুনাড়ী, গুহা আদেশ মধুকর, ব্রহ্মই পুষ্প, ইহা নিঃসৃত অমৃত সাধা নামক দেবতা উপভোগ করেন, এই পঞ্চ অমৃত বর্ণনে যে গুহা আদেশকে মধুকর বলা হইয়াছে ইহা গোপনীয় তান্ত্রিক আদেশ ভিন্ন অপর কি হইতে পারে? অতএব উপনিষদের সময়েও তন্ত্রের গুপ্ত প্রচলন ছিল বলা যায়। তান্ত্রিক উপাসনা অদ্বৈতবাদের উপর স্থাপিত। তন্ত্রের শক্তি-কল্পনা বৈদিক। ঋগ্বেদের ‘বাগন্ত্বী সূক্ত’ (১০।১২৫)তে শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ আছে, তন্ত্রের ক্রিয়ামার্গের উপাসক নিজ উপাস্ত্রের সহিত তাদাত্ম্য স্থাপিত করেন, ‘দেবোভূতা যজ্ঞেদেবম্’—ইহাই লক্ষ্য। তন্ত্রের পরমতত্ত্ব মাতৃরূপা। কলিযুগে (বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ,—মহানির্বাণ) তন্ত্রবিনা গতি নাই। আগম সপ্তলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ যথা—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চন, সর্বসাধন, পুরশ্চরণ, ষট্কার্য (বশীকরণাদি), সাধন ও ধ্যানযোগ। বেদের জ্ঞানই তন্ত্রের ‘ক্রিয়াত্মক’ রূপ, কতিপয় তন্ত্রের মূল ভিত্তি বেদে, যথা পঞ্চরাত্র, শৈবাগম ইত্যাদি। শারদাতিলকের ভাষ্যকার রাঘবভট্ট তন্ত্রকে ‘স্মৃতি’ বলিয়াছেন। বেদের তৃতীয় কাণ্ড উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত ‘তন্ত্র’। মনু স্মৃতির (২।১) টীকাকার কুল্লুকভট্ট হারীত ঋষির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—শ্রুতি দ্বিবিধ, বৈদিক ও তান্ত্রিক। ভাস্কর রায় তন্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়াছেন। বেদ ও তন্ত্র উভয়ই শিব হইতে উৎপন্ন। বেদ উচ্চবর্ণের জন্ত, তন্ত্র সর্ববর্ণের জন্ত উদ্ভূত।^২

১। কোলমার্গ রহস্য, সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ পৃঃ ১০-২০।

২। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃঃ ২০২।

৩। ঐ ঐ বলদেব উপাধ্যায়, পৃঃ ২০৭ তন্ত্রের প্রামাণিকতা।

শাক্তের সপ্তবিধ আচার মধ্যে ‘বামাচার’ মাত্র অবৈদিক। শাক্তের বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবাপন্ন অবিজ্ঞাযুক্ত সংসারাবদ্ধ জীবের জন্ত, বাম ও সিদ্ধান্ত আচার বীরভাবাপন্ন অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞানের কণামাত্র আশ্বাদনে কৃতকার্য সাধক বা বীরের জন্ত এবং একমাত্র ‘কৌলাচার’ দিব্য ভাবাপন্ন সাধকের জন্ত প্রবর্তিত হইয়াছে। দ্বৈতজ্ঞান লোপ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে স্থায়ী সত্তা উপাস্তুর সত্তায় নিমজ্জিত করিয়া যে অদ্বৈতানন্দে মগ্ন থাকে সেই সাধক দিব্য সাধক। শাক্তমতের ‘তিন ভাব’ ও ‘সপ্ত আচারে’র মধ্যে কঠিনতম ভাব ও আচার ‘দিব্য’ ও ‘কৌল’ ইহা নাথসম্প্রদায়ের অনুমোদিত, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

“কুঃ পৃথিবীতন্ত্বং লীয়তে যত্র তৎ কুলং আধারচক্রং
তৎ সন্থকালক্ষণয়া সুষুম্না মার্গোহপি।”

অতএব ‘কুল’ অর্থে সুষুম্নামার্গ বা যাহাতে পৃথিবীতন্ত্ব লীন হয় সেই আধারচক্র। এবং ‘কৌল’, ‘কুল’, ‘অকুলে’র সন্থক যথা—

কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তম্, অকুলং শিব উচ্যতে

কুলেহকুলেহস্ত সন্থকঃ কৌলমিত্যাভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্তুকে ‘কৌল’ বলে। আর কুলে যুক্ত দেবীকে কৌলিনী বলে।^{১১}

নিরন্তর পথে পঞ্চ-মকার লইয়া সাধন যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। গুরু উপদেশে ঘৃণালজ্জাদি অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া বাসনাকে উর্দ্ধমুখী করিতে হয়, ভেদজ্ঞান দূর করিতে হয়। অশানবাসী যোগী হইয়া অষ্টাদি যোগ সাধন করতঃ কৌলাচারী হওয়ার অধিকারী হওয়া যায়, এই সময়ে সাধকের সোহংভাব, দিকাল বিচার, ভেদাভেদ বা মানাপমানের প্রতীতি থাকে না। বিশ্বসারতন্ত্রে কৌলের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

দিকালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।

নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্ত সাধনে ॥

কচিৎ শিষ্টঃ কচিদ্রষ্ট, কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।

নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥

কৌলের অন্তরে বাসনা কামনা ক্ষয় হইয়া মহাকালী বাস করেন,

এক জীবনে কোল না হইলেও পূর্ব সাধনা বুঝা যায় না, কোলাচারে উপনীত হইলে মোক্ষলাভ হয় ইহা গীতাতেও আছে।^১

মন্ত্রশাস্ত্রকে সাধারণতঃ তন্ত্র বলে। মন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিবিধ ভাব ও সপ্তবিধ আচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাব—দিব্য, বীর ও পশু। আচার—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কোল। বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান ভাব দ্বারা করিলে ফললাভ অবশ্যস্বাভাবী। রুদ্র যামলতন্ত্রে আছে—

ভাবেন লভ্যতে সর্বং ভাবেন দেব দর্শনম্।

ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ ভাবাবলম্বনম্ ॥

ভাব দ্বারাই সর্বপ্রকার লাভ হয়—দেবদর্শন, পরমজ্ঞানলাভ ইত্যাদি। অতএব উপযুক্ত ভাবালম্বনে কৰ্মবিধি মহানির্বাণ তন্ত্রের ৪র্থ উল্লাসে আছে। যাহার যে প্রকার ভাব ও সাধনে অধিকার সে তাহার অনুকূল অনুষ্ঠান করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে। ভাবচূড়ামণি তন্ত্রেও আছে—

বহুজপাং তথা হোমাং কায়ক্লেশাদি বিস্তরৈঃ।

ন ভাবেন বিনা দেব যন্ত্রমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ ॥

ভাবচূড়ামণি, সময়চার, কুমারীতন্ত্র, জ্ঞানদীপ, বিশ্বসার, সর্বোচ্চাস, কামাখ্যা কুঞ্জিকা, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে ত্রিবিধ ভাবের উল্লেখ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে দিব্যভাব উত্তম, বীরভাব মধ্যম, পশুভাব অধম। রুদ্রযামলের ষষ্ঠ পটলে আছে প্রথমে পশু, পরে বীর ও তৎপরে ক্রমশঃ দিব্য ভাব অবলম্বনীয়। অতএব মনে হয় ক্রমশঃ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণাধিক মনোভাবের দ্বারা সাধনার কথা বলা হইয়াছে। একভাব অগ্ন্য ভাবের হেতু, পশু হইতে বীর, বীর হইতে দিব্যভাব হয়। দিব্যভাবে স্থিতসাধক বিশ্ব ও দেবতায় ভেদ দেখেন না।

ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত সপ্ত আচারের কথা বিশ্বসার তন্ত্রে ও অগ্ন্য তন্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্রের ২য় উল্লাসে আছে—

সর্বোভ্যশ্চাস্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।

বৈষ্ণবাত্তমং শৈবং শৈবাদ্ দক্ষিণমুত্তমম্।

দক্ষিণাত্তমং বামং বামাং সিদ্ধান্তমুত্তমম্।

সিদ্ধান্তাত্তমং কোলং কোলাং পরতরং ন হি।

পশুভাব মধ্যে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার ;
বীরভাব মধ্যে—বামাচার ও সিদ্ধাস্তাচার ;
দিব্যভাব মধ্যে—কৌলাচার শ্রেষ্ঠ ।

কুলাচারে প্রবৃত্ত সাধক পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী । তাঁহার পঙ্ক ও চন্দন, পুত্র ও শত্রু প্রভৃতিতে ভেদ নাই । তিনি সর্বভূতে নিজ আত্মাকে ও নিজ আত্মায় সর্বভূতকে দেখেন ।^১

পূর্বে যে—ন ভেদো যস্ত দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ ।

চিস্তয়েদাত্মনাত্মানং সর্বত্র সমদৃষ্টিমান্ ॥

বলা হইয়াছে,—নাথ সিদ্ধদেরও ইহাই লক্ষ্য । নাথদেরও ‘কৌল’ বলিত ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল কাব্য নাটকাদি পাওয়া যায় তাহাতে কৌল বা ভৈরবের বিবরণ পাওয়া যায় । কর্পূরমঞ্জরী, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, মালতীমাধব, প্রভৃতি গ্রন্থে কাপালিকের বর্ণনা পাওয়া যায় । সে সময় কৌলেরা সমাজে নিন্দনীয় ছিলেন না, এই সকল গ্রন্থ হইতে ইহা অনুমান করা অসম্ভব হইবে না ।

ভাব মানস ধর্ম, আচার তাহারই বহিঃপ্রকাশ । পশ্বাচারে পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্পের ব্যবহার আছে । বীরভাব মধ্যে দক্ষিণাচার, বামাচার ও সিদ্ধাস্তাচার আছে অর্থাৎ বীরাচার-সাধক প্রথমে নিজকে শিব ভাবিয়া শক্তির পূজা করেন, পরে নিজকে শক্তি মনে করিয়া শক্তির পূজা করেন ও সর্বশেষে শিবের সহিত অদ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠা করেন । ইহার উর্দ্ধে দিব্যাচার, তখন সাধকের সকল ভাববর্জিত অবস্থা হয়, এবং তিনি ‘কৌল’ নামে পরিচিত হন । তখন তাঁহার পক্ষে কোন নিয়ম বা বন্ধন থাকে না ।

নিগম তত্ত্বে আছে—

কৌলানাং নিয়মো নাস্তি নিষেধস্ত বিধেঃ শিবে ।

দিব্যানাক্ত তথা জ্যেয়ং মুক্তিমাত্রং বিভেদকম্ ॥৪॥

দিব্যানাং তেজসি ভাবে ভাবাতীতং প্রকাশিতম্

তেজঃ স্তাৎ পরমাণুশ্চ সর্বব্যাপিনিরঞ্জনম্ ॥৫॥

কৌলানাঞ্চ তথৈবোক্তমভাবে ভাববর্জিতং ।

প্রসঙ্গাৎ কথয়ামাশু দিব্যাস্ত্রাপি চ লক্ষণম্ ॥৬॥^২

১। ভাব ও আচার, অটল বিহারী ঘোষ, কল্যাণ শক্তি অঙ্ক ।

২। সর্বোত্তম তত্ত্ব, রাসমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত বস্তুতমোদাস ৪-৬ পৃষ্ঠা ।

ইহা হইতে কৌলের পক্ষে কোন নিয়ম নাই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দিব্যাচারীর জ্ঞান তেজে পর্য্যবসিত হয়, তাহাদ্বারা সমগ্র জগৎ স্বীয় উপাস্ত্র দেবতার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে এবং সাধক এমন একটা স্তরে পৌছান যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ে ভেদ থাকে না।

‘রহস্য-পূজাপদ্ধতি’তে কৌল এবং চক্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

কৌলতন্ত্রে — বিনামাংসৈবিনামংস্তৈর্নানার্চ্ছয়েৎ পরদেবতাং
নিরামিষার্চ্ছনাদেব্যা বীরোহপি পশুতাং ব্রজেৎ।

অতএব পঞ্চতত্ত্ব বিনা পূজা নিষ্ফল। রাত্রিতে রহস্য পূজা বিধি অর্থাৎ গোপনে আচার বিধি, দিবসে পূজা করিলে গোপনে করিতে হয়। মহারাত্রিতে পূজা ফলদায়ক, পঞ্চতত্ত্বের অভাবে অনুকল্প দ্বারা কার্য্য বিধেয়, কিন্তু কৰ্ম্মলোপ করা নিষেধ। ‘স্বশক্তি উপযুক্ত’ হইলে তাহাকে লইয়াই সাধন বিধেয়, নহিলে অন্য শক্তি গ্রহণে জ্ঞাতি বিচার করা নিষিদ্ধ। শক্তি হইবে সুরূপা, তরুণী, অলোলুপা, সুশীলা, শঙ্কাহীনা। চক্রানুষ্ঠানে প্রথমে বিজয়া নিবেদন বিধি, তুলসী বিজয়ার নামান্তর অর্থাৎ সঙ্কেত। চক্রানুষ্ঠানে আটজন ও তাহাদের আটটি শক্তি, মোট ষোল জনের আবশ্যক। পাষণ্ড, মূর্খ ও পামরের সহিত অনুষ্ঠান অবিধেয়, যে সকল কৌল মদ্যপানাসক্ত, স্ত্রীলোলুপ, নিজকৰ্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট, কুলশাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোককে প্রতারণা করে ও পানভোজনলুপ্ত তাহাদিগকে পাষণ্ড বলে। কুলজ্ঞানহীন ব্যক্তি মূর্খ, যে ব্যক্তি অশ্রের বাক্য অবহেলা করে ও আপনার বুদ্ধিকে প্রশস্ত বলে সে পামর।^১

‘তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ’ গ্রন্থে পঞ্চ তত্ত্বের ব্যাখ্যা এইরূপ আছে—
ব্রহ্মরক্ত হইতে যে সুধা অনবরত ক্ষরিত হইতেছে তাহাই মণ্ড, মাংস অর্থে বাক্যসংঘম অর্থাৎ ‘মা’ শব্দ দ্বারা রসনা ও তাহার অংশ বাক্য বুঝায়, সেই বাক্য ভক্ষণই মাংস ভক্ষণ এবং

“গঙ্গায়মুনয়োর্মধ্যে মংস্তৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।

তৌ মংস্তৌ ভক্ষয়েদ্ যন্তু স ভবেন্মংস্ত্রসাধকঃ ॥”

অর্থাৎ গঙ্গায়মুনা বা ইড়াপিঙ্গলার মধ্যে রজঃ ও তমঃ দুই মংস্ত্র চলিতেছে, তাহাদের যে ভক্ষণ করিতে পারে সেই যথার্থ মংস্ত্র-সাধকরূপে গণ্য।

১। রহস্য পূজাপদ্ধতি, জগমোহন তর্কালঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্র নাথ তত্ত্বরত্ন কর্তৃক সংকলিত পৃ ৫, ১০।

তৎপরে 'মুদ্রা'—সহস্রার মহাপদ্মে কর্ণিকার মধ্যে শ্বেতবর্ণ পারদের
 ছায় চন্দ্রসূর্য্য হইতেও জ্যোতিমান অতীব কোমল স্নিগ্ধ কুণ্ডলিনী রূপ
 আত্মা বিরাজ করেন, তাহাকে যে জানিয়াছে সেই ব্যক্তিই মহান্ প্রাজ্ঞ
 মুদ্রার সাধকরূপে বিদিত। তৎপরে 'মৈথুন'—ইহার নাদ বিন্দুযোগ
 বা শিব-শক্তির মিলন সাধন, আত্মা ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির এই মিলনে
 যে সাধক রত সেই মৈথুনের সাধক।^১ অনেকে তত্ত্বকে কামশাস্ত্র
 বলিয়া ভ্রম করিবার জন্ত শক্তিসাহিত্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে। শাক্তধর্মের
 ধ্যেয় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, ব্যক্তির সহিত সমষ্টির অভেদ সিদ্ধি।
 তাত্ত্বিক উপাসনার লক্ষ্য উপাসক-উপাস্ত্রের সহিত তাদাত্ম্য স্থাপন,
 অতএব ইহা অন্তর্যোগ। ষড়্‌দর্শনের ছায় তত্ত্বেরও পঞ্চদর্শন আছে,
 (দেবীভাগবত, নীলকণ্ঠ টীকা, পৃ ৩, টীকা ৪।১৫।১২)। বেদান্তের
 সিদ্ধান্তের সহিত তত্ত্বের দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আছে। পুরাণে
 ও উপপুরাণেও শক্তি বা পরমেশ্বরী পরব্রহ্মের সহিত অভেদ কল্পিত
 হন। (উক্ত টীকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য ; হরিচরণ বসুর সংস্করণ পৃ ২৯)।
 'সর্ব্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম' শাক্তকেও এই ভাবনা বন্ধমূল করিতে হয়। ইহাতে
 আত্মসংযম আছে, ইহা সত্য যে পঞ্চ-মকার বা ষড়্‌বিধ অভিচার অনুষ্ঠান
 বিধি থাকিলেও ইহা মাত্র কৌলমার্গেই প্রচলিত। ব্রাহ্মণাদির নিমিত্ত
 প্রতীক পূজাই বিধি, উপরে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।
 'শ্যামপ্রদীপ' গ্রন্থে ইহার বিবৃতি আছে। পরানন্দ সম্প্রদায়ে পঞ্চবলিও
 নিষেধ আছে, (G. O. S. পরানন্দ সূত্র, পৃ ২৩)। কুলার্ণব তত্ত্বে আছে,
 কৌলমার্গে গমন শাণিত খড়্গের উপর গমনাগমনের ছায়, সর্প
 বা ব্যাঘ্র লইয়া ক্রীড়া করা হইতেও ইহা ভীষণ (২।১২২)। যাহাদের
 মনে বিকার নাই, পঞ্চ-মকারের বিধান মাত্র তাহাদের জন্ত। ইহারাই
 বীর, তাই কৌলমার্গ যোগীর পক্ষেও দুর্গম। ইহাতে সাধকের ভোগের
 দ্বারা সিদ্ধি লাভের কথা আছে, ত্যাগের দ্বারা নয়, কিন্তু ইহাতে আছে
 'পূর্ণ আত্মসংযম', অতএব ইহা কামশাস্ত্র নহে।^২

তত্ত্বে চক্রের সাধনে মাতঙ্গিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা
 সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর, তাত্ত্বিক সাধনায় ইহাদের আবশ্যকতা আছে।
 খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে তত্ত্বের সাধন আরম্ভ হইয়া, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে

১। তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, পৃ ১২, ১৩ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। শাক্তধর্ম, চিত্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃ ৫১২ কল্যাণ, শক্তি অঙ্ক।

ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া ৯ম ও ১০ শতাব্দীতে সাধনের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয় এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। রাজশেখরের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় কোলজ্ঞান সাধারণো সুপরিচিত ছিল। কর্পূরমঞ্জরী মধ্যে ভৈরব বা কোলের নিন্দা নাই, তৎকালে কোলাঙ্গনার বিশেষ আদর তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দেখা যাইত। তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীর গুহ্য সমাজ নামক বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থেও শিষ্যের প্রজ্ঞাভিষেক অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা শক্তি বরণের কথা আছে। সাধক বৈষ্ণৱ, চণ্ডাল বা শূদ্রকন্যা প্রজ্ঞারূপে গ্রহণ করিতেন, গুরু ইহার সহায় থাকিতেন।^১ তন্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃঃ ৯৪৯ এ সোমদেব রচিত 'যশস্তিলকচম্পু'তে ভাস বর্ণিত বীরাচারের প্রতি বিক্রপের উল্লেখ আছে, যথা—

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষণীয়ং

গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতৌ বিকৃতশ্চ বেশঃ।

যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গং

দীর্ঘায়ুরন্তু ভগবান্ স পিনাকপাণিঃ। (আশ্বাস ৫)।

খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত মহেন্দ্র বিক্রমের 'মন্তবিলাস প্রহসনেও' উক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়; বামমার্গের জনৈক কাপালিক বর্ণন প্রসঙ্গে উহা উক্ত হইয়াছে, সম্ভবতঃ পূর্বতন কবি ভাসের নিকট তিনি ঋণী।

উক্ত সোমদেবের 'নীতিবাক্যামৃত'র টীকায় নারদ বর্ণিত কোলাচারের নিন্দা আছে।

এই দুইটি সূত্র হইতেও হিন্দুতন্ত্র বা কোলাচার যে খৃষ্টীয় ২য়, ৩য় শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল এবং উহা বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।^২

পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধ ও জৈন সাধনার মধ্যেও তন্ত্রের বীরাচারের প্রবেশ ঘটে। বৌদ্ধতন্ত্রের আদিগ্রন্থ 'গুহ্যসমাজতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রজাল বৌদ্ধনীতির বিরুদ্ধ এবং উহা অংশত গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। 'শক্তি' নির্বাচনেও জাতিবিচার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে।^৩ অসঙ্গের সময় হইতে (খৃঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী) বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রবেশলাভ হয়।

১। Magic & Miracle in Jaina Literature, Kalipada Mitra, p. 34, 35.

২। সর্বোদাসতন্ত্র, ভূমিকা, পৃ ১২ নীলেশ ভট্টাচার্য।

৩। G. O. B. গুহ্য সমাজতন্ত্র, পৃ ২৪১২৫

তান্ত্রিক গ্রন্থে “একাকী ভোগরহিতো নারীং গচ্ছৎ” বা “নির্বিকারেণ কামিনীমধ্যে জপকরেৎ” প্রভৃতি বাক্য আছে, ইহা ব্যতীত বীরভাবের সরলভাবেই উল্লেখ আছে। প্রশ্ন হইতে পারে ব্রহ্মজ্ঞানেই যদি সমাধিলাভ সম্ভব হয়, তবে বীরভাবের এই ভয়াবহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায়, শাক্ত সম্প্রদায় ‘শক্তি’কে চরমসত্তা রূপে নির্দেশ করেন নাই, তাঁহারা অদ্বৈতবাদীদের পরব্রহ্মের স্বরূপের স্থায় এক চরমসত্তা স্বীকার করিয়াছেন, প্রভেদ এই যে সৃষ্টিকে তাঁহার খেলারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ ‘ব্রহ্মখেলা জগৎ সর্বং, খেলার্থং হি পরংব্রহ্ম সাকারো হি যুগে যুগে’। ব্রহ্মজ্ঞান চরমলক্ষ্য প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ, দেহান্তে ব্রহ্মের সহিত মিলনই লক্ষ্য, ‘দেহান্তে ব্রহ্মভাক্ ভবেৎ’ ইহা প্রকৃতির জ্ঞান বিনা হয় না। নিত্যাপ্রকৃতি ত্রিবিধরূপে ব্যক্ত,—মানবদেহে সূক্ষ্মরূপে, বিবিধ বর্ণ মধ্যে জ্যোতিরূপে এবং নারীতে স্থূলরূপে।^১ তান্ত্রিক সাধক এই ত্রিবিধরূপের সামঞ্জস্য সাধনে রত। ‘সেকোদ্যেশ’ গ্রন্থের টীকায় শিষ্যের মুদ্রা সাধন মধ্যে গুহ্য, কুস্ত ও প্রজ্ঞাভিষেক বা কৰ্ম, জ্ঞান ও মহামুদ্রা সাধনের কথা আছে।^২

স্বীয় পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি তান্ত্রিক সাধনের উৎকর্ষ। ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তঃপূজার মূলেও এই পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সাধন আছে। গুরুই শিব-শক্তির প্রতীক, তিনিই সাধনের পথপ্রদর্শক। গুরুর নির্দেশে অন্তঃপূজা ও বহিঃপূজার সংশ্লেষণ কর্তব্য। বীরাচারের মূলকথা এই যে অন্তঃপূজার পূর্ণত্বের নিমিত্ত বাহ্যপূজার প্রয়োজন। যে সাধক স্বীয় আন্তরজ্ঞানের দ্বারা বাহ্য সকল বস্তুকে বিশুদ্ধ বোধ করিতে পারে, মাত্র তাহারই বাহ্যপূজার অধিকার আছে। ‘কেবলী’ বা কেবলানন্দলুক্ক সাধকের পক্ষে বাহ্যপূজা হইতে অব্যাহতির বিধি আছে। তাঁহারা স্ব-সাধনে মগ্ন হইয়া থাকেন। তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে অধিকারী ভেদ আছে, কিন্তু জাতি বা ধর্মের বিচার নাই।

তান্ত্রিক সাধনে ‘যন্তের’ ব্যবহার প্রচলিত, ইহা বৈদিক অনুষ্ঠানের স্থায় নহে। বৈদিক অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট পদ্ধতির সূক্ষ্মতম নিয়ম পালনে সাধক রত থাকায় যজ্ঞেশ্বরের সন্ধান পাওয়া অর্থাৎ প্রকৃত আত্মার উপলব্ধি করা সাধকের পক্ষে দুষ্কর হইত। উপনিষদ পরমাত্মার সন্ধান

১। সর্বোদ্যোগতঃ, উদ্যোগ ৩০।২৩, ৩২।২৭ ইত্যাদি।

২। G. O. S. নারোপা বিরচিত, সেকোদ্যেশ টীকার ভূমিকা পৃ ২০।

দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিবার নির্দেশ দেন নাই।
 তান্ত্রিক এই উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন করিলেন শক্তিকে অভিব্যক্ত করিয়া,
 ইহা দ্বারা উপাসনার মধ্যে যে প্রাণের সঞ্চার হইল, তাহা দ্বারা ভারতের
 সর্বজাতির ও সর্বশ্রেণীর সাধকের মিলিত হইবার সুযোগ হইল।
 এইখানে বৈদিক অনুষ্ঠান বা ঔপনিষদিক উপাসনা হইতে তান্ত্রিক সাধনের
 শ্রেষ্ঠত্ব, তাই বীরাচারের অনুষ্ঠান সাধারণের নিকট ভীতিপ্রদ মনে
 হইলেও, তান্ত্রিক সাধকের প্রেয়।

(গ) ভারতের মধ্যযুগের রহস্যবাদীদের সাধনার সহিত নাথ সাধনার সম্বন্ধ বিচার।

ভারতের ধর্মজগতের বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রসূত যে সকল ধর্মের
 উদ্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি যোগসূত্র বিद्यমান আছে।
 ইতিহাসের পৃষ্ঠা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সহিত ধর্মজগতের যোগাযোগের সাক্ষ্য
 প্রদান করিতেছে, কালের নিশ্বাস হস্তে বহু মন্দির ও মসজিদ বিনষ্ট
 হইয়াছে, তথাপি ভারতের চিন্তাধারার বিশিষ্টতা লোপ পায় নাই,
 তাহার ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধর্মের মধ্য দিয়াই বহু যুগ হইতে সমভাবে
 প্রবাহিত হইতেছে। এই কারণে মধ্যযুগের রহস্যবাদী সন্ত ও সুফীদের
 সহিত নাথদের সাধনার তুলনা করিলে একটি যোগসূত্র যতই ক্ষীণ হউক
 না কেন, লক্ষিত হয়। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হইলেও, ইহাদের মধ্যে
 সাধনাগত ঐক্য আছে। প্রাচীন যুগের পাতঞ্জল, বৌদ্ধ, জৈনাদি
 সম্প্রদায়ের যোগসাধনা সুবিদিত, নাথ, সন্ত ও সুফীদের সাধনার
 অন্তরালেও এই ‘যোগ’ সুস্পষ্ট বিद्यমান। সন্ত কবীরের উপদেশে
 বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ভক্তির সহিত বেদান্তের তত্ত্বমসির অপূর্ব মিশ্রণ আছে,
 তৎসহ নাথযোগের অনুরূপ সাধন কথাও আছে। নাথযোগে সুফী ও
 সন্ত সাধনার অনুরূপ প্রেম বা ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলেও নাথ,
 নিরঞ্জন ও সন্তমতের ঐক্য আছে। সন্তদের মধ্যে ‘সাধ’ শ্রেণী নাথগুরু
 গোরক্ষনাথের পূজা করেন, কবীর-গোরক্ষের মিলন-কথাও ধর্মজগতে
 প্রচলিত আছে, দাদুও গোরক্ষনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

দিনাজপুরের বালিয়াদীঘির ফকীরদের সাধনামধ্যে সুফী ও
 নাথযোগীদের সাধনার মিশ্রণ দেখা যায়।^১

কথিত আছে, সন্তকবি কবীর জাতিতে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। আবার গোরক্ষ-শিষ্য বাবা রতন হাজিও বলিয়াছেন : “হিন্দু মুসলমান উভয়ে খোদার ভূতা, আমরা যোগী—কাহারও মধ্যে ভেদ দেখি না”, ইহা দ্বারা সন্ত-সম্প্রদায়ের কবীরের সহিত নাথপন্থীদের যোগাযোগ নির্দেশিত হয়। মধ্যযুগের সাধকেরা সকলেই একটি পথ নির্দেশ করিবার চেষ্টার ফলে প্রাচীন বৈদিক ধর্মসহ জ্ঞান ও ভক্তির ধারা, শ্রায়েব বিধান, তান্ত্রিক সাধন যোগীদের সাধন প্রভৃতি ধর্মজগতে উদ্ভূত হয়। নাথযোগীরা উত্তর ভারতে ভর্তৃহরি-সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। তাহারা মুসলমান হইয়াও হিন্দুর শ্রায় গৈরিক ধারণ করিত ও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ গীত গাহিয়া মানব-হৃদয় জয় করিত, হিন্দুর বহু পার্বণে ইহাদের উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। কালক্রমে নাথ ও নিরঞ্জনী সম্প্রদায় হইতে বঙ্গদেশে আউল, বাউল প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। সকল সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি বা জীবাশ্বা-পরমাশ্বায় মিলনসাধন। সুফী সাধকও হিন্দু যোগীর সহিত অদ্বৈতবাদের সূত্রে আবদ্ধ। মুসলমান বিজয়ের পূর্বেও সুফী সাধক মৈনুদ্দিন চিশ্তী, মখদুম আলি প্রভৃতি সুফীধর্ম প্রচার করিয়া হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপন করেন।

নাথযোগীরা বলেন, জীবমধ্যে ঈশ্বরের শুদ্ধচৈতন্যশক্তি অবিচ্ছিন্ন দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই আবরণ দূর হইলে জীব আবার শিব হইবেন। সুফী সাধক মনসুর হালাজ, শিবদয়াল প্রভৃতি সন্ত সাধক বলেন জীবাশ্বা পরমাশ্বার মিলন স্বীকার করিলেও মিলনের মধ্যেও ভেদ অনিবার্য, অর্থাৎ জীব জীবই এবং ঈশ্বর ঈশ্বরই, ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ শূন্য মিলন হইতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজও এই কথা বলিয়াছেন। সমুদ্রের একবিন্দু জলেও যেক্রপ সেই জলের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সমুদ্র ও একবিন্দু জলে যেক্রপ পরিমাণগত ভেদ আছে, সেইরূপ জীবাশ্বা ও পরমাশ্বা অভেদ হইলেও তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে, জীবাশ্বা পরমাশ্বার ‘অণু’রূপ মাত্র। তথাপি জীবাশ্বা ও পরমাশ্বার যোগ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। সুফী সাধক বোগদাদের জুনিয়াদ ও মনসুর হালাজ ‘অনল হক্’ বা সোহহা উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন। কবীর একদিকে

রামানন্দের চরণে বেদান্ত শিক্ষা করেন, আবার শেখ তাকীর নিকট সুফী ধর্ম ও শিক্ষা করেন, তাই মুসলমান হইলেও কবীরের সাধনায় বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও প্রেম আছে। কবীরের রাম কোন অবতার বিশেষ নহেন, রাম বা গোপাল অর্থে তিনি সেই চরম সত্যকে নির্ণয় করিয়াছেন। সন্তেরা মূলতঃ অদ্বৈতবাদী, ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকিলেও কেহই দ্বৈতবাদী ছিলেন না। ভারতের মধ্যযুগে সন্ত সাধনার বিকাশ, ধর্মজগতে তাহাদের সাধনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ উহা বলভাদির দ্বারা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত নহে, উহা 'সুরত' বা স্রোতের দ্বারা মাত্র। যিনি সংকে উপলব্ধি করিয়া সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই সন্ত। কবীরাদি মূর্ত্তি উপাসক ছিলেন না তাই ইহাদের 'নিগুণী' বলা হয়, নিরঞ্জন উপাসক 'নিরঞ্জনী', এই সম্প্রদায় নাথ-সম্প্রদায়ের প্রসার, ডাঃ পীতাম্বর বড়খাল এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা নাথ ও নিগুণ সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় বিশেষ, কারণ নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইতে অবতারাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও ইহারা তাহাদের পূজা করেন না। কবীর, কামাল, দাদুর দর্শনের সহিত ইহাদের দর্শনের অপূর্ব্ব মিল দেখা যায়; রামানন্দকে এই পথের প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। সন্তদের মূলগত সিদ্ধান্ত তিনটি,—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, পরমাত্মা জীবাত্মার স্বরূপগত একতায় বিশ্বাস, আত্মার নিত্যতা ও মোহহঃ সাধনায় প্রত্যয়। কবীরাদি সন্তেরা 'সুরত' শব্দ যোগের দ্বারা মিলন স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন।

ধ্বনি দ্বারা আমরা ভাব ব্যক্ত করি, তাই সন্ত কবির। অন্তর-ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। কারণ নিরঞ্জনকে যে উপলব্ধি করিয়াছে সে মুক ও বধির উভয়ই, মুকের দ্বারা সে মিষ্ট ভ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ইন্দ্রিতে সুখ বর্ণনা করে। সাজাহান-পুত্র দারা সেখ রচিত 'রিসালা-ই-হক্‌নামা' পুস্তিকায় সত্যের অনুসন্ধান ও তৎপরে ধ্যান, নামস্মরণ ও অনাহত-নাদশ্রবণের দ্বারা মিলনসাধন সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

এই সুরত শব্দযোগ বস্তুতঃ কবীরাদির বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। নাথমার্গে ইহার বিশেষ সাধন ছিল, তাহারা ইহাকে 'অজপাজপ' বলিতেন। নাথপন্থের গ্রন্থাদিতে অজপাজপের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। যোগমার্গের নাদানুসন্ধানই সন্তদের 'অনহদ নাদ'—এই নাদকে আশ্রয় করিয়াই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায়, ইহাই উভয় মার্গের বৈশিষ্ট্য।

চিত্তবৃত্তিকে শব্দে বা মস্ত্রে লয় করিবার উপদেশ প্রাচীন যুগ হইতেই বর্তমান রহিয়াছে, ইহারই নামান্তর 'মন্ত্রচৈতন্য'। মন্ত্র বা নামজপের মাহাত্ম্য অতুলনীয়, ইহার সাহায্যে অসম্প্রজাত সমাধিতে সহজে লীন হইবার সূচনা বিভিন্ন উপনিষাদিতেও পাওয়া যায়।^১

উপনিষদে প্রণবের প্রশস্তি আছে, নাথমার্গে প্রণব সাধনার বিশিষ্ট স্থান আছে, সমুদ্রমধ্যেও 'সওনাম' বা সত্যনামের এইরূপ প্রশস্তি আছে। সমুদ্রের সুরত শব্দযোগের দ্বারা নামের পরে যে ভূমিতে পদার্পণ করেন তাহা নিঃশব্দ বা 'অনামীলোক' নামে পরিচিত। কবীর এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“তা পর অকহ লোক হৈ ভাই
পুরুষ অনামী তহা রহাই
জো পহঁচৈ জানৈসে বাহী
কহন শুনন সে দ্বারা হৈ।”

এই অবস্থাই তত্ত্বাতীত অবস্থা, অথবা সহজিয়া সম্প্রদায়ের সহজাবস্থা। সমুদ্রগণ ইহাকে 'বিগম দেশ' অর্থাৎ সুখহুঃখাতীত দেশরূপে আখ্যাও দিয়াছেন। এই অবস্থায় যে সুখের অনুভূতি হয় তাহার নাম নিরতি বা নৃত্য। সুফিরা ভাবাবেশে যে দৈহিক নৃত্য করেন তাহার নাম 'দৌর নৃত্য', তাহারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ সহকারে নৃত্য করেন, কিন্তু সমুদ্রের 'নিরতি' কোন বাহ্যক্রিয়া নহে। সাধকের স্বত্বিলাভ হইলে কোন প্রকার দৈহিক ক্রিয়া নিস্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এই অনুভূতি বর্ণনাতীত, তাই নাথ-সিদ্ধেরা ইহার নাম দিয়াছেন 'উন্মদী' অবস্থা অর্থাৎ মন-হীন অবস্থা। এই উন্মদী অবস্থাপ্রাপ্তিই সুখহুঃখাতীত পরম প্রকাশের মধ্য স্থিতি। সুফীদের 'সমা' বা বামপদমূলে ভর করিয়া চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মিলন-অনুভূতির যে সাধন আছে অর্থাৎ চক্ষু বিনা রূপদর্শন, কর্ণ বিনা স্বরশ্রবণ, পদ বিনা নৃত্য ইত্যাদি ভাবসাধন, তাহা কণিক। কিন্তু সহজ সমাধি বা উন্মদী দশাপ্রাপ্তি স্থায়ী। তাই মীরার গুরু রৈদাস চামার পাছকা সীবনকালেও সম্মুখে চতুর্ভুজ হরিমূর্তি দেখিয়া গাহিতেন :

প্রভুজী—তুম চন্দন, হম পানী। জাকী অঙ্গ অঙ্গবাস সমানী।

প্রভুজী—তুম ঘন বন, হম মোরা। জৈসে চিতবন্ত চন্দ চকোরা।

প্রভুজী—তুম দীপক, হম বাতী । জ্বাকি জ্যোতি বরৈ দিন রাতি ।
প্রভুজী—তুম মোতি, হম ধাগা । জৈসে সোনহি মিলত সুহাগা ।
প্রভুজী—তুম স্বামী, হম দাসা । এসী ভক্তি করৈ রৈদাস ॥

(কল্যাণ, সন্তঅঙ্ক—রৈদাস পৃ ৫০৭)

চিতোরের রাণী মীরাবাই এই প্রেমের আকর্ষণে সকল ত্যাগ করেন, তাঁহার ভজনও হিন্দী-সাহিত্য জগতে অতুলনীয়,—যেমন মর্ম্মস্পর্শী তেমনি গভীর । রাণা বিষ পাঠাইয়া, সর্প পিটারা প্রেরণ করিয়াও কোন রকমে মীরাকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিয়া বিষ গ্রহণ করিলে তাহা অনৃত হইল এবং—

“সাপ পিটারা রাণা ভেজা মীরা হাত দিয়ো যায় ।
নায় ধায় যব দেখন লাগি, শালিগরম গৈ পায় ।”

ইহাই সন্তসাধনার মূলমন্ত্র,—নামজপ বা ‘স্মিরণ’ ; ইহার দ্বারা ই অসম্ভব সম্ভব হয়, মর্ত্যালোকবাসী স্বর্গের আশ্বাদ পাইয়া থাকে । কবীরের দ্বায় অদ্বৈতবাদী দাদু সন্তসাধকদের অশ্রুতম গুরু, রামনাম জপ তাঁহার সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব । এই ‘রাম’ বেদান্তের নিগূর্ণ পরমব্রহ্মের অনুরূপ, তাই তাঁহার মূর্তি বা মন্দির নাই, সন্তসাধনা তাই সকলের পক্ষে শুলভ, ব্যয়সাপেক্ষ বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন ইহাতে নাই । এই নিমিত্ত সন্তমত ইতর-ভেদ সকলের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করে, বিশেষ করিয়া সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন । সন্তদের মধ্যেও যোগীদের দ্বায় কোন জাতিবিচার না থাকায় কবীরকে সমাজ-সংস্কারক আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে ; বস্তুত তিনি সকল ধর্ম্মের সারগ্রাহী ছিলেন এবং সকল জাতির পক্ষে শুলভ সহজ পন্থার নির্দেশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সমাজ-সংস্কারক রূপে তিনি এ সকল করেন নাই । তবে একেশ্বরবাদ প্রচার, জাতিভেদ দূরীকরণ, দেব বা দানবের পূজা নিষেধ, কুরীতি দমন ইত্যাদির উপদেশ তিনি দিয়াছেন । সন্তবাণীতে বৈরাগ্যের ও সংস্কারের ভুরি ভুরি উপদেশ আছে । সদগুরুই একমাত্র পথ-প্রদর্শক । দাদু বলিয়াছেন, ‘দাদু এসা গুরু মিল্যা, জীব ব্রহ্ম করি লেই’ । নাথযোগীরাও বারংবার সদগুরু লাভের উপদেশ দিয়াছেন : “হুর্লভা সহজাবস্থা সদগুরোঃ করুণাং বিনা” । একমাত্র গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ

হয় ইহাই নাথমার্গে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে : “সিদ্ধিগুরুবাক্যোন লভ্যতে।” সুফীসাধকও ‘মুরসিদ’ বা গুরুকে মান্য করিয়া চলেন।

“যা আছে পিণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে” ইহা সকল যৌগিক সম্প্রদায়ের মত। পারস্য লেখক মুহম্মদ-অল-নসফী ইহার অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।^১ এই ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডে বিশ্ব প্রতিভাসিত হইয়া আছে, ইহাই ইহার তাৎপর্য (সি, সি, স, ৩১২)। শরীর মধ্যে আধ্যাত্মিক কয়েকটি কেন্দ্র আছে, সমুদয়ের সান্নিধ্যিক ভাষায় তাহাকে ‘কবল’ (কমল) বলে, তাত্ত্বিক সাধনে ইহাকে ‘চক্র’ বলে। এই বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত সাধন বলে ব্রহ্মাণ্ডের লোকসকলের সম্বন্ধস্থাপন সম্ভব, ইহা রাধাস্বামী-সম্প্রদায়, সমুদ-সম্প্রদায়, নাথ-সম্প্রদায় প্রভৃতি বিবৃত করিয়াছেন। দেহমধ্যে সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিয়া তাহার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে হয়। ‘সুমিরণ’ বা ‘নাম-স্মরণ’ এই সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিবার প্রক্রিয়াবিশেষ, সমুদয়ের মধ্যে ইহা গোপনীয় সাধন। নাথযোগীরা হঠযোগের সহায়ে সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করেন ইহাই সমুদ ও নাথমধ্যে ভেদ। উভয়ের উদ্দেশ্য পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগস্থাপনা, কিন্তু প্রণালী ভিন্ন। তথাপি নাথ-সাধনমার্গের জীবমুক্তি, ত্রিকুটী, সহস্রদলকমল, নাড়ী, চক্র, অজ্ঞাপাসাধন প্রভৃতির উল্লেখ সমুদয়ের ‘সাধী’তেও পাওয়া যায়। কবীর জীবমুক্তির বর্ণনা দিয়াছেন, চরণ দাসও বলিয়াছেন—

জব হো এক হুসরা নাসৈ
বন্ধ মুক্তি কী রহৈ ন সসৈ ॥
মৃতক অবস্থা জীবত আটৈ ।
করম রহিত অস্থির গতি পাইব ॥

যিনি বর্তমান জীবনে জীবিত থাকিয়াই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি জীবমুক্ত যোগী। মুক্তজীব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মের স্থায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্ব ও ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ দূর হয় না, কারণ মুক্তজীবও বন্ধজীবের স্থায় অণুমাত্র, এবং মুক্ত হইয়াও জীব সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না, অতএব জীবমুক্ত যোগীও ব্রহ্মাশ্রিত।

বাবা রামলালজী তাঁহার রচিত 'শব্দে' ত্রিকুটী, অজপাজপ, ষট্চক্র, বন্ধনাল প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। সন্তদের মধ্যে 'শূন্যের' সাধনাও আছে; বৌদ্ধ, নিরঞ্জনী, নাথপন্থী, সহজিয়া, বাউল ও সন্তেরা অনেকে নিজেদের শূন্যের উপাসক বলিয়াছেন, শূন্য সাধনার দ্বারা সহজাবস্থা লাভ করিবার নিমিত্ত এই সকল সহজবাদীরা শূন্যকে স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে ক্ষুদ্রতম তৃণের বা পুষ্পের বিকাশের জন্যও উন্মুক্ত আকাশের প্রয়োজন হয়; যেখানে প্রাণের বিকাশ নাই সেখানে আকাশ বা শূন্যেরও প্রয়োজনীয়তা নাই। ধর্মরূপ জীবন্ত বস্তুর বিকাশের জন্য শূন্যতার আবশ্যিকতা আছে, এই শূন্যতা নাস্তি-ধর্মাত্মক নহে, ইহা ভাবাত্মক জীবনধারার স্বরূপ। সহজ মতে তাই গুরুকে শূন্য পদবী দেওয়া হয়। "সতগুরু শূন্য সমান হৈ" রজ্জবজী ইহার দ্বারা গুরু-প্রণামের মধ্য দিয়াই সীমাহীন নিরঞ্জে মগ্ন হইবার উপায় বলিয়াছেন। জপতপ মিথ্যা, সহজ নিরঞ্জনের সহিত যুক্ত হওয়াই সহজাবস্থা, গুরুই তাঁহাকে বুঝিবার সুগম উপায় স্বরূপ।^১ রহস্যবাদীদের মধ্যে দৈববাণী দ্বারা দীক্ষালাভও প্রচলিত।^২

কবীরের রচিত বলিয়া 'গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী' নামক যে পুস্তকের প্রসিদ্ধি আছে, তাহাতে গোরক্ষনাথের সহিত কবীরের ধর্মবিচারের বৃত্তান্ত আছে। কবীর বা দাদু কেহই পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁহারা ভগবানের মাধুর্য্যকেই চিনিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন রুমী বলিয়াছেন, "শাস্ত্রপাঠ দ্বারা তিনি লভ্য নহেন, কারণ বুদ্ধি শ্রীতির বিরুদ্ধ।" নাথমতে ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতেও তিনি বাক্যমনের অতীত, অতএব পুথিপাঠ ও জপতপ মিথ্যা (চর্যা ৪০, গো, সি, স. পৃ ২৪ তুলনীয়)। সুফীসাধক চিশ্তীর সমাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সম্মানিত, চিশ্তী যে গোপনীয় সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত্রিকুটীধ্যান ও হঠযোগের আসন প্রভৃতির সাধন আছে। অনহদ্বাদের অনুরূপ সাধনের নাম 'শগলে সৌতে'। ভারতীয় সুফীদের মধ্যে কুওলিনী, সহস্রার প্রভৃতির চর্চা ছিল। তাঁহারা উন্টা বাগীরও ব্যবহার করিয়াছেন। জীবনযাত্রা হওয়া চাই নদীর মত সহজ, নদী নিরন্তর তীরবর্তী বনস্পতি ও মানবদের তৃপ্ত করিয়া যেরূপ সমুদ্রের দিকেই চলিয়াছে, তেমনি সহজ-সাধক

১। সন্তোকাঁ সহজ শূন্য সাধনা—কল্যাণ সাধনাবলী (১ম ভাগ), পৃ ৩০৪, আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন।

২। Initiation, Annie Besant.

জীবনপথে অগ্রসর হইবেন, এই ভাবই হইল সাধনার সহজ ভাব; এই ভাবের সহিত নাথপন্থের সহজাবস্থা লাভের ঐক্য আছে। কথিত আছে সম্ভগুরু দাদু এক সময়ে নাথপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নাম হয় ‘কুস্তারীপাব’; ইহা নাথযোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম।^১ সহজ দেহমধ্যেই অবস্থিত, কারণ দেহের বাহিরে কিছু নাই, এই মত বাউল, সহজিয়া ও সুফীদের মধ্যেও প্রচলিত। সুফীরাও দেহকে দেব-মন্দির বলিয়াছেন।

সম্ভমধ্যে পরমজ্যোতির প্রকাশকে অনন্ত বা পরব্রহ্মের তেজ বলা হয়, উহা অসংখ্যচন্দ্রের স্থায় জ্যোতিষ্মান হইয়াও স্নিগ্ধ, সাধকের মন সে স্থানে উপনীত হইলে ‘বিন-মন-সা’ হয়, অর্থাৎ অমনস্ক বা মনঃশূণ্য অবস্থা হয়। ইহাই রামের মধ্যে আত্মলীন হওয়া। এই সাধনের সহিত নাথ-সাধনের বিশেষরূপ সাদৃশ্য আছে। নবধা ভক্তিমার্গের আলোচনা করিয়া সম্ভকবি অন্তিম সমস্তায় বলিয়াছেন—

মেরা মুঝমে কুছ নহী, জো কুছ হৈ সো তেরা।

তেরা তুঝকো সৌপতে, ক্যা লাগে মেরা ॥—কবীর

“তেরা তুঝকো সৌপতে ক্যা লাগে মেরা।” ইহাই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। ইহার পর মৌন হওয়া ব্যতীত উপায় নাই।^২

(ঘ) নাথপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথ ও বৌদ্ধসাধনা—নাথসিদ্ধদিগকে কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ ব্রাহ্মণ্য যুগের শৈব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ নাথমার্গে হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। নাথ-হঠযোগ সাধনার সহিত বৌদ্ধসহজিয়া সাধনার সাধর্ম্য আছে। উভয় মতেই চিন্তের সমতা লাভ উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রণালীতে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে।

বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের কালে নাথপন্থের বহুল প্রচার দেখা যায়। হিন্দুর তন্ত্র ও শৈবগম নাথদর্শনের উপর

১। দাদু, কিতিমোহন সেন, পৃ ৩০, ৩৭ ইত্যাদি, উপক্রমণিকা।

২। নিবন্ধের এই অধ্যায়ের কিয়দংশে ‘মধ্যযুগের সম্ভ ও নাথসাধনা’ নামে ১৩৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত করি।

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বৌদ্ধসহজিয়াদের মতের সহিত নাথমতের কোন কোন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও নাথপন্থা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত যুক্তমার্গ বিশেষ।

হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের শিব ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও উপায় সম্বন্ধে একই প্রকার ধারণা দেখা যায়। বৌদ্ধসহজিয়া মতে ‘মহামুদ্রা’ সাক্ষাৎকার হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এই মহামুদ্রা শূণ্যতার ও করুণার অভেদস্ববোধ। হিন্দুতন্ত্রের যাহা শিব ও শক্তি, বজ্রযান ও সহজযানের তাহাই শূণ্যতা ও করুণা। ইহাদের মিলনে ‘মহামুখ’ অনুভূত হয়, ইহাই ‘এবম্’কার রূপে বর্ণিত হয়। ইহাই চন্দ্রসূর্য্যের যোগ, বিন্দু উভয়ের মধ্যস্থল। হিন্দুতন্ত্রে এই মিলন ‘ষট্‌কোণ’ বা উর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ ত্রিকোণ দ্বারা বর্ণিত হয়, উভয় ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুর সংযোগই মিলন, এই মিলনই ‘সামরস্র’।

সহজমতে বিন্দু অনাহত ও তজ্জাত অক্ষরমালার বাচক। ইহার বহির্দেশে যে কালচক্র আবর্তিত হইতেছে, জীব তাহা আশ্রয় করিয়া সংসারে ভ্রমণ করে। কালচক্র সমাপ্তিতে বিন্দুস্থান অধিকার করিয়া জীবের মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার হয় ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। নাথমতেও বিন্দু হইতে নাদ, নাদ হইতে কলার উৎপত্তি (নিবন্ধের নাথবিন্দু কলা অধ্যায় দ্রষ্টব্য), দ্বিবিন্দু ক্রমশঃ এক মহাবিন্দুতে পরিণত হইয়া যে অদ্বৈতভাবের উৎপত্তি হয় তাহাই নিত্য অবস্থা,—

উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্।

(গোরক্ষ-শতক, ৭৪ শ্লোক)।

চিন্তা এই অবস্থায় ‘অমনস্ক’ হয়, ইহা নির্ব্বাত দীপের সহিত তুলনীয়, এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে—

“লবণং তোয়সম্পর্কাত্ যথা তোয়সমং ভবেৎ।

মনোহপি ব্রহ্মসম্পর্কাত্ তথা ব্রহ্মময়ং ভবেৎ॥”—অমনস্ক (১।২৩-২৬)

নাদ ও বিন্দুর মিলনই বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন। বৌদ্ধ সাধনায় চন্দ্রসূর্য্যের উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যায়। বঙ্গীয় গাথাতেও হাড়িসিদ্ধা চন্দ্রসূর্য্যের কুণ্ডল ধারণ করিতেন এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার দ্বারা নাথেরা যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় না। চন্দ্রসূর্য্যের মিলন অর্থে ‘আনন্দানুভূতি’। তন্ত্রমতে সৃষ্টির মূল উপাদান চন্দ্র,

চন্দ্র যেখানে বিন্দুরূপে স্থিত সেখানে কম্পন বা সৃষ্টি নাই, ইহাই চন্দ্রের নিষ্কল কলা । ইহা হইতে সুধাক্ষরণ হইলে সৃষ্টির আবির্ভাব হয় । এক্ষণে ও নাদই উপায় ও প্রজ্ঞা বা গ্রাহক ও গ্রাহ্য ; ইহাদের মিলনে ‘নির্ঝাণানন্দ’-প্রাপ্তি হয় । সহজিয়া মতে উকীষকমলে এবং তত্ত্বমতে সহস্রারে এই আনন্দের অনুভূতি হয় ।

সহজিয়া বৌদ্ধের শূন্য সমাধি বা সহজ অবস্থা লাভ নাথমার্গের সমরস সাধনার সহিত তুলনীয় ।

“কশ্চিৎ সমরসং রসসংস্থিতম্ ।” ইত্যাদি

(অকুলবীরতত্ত্ব-B.-১১৬, ১১৭ ইঃ)

সহজিয়া মতে গুরুর উপদেশে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, ইহাই ‘জ্ঞানমুদ্রা’ । সেই গুরুর স্বরূপ ‘যুগনদ্ধরূপ’ বা প্রজ্ঞা-উপায়ের সমরস বিগ্রহ । নাথমতেও গুরু-উপদেশে শিব-শক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়া সাধক যে তত্ত্বাতীত অবস্থায় পৌঁছান তাহাই পরম পদ (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে ‘পরমপদ’ দ্রষ্টব্য) ।

নাথমতে বৌদ্ধসহজিয়া ও জৈনমতে শূন্য-সাধনার কথা আছে । বৌদ্ধমতে চতুর্থ বা তুরীয় ‘শূন্য’ই বজ্রগুরুর অধিষ্ঠান । যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয় ‘সর্বশূন্যতা’র কথা বলিয়াছেন ।^১ হঠযোগ-প্রদীপিকাতে ‘শূন্য’ কথা আছে, ইহা যোগের বিভিন্ন স্তরের সহিত যুক্ত ।^২ জৈন ধর্মে পাহুড়া দোহাকার ‘শূন্য’র প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই ।^৩

সহজিয়া মতে মধ্যপথ বা ডোহীর (বা সুষুম্নার) শোধন করিতে হইলে ললনা ও রসনার (বা ইড়াপিঙ্গলার) সংযোগ কর্তব্য, তন্মধ্যেও ইড়া-পিঙ্গলার সংযোগ দ্বারা সুষুম্না পথ উন্মুক্ত হইবার কথা আছে । চর্যাপদ ও হঠযোগ-প্রদীপিকাতে ‘বারুণী’র কথা আছে, ইহার অর্থ চক্ৰল বিন্দু । ‘সহজ’ শব্দ বজ্রযানের, নাথপন্থে পরমপদই সহজ । উভয় মতেই যোগের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে ।

১ । Doctrine of Maitreya Nath, Tucci, p. 21.

২ । হ-যোগ-প্র ৪১০ ইঃ

৩ । Pahuda Doha, H. Jain, No. 212. অরং ন হোই...ইত্যাদি ।

বজ্রদেহ, যোগদেহ, রসময়ী তন্ত্র ও সিন্ধুদেহ মূলতঃ একই, যোগ-মূর্ত্তেও 'বজ্রসংহননরূপ কায়সম্পৎ'এর উল্লেখ আছে। সিন্ধুদেহ বাতীত নাথদের 'মহাজ্ঞান' ধারণা অসম্ভব (সাধনা-অংশে কায়সিন্ধি অধায় দ্রষ্টব্য)।

নাথমতে যে দ্বাদশ মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে বজ্রোলী, সহজোলী প্রভৃতি নাম বজ্রযান, সহজযানকে স্মরণ করাইয়া দেয়; ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নহে, তথাপি এই কারণে নাথদের বৌদ্ধ বলা চলে না।

বঙ্গদেশে কর্ত্তাভজ্ঞার দল ও ধর্ম ঠাকুরের উপাসকদিগের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। কর্ত্তাভজ্ঞা অর্থে গুরুকে যে ভজনা করে, নেপালে তাহারা 'গুভাজু' নামে পরিচিত। কর্ত্তাভজ্ঞা লালশশীর পদে গুরুর উপদেশ বিনা সহজ পথ অবলম্বনে বিপদের সম্মুখীন হইবার কথা আছে।

উপরোক্ত নানা কারণে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগে শৈব ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধেরা আত্মরক্ষা করেন এবং নাথগণও এইরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বস্তুতঃ নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তবে তাহাদের আচার ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি মিশ্রিত হওয়ায় অর্থাৎ না হিন্দু, না বৌদ্ধ হওয়ায় নাথদের বৌদ্ধধর্ম হইতে শৈবধর্ম গ্রহণ করার ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। মংস্তেন্দ্র 'শৈব' ছিলেন, তিনি নেপালে শৈবধর্মই প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। কেবল গোরক্ষ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ একটি কিস্তদস্তী প্রচলিত আছে, কিন্তু গোরক্ষের জাতি বা জন্মস্থান সম্বন্ধে অত্যাধিক কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ডাঃ মোহন সিং তাহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে গোরক্ষ সম্বন্ধে প্রবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বৌদ্ধাচার্যাদের ৮৪ সিন্ধুতালিকায় শৈব নাথসিন্ধুদের নাম থাকায় নাথদের বৌদ্ধ বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু গোরক্ষ সম্প্রদায়ের মন্ত্র 'শিব-গোরক্ষ', ইহাদের তীর্থ শৈবতীর্থ এবং পরিচ্ছদ শৈবযোগীর অনুরূপ। হাড়িসিন্ধুর সিন্ধি ভক্তগণের স্পৃহাও শৈব পূজারীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নাথ যোগীরা নিজেদের 'শিবগোত্র' বলেন (নাথদের

উদ্ভব ইতিহাসে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে)। আদিনাথ পার্বতীকে বলিতেছেন, “অহং সো ধীবরো দেবী” অর্থাৎ আমি ধীবররূপী মৎশ্বেত্র, অতএব নাথসিদ্ধদের বৌদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। গোরক্ষনাথ পশু হত্যাকারী ছিলেন এইরূপ বিবরণও পাওয়া যায়, ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি বৌদ্ধ ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় মৎশ্বেত্র, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি ক্রমে স্থান পাইলেন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের সহিত নাথদের ক্রমে সম্বন্ধ ঘটিল তাহা বিচার্য।

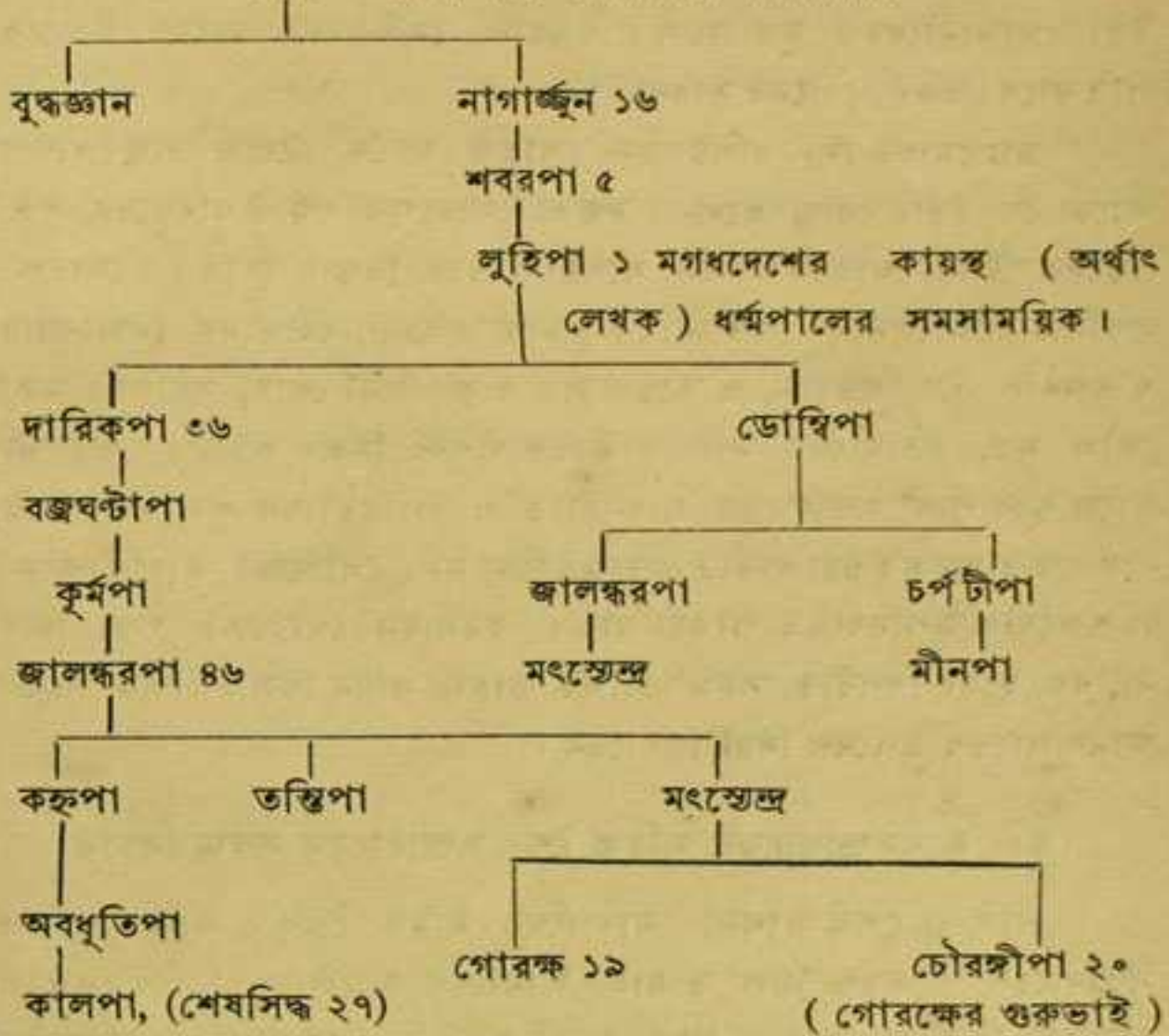
বুদ্ধের নির্বাণলাভের ৪০০।৫০০ বৎসর পর হইতে জনসাধারণের মানসিক ভাব পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তন্ত্র ও মন্ত্র স্থান লাভ করিল, ফলে মন্ত্রযান প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। বর্তমান গুপ্তুর জিলায় (দক্ষিণ ভারতে) অবস্থিত শ্রীপর্বত ও ধাত্যকটক যাদুবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে; সৌদামিনী নামক বৌদ্ধভিক্ষুণী শ্রীপর্বতে শিক্ষার্থে যান, ভবভূতির ‘মালতী-মাধবে’ তাহার উল্লেখ আছে। বাণ, নাগার্জুন প্রভৃতিও শ্রীপর্বতের সহিত অপরিচিত ছিলেন না। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয় ও ক্রমশঃ ৮৪ সিদ্ধার দ্বারা উহা উত্তর ভারতে প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে নাথসিদ্ধেরাও অন্যতম। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলিয়াছেন, সরহপা (৭৬২-৮০৯ খৃঃ) আদি-সিদ্ধ, তিনি নালন্দার অধিবাসী ছিলেন, মীনপা (৮০৯-৮৪৯ খৃঃ) কামরূপের ধীবর, গোরক্ষের জাতি ও দেশের বর্ণনা পাওয়া যায় না, তিনি মীনপার শিষ্য ছিলেন, এই মীনপা মৎশ্বেত্রের পিতা নামে খ্যাত। তৎসংগৃহীত ‘বংশবৃক্ষ’ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

এই বংশবৃক্ষ প্রধানতঃ পঞ্চ প্রধান গুরুর গ্রন্থাবলী হইতে রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, এই গ্রন্থ চীনের সীমাস্তরের মধ্যে মুদ্রিত। আমি বংশবৃক্ষের প্রয়োজনীয় অংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। উক্ত লেখক বিরূপা, গোরক্ষ, ভৃগুক ও জালন্ধরের কাল দেবপালের সমসাময়িক (৮০৯-৮৪৯ খৃঃ) ধার্য্য করিয়াছেন, আদি সিদ্ধার কাল ৭৬৮-৮০৬ খৃঃ এবং শেষ সিদ্ধ কালপার কাল ১১৭৫ খৃঃ ধার্য্য করিয়াছেন। (বংশবৃক্ষে দুইবার মৎশ্বেত্র ও জালন্ধরপার নাম কেন?)

(‘গঙ্গা’ পুরাতত্ত্ব জ্যেষ্ঠ। জাহ্নয়ারী ১৯৩৩ সাল)

চৌরাশী সিদ্ধার বংশাবলি

সরহ ৬ আদিসিদ্ধ, ধর্মপালের সমসাময়িক



এই সিদ্ধদের চিত্র ভোটিয়া গ্রন্থ হইতে উক্ত লেখক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। 'গঙ্গা' পুরাতত্ত্ব ও কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৪৭৩ ইঃ দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধাদের রচনাকে উক্ত লেখক হিন্দীর প্রাচীনতম নিদর্শন বলেন, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহাকে বাংলার প্রাচীনতম রূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।^১

খৃষ্টপূর্ব যুগে বৌদ্ধ গ্রন্থে 'একাভিগ্ণায়ো' সাধন দেখা যায়, পাশ্চাত্যে Gnostic Rosicrucianদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা ছিল, বৌদ্ধসহজিয়া সাধনেও ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট।^২ কিন্তু শ্রী লইয়া সাধন হইলেও ইহা কামের

১। Origin & Development of the Bengali Language by Dr. S. Chatterji দ্রষ্টব্য।

২। Post-Chaitanya Sahajiya Cult, M. Bose, pp. 76, 101, 105, 116 etc.

সাধনা নহে কারণ ইহাতে বাহ্যসুখ বা সম্ভান উৎপাদন নাই। অগ্নি বিনা যেমন ছুঁক আবর্তন সম্ভবে না, তেমনি নারী বিনা কামনার শুদ্ধি হয় না, ইহা গোস্বামীদেরও মত ছিল। স্বপ্তান মিষ্টিকদের মধ্যেও ঈশ্বরকে পতিভাবে ভজনা প্রেমের সাধনা।^১

ডাঃ মোহন সিং বলিয়াছেন গোরক্ষ সম্বন্ধে এদেশে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন; বস্তুতঃ গোরক্ষের ধর্ম উপনিষদের ধর্ম, সম্বদের উপর গোরক্ষের দর্শন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গোরক্ষ-প্রচলিত ধর্মে জৈনদের ‘জত’ নামক চূড়ান্ত ব্রহ্মচর্য্য, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ এবং বজ্রযান, ও তন্ত্রের লয় ও কুণ্ডলিনী যোগ, সহজিয়া মত, কৌল মত, হঠযোগের সাধন প্রভৃতির অপূর্ব মিশ্রণ আছে। পরবর্তী কালে পূর্ব পূর্ব সম্প্রদায়ের সাধনরীতি ও পারিভাষিক শব্দ স্বভাবতঃই নাথধর্মে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত গতাস্থর ছিল না। গোরক্ষের ‘নাদানুসন্ধান’ বা শব্দযোগ উপনিষদেও পাওয়া যায়। হঠসাধন গোরক্ষের পন্থা ছিল না, বরং হঠের বিপরীত ‘সহজ’ যোগই তাঁহার সাধন ছিল। তিনি সহজ-আনন্দলাভের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।^২

(ঙ) নাথসম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথ ও শৈব সাধনা—নাথপন্থের সহিত শৈব ও শাক্ত তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাই আমাদের আলোচ্য। বৈদিককাল হইতেই শিব বা রুদ্রের পূজা প্রচলিত ছিল, যজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে সমস্ত জগৎকে রুদ্ররূপ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও (৩।১১) শিবের বর্ণনা আছে। কিন্তু অথর্ববেদের পূর্বে পাণ্ডপতি বর্ণন নাই। বামন পুরাণে শৈবদের চারিটি সম্প্রদায়ের কথা আছে—শৈব, পাণ্ডপত, কালদমন ও কাপালিক। ছায়বর্ত্তিকার খ্যাতনামা রচয়িতা উদ্বোতকর পাণ্ডপতাচার্য্য ছিলেন। কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায় অধুনা লুপ্ত, ইহাদের দর্শন এক প্রকার অজ্ঞাত। কাশ্মীর শৈবদের প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বা ‘ত্রিকদর্শন’ এবং দাক্ষিণাত্যের ‘শৈবসিদ্ধান্ত’ মত ও ‘বীর-শৈবসিদ্ধান্ত’ বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় এখনও ইহাদের দর্শন লুপ্ত হয় নাই, ইহাদের গ্রন্থাদিও ছল্লভ নহে। নাথেরা শৈব ছিলেন

১। Mysticism, Underhill, Pt. II, p. 170.

২। Gorakhnath, Singh, p. vii, 25, 30.

একথা পূর্বে স্বীকার করা হইয়াছে, অতএব ত্রিকদর্শন ও বীর-শৈব, শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শন প্রভৃতির সহিত নাথ দর্শনের মিল থাকা বিচিত্র নহে।

দক্ষিণে তামিলদেশে ৭ম, ৮ম শতাব্দীতে ৮৪ জন শৈব সন্তের আবির্ভাব হয়, ইহাদের মত শৈব-সিদ্ধান্ত মত নামে পরিচিত। ভগবান শঙ্কর হইতে ২৮টি তন্ত্রের উদ্ভব হয়। জয়রথ তন্ত্রালোকের টীকায় তাহাদের নাম দিয়াছেন। কর্ণাটে দ্বাদশ শতকে বসব কর্তৃক বীর-শৈব মত প্রচারিত হয়। বীর-শৈবরা কণ্ঠে লিঙ্গ মূর্তি ধারণ করিতেন, নাথেরাও কণ্ঠে 'শিংগাদ' ধারণ করেন। বীর-শৈবরা সর্বজাতির নিমিত্ত ধর্ম প্রচার করিতেন, ইহাদের মত 'লিঙ্গায়েং' বা 'জঙ্গম' নামে পরিচিত। কাশীতে জঙ্গম বাড়ীতে ইহাদের জ্ঞান-সিংহাসন আছে।

ত্রিকদর্শনের নামান্তর 'স্পন্দবাদ', ইহা কাশ্মীর শৈবানুষ্ঠানবাদ নামে খ্যাত। পশু, পাশ ও পতি এই তিন তত্ত্ব ত্রিকদর্শনের মূল তত্ত্ব। অভিনব-রচিত তন্ত্রালোকের টীকায় এই দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দর্শনের মূল প্রবর্তক আচার্য্য বসুগুপ্ত (আনুমানিক ৮০০ খৃঃ)। ইনি শিব-সূত্রের উদ্ধারকর্তা। অভিনবের তত্ত্বসার, মালিনীবিজয়বার্ত্তিক, পরমার্থসার প্রভৃতিও ত্রিকদর্শনে প্রসিদ্ধ। এগুলি একাধারে সাহিত্য ও দর্শন। অভিনবের উপযুক্ত শিষ্য ক্ষেমরাজ স্বচ্ছন্দতন্ত্র টীকা, শিব-সূত্রের মর্শিনী প্রভৃতির রচয়িতা।

শাক্ততন্ত্র কাশ্মীর, কাশী ও কামাখ্যায় রচিত হয়। কামাখ্যা কোলমতের মুখ্যস্থান। কোলমার্গের মতে তন্ত্রসংখ্যা চতুঃষষ্টি। কাশ্মীরে ও কাশীতে ত্রীবিজ্ঞার পূজা হয়, ইহার আচার্য্য দত্তাত্রেয়, অগস্ত্য ও গোড়পাদ। গোড়পাদের উপযুক্ত শিষ্য শঙ্কর সৌন্দর্যালহরীতে কবিত্ব ও তাত্ত্বিকতার সমাবেশ দেখাইয়াছেন। কোলমতে পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির নামও প্রসিদ্ধ।

বীর-শৈব-সিদ্ধান্ত মতে স্থূল চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট জীব ও সূক্ষ্ম চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট শিবের অদ্বৈত বা সামরস সাধনা আছে। শিব ক্রীড়ার জন্ত স্পন্দনের সৃষ্টি করেন, এইরূপে সামরস বিভেদ হইয়া তিনি জীব ও শিব হইলেন। শিব ও শক্তি অভেদ। জীব আপন স্বাভাবিক ভক্তিশক্তি দ্বারা পরমশিবের সহিত একতাব প্রাপ্ত হইলে জীবের মুক্তি হয়। শক্তির দ্বারা পরমশিব হইতে জগতের পরিণাম হয়, অতএব জীব ও শিবে ভেদ নাই।

শৈবসিদ্ধান্তমতে শিব, শক্তি ও বিন্দু রত্নত্রয়, ইহাই সমগ্র জগতের মূল স্বরূপ। শিব জগতের কর্তা, শক্তি করণ, বিন্দু উপাদান। এই বিন্দুই মহামায়া, শব্দব্রহ্ম, কুণ্ডলিনী, বিজ্ঞাশক্তি ও ব্যোম। বিন্দু স্কন্ধ হইলে একদিকে শুদ্ধদেহ, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভুবনের উৎপত্তি হয়, অন্যদিকে শব্দের উৎপত্তি হয়। ‘শব্দ’—সূক্ষ্ম নাদ, অক্ষর বিন্দু ও বর্ণভেদে ত্রিবিধ। ইহার কারণভূত বিন্দু জড় হইয়াও শুদ্ধ। জড় শক্তির সহিত শিবের তাদাত্ম্য হয় না, কারণ শিব চেতন। পরমেশ্বর নিজ সমবায়িনী শক্তি দ্বারা বিন্দুতে আঘাত করিলে শুদ্ধজগৎ হয়, মায়ার ক্ষোভে অশুদ্ধ-জগতের উৎপত্তি হয়। শিবের সংজ্ঞা ‘পতি’, তিনি ‘পঞ্চকৃত্যকারী’। জীব, অণু বা পশু, ইহার ত্রিবিধ মল থাকিলেও জীব কর্তা। জীব পাশ দ্বারা বদ্ধ, সেই পাশ বা মল অপগত হইলে মুক্তি হয়। তত্ত্বমতে মল জ্ঞান বা কর্ম দ্বারা দূর হয় না, ক্রিয়া দ্বারা হয়। ক্রিয়ার সহিত চৈতন্যের উদয় হয়, ইহাদের সহযোগে ‘জীবমুক্তি’ হয়।^১

কাশ্মীর ত্রিকুবাদ বা প্রত্যভিজ্ঞাবাদে আছে “শিব এব গৃহীত পশুভাবঃ”, ইহাই এই বাদের মূল প্রতিপাত্ত। শিবই দৃশ্য, শিবই দ্রষ্টা, তিনিই বেত্তা, তিনিই বেত্তা। তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যশক্তি-মহিমায় নর্ম্মরভসে বা খেলার ঔৎসুক্যে^২ এই জগৎকে আপনার বোধগগনে প্রতিবিস্তবৎ প্রকাশিত করিয়াছেন,^৩ তিনি আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া অণুরূপে অবভাসিত হইতেছেন এবং অণুর ভোগ সিদ্ধার্থে চরাচর জগৎ প্রকটিত করিতেছেন (তত্ত্বসার ৮ আঃ)। শিবের ‘স্পন্দ’ বা আত্মবিমর্শ হইতেই এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি। শিব হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত তত্ত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব বৃক্সাইবার নিমিত্ত এই মতবাদীরা সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব ব্যতিরিক্ত আর একটি বা আরও এগারটি তত্ত্বের কথা বলেন। পরমশিব তত্ত্বাতীত হইলেও তাঁহাকে গণনায় ধরিলে তত্ত্ব ২৭টি বা ৩৭টি হয়।^৪

অন্যান্য বাদের ন্যায় ত্রিকুবাদেও মোক্ষের কথা আছে। স্বরূপের ব্যাতিই মোক্ষ, অর্থাৎ আমিই সেই পরমশিব এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই মোক্ষ।

১। ভারতীয় দর্শন, উপাধ্যায়, পৃ ৫৪৫ ইঃ

২। দ্বৈতপ্রত্যভিজ্ঞাত্মক ৫।৬

৩। তত্ত্বসার, তৃতীয় আঃ, ‘সর্বমিদং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিস্তবাত্ম’।

৪। তত্ত্বালোক, ১১ আঃ ২৪ ; তত্ত্বসার ১০ আঃ পৃ ১১১।

মুক্তির পথে জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে অণু শিব স্বরূপের উপলব্ধি করে। পরমেশ্বর স্বাতন্ত্র্যপ্রচ্ছাদন ক্রীড়ার দ্বারা পশু বা অণু হন, সুতরাং সেই আচ্ছাদন দূর না করিলে অণু মুক্তির পথে যাইতে পারে না। তাঁহার এই ইচ্ছাই ‘শক্তিপাত’। পরমেশ্বর স্বাতন্ত্র্যশক্তিসার বলিয়া তাঁহার শক্তিপাত নিরপেক্ষ এবং তৎফলে অণু স্বরূপের উপলব্ধি করে অর্থাৎ পরমশিবত্বে অবস্থান করে (তন্ত্রসার ১১ আঃ) ।

ত্রিক্রমতে শিবই খেলার ঔৎসুক্যে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন ; ইহার দ্বারা তাঁহাতে ‘ইচ্ছার’ কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে না। নাথমতে শিব ও শক্তি অভিন্ন অর্থাৎ সকলের মূলে যে চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, তাঁহার সহিত চিৎশক্তি সদাযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় ব্যক্ত জগতের উদ্ভব হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জগতের লয় হয়। শক্তিয়ুক্ত শিবই সৃষ্টির আদিকারণ, তিনি সৎ, সর্বচৈতন্যের আধার বলিয়া চিৎ এবং ইচ্ছাদি শক্তি তাঁহার কলা বলিয়া তিনি ‘সকল’ পরমেশ্বর। শক্তি ইচ্ছারূপিণী, মহাপ্রলয়ের অন্তে পুনর্বিকাশের ইচ্ছাই শক্তির ‘ইচ্ছা’ নামে খ্যাত। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—শক্তির এই তিনটি রূপ আছে। আবার জগতের লয় অবস্থায় “শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যস্থিতঃ শিবঃ। জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তি ইচ্ছয়া। ইচ্ছাশক্তির্লয়ঃ যাতি যত্র তেজঃ পরঃ শিব।” (এই নিবন্ধের সাধনা-অংশে নাদবিন্দুকলা অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

ইতিপূর্বে যে শৈবসিদ্ধান্ত মত বর্ণন করা হইয়াছে—যাহাতে শিব, শক্তি ও বিন্দুকে ‘রত্নত্রয়’ বলা হইয়াছে তাহার সহিত নাথদর্শনের অনেকাংশে মিল আছে। পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হয় তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত। বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদের উৎপত্তি হয়, উহা হইতে সৃষ্টির আরম্ভ। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে “বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি বিন্দুরিন্দু রজো রবিঃ। উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্।” (পৃ ৪১)

এই পরমপদ প্রাপ্তি নাথসিদ্ধদের লক্ষ্য, অতঃপর পরমপদের দর্শন ব্যাখ্যাত হইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ
সিদ্ধান্ত-অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরমপদ বা পূর্ণ সত্যের স্বরূপ, সামরস্ত

নাথসিদ্ধগণের সমস্ত সাধনার চরম লক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি। সর্বতত্ত্বের উর্দ্ধে পরমপদের অবস্থান। উহা বাচ্য-বাচক-ভেদবিরহিত। তজ্জন্ম নাথগণ উহার নির্ণাম বা অনামা আখ্যা দেন। “সর্বতত্ত্বোপ-
বৃদ্ধিধান্ নির্ণাম পরমং পদম্।”^১ পরমতত্ত্ব বা পরং ব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণ
অনাদিনিধন এক অখণ্ড অব্যক্তস্বরূপ কার্য্যাকারণ-কর্তৃবহীন এবং
কুলাকুলের অতীত অবস্থা।^২ সৃষ্টিকালে ইহা হইতেই সমুদায় ভাব-
পদার্থ প্রসূত হয় এবং প্রলয়ে ইহাতেই লীন হয়।^৩ সেই সর্বকারণের
কারণ পরতত্ত্বই মুমুকুর সাধন-নিষ্ঠার চরম লক্ষ্য বিবক্ষ্য পরমপদ
নামে অভিহিত হয়।

পরমপদ অর্থে শ্রেষ্ঠ স্থান বা অবস্থা বা গতি বুঝায়। জীবের যে
অভীষ্টতম চরমগতি তাহাই পরম পদ। “যদ্ গতা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম
পরমং মম।”^৪ যে অবস্থা বা পদ লাভ করিলে জীবকে জন্মমৃত্যুর দ্বার
দিয়া পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখমোহাদ্বয়ক এই সংসারে অবশভাবে গতাগতি লাভ
করিতে হয় না তাহাই পরমপদ। জনন-মরণজ দুঃখের অনুভবকারী
জীব তন্নিরাকরণে উৎসুক হইয়া গুরুপদিষ্ট মার্গের অনুসরণপূর্বক যে
সামরস্তাত্মক অবস্থা লাভ করে তাহাই পরমপদ।^৫ সাধন-বলে যাবতীয়
জৈব চাক্ষুর্যের তিরোধানে চিৎ-স্বাদ-সুখ-বিশ্রাস্ত^৬ নিকৃথিত রূপ
পরম-শ্রীলাভ করিয়া জীব যে অনন্তভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে
সমর্থ হয় তাহাই পরম-পদ।^৭

যং লক্ণ চাপরং লাভং নাশিকং মন্যতে ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥

(গীতা, ৬।২২)

অর্থাৎ গীতার ভাষায় যাহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভকে অধিক মনে

১। সি. সি. স. ৪।৩৪

২। সি. সি. স. ১।৪ ; সি. সি. প. ১।৪, ৫

৩। “শক্তিপ্রসঙ্গ সঙ্কোচে জগতঃ সৃষ্টিবিস্তৃতি”।

সি. সি. প. ৪।২০ ; সি. সি. স. ৪।২৪

৪। গীতা, ১৫।৩

৫। সি. সি. স. ৫।১২ ; সি. সি. প. ৫।১২

৬। সি. সি. প. ৫।১৩

৭। সি. সি. স. ৫।১৩

হয় না, যাহাতে স্থিতিলাভ করিলে গুরুত্বের দ্বারাও বিচলিত হইতে হয় না, সেই সর্বানন্দময় নিশ্চল পদই পরম-পদ।^১ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি চতুরবস্তার অতীত শান্তিনির্ভর তুরীয়াতীত স্বায়জাগর অবস্থাই পরম-পদ। পরম-পদাকূট যোগী সর্বাবস্থায়ই বিজ্ঞাতা হন।^২

মন-বুদ্ধির অতীত, পরিচ্ছিন্ন সত্তা সংবিকলার উর্দ্ধস্থ উহাপোহ-রূপ তর্কের অনধিগম্য পরম-পদ^৩ সর্বপ্রকার উপাধিশূন্যতা ও নিরূপাধিতা-হেতু স্বসংবেদ্য।^৪ চরাচর নিখিলের অত্যন্ত বিভাসক আয়বেদ্য পরম-পদ^৫ এক অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বভাব। ইহা একাধারে বিশ্বরূপ ও বিশ্বোত্তীর্ণ। “অখণ্ড-পরিপূর্ণায়া বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ”।^৬ শ্রুতিও বলেন পরম-পদরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া বিষয়বিজ্ঞানসহ নামসকল তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। যিনি এই ব্রহ্মসম্বন্ধী আনন্দকে জানেন তিনি সর্ব ভয়ের কারণ হইতে মুক্ত হন।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥^৭

মুক্তিই জীবের পরম-পুরুষার্থ। নাথ-স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি, উহাই পরম-পদ।^৮ ভাবাভাববিনির্মুক্ত নাশোৎপত্তিবিবর্জিত সর্বসঙ্কলনাতীত দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সমতব্ধই নাথ-স্বরূপ।^৯

নিগুণং বামভাগে চ সবাভাগেহদ্ব্যুতানি জা।

মধ্যভাগে স্বয়ং পূর্ণস্তশ্চৈব নাথায় তে নমঃ ॥

(গো. সি. স., ১ম শ্লোক)।

এই শ্লোকে বামভাগে যে নিগুণের অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা নাথ-স্বরূপের একভাগ এক ব্যবহারে নিগুণ-স্বরূপ কল্পনা করা হয়, ইহাই উক্ত হইতেছে। পুনঃ ইহার সবাভাগে যে অব্যুতানি জা শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ইচ্ছাশক্তি বা সর্বসাকার ব্রহ্মকারিণী-ভূতা শক্তি। ইহাও একভাগে এক ব্যবহারে সগুণ ব্রহ্মমূলভূতা বলিয়া কল্পনা করা হয়। মধ্যভাগে সর্বস্বাধার বা সর্বশিরোমণিরূপ

১। সি. সি. প. ৫৪৩

২। সি. সি. প. ৫১০

৩। সি. সি. প. ৫৪৪

৪। সি. সি. স. ৫৪, ৫, ৬

৫। সি. সি. প. ৫৪, ৬

৬। সি. সি. স. ৫৪

৭। সি. সি. স. ৫৪

৮। তৈ. উ. ৫১০

৯। গো. সি. স. পৃ. ১০

১০। অমলক ও অবদূত টীকা,

গো. সি. স. পৃ. ১০, ১১

নিষ্ঠা ও সন্তোষ উভয়ের একান্তরূপ 'নাথ' কল্পনা করা হইয়াছে। নাথ-স্বরূপ সত্য-অসত্য জড়-চৈতন্য সর্বভাবের সাম্য-স্বরূপ দ্বৈতাদ্বৈতের উর্দ্ধবর্তী অবাঙ্মনসগোচর। যাহাতে দ্বৈতের কল্পনা নাই, অদ্বৈতের বিকল্পও যাহাতে নাই, সেই দ্বৈতাদ্বৈতের উর্দ্ধবর্তী চৈতন্য-স্বরূপকেই 'নাথ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অপরন্তু মনোবাগতীত বিশ্বোত্তীর্ণতা এবং মনোবাঙ্মন্য বিশ্বরূপতা এতদ্ব্যভাসক পূর্ণতাই নাথ-স্বরূপ।^১ এতদ্ব্যভাসের সহিত সামরসেই মোক্ষ। "মোক্ষঃ সমরসো ভবেৎ। বিমুক্তমিখমাখ্যানং পশ্চ্যেত চাত্মনাখ্যানি।"^২ বিগলিত সর্বভেদ সমরস-ময় মোক্ষপদে আত্মা কর্তৃক আপনাতেই বিমুক্ত আত্মা উপলব্ধ হন। সামরসাত্মক পরম-পদে সম্যক চৈতন্যবিশ্রাস্তির ফলে^৩ সমস্ত অনাত্ম ভাবের উপশাস্তি হইলে স্বপিণ্ডলীন হয় এবং চরাচর আত্মভাবে অঙ্গীকৃত হইয়া স্বয়ং চিদ্বিলাসের প্রকাশ হয়।^৪ মুণ্ডকোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে আত্মসাক্ষাৎকারী বিদ্বান্ সাধক যখন সূর্যের ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃ, সর্বজগতের অবিনাশী কর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণ-স্বরূপ ও জগৎ-কারক ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরমসাম্য প্রাপ্ত হন।^৫

যদা পশ্যঃ পশ্চ্যেত কল্পবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিদ্যু নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

(মুণ্ডক উপনিষদ ৩।১।৩)

পরন্তো উপনীত সাধক তাদাত্ম্য লাভ করেন। তাদাত্ম্য অল্পভবের ফলে সর্বভেদ বিগলিত হয়। "তদল্পভবতঃ ভেদবিরহঃ।"^৬ ভেদের বিগলনই সমরসতা। তখন "লোকা ন লোকা, বেদা ন বেদা, দেশা ন দেশা, যজ্ঞা ন যজ্ঞা, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, ... তাপসা ন তাপসা ইতি একমেব পরম", এই প্রকার অখণ্ড একত্বেরই জ্ঞান হয়।^৭

নিরুত্থান দশায় স্বপ্রকাশ একবেত্তা শিবভাবই কুলাকুলস্বরূপ সামরসের ভূমি।^৮ প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় তরূপ ব্রহ্মজ্ঞ নাম ও রূপ

১। গো. সি. স. পৃ ৫২, ৫৩

২। অমরোদ্য শাসন ২০ শ্লোক

৩। সি. সি. স. ৫।৩৪

৪। সি. সি. প. ৫।৩০, ৩৪

৫। মুণ্ডক উঃ ৩।১।৩

৬। সি. সি. স. ৫।১১

৭। গো. সি. স. পৃ ১০; জ্ঞানোপনিষদ

৮। সি. সি. স. ৫।৪, ৫

হইতে বিমুক্ত হইয়া অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ পরমাণ্বাকে প্রাপ্ত হন।^১ ইহাই সামরস্তু। এই সামরস্তুের উদয়ে চলন আর থাকে না, সঙ্কোচ একেবারে কাটিয়া যায়, ইহাই নিষ্পন্দত্ব ও নিরন্তরত্ব।^২ তখন আত্মা নিজ শক্তির মহিমায় ব্যাপকতা লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বরূপে ও তদ্ব্যবসায়ী রূপে একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। “বিশ্বাতীতঃ যদা বিশ্বমেকমেবাবভাসতে।”^৩ এই যুগপৎ বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত ভাবই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ।

জীবভাবে বহু সংকীর্ণ ভাবের সমাবেশ আছে। ইহা ভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চৈতন্য-রূপ বহুভেদ-সংশ্লিষ্ট। তব্দৃষ্টিতে এক পরম কারণ হইতেই বহুর উদ্ভব। কিন্তু বহুতে বহুরূপে অভিমানী হইয়া জীব আপন মৌলিক পূর্ণত্ব ও একরসত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। গুরুকৃপা-সহায়ে সাধনদ্বারা আপন পূর্ণত্ব অনুভব করিবার যোগ্যতাও জীবের আছে। “জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধিঃ গুরুবাকোন লভ্যতে।”^৪ সাধনবলে জীব আপন পরিচ্ছিন্ন বহিমুখী ভাবকে সংবৃত করিয়া দেহাদিতে অভিমানাত্মক আবরণ উন্মোচন করিলেই স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। জ্যামিতির বিন্দুর উপমা হইতে এই তত্ত্বটা বুঝা যাইতে পারে। নাথগণের দৃষ্টিতে শক্তির প্রসার ও সঙ্কোচ হইতে সৃষ্টি ও সংহার। স্থির অচঞ্চল বিন্দুই যেন মূল কারণ। বিন্দুর গতি হইতে রেখার উৎপত্তি, সেই রেখা বহুমুখী হইয়া বহু রেখার সৃষ্টি করিলে বহুবিধ ক্ষেত্রাদির উদ্ভব হয়। আবার বিন্দুর ঐ গতি বিপরীতমুখী হইলে ক্ষেত্র-রেখাদি বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র বিন্দুই থাকে। “নিরুপস্থানে স্বস্বরূপাথগৈব প্রতিভাতি সা।”^৫ সেইরূপ এক পরম কারণ পরতত্ত্ব হইতেই ষট্‌পিণ্ডাত্মক এই চরাচর প্রসৃত হইয়াছে। এই প্রসরের সঙ্কোচ হইলে চরাচর পুনরায় এক তত্ত্বে এক রসে উপনীত হইবে। বহুমুখী ভেদময় পরিচ্ছিন্ন জীবভাবও ঐ একই প্রণালীতে আপন বহিমুখী চাঞ্চল্য সংবৃত করিয়া স্বস্বরূপে এক রসে উপনীত হইয়া আপনাকে পরম কারণের সহিত অভিন্ন জানিয়া যুগপৎ স্বীয় বিশ্বময় ও বিশ্বব্যাপী ভাবের উপলব্ধি করে। অর্থাৎ ভেদের অপগমে অভেদের

১। মুণ্ডক উপ, ৩।২।৮

২। সি. সি. স. ১।৭

৩। সি. সি. স. ৩।১০

৪। সোহতিমান আত্মনো বহুঃ তন্নিবৃত্তি র্যোক্তাঃ; গো. সি. স. পৃ. ১০

৫। হ. গো. প্র. ৪।৮

৬। সি. সি. স. ৪।৩৬

উদয় হয়। অভিন্নহই পূর্ণত্ব, ভেদবিরহই সামরস্ত। ভেদই দুঃখদায়ক, ভেদবিরহই পূর্ণানন্দ। জীবের স্বরূপানুসন্ধানের ফলে যে আত্মবোধ বা নিজাবেশের উদয় হয়, তাহা হইতে অমল-সুখ-চমৎকার-প্রাপক প্রকাশ-স্বরূপ সংবিদের উদয় হয়।^১

“ততঃ সচ্চিদানন্দ-চমৎকারাদ্ অভূতাকার-প্রকাশ-প্রবোধঃ জায়তে। প্রবোধাদ্ অখিলমেতদ্ দ্বয়াদ্বয়-প্রকটতয়া চৈতন্যভাসাভাসকং পরাৎপর-পরমপদমেব প্রক্ষুটং ভবতি।”^২ তৎপরে সেই আনন্দ হইতে প্রকাশময় জ্ঞানের উদয় হয়, এবং এই প্রকাশের জ্ঞান হইতে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বকে প্রকটিত করিয়া চৈতন্যভাস দ্বারা আভাসিত পরমপদ প্রক্ষুট হয়।

শক্তির সমস্ত চকলতা সংবৃত হইলে শক্তি নিরুত্থানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শিব-স্বরূপে আত্মলীনা হয়। কারণ যখন স্বভাবতঃ আত্মলীন বা নিরুত্থানদশা হয় তখনই শিব, যখন শক্তি সক্রিয় বা সজ্জাত তখনই শক্তি; এই নিরুত্থানদশাতেই কুল ও অকুল বা শিব ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত, উহাই সহজাবস্থা। উহাই সামরস্তের ভূমি।^৩ উহাই পূর্ণ সত্য। তদ্ব্যসারেও উক্ত হইয়াছে, “স্বভাব এব পরমোপাদেয়ঃ স চ সর্বভাবানাং প্রকাশরূপ এব।”^৪ অর্থাৎ স্বভাব বা সহজাবস্থাই পরম উপাদেয় পূর্ণ সত্য। উহাই সর্বভাবে প্রকাশক স্বপ্রকাশ।

যাহা সর্বগত হইয়াও আপন মাহাত্ম্যে স্থির ও পরিপূর্ণ দ্বৈতাদ্বৈত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও নিত্য-স্বরূপ বা নিরন্তর^৫, ভাবগম্য নিরাকার ও দৃষ্টিগোচর সাকার এতদুভয়ই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত অথচ যাহা ভাবাভাব-বিনির্মুক্ত অন্তরাল-স্বরূপ, ভেদাভেদবর্জিত কেবল-স্বরূপ, তাহাই পূর্ণ, তাহাই সত্য।^৬

এই পূর্ণ সত্যের কোন হেতু নাই, কোন দৃষ্টান্ত নাই সুতরাং ইহা অহেতুক স্বয়ংসিদ্ধ। ইহা মনোবুদ্ধ্যাদির অগোচর, মহাশূন্যাত্মক বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দ-ঘন-তত্ত্ব।

হেতু-দৃষ্টান্ত-নির্মুক্তং মনোবুদ্ধ্যাগোচরম্।

ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দং তত্ত্বং তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ (বিবেক-মার্গঃ।^৭)

১। সি. সি. স. ৪১১, সি. সি. প. ৭৮

২। সি. সি. প. ৭৮

৩। সি. সি. স. ৪১৩, সি. সি. প. ৪১৩, ৩

৪। অভিন্নব ভগ্ন, তদ্ব্যসার পৃ ৩

৫। গো. সি. স. পৃ ১১

৬। গো. সি. স. পৃ ৩৪

৭। গো. সি. স. উদ্ভূত পৃ ৪১

এক ব্যবহারে যাহা নিগূর্ণ অথবা ব্যবহারে যাহা সগুণ এতদ্ব্যভয়ের
আধারভূত সর্বস্বাধার^১ ও ঐক্যভূমি নাথ-অবস্থাই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ।
ইহাতে নিগূর্ণ ও সগুণ ঐক্যপ্রাপ্ত হয়, দ্বৈতাদ্বৈত, সত্যাসত্য, জড় ও
চৈতন্য সমস্ত ভাবজাতই সমতা প্রাপ্ত হয়।^২

দ্বৈতমতে ব্রহ্ম সক্রিয়, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। কিন্তু ক্রিয়া ও
অক্রিয়ার কোনটাই নিরন্তর নহে বলিয়া অক্ষর নহে। “সর্বদা ক্রিয়ৈব
ন ভবতি, সর্বদা অক্রিয়ৈব চ ন ভবতি।” ক্রিয়াও নিরন্তর নহে,
অক্রিয়াও নিরন্তর নহে। “ক্রিয়াক্রিয়ে ছয়েইপি শক্তি-তৎস্ব এব।” ব্রহ্মে
ক্রিয়া ও অক্রিয়া দুই শক্তিই আছে।^৩ বিশ্বময়ত্বই তাঁহার সক্রিয় সগুণ
ভাব, আর বিদ্বোত্তীর্ণত্বই তাঁহার নিষ্ক্রিয় নিগূর্ণ ভাব। “অকর্তৃ তৎকর্তৃ চ
তৎ পরং পদম্”।^৪ পরম-পদ বা নাথ-স্বরূপে কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব দুই-ই
আছে। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ইত্যাকার একদেশী দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ণত্বের
নির্দেশ হয় না।^৫ যোগবীজে উক্ত হইয়াছে, “পরিপূর্ণস্বরূপং তৎ
সত্যমেতদ্ বরাননে। সকলং নিকলধৈব পূর্ণতাচ্চ তদেব হি” ॥^৬ সকলত্ব
ও নিকলত্ব এই দুই মিলিয়াই তাঁহার পূর্ণত্ব। পূর্ণত্বের অধিগমেই চরম-
সত্যের অধিগম হয়। সামরস্যই সেই পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সত্যই পরমপদ বা
সহজাবস্থা।

বিবেক-মার্গেও সামরস্যের বিষয় নিম্নের উপমা দ্বারা বুঝান
হইয়াছে—

যথা ঘৃতে ঘৃতং ক্ষিপ্তং ঘৃতমেব হি জায়তে।

ক্ষীরে ক্ষীরং তথা যোগী তত্ত্বমেব হি জায়তে ॥

ঘৃতে ঘৃত এবং ক্ষীরে ক্ষীর নিষ্কিপ্ত হইলে যেমন যথাক্রমে ঘৃত ও ক্ষীরই
হয়, সেইরূপ যোগীও পরতত্ত্বে উপনীত হইয়া তত্ত্বের সহিত সমাক্ সমতা
প্রাপ্ত হন।^৭ এই উপমা দ্বারা সমরসীকরণের রহস্য খ্যাপিত হইয়াছে।
ঘৃত হইয়া ঘৃতে প্রবেশ করিতে হইবে, ক্ষীর হইয়া ক্ষীরে প্রবেশ করিতে
হইবে। জীব-ভাবের সমস্ত দোষ ও মল পরিহারপূর্বক, নির্মল ও নির্দোষ
হইয়া “স্বরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিতিম্ আপ্নোতি কেবলম্”,^৮ অর্থাৎ প্রথমে

১। গো. সি. স. পৃ ৭০

২। গো. সি. স. পৃ ৭০

৩। গো. সি. স. পৃ ৭১

৪। গো. সি. স. পৃ ৪২

৫। গো. সি. স. পৃ ৭১

৬। যোগবীজ ২৪, ২৫

৭। বিবেকমার্গে, গো. সি. স. পৃ ৪১

৮। যোগবীজ, ১০০ শ্লোক

ভেদময় বিশ্বকে অতিক্রমপূর্বক নির্বিকল্পপদে আকৃষ্ট হইলে পশ্চাৎ পরতত্ত্বের সহিত সামরস বিধানানন্তর বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত ভাবের অধিগম হয়। বিশ্বের পরিচ্ছিন্ন প্রকাশকে পশ্চাতে রাখিয়া সকল প্রকাশের প্রকাশক পরতত্ত্বে মিলিত হইলে নিরুত্থান-দশাপ্রাপ্ত সিন্ধযোগী দেখেন, “তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।”^১ তখন পরিত্যক্ত বিশ্ব আপন বিশ্বোত্তীর্ণ স্বভাবে অঙ্গীকৃত হয়। ইহাই সমরসীকরণ।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে—সামরস্যায়ক সহজাবস্থা বা পরম-পদ-লাভই নাথমার্গিগণের সাধনের চরম লক্ষ্য। এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রবল পুরুষকার ও গুরুকৃপার অর্থাৎ সর্বাস্তর্যামী পরমশিবের শক্তিপাতের^২ একান্ত প্রয়োজন। “তেন সন্দর্শিতে মার্গে স্বসংবেদ্যস্য দর্শনম্”—সদৃশ-প্রদর্শিত পথেই স্বসংবেদ্য পরম-পদের প্রাপ্তি সম্ভব।^৩ গুরুর পরা-কৃপা বিনা চিত্তবিশ্রান্তি-লাভ ছল্লভ।^৪ কিন্তু “ন কর্মণা বিনা দেবি যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে,” বীৰ্য্য-সহকারে সাধন-রূপ কর্ম বিনা যোগে সিদ্ধি লাভও হয় না।^৫ কারণ সেই পরমপদ সাধনশীল যোগিগণেরই অপরোক্ষানুভূতিগম্য—“তত্ত্ব পদং তাদৃগ্-যোগিনামেব অপরোক্ষম্।” সত্যবাদী হৃষ্টচিত্ত স্মৃতরাঃ^৬ জিতেন্দ্রিয় এবং ক্ষোভাকাজ্জ্বাদি-দোষহীন মুমুক্শুগণ বহু যত্ন ও উপায়-সহায়ে গুরু-প্রসাদে সেই পরমপদ লাভে সমর্থ হন।^৭ জ্ঞান ও যোগরূপ দুই উপায়ের দ্বারা পরমপদ সাধ্য। বীৰ্য্য-সহকারে খড়্গ চালিত না হইলে যেরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানহীন যোগ ও যোগহীন জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে।^৮ জ্ঞানযুক্ত যোগ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ সম্ভব। এক্ষণে কিরূপ জ্ঞান ও যোগ দ্বারা পরমপদ-প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

পরিচ্ছিন্ন দেহাভিমান বা সঙ্কল্প ত্যাগপূর্বক সর্বব্যাপক পরমনাথ পরমেশ্বরকে যথাতথ্যতঃ উপলব্ধি করিয়া জীব মুক্ত হয় এবং তাদৃশ হয়। “তং সঙ্কল্পং বিহায় সর্বব্যাপকং পরমনাথং যথাতথ্যেন পশ্যত্যথ মুক্তো

১। কঠ উঃ ২।২।১০ বেতা উঃ ৩।১৪
২। সি. সি. প. ২।৩৫
৩। সি. সি. প. ২।১৮
৪। সি. সি. প. ২।৩১

৫। যোগবীজ ১০০ শ্লোক
৬। গো. সি. সি. পৃ ১১
৭। সি. সি. প. ২।২১
৮। যোগবীজ ৬০, ৬৪ শ্লোক

ভবতি তাদৃশ এব স্তাং”।^১ সঙ্কল্প বা দেহাভিমান থাকিলেই শীতোষ্ণ-মুখহৃৎখাদি শত্র্যাগ্নি জলমারুত নানাবিধ জীব-সংস্পর্শ এবং বহুতর মানস ব্যাধিদ্বারা শরীর পীড়িত হইয়া চিত্ত ও তৎসহ প্রাণ সংকুচ হয়।^২ এইরূপে বহু হৃৎখের দ্বারা আকুলিতচিত্ত জীব দেহাবসানকালে তাৎকালিক ভাবনারূপ গতি লাভ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়।^৩ অপক পার্থিব জড়দেহই হৃৎখের কারণ।^৪ যোগাগ্নিতে মহাভূতাদি তত্ত্বসকল যথোক্তক্রমে হৃত হইলে সপ্তধাতুময় পার্থিব দেহ দক্ষ হয় এবং অজড় শোক বর্জিত মহাবল পক যোগদেহ-লাভ হয়।^৫ চিত্ত নিরাকুল হইলেই যোগ সম্ভব। চিত্তের সহিত প্রাণ সমৃদ্ধ, প্রাণজয়েই চিত্ত জয়।^৬ এবং প্রাণাপানের সমাযোগে চন্দ্রসূর্য্যের ঐক্য-সম্ভূত যোগাগ্নি দ্বারাই সপ্তধাতুময় দেহ দক্ষ হয়।^৭ তখন জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।^৮ জীবৎকালে যে সাধক প্রাণকে বিলীন করিতে সক্ষম হন, তাহার পিণ্ডপাত হয় না, অর্থাৎ দৈহনাশ হয় না, চিত্ত সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয় এবং শুদ্ধচিত্তে স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।^৯

প্রাণজয়ের সিদ্ধ-সম্মত উপায়ের বিষয় অণ্ডত্র সাধন-অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। অধুনা নৈরুখ্য-লাভানন্তর পরম-পদের সহিত সমরসীকরণের বিষয় সংক্ষেপতঃ আলোচিত হইতেছে। অর্থাৎ জৈব-চাক্ষু্য দূরীভূত হইলে জীবের পরমপদের সহিত যে তাদাস্য হয় সেই বিষয় বিবৃত হইতেছে।

সহজ, সংযম, সোপায় ও অদ্বৈতাভিধেয় চতুর্বিধ অন্তরঙ্গ জ্ঞান-ভাবের ক্রমিক উদয়ে পরমপদে প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়। বিশ্বাতীত পরমেশ্বরই বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহা জানিয়া বিশ্বকেও আপনার মধ্যে দর্শন করিতে পারাই সহজজ্ঞান। ইহার অপর নাম স্বাস্থ্যসংবিৎ। বাহ্য জগতের সহিত সংস্পর্শে যে সমুদয় বৃত্তির উদ্বেক হয়, তাহাদিগকে সম্যক অবধানতার সহিত আপন আত্মায় প্রত্যাহৃত করিয়া ধারণা করাই সংযম। সংযমই সর্ব্বনিগ্রহ।

১। পো. সি. স. পৃ. ২, ৩

২। যোগবীজ ৩৬, ৩৭ শ্লোক

৩। ঐ ৩৮, ৩৯

৪। ঐ ৩৪

৫। ঐ ৩৪, ৪২

৬। যোগবীজ ১৩, ১৪ শ্লোক

৭। ঐ ১০

৮। ঐ ৬২

৯। ঐ ১৮, ১৯

বিষয়ের সংস্পর্শে তাহার প্রতিলৌল্যজনিত অথবা স্বতঃই বিবিধরূপে প্রকাশমান আয়ত্নভাবে সংবৃত করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করাই সোপায়জ্ঞান। ইহাই স্বস্ববিশ্রাস্তি। আর সকল ভেদহীন এমন কি দৃষ্টদৃশ্য-ভাবহীন যে নির্বিকলতা, নিত্যত্ব, নিরুত্থান অবস্থা তাহাই অদ্বৈত বা সাদৃশ্য জ্ঞান, তাহাই পরম-পদ। এই অদ্বৈত-স্বরূপ পরম-পদে আকৃষ্ট যোগী নিত্যত্ব নিরবিকল হইয়া নিরুত্থানদশায় অধিষ্ঠান করেন।^১

সকল চাকল্যের বিশ্রাস্তিই নিরুত্থান-দশা। সম্বলই সকল চাকল্যের মূল। দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির চাকল্য ও তৎকারণভূত সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে সংকল্প নিরুদ্ধ হয়। সংকল্পের নিরোধে নির্বিকলতার উদয়ে নৈরুত্থানলাভ হয়। নৈরুত্থাই সামরসের বা পরম-পদে স্থিতি-লাভের উপায়-ভূত। কিন্তু মাত্র নৈরুত্থাই পরম-পদ নহে। নৈরুত্থা-লাভের পর নিজাশক্তি বা পরাশক্তি বা উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ পরমাবস্থা বা পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতিলাভ করে। তখন বিকল ও নির্বিকলতার ভেদও তিরোহিত হইয়া যায়। পূর্ণব্রহ্ম সেইজন্য নির্বিকল এবং বিশ্ণোত্তীর্ণ হইয়াও বিশ্বময়। উহা যুগপৎ নিরাকার ও সাকার এবং সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনন্তাকারময়। তখন বুঝা যায় এক পূর্ণই স্বস্বাতন্ত্র্য-বলে বা আপন স্বরূপ-মহিমায় আপন নিরঞ্জন-স্বরূপ হইতে অচ্যুত থাকিয়াও বিশ্বরূপে ভাসমান হয়।^২

“এস্তে স্ববেগ-নিচয়ে পদপিণ্ডমৈক্যং সত্যং ভবেৎ সমরসম্” পিণ্ডের নিখিল বেগ উপশান্ত হইলে তবেই পদপিণ্ডের সমরসময় ঐক্য নিষ্পন্ন হয়।^৩ গুরুপদিষ্ট পন্থায় অপিণ্ড হইতে পরপিণ্ড পর্য্যন্ত নিখিল পিণ্ডের জ্ঞান চিন্তে ধারণ করিয়া সম্যক্ অবহিত বা অবিপ্রবা স্মৃত্যাকৃষ্ট হইয়া মুমুক্শুগণ পরম-পদের সহিত রসসাম্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।^৪

উপনিষৎও বলেন—যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার-শূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া থাকেন।

১। সি. সি. স. ৩।১৭-২৪; সি. সি. স. ৩।২০-২২

২। “ব্রহ্মবিজ্ঞান ও পরমপদ”, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, কাল্কট, ১৩৪৭, পৃ. ৩১০

৩। সি. সি. প. ৩।৮৪

৪। সি. সি. স. ৩।২

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেতি তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥^১

“যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পরমাং পদম্ ॥”^২

কুণ্ডলিনী প্রবোধিত হইলে এবং কায়িক মানসিক সর্ব কৰ্ম নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইলে সহজাবস্থা-লাভ হয় ।

উৎপন্ন-শক্তি-বোধস্ত ত্যক্তনিঃশেষকৰ্মণঃ ।

যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে ॥^৩

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ ।

মূৰ্দ্ধন্যধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ।

ওমিতোকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামহুস্মরন্ ।

যঃ প্রযাতি তাজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥^৪

অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া যোগধারণার আশ্রয়ে প্রাণসকলকে মস্তকে স্থাপন করিয়া একাক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে ও ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ।

তপসঃ প্রাপ্যতে সৎ সৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ ।

মনসঃ প্রাপ্যতে হ্যাত্মা যমাপ্তা ন নিবৰ্ত্ততে ।

(মৈত্রায়ণ্যপনিষৎ ৪।৩)

অতএব বুঝা গেল মন-বুদ্ধির সহিত দেহেন্দ্রিয়কে ব্যাপার-শূন্য করাই পরাগতি লাভের মুখ্য সাধন ।

যোগানুষ্ঠানদ্বারা কায়, মন ও প্রাণের সর্বকৰ্ম নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইলে কিরূপে সহজাবস্থা-লাভ হয় তাহা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইতেছে । আসনদ্বারা দেহ স্থির ও কুন্তক মুজাদির দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়-দ্বার অর্গলবদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে সঞ্চারশীল বায়ু বা প্রাণশক্তিসকল একমাত্র প্রাণরূপে পরিণত হইয়া নাড়ী-সামরস্ত সম্পাদন করে । তৎপরে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনদ্বারা নিকম্পতা লাভানন্তর নৈরুখ্য-প্রাপ্তি হয় । অর্থাৎ আসনাদি

দ্বারা কায়িক ব্যাপার পরিত্যক্ত হইলে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার-সহ মন ও বুদ্ধি সক্রিয় থাকে, এবং প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা প্রাণেন্দ্রিয়-সহ মানসিক ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া ঐ ব্যাপার বুদ্ধিতে থাকে। অনন্তর পরম বৈরাগ্য দ্বারা বুদ্ধি-ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে নির্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, ইহাই সহজাবস্থা।^১

‘নৈরুখ্যের স্বরূপ’—চাঞ্চল্যের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সমাকৃ চিন্তাবিশ্রাস্তি ও স্বপ্নমধ্যে নিমগ্নতাই নিরুখ্য।^২ বাসনা বা আশয় ও ফলাকাঙ্ক্ষা হইতেই চাঞ্চল্যের উদ্ভব। সেইজন্য নৈরুখ্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ “স্বস্বাশয় প্রলয় কর্ম মুখানুসন্ধি আবেশের” প্রয়োজন অর্থাৎ নিখিল বাসনার উন্মূলনকারী ভাবনারূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং সাধনজ সমস্ত সিদ্ধিফলের পরিহার একান্ত কর্তব্য, “স্বসিদ্ধিফলবর্গম্ অপাশ্য লক্কনৈরুখ্য”।^৩ বাসনার উন্মূলনকারী ভাবনা বা চিন্তা-লয়কারী ক্রিয়া ও সিদ্ধিফলের ত্যাগ হইতে সর্ববৃত্তির নিরোধক নিকম্পতা বা স্তৈর্য্যের আবির্ভাব হয় “ভবতি কশ্চন তত্র নৈজঃ”। উক্ত নিকম্পতা লব্ধ হইলে বা একঃ অর্থাৎ চাঞ্চল্য দূর হইলে নিজাবেশ বা আত্মস্বরূপ-বোধের উদয় হয়। আত্মবোধের দৃঢ়তা হইতে নিবিড়তম নৈরুখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এক সর্বব্যাপী নিত্য (বিতত ও সতত) আনন্দ-অবস্থার স্ফূরণ হইতে জ্ঞানৈকরস অমলসুখ চমৎকার প্রাপক স্বপ্রকাশ-বোধের উদয় হয় এবং সমস্ত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়; ইহাই ভেদ-বিরহ।

এই বোধের সমাকৃ উদয় হইতে অপার অভিন্ন চৈতন্যভাসক পরম-পদ অধিগত হয় এবং যোগীর নিজ পিণ্ডেরও সংবেদন হয়।^৪ পরম-পদের সহিত নিজ পিণ্ডের তথা নিখিলপিণ্ডের অভিন্নত্ব-বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই সমরস-ক্রিয়া। পরম-পদের সহিত প্রাথমিক ঐক্য-বিধানের পর নিজ-পিণ্ড-পরীক্ষণ-রূপ যে স্বস্বরূপ কিরণানন্দের উন্মেষ হয় তাহার প্রত্যাহরণই সমরসক্রিয়া।^৫ এই উন্মেষ বিশ্ব বা বিকল্প হইতে নিজ নির্বিকল্পস্বরূপের ভেদরূপ।^৬ এই উন্মেষের প্রত্যাহরণ বা বিকল্প হইতে নিজ নির্বিকল্পস্বরূপের ভেদবোধের তিরোধান-রূপ

১। হ. যো. প্র. ৪।১০, ১১

২। সি. সি. প. ৫।৮২

৩। সি. সি. স. ৫।৯, ১০

৪। সি. সি. স. ৫।১০, ১১, ১২

৫। সি. সি. স. ৫।১০, ১১; সি. সি. প. ৫।১১

৬। “দুত্ববিজ্ঞান ও পরমপদ” প্রবন্ধ, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ. ৩১

সমরস-ত্রিগ্না দ্বারা যোগী আপন শক্তিপুঞ্জকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তির মহিমা-রূপে অনুভব করিয়া (“নিজ-কিরণ-পুঞ্জং নিজতয়া প্রপশ্যন্তঃ”) তাহা হইতে নিখিলাস্তর্ব্বত্তী শক্তিসমূহের অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিখিলকে স্বরূপে অঙ্গীকৃত করেন।^১ এই অঙ্গীকারের ফলে যোগী আপনাকে বিশ্বময় ও বিশ্বো-ত্তীর্ণ জানিয়া কৃতার্থ হন।

জীব নানাশক্তির সংঘাত, একই শক্তি উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ-শক্তিরূপে জীবের ত্রিধা অধিষ্ঠিত। অধঃশক্তির সঙ্কোচন অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে মন-ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যাহারণ, মধ্যশক্তির প্রবোধন বা প্রত্যক্-চেতনের স্বরূপাগম এবং উর্দ্ধশক্তির নিপাতন বা পরমতত্ত্বের নিজাশক্তির অবতরণরূপ কৃপার দ্বারা পরমপদ-লাভ হয়। ইহাই নিজাশক্তিসহ অনামা বা পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতি, ইহাই সামরস্ত।^২

“সমরসীকরণের প্রাথমিক অবস্থায় আত্মা বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় নির্বিকল্প-পদে স্থিতিলাভ করে। পরে ভগবানের পরমাশক্তির অনুগ্রহে নিজ পূর্ণত্ব অনুভব করে। তখন বৃষ্টিতে পারে ঐ পূর্ণ সামরস্ত-ময় স্বরূপে একদিকে যেমন অনন্ত শক্তির সামরস্ত, অপরদিকে তেমনি শক্তি ও শক্তিমানের সামরস্ত। উহাতে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এক অখণ্ড বোধ বা প্রকাশরূপেই ক্ষুরিত হয়। বন্ধন ও মোক্ষের ভেদ, সবিকল্প ও নির্বিকল্পের ভেদ, মন ও আত্মার ভেদ, এবং দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভেদ চিরতরে বিগলিত হইয়া যায়। ঐ অবস্থাভীত অবস্থার উপলব্ধি করাই পরাগতি।^৩ উহাই সামরস্তাত্মক পরম-পদ। সামরস্তই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীনিত্যানাথ, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে বলিয়াছেন, “স্বয়ং জ্যোতিঃ সত্যামেকং জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে”।^৪

১। সি. সি. স. ৪।১৪

২। অমরৌঘশাসনম্ (গৌরকনাথকৃত) — ১ম স্কো ৮

৩। “হুত্বাবিজ্ঞান ও পরমপদ” প্রবন্ধ, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ, কাল্কিন, ১৩৪৭, পৃ. ৩১২

৪। গো. সি. স. পৃ ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিণ্ডতত্ত্ব

নাথগণ বলেন সত্যবিচারে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বলিয়া কিছু নাই। তথাপি লোক-প্রতীতির অনুরোধে লয়োৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিতে হয়।^১ একাকার অথচ অনন্তশক্তিমান পরমেশ্বর নিজ আনন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের নানাকারে বিলসন-পূর্বক স্বয়ং স্বপ্রতিষ্ঠাকৃত হন, ব্যবহার-দৃষ্টিতে এইরূপই উপলব্ধি হয়।^২ কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বাকাররূপে ক্ষুরিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান পরমশিব নিত্যকালই আপন পূর্ণস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড নানারূপে তাহা হইতে প্রসূত হইলেও তিনি পূর্ণই থাকেন।

শ্রুতিও বলেন—

ও পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্টতে ॥^৩

ও উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহাও অর্থাৎ নামরূপস্থ ব্রহ্মও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন, পূর্ণের অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মের পূর্ণই গ্রহণ করিলে পূর্ণই মাত্র অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

সুতরাং ব্যবহার-দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড ভাবের উপরম হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই অব্যক্তস্বরূপ অনামা পরব্রহ্ম। সেখানে কার্য্য নাই, কারণ নাই, কুলাকুল নাই, স্বয়ং কর্তৃভাবও নাই।^৪ উহা স্বয়ংপূর্ণ অনাদিসিদ্ধ অথও একস্বরূপ লয়োৎপত্তিহীন পরমতত্ত্ব।^৫ এই পরমতত্ত্ব হইতেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয়, এবং তাহাতেই লীন হয়। কিন্তু যাহা কার্য্য-কারণ-কর্তৃহীন তাহা হইতে কিরূপে কার্য্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়? তদ্বত্তরে নাথগণ বলেন, সেই অনাদিসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ অনামা পরমতত্ত্বে ধর্মাধর্ম্মিণী ইচ্ছামাত্র নিজাশক্তি অবিভাবী রূপে চিরবিদ্যমান।^৬ সেই নিজাশক্তি হইতেই তাহার স্বয়ংকর্তৃত্বের আবির্ভাব হয়, তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

১। সি. সি. প. ১১২

২। সি. সি. প. ৪১২

৩। ইশোপঃ শান্তিপাঠ

৪। সি. সি. প. ১১৪, সি. সি. স. ১১৪

৫। সি. সি. প. ১১৫

৬। সি. সি. প. ১১৫, সি. সি. স. ১১৫

অসঙ্গা ইদমগ্র আসীং । ততো বৈ সদজায়ত
তদাঙ্গানং স্বয়মকুরুত । তস্মাৎ স্কৃতমুচ্যতে ।^১

অর্থাৎ এই অভিব্যক্ত জগৎসৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্মই ছিলেন । সেই অসংশয়বাচ্য ব্রহ্ম হইতেই ব্যাকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল । তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাকে স্কৃত বা স্বয়ংকর্তা বলা হয় । স্বয়ংকর্তৃত্বের কারণভূতা নিজাশক্তির প্রসর হইতেই ক্রমশঃ অব্যক্ত পরমব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয় ।^২ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত বাহ্য স্থূলরূপের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত যে যে স্তর বা ক্রম আবির্ভূত হয় তাহাদের প্রত্যেকটীকে পিণ্ড বলা হয় । এইরূপ ষট্‌পিণ্ডের দ্বারা চরাচর সংসিদ্ধ হইয়াছে ।

অনামার বা অব্যক্তের নিজাশক্তি হইতে প্রথম উন্মুখতারূপ পরাশক্তি, তৎপরে পরাশক্তি হইতে স্পন্দনমাত্র অপরাশক্তি, অপরাশক্তি হইতে সূক্ষ্ম অহস্তারূপ সূক্ষ্মাশক্তি, এবং সূক্ষ্মাশক্তি হইতে বেদনশীলা কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্ভূত হন ।^৩

সহজাবস্থায় অনামায় অন্তর্লীন নিজ, পরা, অপরা, সূক্ষ্মা ও কুণ্ডলিনীশক্তির প্রত্যেকটীতে পাঁচটি করিয়া গুণ বিद्यমান আছে । নিজাদি পঞ্চশক্তির পঞ্চবিংশতি গুণকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বোৎপত্তির প্রথম পর্ব্বরূপ পরপিণ্ড উদ্ভূত হয় ।

নিজাপরাহপরা সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীশ্চ পঞ্চধা ।

শক্তিচক্রমেণোখো জাতঃ পিণ্ডঃ পরঃ শিবে ॥^৪

পরপিণ্ড হইতে অপরংপর, পরমপদ, শূণ্য, নিরঞ্জন ও পরমাঙ্গা রূপ পঞ্চতত্ত্বাত্মক অনাদিপিণ্ড সমুৎপন্ন হয় । অপরংপর তত্ত্ব হইতে ক্ষুরতামাত্র, পরমপদ হইতে ভাবনামাত্র, শূণ্য হইতে স্বসত্ত্বামাত্র, নিরঞ্জন হইতে স্বসাক্ষাৎকারমাত্র, পরমাঙ্গপদ হইতে পরমাঙ্গা-ভাবে আবির্ভাব হয় । অপরংপরাদি পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকটিরও পাঁচটি করিয়া গুণ আছে ।^৫

অনাদি পিণ্ড হইতে পরমানন্দ, পরমানন্দ হইতে প্রবোধ, প্রবোধ

১। তৈত্তিরি, উপঃ ২।৭

২। শক্তিপ্রসঙ্গসঙ্কোচো জগৎ সৃষ্টিসংক্রান্তী, সি. সি. স. ৪।২৪ ; সি. সি. প. ৪।২০

৩। সি. সি. স. ১।৫, ৬ ; সি. সি. প. ১।৬, ৮

৪। সি. সি. প. ১।১৬ ; সি. সি. স. ১।১২ শক্তিপঞ্চকসমুৎপত্ত পঞ্চবিংশতিসংক্রান্ত ।

পরপিণ্ডসমুৎপত্তিঃ সিদ্ধান্তজৈঃ সমীকৃত্য ।

৫। সি. সি. প. ১।২৪, সি. সি. স. ১।১৪-২০

হইতে চিদুদয়, চিদুদয় হইতে প্রকাশ, প্রকাশ হইতে সোহহম্ভাবের আবির্ভাব হয়। পরমানন্দাদি পঞ্চভূত ও তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া, সাকুল্যে পঞ্চবিংশতি গুণ লইয়া আত্মপিণ্ড গঠিত।^১

পর, অনাদি ও আত্মপিণ্ড নিরাকার স্বরূপ। আত্মপিণ্ডই সাকার সৃষ্টির বীজস্বরূপ। আত্মপিণ্ড হইতে প্রথমে মহাকাশ, মহাকাশ হইতে মহাবায়ু, মহাবায়ু হইতে মহাতেজ, মহাতেজ হইতে মহাসলিল এবং মহাসলিল হইতে মহাপৃথ্বী আবির্ভূত হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ে আছে (২।১।৩)—

তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ।

বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ।

ওষধীভোহন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।

অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্ম হইতে আকাশ, তৎপরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ, অপ হইতে পৃথিবী, এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। ইহাদেরও পাঁচ পাঁচ করিয়া গুণ আছে। পঞ্চমহাভূত ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সাকার বা মহাসাকার পিণ্ড।^২ মহাসাকার পিণ্ডের মিলিত ভাবই শিব।

শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ হইতে সদাশিব, সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা, এই পর্যায়ক্রমে মহাসাকার পিণ্ডের অষ্টমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে।^৩

“স এব শিবঃ শিবাদ্ ভৈরবো ভৈরবাৎ শ্রীকণ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠাৎ সদাশিবঃ সদাশিবাদ্ ঈশ্বরঃ ঈশ্বরাদ্ রুদ্রো রুদ্রাদ্ বিষ্ণু বিষ্ণোত্র্যক্ষৈতি মহাসাকার-পিণ্ডস্ত মূর্ত্ত্যষ্টকম্।”

অষ্টমূর্ত্ত্যাক্ষক শিবের অদ্বৈত মূর্ত্তি ব্রহ্মার দৃষ্টি বা অবলোকন হইতে সাকার পিণ্ডের পঞ্চভূত বা পঞ্চবিংশতি গুণের সমাবেশে নরনারীরূপ— অর্থাৎ জীবভূত— প্রকৃতিপিণ্ডের উৎপত্তি হয়। পঞ্চপঞ্চাক্ষক জীবশরীরই প্রকৃতিপিণ্ড। জীবশরীরে অস্থিমাংসাদি পঞ্চভূত্যাংশ, শোণিতাদি পঞ্চ-অপ্ অংশ, ক্ষুদ্রক্ষাদি পঞ্চতেজ অংশ, ধাবন-চলনাদি পঞ্চবায়ু অংশ এবং রাগদ্বেষাদি পঞ্চনভঃ অংশ সমাবিষ্ট। তজ্জগৎ ইহা পঞ্চবিংশতি গুণযুক্ত

১। সি. সি. প. ১।৩০; সি. সি. স. ১।২১-২৮

২। সি. সি. প. ২।৩১-৩৪; সি. সি. স. ১।২২-৩৪

৩। সি. সি. প. ১।৩৯; সি. সি. স. ১।৩৫, ৫৬

ভূতসমূহের পিণ্ড ভূতানাং পিণ্ড—বলিয়া অভিধেয়। প্রকৃতিপিণ্ডকে অবলোকনপিণ্ডও বলা হয়।^১

“প্রাকৃত পিণ্ডে স্ম্যঃ পঞ্চভূতানি তদগুণাঃ”।^২

নাথগণের দৃষ্টি অনুসারে জীব পঞ্চ অস্তঃকরণ বিশিষ্ট। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিন্তা ও চৈতন্য সেই পঞ্চ অস্তঃকরণ। প্রত্যেক অস্তঃকরণেরও পাঁচটি করিয়া গুণ আছে।^৩

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত প্রসূত হইয়াছে। ব্যক্তও অব্যক্তে বিশ্রাস্তি লাভ করে। যাহা ব্যক্ত তাহাই কুল, আর তাহার যাহা নিমিত্ত তাহাই অকুল। অকুলতা অব্যক্ত, কিন্তু তাহা অনামা হইতে ভিন্ন। অব্যক্ত অনামায় সর্বপ্রকার কারণ ভাবের উন্মেষহীনতা; কিন্তু অব্যক্ত অকুলে কারণতা অর্থাৎ নিমিত্তত্ব ভাবের উন্মেষ আছে। অকুলরূপ নিমিত্ত বা কারণ হইতেই কুলরূপ ব্যক্ত কার্যের উদ্ভব। সেইজন্য নাথগণ বলেন—

অকুলং কুলমাধন্তে কুলং চাকুলমিচ্ছতি।

জলবৃদ্ধুর্দ্বন্দ্বে শ্রায়াদেকাকারঃ পরঃ শিব ॥^৪

অর্থাৎ অকুলই কুলকে ধারণ করিয়া আছে এবং কুল অকুলকেই আকাজ্ঞা করে। জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত অখিলের যাহা নিমিত্ত তাহাই অকুল।^৫ জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত কুল পঞ্চায়ক। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কাল ও জীব এই পঞ্চের নাম কুলপঞ্চক। ইহাদেরও প্রত্যেকটির পাঁচটি করিয়া গুণ আছে।^৬ তন্মধ্যে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীত এই পঞ্চ অবস্থাই তাহার পাঁচগুণ।^৭ সেইরূপ যে পঞ্চশক্তিকে লইয়া জীবের ব্যক্তিত্ব সেই বাসনাদি পঞ্চগুণযুক্ত ইচ্ছাশক্তি, স্বকুলাচারাди পঞ্চগুণযুক্ত ক্রিয়াশক্তি, মদাদি পঞ্চগুণযুক্ত মায়াশক্তি, আকাজ্ঞাদি পঞ্চগুণযুক্ত প্রকৃতিশক্তি এবং পরা পশুস্তী মধ্যমা বৈশ্বরী ও ইষ্টমাতৃকারূপ বাক্শক্তিকে ব্যক্তিপঞ্চক আখ্যা দেওয়া হয়।^৮

কাম কর্ষ চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি এই পাঁচটিকে লইয়া ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড বা প্রপঞ্চগোচরীভূত রহিয়াছে ও সেইহেতু নাথদর্শনে এই পাঁচটি প্রত্যক্ষকরণ-পঞ্চক বা প্রত্যক্ষকৃতিহেতু নামে অভিহিত হয়। কামের পঞ্চগুণ, কর্ষের

১। সি. সি. প. ১।৩৭-৪৩; সি. সি. স. ১।৩৭-৪০ ৫। সি. সি. স. ৪।১০

২। সি. সি. প. ১।৪১

৬। সি. সি. প. ১।৪০; সি. সি. স. ১।৪৬

৩। সি. সি. প. ১।৪৪-৪৫

৭। সি. সি. প. ১।৪০; সি. সি. স. ১।৪২

৪। সি. সি. প. ৪।১১

৮। সি. সি. প. ১।৪৬-৪১; সি. সি. স. ১।৪০-৪৩

পঞ্চগুণ, চন্দের ষোড়শকলা, সূর্যের দ্বাদশকলা, এবং অগ্নির দশকলা প্রসিদ্ধ। এতদতিরিক্ত চন্দের নিবৃত্তি বা অমৃতকলা, সূর্যের প্রকাশিকা বা নিজকলা ও অগ্নির পরাজ্যোতি নামে আরও এক একটি কলা আছে।^১

কাম বা কামনা বা সংস্কার হইতে কৰ্মের উদ্ভব, চন্দ্রসূর্য্যরূপ কালের বা ইড়াপিঙ্গলাবাহী প্রাণশক্তির আশ্রয়ে এবং অগ্নিরূপ শক্তির সহায়ে কৰ্ম নিষ্পন্ন হয়। কাম ও কৰ্ম নিবৃত্ত হইলে চন্দের অমৃতকলা, সূর্যের প্রকাশিকা কলা এবং অগ্নির পরাজ্যোতিকলা যখন আপন আপন তেজ বর্ষণ করে তখন প্রপঞ্চ্য নিবৃত্ত হয়। এইরূপে প্রত্যাক্ষের যাহা কৃতিহেতু তাহাই প্রত্যাক্ষের নিবৃত্তিহেতু।

মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম গর্ভপিণ্ড।

অবাক্ত অনির্দেশ্য অনামা পরব্রহ্ম বা পরতত্ত্বের নিজাশক্তির প্রসর হইতে ক্রমশঃ অবাক্ত হইতে ব্যাক্ত, নিরাকার হইতে সাকার, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে। এই প্রসর বা আবির্ভাবে এক একটি স্তর বা পর্য্যায়ই এক একটি পিণ্ড। ষট্‌পিণ্ডের আনুক্রমিক আবির্ভাব এই অধ্যায়ের শেষে একটি চিত্রে সজ্জিত করিয়া দেখান হইতেছে।

পরম কারণ পরমেশ্বর হইতে কিরূপে স্থূলদেহবিশিষ্ট মনুষ্য জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণ উল্লিখিত পর্য্যায় বা ক্রমবিভাগে দেখান হইয়াছে। স্থূলতম জ্ঞান দেহ হইতে বিলোমক্রমে উত্তরোত্তর ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কারণে পৌছিয়া সর্বশেষে সর্বকারণের মূল পরম কারণ পরমতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। সেই পরম কারণ কিরূপে স্থূল জড় দেহবিশিষ্ট হইয়াছেন পিণ্ডসমূহের পরম্পরাক্রমে আবির্ভাব হইতে তাহাই বুঝান হইয়াছে। এই পিণ্ডতত্ত্বের আলোচনা হইতে নাথগণের সাধনের আদর্শ ও উপায় বুঝিতে পারা যায়।

সম্ভবকবির। সত্যপুরুষ হইতে ষট্‌পিণ্ডের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। প্রথমে সত্যপুরুষ পঞ্চ অণু সৃষ্টি করেন, তাহার দ্বারা পঞ্চব্রহ্ম নির্ণীত হয়। ষষ্ঠ অণুর ব্রহ্ম হইলেন নিরঞ্জন, তিনি জ্যোতি বা মায়ার সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই মায়া অনাদি। ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ, তৎপরে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে পৃথিবী এই পঞ্চ তত্ত্বের উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি।

সত্যপুরুষের ও নিরঞ্জনের মধ্যে সহজ, ঔকার, ইচ্ছা, মোহহং, অচিন্ত্য ও অক্ষর এই ষট্‌পুরুষের বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাদের আবাসস্থল নির্ণয়ের জন্য উক্ত পিণ্ডসৃষ্টির কল্পনা।

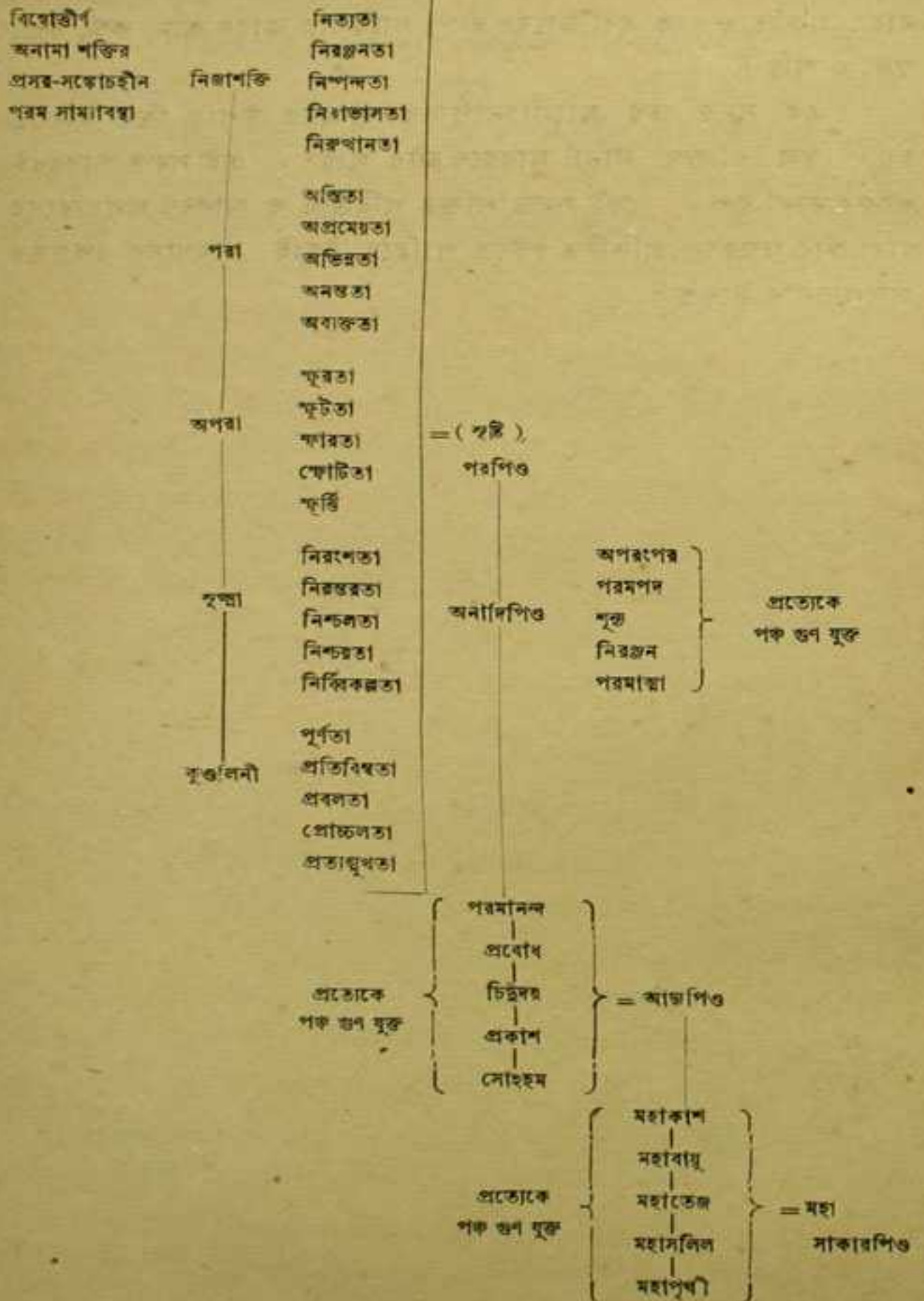
নানক পঞ্চস্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সচ্চতুর্গকে তিনি সর্বোচ্চ স্বর্গ বলিয়াছেন, তাহার নিম্নে ধরমখণ্ড, সরমখণ্ড, জ্ঞানখণ্ড ও করমখণ্ড কল্পনা করিয়াছেন। ধরমখণ্ডে আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের বাস, সরমখণ্ডে চৈতন্যাদির স্থায় সাধকদের বাস, জ্ঞানখণ্ডে কৃষ্ণাদির স্থায় জ্ঞানীর বাস, করমখণ্ডে রামাদির স্থায় কর্মীদের বাস, সর্বোচ্চ সচ্চতুর্গ হিন্দুর সত্যলোকের বা বুদ্ধের নির্বাণ অবস্থার অনুরূপ। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, উচ্চ হইতে উচ্চতর হিন্দুর 'পরাম্পর'ই কবীরের 'অনামী পুরুষ' বা শিবদয়ালীর 'রাধাস্বামী'। সত্যপুরুষের উর্দ্ধে অগম ও অলখ পুরুষদ্বয়, তৎপরে রাধাস্বামী। আধুনিক রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে—ইহারা শিবদয়ালের শিষ্য—নিরঞ্জন বা নিগুণ পুরুষের উর্দ্ধে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, মোহহং পুরুষ, অলখ পুরুষ, অগম পুরুষ ও অনামী পুরুষের বর্ণনা আছে। ইহাদেরও উর্দ্ধে রাধাস্বামী। এইরূপে উর্দ্ধে, তদুর্দ্ধে, তাহারও উর্দ্ধে ইত্যাদি কল্পনা করিলে রাধাস্বামীরও উর্দ্ধে 'ঈশ্বর' বিরাজ করেন এইরূপ কল্পনা করা যায়—কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। কোন একস্থানে পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া অবশ্যসম্ভাবী। অতএব সগুণ নিগুণের অতীতে অসীম সত্তা বিরাজমান, এই পর্য্যন্ত বলাই সম্ভব।^১ নাথপন্থীর 'নাথ' বা 'পরমপদ' এই সগুণ ও নিগুণের অতীত, ইহা পরমপদ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরম-সত্তার ভেদাভেদ নির্ণয় করিতে গেলে রূপান্তরিত হইতে হইতে তাহার সত্তা বিলোপ হইবার অবস্থা হয়। পূর্ববর্তী সত্তরা নিরঞ্জন, অগম, অলখ, অনামী, সত্য ইত্যাদি শব্দ এক ঈশ্বরেরই প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

জীবেরই মুক্তির প্রয়োজন। মুক্তি সাধনাসাধ্য। সুতরাং মুক্তি লাভ করিতে হইলে, জীবের প্রকৃতি কি, জীবের স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিয়া মুক্তির উপায়ভূত সাধনের নির্ধারণ করিতে হয়। গর্ভপিণ্ডে ভ্রূণরূপে জীবের স্থলজগতে আবির্ভাব। ভ্রূণ পিতামাতা হইতে জাত। পিতা-মাতা ও সন্তান সকলেই শরীরবিশিষ্ট। শরীরী জীব দেহ এবং মন,

বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য এই পঞ্চ অন্তঃকরণযুক্ত। দেহ পঞ্চভূতের সম্মেলনে উদ্ভূত। জীব নামক ব্যক্তির পঞ্চ শক্তি আছে—ইচ্ছা, ক্রিয়া, মায়া, প্রকৃতি ও বাক্ এবং জীবের ব্যাপ্ত থাকিবার কারণ কাম, কর্মা, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি।

এই সমস্ত তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক সাধনের উপায় স্থির করিতে হয়। সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম নানা আবরণে জীব আবৃত। এই সমস্ত আবরণই শক্তির নানা রূপ। সেই সমস্ত শক্তির পরিশুদ্ধি ও আবরণ অপসারণের দ্বারা জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, ইহাই নাথগণের পিণ্ডতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্য।

মটপিত্তের আবির্ভাব



মহাসাকার পিও হইতে

পক-পকাত্বক
প্রকৃতিপিও
নরনারীরূপ
শরীর
গর্ভপিও
জগৎ

ত্রাকার
অবলোকন
হইতে

মহাকাশাদি

পকতত্ত্ব ও

তাহাদের পকবিশেষি

গুণই সমষ্টিভাবে

শিব

ভৈরব

জীকণ্ঠ

সদাশিব

ইশ্বর

জগৎ

বিকৃ

ত্রাকার

পক-পকাত্বক

প্রকৃতি পিও

গর্ভপিও, জগৎ

= মহাসাকার পিওর অষ্ট মূর্তি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিণ্ডাধার

অব্যক্ত পরমতত্ত্ব প্রকাশোন্মুখ হইলে পর্যায়ক্রমে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত জড় চৈতন্যাত্মক জীবদেহের উৎপত্তি সাধিত হয় তাহার প্রত্যেকটি অবস্থা বা স্তরকে নাথদর্শনে পিণ্ড নামে অভিহিত করা হয়। নরনারীরূপ জীবশরীরও পিণ্ড শব্দের অভিধেয়। পিণ্ডসমূহ উৎপন্ন বা সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টি এক প্রকার ক্রিয়া। ক্রিয়ার যাহা ফল তাহাই কার্য। কার্য থাকিলেই তাহার কর্তা ও কারণ থাকিবে এবং সকল কার্যই শক্তিসাধ্য। সর্বশক্তির প্রসর ও সংকোচের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার সাধিত হয়।^১ প্রসরই সৃষ্টি ও সংকোচনই সংহার। অতএব অনন্তশক্তির যাহা শক্তিমান সেই পরাৎপর শিবই জগদাকারে ক্ষুরিত হইতে সক্ষম।^২ কিন্তু শক্তি বাতিরেকে শক্তিমান অগ্রাহ্য। শক্তিহীন শিব ও শিবহীন শক্তি অকল্পনীয়। শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার স্থায় এক ও অভিন্ন।

শিবস্তাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।

অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব ॥^৩

সে কারণ পরমশিবের সংবিশ্বরূপা নিত্যপ্রবুদ্ধা পরাৎপর বিমর্শ-রূপিণী অপরংপরা নিজাশক্তিই নানা শক্তিরূপে কার্যাত্মক নিখিলপিণ্ডের জনয়িত্রী মূলসত্তা, চরম আশ্রয় বা আধার।^৪ তন্তু যেমন নানাসূত্ররূপে পটের আশ্রয়, শক্তিও তেমনি নানারূপে নিখিলপিণ্ডের আশ্রয়।^৫ বস্ত্র যেরূপ তন্তুরূপ উপাদানে প্রতিষ্ঠিত, নিখিলপিণ্ডও সেইরূপ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। নিমিত্ত শক্তিই উপাদান। এতদ্রূপ নিখিলপিণ্ডের চরম আধার বা আশ্রয় বলিয়াই নিত্যপ্রবুদ্ধা অপরংপরা নিজাশক্তির নাম পিণ্ডাধার।^৬

নানাশক্তিস্বরূপেণ সর্বপিণ্ডাশ্রয়ান্ততঃ।

পিণ্ডাধার ইতীষ্টাখ্যা সিদ্ধান্ত ইতি ধীমতাম্ ॥^৭

১। সি. সি. প. ৪১২০, সি. সি. স. ৪১২৪

২। সি. সি. প. ৪১২৩, সি. সি. প. ৪১২৬

৩। সি. সি. স. ৪১৩৭

৪। সি. সি. প. ৪১২, ২২, সি. সি. স. ৪১২

৫। সি. সি. স. ৪১৩

৬। সি. সি. প. ৪১২, ২২

৭। সি. সি. স. ৪১৩৮

পিণ্ড সম্পর্কে অপরংপরা নিজাশক্তির ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয়। প্রথম, সৃষ্টাস্থক প্রসর ও সংহারাস্থক সংকোচ। এতদ্ব্যতিরেকেই আদি ও অন্তরূপ পরম সাম্যাবস্থা, যখন শক্তি, বিমর্শের উপসংহারে, সহজতঃ আপনাতে উন্মীলিত নিরুত্থান দশায় আত্মলীনা থাকে। ইহাই শিব ভাব বা শক্তির উপাধিহীন নিষ্ক্রিয় পরমাবস্থা। দ্বিতীয়, পিণ্ডের প্রাকট্যাবস্থায় কার্য, কারণ ও কর্তৃত্বভাবের অঙ্কুরবৎ উত্থানদশায় উন্মীলনকারিণী আধারশক্তিরূপা অবস্থা। তৃতীয়, প্রকটিত বিশ্বের বা শাস্ত্র ও লৌকিক দৃষ্টির (দৃষ্টান্তশ্রবিক) যাবতীয় সাক্ষাৎকারের (ভাবের) সাক্ষিণী মাত্র, অত্যন্ত স্বপ্রকাশ স্বসংবেদ্য অমুভবমাত্রগম্যা চিদ্রূপা অবস্থা।^১

শিবভাবই সামরন্তোর নিজভূমি এবং কুলাকুলের স্বরূপ।^২ শিবস্বরূপে কুল ও অকুল দুই শক্তি নিহিত। জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত অখিল বিশ্বের যাহা একমাত্র নিমিত্ত তাহাই অকুল,^৩ এবং বিশ্বই কুল। অকুলই কুলকে ধারণ করিয়া আছে, অকুলরূপ নিমিত্ত হইতে কুল উদ্ভূত হয় এবং কুল অকুলেই লীন হয়। জলবুদ্বুদ বিদীর্ণ হইলে যেমন একাকার জল অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ কুল অকুলে লীন হইলে একমাত্র শিবই থাকেন।

অকুলঃ কুলমাধন্তে কুলধাকুলমিচ্ছতি।

জলবুদ্বুদ্বন্ ত্রায়াৎ একাকারঃ পরঃ শিবঃ ॥^৪

অকুল হইতে কুলের উদ্ভব তথা বিশ্বের উদ্ভব এবং পুনরায় অকুলে লীন হওয়া, ইহাই বিমর্শ। বিমর্শরূপা শক্তি কুলরূপে পরা সত্তাদি পক্ষভাবে বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে।^৫ যাহা নিরাভাসের আভাসকারিণী, সূর্যাদিও যাহার আভায় আভাসিত হয়, সেই প্রকাশ-স্বরূপা শক্তিই পরাশক্তি।^৬ শক্তির যে ভাব দ্বারা অনাদিসিদ্ধ পরম অদ্বৈত অখণ্ড একতত্ত্ব অঙ্গীকৃত হয় তাহাই সত্তা।^৭ অপ্রমেয় অনাদিনিধন স্বভাবানন্দময় অহংভাবেব জ্যোতনকারিণী শক্তিই অহস্তা।^৮

১। সি. সি. প. ৪।১

সি. সি. স. ৪।২, ২, ৪

২। সি. সি. প. ৪।২; সি. সি. স. ৪।৩

৩। সি. সি. প. ৪।২

৪। সি. সি. প. ৪।১১

৫। সি. সি. প. ৪।১০

সি. সি. স. ৪।৩

৬। সি. সি. প. ৪।৪; সি. সি. স. ৪।৬, ৭

৭। সি. সি. প. ৪।২; সি. সি. স. ৪।৭

৮। সি. সি. প. ৪।৬; সি. সি. স. ৪।৮

ক্ষুরতা শক্তি দ্বারা স্বানুভবগম্য চিৎচমৎকারমূলভ নিরুত্থানদশা প্রস্ফুটিত হয়,^১ এবং পরাকলা শক্তির দ্বারা শুদ্ধ বুদ্ধ-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়।^২

এক্কে প্রশ্ন হইতে পারে শিবের শক্তির প্রসরে, চরাচর জগতের উদ্ভবে শিবের স্বরূপচ্যুতি ঘটে কি না? তাহার পরিপূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয় কি না? তদন্তরে বক্তব্য স্বরূপচ্যুতি বা পরিপূর্ণতার লাঘব হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে জীবের পক্ষে শিবস্বরূপের উপলব্ধি হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না, কারণ যাহা নাই তাহার উপলব্ধি কিরূপে হইবে? অনন্তশক্তিমান্ শিব একাকার হইয়াও আপন আনন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও নানাকারে বিলসিত হন এবং আপন স্বরূপে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কারণ এই প্রসর বা বহিঃপ্রেরণ ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে।^৩ সেইজন্যই অনন্তাকারে ক্ষুরিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান্ শিব স্বরূপে পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।^৪ শিবশক্তির সম্বন্ধ বিচারে ইহা সর্বিশেষ আলোচিত হইবে।

অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বিশ্বরূপ ও বিশ্বময় হইলেও সাধনার্থ যোগিগণ পরাপরস্বরূপা কুণ্ডলিনী শক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন।^৫ আধারশক্তিরই অপর নাম কুণ্ডলিনী। যোগিগণ অনুভব করেন যে সর্ববৎ কুণ্ডলিতভাবে ইহা প্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া আছে। কুণ্ডলিনীই পিণ্ডসংসিদ্ধিকারিণী।^৬

প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধরূপে কুণ্ডলিনী দ্বিধা অবস্থিত। অপ্রবুদ্ধভাবে ইহা দেহ ও চৈতন্যাত্মক, দেহপিণ্ডকে সংসিদ্ধ করিয়া পিণ্ডমধ্যে চেতনারূপে অধিষ্ঠিত। জীবের যাবতীয় চিন্তা ও কৰ্ম উদ্যোগশালিনী কুণ্ডলিনীই প্রপঞ্চরূপে ধারণ করিয়া আছে।^৭ যতদিন কুণ্ডলিনী অপ্রবুদ্ধা থাকে ততদিন জীব প্রপঞ্চে মুক্ত হইয়া সংসারভোগে রত থাকে। অপ্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী প্রবৃত্তিক্রপিণী। যোগসাধনা দ্বারা জীবের অশুদ্ধ পূর্ব-কৰ্ম সংস্কারজনিত বিকার অস্তমিত হইলে কুণ্ডলিনী উর্দ্ধগামিনী হইয়া জীবকে নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করে।^৮ কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগমনই

১। সি. সি. প. ৪১৭, সি. সি. স. ৪১৮

২। সি. সি. প. ৪১৮

৩। সি. সি. প. ৪১২

৪। সি. সি. প. ৪১২

৫। সি. সি. প. ৪১৪

৬। সি. সি. প. ৪১৪, সি. সি. স. ৪১৮

৭। সি. সি. প. ৪১৪, সি. সি. স. ৪১২

৮। সি. সি. প. ৪১৪, সি. সি. স. ৪১২

তাহার জাগরণ। পূর্ণরূপে জাগ্রতা কুণ্ডলিনী নিরাধারা হইয়া চৈতন্যময় হইলে জগতের সমস্তই নিরাধারা হইয়া চৈতন্যময় হয়; তখন সর্বতত্ত্বই স্বরূপে উপলব্ধ হয়। উৰ্দ্ধগামিনী কুণ্ডলিনী শুদ্ধ বিমর্শরূপিণী। শুদ্ধ বিমর্শদ্বারাই স্বরূপের অধিগম হয়।^১

মূলাধারে প্রবুদ্ধে তু সিদ্ধির্ভবতি যোগিনাম্।^২

আধারশক্তিকেই মূলশক্তি বলা হয়, যেহেতু জড়চৈতন্যাত্মক চরাচর জগৎসংবিদ্রূপা এই শক্তির প্রসর হইতেই উদ্ভূত এবং এই শক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।^৩ মানবদেহে এই একশক্তিই নবচক্রে নবধা অবস্থিত।^৪ কুণ্ডলিনীর প্রবোধে তৎসমুদায় শক্তিই প্রবুদ্ধ হইয়া কুণ্ডলিনীতে লীন হয় এবং কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া শিবস্বরূপে আত্মলীনা হইলে সহজাবস্থারূপ পরমপদ-প্রাপ্তি হয়।^৫

শক্তি মূলতঃ এক হইলেও উৰ্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ রূপে উহা তিন ভিন্ন শক্তিরূপে অভিহিত হয়।^৬ এই তিন শক্তির দ্বারা ত্রিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। জীবদেহে এই শক্তিত্রয়ের ত্রিবিধ কেন্দ্রের কথাও নাথগণ বলেন। মূলাধারই অধঃশক্তির কেন্দ্র; হৃদয় মধ্যশক্তির ও সহস্রার উৰ্দ্ধশক্তির কেন্দ্র। অধঃশক্তির বশে জীব স্বভাবতঃ সংসারে মুগ্ধ, নানা উপাধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপারে নিরত থাকিয়া নানা চিন্তায় মগ্ন হয়।^৭ অধঃশক্তিকে আকৃষিত করিয়া তাহার অধোমুখতা বা সংসারমুখতা নিরস্ত করিতে হয়।^৮ দেহের অভিমানী জীবাঁয়া দেহ হইতে দেহান্তরে, অর্থ হইতে অর্থান্তরে পরিভ্রামিত হইয়াও যে শক্তির দ্বারা আপন স্বপ্রকাশরূপ স্বরূপের কথা ধারণা করিতে সমর্থ হয় তাহাই মধ্যশক্তি। স্থূল ও সূক্ষ্ম বা সাকার ও নিরাকাররূপে মধ্যশক্তির দ্বিবিধ ভেদ করা হয়।

সৃষ্টিঃ কুণ্ডলিনী খ্যাতা দ্বিধা ভগবতী তু সা।

একধা স্থূলরূপা চ লোকানাং প্রত্যগায়িকা ॥

অপরা সর্বগা সূক্ষ্মা ব্যাপ্তিব্যাপকবর্জিতা।

তস্মাঃ ভেদং ন জানাতি মোহিতঃ প্রত্যয়েন তু ॥

সি. সি. প. ৪১২৩

১। সি. সি. প. ৪১৫

২। সি. সি. স. ৪১২৫

৩। সি. সি. প. ৪১২৬, সি. সি. স. ৪১২২

৪। সি. সি. স. ৪১২০

৫। হ. যো. প্র. ৪১২০, ১১

৬। সি. সি. প. ৪১২৬

৭। সি. সি. প. ৪১২০

৮। সি. সি. স. ৪১২০

অর্থাৎ সৃষ্টিক্রপা কুণ্ডলিনী স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে ত্রিধা বিद्यমান। প্রত্যক্চেতনাক্রপাই স্থূল। সূক্ষ্মা শক্তি সর্ব্বগা হইলেও ব্যাপ্তি-ব্যাপকভাববর্জিত। জীব বাহ্যপ্রত্যয়ে মুক্ততা বশতঃ সূক্ষ্ম মধ্যশক্তির উপলব্ধি করিতে পারে না।

নিখিল পদার্থের অভ্যন্তরে যে শক্তি ভ্রাম্যমাণ চিদ্রূপে বিद्यমান এবং চরাচররূপ নিখিলগ্রাহ পদার্থের আধারভূতা হইয়াও বিগ্রাহ-স্বরূপা—অর্থাৎ গ্রহীতৃরূপা—সেই সাকারা সর্ব্বরূপা মধ্যকুণ্ডলীই স্থূলরূপা মধ্যশক্তি।^১ সূক্ষ্মরূপা মধ্যশক্তি নিরাকারা অর্থাৎ দেহাভ্যবোধরহিতা, নিশ্চলস্বভাবা, অতএব ব্যাপ্তিব্যাপক-ভাববর্জিতা এবং নিশ্চয়ভূতা অর্থাৎ অপ্রতিযোগিসত্তারূপা বা সর্ব্বনিরপেক্ষভাবে বিद्यমানা। ইহা সদাপ্রবুদ্ধা নিরুদ্ধবৃত্তি নিশ্চল যোগীর ধ্যানগম্যা ও পরমানন্দদায়িনী।^২ এই পরাসংবিদ্রূপা সূক্ষ্মা মধ্যশক্তি গুরুকৃপাকলে স্বরূপদশায় বোধগম্যা। সূক্ষ্মা মধ্যশক্তির বোধ উদিত হইলে যোগিগণের পিণ্ডসিদ্ধি নিষ্পন্ন হয়।^৩ স্থূল মধ্যশক্তিই প্রবুদ্ধ হইলে সূক্ষ্মা শক্তিরূপে পরিণত হয়।

সৈব প্রসরসংকোচাৎ পর্য্যাবৃত্তিমুপাগতা।

নিত্যানন্দতয়া লোলা সূক্ষ্মাখ্যা তিমিরাকৃতি ॥

বুদ্ধেতি সিদ্ধাস্তামাহঃ প্রসিদ্ধাঃ সিদ্ধবদ্ব্যনি ॥^৪

প্রসর ও সংকোচ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে—বহিমুখতা ও অন্তর্মুখতা হইই নিরুদ্ধ হইলে স্থূলা মধ্যশক্তি সূক্ষ্মরূপা হয়। সূক্ষ্মা মধ্যশক্তি তিমিরাকৃতি। অন্ধকারে যেমন যাবতীয় পদার্থ একাকার বোধ হয় মধ্যশক্তির প্রবুদ্ধাবস্থায়ও সমস্ত ভেদ বা বিকল্পজ্ঞান তিরোহিত হয়।

সর্ব্বতঃস্বের উর্দ্ধে অবস্থিত অনামা পরমপদ যে শক্তির দ্বারা স্বসংবেদ্যরূপে অধিগত হয় এবং যাহা নানাপ্রকার সাক্ষাৎকার বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কারণভূতা তাহাই উর্দ্ধশক্তি।^৫

মধ্যশক্তিপ্রবোধেন অধঃশক্তি নিকুঞ্চনাৎ।

উর্দ্ধশক্তি নিপাতেন প্রাপ্যতে পরমং পদম্ ॥^৬

১। সি. সি. প. ৪১২২

২। সি. সি. প. ৪১২৭, সি. সি. প. ৪১২২

৩। সি. সি. প. ৪১২৪, সি. সি. প. ৪১০২. ৩৩

৪। সি. সি. প. ৪১২৮, ২৯

৫। সি. সি. প. ৪১২৪; সি. সি. প. ৪১০৪, ৩৩

৬। অমরৌষধশাসন ১ম প্রোক

উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই তিন শক্তির ত্রিবিধ ক্রিয়ার ফল পরমপদ-প্রাপ্তি হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে ক্রিয়াভেদে একই শক্তির ত্রিবিধ আখ্যা। অধঃশক্তির স্বভাব বিষয়লোলতাকে আকৃষ্ট করিয়া উর্দ্ধমুখী করণ, স্থূল অপ্রবুদ্ধ মধ্যশক্তির সূক্ষ্মা মধ্যশক্তিরূপে জাগরণ এবং উর্দ্ধশক্তির নিপাতন বা কৃপা হইতে পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিবশক্তির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

নাথগণ জগৎপ্রপঞ্চের অদ্বিতীয় পরমকারণকে শিব বা আদিনাথ নামে অভিহিত করেন। তিনি স্বরূপতঃ অনাদি অনন্ত স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রকাশ নিত্য বস্তু। দেশকালের অতীত, সূতরাং সর্ব-অবচ্ছেদহীন এবং সকল ভেদ ও বাধাশূন্য। অন্তরে বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সত্তা হইতে অতিরিক্ত বা মূলতঃ বিভিন্ন। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার সত্তা, তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রকাশ তদতিরিক্ত কোন পদার্থের সাপেক্ষ নহে। তিনি স্বয়ং নিষ্কারণ হইয়া চরাচর সমস্তের একমাত্র কারণ। এই কারণতাই তাঁহার শক্তি। এই শক্তির সহিত তিনি নিত্যযুক্ত। শক্তিবলেই তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্তা।

এই শক্তির সহিত শিবের সম্বন্ধ কি? এই শক্তি কি শিব হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? অথবা ভেদাভেদরূপ? ইহা কি শিবের কোন আগন্তুক বা নিমিত্তজ উদ্ভূত ধর্ম? ইহা কি শিবেরই গুণ নিত্যবস্তু অথবা অনিত্য? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে নাথগণ বলেন :—

“শিবস্ত্যাত্মন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।”

অর্থাৎ শিবের অন্তরে শক্তি, শক্তির অন্তরে শিব। মূলতঃ ইহারা অভিন্ন, একই অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব দৃষ্টিভেদে শিব বা শক্তি আখ্যায় অভিহিত হন। শিবভাবের অখণ্ডৈতন্য শক্তিতেও চিরবিद्यমানা এবং শক্তির সক্রিয়তাও শিবভাবে সদা অনুম্ন্যত। তাই ‘শিবের শক্তি’ কথাটি প্রচলিত। শিব শক্তিযুক্ত হইয়া সর্বাকারে স্ফুরিত হন। এই ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ অভেদে। যত্নর পুস্তক বলিলে, পুস্তক পদার্থ যত্ন হইতে এক পৃথক সত্তা এবং যত্ন তাহার অধিকারী। পুস্তক সম্পর্কে যত্নে অধিকারিত্ব ধর্ম মাত্র চিন্তনীয়। গৃহের ছাদ বলিলে ছাদ গৃহরূপ সমগ্রবস্তুর অংশমাত্র। ইহাতে অংশাংশী ধর্ম মাত্র চিন্তনীয়। কিন্তু ‘শিবের শক্তি’ বলিতে এরূপ কিছুই বোধ্য নহে। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। একই বস্তু দৃষ্টি ও ব্যবহার ভেদে দুই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সূতরাং শিব-শক্তি দুই ভাব অগোছাশ্রয়ভূত। ধর্ম বিনা ধর্মী অকল্পনীয়। ধর্মীকে

ছাড়িয়া ধর্মেরও কোন সত্তা নাই, যেমন দাহিকা শক্তি বিনা অগ্নি অকল্পনীয়। অগ্নি ও দাহিকাশক্তিকে তত্ত্বতঃ পৃথক করা সম্ভব নয়। সেইরূপ শিব ও শক্তি তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

“প্রসরাদ্ ভাসয়েৎ শক্তিঃ সঙ্কোচাদ্ ভাসয়েৎ শিবঃ।”

শক্তি যখন জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, শিব তখনই সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্তা। আবার শক্তি যখন জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, তখন একমাত্র শুদ্ধ স্বপ্রকাশ শিবই থাকেন। সূর্য্য এই বিচিত্র জগতের প্রকাশক, কিন্তু প্রকাশ্য কিছু না থাকিলে সূর্য্য যেমন অদ্বিতীয়রূপে আপন মহিমায় বিরাজ করেন, সৃষ্টিস্থিতিসংহারাত্মক শক্তিকার্য্যের উপরাম শিবও সেইরূপ আপন বিশুদ্ধ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। শক্তির উপলব্ধি হয় ক্রিয়াসম্মত কার্য্য দ্বারা। ক্রিয়ার যাহা কারণ তাহাই শক্তি। শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই শক্তিমান বা শক্ত। কিন্তু শক্তি দ্বারা যখন কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, শক্তি যখন আশ্রয়ে লীন হইয়া থাকে তখনকার সেই ক্রিয়াহীন শাস্তাবস্থাই বিশুদ্ধ শিবভাব। জগৎপ্রপঞ্চের বহিঃপ্রকাশও যেমন শক্তির কার্য্য, প্রপঞ্চের লয়ও সেইরূপ শক্তির কার্য্য। অতএব সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপ কার্য্যের দ্বারাই শক্তিকে বুঝিতে বা ভাবনা করিতে পারা যায়। সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপ কার্য্য না থাকিলে শক্তির আশ্রয়ে যে ভাবে অবস্থান করেন, তাহাই শিবভাব। বিকাশ ও সঙ্কোচশীল চিদ্রূপা শক্তি একদিকে আপন চিদ্রূপতার ক্রমিক বিরোধ দ্বারা আপনাকে নামরূপের নানা আবরণে আবরিত করিয়া নানাভাবে পরিণত হইয়া স্থূল জড় পৃথিবী তত্ত্বরূপে অন্ত্যাপরিণাম লাভ করেন। ইহাই শক্তির সৃষ্টিরূপ প্রকাশ বা প্রসরণ। অপরদিকে অচিদাবরণের ক্রমিক অপসরণ দ্বারা নিজ চিদ্রূপতার সম্যক উন্মেষসাধন করিয়া শিবস্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করেন। সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে গুরু গোরক্ষনাথ বলেন :—“সৈব শক্তির্যদা সহজেন স্বাশ্মিন্ উন্মীলিত্যাং নিরুত্থানদশায়াং বর্ততে তদা শিবঃ স এব ভবতি”।^১ অর্থাৎ ক্রিয়াশীলা শক্তি যখন সঙ্কোচরূপ ক্রিয়ার দ্বারা আপন চিৎস্বরূপের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার স্পন্দনের পরিসমাপ্তি সাধন করে, তখনই তাহা

শাস্ত্র চিৎস্বরূপ শিব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। তখন শিব ও শক্তির ভাষাগত বৈকল্পিক ভেদও অপনীত হয়।

শক্তির প্রসর বা বিকাশরূপ ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি, আর সঙ্কোচনরূপ ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টির উপসংহরণ।^১ এই দুই ক্রিয়া অবরোহণ ও অধিরোহণাত্মক, শক্তিমান শিব আপন নিগ্রহ-শক্তিবলে প্রপঞ্চ ও জীবরূপে অবরোহণ করিয়া পুনরায় অমুগ্রহ-শক্তিবলে স্বরূপে অধিরোহণ করেন। শিবশক্তি এক অদ্বিতীয় ভাব হইতে প্রপঞ্চের অনন্ত বৈচিত্র্যে যেন নিজেকে রূপান্তরিত করিলেন, আবার অনন্ত বৈচিত্র্য হইতে ভেদের তিরোধান দ্বারা এক অদ্বিতীয়রূপে যেন ফিরিয়া আসিলেন। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শিবের শক্তির এই প্রসর-সঙ্কোচের কোন কালিক আরম্ভ বা সমাপ্তি নাই। ইহা অনাদি-কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত একইভাবে চলিতেছে ও চলিবে। কারণ অনাদিনিধন নিত্যবস্তুর স্বরূপ যোগ্যতাও নিত্য, স্মৃতির তাহাও অনাদি অনন্ত। শক্তির অধিরোহণ ক্রিয়াই সমস্ত সাধনের মূল কথা। ইহার দ্বারাই জীব শিবস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহা বলা যায়, যেন কোন পান্থ আপন শাস্ত্রত আশ্রয় ছাড়িয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আপন আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিল। যোগী আপন সাধনাভ্যাসে সম্যক্ অধিকৃত হইয়া নিরুত্থান দশা লাভান্তর শিবস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন।

শক্তিব্যতিরেকে শক্তিমান অগ্রাহ্য। শক্তিমান বা শিব বস্তুতঃ শক্তিরই ক্রিয়াহীন বা উপাধিহীন পরমাবস্থা। শক্তিয়ুক্ত শিবই সর্ববতোমুখ, তিনি সর্বাকারে ক্ষুরিত হইতেও যেমন সক্ষম, সকল আকারকে সংবৃত করিতেও তেমন সক্ষম। প্রসরণও তাঁহার সামর্থ্য, সঙ্কোচনও তাঁহার সামর্থ্য।^২ “শিবোহপি শক্তিরহিতঃ কৰ্ত্তুং শক্তো ন কিঞ্চন।”

শিবঃ স্বশক্তিসহিতো হ্যভাসাদ্ ভাসকো ভবেৎ ॥^৩

স্বশক্ত্যা সহিতঃ সোহপি সর্বস্থ্যভাসকো ভবেৎ ॥^৪

১। “শক্তিঃ প্রসরসঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিসংকীর্ণী”—সি. সি. স. ৪।২৪

২। সি. সি. প. ৪।১৩

৩। সি. সি. স. ৪।১৩

৪। সি. সি. প. ৪।১৩

স্বশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বশক্তিবলে শিব চরাচর জগতের আভাসক হন। যাহা নিরাভাস বা অব্যক্ত ছিল শক্তির প্রসরে তাহা ভাসিত বা বিকশিত হয়। “অভাসাদ্ ভাসকো ভবেৎ।” আবার শক্তির সঙ্কোচে যাহা আভাসিত বা ব্যক্ত ছিল তাহা নিরাভাস বা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। শক্তি প্রসর ও সঙ্কোচাত্মক, শিব প্রসর ও সঙ্কোচের উপরমাত্মক। শক্তির প্রসরই সৃষ্টি এবং সঙ্কোচই সংহার; প্রসর ও সঙ্কোচের যাহা আদি ও অন্ত তাহাই সাম্যাবস্থা তাহাই নিরাভাস, তাহাই শিবাবস্থা। যখন এই সাম্যভঙ্গ হয় অর্থাৎ শক্তির ক্ষুরণ বা প্রসরে স্তরানুসারে বিশ্বের আবির্ভাব হয় তখন শক্তি পরিণাম লাভ করে বা জগৎ আভাসিত হয়। শক্তির সঙ্কোচনক্রিয়ার অবসানকাল পর্য্যন্তও জগৎ আভাসিত হয়—ক্রমশঃ স্থূল-সূক্ষ্মভেদে। অতএব জগতের আভাসই শক্তিভাব এবং নিরাভাসই শিবভাব।

আভাস বৈচিত্র্যময়ী ও পরিণামী। অশেষ বৈচিত্র্য ও পরিণামের পশ্চাতে যে অপরিণামী একরস সদ্বস্ত আছে যাহাকে ভিত্তি করিয়াই বিচিত্র বৈচিত্র্যের উদ্ভব বা তিরোধান তাহাই শিবস্বরূপ—“the changeless principle of all our changing experience”।^১ শিব একরস, অপরিণামী। শক্তি পরিণামী। শিব হইতে শক্তির আবির্ভাব এবং তাহা হইতে ত্রিলোক, চতুর্দশ ভুবনাদির উৎপত্তি। বিশ্বসৃষ্টির ইহাই রহস্য। শক্তির তিরোভাবে জগতের লয়। তথাপি শিব ও শক্তি সূর্য্য ও সূর্য্যাকিরণের ন্যায় অভিন্ন। তাই শক্তির সাধনেই শিবত্বের উপলব্ধি হয়। সবিকল্প সমাধি দ্বারা যেরূপ নির্বিকল্পে পৌছান যায়, তেমনি শক্তির উপাসনা দ্বারা শিবত্ব লাভ হয়। শক্তি-উপাসনা সাধন, শিবত্বলাভ তাহার ফল।

বিমর্শই শিবের শক্তি। পরাপর বিমর্শরূপিণী সংবিস্তাররূপা শক্তিই নানাকারে বিশ্বের আধারভূতা।^২ এই বিশ্ব শক্তির বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং সগুণ সক্রিয় বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী শিব ও নিগুণ নিষ্ক্রিয় শিব—শিবের এই দুই রূপই নাথগণ কর্তৃক অঙ্গীকৃত। সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়ের সগুণ-নিগুণের মিলনভূমিকেই তাঁহারা নাথস্বরূপ বলেন।

শিব চিৎস্বরূপ। তাঁহার নিজাশক্তিও সংবিৎস্বরূপ।^১ — এই নিজাশক্তি ইচ্ছামাত্রধর্মী এবং ধর্ম্মী, অর্থাৎ শিব হইতে অভিন্ন।^২ শিবের নিজেকে নিজে জানাই তাঁহার আত্মবিমর্শ। ইহাই ইচ্ছামাত্র। বিমর্শ হেতুই “অস্মি” (আমি আছি = সংস্বরূপতা), “প্রকাশে” (আমি প্রকাশিত হইব নিজের দ্বারা = চিৎস্বরূপতা), “নন্দামি” (আমি আনন্দিত হইব = আনন্দস্বরূপতা) এই ত্রিভাবের অধিগম হয়। বিমর্শ শিবের নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং যখন বিমর্শ ছিল না, ইত্যাকার কালিক ব্যাপার কল্পনীয় নহে। কিন্তু ব্যবহারদৃষ্টিতে সৃষ্টি আদি প্রক্রিয়া বৃদ্ধিবার জন্য বলিতে হয় যখন বিমর্শ নাই এবং বহুর একীকরণও নাই—পরম কারণ পরাৎপর পরমেশ্বর নিজেকে আপনাতে আপনি বিত্তমান—তখন তিনি অনামা অর্থাৎ বাচ্যবাচকভেদবর্জিত নামরূপাতীত পরমব্রহ্ম। ইহাই পরম শিবভাব। ব্যবহারদৃষ্টিতে ইহাই মহাপ্রলয় এবং তদুদৃষ্টিতে শিবের বিশ্বোত্তীর্ণভাব। কিন্তু তাঁহার অবিনাভাবী আত্মবিমর্শ বা ইচ্ছামাত্রধর্ম্মী নিজাশক্তিভাবে শিব হইতে কোনও ভাবাস্তুর উপলব্ধিত হয় না। ইহা ধর্ম্মী শিব হইতে অভিন্ন। সৃষ্টির প্রাগ্ভাবী অবস্থায় ক্রিয়াশব্দের প্রয়োগ যদিও সমীচীন নহে তবু ভাবপ্রকাশের সৌকর্য্যার্থে বলিতে পারা যায়, ইচ্ছামাত্র বা সত্তামাত্রই নিজাশক্তির ক্রিয়া। তৎপরে বহিঃপ্রকাশের সূক্ষ্ম উন্মুখতা হইতে পরাশক্তির অভিব্যক্তি। ইহা যেন অন্তরে এক অনির্দেশ্য মূহ প্রেরণা অনুভবের তুল্য। সুতরাং পরাবস্থায় শক্তিসত্তা শিবসত্তা হইতে অভিন্ন হইয়াও শিবরূপী না হইয়া যেন শিবস্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই ক্ষুটোন্মুখ পরাশক্তির বিশ্বোত্তীর্ণ শিবভাব হইতে অতি সূক্ষ্ম বিভেদ। এই সিস্থক্ষোপলব্ধিত শিব সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত থাকিয়াও যেন আত্মসংবিৎশীল চেতন পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার দিকে আর একপদ অগ্রসর করিয়া দিলেন।^৩

বহিঃপ্রকাশের তৃতীয় স্তরে শিবের ইচ্ছাশক্তির অন্তরে যে স্পন্দনের আবির্ভাব হয় তাহাও অন্তর্ভাব বিশেষ। ইহাকে অপরাশক্তি আখ্যা দেওয়া হয়। যাহা অনন্ত অপ্রমেয় নিম্পন্দ ছিল তাহা যেন আপনার মধ্যে স্পন্দনের ভূমি লাভ করিল। অদ্বৈত যেন দ্বৈতের

অভিমুখী হইল। বিশ্বেদ্বৈততাব হইতে বিভেদ আরও স্পষ্টতর হইল। নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার ঐশ্বর্য্য যেন জাগরিত হইল। যাহা বীজ বা কারণরূপী ছিল তাহা যেন কার্য্যরূপে অভিব্যক্তির অভিমুখী হইল। গূঢ় স্পন্দনশীল। অপরাশক্তিয়ুক্ত শিবে যেন কর্তৃত্বভাবের আভাস প্রথম লক্ষিত হইল। শক্তির শক্ত তিনি—যেন শক্তিকে প্রকাশিত করিতেছেন, শক্তিকে অনুভব করিতেছেন, শক্তির একমাত্র অধিকারী রূপে অবস্থান করিতেছেন।^১

এই স্বারসিক স্পন্দন আরও ফুটতর হইয়া চতুর্থস্তরে অহস্তা বোধমাত্রের উদয়ে শক্তি সূক্ষ্মা নামে অভিহিত হয়। সূক্ষ্মাশক্তির শক্তিমান শিব যেন নিজেকে নিজে জানিতে পারিলেন। এখন স্বয়ং-কর্তৃত্বভাব অধিকতর ফুট হওয়ায় শিবের ব্যক্তিত্ব বা অস্বয়ংপ্রত্যয়াত্মক ভাব উন্মেষ লাভ করিল। যাবৎ অহস্তা বা অহং বোধের উদয় হয় নাই তাবৎ শিবভাবে অকর্তৃত্বভাবই প্রকট ছিল—এখন শিব পুরুষবিশেষ, তাঁহাতে কর্তৃত্ববোধ জাগরিত হইয়াছে। কিন্তু ইদংভাবের উদয় না হওয়ায় তাহাতে অংশাংশীভাব নাই, তাঁহার অহংভাবে কোন ভেদ নাই। তিনি নিশ্চল অর্থাৎ বাহ্যক্রিয়াশূন্য, নিশ্চয়াত্মক ও নির্বিকল্প। এখনও এক বহু হয় নাই সুতরাং কোন বিকল্পও নাই। সূক্ষ্মাশক্তি যেন শরীর এবং শিব যেন শরীরী। তথাপি এখনও তাঁহার বিশ্বেদ্বৈত স্বপ্রকাশ অদ্বৈতভাবের উপর দ্বৈতভাব বা প্রকাশ্যভাবের কোন ছায়াপাত হয় নাই।^২

শক্তির উন্মেষের পঞ্চমস্তরে অহস্তামাত্রের ফুটতর বিকাশে বেদনার ফুটি হয়। বেদনশীল। কুণ্ডলিনীতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভব পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে এখন প্রবলতা অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তা, প্রোচ্চলতা বা সর্ব্বাকারে আকারিত হইবার যোগ্যতা, প্রত্যয়মুখতা বা বিপরীতমুখতা অর্থাৎ একত্ব হইতে বহুত্বের অভিমুখতা এবং প্রতিবিশ্বতা—দর্পণে যেমন সকল কিছুই ছায়া ধারণ করে, সেইরূপ বহুভাবে শিব স্বরূপকে আভাসিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। শিবের আশ্রয়ে কুণ্ডলিনী শক্তিতেই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সংকল্প বা কল্পনাকারে বীজভূত হইয়া রহিয়াছে। শিব যেন এই কল্পনাত্মক জগতের অধিষ্ঠাতা। এই দেহে

যেন তিনি অনুপ্রবিষ্ট। এই শক্ত্যাক্ত্যকভাবেময় ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই উপাদান, তিনিই ইহার অধিষ্ঠাতা বা আত্মা, তিনিই ইহার প্রভু।^১

কুণ্ডলিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগতের আবির্ভাব হয়। জগতের আবির্ভাব অর্থে শক্তির চিহ্নপতার ক্রমিক আবরণ। শক্তির বিচিত্রাকারে ক্ষুরণ অর্থেই নিজেকে নিজে আবরিত করা। চিহ্নপা শক্তি জড়রূপে পরিণামিত হন। প্রসন্নমুখী শক্তিকে তন্ত্রে নিষেধব্যাপাররূপা বলা হইয়াছে। ইহাই তিরোহতি, নিরোধ বা নিগ্রহ। ইহা শক্তির বহিমুখী ক্রিয়া বা প্রত্যঙ্মুখতা। প্রলয়োন্মুখে শক্তির অন্তিমুখী ক্রিয়াদ্বারা শক্তি স্বকারণে প্রত্যাবৃত্ত হন। সমস্ত আবরণ উন্মোচিত করিয়া আপন সংবিশ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই অনুগ্রহ, ইহাই প্রাণমুখতা। এই প্রত্যাবর্তন সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়-ভাবেই হইতে পারে। সমষ্টিভাবে হইলেই তাহা মহাপ্রলয়। সাধকের ব্যষ্টি জীবনে বহিমুখী শক্তি অন্তিমুখী হইয়া যখন পরমশিব মিলিত হয় তখনই অখিলপিণ্ডের সহিত পরমপদের সমরসীকরণে একমাত্র শিবই থাকেন। সেখানে সমস্ত ক্রিয়ার উপশম হয়।

সংবিশ্বরূপ পরমশিবই জড় ও অজড়াত্মক নিখিল পদার্থের অন্তর্নিহিত একমাত্র মূলসত্তা। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই শিবই চরাচর জগতের পরম কারণ। দেশকালাদীন বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে আভাসিত হইয়াও শিব নিত্য আপন শাস্বতস্বরূপে দেশ, কাল ও নামরূপের অতীত হইয়া বিজ্ঞমান। তিনি বিভূরূপে যাবতীয় পদার্থে অনুসূত থাকিয়াও শিবভাবে সর্বাতীত শক্তিভাবে বিশ্বরূপ বিশ্বময় শিবভাবে বিশ্বোত্তীর্ণ।

শিব সর্বাকার হইয়াও একাকার। স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত ও অসীম। একাকার শিব অনন্ত শক্তিমান্ রূপে নানাকারে বিলাস করিয়াও আপন চিৎস্বরূপে সদা প্রতিষ্ঠিত। শিবভাব সর্বপ্রকার ভেদহীন বলিয়াই একাকার। স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগতভেদ তাহাতে কল্পনীয় নহে। কারণ তিনিই একমাত্র কারণ, সকল কারণের পরমকারণ। জগৎপ্রপঞ্চে প্রতীয়মান ভেদ শক্তির কার্য্য। ইহাতে পরমকারণের স্বরূপের হানি হয় না। শিব অনন্ত শক্তিমান্ বলিয়াই নিত্য সর্বাকারে আকারিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান্ এবং আপন এক অদ্বিতীয় ভাবে সদাই অবশিষ্ট থাকেন।

অতএব একাকারোহনমন্তুশক্তিমান্ নিজানন্দতয়াবস্থিতোহপি নানা-
কারহেন বিলসন্ স্বপ্রতিষ্ঠাং স্বয়মেব ভজতি ইতি ব্যবহারঃ। অলুপ্তশক্তিমান্
নিত্যাং সৰ্ব্বাকারতয়া ক্ষুরন্ পুনঃ স্বেনৈব রূপেণ এক এব অবশিষ্ট্যতে।^১
শিবস্বরূপের এই দ্বৈরূপ্য নাথগণের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। সৰ্ব্বাকার হইয়াও
একাকার। নানাকার হইয়াও সুখদুঃখমোহের অতীত, নিজানন্দে সদা
আরুঢ়। শক্তিরূপে তিনি অশেষ বিশেষ, শিবরূপে তিনি পরম অবিশেষ।

শক্তির প্রসারে, বিকাশে বা উন্মেষে জগৎপ্রপঞ্চ বাচ্যবাচকরূপে
প্রাচুর্ভূত হয়। শক্তির সঙ্কোচে অর্থাৎ স্পন্দনক্রিয়ার উপশান্তিতে
বাচ্যবাচকরূপী জগৎপ্রপঞ্চও স্বকারণে লীন হয়—তখন বাচ্যবাচকভাবের
উপশমাস্থক শিবই স্বস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন।

শিব ও শক্তি অভিন্ন, এ কথা নাথদর্শনে বহুশঃ অঙ্গীকৃত। অভিন্ন
হইলেও ব্যবহারদৃষ্টিতে অর্থগত কিছু ভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। একটা
উপমার দ্বারা এই পার্থক্যটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। একটা
নিষ্ক্রিয় নিশ্চল অনন্ত জ্যোতির্ময় কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত রশ্মিজাল
যেমন সর্বতঃ বিকীরিত হইতে পারে, তেমনি সর্বশক্তির কারণ বা
আশ্রয়ভূত এক শিবভাব হইতে সমস্ত শক্তিভাব নির্গত হইয়া আবার
শিবেই প্রত্যাবর্তন করে। অনন্তশক্তির কেন্দ্র শিবে এই নির্গমন বা
প্রত্যাগমন ক্রিয়াদ্বারা কোন অপচয় বা উপচয় ঘটে না।

দণ্ড ঘটের কারণ। ঘট যখন নিষ্মিত হয় নাই, ঘট নির্মাণ যখন
সমাপ্ত হইয়াছে বা নিষ্মিত ঘট যখন ভগ্ন হইয়া খর্বরে পরিণত বা খর্বর
ধূলিতে পরিণত হইয়াছে, এই সমস্ত অবস্থাতেই দণ্ডে দণ্ডে ধর্ম তুল্যরূপে
উদিত আছে, তাহার কোন অপচয় উপচয় নাই। কেবল ঘটের অপেক্ষায়
দণ্ডে ঘটের কারণতা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট। সেইরূপ সৃষ্টির অপেক্ষায় শিবশক্তির
প্রসার সঙ্কোচ। শিবের শিব স্বর্গাবস্থায়ই তুল্য অগ্নানরূপে উদিত।
সৃষ্টি না থাকিলে শক্তি অদৃষ্ট, সৃষ্টি থাকিলে শক্তি দৃষ্ট। কিন্তু সর্বত্র
সমভাবেই শিব হইতে অভিন্ন।

শক্তিভাব হইতেই সৃষ্টি স্থিতি সংহারাস্থক ক্রিয়ার উৎপত্তি।
চিৎস্বরূপ শিবে কোন চাঞ্চল্য নাই। সৃষ্টিরূপ ক্রিয়ার উপশান্তি হইলে
শক্তি যেখানে লীন হইয়া থাকে তাহাই শিবভাব। পুনঃ শিবভাব হইতে

স্বারসিক অহংভাবের বিমর্শে শক্তির ক্ষুরণে সৃষ্ট্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়। শক্তির ক্ষুরণ হইলেই তাহা ভাসিত হয়, অক্ষুরণে তাহা কারণে অনুপ্রবিষ্ট থাকে এই মাত্র বলা যায়। অতএব শক্তি শিবের শক্তি যাহা হইতে প্রসৃত হইয়া শেষপর্যন্ত সৃষ্ট্যাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং যাহাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সৃষ্ট্যাদি উপসংহৃত হয় তাহাই শিব। কার্যাকারণ ও কর্তৃত্ব যাহাদ্বারা ক্ষুটভাবে উদ্ভিত হয় অথবা উদ্ভিত করিবার যোগ্যতা যাহার আছে তাহাই শক্তি। নিরুত্থানদশাই শিব।

কার্যাকারণকর্তৃণাম্ উত্থা(?)বস্থাকরণং ক্ষুটম্।

কর্ত্বুং শক্ৰোতি যং তস্মাৎ শক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥

সহজেনাশ্রলীনা সা যদা সঞ্জায়তে তদা।

নিরুত্থানদশেতুক্তা শিবসংজ্ঞাহপি তত্র হি ॥^১

শক্তি শিবভাব হইতে প্রসৃত হইয়া ক্রমশঃ কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ ধারণ করে। তেজঃপুঞ্জ হইতে বিকীরিত রশ্মি যেমন যতই আপন উৎপত্তিকেন্দ্র হইতে ক্রমশঃ দূরে প্রসৃত হয় ততই তাহার কিরণ ক্রমশঃ নিম্প্রভ হইয়া যায়, সেইরূপ চিৎস্বরূপ শিবভাব হইতে উদ্ভূত শক্তি যতই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে বা স্থূলরূপে আভাসিত হয় ততই তাহার চিৎস্বরূপের বহিঃপ্রকাশ আবরিত বা মন্দীভূত হয়। পুনরায় সেই শক্তি যখন সঙ্কোচ প্রক্রিয়া দ্বারা বিপরীতমুখে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে কারণে প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন তাহার চিদ্রূপতার প্রকাশ হয়। এইরূপে শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে স্বকারণে প্রত্যাবৃত্ত হয় একমাত্র চিৎস্বরূপই থাকে। তিনিই শিব।

চিৎস্বরূপ শিবেই আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আশ্রিত। ইহাদের উন্মেষেই সৃষ্টির প্রকাশ। সৃষ্টির প্রকাশে শক্তিকে তিনভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণরূপে। প্রমাতৃবই শক্তির পরাভাব। যদ্বারা শিব হইতে ক্রিতিতব পর্যাস্ত সমস্ত তব সংবিদ্মাত্ররূপে ধৃত, দৃষ্ট ও ভাবিত হয়। প্রমেয়বই শক্তির অপরাভাব। ইহা হইতেই ভেদজ্ঞান। আর প্রমাণাংশে ভেদাভেদাত্মক পরাপরাভাব।^২ প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় অবিনাশ্যবী ভাবত্রয়।

প্রমেয়ের উপসংহারে কার্যতঃ প্রমাণ ও প্রমাতারও উপসংহার হয়। প্রমাতা প্রমেয় প্রমাণরূপী শক্তি উপসংস্কৃত হইলে একমাত্র চিৎস্বরূপ শিবই থাকেন, ইহা আমরা তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা অনুমান করি। কারণ সমস্ত দৃষ্টির উপরম হইলে যাহা থাকে তাহা ব্যবহারিক কোন ভাবের সহিত তুলিত হইতে পারে না। তবে কি শিবস্বরূপ কেবল অনুমেয় বা কল্পনার বস্তুমাত্র? না তাহা নহে, যোগী স্বশরীরে সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শিবস্বরূপে লীন করিয়া শিবত্বে অধিকৃত হইতে পারেন। শিবত্বে সাক্ষাৎকার সম্ভব এবং তাহাই চরম লক্ষ্য।

তত্ত্বতঃ শিবশক্তি অদ্বৈত। কারণবস্তুতে যে কার্যোৎপাদনকারী ধর্মবিশেষ আছে ও যে ধর্ম তাহার সহিত অপৃথক, তাহাকেই 'শক্তি' বলে, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি। কার্য্যকারণ ও কর্তৃত্বভাব স্ফুটভাবে উথিত করিবার যোগ্যতা শক্তির আছে। নির্বিশেষ শুদ্ধত্বরূপ চেতনস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের আধারের স্ত্রীরূপ 'চিতি', পুরুষ 'চিৎ', অতএব চিৎ ও চিতি একই তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ মাত্র। শিব ও শক্তির মধ্যেও দ্বৈতভাবের বা দেহদেহীর ভাব কল্পনা করা হয়।

চিতিশক্তি অনন্তরূপা, তথাপি শাস্ত্রে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা এই ত্রিবিধ রূপকেই প্রধান বলা হইয়াছে। অগ্নিরও কেবলমাত্র দাহিকা শক্তি নহে, তাহার পাবকতা, দাহিকা ও প্রকাশিকা এই তিনটী প্রধান রূপ আছে। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিই 'স্বরূপ'শক্তি। ভগবানের তটস্থা শক্তি অসংখ্য জীবে অগণিত বিন্দুরূপে প্রকাশিত হইয়াও তত্ত্বতঃ 'এক' ও মহান্, জীব ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপের কণারূপ, অতএব জীব ও শিবে ভেদ থাকিলেও উহারা তত্ত্বতঃ 'এক', জীবে ও শিবে যে শক্তিভেদ তাহা স্বরূপাত্মকও নহে, সর্ব্বথা বিজাতীয়ও নহে, তাই উহাকে 'তটস্থা' বলা হয়।

ভগবানের সং-চিৎ-আনন্দরূপে শক্তিরও ত্রিবিধ রূপ বর্ত্তমান—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। স্বয়ং সং বা একমাত্র পরমার্থ-সত্তাযুক্ত হইয়াও পরব্রহ্ম নিজের যে স্বরূপ শক্তিদ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ গ্রস্ত, সং ও অসদরূপে অনির্ব্বাচ্য প্রাপঞ্চিক বস্তুমাত্রকে কিছুকালের জন্ত সত্তাযুক্ত করিয়া দেন ঐ শক্তির নাম 'সন্ধিনী' শক্তি। স্বয়ং স্বপ্রকাশ চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম যে শক্তির দ্বারা অজ্ঞানমোহিত জীবের জ্ঞান সম্পাদন করাইয়া স্পর্শরূপরসাদিভোগ্য পদার্থের ভোক্তা বা জ্ঞাতা করেন, ঐ শক্তির

নাম 'সংবিৎ' শক্তি। স্বয়ং অনাদি অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম যে শক্তিদ্বারা নিজের আনন্দস্বরূপকে জীবের অনুভূতির বিষয় করাইয়া স্বয়ং ও আনুভূত পরমানন্দের সাক্ষাৎকার করেন ঐ স্বরূপশক্তির নাম 'হ্লাদিনী' শক্তি।^১

ভগবানের তিনটি শক্তি—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। অদ্বৈতীরা যে বলেন, “ব্রহ্ম নিরশক্তি”—বৈষ্ণবদর্শন তাহা অনুমোদন করেন না। চিৎশক্তির ত্রিবিধ বিলাস—ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, এই তিনটির পারিভাষিক নাম হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সন্নিৎ (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৯)। অদ্বৈতীরা বিবর্তবাদী। তাঁহারা বলেন, জীবের অবিচার ফলে ব্রহ্ম বিশ্ব-রূপে প্রতিভাসিত হন। বৈষ্ণবেরা পরিণামবাদী, তাঁহারা বলেন, মায়া-শক্তির দ্বারা মায়াধীশ ভগবান্ বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন। অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গ মায়াশক্তি ব্যতীত ভগবানের এক ‘তটস্থা’ শক্তি আছে—তাহাই ‘জীবশক্তি’। অদ্বৈতীরা ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বেদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জীব ও ঈশ্বরে অভিন্ন বা সোহং ভাব কল্পনা করেন, বৈষ্ণবদর্শন তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বলেন জীব যখন শক্তি ও ঈশ্বর শক্তিমান তখন উভয়ে অভিন্নতা কিরূপে সম্ভব ?^২

বাস্তবিকপক্ষে শক্তির সহিত শক্তিমানের ‘তাদাত্ম্য’ সম্বন্ধ অর্থাৎ উহাদের মধ্যে ‘ভেদ’ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ উহারা ‘অভেদ’। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয় রূপই উপাসকের রুচি অনুসারে কল্পনীয়। দীপশিখা ও তাহার প্রকাশের মধ্যে অভেদ থাকিলেও ভেদ আছে। কারণ দীপ থাকিলে প্রকাশ থাকে, না থাকিলে প্রকাশ থাকে না, অতএব তাহারা অভেদ। আবার দীপশিখায় যে দাহিকাশক্তি আছে, প্রকাশ মধ্যে তাহা নাই, অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান। তথাপি শিব ও শক্তির, দীপ ও প্রকাশের সম্বন্ধ মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। দীপ-শিখা জড় পদার্থ (যাহা কিছু দৃশ্য তাহাই জড়) তাই জড় পদার্থ হইতে তাহার প্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না; কিন্তু শিব ও শক্তি এক চেতনস্বরূপেরই দুই রূপ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, তাই প্রকাশ বা শক্তি ভিন্নরূপ ধারণে সমর্থ। তাই শক্তি ও শক্তিমান অদ্বৈতরূপ হইয়াও

১-১ সাধনমার্গে শক্তিতত্ত্ব, ম. ম. প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কল্যাণ, শক্তি অঙ্ক পৃ: ১৩৭

২-১ প্রেমধর্ম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৯৪৫) দশম অধ্যায়, পৃ ১৫৩ ইত্যাদি।

দ্বৈতরূপে প্রকাশিত। শক্তি শিবের সক্রিয় অবস্থা ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এই ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে শক্তিই মায়া, মহামায়া, মূলাপ্রকৃতি, অবিজ্ঞা, কুণ্ডলিনী, পরাশক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। শক্তিই ইন্দ্রজালের দ্বারা ক্ষণভরে পদার্থসৃষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়া তিনি অঘটনপটীয়সী ‘মায়া’, সংসার উৎপন্ন করিবার ক্রিয়ারূপিণী বলিয়া তিনি ‘মূলাপ্রকৃতি’, মোহদ্বারা বহু পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতে সমর্থ বলিয়া ‘অবিজ্ঞা’ এবং শরীরস্থ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে ‘কুণ্ডলিনী’ শক্তি। তন্ময়ের ডাকিনী হাকিনী ইত্যাদিও শরীরস্থ শক্তি। ঘেরও সংহিতাদিতেও শক্তি উপাসনার আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে, কারণ শক্তি ও শক্তিমানে ‘তাদাত্ম্য’ভাব, শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমীমাংসায় (১-২-১) “তাদাত্ম্যমনয়োনিত্যং বহুদাহিকয়োরিব” বলা হইয়াছে। “শাক্ত অদ্বৈতবাদের” উত্থানের কারণও দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হইলেও শিবশক্তির অদ্বৈতরূপ। তন্ত্রশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জগু উপাসনার বিধি আছে—উহা দ্বিবিধ—আমুরী ও দৈবী, বা পঞ্চ-মকারযুক্ত ও সাংখ্যিক, উভয়েরই ফল দিব্যাসিদ্ধিলাভ। রাধাস্বামী সম্প্রদায় মতেও একই পরমতত্ত্বের দুইটী রূপ আছে। একটী স্থিরতার বোধক স্বরূপ ‘হৃদ’, অপরটী গতির বিকাশ স্বরূপ ‘ধারা’। শক্তির নির্ঝরে উপপ্লব বিনা ধারা প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নহে, এই ধারাই ‘রাধা’ এবং হৃদ ‘স্বামী’, অতএব রাধাস্বামী একই তত্ত্বের দুইটী রূপ, রাধা শক্তি, স্বামী শক্তিমান।

বিশ্বের অন্তর্গত যে নির্ঝিকার সত্তা তাহাই শিব; তাহার শক্তি চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই পঞ্চরূপে অভিব্যক্ত। শক্তি যখন চিৎরূপে অবস্থিত থাকে তখন তাহা ‘শিবতত্ত্ব’, ‘আনন্দ’ শক্তি দ্বারা জীবনের সঞ্চার হয়, ইহাই শক্তিতত্ত্ব, স্ব-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ‘ইচ্ছার’ উন্মেষ, ‘ইচ্ছা-শক্তিরূপা কুমারী’ (শিবসুত্রবিমর্শিনী), শক্তি যখন অগ্নি বলবন্তর ইচ্ছাদ্বারা ব্যাহত না হয়, তখন সে ‘শক্তি’ ব্যাহত হইলে উহা ‘অশক্তি’ কিন্তু ব্যাঘাত দ্বারা অশক্তিই ক্রোধের রূপ ধারণ করে ও কাল পাইয়া নূতন ‘শক্তি’ হইয়া যায়।^১ ইহার অনন্তর যে ‘জ্ঞান’ অবস্থা তাহাই ঈশ্বরতত্ত্ব, ইহাতে জগৎকে উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকে। ইহার পর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ হয়, ইহা হইতে ‘ক্রিয়া’র আরম্ভ হয়, ইহাই

১। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ—স্বর্নানারায়ণ শাস্ত্রী, শক্তি অঙ্ক, কল্যাণ, পৃ: ১০৮

২। শক্তিতত্ত্ব, কল্যাণ, শক্তিঅঙ্ক পৃ: ১২২

শুদ্ধবিজ্ঞান অবস্থা। এই অলৌকিক পঞ্চতত্ত্ব শিবের পঞ্চধা শক্তির অভিব্যক্তরূপ।

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, শক্তি উপাসকের ষট্‌ত্রিংশতি তত্ত্ব, পুরুষের পঞ্চ আনন্দ নিয়তি, কাল, রাগ, বিজ্ঞা, কলা, এবং কলা হইতে মায়া, শুদ্ধবিজ্ঞা, ঈশ্বর, সদাশিব, শিব ও শিবতত্ত্ব, এই ছয়টি তত্ত্ব। পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের সহিত একাদশ তত্ত্ব যুক্ত হইয়া ষট্‌ত্রিংশতি তত্ত্ব হয়। শিবতত্ত্ব স্বতন্ত্রতত্ত্ব, সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধবিজ্ঞা বিজ্ঞাতত্ত্ব ও মায়া হইতে নিম্নের ৩২টি তত্ত্ব ‘আত্মতত্ত্ব’রূপে খ্যাত।

ষট্‌শক্তি বা পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকা; শক্তির এই ষট্‌রূপও কল্পনা করা হইয়াছে। আবার পরমাত্মাস্বরূপা মহাশক্তিকে কেহ ‘সগুণ’ কেহ ‘নিগুণ’ আখ্যায় অভিহিত করেন। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল থাকিলে উহার অধিষ্ঠানরূপ মহাশক্তি সগুণ, এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিগুণ, এক মহাশক্তি মধ্যে সগুণ ও নিগুণরূপ পরস্পরবিরোধী গুণেরও নিত্য সামঞ্জস্য বর্তমান। নিগুণ অবস্থাতেও গুণময়ী মায়াশক্তি তন্মধ্যে নিহিত, আবার সগুণ অবস্থাতে উহা সর্বতত্ত্ব-স্বতন্ত্র বলিয়া বস্তুতঃ নিগুণ, অতএব মহাশক্তিতে সগুণ ও নিগুণ উভয় লক্ষণই বিদ্যমান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সৃষ্টি ও সংহার—পিণ্ড উৎপত্তি বিচার

সৃষ্টি অর্থে যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা ব্যক্ত হওয়া। আর সংহার তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্তের অব্যক্ত হওয়া। কোন কিছুই অত্যন্ত নাশ নাই। স্বকারণে লীন হওয়াই সংহার বা প্রলয়। কার্য্য থাকিলেই কারণ থাকিবে এবং কর্তৃহও থাকিবে। কারণ কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু কার্য্য ব্যক্ত না হইলে কারণ শক্তিরূপে অবস্থান করে। কার্য্যের অপেক্ষায় কারণকে শক্তি বলা হয়। শক্তিমানকে আশ্রয় করিয়াই শক্তি অবস্থিত, শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন নহে। ধর্ম্মীর ধর্ম্মই উহার শক্তি। ধর্ম্ম হইতেছে বস্তুর বুদ্ধভাব। যাহা বুদ্ধ হয় তাহাই ব্যক্ত—যাহা বুদ্ধ হয় না তাহা অব্যক্ত। শক্তি যদি দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ক্রিয়ার প্রবর্তনা করে তবেই তাহা বুদ্ধ হয়। শক্তির প্রসর হইতেই ক্রিয়ার প্রবর্তনা আর তাহার সংকোচ হইতে ক্রিয়ার নিবৃত্তি। অতএব শক্তির প্রসরই সৃষ্টি, আর সংকোচই সংহার। “শক্তিপ্রসরসঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিসংহতী”।^১ শিবই শক্তির আধার। শক্তি যখন সংবৃত্ত তখনই শিবাবস্থা, শক্তির প্রতিপ্রসবে নিরুত্থান দশাই শিবভাব—

প্রসরং ভাসয়েচ্ছক্তিঃ সংকোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ ।

তয়োৰ্যোগস্ত কৰ্ত্তা যঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥^২

সৃষ্টি সংহত হইলে সৃষ্টির কারণভূত শক্তি যেখানে লীন থাকে তাহাই সর্ব্ব কারণের কারণ।

কার্য্যাকারণকর্তৃহং যদা নাস্তি কুলাকুলম্ ।

অব্যক্তং পরমং তদ্বৎ স্বয়ং নাম তদা ভবেৎ ॥^৩

অব্যক্তের যাহা মূল তাহাই পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্ব হইতেই শক্তির প্রসরে জগতের বা পিণ্ডের উৎপত্তি। উৎপন্ন জগৎ নিরাকার ও সাকার ভেদে দ্বিবিধ। সাকারও সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভেদে দ্বিবিধ। সাকার-নিরাকার এবং সগুণ-নিগুণের অতীত পরমতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ পর্য্যায়ক্রমে

ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাবের কথা সিদ্ধগণ বলেন। প্রথম পরপিণ্ড হইতে অনাদিপিণ্ড, অনাদিপিণ্ড হইতে আত্মপিণ্ড, তাহা হইতে সাকার, সাকার হইতে শিবের অষ্টমূর্ত্তিবিশিষ্ট মহাসাকার পিণ্ড এবং মহাসাকার পিণ্ডের অদ্ব্যতম মূর্ত্তি ব্রহ্মা হইতে তাঁহার দৃষ্টিপাতে প্রাকৃত বা অবলোকনপিণ্ড ও তৎপর গর্ভপিণ্ড হইতে জীবোৎপত্তি।

গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে সৃষ্টির নিম্নলিখিত ক্রমের উল্লেখ আছে। সর্বতত্ত্বাতীত অদ্বৈতোপরিবর্তী সাকার-নিরাকারাতীত নাথ হইতে নিরাকার জ্যোতির্নাথের উদ্ভব। তাঁহা হইতে সাকার নাথ, তাঁহার ইচ্ছা হইতে সদাশিব ও তাঁহা হইতে ভৈরব উৎপন্ন হন। ভৈরবের শক্তি ভৈরবী হইতে বিষ্ণু, এবং বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা হইতে সর্বসৃষ্টির উৎপত্তি।^১ অনামা বা নাথ বা পরমতত্ত্ব হইতে পরপিণ্ড (অনাদিপিণ্ড) ও আত্মপিণ্ডে প্রকাশই নিরাকার সৃষ্টি। আত্মপিণ্ড হইতে উৎপন্ন পঞ্চমহাভূত ও ব্রহ্মার দৃষ্টি হইতে সৃষ্ট প্রাকৃত পিণ্ডাদিই সাকার সৃষ্টি।

অনামা বা পরমতত্ত্ব সর্বশক্তিই অন্তরলীনভাবে আছে। তাঁহা হইতে ষট্‌পিণ্ডাত্মক জগৎ উদ্ভূত হইলেও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় পূর্ণই থাকেন। তিনি বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বাতীত। তিনি একাধারে সর্বাতীত বা সর্বোত্তীর্ণ এবং সর্বাত্মক উভয়ই।^২ বিশ্বের প্রাচুর্য্য তাঁহার পরা ও অপরা আদি শক্তির উন্মেষ হইতেই হয়। তাঁহার নিজাশক্তির নিত্যতা, নিরঞ্জনতা, নিরুখতা প্রভৃতি যে পঞ্চগুণের কথা নাথগণ বলেন তাহা দ্বারা তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত স্বপ্রকাশ স্বসংবেগ স্বরূপেরই নির্দেশ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে শক্তির প্রসরই সৃষ্টি, এই প্রসরের প্রথম উন্মেষই ঔন্মুখ্যাক্ষা পরাশক্তি। সৃষ্টির প্রাগ্ভাবী ঔন্মুখ্যতাই এই পরাশক্তির স্বরূপ, ঔন্মুখী শক্তির পরবর্তী অবস্থা স্পন্দন মাত্রা অপরাশক্তি ইহা হইতে অক্ষুট অহস্ত্যার আবির্ভাব—ইহাই সূক্ষ্মাশক্তি, তাহা হইতে চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনীশক্তির আবির্ভাব।^৩ কুণ্ডলিনী শক্তির পূর্ণতা, প্রতিবিশ্বতা, প্রবলতা (প্রকৃতিক্রপতা), প্রোচ্চলতা ও প্রত্যঙমুখতারূপ যে পঞ্চগুণের কথা নাথদর্শনে পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝা যায় সৃষ্ট জগৎ পরতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইলেও

পরতত্ত্ব খণ্ডিত হইয়া যায় না। ইহাই তাঁহার পূর্ণতা। পরমতত্ত্বের পঞ্চশক্তির পঞ্চবিংশতি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অপরম্পর পরমপদাদি পঞ্চভাবাবিহিত পরপিণ্ডের উদ্ভব। প্রথম ভাব অচ্চিমাত্র (জ্যোতিঃ-স্বরূপ) অস্তিতাপূর্ব্ব, দ্বিতীয় ভাব স্বয়ংবেদনা, তৃতীয় ভাব সেচ্ছামাত্র, চতুর্থ ভাব সত্ত্বামাত্র, পঞ্চম ভাব স্ব-সাক্ষাদ্ভূত।^১ গোরক্ষ উপনিষদে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিষয় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। “আদৌ দেবো মহানন্দো নির্মমে দেবতা স্বয়ম্। তস্মাদিচ্ছা সুসম্পন্না ইচ্ছাজ্ঞানং ততঃ ক্রিয়া ॥ ততো ব্যাথাং বরারোহে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্ধদম্। অব্যক্তব্যক্তভাবেন বিচরামি জগজ্জয়ম্ ॥” অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে শিবশক্তির প্রসরের পূর্ব্বে একমাত্র নির্মম মহানন্দময় আদিদেবী আপন মহিমায় বিরাজিত থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে তাঁহার স্বারসিক ইচ্ছার উদয় হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান ক্রিয়ার উদয় হয়, তৎপরে ব্যাথা ও তাহার সহিত পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড বুদ্ধদাকারে উদ্ভূত হয়।^২ উল্লিখিত ভাবসকলের সহিত তদ্ব্যাক্ত সৃষ্টির প্রাগ্ভাবী পরমশিবের চিৎ আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়াশক্তির ক্রমশঃ উন্মেষে শিবশক্তি সদাশিব ঈশ্বর সদ্বিজ্ঞাতত্ত্বের আবির্ভাবের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

শিব স্বপ্রকাশ স্বরূপ। তাঁহার আনন্দশক্তির উন্মেষ হইতে শক্তির প্রসর আরম্ভ। তাহার ফলে প্রথম আত্মবিমর্শদ্বারা তাঁহার স্বারসিক অহং ভাবের উদয়। ইহা নাথদর্শনের পরাশক্তিস্বরূপে উন্মুখতার সহিত তুলনীয়। তৎপরে অপরাশক্তি ও সৃষ্টাশক্তির স্বরূপে যে স্পন্দন ও অর্দ্ধাঙ্গ অহস্তার কথা বলা হয় তাহা ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রভাবে অহম্ ইদম্ ও ইদম্ অহং ভাবের স্বরূপের অনুরূপ। ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে অহম্ ও ইদং যখন পৃথক রূপে ভাসিত হয় তখনই স্ববাহে জগতের আবির্ভাব অনুভূত হয়।

পরপিণ্ডের আবির্ভাবের পর প্রসরোন্মুখ শক্তি পরমানন্দ, প্রবোধ, চিত্তদয়, প্রকাশ ও মোহহং এই পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয়ে আত্মপিণ্ডরূপে প্রাক্ভূত হয়। এই আত্মপিণ্ড হইতেই সাকার সৃষ্টি। সাকার সৃষ্টির আদিতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব। এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চবিংশতি গুণের সমাবেশে

শিবাди অষ্টমূর্তি ও নরনারী-আত্মক প্রাকৃত পিণ্ডের আবির্ভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

নাথদর্শনে ব্যক্ত জগৎকে কুলপঞ্চক আখ্যা দেওয়া হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কাল ও জীব এই পাঁচটি লইয়া কুলপঞ্চক। যাহা ব্যক্ত যাহা নামরূপ বা বর্ণগোত্রাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; তাহাই কুল, তাহাই সৃষ্টি; আর যাহা “বর্ণগোত্রাদিরাহিত্যাদেকমেব” তাহাই অকুল।^১ তাহা সৃষ্টির অবসানেও অকুল, সৃষ্টির পূর্বেও অকুল। অকুল হইতেই কুলের উদ্ভব এবং কুল হইতেই ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

অকুলং কুলমাধন্তে কুলাদ্ ব্যবহৃতির্ভবেৎ।

অতঃ কুলাকুলস্থিত্যানীশঈশোপি শঙ্কতে ॥^২

কুলাকুলের স্থিতিহেতু অব্যক্ত পরমতত্ত্বই ঈশ অর্থাৎ জগতের নির্মাতারূপে শঙ্কিত হন।

“শিবঃ স্বশক্তিসহিতো হ্যভাসাদ্ভাসকো ভবেৎ”।^৩

সৃষ্টিই আভাস, নিরাভাসই সংহার বা লয়। সর্বমূল ও সর্বকারণের কারণ যে পরমতত্ত্ব তাহা স্বপ্রকাশ। তিনি দেশ কাল প্রভৃতির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানমাত্র রূপ। তাঁহার অহংবিমর্শের ফলেই সমগ্র জগৎ প্রমাতৃবর্গের নিকট উৎপন্ন, স্থিত ও উপসংহৃত রূপে ক্রমশঃ ভাসমান হইতেছে। নূতন আভাসের বিষয়ীভাব উৎপত্তি বা সৃষ্টি, আভাস-দ্বারা বিষয়ীভাব স্থিতি এবং আভাসের বিষয় না থাকাই লয় বা সংহার। প্রকাশই শিব, বিমর্শই শক্তি, প্রকাশরূপ শিবদ্বারা বিমর্শশক্তিয়োগে প্রকৃতি বা জগৎ যখন বহিঃবিসৃষ্ট হয় তখন তাহাকে বিসর্গ আখ্যা দেওয়া হয়। “বিসর্গ এব বিশ্বজননে ভগবতঃ শক্তিঃ।”^৪ বিসর্গাখ্যা বিমর্শশক্তি বিশ্বসৃষ্টির কারণ। শিবরূপ প্রকাশ যখন আপন বিমর্শশক্তিকে আপনার মধ্যে সংবৃত করেন তখনই বিশ্বের উপরম হয়। তাহাই সংহার। এইরূপে সৃষ্টি ও সংহার অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে চলিতেছে। ঘটাদি ভূতলে উৎপন্ন হইয়া ভূতল হইতে ভিন্নরূপে ভাসমান হয় কিন্তু জগতের উৎপত্ত্যাди সেইরূপ নহে, দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, জগতের উৎপত্ত্যাдиও সেইরূপ পরপ্রতিভাতে তদ্ব্যতিরিক্তরূপে অজ্ঞানীর নিকট ভাসিত হয়। তাবিক দৃষ্টিতে ইহাই সৃষ্টি এবং সংহারের স্বরূপ।

নাথদর্শনে সৃষ্টিপ্রবাহে আর একটি ধারার কথা দেখা যায়। তাঁহার বলেন নাথ হইতে দুই প্রকার সৃষ্টি হয়, এক নাদরূপা, অপর বিন্দুরূপা। নাদ জ্ঞানরূপ সূতরাং শিষ্যশিষ্যানুক্রমে জ্ঞানধারার সংরক্ষণে নাদরূপা সৃষ্টি এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সম্বানধারার সংরক্ষণে বিন্দুরূপা সৃষ্টি। নাদসৃষ্টিও স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। নাদবিন্দু সম্প্রদায়ের বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

নাদ হইতেই শব্দের সৃষ্টি, শব্দসৃষ্টিও স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ, প্রণব, মহাগায়ত্রী ও যোগশাস্ত্র সূক্ষ্ম শব্দ সৃষ্টি। ব্রহ্ম গায়ত্রী, বেদত্রয়ী স্থূল শব্দসৃষ্টি। যোগশাস্ত্র হইতে তন্ত্রশাস্ত্র এবং বেদ হইতে স্মৃতিশাস্ত্র উৎপন্ন।^১ পরম্পরাক্রমে “নবনাথানাং পশ্চাদ্ দ্বাদশসিদ্ধাশ্চতুরশীতিশ্চ দ্বাদশোপস্থানো অনন্তসিদ্ধাশ্চ জাতাঃ। সদাশিবোভৈরবাদ্ বিষ্ণু ব্রহ্মা সূর্য্যশ্চন্দ্র ইন্দ্রাদি দেবতা জাতাঃ। পুনঃ যোগাৎ শেষযোগসাংখ্যযোগাদয়োহনেকযোগা অনেক ভেদৈর্জাতাঃ।^২ এক হইতেই বহু ও বিচিত্রের উদ্ভব এই তত্ত্বই উপরোক্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত হয়।

নাথগণের দৃষ্টি অনুসারে বিগ্রহসৃষ্টিও দ্বিবিধ, প্রবৃত্তিরূপিনী ও নিবৃত্তিরূপিনী।^৩

শক্তির অবরোহণ হইতে প্রবৃত্তিবিগ্রহ আর অধিরোহণ হইতে নিবৃত্তিবিগ্রহ। অবরোহণ স্বরূপতঃ প্রসররূপ এবং অধিরোহণ সংকোচরূপ। সূতরাং প্রবৃত্তিই সৃষ্টিরূপা এবং নিবৃত্তি সংহাররূপা। জীবের পক্ষে প্রবৃত্তি হইতেই সংসার, নিবৃত্তি হইতে মোক্ষ বা জীবভাবের তিরোভব। সমষ্টিদৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং সংহারও যেরূপ, ব্যষ্টিদৃষ্টিতে জীবের সংসার ও মোক্ষও সেইরূপ। এই সৃষ্টি ও সংহতি তবের যথার্থ জ্ঞানের উপরই নাথগণের সমগ্র সাধন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চল, নিশ্চল, সদানন্দ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত পরমতত্ত্ব হইতে তাঁহার অন্তর্লীন শক্তির প্রসারে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়া যেমন প্রলয়কালে তাঁহাতেই সংহত হয়, জীবেরও সেইরূপ স্বপিণ্ডস্থ সমগ্র প্রবৃত্তিমুখী শক্তি সাধনবলে অন্তর্মুখী হইয়া ক্রমশঃ পরমতত্ত্বের সহিত সামরস লাভ করে। এই সমরস করণই পরমপদ-প্রাপ্তি।

নাথ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বঙ্গ-সাহিত্যে সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা

নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত সৃষ্টি ও সংহার বর্ণিত হইয়াছে, নাথদের বঙ্গগীতিকাদিতেও সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা পাওয়া যায়। অলেকনাথ বা 'নিরঞ্জন' গৌসাই অনাদি ধর্ম্যনাথকে সৃষ্টি করেন, তৎপরে অলেকনাথের মুখামুত হইতে স্থলের (জলের ?) সৃষ্টি হইল, অনাদিনাথ তাহার উপর আসন করিয়া বসিলেন। তৎপরে অলেকনাথ নিজ দেহের শক্তি হইতে (কা)'কেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। দেবী অনাদির পদাস্তর সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ গঙ্গাকে সৃষ্টি করিয়া অনাদির জটায় স্থাপনা করিয়া উহাদের উপর সৃষ্টির ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনাদির কৃপায় (কা)'কেতুকা' দেবী পুনর্জীবিতা হইলেন ও আদি অনাদি মিলিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। বাসুকি ও পাতাল সৃষ্ট হইল, বাসুকির মস্তকে ত্রিকোণ পৃথিবী স্থাপিত হইল। অনাদির মুষ্টির ভিতর অন্ধ-বধির ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জন্মিলেন। অনাদি ছদ্মবেশে তাহাদের নিকট রন্ধনের জন্ত অপোড়া পৃথিবী চাহিলে, একমাত্র শিব তাহার মাথার জটায় রন্ধন ভোজন করিতে বলিলেন। অনাদি সমুদ্রে হইয়া তাহাকে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি লাভের উপায় বলিয়া দিলেন। শিব তাহা লাভ করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে উপায় বলিয়া দিলেন। তৎপরে শিব অনাদিনাথের আজ্ঞায় গঙ্গা ও গৌরীকে বিবাহ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তপস্শ্রায় বসিলে অনাদি শবরূপে আবির্ভূত হইলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঘৃণায় পলাইলেন, শিব তাহার সংকার করিলেন। দাহকালে অনাদির দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের উৎপত্তি হয়।^১

নাথপন্থীয় যোগীরা শিব ও ধর্ম্য নিরঞ্জন উভয়ের উপাসক। তাহাদের নিরঞ্জন 'অলেক'। বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্যের সংমিশ্রণে নাথধর্ম্যের উৎপত্তি কল্পিত হয়। বজ্রযান, সহজযান, যোগী ও নাথসম্প্রদায়ের ধর্ম্যের সহিত যে ধর্ম্যঠাকুরের এককালে জ্ঞাতিত্ব ও সংস্পর্শ ছিল তাহার আভাস সৃষ্টিখণ্ডীয় আখ্যান ও প্রাহেলিকা হইতে পাওয়া যায়। ইচ্ছাশক্তিমান ঈশ্বরই ধর্ম্যঠাকুর, তিনি শূন্যরূপ। তাহার ইচ্ছায় নিরঞ্জন পুরুষ ও মহামায়া প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।^২

১। সা. প. প. ৩১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, উত্তর শূদ্ধপুরাণের ভূমিকা পৃ ২১।

২। শূদ্ধপুরাণ ভূমিকা পৃ ১১৩, ১৬১।

শৃঙ্গপুরাণ নামে ধর্মঠাকুরের যে পূজাপদ্ধতি আছে, তাহার সৃষ্টি-পদ্মন বর্ণনার সহিত নাথপন্থের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। শৃঙ্গপুরাণের প্রথমেই অঙ্ককারময় অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বস্তু চিন ।
রবি সমী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥
নহি ছিল জল থল, নহি ছিল আকাশ ।
মেরু মন্দার ন ছিল না ছিল কৈলাস ॥
নহি ছিল ছিটি..... ইত্যাদি ।

এই মহাশৃঙ্গ মাঝে একমাত্র প্রভু বিরাজ করিতেন, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। ঘোর অন্ধকার দ্বারা সকল আচ্ছন্ন ছিল। প্রভু শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার সৃষ্টির বাসনা হইল, এই ইচ্ছার পরেই প্রাণের ‘স্পন্দন’ আরম্ভ হইল। সেই স্পন্দনরূপ পবন হইতে দুই ‘অনিল’ শ্বাসপ্রশ্বাস জন্মিলেন। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ‘বিকাশ’ ও ‘সঙ্কোচ’ অর্থও হইতে পারে। প্রভু জীব উদ্ধারার্থে বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন,—“আপনি সিরজিল পরভু আপনার কায়া”। সেই পুরুষ হস্তপদহীন, অঙ্গহীন, পিতৃমাতৃহীন, তিনিই নিরঞ্জন বা নারায়ণ। তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে আত্মা-শক্তির উৎপত্তি, আত্মার গর্ভে ‘বস্ত্রা বিষ্ণু সিবের’ উৎপত্তি এবং নিরঞ্জন ও আত্মার যোগে সমস্ত জীবের সৃষ্টি।

এই নিরঞ্জন শৃঙ্গমূর্ত্তি, এই কল্পনা মধ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব স্পষ্ট, কারণ আদিবুদ্ধ বা আদিনাথ শৃঙ্গ হইতে প্রকাশিত। শৃঙ্গপুরাণের সেতাই নীলাই কংসাই রামাই ও গোসাঞি, পঞ্চধর্ম্মপ্রচারক, ইহারা কি পঞ্চাধ্যানীবুদ্ধার রূপান্তর? নিরঞ্জনের শৃঙ্গমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় ও ধবলবর্ণ। বৌদ্ধদের শৃঙ্গ ও স্বয়ংজ্যোতি, কারণ বৌদ্ধমতে আলোক হইতেই জাগতিক সকল পদার্থের উৎপত্তি। শৃঙ্গের দুই রূপ, তন্মধ্যে নিরঞ্জন নিরাকার, ধর্ম্ম সাকার। কিন্তু অগ্রত “দীপমস্ত অনল জেহেন নিকলয়। তন্মধ্যে হেনমতে আছে নিরঞ্জন” দ্বারা নিরঞ্জনের মূর্ত্তির কল্পনা পাই। ধর্ম্মের বাহন উলুক, গজ ও কূর্ম্ম, তাঁহার আসন পদ্ম। ধর্ম্মঠাকুর ক্রমশঃ স্তূপ ও তৎপরে কূর্ম্মাকারে পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। এই কূর্ম্ম

বৌদ্ধ-দেবতা বা বৌদ্ধরূপের প্রতীক নহে, ইহা ধর্ম্মঠাকুরের পাদপীঠ, ধর্ম্ম সূর্য্যঠাকুর।^১

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থেও সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা আছে। তাহা এইরূপ—

প্রথমে আছিল প্রভু ন চিনি আপনা।
জে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা ॥
চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা আকার।
আকার দেখিয়া তান জন্মিল বিকার ॥
এবা কোন জন হয়ে আছে মোর পাশ।
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ ॥^২

অর্থাৎ প্রথমে প্রভু স্বয়ং নিজেকে না দেখিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার বিখ্যাত (transcendental) বা তুরীয় অবস্থা, ইহাই প্রথমাবস্থা। প্রভুর মধ্যে যে শক্তি (জে জন=শক্তি) ছিলেন, তাঁহার দ্বারাই প্রভুর চৈতন্যের (consciousness) উদয় হইল, এই শক্তির সাহায্যেই প্রভু নিজেকে চিনিলেন। কারণ, গুণাবধারণের যোগ্য দ্বিতীয় জন না থাকিলে প্রথম জনের গুণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়, তুলনা-মূলক বস্তুবিহীন অবস্থায় কোন 'স্থান' নির্ণয় সম্ভব নহে, অতএব শিবকে বুঝিতে হইলে শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে।

স্বীয় শক্তির রূপ দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন, আকার দেখিয়া প্রভুর বিকার জন্মিল, শক্তিকে ধরিবার জন্য তিনি ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। তৎপরে শক্তিকে ধরিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন, তখন তাহা হইতে আকাশ ক্রিতি আদি বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব হইল, ইহাই সৃষ্টির দ্বিতীয় বা উচ্চতর অবস্থা। ইহার পর ক্রিয়ৎক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় বাতীত হইবার পর, চৈতন্যের উদয়ে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইল? তিনি স্বয়ং যে সৃষ্টিকর্তা তাহা তিনি বিস্মৃত হওয়াতেই তাঁহার এই বিস্ময়ের উৎপত্তি। জলে তরঙ্গবৎ তাঁহার ভাবনারাশির উদয় হইতে থাকিল এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবতা ও কতশত 'মহামন্ত্রের' উদয় হইতে লাগিল। ভাবনার সহিত যে ঘর্ম্মের ধারা বহিতে লাগিল তাহা হইতে মন্ত্র, দেবতার যে সৃষ্টি, তাহাই সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থা। অনাত্ম হইতে শিব, গোরক্ষ,

মংশোল্লাদির জন্ম। মন্ত্র, দেবতাদির বাসস্থানের নিমিত্ত আকাশ, পাতালাদি সৃষ্টি হইল, ইহাই সৃষ্টির চতুর্থাবস্থা। সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থায় ব্রহ্মের মধ্যে বীজের ন্যায় শিব শক্তিতে লীন হইয়া থাকেন—“আগ্ন আচ্ছন্ত অনাগ্ন আভূতিয়া”,^১ তাই শক্তি সৃষ্টিকর্ত্তীরূপে পরিচিত, বস্তুতঃ শক্তি মধ্যে শিব যোগমগ্ন হইয়া বিরাজ করেন এবং তিনি প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও ঘট অর্থাৎ রূপবর্জিত। যেমন গাছের মধ্যে বীজ ও বীজ মধ্যে গাছ, তেমনি শক্তি মধ্যে শিব এবং শিব মধ্যে শক্তি সদা বিরাজিত। ইহাই সৃষ্টি ও সংহার তত্ত্ব।

বস্তু পরিচ্ছেদ

জীব, ঈশ্বর ও জগৎ

শক্তি ও শক্তিমান নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; তাহাদের সম্বন্ধ ‘অহম্ মমেতিবৎ’ অভেদ। শিব বা শক্তিমান নিজেকে মায়াশক্তির দ্বারা আবরিত করিয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, প্রাণিমাাত্রেরই সাধারণ নাম জীব, এবং প্রাণিমাাত্রেরই দেহাবচ্ছিন্ন চেতন পুরুষ। স্বপ্রকাশ অবিনাশিকরূপে বিদ্যমান শিব হইতে জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইতে নাম ও রূপ দ্বারা ব্যক্ত সংসারের বা জগতের উৎপত্তি, তাই শিবরূপ নিমিত্ত-কারণই হইতেই উপাদান-কারণ উদ্ভূত এবং নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জগৎই শক্তিতত্ত্ব স্বীকৃত হয়, ইহাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলা হয়, অথচ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন তাহাও বলা হয়। চেতন স্বরূপ শিব সঞ্জীবক এবং জগৎ তাহার দ্বারা সঞ্জীবিত জড় শক্তি। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ তিনই তিনি স্বয়ং, ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগও তিনি। সাংখ্যকারিকায় আছে “সৌন্দর্য্যাস্তদনুপলব্ধিনাভাবাৎ কার্য্যাস্তদনুপলব্ধেঃ” অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইবার কারণ জগতের উপাদানস্বরূপ শক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না, উহার অসৎ হইবার কারণে নহে, কারণ জগৎরূপ কার্য্য দ্বারাই তাহার কারণ জ্ঞান হয়।

শ্বেতাস্থতর উপনিষদে আছে,

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্বন্

দেবত্বশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কালানুযুক্তানুধিতিষ্ঠতোকঃ ॥ ১।৩

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা কাল ও জীব প্রভৃতি পূর্বোক্ত নিখিল কারণ-সমূহকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, সেই দেবের স্বাত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকেই ব্রহ্মবাসিগণ সমাধি সহায়ে পরমাত্মার জগৎকারণত্বের সহায়রূপে দর্শন করেন। অর্থাৎ মায়াই সৃষ্টির পরিণামী কারণ, মায়া-শক্তি সহায়েই ব্রহ্ম জগতের কারণস্বরূপ হইয়া থাকেন। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্” (৪।১০ শ্লোক, শ্বেতাঃ উপঃ)। প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ও পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে।

“পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (৬৮ শ্লোক, শ্বেতাঃ উপঃ)—অর্থাৎ পরাশক্তি বা মায়া বিচিত্র কার্যকারিনী, এবং তিনি জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া করেন তাহাও স্বাভাবিক অর্থাৎ মায়িক। ‘জ্ঞানবলক্রিয়া’ অর্থে জ্ঞান ও বলের দ্বারা যুক্ত ক্রিয়াশক্তি।

দেবীভাগবতে আছে—

“প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

অর্থাৎ সৃষ্টিতে প্রকৃষ্ট বা মুখ্যস্বরূপে যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, তিনিই ‘প্রকৃতি’। এখানে উভয়কে ভিন্নভাবে দেখাইলেও শক্তি শক্তের আধারেই স্থিত, তাহারা ঘট ও পটের স্থায় ভিন্ন নহেন। কঠোপনিষদেও আছে “অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।”

প্রকৃতি বহুবিধ জীব সৃষ্টি করেন সত্য, কিন্তু একমাত্র মনুষ্যজীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণপরম্পরা এবং সাধ্যসামর্থ্যতত্ত্ব যোগশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলিয়া জীব শব্দে মনুষ্য অর্থ ব্যবহৃত হয়। দেহাদির দ্বারা চিৎশক্তির অবিচ্ছিন্ন হইবার যে সম্ভাব্যতা, তাহাই জীবের জীবভাব, “পাশবন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ”।^১ পাশবদ্ধতা হেতু জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবকে বারম্বার দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহাবচ্ছিন্ন জীব আপন চিৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। ইহা তাহার অনীশ্বরতা। দেহবদ্ধ হইতে মুক্ত হইলে জীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। বস্তুতঃ জীব শিবস্বরূপ, আমি শরীর এইরূপ অভিমানই দেহধারণের মূল কারণ। এই অভিমান দূর করিতে পারিলে জীব জন্মমৃত্যুর উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয়।

জীবের জন্ম অর্থে জগতের কোন লোকে দেহধারণপূর্বক আবির্ভাব, ও মৃত্যু অর্থে পূর্বধৃত দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে জীব অনাদিকাল হইতে দোলায়মান রহিয়াছে; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহ ধারণ করিয়া জীব লোক হইতে লোকান্তরে আবর্তিত হইতেছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের বীজভূত অবিচ্ছিন্নশক্তিই জীবের কারণ শরীর। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কারণ দেহের নাশ নাই, উহাকে আশ্রয় করিয়াই জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করে, এবং বাসনাক্রয়কারী কৰ্ম করিতে করিতে জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হয়।

জীব সম্বন্ধে একজীববাদ ও অনন্তজীববাদ এই দুইটি বিভাগ আছে।

একজীববাদে একটীমাত্র জীব বিद्यমান, তিনি ঈশ্বরও সৃষ্টি করিয়াছেন জগৎও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মুক্তি হইলে জগৎব্যাপার রুদ্ধ হইবে, সেই নিমিত্ত একজীববাদ অসম্ভব। অনন্তজীববাদে অনন্তকোটি জীব বিद्यমান, এক চিৎসূর্য্য স্বরূপের কিরণ কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব বিद्यমান আছে, প্রত্যেকের নিজস্বসাধনে নিজের মুক্তি হয়, তাহাতে অশ্বেষের মুক্তি সম্ভবে না।

ঈশ্বরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বেদান্তে ও তন্ত্রে যথেষ্ট ভেদ আছে। বেদান্তের ঈশ্বর মায়াযুক্ত ব্রহ্ম, এই মায়া সবগুণপ্রধান, রজঃতমোগুণ তাহার মধ্যে অপ্রধানরূপে বর্তমান, কারণ সত্ত্বরজস্তমো অবিনাশাবী। তন্ত্রের ব্রহ্ম মধ্যে চিৎশক্তি আছে, ইহা মায়াতীত শুদ্ধ-শক্তিযুক্ত শিব। 'মায়াতীত' কারণ মায়া 'জড়' বলিয়া চৈতন্যরূপ শিবের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু 'চিৎ'শক্তি যুক্ত হইতে পারে কারণ তাহাও চৈতন্যময়, এই যুক্ত অবস্থাতেই 'শিব', চিৎশক্তির অন্তর্লীন অবস্থায় শিব শব্দরূপ বা শববৎ। বিমর্শরহিত প্রকাশ জড়তা, বিমর্শযুক্ত প্রকাশই চৈতন্য। শিবের নিত্য অবস্থায় অর্থাৎ বিমর্শমুক্তাবস্থায় শিবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি থাকে না।

জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, এই ঈশ্বর মায়ার সহিত যুক্ত হইয়া যে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু শিব ও শক্তির যোগে যে ঈশ্বরাদি সৃষ্টি হয় তাহা সৃষ্টির উৎকর্ষক্রম।

চিৎশক্তিমান শিবকে লাভ করিতে হইলে কৈবল্যাবস্থার উর্দ্ধে যাইতে হইবে, কৈবল্যাবস্থা সাংখ্যের নির্বিকল্প সমাধিমাত্র। ইহার উর্দ্ধ স্তরে যাইতে পারিলে তবেই ঈশ্বরত্ব-লাভ হয়। অতএব কৈবল্য-লাভ ও ঈশ্বরের সমান হওয়া এক কথা নয়। ঈশ্বরত্ব-লাভে সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মে, কৈবল্যালাভে সে ক্ষমতা জন্মে না।

বিশ্ব মিথ্যা হয় না, প্রতিবিশ্বই মিথ্যা হয়। যথা সূর্য্য মিথ্যা নহে, জলে বহু সূর্য্যের প্রতিবিশ্বই মিথ্যা। সেইরূপ চিদ্রূপা শক্তি সত্য, মায়াতীত জগৎও সত্য, উহাই চৈতন্যময় জগৎ বা বৈষ্ণবের নিত্যধাম। যেমন সর্প সত্য, কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম মিথ্যা। আবার ব্রহ্মকে সীমাবিশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ নহে, কারণ তিনি অসীম। অসীম বস্তু প্রতিবিস্তৃত হইতে পারে না, তাই ব্রহ্ম মায়ায় প্রতিবিস্তৃত হন, ইহা মিথ্যা।^১ অর্থাৎ যাহার বিকার তাহা সত্য, কিন্তু বিকার মিথ্যা।

সেইরূপ মায়াভীত জগৎ সত্য, কিন্তু মায়াময় জগৎ মিথ্যা। শিব ও শক্তি অভিন্ন কিন্তু শিব নিরাকার, শক্তি সাকার, ইহাদের সংযোগে জগতের যে সাকাররূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা (যেমন ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত যানবাহনাদি মিথ্যা, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে যানবাহন আছে তাহা সত্য, তাহার প্রতিবিশ্ব রূপ ছায়াচিত্রই মিথ্যা), কারণ চৈতন্যের বিকাশে উহার লয়প্রাপ্তি ঘটে। জগতে যে সকল ঘটাদিরূপ প্রতিবিশ্ব পড়ে তাহা মিথ্যা কিন্তু তাহাদের মূলে যে বিশ্ব আছে তাহা সত্য, যেমন দর্পণস্থ গোলাপ মিথ্যা কিন্তু গোলাপ বস্তু সত্য।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বেদান্তের ব্রহ্ম ঈশ্বর বা জড় মায়াযুক্ত, বেদান্ত-মতে এই মায়াকে সাধনদ্বারা দূর করা যায়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম শুদ্ধ ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু মায়াযুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বর, মায়ার দ্বারাই আবরণ ও বিক্ষেপের সৃষ্টি হয় (যেমন মনুষ্যের স্থূল চক্ষুর আবরণ স্বরূপ চক্ষুর ছানি cataract হইতেই বিক্ষেপের সৃষ্টি হয়)।

কিন্তু তত্ত্বের শিবের সহিত চিৎশক্তি যুক্ত, অতএব তত্ত্বের চিদ্রূপা শক্তি সর্বদাই শিবযুক্ত ও শক্তিমানের সহিত অভিন্ন, বেদান্তের মায়ার ন্যায় ইহাকে সাধন দ্বারা দূর করা সম্ভব নহে।

নাথগণের ঈশ্বরতত্ত্বে অষ্টমূর্তি বা শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ হইতে সদাশিব, সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা (গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পৃ ৩১) এই অষ্টমূর্তির কল্পনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্বের এই অষ্টবিভাগ এবং ব্রহ্মার অবলোকনে সৃষ্টি। শঙ্কর-পরবর্তী বেদান্তে ঈশ্বর-তত্ত্বে প্রতিবিশ্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ প্রভৃতি মত প্রচলিত আছে। মতবাদগুলি সংক্ষেপে এইরূপ—

অজ্ঞানে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যকে ‘ঈশ্বর’ এবং বুদ্ধিপ্রতিবিশ্বিত চৈতন্যকে ‘জীব’ বলে, কিন্তু অজ্ঞানরহিত বিশ্বরূপ চৈতন্য ‘শুদ্ধ’। স্বতন্ত্রাদি গুণবিশিষ্ট হওয়ায় ঈশ্বর বিশ্বস্থানাপন্ন ও পরম্পরতার কারণ অবিচ্ছাতে যে চিদাভাস তাহা জীব, অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বরূপ ও জীব প্রতিবিশ্বরূপ, ইহাই প্রতিবিশ্ববাদ। কিন্তু রূপযুক্ত বস্তুর রূপের মধ্যে প্রতিবিশ্ব পড়ে (যেমন, চন্দ্রমার প্রতিবিশ্ব জলে পড়ে); ব্রহ্ম রূপহীন, তাহার প্রতিবিশ্ব কিরূপে সম্ভব?

বাচস্পতি মিশ্র অবচ্ছেদবাদ যুক্তিযুক্ত বলেন। এই মতে এক

চৈতন্যই অজ্ঞান ও বিষয় ভেদে দ্বিপ্রকার। অজ্ঞান আশ্রয়ভূত চৈতন্যই 'জীব', আর অবিজ্ঞাবচ্ছিন্ন চৈতন্য 'ঈশ্বর'। স্বজ্ঞান উপস্থিত হওয়ায় জীবজগতের উপাদান কারণ ও ঈশ্বর উপাচার মাত্র রূপে 'কারণ' বলা যায়। (সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ ৮০)।

অদ্বৈতমতে এক আত্মাই সত্য, তিনি জগৎকারণ বা সাক্ষী নহেন। তথাপি অজ্ঞান উপাধিযুক্ত আত্মা অজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া উহাতে পতিত চিদাভাসের অবিবেকের কারণ, সাক্ষী, ঈশ্বর ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। বুদ্ধি উপহিত তাদাত্ম্যকে লাভ করিয়া বুদ্ধিগত স্বকীয় চিদাভাসকে না জানিয়া জীব কর্তা, ভোক্তা, প্রমাতা হন। ইহাই আভাসবাদ, এই মতে জীব নানা, ঈশ্বর এক। (ভারতীয় দর্শন, পৃ ৪৪৮, ৪৪৯)।

জীব, ব্রহ্মা ও ঈশ্বরে নিম্নলিখিতরূপ ভেদ আছে—

- ১। সগুণ ঈশ্বর = ব্রহ্ম—মায়াযুক্ত—সবগুণপ্রধান।
- ২। জীব = ব্রহ্ম—অবিজ্ঞা—রজস্তমোগুণপ্রধান।
- ৩। শুদ্ধব্রহ্ম = জীবও নহে, ঈশ্বরও নহে।

নাথগণ যে ব্রহ্মের অবলোকনে সৃষ্টি কল্পনা করেন, তাহা উপরোক্ত সগুণ ঈশ্বর।

গুরু গোরক্ষনাথের মতে যিনি ষট্পদার্থ সমন্বিত, তিনিই ভগবান। এই ষট্পদার্থ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য। সমগ্র ঐশ্বর্য্যই যোগ, তাহা সহজসিদ্ধিরূপ। ধর্ম্ম হইতেছে মুক্তিরূপ, যে মুক্ত-স্বরূপ তাহারই যশ; শ্রীও মুক্তস্বরূপকে মণ্ডিত করে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যও তাহার, সেই সর্ব্বাধার-স্বরূপ 'নাথ'। শক্তি সৃষ্টিকর্ত্তা, শিব পালনকর্ত্তা, কাল সংহারকারী ও নাথ মুক্তিদাতা। নাথই মুক্ত শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি ইত্যাদি নামভেদে সংসার প্রবর্ত্তকরূপ তাঁহারা ব্রহ্ম, জীব-রূপে ব্রহ্মন, ঈশ্বররূপে ব্রহ্মনকর্ত্তা,—জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ইহাই ভেদ।^১

দ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকে সক্রিয় বলেন, অদ্বৈতবাদীরা নিষ্ক্রিয় বলেন, কিন্তু 'সর্ব্বদা ক্রিয়ৈব ন ভবতি সর্ব্বদা অক্রিয়ৈব চ ন ভবতি', ঈশ্বর মধ্যোক্ত ক্রিয়াক্রিয়া উভয় শক্তি বর্ত্তমান। পূর্ণব্রহ্ম একদিশা নহেন, অর্থাৎ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় নহেন। দ্বৈতবাদীদের কৈলাস-বৈকুণ্ঠ আদি স্থান, অদ্বৈতবাদীদের 'মায়াশবলং ব্রহ্মস্থান', কিন্তু নাথস্থান নিগূর্ণ।^২

নিগুণ ব্রহ্ম হইতে নাথের ভেদ আছে, ব্রহ্ম ব্যাপক, নিগুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপক নহে, কারণ নিগুণ ব্রহ্ম শক্তিরহিত মাত্র। নাথস্বরূপ নিগুণ-সত্ত্বের অতীত (গো. সি. স., পৃ ৭২)। বামভাগে স্থিত শিব সাকার ও সংসারের কল্যাণকারী, সবাভাগে বিমুগ্ধিত ইনি সংসারে প্রবৃত্তকারী, মধ্যভাগে স্বয়ংপূর্ণ নিগুণ-সত্ত্বাতীত সর্বশিরোমণি নাথ, নাথের জ্যোতিরূপই তাঁহার সাকাররূপ। সর্বদেবতা অপেক্ষা শিব উত্তম, শিব হইতেও উত্তম ‘নাথ’।^১

শিবশক্তি অভেদ ‘রা’ শক্তি নামে বিখ্যাত, ‘ম’ শিব নামে কীর্তিত, আবার যে কালী সেই তারা, যে শিব সেই রাম উহার একই।^২

কৈবল্য উপনিষদে ঈশ্বরের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে,

“চিদানন্দস্বরূপ উমাসহায় পরমেশ্বর প্রভু ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ ও প্রশান্ত। স ব্রহ্মা স শিবঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্ স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স আত্মা পরমেশ্বরঃ ॥”^৩

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে পরমেশ্বরের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে—

শক্তিত্বানন্দনিত্য শক্তিমান্ পরমেশ্বরঃ।

সবিজ্ঞাপোহস্তি বিষয় ইতি সিদ্ধিমতং সতাম্ ॥ ৪।১৭।

পরমেশ্বর শক্তিয়ুক্ত, তিনি আনন্দ নিত্য ও শক্তিমান্। জ্ঞানরূপে তিনি জ্ঞেয় বিষয় ইহাই সিদ্ধমত।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনমতে নির্বিশেষ যিনি তিনি মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া সর্বিশেষ হন, তখন তিনি ঈশ্বর। প্রশ্ন হইতে পারে যিনি চেতনস্বরূপ তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে রত হন? শঙ্করাচার্য্যের মতে ইহার উত্তর এই যে, যেমন জানিয়া শুনিয়া আমরা অনিষ্টকর কার্য্যে রত হই, সেইরূপ আত্মা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াই অবিজ্ঞাকে আশ্রয় করেন। স্বয়ং আত্মা যখন অবিজ্ঞার অধীন তখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী নহে ইহা স্বপ্রমাণ, তবে অবিজ্ঞা নাশ করিতে হইলে তবজ্ঞানের আবশ্যক। তবদৃষ্টিতে মায়া বা অবিজ্ঞার অস্তিত্ব নাই, ব্যবহার-দৃষ্টিতে অবিজ্ঞা বা মায়ার সং ও অসং রূপ আছে।

জানিয়া শুনিয়া অনিষ্টকর কার্য্যে রত হওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের পক্ষে জগতের সৃষ্টি, অতএব ইহাকে তাঁহার লীলামাত্র বলা যায়। দ্বায় বলেন

ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, বেদান্ত বলেন তিনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—যথা সোমৈম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং সাদবাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ইত্যাদি।^১ অর্থাৎ একটি মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা যেমন মৃত্তিকার পরিণামভূত সমগ্র মৃন্ময় পদার্থকে জানা যায়, তেমনি এক ব্রহ্মকে জানিলে সব জানা যায়। অতএব ঈশ্বর সর্ববস্তুতে আছেন, এবং তিনি জগৎসৃষ্টির উপাদান কারণও বটে। মুণ্ডক (৩।১।৩) তাই এই ব্রহ্মকে যিনি বলিয়াছেন, সাক্ষাৎকামী সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ পরমেশ্বর পরিপূর্ণস্বরূপ ‘ব্রহ্মযোনি’কে অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরমসাম্য প্রাপ্ত হন।^২ অতএব চেতন পদার্থ হইতেই অচেতনের উৎপত্তি স্বীকার্য।

জগৎ ভোগ্যস্বরূপ, আত্মাই ভোক্তা, তথাপি উভয়ের উপাদান কারণ এক। সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ এক হইয়াও যেমন ব্যবহারিক ভেদ আছে, তেমনি ঈশ্বর ও জগৎ এক হইয়াও উভয়ের ব্যবহারিক ভেদ আছে। ঈশ্বর দেশকালাতীত তথাপি উপাসক কল্পনায় তাঁহাকে মন্মাদি কেন্দ্রে স্থাপনকরতঃ উপাসনা করে।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেমন সর্ববস্তুতে বিद्यমান, তেমনি শক্তিও সর্ববস্তুর উপাদান স্বরূপ, কেবল তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইবার কারণ তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না, যেমন কাষ্ঠমধ্যে দাহিকা শক্তি বর্ত্তমান, কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না।

শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মমীমাংসায় শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

“শক্তয়োহস্ত জগৎ কুৎস্রং শক্তিমাংস্ত মহেশ্বরঃ।

শক্তিস্ত শক্তিমদ্রুপাদ্ বাতিরেকং ন গচ্ছতি।

তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহিকয়োরিব ॥” ১।২।১

অর্থাৎ শক্তিই জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তী, মহেশ্বর শক্তিমান। শক্তির শক্তিমান বাতীত অস্তিত্ব নাই, তাহার। বহ্নিদাহিকার মত তাদাত্ম্য-ভাবাপন্ন।

১। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩।১।৩, উপনিষৎ প্রণাবলী পৃ ৩৪৬

২। যদা পুণ্যঃ পশ্যতে কল্পবর্ণঃ কঠোরমীশঃ পুরুষঃ ব্রহ্মযোনিম্।

“মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসো জীবেশ্বরাবুভৌ ॥

(শক্তিতত্ত্ববিমর্শিনী) ।^১

অর্থাৎ মায়াই কামধেনু, জীব ও ঈশ্বর উভয়ে তাহার বৎস্বরূপ । মায়া হইতেই জীব, জগৎ, ঈশ্বর সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই তাৎপৰ্য্য । তথাপি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে, অভেদও আছে । অভেদরূপে ঈশ্বর ও জীব উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাময় ; ঈশ্বরে যে গুণের পরাকাষ্ঠা, অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের মধ্যে সেই সেই গুণ অণু-মাত্রাতেই বর্তমান । পূর্ণতা ও অণুতা-প্রযুক্তই ভেদভাব । ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি, তাহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী হন । জীবের ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দু বিন্দু স্বরূপ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া সেই শরীরের উপর আর দুইটি ঔপাধিক শরীর—লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর—আচ্ছাদন করিয়া আছে । চিৎস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর উপাধি হইয়াছে ; এই লিঙ্গশরীর বদ্ধ হইবার কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য । জন্মান্তর সময়ে স্থূলদেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু লিঙ্গশরীরের হয় না । জীব অণুচৈতন্যবস্ত্ত, জীব নিজেকে জানিতে পারিলে নিজস্বরূপে মায়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বরূপকে অনুভব করিতে পারিবে ।^২

অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষলাভে মায়ার উচ্ছেদ হয়, কিন্তু অবিজ্ঞার নিবৃত্তি যদি ‘সৎ’ হয় তবে দ্বৈতাপত্তি শঙ্কা হয়, যদি ‘অসৎ’ হয় তবে, শশশৃঙ্গের ন্যায় উহা হইতে জগতের উৎপত্ততা সিদ্ধ হয় না । অবিজ্ঞার দ্বারা নানা ব্যাঘাত হওয়াতে অবিজ্ঞাকে ‘সদসদাস্বকণ্ঠ’ বলা চলে না । আবার উহাকে যদি অনির্বচনীয় বলা হয়, তাহা হইলে অনির্বচনীয় সাধি পদার্থের অজ্ঞান উপাদানত্ব ও জ্ঞান নিবর্ত্তন মানিতে হয় । অতএব উহা সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং অনির্বচনীয় এই চারিপ্রকার হইতে পৃথক পঞ্চমপ্রকার অবিজ্ঞানিবৃত্তি । ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ হয় না, কোন না কোন রূপে উহা থাকে, ইহাই অদ্বৈত বেদান্ত হইতে শক্তিতত্ত্বের বৈলক্ষণ্য । মোক্ষাবস্থায় মায়া অন্তর্মুখী হয় এবং তাহার পরিণাম হয় না, কারণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সঞ্চিত কর্মের নাশ হয়, বদ্ধ অবস্থায় মায়া বহির্মুখী হয়, ইহাই মুক্ত ও বন্ধের মধ্যে ভেদ ।

১ । শক্তি ও শক্তিমানকা অভেদ, দুর্দানারায়ণ শাস্ত্রী, এম. এ. কল্যাণ শক্তি অঙ্ক, পৃ ১৩৮

২ । জৈবধর্ম, পঞ্চম অধ্যায়—কেশর দত্ত

জীব অস্ত্রঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ। নিত্য শুদ্ধমুক্ত স্বভাব আত্মা উৎপত্তিনাশহীন হইয়াও শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্মফলের ভোক্তা। আত্মা সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার নাম ‘অণু’ হইয়াছে (শঙ্করভাষ্য ২।৩।৪৩)। আত্মচৈতন্য জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় ও পঞ্চকোশে উপলব্ধ হয় কিন্তু আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য ইহারও উর্দ্ধে। ব্যাষ্টি অভিমানী জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রজ্ঞা সংজ্ঞা আছে এবং এই শরীরের সমষ্টি অভিমানী ঈশ্বরকে বৈশ্বানর (বিরাট) সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) ও ঈশ্বর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্যাষ্টি ও সমষ্টির অভিমানী পুরুষ পরস্পর অভিন্ন। আত্মা এই তিনের উর্দ্ধে স্বতন্ত্র সত্তা। নিম্নে কোষ্টক দ্রষ্টব্য :—

শরীর	অভিমানী	কোশ	অবস্থা
স্থূল	সমষ্টি—বৈশ্বানর (বিরাট)	}	জাগ্রত
	ব্যাষ্টি—বিশ্ব		
সূক্ষ্ম	সমষ্টি—সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ)	}	স্বপ্ন
	ব্যাষ্টি—তৈজস		
কারণ	সমষ্টি—ঈশ্বর	}	সুষুপ্তি
	ব্যাষ্টি—প্রাজ্ঞ		

জীব বহিমুখী ও অন্তর্মুখী উভয়ই, বহিমুখী হইয়া বিষয়কে প্রকাশিত করে এবং অন্তর্মুখী হইয়া ‘অহং’কর্তাকে অভিযুক্ত করে। বহিমুখী হইয়া অহঙ্কার বুদ্ধিকে অবভাসিত করে, তাহার অভাবে স্বতঃ-প্রত্যোত্তিত হয়। বুদ্ধির যোগে জীব চঞ্চল হয়, অত্যাধা জীব শাস্ত্র।^১

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর ইন্দ্রজালের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা সত্য তাহা সত্য বিদ্যমান, অতএব নিত্যপরিবর্তনশীল জগৎ ‘মিথ্যা’। তথাপি স্বপ্নাবস্থায় অলীক দ্রব্যকে সত্যের দ্বারা দেখার দ্বারা জগতের স্থিতি না থাকিলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা মাথায়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের পক্ষে উহা সত্য, তথাপি উহার পারমার্থিক সত্তা নাই, তাই জীবমুক্ত জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নের দ্বারা অলীক।

তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিস্বরূপ অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ আকাশের উৎপত্তি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে

অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এবং ইহাদের দ্বারা সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি। (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়ব। অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনে জীবের উৎপত্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।)

প্রত্যেক স্থূল ভূত পঞ্চভূতাত্মক, প্রত্যেক ভূতে নিজস্ব অংশ ২ ও অন্ত চারিভূতের ১ অংশ করিয়া সম্পূর্ণ '১' হয়, যথা, আকাশ = ২ আকাশ + ১ পৃথিবী + ১ জল + ১ তেজ + ১ বায়ু = ১ আকাশ। ইহাই 'পঞ্চীকৃত'।^১

অতঃপর শিব কিরূপে জীব হন ও জীব কিরূপে শিব হ লাভ করে ইহাই বিবেচ্য। যোগবীজ ও যোগশিখোপনিষদ মতে^২ বিশুদ্ধ পরমাত্মায় অহঙ্কারবশে জীব অভিধা হয়। নিষ্কল, নির্মল, শাস্ত্র, সর্ব্বাতীত নিরাময় যিনি, তিনি জীবরূপে পাপপুণ্য-ফলভোগী হন। পরমাত্মা কিরূপে জীব হন? যাহা বিশুদ্ধ তাহাই পরমাত্মা, কিন্তু তাহাতে স্পন্দ হইলে অহঙ্কা উৎপত্তি হয়, “বায়ুবাৎ স্কুরিতাঃ স্মৃষ্টিস্তত্রাহংকৃতিরুখিতা, পঞ্চাত্মকমভূৎ পিণ্ডং ধাতুবদ্ধং গুণাত্মকম্” তখন বিশ্বোত্তীর্ণ শিব ‘ত্রিপাদভূতিই’ পঞ্চাত্মক পিণ্ড হন অর্থাৎ ত্রিপাদভূতিসহ নিত্যভূতি (যাহা নিত্য), লীলাভূতি (জাগতিক লীলা), মোহভূতি (জাগতিক মোহ) ও জড়াভূতি (জড়বস্ত্র), এই ধাতুবদ্ধ গুণাত্মক হইয়া পরমাত্মাই সুখদুঃখসমায়ুক্ত জীব হন। সুখ, দুঃখ, তৃষ্ণা, লজ্জা, ভয় আদি জীবের দোষ, দোষহীন হইলে জীব শিব হ লাভ করে। তেন জীবাভিধা প্রোক্তা বিশুদ্ধে পরমাত্মনি। এভির্দোষৈর্বিনির্মুক্তঃ স্বজীবঃ শিব উচ্যতে ॥ মোহাভূতি দ্বারাই জীবে ভোক্তৃস্ববোধ ও জগৎ ভোগ্য হয়।

নারদপরিব্রাজক উপনিষদে আছে : “শরীরাত্তিমানেন জীবতম্। জীবতং ঘটাকাশমহাকাশবাৎ ব্যবধান অস্তি। ব্যবধানবশাদেব হংসঃ সৌহমিতি মন্ত্রণোচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসব্যাপদেশেনানুসন্ধানং কেরোতি। এবং বিজ্ঞায় শরীরাত্তিমানং ত্যজেন্ন শরীরাত্তিমানী ভবতি। স এব ব্রহ্মেত্যাচ্যতে।”^৩

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ৪৩২

২। যোগশিখোপঃ, ১১৬-১১। যোগবীজ।

৩। না, প, উপ—৪ঠা উপদেশ, পৃ ২৭৫

শ্বেতাস্বতরোপনিষদ বলিয়াছেন—

বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্পতে ॥ (৫।২)

কেশাণ্ডের শতভাগের একভাগকে শতধা করিলে যে ভাগ হয়, জীব তাহারই স্থায় 'অণু' পরিমাণবিশিষ্ট, তিনিই আবার স্বরূপতঃ অনন্ত পদবাচ্য। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।২) বলেন—কাষ্ঠে অগ্নির স্থায়ই ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অনুস্থ্যত আছেন, সুতরাং এই দেহমধ্যেই বিশুদ্ধ চিন্তের দ্বারা সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে।

আর্হতদর্শনে বোধ ও বোধাত্মক জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্বভেদ, সংসারী ও মুক্তজীব এবং সংসারী জীবমধ্যে সমনস্ক ও অমনস্ক জীব বিচার আছে। সংসারী জীবই “ভবাদ্ভবান্তরপ্রাপ্তিমন্তঃ”, এবং জীব “চৈতন্যলক্ষণো জীবঃ” (ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়-কারিকা ৪৯)। চিৎ ও অচিৎ ভেদে পরমতত্ত্বও দ্বিপ্রকার।

লোকায়াত দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না (চার্বাকদর্শন), এই মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, পৃথিব্যাदि চারিভূত হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে স্বতঃই মাদকের স্থায় যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য, ভূতের বিনাশ হইলে মনুষ্যদেহও বিনাশ হয়। অতএব চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা বা জীব, দেহ ভিন্ন আত্মা স্বীকারের কোন প্রমাণ নাই।

রামানুজের মতে সগুণব্রহ্মই সত্য, তাহা না হইলে “ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে মুক্তি” এই শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয়, ব্রহ্মের বিশেষণ না থাকিলে সাক্ষাৎকার হইবে কিসে? শঙ্করমতে ব্রহ্ম নিগুণ অর্থাৎ বিশেষণহীন, রামানুজ বলেন, নিগুণ অর্থে গুণাতীত। রামানুজমতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ভেদে পদার্থ ত্রিতয়, ঈশ্বর ও জীব চিৎপদার্থ, পরিদৃশ্যমান জগৎ “অচিৎ”, “অচিৎ চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ামকভেদেন ব্যবস্থিতান্তয়ঃ পদার্থাঃ”, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ভেদে, ভোক্তা, ভোগ ও নিয়ামক ভেদ সংঘটিত হয়, তদনুসারে পদার্থ তিন প্রকার হইয়া থাকে।^১

বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে বর্ণিত হইয়াছে “শ্রীগোরক্ষনাথেন বিশ্বস্ত কৰ্ত্তব্যঃ শিবস্ত লিখিতং নাথস্ত তু ন লিখিতম্।” শিবই বিশ্বকর্ত্তা, নাথ নিগুণ এবং নিরূপাধিরূপ, অতএব তাহার পক্ষে

প্রাকৃতিক কার্যাকারে কোন মাহাত্ম্য নাই, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সগুণ সোপাদিযুক্ত শিব। (পৃ ৭৫)

আবার “অস্মাকং মতে শক্তিঃ সৃষ্টিং করোতি শিবঃ পালনং করোতি কালঃ সংহরতি নাথো মুক্তিং দদাতি” (গো.সি.স., পৃ ৭০)—ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, রুদ্র সংহার করেন, এই মতামতের উল্লেখও উক্ত গ্রন্থে দেখা যায়। (পৃ ৭৭)

“কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের” তৃতীয় পটলে আছে সহস্রারের উপর শুদ্ধ, অবিভক্ত, সর্বব্যাপী ‘নিরঞ্জন’ বিরাজ করেন, তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা, তাই তাঁহার নাম “লিঙ্গ”, ইনি “উন্মদনস্বরহিতং ধ্যানধারণাবজ্জিতম্ প্রত্যক্ষং সর্বদা নিত্যং”, ইনি বর্ণহীন হইয়াও সর্ববর্ণময়, ইহার মানসপূজা কর্তব্য। এই উৎপত্তি ও লয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন বিশুদ্ধ, নিত্য, অপরিমেয় ও আকাশের উদ্ধার দায় উজ্জল। মানসলিঙ্গের জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, ইহাই “কৌলিক লিঙ্গম্”। দ্বিতীয় পটলে সংহার বৃত্তান্ত আছে। দেহ মধ্যেও সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দশভুবন তত্ত্বরূপে আছে, কালাগ্নি উর্দ্ধমুখী হইলে সংহারোবৃত্ত হয়। সংহারকালে শক্তি শিবে মিলিত হন, শিবও ক্রিয়াশক্তিতে বিলীন হন। তখন একমাত্র পরাশিব বিরাজ করেন, বিশ্বের এইখানেই সমাপ্তি হয়।

উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পটলে ‘জীব’ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—জীব পরমতত্ত্ব, ইহাই ‘হংস’ ও প্রাণবুদ্ধিচিহ্ন; দেহমধ্যে যাহা জীব, দেহমুক্ত হইলে তাহা শিব হয়। হংসই দেহরূপী শিব, ইহা কুণ্ডলীরূপে দেহে বিরাজ করে, ইহা অতি শক্তিশালী, ইহার জরা নাই, মৃত্যু নাই। “স জীবঃ পুংসলো হংসঃ স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ।”^১

তত্ত্বমতে বিশ্বের উৎপত্তি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে বিন্দু ও বিসর্গ রহস্য জানা আবশ্যিক, স্বতন্ত্রানন্দ নাথ বলিয়াছেন—

সৃষ্টা বহিঃ শিবচিত্তা প্রকৃতিবিসর্গঃ

তাং স্বায়না কবলয়ন্ শিব এষ বিন্দুঃ ॥^২

প্রকাশই শিব, বিমর্শই শক্তি। প্রকৃতি যখন শিবরূপ প্রকাশের দ্বারা বাহিরে বিসৃষ্ট হয়, তখন তাহা বিসর্গ পদবাচ্য। প্রকৃতি স্বভাব বা বিমর্শ, পক্ষান্তরে প্রকাশেও বিমর্শাত্মক স্বভাব আছে, তাই প্রকাশ নিজের

১। কৌলজ্ঞান, ১৭।০০

২। দেবীমুক্তে চিন্তনীচ, দ্বর্গা চৈতন্য ভারতী গ্রন্থের ভূমিকা, ১৮০, ১৮১

বিমর্শকে কদাচিত্ প্রপঞ্চাসক্তানের ইচ্ছা করিয়া আপন স্বরূপের ভিত্তিতেই বাহ্যবৎ বিমৃষ্ট করে। এই বিসর্গাখ্যা বিমর্শ জ্যেয় আকার ধারণ করিয়া জ্ঞাতাকে গ্রাস করে ও নিজে প্রমাতা হয়। অপরদিকে জ্ঞাতা চিত্রপ হইলেও বৈভবহীন হইয়া প্রমেয় ভাব প্রাপ্ত হয় ও জীবরূপে প্রকট হয়। শিবরূপী প্রকাশ, প্রপঞ্চ সংহার ইচ্ছা করিলে বিমর্শরূপা প্রকৃতিকে আপন স্বরূপে গ্রাস করে, তখন তাহাকে ‘বিন্দু’ বলে। সুতরাং জ্যেয়াত্মক বিমর্শই ‘বিসর্গ’ এবং জ্ঞাতরূপ প্রকাশই ‘বিন্দু’। এই বিচিত্র সংসার বিসর্গ হইতেই উদ্ভূত হয়। বিশ্ব ভেদাত্মক, ভেদাভেদাত্মক, ও অভেদাত্মক, তাই বিসর্গ-শক্তিও স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর ভেদে ত্রিবিধ। সিদ্ধযোগীশ্বরী-তন্ত্রমতে চিন্মাত্ররূপ বিসর্গশক্তিই জগদ্যোনি কুণ্ডলিনী, ইহার গর্ভে নিখিল বিশ্ব অবস্থিত।

বৈষ্ণব-তন্ত্রমতে ‘বিশ্ব’ জগৎ-অধিপতি নারায়ণের বিলাসমাত্র। ভগবানের সঙ্কল্পের নাম সুদর্শন, ইহা উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ শক্তিভেদে পঞ্চবিধ। অবিজ্ঞাদিই ‘নিগ্রহ’। স্বভাবতঃ শক্তিশালী জীব অবিজ্ঞাদ্বারা ক্রমশঃ অণু বা অকিঞ্চিংকর হয়, ইহাই অণুত্বাদির মূল, জীবের ইহাই বন্ধনের কারণ, জাতি, আয়ু ভোগ ও ইহার ফলস্বরূপ। জীবের ক্রেশদর্শনে ভগবানের কৃপার যে স্বতঃ উদ্ভেক হয়, তাহাকেই ‘অনুগ্রহাত্মিকা শক্তি’ বলে, আগমে ইহারই নাম “শক্তিপাত”, ইহাই ভগবদ্ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের ফলে জীবের শুভাশুভকর্ম ফলোৎপাদন-রহিত হয় এবং জীব বৈরাগ্য ও বিবেক প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষের প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়।

বৈষ্ণব তন্ত্রমধ্যে ‘পাকুরাত্র’ই প্রাচীন, ‘বৈখানস’ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। পাকুরাত্রকে বেদের অংশ বলা হয়, ইহার সাহিত্য প্রচুর, যথা— অহিবুধ্যসংহিতা, জয়াখ্যাসংহিতা (G. O. S.)। পাকুরাত্র সাধনমার্গে যোগ ও ভক্তির সমন্বয় আছে, অকিঞ্চনরূপে ভগবানে শরণাগতি দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহশক্তি লাভ করিলে ‘ব্রহ্মভাবাপত্তি’ হয়।

জীবই ব্রহ্মস্বরূপ ‘তত্ত্বমসি’, কিন্তু রামানুজ ইহার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ‘তৎ’ সর্বজ্ঞ অস্তুর্ধ্যামী ঈশ্বর, ‘হম্’ অর্থে অচিদ্বিশিষ্ট জীব-শরীরধারী ব্রহ্ম (সাধারণতঃ হম্ অর্থে জীবের প্রতীক) এবং ‘তত্ত্বমসি’ এই উভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞাপক, অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্মাতা ও অস্তুর্ধ্যামী এই উভয় ঈশ্বরে একতাবিশিষ্ট। অতএব এই মতের ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ নাম হইয়াছে (তুলনীয়, ছান্দোগ্য উপ. ৬।২।৩ ‘তদৈক্যতবহুস্যাম্’ ইত্যাদি)।

রামানুজমতে জীব ও ব্রহ্ম মধ্যে বিশেষণ বিশেষ্য সম্বন্ধ বা অংশাংশী ভাব আছে, যেমন অগ্নিশিখা অগ্নির অংশ; জীব ও ব্রহ্ম অভেদ না হইলেও ভিন্ন। ব্রহ্ম প্রাক্ত, জীব অক্ত, শ্রুতি এইরূপে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ দেখান (স্তোত্র ১১২)।

অহমরূপে এই বিশ্বের উৎপত্তি, তন্মধ্যে বাচ্য প্রকাশ, বাচক বিমর্শ, ইহাদের নিত্য অবিনাশ্রুত সম্বন্ধ বর্তমান। অ = পরমেশ্বর, অকুল, পরশিব; হ = পরাশক্তি, কোলিকৌশল, বিমর্শ বা পরাকুলিনী। “অকারশ্চ হকারশ্চ দ্বাবেতো যুগপৎস্থিতৌ। বিভক্তির্নানয়োরস্তি চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥” ইহাই অনাদি মিথুন বা দিব্যদম্পতী, ইহাই অর্ধনারীশ্বর। এই অহম পরামর্শই মাতৃকার পরমতত্ত্ব, কারণ যাবতীয় বর্ণের উদ্ভব ইহারই মধ্যে নিহিত। এই অবিভক্ত, অখণ্ড, পূর্ণ অহং-পরামর্শই পরাবাক্; পশ্চাত্তী মধ্যমা বৈখরী ভেদে ইহা ত্রিবিধ। পরতত্ত্ব এক ও নিরংশ হইলেও তাহার মুখ্য শক্তি তিনটি—অনুত্তরা, পরাপরা ও অপরা। অনুত্তরা শক্তি চিৎশক্তি, পরাপরা ইচ্ছাশক্তি, অপরা জ্ঞানশক্তি। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে হলাদিনী শক্তিকে পরমাশক্তি (চিৎশক্তি) বলা হয়। বস্তুতঃ চিৎশক্তি ও হলাদিনী শক্তি অভিন্ন। গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে যোগমায়া চিৎশক্তি, লীলামধ্যে ইহার প্রধান অঙ্গ। যোগমায়াই বিশ্বে ভগবৎলীলার যোজনাকারিণী আদিশক্তি অর্ধমাত্রা, যোগমায়ার অঙ্গ হইতে প্রণবের উৎপত্তি, ইহার উর্দ্ধাংশ যোগমায়ার সহিত সংযুক্ত থাকে ও ব্রজলীলা নামে অভিহিত হয়। এই ব্রজলীলা ও যোগমায়ার সংযোগ হইতেই অখিল সৃষ্টির বিকাশ হয়।’

জগৎসৃষ্টির পূর্বে পরমায়া নিরাকার ছিলেন, স্বপ্রকাশ হইবার নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি তিনি ইচ্ছা করিলে, সাকাররূপিণী ইচ্ছাশক্তির জন্ম হইল, তৎসহ পরমায়াও সাকার রূপ ধারণ করিলেন, ইহাই শিবশক্তি বা প্রকৃতি পুরুষ। ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার সৃষ্টি করিলেন, যোগমায়া হইতে মহামায়া ও মায়া সৃষ্ট হইলেন। মহামায়া ও মায়ার সম্বন্ধ মাতা ও পুত্রীর স্থায়, মায়া মনুষ্য জীব পশু প্রভৃতির কর্তা, পঞ্চতত্ত্ব ও অপরা জগতের অধীশ্বরী, মহামায়া জীবের জন্ম মরণ বিবাহাদি ও পরাজগতের কর্তা, তিনি উর্দ্ধ জগতের ব্যবস্থাপিকা। কিন্তু জগতের

সৃষ্টি ও সকালনকর্ত্রী ইচ্ছাশক্তি, একমাত্র যোগমায়ার সহিতই ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, দেহস্থ আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে যোগমায়ার নিবাস।^১

মায়া অবিজ্ঞা, মহামায়া বিজ্ঞা। মায়া আবরণ বিক্ষেপ দ্বারা জীবকে বহির্মুখ করিতেছে মহামায়া ঐ সকল অনর্থ দূর করিয়া জীবকে অন্তর্মুখ করিতেছেন। বেদান্তে বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার ভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয়কে ‘মায়া’ বলা হইয়াছে। মহামায়াই দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি, মহামায়াই মহাবিজ্ঞা, মোক্ষার্থী তাঁহারই শরণাগত হন—

মোক্ষার্থিভিমুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ

বিজ্ঞাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ (শ্রীচণ্ডী)^২

পুরুষ ও প্রকৃতির বিশেষ বাদ এবং তৎসহ জীব ও জগতের সম্বন্ধ লইয়াই দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি মত প্রচলিত। অতি সংক্ষেপে ইহাদের নির্দেশ করিয়া সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যাইতেছে। দ্বৈতবাদে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, জীব অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি, জীবেরই বন্ধন ও মুক্তি হয়। সাংখ্য দ্বৈতবাদী, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দর্শনে দুইটী বিভিন্ন তত্ত্ব। বেদান্ত একমাত্র পুরুষকে স্বীকার করিয়াছেন ও মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ বিজুষ্টিত হইয়াছে বলিয়াছেন। এই প্রপঞ্চের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যকারও বিবৃত করিয়াছেন। প্রপঞ্চলয়ে যে ব্রহ্মতত্ত্ব থাকে তাহাই সাংখ্যের পুরুষ, তিনি অপরিণামী জ্ঞেয়া পুরুষ মাত্র।

অদ্বৈতবাদীদের মধ্যেও ভেদ আছে শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, “জীবব্রহ্মৈব নাপরঃ”—জীব ও ব্রহ্ম দুইই এক। নির্বিশেষে চৈতন্যস্বরূপতা লাভই মোক্ষ, এবং ‘জগৎ’ তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা বিবর্তিত হইতেছে, ইহা ‘বিবর্তবাদ’ নামে পরিচিত। কাশ্মীর শৈবদ্বৈতীরা জগৎকে পরমশিবের আভাস বলেন, ইহা ‘আভাসবাদ’ নামে পরিচিত। পরমশিবের কল্পনায় বা আভাসে যে জগতের বিকাশ তাহা ‘সত্য’। প্রসর ও সংকোচবাদ কাশ্মীর অদ্বৈতবাদীর বৈশিষ্ট্য।

যাহাতে জগৎ শক্তির পরিণামরূপে প্রকটিত (যথা, দধি ছুড়ের ও মৃন্ময়পাত্র মৃন্তিকার পরিণাম) তাহাকে ‘পরিণামবাদ’ বলে। শঙ্কর বলেন

১।

ইচ্ছাশক্তি + শিব

যোগমায়া

(পরাজগৎ) মহামায়া

মায়া (অপরাজগৎ)

২। শক্তি উপাদনা ও বেদান্ত, পৃ ৩, দুর্গাচৈতন্য ভারতী

জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র, পরিণাম নহে, পরিণামবাদে তত্ত্ব রূপান্তর আছে, বিবর্তবাদে অত্যন্ত রূপান্তর আছে, যথা, রজ্জুর সর্পরূপে প্রতিভাসন। শঙ্কর জগৎকে ‘মিথ্যা’ বলিয়াছেন, মিথ্যা অর্থে শশশৃঙ্গের ন্যায় অলৌকিক কিছু নহে, মিথ্যা অর্থে যাহা প্রথমে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় ও পরে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,—যথা, রজ্জুতে সর্পভ্রম। ভ্রমকালীন সর্প শশশৃঙ্গের ন্যায় অলৌকিক নহে, উহা মিথ্যা।

রামানুজ বলেন, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ এবং উভয়েই সত্য। তথাপি জীব কখনও ঈশ্বর হয় না, জীবের মুক্তিই হয়; ইহাই ‘বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ’, “ঈশ্বরঃ চিৎ অচিৎ চেতি পদার্থ তৃতয়ঃ হরিঃ।” নিম্বার্কের মতে জীবে ঈশ্বরে অংশাংশী ভাব আছে। অংশে অংশীর সকল গুণ থাকিলেও তাহা পূর্ণ নহে, অর্থাৎ জীবে ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি গুণ অণুপরিমাণে আছে, জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়েই অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম পৃথক, কিন্তু চিৎরূপতা দ্বারা উভয়েই এক, তাই ইহার নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে (জীব গোস্থামী) ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভেদের সম্যক উপলব্ধি হয় না বলিয়া তাহাদের মত ‘অচিন্ত্যভেদাভেদ’ নামে পরিচিত। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন কি অভিন্ন ইহা চিন্তার অতীত।

সিদ্ধ বা নাথমতে অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব, শক্তিরই আত্মপ্রকাশ। সূক্ষ্ম কারণজগৎ, লিঙ্গাঙ্কক সূক্ষ্মজগৎ ও ইন্দ্রিয়গোচর স্থূলজগৎ, শক্তিরই ত্রিবিধ বিকাশ। বিশ্বমূলে যে পরমসত্তা বিद्यমান, তাহাই শক্তির পরমরূপ। এই বাস্তবের অগোচর পরমার্থ সত্তাকেই শাস্ত্রে ‘পরমপদ’ বলা হয়। ইহা সং বা অসং এইরূপ বিচারের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু প্রকাশ ও বিমর্শ অবিনাভূতরূপে ইহাতে বর্তমান তাহা স্বীকার্য। শিবশক্তিরূপ প্রকাশ ও বিমর্শের নিত্যসম্বন্ধ চৈতন্যরূপে সাধকের অনুভূতিতে প্রকটিত হয় ও শাস্ত্রে প্রচারিত হয়। চৈতন্য হইয়াও উহাদের সাম্যাবস্থায় তাহা অব্যক্ত থাকে, এই অবস্থাই পরমপদ। এই অবস্থায় মহাশক্তিরূপা অনাদিশক্তি পরমশিবের সহিত অদ্বয় ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। এই অবস্থা পরমব্রহ্মভাবের অনুরূপ হইয়াও তাহা হইতে বিলক্ষণ। কারণ পরমপদ নিষ্কল বা পূর্ণকল পরমেশ্বর নহেন, কারণ নিষ্কল, সকল তথা স-কল, বিশ্বেরই তিনটী অবস্থামাত্র, কিন্তু মহাশক্তিরূপ পরমপদ বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ (পরমপদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই বিধাতীত পরমপদের সহিত ইহার স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ

আত্মবিলাসের নিত্যসাম্য ভগ্ন না হইয়াও যে ভগ্নবৎ অবস্থার উদ্ভব হয় সেই বৈষম্যের ফলেই গুণপ্রধান ও ছত্রিশতত্ত্ব-সমন্বিত বিশ্বের আবির্ভাব হয়। শিবশক্তি অভিন্ন হইয়াও স্বাতন্ত্র্যজনিত যে বিকোভ বর্তমান উহাতেই বিশ্ব-প্রপঞ্চের আবির্ভাব, অতএব ত্রিবিধ বিভাগ বিশিষ্ট বিশ্ব মূলতঃ শক্তিরই বিকাশ।

শিবশক্তির বৈষম্যেই জগৎ সৃষ্টি ও সম্ভোগ হয় অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবভাবের উন্মেষ হয়। সাম্যাবস্থায় জীব ও শিব অভেদ এবং সৃষ্টি ও দৃষ্টি একার্থবোধক হয়।^১

প্রতিজীবে ঈশ্বরের স্কুলিঙ্গ আছে বলিয়া ‘জীবাত্মা’ নাম হইয়াছে। সমস্ত শক্তির যে মূলস্রোত তাহাই পরমাত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় বস্তুতঃ ভেদ নাই, কেবল যে পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন ভাব আছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়া অসম্ভব নহে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে শূন্য হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়াছেন। এই শূন্য অর্থেই শক্তি, এই বিজ্ঞান শূন্যবিজ্ঞান ও মহাসুখের সাকার রূপ। জীবাত্মার নাম বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ যাহার সত্ত্ব বা মন বোধি বা নিঃশ্রেয়সকে আশ্রয় করিয়াছে। পরমশূন্যের ভাবনা ‘নৈরাত্মা’ দেবতারূপে করা হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব ও নৈরাত্মার মিলন লবণজলের মিলনের ন্যায় সাধিত হইতে পারে, তাই উহারা দ্বৈত মনে হইলেও বস্তুতঃ উহারা অভেদ। শক্তিবাদ সাংখ্যের দ্বৈতবাদ হইতে অগ্রণী ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সোপান। কোন কোন মতে তন্ত্রের শিবশক্তি সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতির তুল্য, এই মত ভ্রান্ত। ‘জগৎই ঈশ্বর’ ইহাই আগমের ভিত্তি। শক্তি শিবের জননীস্বরূপা।

তং বিলোক্য মহেশানি সৃষ্ট্যুৎপাদনকারণাৎ।

আদিনাথং মানসিকং স্বভর্তারং প্রকল্পয়েৎ ॥

অর্থাৎ হে মহেশানি! ইহা আপনরূপে দেখিয়া নিজ পতিরূপে আদিনাথকে সৃষ্টির জন্ত নিজ মন হইতে উৎপন্ন করিলেন।^২

আবার শক্তিই বিশ্বসৃষ্টির কারণ, সৃষ্টির সঞ্চালন ও সংহারকারিণী। সৃষ্টির অণুতে অণুতে পরাশক্তি বিद्यমান। তাহার ইচ্ছাতেই এই ভৌতিক জগতের উৎপত্তি, ইহাই অদ্বৈতবাদী শাক্ত দর্শনের মত।

১। ‘শক্তিসাধনা’ ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ ‘কল্যাণ’ শক্তিঅঙ্ক অষ্টম, ১৯৪৪

২। ‘শক্তিকাব্যরূপ’ ডঃ বিনয়চোব ভট্টাচার্য্য ‘কল্যাণ’ শক্তিঅঙ্ক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে দ্বৈতমত, দ্বৈতাদ্বৈতমত, অদ্বৈতমত প্রভৃতি নানারূপ মত দেখা যায়। বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী ভারতীয় সাধনা বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার মিলিত ধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধসাধনার প্রভাবও পরবর্ত্তী কালের হিন্দুভাবধারার উপর পতিত হইয়াছে। বৈদিক সাধনার চরমবিকাশ অদ্বৈতজ্ঞানে, দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতজ্ঞানই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। তান্ত্রিক সাধনাও আগম-প্রতিপাদিত দ্বৈতাদি বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া পরিশেষে অদ্বৈতজ্ঞানে পর্যাবসিত হইয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্বই শক্তি ও শৈব তত্ত্বের পরমতত্ত্ব। আচার-অনুষ্ঠানাদিতে ভিন্ন হইলেও বেদান্ত ও আগম নির্দিষ্ট সাধনার আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকাংশে এক ও অভিন্ন।

অদ্বৈতমার্গী বেদান্তের প্রচার শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু দ্বৈত ও অদ্বৈত আগম-প্রতিপাদিত শক্তি উপাসনা ও শিবশক্তি তত্ত্বের বিচার একপ্রকার আগম গ্রন্থেই নিবদ্ধ আছে বলিলেই হয়। বহু আগম গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আগম সাহিত্যের আলোচনা করিলে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ হইতেই শক্তিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তি উপাসনা একমাত্র আগমের বিষয় নহে, বেদে ও পুরাণেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। বেদের বাক্স্মন্ত বা দেবীস্মন্ত, শ্রীস্মন্ত রাত্রিস্মন্ত প্রভৃতি এই গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে দুর্গা মহিষমর্দিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি মত্তমাংসে ও পশুবলিতে সন্তুষ্ট, তিনি কুমারী, সতীও তাঁহার ধর্মগত, শ্রীকৃষ্ণের তিনি ভগিনী, নীলবর্ণা ও ময়ূরপুচ্ছধারিণী। ইহার সহিত শিবের সম্বন্ধ নাই। ইহার পরে মহাভারতেই তাঁহাকে শিবপত্নী উমা বলা হইয়াছে ও বেদবেদান্তের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। তিনি সতী কিন্তু কুমারী নহেন।^১

হরিবংশের (সম্ভবতঃ চতুর্থ শতকের রচনা) দুইটি স্তোত্রে ও

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্মা বা চণ্ডী-মাহাত্মা, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও শক্তি উপাসনা আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে শক্তিপূজা উত্তমরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তদীয় দরবারে বাণ কর্তৃক চণ্ডীশতক রচিত হয়; তিনি পূর্ববর্তী চণ্ডীমাহাত্মা হইতেই তাঁহার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন।^১

উপনিষদেও শক্তিপূজা আছে। মাত্র ষোড়শটি শ্লোকাঙ্কক ত্রিপুরা উপনিষদে (ইহাকে ঋগ্বেদের শাকল শাখার অংশ বলা হইয়াছে) শক্তিপূজা পদ্ধতি ও সংক্ষেপতঃ শক্তি-দর্শনের কথা আছে। ‘দেবী উপনিষদ’, ‘ষট্চক্র উপনিষদ’, ‘ভাবনা উপনিষদ’ প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রধান উপনিষদ সম্ভবতঃ কোন পূর্বতন শাক্ত উপনিষদ অবলম্বনে রচিত। ভাবনা উপনিষদে জীবদেহকে ত্রীচক্র বলা হইয়াছে। এই সকল উপনিষদ পরবর্তী যুগের হইলেও খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। বঙ্গদেশেও এই সময়ে চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য-বর্ণন পট্টাকারে লিপিবদ্ধ হয়।^২

বেদান্তে ও শক্তিপূজায় কুচি বা বাসনাভেদে দেব বা দেবীর পূজা থাকিলেও বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভের প্রতি সাধকের লক্ষ্য থাকে। এই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ আত্মা কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও বা শক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠে রামায়ণেও শক্তি ও ব্রহ্মের অভিন্নতা স্থাপিত হইয়াছে, শক্তি ও কারণব্রহ্ম বস্তুতঃ এক, মায়াতীত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। স্পন্দময়ী শক্তিরই নিঃস্পন্দ অবস্থা শিব, উভয়েই চিন্মাত্র বলিয়া এক। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উভয়ে অভেদ। তথাপি উহাদের পৃথকভাবে উপাসনার সার্থকতা আছে। স্পন্দোদয়ে ইহাদের পৃথক সত্তা গ্রহীত হয়।

অদ্বৈতাগমে শিব ও শক্তি অভিন্ন ও এক। এক মহাশক্তিই সত্য, শিব বস্তুতঃ সেই মহাশক্তিরই উপাধিহীন পরমাবস্থা মাত্র। সাধারণতঃ শাক্তাগমসকল অদ্বৈতদৃষ্টিসম্পন্ন।

অদ্বৈত শাক্তমতে শিব যেরূপ মহাশক্তিরই অবস্থা বিশেষের বাচক, তদ্রূপ অদ্বৈত শৈবমতে শক্তিই পরমশিবের অবস্থা বিশেষের বাচক। উভয় মতেই পরম বা মূলতত্ত্বটি অদ্বয় বা অদ্বৈত। শাক্তমতে তিনি শক্তি, শৈবমতে তিনি শিব।

তদ্বশান্ত্রে মহাশক্তি তদ্বাতীতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি একদিকে তদ্বাতীত হইয়াও সর্বতদ্বাত্মক, তদ্বমতে ইহাই তাহার পূর্ণত্ব। অতএব এক মহাশক্তিই অদ্বৈত শাস্ত্রমতে পরমতত্ত্ব এবং তদ্বাতীত হইয়াও সর্বাত্মক।

সিদ্ধমতে সেই পরমতত্ত্বকে দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত বলা হইয়াছে; দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের ইহাই ভেদ বা বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবই পরম সত্যের একাংশ। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত তত্ত্বই পূর্ণসত্য। নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে আছে:—

বেদান্তী বহুতর্ককর্কশমতিগ্রস্তঃ পরং মায়ায়া
ভাট্টাঃ কৰ্ম্মফলাকুলা হতধিয়ো দ্বৈতেন বৈশেষিকাঃ।
অন্যে ভেদরতা বিবাদবিকলাস্তে তত্ত্বতো বক্তিতা-
স্তস্মাৎ সিদ্ধমতং স্বভাবসময়ং ধীরঃ পরং সংশ্রয়েৎ ॥
সাংখ্য্য বৈষ্ণববৈদিকা বিধিপরাঃ সন্ন্যাসিনস্তাপসাঃ
সৌরা বীরপরাঃ প্রপঞ্চনিরতা বৌদ্ধা জিনাঃ শ্রাবকাঃ।
এতে কষ্টরতা বুধা পথগতাঃ তত্ত্বতো বক্তিতা-
স্তস্মাৎ সিদ্ধমতামিত্যাदि।^১

অর্থাৎ বেদান্তবিৎ উত্তরভাগশাস্ত্রবাদী অদ্বৈত অন্য বস্তুর আরোপ করিয়া দ্বৈত-কল্পনা করে, তাহারা তর্ক ও কর্কশ কঠোর মতি লইয়া যাহা মায়াহীন তাহাকে মায়াদোষে দোষী করে। ভাট্টা মীমাংসক, অনীশ্বর-বাদীরা কৰ্ম্মফলাকুল। বৈশেষিক প্রভৃতি ভেদরত, বিবাদকর্তা, তাহার তত্ত্ববক্তিত। সাংখ্য্য, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, তাপস, সৌর, বৌদ্ধ, জিন, শ্রাবক প্রভৃতি কষ্টরত, তাহারাও তত্ত্ববক্তিত। তাহা হইতে সিদ্ধমত শ্রেষ্ঠ, তাহারা স্বভাবসময় ও ধীর অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক সহজাবস্থাময় মত বলিয়া শ্রেয়ঃ। বহুশিষ্য-পরিবেষ্টিত অগ্নিহোত্রা আচার্য্য, নগব্রত তাপস, মৌনী ইত্যাদিগণও তত্ত্ববক্তিত।

গোরক্ষরচিত হঠপ্রদীপিকায় আগম নিগম মতাবলম্বী বৈখানস আগমবাদীর দোষদর্শন করা হইয়াছে যে তাহারা শাস্ত্ররীকে জানেন না, ইহারা তত্ত্ববক্তিত ও নিজেদের শারীরিক সুখের জন্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য সাধন করিতে কাতর বলিয়া “অহং ব্রহ্ম” বলিয়া থাকেন। “শাস্ত্ররী মুদ্রা প্রাপ্তা কুলবধূরিব” কিন্তু বেদবাদী প্রভৃতি নিজজ্ঞান প্রকাশে চতুর্মুখ।

এই সংসারে যোগ ও ভোগ নামে দুই পদার্থ আছে, সংসারের সমস্তই যোগ বা ভোগের অন্তর্গত, তন্মধ্যে সিদ্ধগণ যোগে মগ্ন এবং সংসারিগণ ভোগে মগ্ন, যোগের ফল মুক্তি, ভোগের ফল বন্ধ, যোগে আদিত্তে কষ্ট হইলেও অস্ত্রে পরমানন্দলাভ হয়, ভোগে মাত্র কিছু বিষয়ানন্দ আছে।

কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রমতে কৰ্ম্মাদি উপাসনাই সাধন। মৌমাংসকগণ পঠনপাঠনের দোষনিবৃত্তির জন্ত ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করেন, যদি শাস্ত্রপাঠ তাহাদের দোষের হয় তবে তাহাদের সেবায় কি ফল? যে স্বামীর ভজন করা হয়, তিনি ত স্বতন্ত্র। তিনি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুসারে মন্ত্রীদিগকে অর্থাৎ মন্ত্রজপকারীদিগকে দান করিবেন, তদ্বিষয়ে অন্য কোন পুরুষের অপেক্ষা নাই, সুতরাং উপাসনার ফল কি?

দেহ কৰ্ম্মরচিত, কৰ্ম্মসকল ত্রিগুণপ্রসূত, গুণসকল মায়ার অন্তর্গত। এইভাবে প্রাণিগণের যে প্রারন্ধ তাহা মায়াভিমত। অভিমানের উদয় হইলেই বন্ধ হইতে পৃথগীভূত হয়। এইভাবে পূর্বে ও পরে গুণলেশ থাকিবেই এবং তাহাই বাধক। অতএব অবধূত ব্যতীত প্রারন্ধ কৰ্ম্ম কেহই নির্মূল করিতে পারেন না।^১

গীতায় আছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্বৈগুণ্যো ভবাজ্জুন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্তো নির্যোগক্ষেম আশ্রবান্ ॥ (২।৪৫)

সব্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের কার্য্য অর্থাৎ কামনামূলক সংসার, কৰ্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ তাহার প্রকাশক, কৰ্ম্মফলকামীদের নিকট বেদ ফলপ্রকাশ করেন এবং তাহারা ফলকামনাপূর্ব্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া সংসারে বদ্ধ হন। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করিলে বদ্ধ হইতে হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিতে এবং যোগ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) ও ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণ) আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

বেদান্তী চিন্তাশক্তির জন্ত কৰ্ম্মের অভিমত্বগণ করিয়া তদনন্তর জ্ঞানই সাধন বলিয়া থাকেন, ইহাতে বেদান্তীর জ্ঞান ও কৰ্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ। মৌমাংসক মন্ত্রিবৎ রাজসাপেক্ষ, আর বেদান্তী রাজবৎ মন্ত্রিসাপেক্ষ। সাপেক্ষত্ব

উভয়েই বর্তমান কিন্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়া যে আবশ্যিক যোগ সকলের কর্তব্য তাহা স্বতন্ত্র বস্তু। মৌমাংসক দ্বৈতের অভিমনন করেন, বেদান্তী অদ্বৈতের অভিমনন করেন, যোগীরা তত্বপরি বিষয়ের কথা বলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই প্রকৃতিবিকার, প্রকৃতিবিকার সদাই চঞ্চল, কিন্তু ব্রহ্ম অচঞ্চল। দ্বৈতবাদীর নিকট নিশ্চল নাই, অদ্বৈতবাদীর পক্ষেও নিশ্চল নাই। মহাসিদ্ধরা বলেন দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত নিশ্চল পদই সত্য।^১

অবধূতগীতায় আছে—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।

সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ সংসারে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, তাহারা সমতত্ত্বকে জানে না।

দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত সেই পদে অবস্থানেই মুক্তি। মায়া প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের কল্পনা, ভাবাভাববিনির্মুক্ত শিবই অন্তরালস্বরূপ, তিনি সাকারও নহেন নিরাকারও নহেন, ভেদাভেদ তাঁহাতে নাই। ভাবগম্য হইলে যিনি নিরাকার, দৃষ্টিগোচর হইলে তিনিই সাকার। তাই শিব ভাবাভাববিনির্মুক্ত।^২

দ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকে ক্রিয়মাণ বলেন, অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাকেই নিষ্ক্রিয় বলেন। ব্রহ্ম নিরন্তর ক্রিয়মাণ বা নিরন্তর নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। মনুষ্য যেরূপ কার্য্য করে এবং কার্য্যান্তরে বিশ্রাম করে, ঈশ্বরও তদ্রূপ করেন। ক্রিয়াক্রিয়া উভয় শক্তিই তাঁহাতে বিদ্যমান। ইহাই সিদ্ধমতে পূর্ণতত্ত্বের লক্ষণ। অতএব সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি একদেশী দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ণত্বের নির্দেশ হয় না।

নিগূর্ণ ব্রহ্ম ও সিদ্ধদের নাথ মধ্যে প্রভেদ এই যে, ‘নাথ’ অদ্বৈতোপরি ও নিরাকার সাকারাতিত, সেই নাথ হইতেই নিরাকার জ্যোতির্নাথ ও সাকারনাথের জন্ম, সাকারনাথ হইতে সদাশিব ভৈরব ও তাঁহার শক্তি ভৈরবীর জন্ম। ‘নাথ’ সর্ববিলক্ষণ অর্থাৎ ‘যাদৃশ এব তাদৃশ এব’, তাঁহার কোন তুলনা নাই, তিনিই মহাসিদ্ধদের ধ্যেয়।^৩

সিদ্ধমতে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য আছে, ইহারা ত্যাগের মধ্যে যদি ভোগ সাধন করেন তবে তাহা তাঁহাদের বাধক হয় না। কারণ

১। গো. সি. স., পৃ ১০, ১৬

২। অবধূত গীতা, হরিশ্যাম ভগীরথজী, শ্লোক ৩৬ প্রথম অধ্যায়

৩। গো. সি. স., পৃ ১১, ৩৪

৪। গো. সি. স., পৃ ১২, ১৩

ভোগী দেহ দ্বারা বিজিত, যোগী দেহকে জয় করিয়াছেন, অতএব ভোগ ও ত্যাগ যোগীর নিকট সমানার্থক। সিদ্ধমতে ঔকার সাধনে বৈশিষ্ট্য আছে, এই ঔকার বা প্রণবই নাথসম্প্রদায়ের নাদবিন্দুসাধন, এই প্রণবসাধনেই সিদ্ধদের শিব ও শক্তির সাধন। সিদ্ধমতে এই মনুজ-দেহই আত্মা, তাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ষট্চক্রসাধন ও ষড়ঙ্গযোগসাধন সিদ্ধদের বৈশিষ্ট্য।

মহাজ্ঞানলাভ করিয়া কায়সাধন দ্বারা অজর অমর হওয়াই নাথগণের প্রেয়। শাস্ত্রপাঠ বা বহু শিষ্ট্য করা সিদ্ধমতে নিন্দনীয়। মহাসিদ্ধরা গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন না, তাঁহারা অবধূত, জ্ঞানদণ্ড তাঁহারা ধারণ করেন, তন্ময়তা যোগ রূপ সূত্রই তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত, তাঁহাদের শিখা জ্ঞানশিখা, পরমাত্মায় স্থিতিই তাঁহাদের সন্ধ্যা।^১ নাথেরা দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, ইহারা সাকার-নিরাকারাতীত বা সগুণ-নিগুণাতীত ‘নাথে’র বর্ণনা করিয়াছেন। ‘নাথ’ বিশ্বোত্তীর্ণ। নিজেকে এই নাথস্বরূপে অনুভব করাই জীবনের লক্ষ্য। যোগজ্ঞ প্রণালী দ্বারা সাধন না করিলে এই অনুভূতি লাভ সম্ভবে না, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে “সম্মার্গশ্চ যোগমার্গঃ, তদিতরন্তু পায়ণমার্গঃ” বলা হইয়াছে। যোগ-মার্গকেই শ্রেষ্ঠ মার্গ বলা হইয়াছে। এই মার্গ দ্বৈতাদ্বৈতোপরবর্তী মার্গ।

জালন্ধরনাথকৃত সিদ্ধান্তবাক্যে আছে—

বন্দে তন্নাথতেজো ভুবনতিমিরহং ভানুতেজস্করং বা

সংকৃতব্যাপকং ত্বা পবনগতিকরং ব্যোমবন্নিভরং বা।

মুদ্রানাদত্রিশূলৈর্বিমলরুচিধরং স্বর্পরং ভস্মমিশ্রং।

দ্বৈতং বাহদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা।^২

“যোগমার্গাং পরো মার্গো নাস্তি নাস্তি শ্রুতৌ স্মৃতৌ”। বিবেকমার্গশ্রেণী
“যোগশাস্ত্রং পঠেন্নিত্যং কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরঃ” ইত্যাদি আছে। কিন্তু যোগ কি? বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকিলেও মূলতঃ ইহা একই। হঠযোগপ্রদীপিকাতে আছে, “যথাচোক্তং গোরক্ষনাথেন সিদ্ধ-সিদ্ধান্তপদ্ধতৌ। হকারঃ কীর্তিতঃ সূর্য্যষ্টকারশ্চন্দ্র উচ্যতে। সূর্য্যচন্দ্র-মসৌর্যোগাঙ্কঠযোগো নিগচ্ছতে।” প্রাণ ও অপানের যোগরূপ প্রাপ্যায়ামকে হঠযোগের লক্ষণ বলা হইয়াছে। (১১১ টীকা)

১। ব্রহ্ম উপনিষদ ও পরমহংস উপনিষদ, ১০৮ উপনিষদে ব্রহ্মবা। গো. গি. স., পৃ ৪২, ৫০

২। Some Aspects of History & Doctrine of the Nathas—by M. M. Gopinath Kaviraj, S. B. S., No. 6.

মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ আদি (অর্থাৎ জালন্ধর, ভর্জুহরি, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি) এই হঠযোগবিজ্ঞান সাধন লক্ষণ ও ফলাদি জানিতেন। সাঝারাম যোগী গোরক্ষ-প্রসাদেই এই হঠযোগ অবগত হন (হ-যো-প্র ১৪)। মৎস্যেন্দ্রের নামের সহিত মৎস্যেন্দ্র-আসন, জালন্ধরনাথের নামের সহিত জালন্ধরবন্ধ, গোরক্ষের নামের সহিত গোরক্ষাসন সংশ্লিষ্ট ; এইগুলি হঠযোগের সহিত যুক্ত। বঙ্গীয় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসেও যোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা বঙ্গসাহিত্যে যোগবিষয়ক উল্লেখ।

হঠযোগ দ্বিপ্রকার, গোরক্ষ ও মার্কণ্ডেয় প্রচারিত (অশ্বত্র ইহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)। নাথেরা হঠযোগের পুনরাবর্তন করেন ইহাই সম্ভব। তৎকালে পাতঞ্জল, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন রাজযোগের উপর স্থাপিত ও বিস্তারিত হইতে থাকে, নাথেরা সিদ্ধাস্ত করিলেন যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা রাজযোগ সাধন সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, তাই বায়ুজয় দ্বারা হঠযোগ সাধন করিয়া রাজযোগে উপনীত হইবার পন্থা নির্ধারণ করিলেন। মন্ত্রযোগ দ্বারা রাজযোগে উপনীত হওয়া অপেক্ষা ইহা সহজসাধ্য। এদেশে সর্বত্র প্রসিদ্ধি আছে যে বিন্দু (বীর্থা বা শুক্র), বায়ু ও মনস্ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, অতএব একটীর জয় সাধনে অপর দুইটীর জয় অবশ্যস্বাবী। ব্রহ্মচর্যা দ্বারা বিন্দুজয় কর্তব্য, বায়ুজয়ে মনের স্থিরতা হয়, ইহা সকল সাধনার মূল লক্ষ্য। আসন, মুদ্রা, নাদানুসন্ধানাদি হঠযোগসাধনে সাহায্য করে। ইহা দ্বারা উন্নয়নী অবস্থানভাই চরম উদ্দেশ্য। ইহাই অমনস্ক। ইহার সহিত বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধনের মিল আছে। তথাপি নাথমার্গের সিদ্ধিকথা অশ্বমার্গে পাওয়া যায় না। “আসনং কুস্তকং চিত্রং মুদ্রাখ্যং করণং তথা অথ নাদানুসন্ধানম্,” প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত।

আসন দ্বারা স্বাস্থ্য, স্থিরতা ও লঘুতা প্রাপ্তি হয়। নাদ অভ্যাসে মনের উপর ক্রিয়া হয় ও চাক্ষুশ্য দূর হয়। মন নিষ্ক্রিয় হইলে বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে ও মনোন্মোহনী বা সহজাবস্থা লাভ হয়। এই বিবিধ হঠপ্রণালী পরস্পরের সহিত যুক্ত। নাদশ্রবণে অভ্যস্ত হইলে বুদ্ধিতে হইবে বায়ু শুষুন্না নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। অশুদ্ধতা পরিহৃত হওয়া মাত্রই অনাহত নাদ শ্রুত হয়। এই অশুদ্ধতা পরিহারের

নিমিত্ত আসন ও মুদ্রাসাধন কর্তব্য। মুদ্রাসাধনের লক্ষ্য কুণ্ডলিনীর জাগরণ কিন্তু প্রণালীবদ্ধ নিয়মে আসন সাধন না করিতে পারিলে ইহার জাগরণ সম্ভব হয় না। মানবের মধ্যে যে সূপ্ত শক্তি আছে তাহাকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যেই হঠযোগের সাধনা। নাথযোগীরা দৈহিক সাধনের উপরই গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। হঠযোগে দেহস্থ নাড়ী ইত্যাদির জ্ঞান আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলতম বিষয় হইতে সম্প্রজ্ঞাত বা সন্নিহিত সমাধি লব্ধ জ্ঞান অবধি সকল বস্তুর জ্ঞান এবং জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার সহিত যে যোগ আছে হঠযোগীর সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা কর্তব্য। মনুষ্যের মধ্যে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূর করাই হঠযোগীর লক্ষ্য। বায়ুকে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে নীত করাই হঠযোগের সাধন। মস্তকস্থ সহস্রদল কমলে সর্বোচ্চ স্তর বিদ্যমান, সাধনা দ্বারা সেই স্তরে উপনীত হওয়াই হঠযোগীর কাম্য।

শুদ্ধ আত্মা মন ও ভূত এই উভয় আচ্ছাদন দ্বারা আবরিত হইয়া পার্থিবরূপ ধারণ করে। বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি মনের অন্তর্গত, ভূত অর্থে শব্দ-স্পর্শাদির তন্মাত্রের আধার। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির কেন্দ্র আছে, তাহা হইতে ইহাদের প্রসার ও সংকোচ সাধিত হয়, কেন্দ্রগুলিই ‘তন্মাত্র’। তন্মাত্র রূপে শব্দ-স্পর্শাদির ভিন্নতা উপলব্ধি হয় না। শুদ্ধ আত্মা বহিঃপ্রকাশের সময়ে তন্মাত্রের আবরণ গ্রহণ করে, তাহা দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা আবরিত হয়, কিন্তু তাহা দূর করিবার ক্ষমতাও তৎসহ গ্রথিত থাকে।

বাহ্য স্থূল জগতে আত্মার প্রকাশ হইলে আত্মাবিস্মৃতি ঘটে, তন্মাত্র — কেন্দ্র হইতে যে সূক্ষ্ম বস্তুর বিকীরণ ঘটে তাহার ‘পঞ্চীকরণ’ দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। শুদ্ধ আত্মার সূক্ষ্ম বস্তুতে পরিণত হওয়া সরলগতিতে গমনের দ্বারা, কিন্তু সূক্ষ্মের বাহ্য স্থূলে পরিণত হওয়া বায়ুর ‘তির্য্যগ্গতির’ সহিত তুলনীয়।

বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন স্থূল আবরণে আচ্ছাদিত হয়, মনস্ তখন স্থূল বস্তু গ্রহণযোগ্য ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয় গ্রহণে রত থাকে। ইন্দ্রিয়গণ এই নিমিত্তই স্থূল বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণে অসমর্থ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে মনস্কে পৃথক করিতে সমর্থ হইলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপলব্ধি সম্ভব হয়। মনসের এই পৃথকীকরণ যত অধিক হইবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাও তত অধিক হইবে। শুদ্ধতা ও মনঃসংযমই মনকে পৃথক করিবার উপায়। শিবের ‘দিব্যচক্ষু’ অর্থে

মনেরই সংযম দ্বারা দিব্যদর্শন। স্থূলাবরণে আবরিত মনকে স্থূলই বলা চলে, বায়ুর গতিও এই অবস্থাতে সরল থাকে না। ইহাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। বায়ুর বক্র গতির নিমিত্তই শরীরস্থ বক্রনাড়ীর প্রয়োজন। সুষুম্না তন্মধ্যে মধ্যনাড়ী, অন্ত্রনাড়ী বাম ও দক্ষিণে স্থাপিত; সাধারণ ব্যক্তির মন ও বায়ুর গতি এই নাড়ীপথে চালিত হয়, ইহাই তাহার সংসার। নাথগণ বলেন নদী যেমন সাগরে নীত হয় তেমনি সুষুম্না পথে চালিত হইলে মানব সেই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করিবেই। স্থূল দেহ দ্বারা আবৃত জীবের পক্ষে অল্প পস্থা বিপথে গমনের ন্যায় ত্যাজ্য। যে মুহূর্তে মনের বিভিন্ন গতির রোধ হইয়া চিন্তা স্থির হয় ও বায়ুনিরোধ হয় তন্মুহূর্তেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আত্মশক্তির বিকাশ হয়। ইহাই সূপ্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও তাহার বাহ্য বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নতা। এইরূপে বাহ্যবস্তুর হইতে পৃথক্ হইয়া শক্তি অন্তর্মুখী হইয়া সেই বিরাট সত্তার সহিত মিলিত হয়। ইহা অস্তিত্বলোপ নহে, ইহা মিলন ও একের অন্বেষণ। ব্রহ্মান্ বা শিব শক্তিরই রূপভেদ মাত্র। শিবের সহিত স্থূল বস্তুজগতের যোগ নাই তথাপি সত্তামাত্রের যে শিবত্ব আছে ইহা স্বীকার্য্য; বাহ্য আবরণ দ্বারা সেই শিবত্ব আবরিত। শক্তির এই রূপকে অর্থাৎ শিবত্বকে জীবমধ্যে গুরুই কৃপা করিয়া উন্মেষিত করেন—“শিবস্তাত্মান্তরে শক্তিঃ শক্তেরভাস্তরে শিবঃ।”^১

শক্তি কিরূপে জড়বস্তুর দ্বারা আবরিত হয় ইহা অতীব রহস্যময়।

— কিন্তু মানব তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেই শক্তিকে তাহার মূল-স্বরূপ অথও পরমসত্তাতে লীন করিতে পারে।

জড়পদার্থই শিব ও শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে, অতএব জড়পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলেই এই ভেদজ্ঞান দূর হয়। জড়পদার্থ কি? ইহা ইন্দ্রজাল বিশেষ, পরমসত্তার শিব ও শক্তিরূপে প্রকাশেই ইহার প্রকাশ। যখন শিব ও শক্তি মিলিত হন তখন বাহ্য জড়পদার্থেরও অস্তিত্ব থাকে না। যোগী শিব-শক্তির এই মিলনাকাজক্ষাই করেন। মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনায় ইহারই ইঙ্গিত দেখা যায়। প্রণয়ঘটিত কাল্পনিক চিত্রদ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হয়।

আত্মা বাহ্যবস্তুর সহিত যুক্ত থাকিলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয় না,

শক্তি বিষয়বস্তু হইতে মুক্ত হইলেই স্বরূপ-উপলব্ধি সম্ভব। শক্তি আবরিত হইলে তাহার মূল শিব হইতে শক্তি বিচ্ছিন্ন হয় ও বস্তুজগতে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই যোগসাহিত্যের ‘প্রকৃতিলীন’ অবস্থা। জাগতিক অজ্ঞানতার মূল এইখানে। তৎপরে বিশ্বসৃষ্টির সহিত উহা জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দেহস্থ বায়ুসকল সরলভাবে আর প্রবাহিত হয় না ও অন্যান্য শক্তিগুলির গতিও পরিবর্তিত হয়। ইহাই তৃতীয় অবস্থা। এই অসামঞ্জস্য দূরীকরণ কর্তব্য। স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষণিকের নিমিত্ত সন্ধিক্ষণ বা নিরোধক্ষেণে এই অসামঞ্জস্য থাকে না, এই ক্ষণটির স্থায়িত্ববর্ধন অভ্যাস দ্বারা সম্ভব। দক্ষিণ ও বাম মার্গের বায়ুগণকে বশীভূত করা সম্ভব, সিদ্ধ ও নাথমতে ইহাদেরই চন্দ্রসূর্য্য, ইড়াপিঙ্গলা আদি নাম দেওয়া হইয়াছে। গোরক্ষকৃত অমরোঘশাসনে—“যত্র চ মূলভগমণ্ডলাস্তে কুণ্ডলিনীশক্তি বিনির্গতা তত্র বামভাগোন্তবসোমনাডিকা” ইত্যাদি আছে।

এই বিভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলে শ্বশুম্নাগ্র ব্রহ্ম বা শূন্যনাড়ী মুক্ত হইয়া যায়, তখন বিন্দু, বায়ু ও মনস্ ক্রিয়াযোগের দ্বারা তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ, মধ্যনাড়ীর পথ উন্মুক্ত হওয়া, মন ও বায়ুর শুদ্ধতা প্রাপ্তি, প্রজ্ঞার উন্মেষ, অহঙ্কার ও অবিজ্ঞানাত্মিকতার বিলয়, সকলই একই ক্রিয়ার নামান্তর। বাসনা ক্ষয় করিয়া পথ উন্মুক্ত করিতে হয়। নাথমার্গে ইহাকেই ষট্চক্রভেদ বলা হয়। ইহা তত্ত্বেরও প্রকাশপ্রণালী, — ঋষ্টানদের ইহাই বিশোধন, তত্ত্বের উপাসনা-কাণ্ডের ইহাই ভূতশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি।

ব্রহ্মনাড়ীর গুপ্তরক্ত বৈদিক ঋষ্টাদের অজ্ঞাত ছিল না, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে মূর্ত্ত্যানাড়ীর কথা বলা হইয়াছে তাহাই শ্বশুম্না নাড়ী। বিভিন্ন মতানুযায়ী চারিটি স্থানে (মূলা, নাভি, হৃদয় ও আজ্ঞা) হইতে মনসের উর্দ্ধগতি কল্পনা করা হয়। বৈদিক সম্প্রদায়ে হৃদয় ও নাথসম্প্রদায়ে মূলা ও নাভিস্থান হইতে সাধন প্রচলিত ছিল। ঐ সকল স্থানই মনস্ ও বায়ুর সন্ধিস্থল। এই সকল স্থানে মনোনিবেশ করিতে পারিলে ‘পথ’ উন্মুক্ত হয়। এই জ্যোতির্ময় পথের এক প্রান্তে ঈশ্বর বা গুরু, অন্য প্রান্তে জ্ঞানপ্রাপ্ত জীব বা শিষ্য, এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই ঐ পথ। অভ্যাসের দ্বারা

এই পথের দূরত্ব হ্রাস হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হয়। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দূর হইলে শিব ও শক্তি (বা ঈশ্বর ও জীব) ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া থাকেন; ইহাতে স্বাতন্ত্র্য দূর হইয়া এক অবিমিশ্র সত্তার উদ্ভব হয়, ইহাই জীবের আদি অবস্থা। ইহাকেই শিবশক্তির সামরস্য বলে, ইহাই আনন্দের স্বরূপ। জ্ঞান ইহার সহিত নিত্যযুক্ত, এই জ্ঞানই মোক্ষমার্গ, তাই নাথেরা শাস্ত্রসকলকে অন্তরায়স্বরূপ বলিয়াছেন। শাস্ত্রপাঠে অজ্ঞান দূর হয় না, বিভ্রম আসিয়া পড়ে। যোগ বিনা প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভবে না, “যোগায় রহিতঃ জ্ঞানং মোক্ষায় ন ভবেৎ” (যোগবীজ, ৬৪ শ্লোক)। শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। জনক, অসিত, তুলাধার ধর্মব্যাধ, মৈত্রেয়ী, শূলভা প্রভৃতি যোগ বিনা জ্ঞান-সাধনের উদাহরণ, ইহারা পূর্বজীবনে যোগসাধন করিয়াছিলেন। সিদ্ধরা বলেন যাহার জ্ঞান আছে ও সিদ্ধি নাই সে যথাসময়ে কোন সিদ্ধের আশ্রয়ে তাঁহার কৃপায় যোগসাধন করিবে (যোগবীজ, ১৫৯-৬০)।

মোক্ষার্থে ইহা প্রয়োজন। জ্ঞাননিষ্ঠ যোগীর পক্ষেও যোগ আবশ্যক, দেবতাও যোগ বিনা মোক্ষলাভ করেন না (যোগবীজ, ৩১)।

শঙ্করের সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে ‘জ্ঞানমাত্রেণ মুক্তিঃ’ থাকিলেও যোগ-সাধন বিনা দেহজয় সম্ভব নহে। যতক্ষণ মানব সীমাদ্বারা আবদ্ধ ততক্ষণ প্রজ্ঞালাভ হয় না, মনও স্থির হয় না, এই সীমা অর্থে মানবের বাসনা আদি। দেহ পঞ্চভূত, শীতোষ্ণ, জরামৃত্যু দ্বারা বাধিত, একমাত্র যোগ দ্বারাই ইহাদের অতিক্রম করা যায়। ইহাই নাথযোগীদের প্রধানতম লক্ষ্য। মানব দেহ অপেক্ষ, সেই নিমিত্ত মানবে দুঃখের অস্তিত্ব ও তৎসহ স্বাভাবিক শক্তিসকল আবৃত অবস্থায় থাকে। আত্মসংযম কঠিন, কারণ প্রাকৃতিক প্রভাব হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা মানবের পক্ষে কঠিন সাধনা। মানব প্রকৃতির অধীন, জ্ঞান দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করা যায় না বলিয়াই যোগসাধন আবশ্যক। অতএব যোগ দ্বারা পঞ্চদেহ লাভ করাই নাথদের সাধন। শিবস্বলাভ, জীবমুক্ত হইয়া সিদ্ধির দ্বারা প্রভুত্ব ইত্যাদি নাথমার্গের আদর্শ। জীবমুক্ত হইবার উপায় হঠযোগ সাধন। যোগশূত্রে হঠযোগের স্থান নিয়ে এবং মোক্ষের জন্য ইহাতে দেহরক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। নাথমার্গে দেহরক্ষাই বৈশিষ্ট্য।

সহস্রারে শক্তিসহ শিবের মিলনে মোক্ষ বা অমৃত প্রণালী দ্বারা মোক্ষলাভই সকল সাধনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু নাথসম্প্রদায়ের মতে মোক্ষ

আবশ্যক হইলেও উহা তাহাদের লক্ষ্য নহে। সিদ্ধি বা বিভূতি লাভই ইহাদের লক্ষ্য। কারণ বিভূতি দ্বারা সাধক যে কেবল স্বয়ং স্বর্গস্থ উপলব্ধি করেন তাহা নহে, পরন্তু মানবের হিতার্থে ঘটনাবলীর গতি নিয়ন্ত্রণেও সমর্থ হন। ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে’ এই ব্যবহারিক দিক্ বিভিন্ন পটলে বর্ণিত হইয়াছে।

বাসনা জয় দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, সাধক ক্রমশঃ বাসনা, ক্রোধ ও দম্ভ জয় করিয়া ‘সমহ’ লাভ করিবেন। অষ্টাদশ প্রকার ‘লোকশাস্ত্র’ সত্যের অঙ্গীভূত নহে, সে সকল পূজাপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া (৩১৬-১৭) দেহমধ্যে মানসলিঙ্গের পূজা কর্তব্য, তাহাতেই ‘সিদ্ধি’লাভ হইবে, প্রস্তরলিঙ্গের পূজায় সিদ্ধিলাভ হয় না। অহিংসা, ইন্দ্রিয়জয়, দয়া, জ্ঞান ইত্যাদি এই দেহস্থ লিঙ্গের মানসপূজার ফলস্বরূপ ; যথা—

অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহম্।

তৃতীয়ঞ্চ দয়াপুষ্পম্ ভাবপুষ্পং চতুর্থকম্ ॥২৫

পঞ্চমস্তু ক্ষমাপুষ্পং ষষ্ঠং ক্রোধবিনির্জিতম্।

সপ্তমং ধ্যানপুষ্পস্তু জ্ঞানপুষ্পস্তু অষ্টমম্ ॥২৬

এতং পুষ্পবিধিং জ্ঞাত্বা অর্চয়ে লিঙ্গমানসম্।^১

মৎশ্রোত্রেণ যোগিনী কৌলদের বিভিন্ন সিদ্ধিকথা কৌলজ্ঞানের চতুর্দশ পটলে বর্ণিত আছে ; যথা দূরদর্শন, পরকায়প্রবেশ, স্বদেহে ব্রহ্মরূপাদি দেবতা ও গ্রহনক্ষত্রাদি বিশ্বজগৎ দর্শন। সাধক স্বয়ং শিবের স্থায় হইতে পারেন (৭৫-৭৬ শ্লোক) এবং সৃষ্টিসংহারকর্তা, জরামরণমুক্ত মহাবেগগামী হইতে পারেন। সাধক অতীত অনাগত বর্তমান দর্শনে সক্ষম হন এবং তন্ময়তা লাভ করিয়া খেচরী দ্বারা অমৃতপান করেন। এই অমৃতের স্বভাব কামকলার স্থায় অর্থাৎ নির্মল, এবং খণ্ডোত ও তারকার স্থায় উজ্জ্বল। সাধক তখন উৎপত্তিলয়ের অতীত অবস্থা, কুলাকুলবর্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হন (৯৬-৯৭ শ্লোক)। এইরূপে যিনি মনের সাধনা করেন শিব তাঁহাকেই ‘অষ্টসিদ্ধি’ দান করেন (৫৯-৬৮ শ্লোক)।

খেচরীমুক্তা সাধন সম্বন্ধে ডাঃ সিং বিভিন্ন উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ‘গোরক্ষনাথ’ পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে চিত্ত ‘খালক’ মধ্যে

ভ্রমণ করে ও জিহ্বা 'খ' মুদ্রা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় বলিয়া 'খেচরী মুদ্রা' নাম হইয়াছে। যোগীরা ইহার সাধন করেন।

যোগরাজ উপনিষদে দশদ্বারের কথা আছে। তন্মধ্যে ঘটিকাস্থানের তালুকাচক্র ষষ্ঠ। উপনিষদের সহিত গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের ঐক্য ও অগ্ণাশ্রম সম্প্রদায়ের অনৈক্য সম্বন্ধে ডাঃ সিং গোরক্ষসংহিতার মতামত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমরস দ্বারা পূত ভক্ত শূন্যমধ্যে উল্লসিত হইয়া অবস্থান করেন। কঠ উপনিষদে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন জয় দ্বারা উর্দ্ধতন অবস্থালভের উল্লেখ আছে এবং পুরুষ, সুষুমা, অধোমুখ, উর্দ্ধ আদি শব্দ আছে।

গোরক্ষ-রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে যে আদর্শ আছে তাহা সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য। তাহাতে আছে, শব্দব্রহ্মের পারদর্শিতা হইলে পরব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অতএব 'সর্বং পরিত্যজ্য শব্দব্রহ্ম সদাভ্যাসেৎ'। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া নাদ উঠে, তবে সে নাদ শব্দহীন। বালোচিত মূর্ত্ততা বশতঃই লোকে বলে, কৰ্ম্মনাশে মোক্ষ হয়, পূজাপাঠাদি মন্ত্রমাংসভক্ষণে যে আনন্দলক্ষণ হয় তাহাই মোক্ষ, কুণ্ডলিনীর জাগরণই মোক্ষ, সুসমদৃষ্টি হইলে মোক্ষ হয় ইত্যাদি, কিন্তু সিদ্ধমতে সহজসমাধি-ক্রমে মনের দ্বারা মনকে সমালোচনা করিলে যথার্থ মোক্ষ হয়। "কাম-বিষহরস্থানং মানসোদ্ভবঃ মনোমধ্যে কারণং কারণং উৎপত্তিস্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে";^১ কামবিষহর নিরঞ্জনের জ্ঞানেই জীবনমুক্তি লাভ হয়।

এককথায় গোরক্ষমতের বৈশিষ্ট্য হইল বৃত্তি, প্রাণ ও বীৰ্য্য জয়। 'নাদানুসন্ধান' এই সম্প্রদায়ের বিশেষ সাধন। ইহার সহিত শব্দব্রহ্ম ও ফোটবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্রীব্রহ্মানন্দ-কৃত অদ্বৈতমার্গেও (পৃ ১২৭-৩২) নাদসম্প্রদায়ের বিবরণ আছে; তন্মধ্যে এইরূপ বিবৃতি আছে—

অত্রায়ং সম্প্রদায়ঃ হৃদয়ধোমুখকমলে প্রাণায়ামেনোধূমুখং কৃৎবা তত্র সূর্য্যামণ্ডলং দ্বাদশকলাস্বকজাগরিতস্থানমকারং তত্‌ত্‌পরি চন্দ্রমণ্ডলং ষোড়শকলাস্বকং স্বপ্নস্থানমুকারং তত্‌ত্‌পরি বহ্নিমণ্ডলং দশকলাস্বকং সুষুপ্তি-স্থানং মকারং তত্‌ত্‌পরি নাদাখ্যং তুরীয়ং ব্রহ্ম বিভাবয়েদিতি। সংগৃহীত-শচায়মর্থঃ কালিদাসেনাপি।



আনন্দলক্ষণমনাহতনাভিদেশে নাদাত্মা পরিণততনরূপমীশে ।
প্রত্যঙমুখেনমনসপরিচীমানশঃ সস্থি নেত্রসলিলৈঃ পুলকৈশ্চ ধন্যা ।^১

নাথেরা শিব ও পরমশিবের উপাসক, বেদান্তের ব্রহ্ম হইতে ইহাদের দৃষ্টিতে ভেদ আছে । ইহাদের মার্গ যোগপ্রধান । গোরক্ষের যোগ অথর্ববেদে (৮১২) উল্লিখিত যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার আদর্শ অর্জুনারীশ্বর 'পুরুষ-বাক্', ইহা দ্বৈতভাব । অথর্ববেদে যোগ অর্থে 'মিলন'—বিশ্বের সহিত পুরুষাত্মার যোগ । ইহাষ্ট শিবের উপাসনা ।^২

সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য 'নাথ' কল্পনা, ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈতের বিকল্প নাই । অদ্বৈত উপলব্ধি করিতে হইলে দ্বৈতের উপলব্ধি প্রথমে কর্তব্য, শিব ও শক্তির সামরস্য সাধনেই পরমশিবের উপলব্ধি হয়, কিন্তু 'নাথ' সর্বদ্বন্দ্বাতীত অবস্থা, তাহা 'যাদৃশ এব তাদৃশ এব'—উহা বর্ণনাতীত । সিদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁহারই উপাসক ।

ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য ।

(নাথদর্শনে ত্যাগ ও ভোগের রহস্য অপূর্ব । গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে (পৃ ১) নাথলক্ষণে আছে—

“একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগাশ্চৈককরে স্বয়ম্ ।

অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাম্ ... ।” ইত্যাদি

যাঁহার একহস্তে ত্যাগ, অপর হস্তে ভোগ ধৃত, এবং ভোগ ও ত্যাগের দ্বারা যিনি অলিপ্ত তিনিই নাথ । /

অতএব নাথমার্গে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য সাধনই যে আদর্শ তাহা উক্ত শ্লোক হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব । মনুষ্যের সম্মুখে জল থাকিলে তাহার তৃষ্ণাও থাকে, জোর করিয়া জলপান হইতে বিরত থাকিলে তৃষ্ণা মিটিবে না । সেইরূপ বাসনা না মিটিলে ভোগতৃষ্ণা থাকিয়া যাইবে, সুতরাং ভোগের দুঃখাবহতার চিন্তা দ্বারা তৃষ্ণা দূর কর্তব্য । কারণ “ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি” । ইহাও সত্য যে ভোগের দ্বারা তৃষ্ণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ভোগে তাহার নিবৃত্তি নাই । তাই তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, “ভোগের মধ্যে ত্যাগের উদ্দেশ

১ । গোরক্ষনাথ, ডাঃ সিং—‘নাদাত্মসংস্থান’

২ । গোরক্ষনাথ, ডাঃ সিং—পরিশিষ্টের নোট

কর্তব্য” অর্থাৎ মুক্তি ভোগেও নাই, ত্যাগেও নাই, তৃষ্ণা থাকিলে মুক্তি হইবে না, আবার জন্মগ্রহণ ও তৎফলে পুনরায় ভোগ অনিবার্য। আবার ভোগের মধ্যে মগ্ন থাকিলেও মুক্তি নাই. ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেই থাকিবে, অতএব ভোগ করিয়া ত্যাগ করিতে শিখিবে।

শ্রীমীননাথের উক্তি—হরকোপানলে স্বর ভস্মীভূত হন। যিনি অর্দ্ধগৌরীশ্বর তাঁহাকে নমস্কার। মহাসিদ্ধরা বিষয়াদি ত্যাগ করেন। ব্রহ্মেও প্রকৃতি আছে, শিবশক্তি অভিন্ন। তাই “শিবস্তাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ, অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব। প্রসরং ভাসয়েৎ শক্তিঃ সঙ্কোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ। তয়োৰ্যোগস্ত কৰ্ত্তা যঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্। এবং ত ঐক্যং জ্ঞাত্বা কামমপি ভুঞ্জন্ত্যেব। অতএবোক্তং কচিদ্ ভোগী কচিদ্ ত্যাগী” ইত্যাদি।^১ “পরমহংসাস্ত কামং নিষেধয়ন্তি স নিষেধো ন ভবত্যেবম্।”^২ ত্যাগীদের পক্ষে ত্যাগ এইরূপ—কৰ্ম্মরাহিত্যের পর আর ত্যাগ নাই, তাহারা প্রারম্ভ অবধি ত্যাগ করে, অর্থাৎ তাহার ফলভোগ ত্যাগীদের করিতে হয় না। তাহারা যদি ভোগ করে তাহাও সংসারীদের যেরূপ ভোগ হয়, সেরূপ হয় না। ইহাদের প্রকৃতিসহ পূর্ণহলাভে রীতিবৈলক্ষণ্য আছে। ভোগীদের পক্ষে ত্যাগ সম্ভবে না, যাহারা ত্যাগী তাহারা প্রথমাবধি ত্যাগশীল। আবার যাহারা ত্যাগী তাহারা পুনঃ ভোগ কিরূপে করিবে? ভোগ করিলে তাহাদের সৰ্ব্বশ্ব নষ্ট হইবে। অতএব ত্যাগ ও ভোগের রহস্য একমাত্র অবধূতই জানেন। অবধূত ত্যাগীরা “স্বেচ্ছয়া ভোগমপি কদাচিৎ কুৰ্বন্তি তথাপি তেষাং ভোগো বাধকো ন ভবেৎ।”^৩ ভোগীরা মাত্র ভোগ করেন, ত্যাগীরা মাত্র ত্যাগ করেন, একমাত্র অবধূতই তাহাদের সামরস্ত্র সাধনে সমর্থ, “ত্যাগভোগয়োৰ্দ্ধিক্যোরপি পদার্থয়োঃ সামর্থ্যম্”। ত্যাগীদের পক্ষেও আহাৰাদি ত্যাগ সম্ভবে না, কারণ তাহারা দেহদ্বারা বিজিত ও দেহাধীন।

গৃহস্থের ভোগ ও মোক্ষ

গৃহস্থ শ্রী গ্রহণ করে, তৎফলে ইহলোক পরলোক উভয় লোকই তাহার নষ্ট হয়। তাহার ভোগও নাই, মুক্তিও নাই, চঞ্চল মনের দ্বারা সে বশীভূত। কারণ গার্হস্থ্য ধৰ্ম পালন করিতে করিতে সে শ্রাস্ত

হইয়া অল্প আশ্রম গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার প্রারব্ধের ফল ফলিতে থাকে। কৰ্ম অঙ্কুরস্বরূপ থাকিয়া যায় বলিয়া তাহার মুক্তি হয় না, এবং সে বস্তুজন্তুর ন্যায় বারম্বার জন্মগ্রহণ করে। চঞ্চলমনা হস্তী সুখলাভার্থে গ্রাম হইতে বনে গমন করে, এবং বনের শৃগাল ভোগার্থে গ্রামে আগমন করে। রাজা বজ্রদ্রী-পরিবৃত হইয়া মাত্র দুঃখের ভাগী হন, তাহার নরকভোগই হয়।^১

প্রারব্ধ কৰ্মফল হইতে ত্যাগী নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন কি না বিবেচ্য। প্রারব্ধ কৰ্ম বিনাযত্নেই সাধিত হয় এবং তাহার ভোগ হয়, ইহা বিদ্বানেরা স্বীকার করেন। কিন্তু যোগশক্তি দ্বারা যেরূপ নানারূপ সিদ্ধি প্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ প্রারব্ধ কৰ্মফলকেও যোগশক্তি দ্বারা বিজিত করা যায়। (সম)ন্যাসীদের মতে শৃঙ্গার বর্জনীয়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলে অস্ত্রের শরীরের জন্ম কিরূপে সম্ভব? অতএব যোগিগণের সিদ্ধান্তই ক্রব।^২ অর্থাৎ ত্যাগের মধ্যেও ভোগ সাধন কর্তব্য কারণ অবধূত বন্ধ ও মোক্ষাতীত।

ভারতীয় মতানুযায়ী ভোগ বন্ধনের কারণ, সংসার-ত্যাগেই মুক্তি। পাশ্চাত্যে ভোগী সহ ত্যাগীর দল আছে, ক্যাথলিক সম্প্রদায় মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, দারিদ্র্যাবরণ ও সেবাব্রত আছে, তথাপি ত্যাগতত্ত্ব তাহাদের প্রধান লক্ষ্য নহে, ত্যাগ ও ভোগের সামরস্তুই আদর্শ। ভারতীয় উপনিষদে ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধন তৈত্তীরিয় উপনিষদে (১।১১।১) আছে। সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না, — আচার্য্যের জন্ত অভীষ্ট ধন আহরণ করিবে কিন্তু বংশবিস্তার-ক্রমকে ভঙ্গ করিবে না—“প্রজাতন্তুঃ মা ব্যবচ্ছেৎসী”। অতএব ইহা ত্যাগ ও ভোগের সামরস্তুের আদর্শ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে (১।১।৩৩, ৭।১১) আছে যে ভোগাসক্ত না হইলে ভোগ অত্যাজ্য নহে, সর্ব্বথা অহস্তার পরিত্যাগ হইলে ভোগও অমঙ্গলপ্রদ নহে। কৰ্ম্মযোগী বা জ্ঞানযোগী কাহারও পক্ষে ভোগ বন্ধনের কারণ নহে। জ্ঞানযোগীর পক্ষে ভোগে অহস্তা নাই, ফলাকাঙ্ক্ষাও নাই, আসক্তিও নাই। এরূপ যোগী ভগবানের সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হন, সত্যজ্ঞান দ্বারা তাহার কৰ্ম্ম বিনষ্ট হয়। মহাপুরুষ বা

যোগীর পক্ষে ভোগ বন্ধনস্বরূপ নহে (৫৮, ৯ গীতা) । কর্মযোগীর ভোগ কামরাগবিবর্জিত, অতএব বন্ধনকারণহীন । অনাসক্ত হইয়া যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিষয়ভোগ করে সে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত (২৬৪ গীতা) । কারণ সংসার হইতে ভোগ বিসর্জিত হইলে বিশ্বসৃষ্টির অন্ত হইয়া যাইবে, তাই ভারতের আদর্শ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় ।

বৌদ্ধধর্মে তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য অষ্টাঙ্গমার্গ ও দশশীল দ্বারা ত্যাগ সাধন আছে । জৈনদের সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্রও ত্যাগের মার্গ, এই তিনের সমন্বয়ে ‘মোক্ষ’লাভ সম্ভব হয় ।^১ শঙ্করের ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা’ও ত্যাগের তত্ত্ব । কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানে আকৃষ্ট হইলে ত্যাজ্যও থাকে না, গ্রাহ্যও থাকে না । কাশ্মীর শৈবদ্বৈতবাদে এই ত্যাগ ও ভোগের সামরস আছে । ভোক্তা যখন ভোগের সহিত একীভূত হন, তখন সেই একীভাবকে ‘ভোগ’ বলে, ‘মোক্ষ’ও বলে । প্রবোধপঞ্চদশিকাতে আছে, “তস্মা ভোক্তা স্বতন্ত্রায়া ভোগৈকীকার এষ যঃ । স এব ভোগঃ সা মুক্তিঃ স এব পরমং পদম্ ।” বস্তুতঃ ভোগ ও মোক্ষের অনুভূতির সামরসই জীবমুক্তি । মহেশ্বরানন্দের মতে (মহার্থমঞ্জরী, পৃ ১৩) ইহাই ত্রিগ্‌দর্শনের বৈশিষ্ট্য । শ্রীরত্নদেবে আছে, “ভুক্তির্ক্বাপাথ মুক্তিঞ্চ নাশ্চত্রৈক্য পদার্থতঃ । ভক্তিমুক্তৌ উভে দেবি বিশেষে পরিকীর্ত্তিতে ॥” এই অবস্থায় “সর্বো মমায়াং বিভবঃ” অনুভূতি হয়, এই বিশ্বাস্যকতা আত্মার স্বভাব, আগন্তুক ধর্ম্য নহে । বৌদ্ধ সহজিয়া মতেও ‘মহাসুখ’ প্রকাশমান হইলে, জিনরত্ন বা বরগগন নামক অধ উর্দ্ধ পদ্যকে অবধূতী স্পর্শ করে, তৎফলে ভব ও নির্বাণ উভয়ই একসঙ্গে সিদ্ধ হয় । ভবভোগ অর্থে পঞ্চপ্রকার কামগুণ, নির্বাণ অর্থে মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার ।^২ বাসনা না থাকিলে বিষয়ের আকর্ষণ থাকে না, সুতরাং বিষয়-সংস্পর্শে ক্রোভ থাকে না, বন্ধনও হয় না—ইহাই নাথযোগীদের আদর্শ ও সাধনের লক্ষ্য । ইহাই ত্যাগ ও ভোগের সামরস সাধন ।

পরমহংস ও অবধূত

নাথগণের আদর্শ অবধূতত্ব । সন্ন্যাস বটপ্রকারের, যথা—কুটীচক, বহুদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত । নারদপরিব্রাজক

১ । Outlines of Jainism—J. Jaini (1916) p. 53.

২ । গুরুত্ব ও সঙ্গত বহুত্ব, ম.ন. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩০৭ ফুটনোট ।

উপনিষদে^১ ইহাদের প্রত্যেকের বাহ্য লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। পরমহংস শিষ্যাজ্ঞাপবীতরহিত, পঞ্চগৃহে একরাত্র অন্নগ্রহণকারী, করই তাঁহার পাত্র, তিনি কৌপীন ও দণ্ডধারী, ভস্মলেপনপর ও সর্বব্যাপী। অবদূত সকল নিয়মের অতীত, অনিয়ম ও অজগরবৃত্তিই তাঁহার ধর্ম অর্থাৎ তিনি বায়ুমাত্র আহার করিয়া থাকেন, পরমহংসের দ্বায় অন্নগ্রহণও করেন না বা তুরীয়াতীতের দ্বায় ফলগ্রহণ করিয়াও জীবিত থাকেন না। অবদূত স্বরূপ অমুসন্ধানেই রত থাকেন। বিভিন্ন সন্ন্যাসদ্বারা বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয়। তুরীয়াতীত সত্যলোকে গমন করেন, হংস ও পরমহংস যথাক্রমে স্বর্গলোক ও তপালোকে গমন করেন, কিন্তু অবদূতের সাস্বস্বরূপ কৈবল্য লাভ হয়। শ্রুতিতেও আছে, ‘যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি সমাপ্নোতি নানুথা’।^২

ইহাও বাহ্য লক্ষণ মাত্র। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে অবদূত ও পরমহংসের ভেদ বিচারের রূপ অল্প প্রকার। এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, পরমহংসেরা বলেন যে দ্বৈতবাদীদের কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি স্থান, অদ্বৈতবাদীদের মায়াবাহিত ব্রহ্মস্থল, বন্ধ ও মননের পরে যে মুক্তি হয়, তাহা যোগীদের নিগুণ স্থান এবং বন্ধমুক্তিরহিত পরমসিদ্ধান্তবাদী যোগী (যাহার শরীর অবদূতের দ্বায় অর্থাৎ যিনি অবদূত) তাঁহার স্থান নিগুণ সত্ত্বের অতীত অদ্বৈত পরবর্তী, যে স্থান “সর্বপরিবর্ত্যেব” বা যেখানে সব আছে সেই স্থান তাঁহাদের।^৩ ইহা দ্বারা অবদূত স্থানের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে নিগুণ ব্রহ্ম স্থান কথামাত্র, নিজ মাহাত্ম্য বর্ধনের জন্ত ইহা বলা হয়, কিন্তু আচরণের দ্বারা তাহা দেখা যায় না, কারণ নিগুণ ব্রহ্মে বা অমায়িব্রহ্মে মায়ারূপ গুণ আরোপ করিয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়াদি ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপ করা হয় এবং তাঁহার নানারূপ স্তবস্ততি করা হয়। নিগুণ ব্রহ্মে মায়ার আরোপ কিরূপে সম্ভব? তথাপি যদি নিগুণ ব্রহ্মই ইষ্ট বলা হয়, তাহা দ্বারাও পূর্ণতা হয় না, যোগীদের যাহা ইষ্ট তাহাই যথার্থ। কারণ ব্রহ্ম ব্যাপক, নিগুণ ব্রহ্ম ব্যাপক হইতে পারেন না। চৈতন্যস্বরূপ জীবকে যদি ব্যাপক বলা যায় তবে পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যাপকত্ব আবদ্ধ হইয়া ব্যাপকত্বহানি হয় কারণ

১। না. প. উপ., ৫ম উপদেশ, পৃ ২৭২, নির্ঘমাগর প্রেস (১৯৩২)।

২। ইতা ৮৩ তুলনী

৩। গো. দি. স., পৃ ৭১

তাহার আত্মরূপই ব্যাপক। নিগুণ শক্তিরহিত, তাহাতে ব্যাপকত্বদ্বন্দ্ব কল্পে সম্ভব? এইরূপে নিগুণ বা সগুণ ব্রহ্ম এই উভয় ব্রহ্মই পরাংপর ব্রহ্ম নহেন। কারণ পরাংপরই পূর্ণনাথ লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ দ্বৈত বা অদ্বৈত উপরবর্তী সাকার ও নিরাকারাতীত নাথস্বরূপ।^১

সিদ্ধমতে বলা হয় পরমহংস কেবল ত্যাগী, “পরমহংসাস্তু কামং নিষেধয়ন্তি স নিষেধো ন ভবত্যেবম্”। তাহা কিরূপে সাধিত হয় তাহা ‘ত্যাগ ও ভোগের’ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। সিদ্ধমতে অবদ্বৈতের একহস্তে ত্যাগ ও একহস্তে ভোগ ধৃত থাকায় অর্থাৎ সর্বদ্বন্দ্বাতীত হওয়ায় অবদ্বৈত মার্গই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তী তাহা মানিবেন না, পরমহংসের মার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিবেন, কারণ পরমহংস সর্বত্যাগী। অতএব বিভিন্ন মার্গের বিভিন্ন লক্ষ্য, এইমাত্র বলা চলে।

বন্ধন ও মোক্ষ

নাথগণ বলেন ব্রহ্ম পঞ্চপাতবিনিমুক্ত, ‘পঞ্চপাত’ অর্থে দেহাভিমান অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি শূদ্র ইত্যাদি জ্ঞান। তাহাকে জ্ঞানিতে হইলে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ আমি গৃহস্থ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী, আমি উত্তম, আমি মধ্যম বা অধম, এই সকল জ্ঞান (সঙ্কল্প) ত্যাগ করিয়া ব্যাপক পরমনাথকে স্বরূপতঃ দর্শন করিলে মুক্তি হয়।^২

বর্ণাশ্রম ত্যাগে মুক্তি হয়, “গুণানতীতৈব মুক্তোভবের তু গুণাভি-
মানীতি সমতঃ সিদ্ধান্তো ভবত্যেব”।^৩ চাতুর্বর্ণ্য ব্যবহারে গুণত্যাগ
অসম্ভব, কারণ বর্ণাশ্রমীর পক্ষে গুণবৃত্তি সাধারণ, অতএব উহা মুক্তিহীন।
পঞ্চমাশ্রমী বা অত্যাশ্রমীর পক্ষেই মুক্তিলাভ সম্ভব, কারণ “নাস্তি
গুণবৃত্তীনাং মুক্তিসাধকত্বম্,” এবং অত্যাশ্রমীই মুক্তিপ্রদ গুরু।^৪

পরমপুরুষার্থই মুক্তি, তাহাই নাথস্বরূপে অবস্থান। অবদ্বৈতের
যোগসাধনফলে ইহা লাভ হয়। গোরক্ষ উপনিষদে অদ্বৈতোপরি
সদানন্দ দেবাস্বরূপে নাথস্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। তিনি সকল
ভেদাতীত, পরম্ একম্। সর্বোপনিষৎসারে আছে—“কথং বন্ধঃ কথং
মোক্ষঃ” ইত্যাদি প্রশ্নে “অনাশ্বনো দেহাদীনাস্বহেনাভিমন্ততে সোহভিমান
আশ্বনো বন্ধস্তগ্নিবৃত্তির্মোক্ষ ইত্যানেন স্বরূপেণাবস্থানমিতি সিদ্ধম্।”

অতএব অনাত্মের আত্মতে অভিমানই ‘বন্ধ’ এবং “স্বয়ংজ্যোতি সত্যমেকং জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে”, তৎপদে অবস্থানই মুক্তি।

“সবিষয়ং মনো বন্ধায় নির্বিষয়ং মুক্তয়ে ভবতি।”^১ এইরূপে সবিকল্প ও নির্বিকল্প চিন্তের ভেদ ও অমনস্কতা সাধন আছে। সবিষয় মন বন্ধনের ও নির্বিষয় মন মোক্ষের কারণ। যোগচূড়ামণি উপনিষদে আছে—

ইন্দ্রিয়ৈর্বধ্যতে জীব আত্মা চৈব ন বধ্যতে।

মমত্বেন ভবেজ্জীব নির্মমত্বেন কেবলঃ ॥^২

নাথমার্গের ‘যোগবীজ’ গ্রন্থেও আছে, অহঙ্কারই জীবত্ব, তাহাতে দোষ বর্তায়, অহঙ্কাররূপ দোষ হইতে মুক্তি হইলে মোক্ষলাভ হয়। যোগশিখোপনিষদও বলেন—“বারিবং ক্ষুরিতং স্বস্মিংস্তত্রাহঙ্কৃতিরুখিতা। পঞ্চাঙ্গকম্ ভূপিওম্ ধাতুবন্ধম্ গুণাঙ্গকম্”,^৩ পরমাত্মাতে বারিবং স্পন্দন হইলে তাঁহার অহঙ্কার উখিত হয় এবং তাহা পঞ্চাঙ্গক হয় ও গুণযুক্ত হয়, ইহাই জীবত্বপ্রাপ্তি এবং এইরূপে শিবরূপী জীব বন্ধ হয়।

মৎসেন্দ্রনাথের সম্প্রদায়ের ‘অকুলাগমতন্ত্রে’^৪ মুক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা, ধর্ম্মাধর্ম্ম মুক্ত নিরাশ্রয় চিত্ত নির্বাণ-মুক্তি লাভে সমর্থ, চিত্ত অর্থে ‘জীবন’ অচিত্ত অর্থে ‘মরণ’—চিত্ত ও অচিত্তকে যে সমতাপন্ন করিয়াছে সেই মুক্ত।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিমুক্তং যদি চিত্তং নিরাশ্রয়ং।

তদা নির্বাণরূপায় মুক্তির্ভবতি যোগিনাম্ ॥

চিত্তং জীবিতমাখ্যাতমচিত্তং মরণং ধ্রুবং।

চিত্তাচিত্তসমো ভূত্বা জীবনমুক্তিরিহোচ্যতে ॥

ভাবাভাববিনিমুক্তঃ স্বভাবো ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ।

ভাবঃ প্রাণসমাখ্যাতঃ অভাবোহপানশক্তিভিত্তিকঃ ॥

প্রাণাপানসমায়োগে যাস্তি ব্রহ্মপদং প্রিয়ে।

শূন্যং সর্ব্বনিরাভাসং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে ॥^৫

(দ্বিতীয় উপদেশ)।

মুক্তির দুই মার্গের কথা ঋতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, “সদ্যোমুক্তি-প্রদশৈচকঃ ক্রমমুক্তিপ্রদঃ পরঃ।” শুকদেব-উপদিষ্ট মার্গ সত্ত্বমুক্তিপ্রদ,

১। মণ্ডল ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ ৫।১০ ২। যোগচূড়ামণি উপঃ ৮৪ শ্লোক ৩। যোগশিখোপঃ ১।৮

৪। অকুলাগমতন্ত্রের পুঁথি অগ্রাচীন নেওয়ারী লিপিতে লিখিত, ভণিতার কাল আনুমানিক ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ, ইহা মৎসেন্দ্রনাথ সম্প্রদায়ের পুঁথি।

৫। কৌলজ্ঞাননির্ণয়—বাগচী পৃ ৩১

ইহার নামান্তর ‘বিহঙ্গমমার্গ’, ইহাতে সত্ত্বমুক্তি লাভ হয়। বামদেব-উপদিষ্ট মার্গের নামান্তর ‘পিপীলিকামার্গ’—অর্থাৎ ইহা উত্থানপতনের মধ্য দিয়া ক্রমমুক্তির মার্গ। যোগবীজে “চিরাৎ সংপ্রাপ্যতে সিদ্ধি-শ্রীকটক্রম এব সঃ” এবং যোগসিদ্ধির পূর্বে দেহপাত হইলে পুনরায় দেহ ধারণপূর্বক পুণ্যবলে গুরুলাভ ও সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভকে ‘কাকমত’ বলা হয়। অভ্যাসের ক্রমিক ফল বা ‘পশ্চিমমার্গ’ই মোক্ষলাভের পথ। ইহাই কাকমত।^১ এই পশ্চিমমার্গই যোগমার্গ বা কুণ্ডলিনীর জাগরণের পথ।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যোগব্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাদি শুভলোক লাভ করিয়া তথায় বহুবৎসর বাস করেন, অনন্তর সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।^২

দত্তাত্রেয়ের অবদূতগীতায় আছে “ত্রিতয়তুরীয়ং নহি নহি যত্র বিন্দতি কেবলমাত্মনি তত্র। ধর্ম্মাধর্ম্মো নহি নহি যত্র বন্ধোমুক্তঃ কথমিহ তত্র।”^৩ অর্থাৎ যেখানে ত্রিতয়—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—ও তুরীয় অবস্থা নাই, সেখানে কেবল আত্মাকে জানিবে এবং যেখানে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নাই সেখানে বন্ধ ও মোক্ষ কিরূপে সম্ভব? অতএব সিদ্ধযোগী বন্ধমোক্ষহীন।

সিদ্ধযোগী ভাবাভাববিনির্মুক্ত। ভাব অর্থে প্রাণ, অভাব অর্থে অপান। তিনি প্রাণাপানের যোগ জানেন, শূন্যময় নিরাভাসকে চিস্তার দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। কিন্তু এই পদলাভের উপায় কি? জ্ঞান বিনা যোগে সিদ্ধি নাই, যোগ বিনা জ্ঞানে মোক্ষ নাই। জ্ঞানী বহু জন্মান্তরের সাধনে ‘যোগ’ লাভ করেন, যোগী একজন্মেই ‘জ্ঞান’ লাভ করেন; সেই নিমিত্ত সত্যাকার জ্ঞানসহ যে যোগ তাহাই মোক্ষপ্রদ মার্গ। দেবীর ‘মুক্তিমার্গ’ জিজ্ঞাসায় শঙ্করের উত্তর এইভাবে বিবৃত হইয়াছে—

যোগেন রহিতং জ্ঞানং ন মোক্ষায় ভবেদ্বিধে ॥৫১

জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিদ্ধতি কদাচন।

জন্মান্তরৈশ্চ বহুভির্যোগো জ্ঞানেন লভ্যতে ॥ ৫২

১। যোগবীজ ১৪৪—১৫০, ১৫৩ শ্লোক।

২। “শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রষ্টোহভিজ্ঞায়তে”, ৩।৪১ গীতা।

৩। অবদূত গীতা ১।৩৪, দত্তাত্রেয়কৃত নকুলাবদূত প্রণীত।

জ্ঞানং তু জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে ।

তস্মাৎ যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্ত মোক্ষদঃ ॥ ৫৩*

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে মোক্ষবৃত্তান্ত বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

কুল উর্দ্ধগামী হইলে মোক্ষলাভ হয়, 'কুল' অর্থে শক্তি । লিঙ্গের অর্থাৎ শিবের প্রতি ভক্তি রাখিলে ইহা সম্ভব হয়, এই শিব দেহমধ্যেই অবস্থিত (৩২৭) । জগতের মূলে যে সর্বব্যাপী 'হংস' বিরাজমান, তাহার যথার্থ জ্ঞানেই মুক্তি হয়, এই জ্ঞানলাভে পাপপুণ্যাতীত অবস্থা বা 'উন্মনী' অবস্থা লাভ হয় । এই চরম জ্ঞানের বিকাশমাত্রেই মোক্ষ হয়, কেবল স্বকীয় মোক্ষ নহে, যে তাহাকে স্পর্শ করিবে তাহারও মোক্ষ হইবে (১৭৩৭) । হংস বা শিবই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, তিনি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক (১৩২) তাহার উপলব্ধিতে মোক্ষ । হংসের স্বভাব (১৬১৮-৩৩) বর্ণিত হইয়াছে । তিনি হর্ষাকর্ষা, দেহমধ্যে অবাধবিচরণশীল, ভাবাভাববর্জিত, জরানাশহীন, পৃথিবীতে আত্মরূপে ক্রীড়ারত (১৭৩৮) । পরমাত্মার এই স্বভাব জানিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিলে সত্ত্ব মুক্তি হয় । সহস্রাধারে 'হংস'র নিবাস, শক্তি ঐ স্থানে পৌঁছিলে যথার্থ সমাধি হয়, (১৩১-৫), ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না ।^১

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ মধ্যে মানব মোক্ষ বা ত্রিবিধ দুঃখ হইতে সদাকালের নিমিত্ত মুক্তি প্রার্থনা করে । অবিজ্ঞা সংসারে বন্ধনের কারণ, অবিজ্ঞাই রাগদ্বेषাদির জননী । অনিত্য অশুচি ইত্যাদিতে নিত্য, শুচি ইত্যাদি কল্পনাই অবিজ্ঞা (যোগসূত্র ২।৫), জ্ঞানই তাহা হইতে মুক্তির উপায় । হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে তাই জ্ঞানের উপদেশ আছে । সত্বপদেশ দ্বারা পারে লইয়া যাইতে যিনি সক্ষম তিনিই জৈনমতে 'তীর্থঙ্কর' । জৈনের 'সম্যক্ চারিত্র্যে'র জ্ঞান যম, নিয়ম ও ধ্যান আছে, বৌদ্ধের সমাধি আদি ত্রিবিধ সাধন আছে, শ্রায়েব আত্মসাক্ষাৎকার আছে । সাংখ্য ও যোগে যম নিয়ম প্রত্যাহারাদি মোক্ষমার্গের সাধন আছে ।

বেদান্ত বলেন, অধ্যাস বা একবস্তুরে অপর বস্তুর ধর্ম আরোপে দুঃখময় বন্ধন হয়, অধ্যাস দূর হইলে মোক্ষ হইবে । মুক্ত পুরুষ দেহ, মন ও আত্মার প্রকৃত ধর্ম জ্ঞানে বলিয়া রাগদ্বেষষ্কৃধাতৃকাদি দ্বারা পীড়িত

১। যোগশিখোপঃ ১।৫১-৫৩, যোগবীজ ৬৪-৬৬ শ্লোক ।

২। কৌলজ্ঞাননির্ণয় ১০, ১৩ পটল ।

নহেন, তাই তিনি মুক্ত। সাংখ্য বলেন, দুঃখের আত্মাত্মিক নিবৃত্তিতে মোক্ষ হয়, বেদান্তমতে মোক্ষাবস্থা কেবল দুঃখাভাব নহে, উপরন্তু পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। জীবাত্মা দেহধর্ম্মে বদ্ধ হইলেও আত্মা নিত্যমুক্ত; জীব তাহা উপলব্ধি করিবামাত্র তাহার স্বরূপে অবস্থান ও মুক্তি হয়। বেদান্তের মোক্ষে ও শক্তিতত্ত্বের মোক্ষে ভেদ আছে। বেদান্তের মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ কল্পিত হয়; শক্তিতত্ত্বের মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ হয় না, কোন না কোন রূপে তাহা থাকে, তবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সেই মায়ার পরিণাম হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের নাশই ইহার কারণ। সৃষ্টি কর্ম্মভোগের জন্ম, কারণাভাবে বা কর্ম্মের নাশে সংসার উৎপন্ন হয় না। অতএব বদ্ধ অবস্থায় মায়া বহিমুখী, মোক্ষাবস্থায় মায়া অন্তর্মুখী; ইহাই বন্ধন ও মোক্ষের বৈলক্ষণ্য।

প্রাচীন দার্শনিকগণ মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, মোক্ষের আদর্শ সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত ভেদ আছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। (নাথমার্গে ও আগমে মূলধারে প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে মুক্তিমার্গ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মৎস্যেশ্বরনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথ্যাচার্য্যগণের মতে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণে সহায়তা করে তাহাই কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগ। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত আত্মা বা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে। এই সিদ্ধান্ত বৈদিক নহে, পাতঞ্জল যোগমার্গেও ইহার উল্লেখ নাই, ইহা তত্ত্বের নিজস্ব। তথাপি ইহা কোন নূতন তথ্য নহে, বা মোক্ষলাভের উপায়বিশেষ মাত্র নহে। কুণ্ডলিনী আধারশক্তি, অর্থাৎ এই শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ইহার চৈতন্য সম্পাদনে ইনি নিরাধার হন, তৎকালে জাগতিক সকল বস্তু নিরাধার হয়। কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময়ী হন, তখন বিশ্বজগৎও চৈতন্যময় হয়, তখন ঋতিনির্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। এই জাগরণ ক্রমশঃ হয়, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি প্রভৃতি ইহার অবস্থাভেদ মাত্র। পূর্ণ জাগরণে অদ্বৈতজ্ঞান হয়, তৎপূর্বে দ্বৈতজ্ঞান অবশ্যস্বাবী। পূর্ণ জাগরণকেই তত্ত্বশাস্ত্রে ‘পূর্ণা হস্তা’ বলা হইয়াছে।

তত্ত্বমতে কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন ভিন্ন জীবের উদ্ধগতিলাভ সম্ভবপর নহে, বিশেষ সাধন দ্বারা ইহাকে জাগরিত করিতে হয়, কিন্তু অগ্নি প্রকটিত হইলে ইন্ধনকে যেমন দগ্ধ করে, তেমনি কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে

সাধনা বিলুপ্ত হয়। সাধনাই ইন্দ্রন। বাহ্য-সাধনমাত্রই বিচার, ভক্তি, মন্ত্র বা হঠ, পুরুষকার-সাপেক্ষ, এই পুরুষকার বা কর্তৃত্ববোধ কুণ্ডলিনীর জাগরণের সহিত লুপ্ত হইয়া আসে। বৌদ্ধরা ইহাকেই 'শ্রোতাপন্ন' বলিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তির সঞ্চার হইলে তাহার শ্রোতে পতিত জীবের আর নিম্নে গতি হয় না, অবশ্য শক্তির তারতম্যে শ্রোতাপন্নের অবস্থা বহু প্রকার হইতে পারে। এই শ্রোতাই সুষুম্নাবাহী কুণ্ডলিনীর উজ্জিশ্রোত।

কুণ্ডলিনীর চৈতন্যের সহিত ইড়াপিঙ্গলামার্গে বাহিত শ্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্না পথে প্রবেশ করে, এই পথে প্রবেশ করিয়াও ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে জীবশক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া ব্রহ্ম নাড়ী বা আনন্দময় কোষে গমন করে। ইহাতেও যখন লক্ষ্য থাকে না, তখন গুণাতীত সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। আনন্দময় কোষে ঐশ্বর্য্য অবস্থা প্রাপ্তি হয় কিন্তু কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্যসম্পাদনে পারমেশ্বর্য্যলাভ হয়, পূর্ব্বোক্ত তমঃ রজঃ ও সব মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্য হইল বলা যায়।

উজ্জিস্থ সব্ববিন্দু ও অধঃস্থ তমোবিন্দুর মধ্যবর্ত্তী রেখাকে 'মেরু' বলে, এই মেরুর উজ্জিবিন্দুর আকর্ষণই 'কৃপা' বা সংকর্ষণ ও অধোবিন্দুর আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ, ইহা ভূমধ্য হইতে প্রসৃত। বিশুদ্ধজীব এই উভয় আকর্ষণের মধ্যস্থলে তটস্থভাবে বর্ত্তমান, আগম মতে ইহারাই বিজ্ঞানকল জীব, ইহারাই সাংখ্যজ্ঞানী, কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ কিন্তু ভগবৎকৃপাশক্তিতে বঞ্চিত। তটস্থভাব হইতে বিন্দু কোন অনির্কষচনীয় কারণে উজ্জিমুখী হইলে আপন রেখা অবলম্বন করিয়া সহস্রারের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ইহা ভাবের সাধন, ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। তমোবিন্দুর পঞ্চ বিভাগের ত্রায় সব্ববিন্দুরও পঞ্চ বিভাগ আছে—তাহারা ভাবপ্রধান। শাস্ত্র হইতে মাধুর্য্য পর্য্যন্ত এই পঞ্চ স্তর। সাম্যভাব পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যাবস্থার অনুভব হয়, তৎপরে মাধুর্য্যের বিকাশ সখ্য, বাৎসল্য ও কাস্তুরূপে, তন্মধ্যে কাস্তুভাবই শ্রেষ্ঠ। এই ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয়, শৈবাচার্য্যদের শিবশক্তির সামরস্ত্রও প্রকারান্তরে এই ভাব।

মোক্ষমার্গের পথিককে একে একে সকল তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া তত্ত্বাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, কারণ তত্ত্বমাত্রই বৈষম্যের অন্তর্গত। সমাধির ক্রমবিকাশ বা কুণ্ডলিনীর ক্রমোন্নতি একই বস্তু। পাতঞ্জল যোগমতে চিন্তা একাগ্রভূমিতে অবস্থিত থাকিলে তাহার আলম্বন

থাকে, ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহার পরবর্তী অবস্থায় আলম্বন (অবলম্বন) বিলীন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় কিন্তু একাগ্রভূমি অবলম্বন না করিয়া এই নিরোধভূমিতে পদার্পণ করা যায় না। এই আলম্বন 'অস্মিতা'রূপ বিন্দু বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ভাব। ইহারও ত্যাগ হইলে কৰ্ম্মাশয়, পূৰ্ব্বসংস্কার, অভিমানাদি কিছুই থাকে না। এই শুদ্ধাবস্থাই নির্মাণচিত্ত বা নির্মাণকায়াদি গ্রহণের অবস্থা বিশেষ। সাধক এই স্তরে কৈবল্যাসিদ্ধি লাভ করেন অথবা জীবোদ্ধারে ব্রতী হইয়া নির্মাণকায় গ্রহণ করেন।

যথার্থ সাম্যাবস্থালভ করিতে হইলে প্রথমে দ্বৈত হইতে অদ্বৈতভাবে উপনীত হইতে হইবে, পরে স্বভাবের নিয়মে অদ্বৈতভূমিও অতিক্রান্ত হইলে দ্বৈতাদ্বৈত উপরিবর্তী সাম্যাবস্থার উপলব্ধি হইবে ইহাই 'নাথাবস্থা'। দ্বৈতভাবকে অদ্বৈতে পরিণত না করিয়া নিবৃত্তি করিলে বাথান অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতিলীনদের ও সাংখ্যের কেবলী পুরুষদের এই কারণেই মগ্নোথানবৎ পুনরুত্থান ঘটে।

অতএব সাংখ্যমতে যাহা মুক্তি তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে। সাধনা দ্বারা অগ্নিমাди অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইতেই সাংখ্যের দৃষ্টিতে ঈশ্বরহলাভ হইল বলা চলে, সাংখ্যের সম্মত ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যেশ্বর, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনিত্য কারণ দ্বৈতবোধ হইতে উৎপন্ন এবং কৈবল্যের পরিপন্থী। সাংখ্যানির্দিষ্ট সাধনে জীব পূৰ্ব্বোক্ত 'তটস্থ' বা মধ্যবিন্দু হইতে উর্দ্ধে উথিত হইতে পারে না, তাই সহস্রারে প্রবেশ-পথ পায় না। শৈবাগম মতে ইহা 'বিজ্ঞানাকল' অবস্থা তাহাও পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈদী ভক্তি বা উপাসনার ফলে বিন্দুর রশ্মি মহাবিন্দুর একটি রশ্মিতে সংযোগ লাভ করিলে ক্রমশঃ তাহা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, খণ্ড সত্ত্ব বা জীবদেহে ভাবের বিকাশ হইলেই সহস্রারের নিত্যবিভূতি অনুভূত হয়, ইহাই ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয়। কুণ্ডলিনীর ক্রমিক চৈতন্যেও জীব উর্দ্ধবিন্দু পর্য্যন্ত উথিত হয়, কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইলেই সাম্যভাবে অবস্থিতি হয়, ইহাই 'পূর্ণাহস্তা', শাস্তাবস্থা, ব্রাহ্মীস্থিতি, শাস্বতপদে অবস্থান বা 'নির্বাণ'।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর ও পরা মুক্তি

জীবিতাবস্থায় দেহপাতের পূর্বে যে মুক্তি হয় তাহা জীবন্মুক্তি, এবং পার্থিব স্থূল ও সূক্ষ্মদেহনাশের পর যে মুক্তি হয় তাহা বিদেহমুক্তি, সাধারণতঃ এই উভয় প্রকার মুক্তি বর্ণিত হয়। জীবন্মুক্তের মুক্তি হইলেও প্রারম্ভ কৰ্মের ফলস্বরূপ স্থূল দেহ থাকে। তথাপি জীবন্মুক্ত দেহ ও আত্মার ভিন্নত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, অতএব জাগতিক সুখদুঃখ দ্বারা অবিচলিত থাকেন, এবং প্রারম্ভ ক্ষয়ে বিদেহ-মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকেন। ইহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তীর জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। পদ্মপত্রে জলের ছায় বেদান্তী সংসারবিরক্ত, নিরাসক্ত, নির্বিকার হইয়া নিজেকে বদ্ধ হইতে মুক্ত মনে করিলে ‘জীবন্মুক্ত’রূপে বিবেচিত হন। এই অবস্থাই তাহার স্বরূপোলব্ধির অবস্থা। তৎপরে প্রারম্ভহীন হইলে ‘বিদেহমুক্ত’ অবস্থা হয়।

নাথদর্শনে জীবন্মুক্তির অবস্থাই আদর্শ, দেহপাতে যে মুক্তি হয় তাহাকে যথার্থ মুক্তি বলা চলে না, কারণ সে মুক্তি দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা বাধিত। নাথগণ বলেন, যে দেহে পরমপদপ্রাপ্তি হইয়াছে, সেই দেহকেই অজর অমর করিয়া রক্ষা করা ও যথেষ্ট বিচরণাদি করা কর্তব্য, বিদেহমুক্তিতে সেই দেহেরই ত্যাগ হয়। সম্ভববিরোধে দেহ থাকিতে মুক্তিলাভ করিতে উপদেশ দেন, কারণ মৃত্যুর পর কি ঘটবে বা না ঘটবে তাহার নিশ্চয়তা কি? আবার বৈষ্ণব মধ্যে নিত্বার্ক সম্প্রদায় জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে দেহ অবিচ্ছাদীন, এবং দেহ থাকিলে অবিচ্ছাদ থাকিবে, অবিচ্ছাদ থাকিলে মুক্তি কোথায়? এইরূপে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত। প্রথমতঃ নাথ মতের কথা বলিব।

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে—“অজরামরপিণ্ডো যো জীবন্মুক্তঃ স এব হি” (১৭১ শ্লোক), যাহার পিণ্ড বা দেহ অজর ও অমর সেই জীবন্মুক্ত, যোগসিদ্ধির অলৌকিক গুণ ইহাতে কদাচিত্ লক্ষিত হয়। জীবন্মুক্ত যোগীর প্রাণ বহির্গত হয় না বলিয়া পিণ্ডপাত হয় না, “ন বহিঃপ্রাণ আয়াতি পিণ্ডস্ত পতনং কুতঃ।” পিণ্ডপাতে যে মুক্তি তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে,

কারণ অশ্বকুট্টাদি দেহধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, দেহত্যাগে কি তাহাদের মুক্তি হয়? (১৭২ শ্লোক)। জীবমুক্ত যোগীর দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয়। জলে সৈন্ধব যেমন মিলিয়া যায়, তেমনি মুক্ত পুরুষের দেহ ব্রহ্মহলাভ করে, এইরূপ যোগীই জীবমুক্ত। ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব প্রাপ্তি হইলে যোগীর দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; ইন্দ্রিয়সকলও চিন্ময় হয়। ইহাই যোগীর ‘সিদ্ধদেহ’ বা যোগদেহ, ইহার বিবরণ নিবন্ধের কায়সিকি অধ্যায়ে সাধনা অংশে দ্রষ্টব্য।

যোগীর সিদ্ধ দেহলাভ হইলে ইচ্ছামৃত্যুবরণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। হঠযোগপ্রদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যতপ্রকার সমাধি আছে তন্মধ্যে মৃত্যুর সমাধিক্রম অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যুরূপ সমাধি উত্তম এবং জীবমুক্তিরূপ সুখের উপায়। “মৃত্যুং চ সুখোপায়ং ব্রহ্মানন্দকরং পরম”।^১ ইহার টীকায় আছে, যিনি এই ক্রম অনুসারে সমাধি আশ্রয় করিতে পারেন তাঁহার মৃত্যু হয় না, তিনি ইচ্ছা করিলে দেহত্যাগ করিতে পারেন। এই সমাধি আশ্রয় করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতেই মনোনাশ ও বাসনাক্রয় হইয়া জীবমুক্তিরূপ সুখলাভ হইয়া থাকে। আর এই সমাধিক্রম ব্রহ্মানন্দপ্রদ, অর্থাৎ এই সমাধিতে প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়, তাহা হইলেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান হইয়া অত্যন্ত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিরূপ ‘বিদেহমুক্তি’ লাভ হইয়া থাকে।

সিদ্ধগণ কায়সিকির যথার্থ মূল্য বুঝিতেন, কারণ এই দেহকেই তাঁহারা আত্মা স্বরূপ মনে করিতেন এবং সেই নিমিত্ত জীবিতকালেই মুক্তি চাহিতেন। সেই মুক্তির জন্ত যে সাধনা আবশ্যিক তাহা দীর্ঘদিনে সাধিত হয়, তাই তাঁহারা এই দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদনে বৃত্ত করিতেন। জীব অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা দ্বারা আচ্ছন্ন। এই অজ্ঞানের দুইটী রূপ আছে, এক ‘আবরণ’ দ্বিতীয় ‘বিক্ষেপ’। আবরণ দূর হইলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় এবং জীবমুক্তি হয়। ইহার ফলে মনোনাশ, বাসনাক্রয় ও তত্ত্বজ্ঞান হয়। কিন্তু বিক্ষেপ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ থাকে, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত দেহনাশ হয় না। জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না, ভোগের দ্বারাই হয়, কিন্তু যোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয়

করিবার ক্ষমতা যোগীর আছে। যোগীর যোগাঙ্গি দ্বারা সংকৃত পঙ্ক দেহ প্রারব্ধের অধীন নহে। জীবমুক্ত যোগীও প্রারব্ধের অধীন, বেদান্ত ভোগের দ্বারা সেই প্রারব্ধ ক্রয়ের কথা বলেন, বেদান্তীর জ্ঞানমার্গ, কিন্তু যোগমার্গে যোগ দ্বারাই দেহজয় ও প্রারব্ধের ক্রয় হয়। যোগবীজ গ্রন্থে আছে “আমি মুক্ত” বিচার ও মনের দ্বারা এইরূপ চিন্তা বশে কেহ মুক্ত হয় না, ইহাতে যোগের অপেক্ষা আছে “পুমান্ জন্মান্তরশতৈ যোগাদেব বিমুচ্যতে” (শ্লোক ৬৯)। বেদান্তী জ্ঞানলাভেই জীবমুক্তি স্বীকার করেন, বিদেহমুক্তি সময়সাপেক্ষ মাত্র।

জীবমুক্ত জ্ঞানমার্গী বেদান্তী এই নিমিত্ত প্রারব্ধক্ৰয়ে সচেষ্ট হন, কারণ তাঁহার প্রারব্ধ ক্রয় না হওয়া পর্যন্ত দেহপাত হয় না। পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ, পরেচ্ছা-প্রারব্ধ ও অনিচ্ছা-প্রারব্ধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। অনুভূতি প্রকাশে তীব্র, মধ্য, মন্দ ও শূণ্য এই চারি-ভেদের স্বেচ্ছা, পরেচ্ছা ও অনিচ্ছা ভেদে দ্বাদশ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।^১

সাংখ্য, গীতা প্রভৃতিতে জীবমুক্তিকে চরমপ্রাপ্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহজন্মেই সাধন দ্বারা হুঃখ হইতে ত্রাণলাভ ও আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব,—তাহাই জীবমুক্তি। ত্রিবিধ হুঃখ হইতে নিবৃত্তিই সকলের কাম্য, ষড়্‌দর্শনে ইহাকেই জীবনের লক্ষ্য বলা হইয়াছে। প্রাচীনতম যোগদর্শন অনুসারে যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে প্রারব্ধের ক্রয় পর্যন্ত সেই দেহে বাস করাকে ‘জীবমুক্তি’ বলে, এই অবস্থাতে প্রারব্ধের সংস্কারে যথেষ্টাচার হইতে পারে। যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা নাশের পরবর্তী অবস্থা ‘বিদেহমুক্তি’।

বেদান্তের আত্মসাক্ষাৎকারই নাথমার্গের পরমপদপ্রাপ্তি, নাথেরা সেই দেহকেই স্থায়ী করিতে সচেষ্ট। উপনিষদের আদর্শানুযায়ী হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা নাশের দ্বারা অমরত্বপ্রাপ্তির কথা আছে (কঠোপঃ ২।৩।১৪)। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ঔপনিষদিক জীবমুক্তির আদর্শ।

নারদপরিব্রাজক উপনিষদের পঞ্চম উপদেশে আছে, “জাগরিতে শুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ইব যদি অশ্রুতং যদি অদৃষ্টং তৎ সর্বম্ অবিজ্ঞাতম্ ইব যো বসেৎ তস্য স্বপ্নাবস্থায়াম্ অপি তাদৃশী অবস্থা ভবতি। স জীবমুক্ত ইতি বদন্তি।” চিত্তবৃত্তির অবস্থান-ভেদে জাগ্রৎস্বপ্নাদি সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

যোগতত্ত্ব উপনিষদে (শ্লোক ১৪২) ‘বিদেহমুক্তি’র কথা আছে ।
আত্মমাত্রে অবশিষ্ট থাকাই বিদেহমুক্তি ।

নিষিদ্ধৈর্নবভির্দ্বারৈর্নির্জনে নিরূপদ্রবে ।

নিশ্চিতং তু আত্মমাত্রেন অবশিষ্টং যোগসেবয়া ॥ ১৪২

কূর্শ্বের স্থায় সমস্ত দ্বার নিজিয় করিতে পারিলে বিদেহমুক্তি হয় ।
এই আদর্শ সাংখ্য, যোগাদির বিদেহমুক্তির আদর্শ হইতে ভিন্ন ।

নাদবিন্দু উপনিষদে আছে (৫২—৫৬ শ্লোক)—

মৃতবৎ তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্ৰ সংশয়ঃ

* * * *

দৃষ্টিঃ স্থিরা যন্ত বিনা সদৃশং বায়ুঃ স্থিরো যন্ত বিনা প্রযত্বম্ ।

চিন্তাঃ স্থিরা যন্ত বিনাবলম্বং স ব্রহ্ম তারাস্তর নাদরূপ ॥

গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে এই শ্লোকের উল্লেখ আছে (পৃ ৪০) ।

তাহার শেষে “স এব যোগী স গুরুঃ স সেব্যঃ” এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, ইহা
হঠপ্রদীপিকার দশম উপদেশ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে (গো. সি. স., পৃ. ৩৮),
উপনিষদের ব্রহ্মতারাস্তরই ‘তুর্ঘ্য-তুর্ঘ্য’ অবস্থা বা বিদেহমুক্তির অবস্থা ।

মণ্ডলব্রাহ্মণ্য উপনিষদে (৪।৩, ৪) জীব চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ত্যাগ করিয়া
পঞ্চবিংশতি তত্ত্বস্বরূপ ; এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া জীব নিজেকে
ষড়্-বিংশতি বা ‘অহম্ পরমাত্মা’রূপে জানিলে জীবমুক্ত হয় । যোগকুণ্ডল্য
উপনিষদে আছে, জীবমুক্ত যোগীর কাল অতীত হইলে দেহনাশের সময়ে
বিদেহমুক্তি অর্থাৎ অদেশমুক্তি হয় । ইহা পবনের নিম্পন্দতালাভের
স্থায় অবস্থা (৩।৩৩, ৩৪) ।

তেজবিন্দু উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে (১-৩২ শ্লোক পর্য্যন্ত) জীবমুক্তির
লক্ষণ ও (৩৩-৮১ শ্লোক পর্য্যন্ত) বিদেহমুক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ।
যে নিজেকে শুদ্ধচৈতন্যরূপে জানে সেই জীবমুক্ত এবং যে সেই শুদ্ধ
চৈতন্যস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই বিদেহমুক্ত । সেই পরমসত্তার
তুলনা নাই ।

বরাহ উপনিষদে (৪।১) মহামুনি স্বতুর দ্বাদশ বৎসরান্তে তপস্তার
ফলে জীবমুক্তির যে জ্ঞান হয় তাহার বর্ণনা আছে : “সপ্তভূমিষু জীবমুক্তা-
শ্চত্বারঃ” অর্থাৎ সপ্তভূমির প্রথম চারিটি—শুভেচ্ছা, বিচার, মনের সূক্ষ্মতা,
স্বাপত্তি জীবমুক্তির, তৎপরের দুইটি ভূমিতে ব্রহ্মকে উত্তরোত্তর জানিয়া

সপ্তম ভূমিতে ব্রহ্মবিদ হওয়া যায়। এইরূপে জীবন্মুক্তেরও চারি প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

বাহ্যজগতে লিপ্ত থাকিয়াও যিনি ব্যোমের ন্যায় নির্লিপ্ত, যাহার চিন্তে সংকল্প বা বিকল্প নাই, সুখদুঃখ নাই, যিনি নির্বিকার, তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি রাগদ্বেষহীন, হর্ষশোকাভীত, অহঙ্কারবর্জিত, যাহার চিন্তা অন্ধুর ও নির্মল তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি বাহ্যবিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট, নহেন তিনিই জীবন্মুক্ত।^১

উপনিষদের ন্যায় হঠযোগপ্রদীপিকাতেও (৪।১১) উক্ত হইয়াছে—

উৎপন্নশক্তিবোধস্ত ত্যক্তনিঃশেষকর্মণঃ ।

যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে ॥

অর্থাৎ যে যোগী কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিয়া নিঃশেষরূপে কায়িক ও মানসিক কর্ম পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত, তিনিই সহজাবস্থা লাভ করিয়াছেন। পরমবৈরাগা বা দীর্ঘকাল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা বুদ্ধিব্যাপার নিবৃত্ত হইলে যে নির্বিকার স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহাই সহজাবস্থা বা জীবন্মুক্তি। শক্তিবোধ ও সর্বকর্মপরিত্যাগ হইলে কোনরূপ যত্ন না করিলেও এই অবস্থা লাভ হয়।

সিদ্ধমতে বিদেহমুক্তি নাই, যোগের দ্বারা সিদ্ধযোগী প্রারন্ধ ক্ষয় করেন, কায়বাহ রচনা করিয়াও প্রারন্ধক্ষয়ের ক্ষমতা তাঁহার আছে (কায়সিদ্ধি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তৎপরে দেহ রাখা বা না রাখা তাঁহার ইচ্ছাধীন। এইরূপ জীবন্মুক্ত যোগীর পক্ষে বিদেহকৈবল্য অথবা সিদ্ধদেহ আশ্রয় করিয়া জগৎকল্যাণ সাধন এই দুইটা পথ খুলিয়া যায়, কৃতি অনুসারে পথগ্রহণ নিম্পন্ন হয়।^২

জীবিতকালেই সত্ত্বোমুক্তির অবস্থাকে সাধারণতঃ জীবন্মুক্তি বলে, প্রারন্ধকর্মবশে যে দেহ থাকে তাহার লয়প্রাপ্তি হইলে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি অব্যক্তে লীন হইয়া যায় এবং দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেহকৈবল্য হয়। জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির ভেদ উপাধিগত, বাস্তবিক নহে। যোগীর সিদ্ধদেহের তেজ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া

১। বরাহ উপনিষদ, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় মন্ত্রের ২১-৩০ শ্লোক।

বরাহ উপনিষদ এবং উপরোক্ত অন্যান্য উপনিষদের শ্লোকাদি ১০৮ উপনিষদ, নির্ণয়সাগর গ্রন্থ ১২৩২ হইতে গৃহীত।

২। দেবীমুক্তি চিন্তনীর, দুর্গাচৈতন্য ভারতী, কৃতিকা পৃ. ১৮০, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত।

অবস্থান্তর প্রাপ্তি সম্ভব, ডাঃ রমন শাস্ত্রী তাঁহার প্রবন্ধে তাহাকেই শুদ্ধমার্গের দিবাদেহ বলিয়াছেন—C. H. I. Vol. II দ্রষ্টব্য। সিদ্ধমতে দেহই আত্মা, বিক্ষেপ দূর না হইলে শুদ্ধদেহলাভ হয় না, শক্তিমুক্ত চৈতন্যকে সিদ্ধেরা স্বীকার করেন, তাহাকে জয় করিলে বিক্ষেপরূপ অজ্ঞান দূর হইয়া মুক্তিলাভ হয়। যোগী চৈতন্যশক্তিকে জয় করিয়া ‘কালজয়ী’ হন। যোগীর এই দেহই ‘যোগদেহ’। বৈষ্ণবের ‘ভাবদেহ’ও এইরূপ যোগদেহ, ইহা অপ্রাকৃত শুদ্ধদেহ। বৈষ্ণব ‘ভক্তি’ দ্বারা দেহ-শুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া ভাবদেহ অর্জন করেন। এই ভক্তি কি? ইহা গুরুকৃপায় জীবদেহে সঞ্চারিত চৈতন্যশক্তিবিশেষ। ইহা দ্বারা অপ্রাকৃত শুদ্ধদেহলাভ সম্ভব হয়, জ্ঞানীর পক্ষে এ দেহলাভ সম্ভব নহে। সিদ্ধমার্গে দেহ ভিন্ন আত্মার অবস্থান সম্ভব নহে মনে করিয়া দেহশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বা পুরুদেহের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

রামানুজ আদি বৈষ্ণবেরা বলেন, সকল বন্ধন নিবৃত্তিরূপা মুক্তি জীবদশায় প্রাপ্তি সম্ভব নহে, কেবল বিদেহ অবস্থাতে তাহা সম্ভব, মুক্তজীব বৈকুণ্ঠে ভগবানের কিঙ্কর, তাহাই পরমমুক্তি। এইরূপ মুক্তজীবে সর্বজ্ঞতা আদি সিদ্ধ হইলেও সে সৃষ্টিস্থিতিসংহার করিতে সক্ষম হয় না, অতএব অদ্বৈত মতানুযায়ী সে ভগবানের সহিত এক হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের সাধনে যে উন্নততম অবস্থা হয় তাহাই কাম্য। রামানুজ-মতে মুক্তাবস্থাতেও আত্মার শরীরে অবস্থান অনিবার্য, কিন্তু সেই শরীর শুদ্ধ ও অপ্রাকৃত। এই শুদ্ধসত্ত্বের নামান্তর পরমপদ, নিত্যবিভূতি, অমৃত, বৈকুণ্ঠ, ত্রিপাদবিভূতি ইত্যাদি। ইহা ভগবানের সেবার জন্ত গৃহীত হয়, ভগবানের কৈঙ্কর্য্যই পরমমুক্তি।^১ রামানুজ, নিস্বার্ক জীবমুক্তি স্বীকার করেন নাই, ‘বিদেহমুক্তি’ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের মতে মোক্ষের দুই অঙ্গ, তদ্ভাবাপত্তিঃ বা ব্রহ্মস্বরূপলাভ এবং আত্মস্বরূপলাভ। তদ্ভাবাপত্তি অর্থে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতালাভ নহে, ব্রহ্মসাম্যজ্বালাভ মাত্র। আত্মস্বরূপ লাভ অর্থে জীবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। আত্মস্বরূপলাভই ব্রহ্মস্বরূপলাভের কারণ। অবিচ্ছায়মুক্ত দেহাধীন জীবের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, অভিন্ন নহে। মুক্তিকালে জীবের স্বরূপনাশ হয় না, তাহার

বিকাশ হয় ও ধর্মেরও পূর্ণ বিকাশ হয়, তাই জীব ব্রহ্মের সমতুল হয়, ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মত।

সাংখ্যকার বলিয়াছেন বিবেক জ্ঞান হইলে এই জন্মেই মুক্ত হওয়া যায়, তাহাই জীবমুক্তি, কিন্তু ইহা কৈবল্য নহে। তথাপি এই প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষকে কেবলী বলিয়া জানা যায়। যোগসূত্রে (২।২৭), “তস্মা সপ্তধা প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা”র কথা আছে, সপ্তম ভূমিতে পুরুষকে গুণসংস্কৃতিত কেবলী অমল ইত্যাদি রূপে জানা যায়। এই সপ্ত প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা ভাবনাকালে যোগী জীবমুক্ত হন, কারণ তখন তাঁহার সংস্কার লেশমাত্র থাকে না। যোগীর প্রারম্ভ কর্মের নিষ্পাদন হইতে থাকে, তবে কর্মবন্ধন হয় না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যোগী হৃৎ-সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন। সম্যক্ চিত্তনিরোধ না করা পর্য্যন্ত যোগীকে জীবমুক্ত বলা হয়। চিত্তনিরোধে বিদেহকৈবল্য আশ্রয় হয়। জীবমুক্ত যোগীর ‘নির্মাণচিত্ত’ ধারণ করিয়া অবস্থান সম্ভব, নির্মাণচিত্ত দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক দেহধারণও সম্ভব। আবার সংস্কারলেশ হইতেও শরীরধারণ হয়, তাহারা নূতন কর্ম করেন না, সংস্কারশেষের প্রতীক্ষায় থাকেন। তাহাদের মুক্তি অর্থে হৃৎমুক্তি, “ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ”।^১ শরীরনাশ হইলে যে অবশ্যস্তাবী হৃৎত্রয় হইতে মুক্তি হয় তাহাই বিদেহমুক্তি; বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাকেই বাস্তবিক মুক্তি বলেন।

যোগসূত্রে আছে (১।১৯), “ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং”। ভব অর্থে সংস্কারবশে জন্ম। সংস্কারবলে তাহাদের চিত্তবৈরাগ্য নিরুদ্ধ হইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়াছে, তাহাদের নাম প্রকৃতিলীন। সাংখ্যসূত্রে আছে প্রকৃতিলীনদের মগ্নের ন্যায় পুনরুত্থান হয়, বৈরাগ্য-সংস্কার ক্ষয় হইলেই তাহাদের চিত্ত পুনরুত্থিত হয়। বিদেহলীন অর্থে দেহান্তে যিনি উপাশ্বে লীন হন বা যিনি দেহাহঙ্কারশূন্য হইয়া সানন্দ সমাধিতে বিরাজ করেন, দেহপাতে ইহারা লোকবিশেষে উৎপন্ন হইয়া ধ্যানসুখ ভোগ করেন। বিদেহলীনেরা দেহধারণে বিরাগযুক্ত, তথাপি বিদেহ প্রকৃতিলীনদের যে নিরোধ তাহা ভবমূলক, তাহার ফলে পুনরাবির্ভাব ঘটে। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয়ের সিদ্ধদের সম্যক্ বিবেকজ্ঞান হয় না, তথাপি বৈরাগ্যের দ্বারা কারণ লয় করেন বলিয়া

মোক্ষপদে থাকেন। সমাধিবলে শরীর সংস্কার অতীত হওয়াতে তাঁহাদের শরীর ধারণ হয় না, কিন্তু বিবেকজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকায় উচ্চতর লোকমধ্যে অভিনিবর্তিত হইয়া পরে প্রলয়ের সাহায্যে কৈবল্য লাভ করেন, কৈবল্যপদ সর্বলোকাভীত ও পুনরাবর্তনশূন্য।^১ বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের মোক্ষ বিদেহমুক্তির প্রকারভেদ।

ন্যায় ও বৈশেষিক ছুঃখনিবৃত্তিমাत्रে মোক্ষলাভের কথা বলেন, ইহা অভাবাত্মক; মীমাংসা, বেদান্ত, জৈন ও মহাযান বৌদ্ধ মোক্ষাবস্থায় যে ‘আনন্দ’ উপলব্ধির কথা বলেন তাহা ভাবাত্মক। বৌদ্ধ সহজিয়া বায়ুনিরোধের দ্বারা বোধচিন্তাকে দীপস্বরূপ করিয়া যে মহামুখ উপলব্ধির বর্ণনা করেন তাহাই জীবমুক্তের ‘আনন্দ’ উপলব্ধি। বৌদ্ধমতে ‘সোপাধিশেষ’ অবস্থা জীবমুক্তের অবস্থা, ইহাই নির্বাণ। ‘নিরূপাধিশেষ’ বা অনূপাধিশেষই বিদেহমুক্ত বা কৈবল্যমুক্তের অবস্থা।^২

দিগম্বরী জৈনেরা বলেন, আত্মা চতুর্দশ গুণস্থানের মধ্য দিয়া অবশেষে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই চতুর্দশ গুণস্থানের শেষ দুই অবস্থা জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তির অনুরূপ। এই অবস্থাদ্বয়ের নাম ‘সযোগীকেবলী গুণস্থান’ এবং ‘অযোগীকেবলী গুণস্থান’। সযোগীকেবলীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি হয়, তৎফলে তিনি বিশ্বগুরু হইতে পারেন, ইহাই তীর্থঙ্করের অবস্থা। অযোগীকেবলী কায়াহীন সিদ্ধদের মধ্যে অবস্থান করেন ও জাগতিক ব্যাপারে অলিপ্ত থাকেন। সযোগীকেবলীর প্রারন্ধের সহিত জ্ঞাতি, আয়ুভোগ থাকে, ইহার দ্বারাষ্ট শরীর রক্ষা হয়, প্রারন্ধের অন্তে শরীরের লয়প্রাপ্তি হয়। অযোগীকেবলী কায়াহীন।^৩

গীতাতে আছে জ্ঞানীব্যক্তি ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন, গীতাকার ইহাকে ব্রাহ্মীস্থিতি (২।৭২) বলিয়াছেন। মৃত্যুকালেও এই অবস্থালাভ হইলে ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আনন্দলাভ হয়। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করিলে মুক্তিলাভ অবশ্যস্তাবী (৩।১২, ৬।১)। এইরূপ নিকাম কর্ম্মই যোগী বা সন্ন্যাসী। এই সুখছুঃখহীন, সদাসন্তুষ্ট কামনাহীন যোগীই উপনিষদের বর্ণিত ‘জীবমুক্ত’।

১। পাতঞ্জল দর্শন ও টীকা পৃ: ২৪০—হরিহরানন্দ আরণ্য। (১৯৩৮)

২। উদয়নের ছারিকুহমাঞ্জলি (১ম অধ্যায়)—ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের প্রবন্ধ, S. B. S. Vol. II.

জীবমুক্তের স্বরূপ ‘তত্ত্ববটধানিকা’তে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

“যথা চ পশবো ভাস্তি তথা কেচন তাং নিজাম্ ।

অপ্রকাশদশাং স্তুস্তি দেহপ্রাণতদাস্বতাম্ ॥

তে প্রবুদ্ধাশ্চ পতয়ো জীবমুক্তা মহর্ষয়ঃ ।

তেষাং তন্তারতমোণ গুরুশিষ্যাদিতো স্থিতাঃ ॥”

জীবের স্বপ্রকাশভাব নিজের বিচিত্রস্বভাবহেতু দেহপ্রাণাদিরূপে আছে । কেহ কেহ দেহপ্রাণরূপ অপ্রকাশরূপ দশাকে হনন করেন, তাঁহারা প্রবুদ্ধ মহর্ষি জীবমুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে তারতম্যতাবশে গুরুশিষ্যাদি রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে ।

ভট্টবামদেব রচিত ‘জন্মমরণবিচারে’ আছে স্বরূপ পরামর্শ ই জীবমুক্তির উপায়, “অকৃত্রিমস্বরূপপরামর্শেন জীবমুক্তিমাশাশু কৃতকৃত্যতা-মালম্বন্তে সন্তঃ” ।^১

জীবমুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে প্রারম্ভ কর্তব্যভোগ করতঃ দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না ; যেমন ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে দেখেন, জীবমুক্তও সেইরূপ দৃশ্য জগৎকে দেখেন । আচার্য্যেরা বলেন, যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও সুষুপ্তের স্থায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সম্বন্ধেও যিনি অদ্বিতীয় দর্শন, বাহ্যকর্ম্য করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিরুপকর্ম্য, যিনি কেবল পূর্বসংস্কারবশে অভ্যন্তের স্থায় কার্য্য করেন, অভিমানপূর্বক কার্য্য করেন না, তিনিই আত্মজ্ঞ বা জীবমুক্ত, তদ্বিন্ন ব্যক্তি জীবমুক্ত নহেন ।^২

সুখ, শান্তি, পরমাত্মার সহিত মিলন, জীবমুক্তি প্রভৃতি একই আদর্শের বিভিন্ন রূপ । মানব প্রকৃতি দ্বারা বদ্ধ, অতএব উর্দ্ধে গমন ব্যতীত তাহার উপায় নাই, ইহা বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইতে পারে । মার্কণ্ডেয় ও তৎপরে মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষাদি হঠযোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিরোধের উপদেশ দিয়াছেন, বায়ুনিরোধে ইন্দ্রিয়সংযম হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তজ্জন্ম উপযুক্ত দেহধারণ কর্তব্য । বহির্মুখী ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হইলে সাধনের তীব্রতা অনুযায়ী শুদ্ধতা প্রাপ্তি হয় । সাধকের দেহমধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ বা কুণ্ডলিনীর জাগরণ গুরু-

১। তত্ত্ববটধানিকা—অভিঃ-৮ অঙ্ক বিবচিত ১১২০, ২৭

২। জন্মমরণবিচার—ভট্টবামদেব বিবচিত, শেষ পৃষ্ঠা ।

৩। বেদান্তসার—কালীদাস বেদান্তবাণিশ সংকলিত (সমাধিক যোগী বিবচিত) পৃ ১২০-২৩ ।

সহায়ে সম্পাদিত হয়, সেই জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখা সাধকের কর্তব্য। মনের শুদ্ধতা বিনষ্ট হইলেই চিন্তা অজ্ঞানের মধ্যে পুনরায় নিমজ্জিত হয়, ইহাকে ভবপ্রত্যয়, উপায়প্রত্যয়াদি বলা হয়। যাহাতে এই অবস্থা না হয় তাহার জ্ঞান সাধককে সচেতন থাকিতে হয়। এই নিমিত্ত ‘সিদ্ধদেহ’ ‘ভাবদেহ’ প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া প্রজ্ঞার স্থিতি সাধন কর্তব্য। যোগসূত্রের (৩।৫১) ভাষ্যে যোগীদের চারিপ্রকার অবস্থা বর্ণন করা হইয়াছে—প্রথমকল্পিক মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্ত ভাবনীয়। শেষোক্ত অবস্থায় চিন্তলয়ই একমাত্র অবশিষ্ট পুরুষার্থ থাকে, বিবেকখ্যাতি দ্বারা যোগী কৈবল্যপ্রাপ্ত হন, যোগমতে এই অবস্থাই যথার্থ জীবনমুক্তির অবস্থা। বিবেকখ্যাতি হইলেই যে তৎক্ষণাৎ সদাকালের জ্ঞান চিন্তানিবৃত্তি হয় তাহা নহে, কৈবল্যের জ্ঞান বিবেকখ্যাতিকে অবিপ্লবী করিতে হয়। খেচরীমুদ্রা-সাধনে যে দীর্ঘকালের জ্ঞান প্রাণরোধ সম্ভব হয় তাহাতে চিন্তাবৃত্তি নিরোধ হইলেও উহা কৈবল্য নহে। স্মৃতি প্রজ্ঞাদিপূর্বক সংস্কার ক্ষয় ও তত্ত্ব সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত কৈবল্যালাভ হয় না। খেচরী আদি সিদ্ধির দ্বারা একাগ্রভূমি সাধন হইতে পারে, চিন্তাকে সম্মুখে রাখিয়া দ্রষ্টৃস্বরূপ অবস্থান ও সঙ্কল্পনিরোধ সর্বশুদ্ধিলাভের মুখ্য উপায়।^১ ইহাই উত্তম সমাধি। এই ‘উন্মনী অবস্থাই জীবনমুক্তির কাম্য। নাথসিদ্ধগণ উন্মনী অবস্থালাভ বা অমনস্কপ্রাপ্তির কামনা করেন, তাই জীবনমুক্তিই নাথযোগীদের আদর্শ।

অপর ও পরামুক্তি

জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে অপরমুক্তি ও পরামুক্তি ভেদ করা হয়। উদ্যোতকর দুইপ্রকার নিঃশ্রেয়সের কথা বলিয়াছেন, অপর ও পর নিঃশ্রেয়স; তত্ত্বজ্ঞানই এই উভয়ের কারণ। জীবনমুক্তি অপর নিঃশ্রেয়স, বিদেহমুক্তি পর নিঃশ্রেয়স, “নিঃশ্রেয়সস্ত পরাপরভেদাৎ। যন্তদপরং নিঃশ্রেয়সং তৎ তত্ত্বজ্ঞানান্তরমেব ভবতি। * * * পরং চ নিঃশ্রেয়সং তত্ত্বজ্ঞানং ক্রমেণ ভবতি”।^২

১। যোগতারাবলী ১৯ লোক—পঞ্চম দাসীনদৃশা প্রশংসা সংকল্পমুদ্রার সাবধানঃ” পৃঃ ৩৭৭
যোগশাস্ত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

২। ভারতীয় দর্শন, পৃঃ ২৭১ বলদেব উপাধ্যায়।

আগমসম্মত পরামুক্তিই পূর্ণত্ব। আগম-মতে সাংখ্যের কৈবল্য বা বেদান্তের মুক্তিতে পূর্ণত্ব নাই। তত্ত্বালোকটীকায় (৪।৩১) জয়রথ বলিয়াছেন, বেদান্তের মুক্তি সবেচ্ছ প্রলয়াকল অবস্থার দ্বায়। সম্ভবতঃ তাঁহার মতে এই অবস্থায় আণবমল থাকিয়া যায়, ধ্বংসোন্মুখও হয় না। এই অবস্থা বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ বলিয়াও জয়রথ স্বীকার করেন না, কারণ বিজ্ঞানকলে আণবমল ধ্বংসোন্মুখ হয় বলিয়া উহাতে কৰ্ম জন্মায় না। কেহ কেহ বেদান্তমোক্ষকে বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ মনে করেন। বৈষ্ণবাদের মোক্ষ ঐ মতে প্রলয়কালের দ্বায়। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল মোহাদি-রূপভোগ হয় ও তৎপরে নূতন সৃষ্টিতে জন্ম হয়।’

মৎস্তেশ্বরের কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে শিবকে জীব বলা হইয়াছে। জীবই সেই পরম নিষ্কল, নিত্য, নিরাময় পরমাণু বা সর্বব্যাপী শিব। শিবই জীবন বা হংস, শক্তি পুঙ্গল, মন, প্রাণ ইত্যাদি এবং সর্ব প্রাণীর ‘সমীরপূরকো বায়ু’, দেহমধ্যে ইনি ‘জীব’, দেহমুক্ত হইলে ‘শিব’ (ষষ্ঠ পটল)। প্রকৃত মুক্তিতে পশুত্বের নিবৃত্তি ও শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। ভগবৎ-অনুগ্রহপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা জন্মিলে শক্তিপাতের দ্বারা পবিত্র সাধক স্বরূপলাভে সমর্থ হন।

তত্ত্বমতে পঞ্চকৃত্যকারী পরমশিবের জীবনের প্রতি অনুগ্রহফলেই জীবের মুক্তি হয়। এই মুক্তি দ্বিবিধ—নিরধিকার ও সাধিকার। প্রলয়ান্তে ও সৃষ্টির পূর্বে যে জগৎহীন স্বাপাবস্থা হয় তখন নিরধিকার মুক্তিলাভ হয়, ইহাই শিবত্ব। সংহারকালে ও স্থিতিকালে যোগাতানুসারে সালোক্যাদি পদপ্রাপ্তি হয় তাহাই ‘অপরমুক্তি’। শিবত্বপ্রাপ্তিই ‘পরামুক্তি’ বা শ্রেষ্ঠমুক্তিপদ। পরামুক্তির চারিটি অবস্থা—বন্ধ, বন্ধমুক্ত, আত্মা ও সর্বাশ্রা। তত্ত্ববটধানিকা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, পরামুক্তি পুনরাবৃত্তিবর্জিত। কিন্তু অশুদ্ধের দ্বী প্রাণ শূন্যে অবস্থিতির নিমিত্ত অপরমুক্তি, ইহারা জন্মমরণশীল (১।৩৩-৩৫)।

অতএব যে গতিতে পুনরাবর্তন নাই তাহা পরামুক্তি, যাহাতে পুনর্বার দেহধারণ অনিবার্য তাহাই অপরমুক্তি। দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি ভেদবশতঃ অপরমুক্তির বহু ভেদ আছে। পরামুক্তির দুইটি মাত্র ভেদ আছে, প্রথমটিতে মরণোত্তর ‘সত্তোমুক্তি’, দ্বিতীয়টিতে

‘ক্রমমুক্তি’। মৃত্যুকালীন ভাবনার উপরই জীবের পরা বা অপরগতি নির্ভর করে।’

জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যস্বাভাবী ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কালজয়ী রসেশ্বর সিদ্ধ ও নাথসিদ্ধেরা বলেন মৃত্যুকেও জয় করা যায়। তাহারা বলেন মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন, এই দেহকে জয় করিয়া অবিনাশী হইয়া জগতের কার্য্য করা সম্ভব। মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের সিদ্ধেরা বলেন এই দেহকেই কয়েকটা বিশেষ প্রণালী দ্বারা দেহান্তরে পরিবর্তিত করা যায়, যাহাতে কাল পূর্ণ হইলে সেই নূতন দেহ লইয়াই ভগবৎসকাশে উপনীত হওয়া ও সেখানে চিরস্থিতিলাভ করা সম্ভব হয়।

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি, মৃত্যুই মুক্তিলাভের মার্গ, কিন্তু সিদ্ধসম্প্রদায় বলেন, জন্মই কালচক্রের আবর্তন হইতে রক্ষা পাইবার উপায়। মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম হইবে, কিন্তু এই জন্মেই যদি সাধন দ্বারা এইরূপ দেহলাভ হয় যে মৃত্যু ঘটিবে না, তাহা হইলে জন্মমৃত্যুর কালচক্র হইতে অব্যাহতিলাভ হইল। সিদ্ধমাত্রেরই ইহাই প্রেয়। এ পৃথিবীতে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার উপর আমার কোন হাত নাই, কিন্তু পুনর্জন্ম রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, অতএব ‘মৃত্যুতেই মুক্তি’ এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, অতএব দেহসিদ্ধি দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে। সিদ্ধদেহ যোগী ‘জীবমুক্ত’, তিনি ইহজগতে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত, তিনি মৃত্যু ব্যতীতই ‘পরামুক্ত’ হইতে পারেন অর্থাৎ তাহার শুদ্ধদেহ লইয়াই এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন। ইহা কায়িক মৃত্যু নহে, ইহা গুরুর উপদেশে স্থূলদেহেরই পরিবর্তন এবং সেই দেহেই ইহজগৎ ত্যাগ। যে মৃত হয় সে মুক্ত নহে, ইহাই সিদ্ধমত। পরামুক্তের ‘দেহপাত’ হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ তিনটীই অশুদ্ধমায়ার দেহ, মানব স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার সময়ে তাহার সূক্ষ্মদেহ জলৌকাবে তৎক্ষণাৎ অন্য একটি দেহকে আশ্রয় করে। স্থূলদেহ আবরণস্বরূপ, অতএব একটি আবরণ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইলেই অন্য আবরণ গৃহীত হয়। কিন্তু মৃত্যুজয়কামী (যোগী) গুরুর উপদেশে অশুদ্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেহে পরিণত করেন, তৎফলে যে দেহ হয় তাহা ‘প্রণবতনু’ (ওঁকারদেহ), ইহা অমৃতপানে চির-

সঞ্জীবিত থাকে। 'প্রণবতনু'ধারী যোগীই 'জীবমুক্ত', অশুদ্ধ মায়িক জগতে বাস করিলেও তাঁহার সম্পর্ক শুদ্ধস্তরের সহিত। তাঁহার জাগতিক বিষয়ের সহিত যোগ স্থায়ী নহে, কারণ তিনি ইহার পর 'পরামুক্তি'লাভ করেন। জীবমুক্তের শুদ্ধমায়ার সিদ্ধদেহ ক্রমশঃ পরামুক্তের মহামায়ার দিব্যদেহে পর্যাবসিত হয়, ইহাই 'জ্ঞানতনু'। অতএব প্রণবতনু ক্রমশঃ জ্ঞানতনুতে স্থিতিলাভ করে। জীবমুক্তযোগী লোকের কল্যাণার্থে প্রণবতনু ধারণ করেন, এবং কার্যশেষ হইলে সকলের সাক্ষাতে দিবালোকেই স্বদেহেই অস্তর্হিত হন। অতএব এইরূপ দেহ শুদ্ধ হইতেই হইবে। ফলতঃ সিদ্ধসম্প্রদায়ে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা দেহশুদ্ধির সাধন প্রচলিত আছে।

দেহশুদ্ধির প্রক্রিয়াতে প্রথমতঃ দেহস্থ সূক্ষ্মতর কোষগুলির পর্য্যন্ত শুদ্ধীকরণ আবশ্যক। অঙ্গপাজপ, হঠযোগের প্রণালী ও রসেশ্বর সম্প্রদায়ের পারদাদির ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে অঙ্গর অমর দেহ লাভ হয়। এই দেহ বাহিরের ভোগ্যবস্তু দ্বারা পুষ্ট হয় না, পার্থিব জগতের উপর এই দেহ বা প্রাণ নির্ভর করে না। এই রূপান্তরগ্রহণ বা পরিবর্তনক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে যে দেহ লাভ হয় তাহাই সিদ্ধদেহ বা মন্ত্রতনু। ইহা তরবারির আঘাতেও কোনরূপে বিকৃত হয় না, এই দেহ দেখিতে অশুদ্ধ হইলেও ইহার ছায়াপাত হয় না বা ইহার পদচিহ্ন পড়ে না। ইহা স্পর্শ করাও যায় না। তথাপি কোন আগন্তুক তত্ত্ববক্তিত ব্যক্তি ইহাতে কোন অসাধারণত্ব দেখিতে পায় না।

যখন জীবমুক্ত সিদ্ধদেহ যোগী পরামুক্তিলাভ করেন তখন তাঁহার উপরোক্ত প্রকার প্রণবতনু বা বৈন্দব শরীর (ইহাই বিন্দু হইতে জাত দেহ বা মহাকারণ দেহ বা শুদ্ধ দেহ) পলকমাত্রে দিব্যতনুতে পর্যাবসিত হয়; এই দেহ মানবদৃষ্টির অগোচর, ইহাই 'জ্ঞানতনু'। এই একদেহ হইতে দেহান্তরে পরিণতি 'মৃত্যু' নহে, কারণ সিদ্ধসম্প্রদায় 'মৃত্যুজয়ী'। মানব যে মৃত্যুকে জয় করিতে অসমর্থ ইহা সিদ্ধেরা স্বীকার করেন না, ইহাকে মিথ্যা বলেন। সিদ্ধমতে দেহজয় না হইলে অর্থাৎ মৃত্যুহীন দেহ লাভ না হইলে মুক্তির কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অতএব সিদ্ধেরা এই জগতেই বাস করিয়া মৃত্যুজয়ের সাধনায় ব্রতী হন এবং কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ স্থিতির পরিচয় না দিয়া অস্তর্হিত হন। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে অনিচ্ছুক বলিয়াই জীবমুক্ত যোগী

সাধারণ ব্যক্তির। যতদিন জীবিত থাকে, সেইভাবেই দেহ ধারণ করিয়া বাস করেন (পৃ ৩১১)। অস্থিহিত হইয়াও সিদ্ধযোগীরা জাগতিক মানবের নিকট আবির্ভূত হইতে পারেন। অগস্ত্য প্রভৃতির এইরূপ বহু বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে (C. H. I., Vol. II., Shastri's article)। (গোরক্ষের সহিত কবীরের মিলনও এই জাতীয় আবির্ভাব বলা যাইতে পারে, কারণ সিদ্ধদেহী কাল জয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন।)

সিদ্ধমার্গের দর্শন সংক্ষেপে বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে রূপ বিনা প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভবে না, রূপ অর্থে দেহ বা পিণ্ড ধারণ, এই দেহ বস্তুজাত, সেই বস্তু অনৈসর্গিক বা নৈসর্গিক উভয়ই হইতে পারে। একটী দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ অপর একটী দেহকে আশ্রয় করে। এই দেহ সাধারণতঃ নশ্বর, কিন্তু প্রাণের ক্রিয়াদ্বারা ইহাকেই অবিদ্বন্দ্ব করা সম্ভব। অস্থায়ী রূপকে ধারণ করিয়া রাখিতে প্রাণের নিরন্তর চেষ্টার ক্রটি নাই, অস্থায়ী রূপ হইতেই অনন্তকাল স্থায়ী রূপের উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের এই তাড়নার বিরাম নাই। আত্মার স্থিতির নিমিত্ত দেহের আবশ্যকতা আছে। মুক্তিই যদি কাম্য হয় তবে এই দেহকেই চিরস্থায়ী করা কর্তব্য, যে দেহ ধারণ হইয়া গিয়াছে তাহাকে পতিত হইতে দিব না ইহাই সাধনা হইবে। যদি চিরস্থায়ী করিবার জন্য উপযুক্ততর দেহধারণ আবশ্যক হয় তবেই দেহপাত হইতে দিব, অন্যথা নহে, ইহা সিদ্ধদের সিদ্ধান্ত। ইহজন্ম দ্বারাই তাহারা কালজয়ে চেষ্টিত।

নাথসিদ্ধেরা তাঁহাদের অলৌকিক সাধনের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে বিশেষভাবে আদৃত হন। তাঁহারা পদার্থ-রসায়ন প্রক্রিয়া (physico-chemical process) দ্বারা মানবদেহকেই অমরত্ব দান করিতেন, ইহা দ্বারা অষ্টসিদ্ধিও লাভ হইত। ইহাদের প্রক্রিয়ার সহিত রসেশ্বর সিদ্ধদেরও সাদৃশ্য আছে। ইহারা পারদ ও অভ্রক রসায়নযোগে দেহকে প্রতিক্ষেপণ, পরিচ্ছন্ন, ও প্রক্ষেপণ (reverberating, cleansing, projecting) করিতে নিপুণ। (C.H.I., Vol. II., Shastri's article)।

বীরমহেশ্বর সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থানুযায়ী নাথসিদ্ধ গোরক্ষ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে কোন মহেশ্বর সিদ্ধের সাফাৎ লাভ করেন। এই সিদ্ধ শুদ্ধমার্গের জীবমুক্তির দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।



গোরক্ষ ইহার নিকট জীবমুক্তি ও পরামুক্তির রহস্তে দীক্ষালাভ করেন। (লিঙ্গধারণচন্দ্রিকায় পৃ ৩৩৫-৩৭, ৪১ গোরক্ষ ও আলমপ্রভুর প্রমোদিত আছে।)

নবনাথের প্রত্যেকে দশ কোটি রসায়নবিদের প্রধানরূপে গণ্য, ইহারা জরামৃত্যুনাশ, বিষের স্ফারণ, ক্ষমতাহরণ প্রভৃতিতে বিখ্যাত ছিলেন। ইহারাই নবকোটি সিদ্ধরূপে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে নাথসিদ্ধদের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ছিল না, ইহারা রসেশ্বর সম্প্রদায়ের সিদ্ধ। মতান্তরে ইহারা খৃষ্টপূর্বকালীন দেশ হইতে আগত 'ভোগের' শিষ্য। ইনি Laotse-এর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভোগ এই সিদ্ধমার্গ দাক্ষিণাত্যে শৈবাগমী ও শাক্তাগমীদের শিক্ষা দেন, এইরূপ প্রবাদও আছে। শুদ্ধমার্গের মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের 'অষ্টাদশ সিদ্ধ' দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধসংখ্যা দ্বারা পুষ্ট। মূলা বা শ্রীমূলানাথ প্রভৃতি শুদ্ধমার্গের 'জ্ঞানসিদ্ধ'দের মধ্যে অগ্রতম; সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, পতঞ্জলি ও ব্যাগ্র পদের সহিত ইনি স্বর্গ হইতেই দীক্ষালাভ করেন। 'ভোগ' ও 'মূলা' অগ্র পঞ্চসিদ্ধের সহিত মিলিয়া সপ্ত শুদ্ধমার্গের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা সন্ন্যাসমার্গ। (লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে, পৃ ৩৪২ শুদ্ধমার্গের ও প্রকৃতসিদ্ধির কথা আছে।)

ভোগ অগস্ত্যের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন, একরূপ মতও প্রচলিত আছে। অগস্ত্য শুদ্ধমার্গের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, তিনি খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টজন্মের পরেও স্থলদেহেই বহু অলৌকিক সাধন দেখাইয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধকূটপর্বতে ইহার আবাস ছিল। তিনি উত্তরভারতের হিমালয় অঞ্চল হইতে দাক্ষিণাত্যে আসেন। ভোগেরও দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তাঁহার Taoism-এর স্বল্পসংখ্যক অধিকারী থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে শুদ্ধমার্গের প্রচার তাঁহার দ্বারাই হয়। ইহার এক শিষ্য মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান ইত্যাদি অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া সকলের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যান। সিদ্ধমার্গের 'মুক্তি' অর্থে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, ইহাই সিদ্ধদের সিদ্ধান্ত। ইহাই আগমের রহস্ত, শুদ্ধমার্গেরও ইহাই লক্ষ্য। অতএব সিদ্ধদের 'দেহপাত' হয় না, তাঁহারা দেহসহ অদৃশ্য হন। তামিলভাষায় রচিত কালদহন-তন্ত্র, মৃত্যুনাশক-তন্ত্র আদিতে শুদ্ধমার্গের নীতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই মানবের দেহান্তর প্রাপ্তি ও অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা লাভ হয়। সামবেদের

অন্তর্গত ব্রহ্মজাবল উপনিষদে যে মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহা মৃত্যুকে জয় করিবার ও দেহকে রূপান্তরিত করিবার উপদেশ।^১

প্রণবই কুণ্ডলিনীর স্পন্দন, অতএব ‘প্রণবতমু’ লাভ অর্থে কুণ্ডলিনীর প্রবুদ্ধ হওয়া। রসেশ্বর ও নাথমার্গে এই দেহকেই স্থায়ী করিবার সঙ্কল্প দেখা যায় অর্থাৎ আয়ুবুদ্ধি লক্ষ্য, মাহেশ্বর সম্প্রদায় (ইহাদের শুদ্ধ আশ্রায় অর্থাৎ শুদ্ধ নিয়মাবলী) মধ্যে দেহকে শক্তিতে পরিণত করাই লক্ষ্য, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধদেহ লাভ হইবে তাহা দিব্যদেহ হইলেও চিরস্থায়ী নহে, তাহা অদৃশ্য হয় এবং ভগবানের দিব্যতেজে মিলিত হইয়া যায়, সেখানে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। কৈবল্য, হংস, ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদাদিতে এই শুদ্ধমার্গের বর্ণনা আছে।

১। "The Doctrinal Culture & Tradition of the Siddhas, Dr. Raman Shastri, C. H. I. Vol. II, p. 303 ff.

নবম পরিচ্ছেদ

গুরুপরম্পরায় নাদ ও বিন্দুসন্তান

শ্রীগুরু আদিনাথ, মৎস্যেশ্বরনাথ, তৎপুত্র উদয়নাথ, দণ্ডনাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, কুর্শ্মনাথ, ভবনার্জি, তস্তা শ্রীগোরক্ষনাথ ঈশ্বরসন্তান আদিব্রাহ্মণ সৃষ্টিবেদী অদ্বৈতোপরি সদানন্দদেবতা, অনাহতশৃঙ্গী খেচরীমুদ্রা মুদ্রা—ইহাই গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে (পৃ ৪০) নবনাথের পরিচয়। কল্পক্রমতন্ত্রে শ্রীগোরক্ষসহস্রনাথস্তোত্র আছে, গোরক্ষনাথকেই তাহাতে বিধিবিষ্ণু শিব বলা হইয়াছে এবং নবভাবে নবনাথের নাম করা হইয়াছে, যথা—মন্ত্রনাথ, ধ্যাননাথ, নিত্যানাথ, পূর্ণনাথ, ছাতিনাথ, সৃষ্টিনাথ, স্থিতিনাথ, হারনাথ, রামনাথ। গোরক্ষমন্ত্র বিনা সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবে না।^১

অন্যত্র “নবনাথাঃ—বিন্দুসন্তানমীশ্বরঃ। চত্বারো গুরবঃ। মৎস্যেশ্বর ঈশ্বর চতুরঙ্গী, গোরক্ষ ইতি স্বরূপাঃ” বলা হইয়াছে।^২

সাধারণতঃ পুত্রকে শিষ্যের অধিক প্রিয় বলা হয়, কিন্তু যোগসম্প্রদায়ে ইহার বিপরীত মত প্রচলিত। “যোগসম্প্রদায়ে শিষ্যোহধিকো যো নাদাংশো জায়তে”। কারণ নাথাংশই নাদ এবং নাদাংশ প্রাণ, শক্তি অংশ বিন্দু, বিন্দু অংশ সন্তান। যোগসম্প্রদায়ে বিন্দু হইতে জাত সন্তান বা বিন্দুসন্তান অপেক্ষা নাদ হইতে জাত সন্তান বা নাদসন্তান অর্থাৎ শিষ্য (যাহাকে নাদান্তসন্ধানের দীক্ষা গুরু দান করিয়াছেন) প্রিয়তর (পৃ ৫৮)। নাথ হইতে দ্বিপ্রকার সৃষ্টি হয়, নাদরূপা ও বিন্দুরূপা, তন্মধ্যে নাদরূপা শিষ্যক্রমেণ বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ। নাদ হইতে নবনাথের উৎপত্তি ও বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম (পৃ ৭২, গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ)।

তন্ত্রমতে পরমেশ্বর বা পরশিব গুরুপরম্পরায় মূল বা আদি। পরমেশ্বর স্বয়ং এক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গুরুপদবাচ্য হন, ভূমিকান্তর গ্রহণে শিষ্য হন। তাহার গুরুরূপই সদাশিবরূপ, শিষ্যরূপই ঈশ্বররূপ। ঐ উভয় রূপই শিবের স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশার্থে শিব এই

দ্বিবিধরূপ গ্রহণ করেন। ঈশ্বর বা পরমাত্মা (অপরশিব) সাড়েতিন ক্রোড় মন্ত্ৰের অধিপতি ও পঞ্চমন্ত্ৰাত্মক। তিনি পরমশিব হইতে যে মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হন পরজ্যোতি হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহা স্বরূপতঃ দৃষ্ট হয় না। ইহা ধ্বনিকরূপ অর্থাৎ নাদবিমর্শময়, তথা অপ্রমেয় ও বিশ্বব্যাপক। ইহা অকারাদি কলাদ্বারা প্রস্তুত নহে। ঈশ্বর ঐ মহাজ্ঞানকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত জীবের আশ্রয় অনুসারে পৃথকরূপে প্রথিত করেন। যাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হন তাহারা যথাক্রমে অষ্টবর্গে বিভক্ত মাতৃকামণ্ডল, সম্পূর্ণ মন্ত্ৰগণ ও অনন্তাদি মন্ত্ৰেশ্বর। ইহারা মায়ায় উদ্ধে অবস্থিত। শ্রীকণ্ঠাদি অষ্ট কঙ্কবাসী রুদ্রগণ অনন্তের শিষ্য। তন্ম্বের উপদেষ্টা শঙ্কর শ্রীকণ্ঠের শিষ্য, উমা শঙ্কর হইতে বিশ্বোপরি অনুগ্রহ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উমার শিষ্যমধ্যে দিব্য, মিশ্র ও আদিব্য এই তিনপ্রকার গণ আছে, দিব্যগণে রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণ আছেন, মিশ্রগণে প্রধানতঃ ঋষিগণ ও আদিব্যগণে মনুষ্য আছে।^১

দশম পরিচ্ছেদ

জরামৃত্যুর রহস্য এবং উহা হইতে অব্যাহতি

পাক্‌ভৌতিক দেহ জরামরণশীল, তথাপি মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, অজরত্ব কামনা করে। সিদ্ধগণ কেবল অজরত্ব নহে, অমরত্বলাভেরও প্রয়াসী। কথিত আছে, স্বর্গের দেবতারা অমৃতপানে অমর হইতেন, নাথসিদ্ধরাও খেচরীমূত্রাসাধন দ্বারা অমৃতপান করিয়া অজর অমর হইতেন। প্রাচীন অগ্ন্যায় সম্প্রদায় মধ্যেও জরামৃত্যু জয়ের নিমিত্ত নানাপ্রকার সাধন ছিল, যথা রসেশ্বর সম্প্রদায় পারদের সহযোগে অজর হইতেন, পারদের নামাস্তর রস, তাই তাঁহারা রসেশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন। ঋগ্বেদে বিশ্বাসীদের মধ্যেও পারদের ব্যবহার ছিল, চীনদেশেও দেহসাধনপ্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। ইহাদের সাধনপ্রণালীর সবিশেষ আলোচনা এই নিবন্ধের সাধনা অংশের ‘কায়সিদ্ধি’ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গোরক্ষসংহিতায় বায়বীমূত্রা, অগ্নিনীমূত্রা ইত্যাদি দ্বারা জরামৃত্যু নাশের উল্লেখ আছে—“ইয়ন্ত পরমা মূত্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী” ; অন্তত্র “অকালমরণং হরেৎ” ।^১

মুখমণ্ডলকে বিস্তৃত করিয়া জিহ্বার মূলভাগকে প্রচালিত করিয়া ক্রমে শরীরস্থ অমৃত পান করিলে—

বলিতং পলিতং নৈব জায়তে নিত্যযৌবনং

ন কেশে জায়তে পাকো যঃ কুর্য্যামিত্যমাণু কীং ॥^২

অগ্ন্যায় মূত্রা সাধন দ্বারাও উক্তরূপ ফললাভের বর্ণনা আছে, অতএব নাথসিদ্ধেরাও যে জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতিলাভের জন্ত সাধন করিতেন ইহা নিশ্চিত।

গোরক্ষরচিত ‘হঠপ্রদীপিকা’ গ্রন্থে আছে “অন্তর্লক্ষ্যাবিলীনচিত্ত-পবনো যোগী যদা বর্ততে দৃষ্ট্যা নিশ্চলতারয়া বহিরসৌ পশ্চন্নপশ্চাত্যপি। মুদ্রেয়াং খলু শাস্তবী ভবতি সা যুগ্মংপ্রসাদাদ্ গুরোঃ শূন্যশূন্য-বিবজ্জিতং ক্ষুরতি যন্তবৎ পদং শাস্তবম্ ॥ অর্কোদঘাটিতলোচনঃ স্থিরমনা

১। গোরক্ষসংহিতা ১।১২৮, ১৩২

২। ঐ ১।১৪৪ মাতৃকী মূত্রার ফলকথন।

নাসাগ্রদন্তেক্ষণঃ চন্দ্রার্কাবপি লীনতামুপনয়ন্নিষ্পন্দভাবাস্তরে । জ্যোতি-
রুপমশেষবাহুরহিতং দেদীপ্যমানং পরং তৎ তৎপদমেতি বস্তু
পরমং বাচ্যং কিমত্রাধিকম্ ॥^১ অর্থাৎ যোগী মনঃপ্রাণ বিলীন
করিয়া, নিশ্চল নয়নে বাহ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াও বিষয়গ্রহণ করে না,
ইহাই শাস্ত্রবীমুদ্রা । এই মুদ্রা প্রাপ্ত হইলে যোগী অনির্বচনীয়
পদলাভ করে । নয়নদ্বয় অর্দ্ধউন্মীলিত করিয়া মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক
নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া চন্দ্রসূর্য্য বিলীন করিবে, অর্থাৎ প্রাণ
ব্যাপার স্তম্ভিত করিবে । এইরূপ করিলে জ্যোতির স্থায় অখিল-
প্রকাশক সর্ব্বকারণ দেদীপ্যমান, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপের জ্ঞান হয়,
যোগী স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, অস্ত্র বিশেষ বস্তুলাভ হয় ইহা বলা যায়
না, ইতোহধিক বক্তব্য নাই । এইরূপে পরমবস্তুর সন্ধান পাইয়া সেই
আত্মসাক্ষাৎলাভমূলক দেহকে অজর অমর করিবার ইচ্ছা সাধকের
মনে দেখা দেয়, তখন সাধক খেচরীমুদ্রা সাধন করেন, তাহার দ্বারা
সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিনিরোধ হয় এবং কদাচ মৃত্যু ঘটে না । ইড়াপিঙ্গলা
নাড়ীর মধ্যে যে নিরালম্ব স্থল আছে অর্থাৎ শূন্য বা আকাশ স্থান আছে,
সেই শূন্যস্থানে বা ব্যোমচক্রমধ্যে যে মুদ্রা আছে তাহারই নাম 'খেচরী'-
মুদ্রা । এই খেচরীমুদ্রা দ্বারা চন্দ্র হইতে অমৃত উদ্ধৃত হয় । খেচরী মুদ্রা
শিবের অতি প্রিয় । এই খেচরীমুদ্রা সর্ব্বনাড়ীপ্রধানা সুষুম্নাকে পশ্চিম
মুখে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে । খেচরীসাধনে চন্দ্রসূর্য্যের নিরোধ হেতু
আয়ুক্ষয়কারক 'কাল' থাকে না ।^২

ইড়াং চ পিঙ্গলাং বন্ধা বাহয়েৎ পশ্চিমে পথি ।

অনেনৈব বিধানেন প্রয়াতি পবনো লয়ম্ ।

ততো ন জায়তে মৃত্যুর্জ্বরারোগাদিকং তথা ॥

বন্ধত্রয়মিদং শ্রেষ্ঠং মহাসিন্ধৈশ্চ সেবিতম্ ॥^৩

অর্থাৎ জালন্ধারবন্ধ, উড্ডীয়ানবন্ধ ও মূলবন্ধ এই ত্রিবিধ বন্ধ দ্বারা প্রাণবায়ুর
লয় হয় । মূলস্থান বা আধারস্থান সমাক্ আকৃষ্ট করিয়া নাভির
অধোভাগে পশ্চিম তানাখ্য বন্ধরূপ উড্ডীয়ানবন্ধ করিবে । অনন্তর
ইড়াপিঙ্গলা বন্ধ করিয়া অর্থাৎ জালন্ধারবন্ধ দ্বারা সুষুম্নাতে প্রাণবায়ুকে

১ । গো. সি. স. পৃ ৩৬, হ-বো-প্র ৪১৭, ৪১ তুলনীয় ।

২ । হ. বো. প্র., টীকা—৪১৪-৪৮

৩ । হ. বো. প্র., ৩৭৪—৭৬

প্রবাহিত করিবে। প্রাণ সুষুম্নাতে স্থির হইলে সাধকের শরীরে জরা কিম্বা কোনপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে না, এবং তাহার মৃত্যু ঘটে না। মৎস্যেন্দ্রাদি মহাযোগিগণ ও বশিষ্ঠাদি মুনিগণ সকলেই উক্ত বন্ধত্রয়ের সেবা করিয়াছেন। হঠযোগসাধনে যতপ্রকার উপায় আছে তাহার মধ্যে উক্ত বন্ধত্রয়কে গোরক্ষাদি সিদ্ধিজনক মনে করেন। বিপরীত-করণীমূত্রা দ্বারাও যোগীরা চন্দ্রামৃত পান করেন। নাভিদেশে যে সূর্য্য আছে তাহা চন্দ্রামৃত গ্রাস করে, তৎফলেই জরামৃত্যু হয়, এই মূত্রা দ্বারা তাহা রোধ হয়।^১

চন্দ্রের অমৃতকলা হইতে যে স্রাবের বর্ষণ হয় তাহা মধু অপেক্ষা মিষ্ট, তাহা পানে চিরযৌবনপ্রাপ্তি হয়। অমৃত কলাতে ষোড়শী নাম্নী শক্তি বিরাজ করেন, এই শক্তি সহস্রদল কমলের পরমাত্মার আত্মাস্বরূপ। সহস্রদল কমলে নিম্নে দুইটি কেন্দ্র আছে, একটির নাম অমৃতকলা, অপরটির নাম মৃত্যুকলা, একটি জীবনের পূর্ণিমাশ্বরূপ, অন্যটি অমাবস্ত্যাশ্বরূপ। ষোড়শীশক্তি ষোড়শীকলা নামেও পরিচিত। পরাশক্তি বিমর্শরূপা, তাহার পঞ্চদশ কিরণ পঞ্চদশী শক্তিশ্বরূপা। এই বিমর্শাখ্যা মহানিত্যা পরাশক্তি পঞ্চমহাভূত দ্বারা প্রকটিত। পঞ্চমহাভূতের পঞ্চদশ গুণ, আকাশের একগুণ শব্দ, বায়ুর দুইগুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের তিনগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ, জলের চারিগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস, পৃথ্বীর পঞ্চগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সর্ব্বসমেত পঞ্চদশগুণ। ইহাদের পঞ্চদশ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে, ইহারাই পঞ্চদশ তিথিরূপে চন্দ্রের পঞ্চদশকলা, শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ইহাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ষোড়শীকলা পরশিবাভিন্না মহানিত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণী। ইহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয়ও নাই, ইহাই অমৃতকলা, মহাদেব ইহাকেই মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রের অমৃতকলা হইতে অমৃতস্রাব হইয়া ঔষধিরা প্রাপ্ত হয়, উহা ভোজনে মনুষ্যশরীর পুষ্ট হয়, ঔষধি দ্বারা দেবতারও যজ্ঞ হয়। চন্দ্রের পঞ্চদশতিথি, পঞ্চদশ নিত্যা নামে খ্যাত। ষোড়শীনিত্যার পূজা ত্রিকোণান্তর্গত মধ্যবিন্দুতে সাধিত হয়, এই নিত্যার নাম 'মহাত্রিপুরা-সুন্দরী'। এই ষোড়শীকলার উপর চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে।^২

১। হ-যো-প্র ৩৫২, ৭৭ ২। কল্যাণ সাধনাক্ষ ২য় খণ্ড, পৃ ৮৫৭-৫৮ পঞ্চদশকলায়ক পঞ্চদশ তিথিরূপী নিত্যা ও ষোড়শী বা অমৃতকলার বিচার"। প্রবন্ধ—শ্রীকৃষ্ণজী কালীনাথ শাস্ত্রী।

এই ষোড়শীনিতার সহিত নাথসিদ্ধদের সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ কুণ্ডলিনীর জাগরণ নাথসিদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অমৃতকলার নিম্নমুখী সূত্র কুণ্ডলিনীতে আবদ্ধ থাকে, এই কুণ্ডলিনীর জাগরণে অমৃতকলার সন্ধান পাওয়া যায়। অমৃতকলার সন্ধানীর জীবনমৃত্যু তাহার স্ব-অধিকারে, কারণ অমৃতপানে সে দীর্ঘায়ু হয়, ও মৃত্যুকে দূরে রাখিতে সক্ষম হয়। মৃত্যুঞ্জয়ী যোগী জিহ্বাতল তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ছিন্ন করিয়া কণ্ঠকূপ মধ্যে জিহ্বাকে প্রসারিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া অমৃতপান করেন, ইহাই খেচরীমুদ্রা নামে খ্যাত।

ঘটাকোটী কপোল কোটির কুটী জিহ্বাগ্রমধ্যাশ্রয়া

চ্ছদ্বীণা গত রাজদন্তবিবরং প্রান্তোদ্ধবক্ত্রেণ যৎ।

অর্থাৎ আলজিভ্‌থাস্তে মুখবিবরে কুটিল জিহ্বাগ্র প্রবেশ করাইবে।^১ রাজদন্তান্তরে শঙ্খিনীমুখ আছে। রাজদন্তবিবর হইল Nasopharynx। মহাপুরুষলক্ষণ বিচার মধ্যে প্রভূতজিহ্বতা অর্থাৎ দীর্ঘজিহ্বা থাকা সুলক্ষণরূপে গণ্য হইয়াছে। (সাধনা অংশে গুরুত্ব ও সৎগুরু মহিমা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

সহস্রার-ক্ষরিত চন্দ্রামৃত ইড়াপিঙ্গলা ধারায় প্রবাহিত হইয়া মূলাধারে সূর্য্যে পতিত হইলে অমৃত গরলে পরিণত হয় তাই মানবের জরা ও বার্দ্ধক্য দেখা দেয়। কালজয়ী যোগী এই অমৃতকে গরলে পরিণত হইতে দেন না, স্বয়ং সেই অমৃত পান করিয়া জরা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। দেহমধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য অমরত্ব ও বিনাশত্ব নির্ণয় করে, ইহারাই পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক। দেহমধ্যস্থ ওজসূই অমৃত, ইহা বিন্দু বা শুক্র, ইহার সংরক্ষণে অজর-অমরত্ব লাভ হয়, ইহার বিনাশে মানব মৃত্যুমুখী হয়। যোগী প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা ইহা সংরক্ষণে যত্নবান হন। তাই সন্তকবি বলিয়াছেন—

গোরক্ষ সো জিন গোয় উঠালী করতী বার ন লাগে।

পানী পবন বন্ধি রাখে, চন্দ্র সুরজ মুখ দীয়ে ॥^২

অর্থাৎ তিনিই গোরখ যিনি গুপ্তধন আবিষ্কারে বিলম্ব করেন না, পবন ও বিন্দুকে যিনি বাঁধিয়া রাখেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে মিলিত করেন।

বাম নাসিকাবাহিত বায়ুকে চন্দ্রবাহিত, দক্ষিণ নাসিকাবাহিত

বায়ুকে সূর্য্যবাহিত এবং উভয় নাসিকা দ্বারা পর্যায়ক্রমে বাহিত বায়ুকে সূর্য্যবাহিত বলে। পূরক, রেচক ও কুস্তক দ্বারা প্রাণায়াম সাধনে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন। ব্রহ্মরন্ধ্রে কুণ্ডলিনী পৌঁছিলে উন্নয়ন অবস্থা হয়, অনাহত নাদ শ্রুত হয় এবং কালজয়ী অমৃতের ক্ষরণ হয়। বেদান্তীর ইহাই ‘তুরীয় অবস্থা’। কবীরও বলিয়াছেন—

উলটি পবন চক্রষট্বেধা, মেরুডণ্ড রসপূরা।

গগন গরজি মন সুমি সমানা, বাজী অনহদ তুরা ॥^১

অর্থাৎ উল্টাপবন সাধন দ্বারা ষট্চক্রভেদ হইয়াছে, মেরুদণ্ড রসে পূর্ণ হইয়াছে, মন শূন্যে বিলীন হইয়াছে, গগনে গরজন হইতেছে, অনাহত নাদ শ্রুত হইতেছে।

যে মরজীবা অমৃত পীবা, কাধসিমরৈ পতাল।

গুরুকী দয়া সাধুকী সংগতি, নিকসিআউ যহিকাল ॥^২

অর্থাৎ মরণশীল জীব সংসারধর্ম্য করিয়া পাতালে প্রবেশ করে, গুরুর দয়ায় ও সাধুসঙ্গে সে অমৃতপান করিয়া ইহজীবনেই সংসার হইতে মুক্ত হয়।

উল্টামার্গে বা মৌনের মার্গে চলিয়া (কারণ মৎস্য নদীর গতির উল্টা দিকে চলে), ফুলকে আবার কলিতে পরিণত করার কথা অর্থাৎ বৃদ্ধের আবার তাকুণ্যপ্রাপ্তির কথা গোরখবাণীতে (পৃঃ ৪০) দৃষ্ট হয়। উল্টামার্গে চলিলে চন্দ্র হইতে রসাস্বাদন সম্ভব হয়। গোরখনাথ আকাশমণ্ডলের রূপ গায় অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দভূতিকে দোহন করিয়া পান করে, নিঃসার বস্তুকে মন্দন করিয়া অমৃত পান করে এবং নির্ভয়ানন্দে জীবিত থাকে (ঐ পৃ ১১৩, শ্লোক ২১ আরম্ভ)।

গোরক্ষ বলেন দশমীদ্বারে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) স্বর্গ ও মোক্ষপদ (শিবস্থান, কেদার) আছে (ঐ পৃ ১১০)। মৃত্যুকালে দেহমধ্যে বহির্মুখ নবদ্বারের একটা দ্বার দিয়া প্রাণ বহির্গত হয়, মৃত্যুর উত্তরকালীন গতিও ইহার উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মরন্ধ্র বা দশমীদ্বার হইতে স্বাভাবিক নিষ্ক্রমণ হয় না, যোগী এই পথেই নির্গমের সাধনা করেন, কারণ তাহা হইলে পুনর্জন্ম হয় না। ছিদ্ৰপূর্ণ কলসের ছায় নবদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া দশমীদ্বার দিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাই মুদ্রা দ্বারা বাহ্যদ্বার রুদ্ধ করিবার

১। কবীর গ্রন্থাবলী, পৃ ২০, ৭, হামফ্রিসের দান। উল্লেখ বাড়ান পৃ ১৪০ নির্ভর্ণসম্প্রদায়।

২। কবীরের সাধী ৩০১ নং পৃ ৩০০, কবীরের ‘বীজক’, রেবা সংস্করণ

প্রণালী যোগীরা সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও (পৃ ৩৫৯) শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা উক্ত হইয়াছে—

ইড়াপিঙ্গলা শুষুমা সন্ধী ।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী ছুয়ারে দিল কপাট ।
এবে চড়িলো মো সে যোগবাট ॥

বাহুদ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগী সমাধিস্থ হইলে যে আবেশ ভাবের উদয় হয়, তাহাই দশমী ছুয়ার বা দশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, তাহা দ্বারা বাহুজ্ঞান লুপ্ত হয় ও সর্ব দ্বারপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কুন্তুক দ্বারা সকল নাড়ী শুষুমাতে একীভূত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে সঞ্চরণশীল বায়ু সমরসীভূত হইয়া একমাত্র ‘প্রাণ’রূপে পরিণত হয়, ইহাই ‘নাড়ী-সামরস’। ইহার পর শুষুমা নাড়ীকে উর্দ্ধশ্রোতা ভাবনা দ্বারা গ্রন্থিসকলকে উর্দ্ধমুখী ও বিকশিত করিতে হয় ; দেহস্থ গ্রন্থি বা পদ্য সঙ্কোচবিকাশশীল।

বাহুজগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইলে প্রাণেরও প্রত্যাহার স্বভাবতই হইয়া থাকে। ধ্যান, ধারণা, সমাধি দ্বারা মনের নিরোধ সাধিত হয়। এই নিরোধের স্থান হৃদয়ে। অন্তররাজ্যেও যাহাতে মন সঞ্চরণ করিতে না পারে তজ্জন্ম মনের নিরোধ কর্তব্য, নতুবা স্নৈর্যলাভ সম্ভব হয় না। মনোবহা নাড়ী দিয়া মন সঞ্চরণ করে, মনোবহা নাড়ীর শাখা-প্রশাখারূপ জালদ্বারা মানবদেহ গঠিত, বিভিন্ন নাড়ীর দ্বারা বিভিন্ন জ্ঞান হয়, যথা—শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান ইত্যাদি। ব্যক্তি দেহের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে একটা বায়ুমণ্ডল জালরূপে বিস্তৃত আছে। এক একটা নাড়ী এক একটা রশ্মি বিশেষ, এই রশ্মিপথে প্রাণ বা মন দেহান্তরস্থ লোকে এবং দেহের বাহিরেও সঞ্চরণ করেন। মন সূক্ষ্মপ্রাণ সাহায্যে পূর্বসংস্কারানুযায়ী ভ্রমণ করে। ইন্দ্রিয়পথে যে আত্মতেজ এতদিন বাহুজগতে বিস্তৃত হইয়া ছিল, ইন্দ্রিয়রোধে তাহার উপসংহত হইয়া সংস্কাররাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে, এই অবস্থায় বাহুস্মৃতি পর্যাস্ত লুপ্ত হইয়া যায়। প্রাণের বিভিন্ন ধারাকে ইড়া-পিঙ্গলার সহিত শুষুমার ক্রমধ্যে মিলনের দ্বারা একীভূত করা হয়। যোগিগণের পরিভাষায় ইহার নাম ‘উর্দ্ধ ত্রিবেণীসঙ্গম’। (ইড়া-পিঙ্গলার নামান্তর ‘বরুণা’ ও ‘অসি’, তাই ইহাদের মিলনক্ষেত্র আজ্ঞাচক্রের নামান্তর ‘বারাণসী’।) এদিকে মনও হৃদয় বা দহরাকাশে

স্থিরতালাভ করে। হৃদয়পুরী মধ্যে নির্বাত প্রদেশে অচঞ্চল দীপশিখার জ্বায় মন দীপ্যমান হইয়া থাকে, ইহাই মনের নিরোধ। এই অবস্থার সহিত সুষুপ্তির ভেদ ইহাই, যে সুষুপ্তিতে প্রাণের কার্য্য রুদ্ধ থাকে না, কিন্তু ইহাতে প্রাণের কার্য্যও থাকে না, ইহা একপ্রকার শববৎ অবস্থা। মনকে শুদ্ধ করিয়া স্থায়ীভাবে নিরুদ্ধ করা কর্তব্য, ইহাই যোগসূত্রের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। হৃদয় হইতে মনকে চেতন করিয়া উদ্ধ করিয়া উদ্ধমুখী সুষুম্নার ধারায় আরোপ করাই যোগীর সাধন। এই জাগ্রৎ মনই প্রবৃদ্ধ কুণ্ডলিনীর মূর্তিরূপে বর্ণিত হইতে পারে। হৃদয়মধ্যে অশুদ্ধমনের রোধ হয়, সুষুম্না পথে প্রাণের সহিত শুদ্ধমনের উর্দ্ধে মিলনের ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। মনের গতিনিরোধ হইলেও, তাহাতে যে স্পন্দনমাত্র থাকে, তাহা মনের স্বভাব। এই কম্পনের পর্যাবসানে চৈতন্য-সূর্য্যের সাক্ষাৎকার হয়, ইহা মনোভূমির অতীত। ইহাই আত্মা বা ব্রহ্ম, মন তাহার সহিত অভিন্ন লাভ করিয়া বিমর্শরূপে বিরাজ করে, এই বিমর্শই শব্দব্রহ্ম বা ওঁকার। ইহার দ্বারাই মানবের ব্রহ্মবিজ্ঞালাভ হয়।^১ এই ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিয়া যোগী জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

চিত্তের মলিন ভোগবাসনাই মানবের জন্মের কারণ। কর্তৃত্বাভিমান লইয়া সকাম কর্মসাধনেই বাসনার উদ্বেক হয় ও পূর্ব সংস্কারসকল উদ্ভূত হইয়া তাহাদের পুষ্ট করে। তাই গীতায় নিকাম কর্মসাধনের উপদেশ রহিয়াছে। যে বাসনা প্রবলাকার ধারণ করে উহাই অস্থিমকালে মৃত্যুমুখী জীবের সম্মুখে জ্যোতির্ময় হইয়া আবির্ভূত হয় এবং জীবকে তদনুরূপ নাড়ীমার্গ ও দ্বারপথে চালনা করিয়া দেহবিমুক্ত করে, জীবের মরণোত্তর গতিও তদ্রূপ হয়। গীতায় আছে (৮।৬)

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

মৃত্যুকালে যে যে দেবতাকে স্মরণ করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হয়।

সুখ ও দুঃখই কর্মের ভোগফল, মানব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে কর্মফল ভোগ করে। শুদ্ধকরণ শক্তিস্বরূপ যে লিঙ্গশরীর থাকে তাহা দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয় না। যতক্ষণ না এই করণ শক্তিস্বরূপ দেহ বিনিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ দুঃখ অবশ্যস্বাভাবী। সুখ, দুঃখ

ও মোহ এই ত্রিপ্রকার বেদনা। কচিং সুখ হইলেও সংসার স্বভাবতঃ দুঃখকর, অতএব জরামরণাদিজনিত দুঃখও স্কূলাদি শরীরের পক্ষে অবশ্যস্বাভাবী। শরীরধারণে (যতক্ষণ না লিঙ্গশরীর বিনিবৃত্ত হয়) চেতনপুরুষ জরামরণকৃত দুঃখপ্রাপ্ত হয়, কারণ সংসার স্বভাবতঃ দুঃখকর।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষ।

লিঙ্গস্তাহবিনিবৃত্তেন্তস্তস্মাদ্ দুঃখং স্বভাবেন ॥

—সাংখ্যযোগ ৫৫ ১

অতএব শরীরী মানব বারংবার জন্মমৃত্যুর দুঃখ হইতে ত্রাণলাভের নিমিত্ত সচেষ্ট। মরণোত্তর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্ত মুমূর্ষুর সাংখ্যিকভাব উদ্ধৃদ্ধ করিতে ঠাকুর-দেবতার নাম করিবার প্রথা আছে। তিব্বতে নানা কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা মুমূর্ষু লামার সদৃগতির ব্যবস্থা করা হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ তিব্বতী সাধনার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নিষ্ক্রমণ ও নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্তিই লক্ষ্য।^১ এইরূপে জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব, ইহাই লামাদের বিশ্বাস।

গীতায় এই মৃত্যুবিজ্ঞানের সুন্দর পরিচয় আছে—

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥^২

অর্থাৎ প্রয়াণকালে ভক্তিয়ুক্তচিত্তে একাগ্রমনে যোগবলে ক্রয়ুগলমধ্যে সম্যকরূপে প্রাণধারণপূর্ব্বক যিনি (তাহাকে) স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। স্মরণের সহিত প্রাণ-মন কিরূপে নিরোধ করিতে হইবে তাহারও উপদেশ আছে—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিকৃধ্য চ।

মূৰ্দ্ধ্ণ্যাধায়াশ্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যবহারন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥^৩

অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত ও মন হৃদয়ে নিকৃদ্ধ করিয়া ক্রয়ুগলের

১। সরল সাংখ্যযোগ, কপিল যঠ প্রকাশিত, পৃ ১২০ ১ম সংস্করণ।

২। With Mystics and Magicians in Tibet, A. David Neel, pp. 29-32

৩। গীতা ৮।১০

৪। গীতা ৮।১২, ১৩ ও টীকা, উদ্বোধন কাণ্ডালয়।

মধ্যে প্রাণ স্থাপন করতঃ আত্মযোগে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ও উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ইহাই গীতার ‘অক্ষর ব্রহ্মযোগ’। কি প্রকারে দেহত্যাগ করিলে সাক্ষাদভাবে ভগবৎস্বরূপ লাভ করা যায় তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগ, মন্ত্র, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনের সমন্বয় ইহাতে আছে। নাথযোগীদের সাধনেও সর্বদ্বারের সংযম, হৃদয়মধ্যে মনের নিরোধ ও তৎপরে ক্রমধ্যে মনের আজ্ঞাচক্রে প্রাণের সহিত মনের মিলন সাধন আছে। কুস্তক সাহায্যে যোগী দৈর্ঘ্যলাভ করেন। শ্রুতিতেও আছে রেচক-পূরক ত্যাগ করিয়া যে যোগী কুস্তক করিয়া স্থিত থাকেন, যাহার প্রাণ-অপান নাভিমধ্যে সমতালাভ করে এবং যিনি ‘হংস’ ‘হংস’ জপরত, তাহার জরামরণ রোগাদি হয় না ও অগ্নিমাди সিদ্ধিলাভ হয়।

জরামরণরোগাদি ন তস্ম ভুরি বিদ্যতে

এবং দিনে দিনে কুর্ঘাৎ অগ্নিমাদিবিভূতয়ে ॥^১

যাহার ‘হংস’বিদ্যা নাই, তাহার নিত্যতাও নাই। এই হংস মন্ত্রই অজপা-জপ। মুদ্রাদি সাধনের সহিত যোগী ‘হংস’মন্ত্র জপ করিয়া জরামরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান।

ইষ্টযোগপ্রণালী মতে চিত্ত সমত্বলাভ করিলে বিন্দুসিদ্ধি হয়, তৎফলে নিত্য ও শুদ্ধ সত্ত্ব এবং পিওদৈর্ঘ্য হয়। বিন্দু হইতেই দেহের বিকাশ, বিন্দু চঞ্চল থাকিলে জরামৃত্যু অবশ্যসম্ভাবী, স্থির হইলে কায়সিদ্ধি হয়। বৌদ্ধদের বজ্রকায়, সিদ্ধমার্গের সিদ্ধ বা দিব্যদেহ, পাতঞ্জলের কায়সম্পৎ, রসেশ্বরের হরগৌরীতন্ত্র একই কথা। আধার পত্র অর্থাৎ উপযুক্ত না হইলে বিরাট চৈতন্য ধারণ বা চৈতন্যের সহিত সত্ত্বক স্থাপন সম্ভব হয় না। জীবদেহ জরামৃত্যুর অধীন। ভট্টহরি বাক্যপদীয়ে (১/৩) বলিয়াছেন যে, শব্দব্রহ্মের অব্যাহত নিত্যকলা কালশক্তির আশ্রয়ে ভাববিকারের প্রসব করে। কালশক্তির প্রভাব হইতেই প্রকৃতির বিকার হয়। কিন্তু পরিণামমাত্রই বিকার নহে। সাংখ্যের বিসদৃশ পরিণাম বিকার, সদৃশ পরিণাম বিকার পদবাচ্য নহে। যেখানে সদৃশ পরিণামেরও সম্ভাবনা নাই, তাহাই নির্বিকার প্রকৃতি-স্থান। সাংখ্যমতে প্রবৃত্তির বিসদৃশ পরিণাম হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব, সাংখ্যের

প্রকৃতি স্থিরবিন্দু নহেন, উহা বিন্দুত্রয় বা গুণত্রয়ের সমষ্টি। সাংখ্যের পুরুষ বিন্দুস্বরূপ, পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলিত হইয়াও নিত্যমুক্ত। সাংখ্যের প্রকৃতিতে যে কম্পন, তাহা বিন্দুর স্পন্দন মাত্র, আগম মতে ইহা নাদের অন্তর্গত (নাদবিন্দুকলা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি দ্বিপ্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ; সৃষ্টিতে প্রতিক্রমে যে অবস্থান্তর হয়, তাহাই জরা। অশুদ্ধ অধ্বা অতীত হইলে বিন্দু স্থির হয়। শুদ্ধ অধ্বার স্থিতিকালে সদৃশ পরিণাম থাকে, ইহাতে যে ‘মরণ’ আছে, তাহা তিরোভাবমাত্র, জাগতিক মরণের সদৃশ নহে। অশুদ্ধ অধ্বায় জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ছয় কোটি বিকার আছে। বস্তুতঃ শুদ্ধ অধ্বাতে দীর্ঘস্থিতির পর যে তিরোভাব হয় সে অবস্থাই অজর-অমরত্বরূপে বর্ণিত হয়, ইহা কল্লাস্ত বা যুগান্ত স্থিতিমাত্র। কালের গতির উর্দ্ধে অজরত্ব লাভ হয় ও কালের গতিরোধে জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি হয়।’

এইরূপে পাক্‌ভৌতিক দেহের জরামরণের রহস্য অবগত হইয়া অমরত্বলাভেচ্ছু যোগী সাধনা দ্বারা জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ রূপ লাভণ্যযুক্ত সিদ্ধদেহে শাশ্বত শাস্তিতে বিরাজ করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দেহতত্ত্ব ও পিণ্ড-সংবেদন

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পর সম্বন্ধ

‘দেহতত্ত্ব’ শব্দটির অর্থ শারীরবিজ্ঞা অর্থাৎ দেহ, আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বিভিন্ন সাধকসম্প্রদায় বিভিন্ন দৃষ্টিভেদে দেহতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, পিণ্ড বা দেহকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে এই পিণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করিয়া সাধন প্রচলিত ছিল। ‘পিণ্ডসংবেদন’ অর্থে পিণ্ডের বোধ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার সম্বন্ধ অনুভব। প্রচলিত বাক্যেও আছে “যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে”, অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহা ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক, ততোধিক এ দেহে কিছু নাই। সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি যৎ কিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেহপ্যস্তি সর্বথা।

ইতি নিশ্চয় এবাত্র পিণ্ডসংবিত্তিক্রচ্যতে ॥

সন্ত সুফী প্রভৃতির সাধন মধ্যেও পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা আছে। সুফী সাধক আজিজ-ইবন-মহম্মদ-অল্-নসীফ তাহার গ্রন্থে যে পূর্ণাঙ্গ মানবের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সকল অংশের তুলনা আছে, এই মানবের জন্তই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি।^১ সন্ত সম্প্রদায়ও মনুষ্য-দেহ ও ব্রহ্মাণ্ডী মনের দেশের তুলনা করিয়াছেন। পরে ইহা আলোচিত হইতেছে।

যোগমার্গের এই পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপনার জন্তই দেহতত্ত্ব ও পিণ্ডের উৎপত্তির বিষয় জানা কর্তব্য। নাথসিদ্ধেরা বলেন—“নাথাংশো নাদো, নাদাংশঃ প্রাণঃ, শক্ত্যাংশো বিন্দুর্বিন্দোরংশঃ শরীরম্”।^২ বিন্দুর ছই দিক—বিশ্বসৃষ্টির যে দিক তাহাই বিন্দুর প্রসর, তাহাই ‘শক্ত্যাংশে’ পরিণাম লাভ করে, এবং অত্র দিক ‘শিবাংশ’ তাহা সাক্ষী বা দ্রষ্টামাত্র হইয়া থাকে। দ্রষ্টা অপরিণামী ও এক, কিন্তু শক্তি স্তরানুসারে

১। সি. সি. স. ৩২

২। Oriental Mysticism, Palmer, Introduction by Arbery.

৩। গো. সি. স. পৃ ৫৮

প্রসারিত হইতে থাকে। শক্তির প্রসার ও সংকোচ আছে, শিবের নাই। শক্তির প্রসারে সৃষ্টি, সংকোচে সংহার। প্রসার ও সংকোচের আদি ও অন্তে সাম্যাবস্থা, মধ্যে কালচক্রের আবর্তন, তাহাই বৈষম্য, কিন্তু তন্মধ্যেও সাম্যাবস্থা নিহিত আছে।

সৃষ্টি ও সংহার নিরন্তর চলিতেছে, বিন্দুর স্পন্দনে সৃষ্টির বিকাশ। স্পন্দনই একমাত্র ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তিই সেই স্পন্দনের কারণ। জলে নিষ্কিপ্ত লোষ্ট্রের স্থায় বিন্দু ক্রমবর্দ্ধমান মণ্ডল রচনা করে, কিন্তু সেই মণ্ডলেরও সীমা আছে। সমগ্র জগৎ একমাত্র বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু বিন্দু অপরিবর্তনশীল উদাসীন দ্রষ্টামাত্র। নাদবিন্দুকলা অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে (সাধনা অংশ দ্রষ্টব্য)। এখানে সংক্ষেপতঃ কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। বিন্দুরূপা সাম্যশক্তি স্পন্দনের দ্বারাই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিনটি স্বতন্ত্র বিন্দুরূপে পরিণত হইয়া তিনটি মণ্ডলের সৃষ্টি করে। সাম্যাবস্থায় এই ত্রিবিন্দু ও মূল বিন্দু অভিন্ন, কিন্তু বৈষম্যকালে উহার পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। তথাপি সাক্ষীর সহিত অভেদভাবাপন্ন যে তুরীয় বিন্দু বা আদিবিন্দু তাহা অবিকৃত থাকে। বিন্দু স্পন্দিত হইয়া চতুর্দিকে বৃত্তাকারে প্রসারিত হইয়া মণ্ডলের সৃষ্টি করে। প্রথম মণ্ডল ‘সহস্রার’, ইহা সহস্ররশ্মির জ্যোতির্ময় সত্ত্বরাজ্য, ইহার কেন্দ্র ‘ব্রহ্মবিন্দু’ নামে পরিচিত। ইহার বাহিরে ‘তটস্থ’ মণ্ডল, ইহার কেন্দ্র ‘রজঃ’ নামক দ্বিতীয় বিন্দু। তটস্থের বাহিরে অন্ধকারময় তৃতীয় মণ্ডল বা ‘মায়া’ মণ্ডল। ইহার বিন্দু ‘তমঃ’ বা তৃতীয় বিন্দু।

এই তিনটি মণ্ডলের সহিত দেহস্থ চক্রের সম্বন্ধ আছে। প্রথম মণ্ডলই মস্তকোক্তের ‘সহস্রারচক্র’, এস্থলে চৈতন্যসত্ত্বার অনুভূতি হয়, তাই ইহাকে ব্রহ্মলোক, জ্যোতির্ময়লোক প্রভৃতি বলা হয়। দ্বিতীয় মণ্ডল বা তটস্থ বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয় তাহার নাম ‘আজ্ঞাচক্র’, ইহা জ্ঞান মধ্য এবং সহস্রারের নিম্নে অবস্থিত। তৃতীয় মণ্ডল বা ‘মূলাধার’ সর্বনিম্ন চক্র এবং ঘোর অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল। বৈষ্ণবেরা এই মায়ামণ্ডলকে ‘বহিরঙ্গ’ বলিয়াছেন, এই মূলাধার বিন্দু হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্থূল পঞ্চীকৃত আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত অনাগত ভবিষ্যৎ স্থূলবস্তুর ‘বীজ’ এই স্তরে চিরবর্তমান।

দ্রষ্টা বা সাক্ষীর দৃষ্টিক্ষেত্র আকাশ, প্রথম বা সর্ববিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিদাকাশ, দ্বিতীয় বা রজোবিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিত্তাকাশ (ইহার মধ্যে খগোতের স্থায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে), তৃতীয় বা তমোবিন্দুর প্রসারক্ষেত্র ভূতাকাশ। এই ভূতাকাশ পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিয়া ইহার বিন্দু ব্যাকৃত অবস্থায় পঞ্চবিন্দুরূপে বিভক্ত হইয়া প্রসরফলে পঞ্চমণ্ডলরূপে পরিণত হয়, এই পঞ্চমণ্ডলই বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্র। তটস্থ মণ্ডলের নাম আঞ্জাচক্র, সত্ত্বমণ্ডলের নাম সহস্রারচক্র তাহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। তমোমণ্ডলের মূলাধার চক্র বা সর্বনিম্ন চক্রই ঘোর অন্ধকারময়।

মানবদেহ বা পিণ্ডের উৎপত্তি এই মূলাধারবিন্দু হইতে। স্থূল-জগতের জীব এই স্তরেই গঠিত হইয়া অবস্থিত থাকে। মহাপ্রলয়ের সময়ে এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে অপঞ্চীকৃত হইয়া পঞ্চভাগে বিভক্ত হয় এবং বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্রে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই প্রসর অন্তে সঙ্কোচশক্তির উন্মেষ অবস্থা। পঞ্চচক্র ক্রমশঃ পঞ্চবিন্দু ও পঞ্চবিন্দু ক্রমশঃ উপসংহত হইয়া একবিন্দুতে বা সাম্যাবস্থায় পরিণত হয়।

সাম্যাবস্থা হইতে স্তরানুসারে কিরূপে ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে নাথমার্গের সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে। পিণ্ডতত্ত্ব ও পিণ্ডাধার অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচিত হওয়ায়, এখানে পুনরুক্তি নিম্নয়োজন। মাতৃকুক্তিতে জীব যে দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম গর্ভপিণ্ড। অব্যক্ত অনামা হইতে প্রসরের দ্বারা ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।^১ নাথগণ স্থূলতম প্রকাশ হইতে নিজেকে সংবৃত করিয়া স্পন্দাঙ্গিকা শক্তিকুণ্ডলিনীর সহায়ে মূলাধারচক্র হইতে বিপরীত মার্গে গমন করিয়া শিবস্থান বা ব্রহ্মস্থান লাভ করেন। নিগূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পর পর যে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব সহস্রদলের মহাশূন্য হইতে ক্রমশঃ নিম্নদিকে মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী স্নায়বীয় কেন্দ্রসকলে যোগীর ধ্যানগোচর হয়। যোগী স্বীয় দেহে মস্তকের শূন্যস্থান হইতে মেরুর অধোভাগ পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রের তত্ত্বের ধারণা করিয়া তদ্বোর্ধ্বে স্থিত সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণার অধিকারী হন। বিপরীতক্রমে বা লয়ক্রমে যোগী সাধনা করিয়া

১। সি. সি. প. ও সি. সি. স. প্রথমোপদেশ দ্রষ্টব্য, 'ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব'।

থাকেন। সৃষ্টিক্রপা কুণ্ডলিনী স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধরূপে অবস্থিত।^১ জীবকে সেই সূক্ষ্মশক্তি উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনা করিতে হয়। এই সাধনায় পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধের জ্ঞান অত্যাৱশ্যক বিবেচিত হয়।

স্থূলাবরণে বেষ্টিত জীব তিনটি আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত, বাসনা বা সংস্কার, অভিমান বা কর্তৃত্ববোধ, এবং কামনা বা ফলাকাঙ্ক্ষা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত হইয়া জীবকে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেয় না, তাহার আবরণ তিনটাই তাহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়। ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা পঞ্চভূতের শুদ্ধতা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ বুদ্ধায়—ইহাই জীবের শুদ্ধ অবস্থা। জীবমাত্রই জ্ঞান, আনন্দ ও অমরত্ব প্রার্থী, এককথায় জীব ‘ব্রাহ্মীস্থিতি’ কামনা করে। জীবের স্থূলাবরণ ক্ষণিকের জন্ম দূর হইলেও সে সূক্ষ্মমার্গে প্রবেশের পথ পায়, তখন পঞ্চভূত শুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিন্দু এক বিন্দুতে পরিণত হয় এবং তৎপরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সেই এক বিন্দুই নির্মল হইয়া তৃতীয় ক্ষেত্রের বিকাশ করে। তৎপরে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিয়া অগ্রসর হওয়াই জীবের সাধনা, ইহাই উপাসনা। উপাসনা দ্বারা আজ্ঞাস্থ বিন্দু ও সহস্রারের মহাবিন্দুর ভেদাংশ বিগলিত হইয়া যে অভেদ প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ, ইহার পর ত্রিগুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা বা ব্রহ্মত্ব।^২ এই সাম্যাবস্থা তত্ত্বাতীত অবস্থা, ইহাই নাথ-মার্গের ‘নাথস্বরূপ’, ইহা লাভই যোগীর কাম্য। ঋতিতে আছে জীবদেহ পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত, ইহা পঞ্চভূতের স্থূল পঞ্চীকরণ বা মিশ্রণ মাত্র। ইহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ইহাই স্থূল প্রকৃতি বা বিশ্ব। ইহা জাগ্রৎ অবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহে তৈজসের আবির্ভাব হয়, ইহাই লিঙ্গ-শরীর এবং গুণত্রয়যুক্ত কারণশরীর। সুষুপ্তি অবস্থায় ‘প্রজ্ঞা’ই ইহার অধিপতি। “সর্বেষামেবং ত্রীণি শরীরানি বর্তন্তে।” জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থায় বিশ্ব, তৈজস, প্রজ্ঞা ও আত্মাই অধিপতি। বিশ্ব স্থূলকে ভোগ করে, তৈজস বিবিধ দশা ভোগ করে, প্রজ্ঞা আনন্দ ভোগ করে, তৎপরবর্তী যিনি তিনি সর্বসাক্ষিস্বরূপ ‘আত্মা’। প্রণব বা তুরীয় সর্ব জীবের অর্থাৎ বিশ্ব প্রভৃতি যত রূপ, স্থূল

১। সি. সি. প. ৪১২৩

২। কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, বঙ্গসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮২।

প্রভৃতি যত দেহ এবং জাগ্রৎ প্রভৃতি যত অবস্থা আছে, সকলের সাক্ষিরূপে নির্লিপ্ত হইয়া বর্তমান থাকে।^১

জীব প্রাণ অপানের বশীভূত, জীব সর্বদা ‘হংস’মত্ৰ জপ করে, এই অজপা জপই মোক্ষপ্রদ; “অনয়া সদৃশী বিজ্ঞা, অনয়া সদৃশো জপঃ, অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি”।^২ কুণ্ডলিনী বিজ্ঞাই প্রাণ-ধারিণী মহাবিজ্ঞা, জীবের মুক্তি ইহার জ্ঞানে। কুণ্ডলিনীতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের কেবল দেহ নহে, জগতের যাবতীয় তত্ত্বেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিद्यমান। কুণ্ডলিনীশক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া মূলসত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছেন। তাই ইহার চৈতন্য সম্পাদনে ‘সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম’জ্ঞান হয়, এই পূর্ণ জাগরণই তত্ত্বশাস্ত্রে ‘পূর্ণহস্তা’রূপে খ্যাত। কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইলে জীবকে ‘ব্রাহ্মীস্থিতি’ লাভের জন্য ভিন্ন প্রয়াস করিতে হয় না, ইহা স্বতঃই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে ইড়াপিঙ্গলা-বাহিত বায়ু সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মারক্রে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবশক্তি স্থূলতা পরিহার করিয়া বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনাড়ীতে গমন করে,—ইহাই আনন্দময় কোষ, তত্পরি সাম্যাবস্থা।

রসেশ্বরদর্শনে পৃথ্বী অপ-তেজ বায়ু আকাশ নিম্নিত দেহকে স্থূলদেহ এবং বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষত্রয় দ্বারা মিলিত দেহকে সূক্ষ্ম-শরীর বলা হইয়াছে। যিনি মুক্ত পুরুষ তাঁহার শরীর অব্যক্ত বা ‘হরগৌরীসৃষ্টিজাং তনুঃ’—এইরূপ সিদ্ধেরা “খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ত্রিলোক্যাং বিচরন্তি তে”।^৩ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ অশুদ্ধ দেহ, মহাকারণ দেহ শুদ্ধদেহ, কৈবল্য দেহ চিংতবাস্যক ও সমুদ্রের ‘হংস-দেহ’ সগুণ-নিগুণের অতীত। বেদান্ত বলেন “শরীরং ত্রিবিধম্ স্থূলসূক্ষ্মকারণ-ভেদাদিত্যর্থঃ”।^৪ কাশ্মীর শৈবাগমে মহাকারণ দেহ বা ‘বৈন্দব দেহের’ বর্ণনা আছে, দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়েও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু নাথমার্গে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। অতএব স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের মাত্র বিচার কর্তব্য।

১। শোগচূড়ামণি উপ. ৭২, ৭৩ শ্লোক

২। ই ৩১-৩৪ ই।

৩। রসেশ্বর তন্ত্র, ১১৭ টীকা

৪। বেদান্তসংজ্ঞাশ্রকরণম্, শ্লোক ৭, আদিত্যপুরী বিবচিত।

নাথসিদ্ধরা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহকে শুদ্ধ করিয়া ‘প্রণবতনু’ বা ঔকারদেহলাভে সচেষ্টে হইতেন। প্রণবতনু চন্দ্রামৃত পানে অজর হইত। এইরূপ যোগীই জীবমুক্ত বিবেচিত হইতেন। মাহেশ্বর সিদ্ধদের মধ্যে প্রণবতনুকে জ্ঞানতনুতে পর্যাবসিত করিয়া স্বদেহে অন্তর্হিত হইবার বৃত্তান্ত আছে। নাথদের সিদ্ধদেহ, মাহেশ্বরদের দিব্যদেহ বস্তুতঃ একই দেহের বিভিন্ন স্তর মাত্র, প্রথমে বিন্দুতে স্থিতির দ্বারা সিদ্ধদেহ হয়, ইহা একটীমাত্র সত্তা বা integral part, তৎপরে উহার প্রসার বা বৃদ্ধির দ্বারা দিব্যদেহ লাভ হয়, এই বৃদ্ধি তেজেরই বৃদ্ধি, শরীরের নহে। নাথমার্গের সিদ্ধদেহ সম্ভবতঃ অন্য মার্গের দিব্যদেহের অনুরূপ, মতান্তরে ইহা বৈন্দব দেহ।

শঙ্করের মতে আত্মার তিনটি উপাধি—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। স্থূল শরীর পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা গঠিত ভোগায়তন দেহ, সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, ইহাই লিঙ্গশরীর। অতঃপর কারণ শরীর, তাহা সংও নহে, অসংও নহে, অনির্কবচনীয়স্বরূপ ও অনাদি। আত্মা এই উপাধিত্রয়—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—হইতে পৃথক।^১ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ আশ্রয় করিয়া জীব লোক হইতে লোকান্তরে আবর্তিত হইতেছে। জন্ম অর্থে ই জগতের কোন লোকে দেহধারণপূর্বক আবির্ভাব, মৃত্যু অর্থে পূর্ববৃত্ত দেহ ত্যাগপূর্বক দেহান্তর গ্রহণ; এই জন্মমৃত্যুর মধ্যে জীব অনাদিকাল হইতে দোলায়মান রহিয়াছে। স্থূল শরীর সর্ববাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপত্তি। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহের বীজভূত অবিচ্ছিন্নশক্তিই জীবের ‘কারণ’শরীর, মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার বিনাশ নাই। কারণশরীরের প্রথম পরিণাম সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর; সাংখ্য লিঙ্গশরীরের কথা বলেন। ইহা বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারযুক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ইহার দ্বারস্বরূপ, ইহা অনাশ্রয়ে থাকিতে পারে না বলিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে।

চিত্রং যথাশ্রয়মূতে স্থাণাদিব্যো বিনা যথাচ্ছায়া।

তদ্বদ্বিনা বিশেষৈ ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্ ॥^২

বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনকে অন্তঃকরণ আখ্যা দেওয়া হয়, নাথগণ চিত্ত ও চৈতন্যকেও অন্তঃকরণ মধ্যে গণনা করেন, কারণ প্রকৃতিপিণ্ডের

১। আশ্রবোধঃ, শ্রীমজ্জিমাবাচা প্রণীত ১১-১৩ শ্লোক।

২। সাংখ্যকারিকা, ৪১ পূত্র।

অন্তঃকরণপঞ্চক—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য।^১ লিঙ্গশরীর পঞ্চ অন্তঃকরণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের সমবায়ে নির্মিত।

বুদ্ধি জীবের গ্রহীতৃরূপ, মন ও অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ার্পিত বিষয়বুদ্ধির সমীপে নীত করিলে জ্ঞান হয়, কারণ বুদ্ধি সবপ্রধান। বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার উদ্ভূত; মন উভয়াত্মক—আন্তর ও বাহ্য। অন্তঃকরণের যে বিষয়জ্ঞান হয় তাহার আভ্যন্তর পরিণামই ‘বুদ্ধি’, ইহাদের সমষ্টির নাম ‘চিত্ত’। বিজ্ঞানন চিন্তা, স্মরণ চিন্তের প্রধান ক্রিয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প কল্পনাদি। চিন্তের বাহ্য ও আন্তর বিষয় আছে। চৈতন্য সম্বন্ধে নাথগণ বিমর্ষ, হর্ষ, ধৈর্য্য, চিন্তন ও নিস্পৃহরূপ পঞ্চগুণের কথা বলেন। এগুলি চিন্তেরই এক প্রকার অবস্থাবৃত্তি।

সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় করণশক্তি। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ার শক্তিসকলও সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গীভূত। পঞ্চপ্রাণ তৃতীয় প্রকার বাহ্যকরণ, কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ার স্থায় প্রাণও অস্থিতাত্মক, “আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।”^২ পঞ্চ প্রাণশক্তি হইতেই দেহধারণ সিদ্ধ হয়। “অহং পঞ্চধাত্বানং বিভজ্যৈতদ্ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি।”^৩ অর্থাৎ আমি (প্রাণ) আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই কার্য্যকরণ সমষ্টিকে সূদৃঢ় করিয়া শরীর ধারণ করি। প্রাণবৃত্তি তাগে জীবের মৃত্যু হয়।

অন্তঃকরণের প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতি (সংস্কার) রূপ মূল তিনটি বৃত্তি হইতেই দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি। পঞ্চপ্রাণ মধ্যে উদানের কার্য্য মর্মস্থান সকল শরীর ধাতুগত বোধাধিষ্ঠান ধারণ, মেরুদণ্ডের মধ্যগত উর্দ্ধশ্রোতস্বিনী শুষুমা নাড়ী আন্তরবোধের মুখ্যশ্রোত, উদান জয় হইলে শরীর লঘু হয় এবং ইচ্ছামৃত্যু ক্ষমতা জন্মে।^৪ প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবের জীবন, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা প্রাণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রাণশক্তির সংযমনে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিসংযমন কর্তব্য, তাহা দ্বারা চিৎশক্তির উদ্বোধন হয়, তাহাই কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন, ইহার জাগরণে জীব পাশমুক্ত হয়।

লিঙ্গশরীর সংস্কারাধার, স্থূলশরীর সহায়ে লিঙ্গশরীরের ভোগ সিদ্ধ হয়। বিষয়যুক্ত ইন্দ্রিয় উজ্জিক্ত হইলে মনের দ্বারা তাহা জানা যায়, মন তাহা অহঙ্কারের নিকট উপস্থাপিত করে এবং বুদ্ধি তাহার ইষ্টানিষ্ট-

রূপ অবধারণ করে, তাহার দ্বারাই জীবের ভোগ সিদ্ধ হয়। অস্তুঃকরণ দ্বারা সিদ্ধ কর্ণের সংস্কার লিঙ্গশরীরে আহিত থাকে। তাই ভোগায়তন দেহ স্থূলরূপে প্রকাশিত হয় এবং ভোগের বাসনা ক্ষয় হইলে স্থূল শরীরই মোক্ষসাধনের উপায়ভূত হয়, অতএব ভোগ ও মোক্ষ উভয়ের সাধনের নিমিত্ত স্থূলশরীরের আবশ্যক; নাথসিদ্ধগণ ইহার উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন, “একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশৈচককরে স্বয়ম্” ইত্যাদি।^১ জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থার অবসানে তুরীয় ও তৎপরে তুরীয়াতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাই তাহার সংসারাবস্থা—

এষ প্রমাতা মায়াশ্চ সংসারী কৰ্ম্মবন্ধনঃ।

বিজ্ঞাভি জ্ঞাপিতৈশ্বৰ্য্যশ্চিদকণা মুক্ত উচ্যতে ॥^২

অর্থাৎ জীবরূপী প্রমাতা মায়াশ্চ ও কৰ্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারের দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করে। কিন্তু বিজ্ঞা (যোগবিজ্ঞা) দ্বারা যখন আপন ঐশ্বৰ্য্য বিজ্ঞাপিত হয়, তখনই মুক্ত হয়, তাহাই তাহার চিদ্ব্যনাবস্থা।

জাগ্রৎ অবস্থায় জীব ‘স্থূলভূক্’, তখন জীবের চৈতন্য স্থূল জড়-দেহাশ্রয়ী। স্বপ্নাবস্থায় জীব ‘প্রবিবিক্তভূক্’ অর্থাৎ চিত্তে যে সংস্কাররূপ ছায়া পড়ে তাহা অবহিতরূপে ভোগ করে, এই অবস্থায় জীবচৈতন্য সূক্ষ্ম-শরীরাস্রয়ী হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় মাত্র অক্ষুট আনন্দভাব থাকে, জীব তখন ‘আনন্দভূক্’, জীবচৈতন্য তখন কারণশরীরাস্রয়ী হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থাই শরীরের সহিত যুক্ত, তত্পরি যে তুরীয় অবস্থা তাহাই আত্মার স্বরূপ অবস্থা, এই অবস্থা দেহাদিবোধ-ভাবশূন্য। তুরীয়ের পরিপক্ক অবস্থা ‘তুরীয়াতীত’। অভিনব গুপ্ত তুরীয় ও তুরীয়াতীতের সংজ্ঞা ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনীতে (৩।২।১২) নির্ণয় করিয়াছেন।

ইহাই জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থার পরিচয়। কিন্তু আত্মা এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ উপাধিত্রয় হইতে ভিন্ন।

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে ‘নবনাথে’র উৎপত্তি নাদ হইতে, বিন্দু হইতে সদাশিবাদি অষ্টভৈরবের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। নবনাথের পর

দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ সিদ্ধা, দ্বাদশ পন্থা, অনন্ত সিদ্ধা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। আবার নাদ বা শব্দসৃষ্টি ত্রিপ্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মরূপাই ‘প্রণব’ মহাগায়ত্রী যোগশাস্ত্র, স্থূলরূপা ব্রহ্ম গায়ত্রী বেদত্রয় ইত্যাদি। ‘প্রণব’ই কুণ্ডলিনীর স্পন্দন, নাথগণ যে প্রণবতন্ত্রের কথা বলেন তাহা কুণ্ডলিনীর জাগরণে লাভ হয়, ইহাই ‘ওঁকার দেহ’ লাভ। এই প্রণবতন্ত্র বা ওঁকারদেহ চন্দ্রামৃতপানে অজরহ লাভ করে, এইরূপ দেহধারী যোগীই জীবিত থাকিয়াও মুক্ত এবং সংসারের পক্ষে মৃত। ইহাই নাথ-যোগীদের ‘সিদ্ধদেহ’ লাভ, ইহাই রসেশ্বর সিদ্ধের ‘রসময়ী তন্ত্র’ ও বৈষ্ণবের ‘ভাবদেহ’। বিভিন্ন দেহ সম্বন্ধে স্থূলভাবে আলোচনা করা হইল, কিন্তু তাহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের কি সম্বন্ধ তাহাই নির্ণয়। ব্রহ্মাণ্ড কি? আমরা সকলে সমভাবে যে আকাশ দেখিতেছি তাহাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড, মনই সেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, মন এক নয়, দেহভেদে মন অসংখ্য, তাই সৃষ্টিও অসংখ্য, আকাশও অসংখ্য। এই আকাশের মধ্যে একটি শক্তি আছে, বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র শক্তি আছে, যাহা দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদি চালিত হইতেছে, পুষ্প হইতে ফল হইতেছে ইত্যাদি। সে শক্তির ক্রিয়ামাত্র আমরা অনুভব করি, ক্রিয়ার বিভিন্নতা হইলেও মূলে শক্তি ‘এক’ ও অনবচ্ছিন্ন। মানবদেহমধ্যেও সেই শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিত। তাই সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে^১ উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে অবস্থিত। জীবমধ্যে এই শক্তির স্থূল বিকাশ, তাহার সূক্ষ্মরূপ উপলব্ধির নিমিত্ত যোগসাধনার প্রয়োজন।

বিভিন্ন সৃষ্টির বিভিন্ন আকাশ আছে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, আগমে তাহাকে ‘গোল’ বলা হয়—যেমন ব্রহ্মগোল, বিষ্ণুগোল, রুদ্র-গোল ইত্যাদি। এইরূপ কোটি কোটি গোল আছে, আমাদের ব্রহ্মার যে গোল তাহাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড বা ভূলোক। যে মন হইতে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যে মন এই ব্রহ্মাণ্ডমূর্তিতে বিরাজিত সেই মনই আমাদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, যাহা দেখিতেছি তাহা ভূলোক, যাহার জগৎ আকাঙ্ক্ষা হইতেছে অর্থাৎ এখন যাহার বিদ্যমানতা নাই তাহাই ভুবলোক, তদূর্কে স্বঃ মহঃ তপঃ জন ও সত্যলোক কল্পিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যে যে লোক আছে তাহা পিও

মধ্যেও বর্তমান, ইহা যোগিগণসম্মত। পিণ্ডমধ্যে তাই 'চতুর্দশ ভুবনে'র অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত সপ্তলোক ব্যতীত তলাতল, মহাতল, রসাতল, সূতল, বিতল, অতল ও পাতাল এই সপ্ত অধোলোক কল্পিত হইয়াছে। মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত এই চতুর্দশ ভুবনের অবস্থান। যোগী মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহত স্থানে চিত্ত সংযমন দ্বারা ভূলোক বিষয়ক জ্ঞানের অনুভূতি লাভ করেন। প্রাচীনতম যোগসূত্রেও নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়বাহ-জ্ঞান, হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্ত-বিজ্ঞান, সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন-জ্ঞান হয় ইত্যাদি আছে।^১ এই সূর্য্য অর্থে সাধারণ সূর্য্য নহে, সূর্য্যদ্বার বা সুষুম্নাদ্বার, তক্রূপ চক্রদ্বার বা তালুমূল আছে। সূর্য্যদ্বার স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ সুষুম্না স্থির করিতে হয়; শ্রুতি বলেন "ততঃ শ্বেতঃ সুষুম্না বজ্রধানঃ" অর্থাৎ হৃদয় হইতে উর্দ্ধগত শ্বেত বা জ্যোতির্ময় নাড়ীই সুষুম্না। তন্ত্রমতে মেরুদণ্ডের পথই সুষুম্না। সুষুম্নাদ্বার হইতে একটী রশ্মি উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে, অতএব সূর্য্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে।

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সামঞ্জস্য অনুসারেই সুষুম্নানাড়ী ও লোকসকলের একত্র নির্ণীত হয়। যে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, মানবদেহেও তত্ত্বগুলি সেই ক্রম অনুসারে সংস্থিত, সেইজন্য দেহকে 'ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড' বলা হয়। সৃষ্টির আদি অবস্থা শূন্য, মাতৃগর্ভস্থ জীবের প্রথম অবস্থাও শূন্য, আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে উর্দ্ধদেশেও এক শূন্যস্থান আছে। সৃষ্টির শূন্য হইতে নাদের উৎপত্তি, জীবদেহের ব্রহ্মরন্ধ্রের শূন্য বেষ্টন করিয়া স্নায়বীয় পদার্থের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমশঃ বিকাশে মেরুদণ্ডের রূপধারণ হয়। আগম মতে সমস্ত সৃষ্টি শূন্যে অবস্থিত, সেই শূন্য দেহমধ্যেই রহিয়াছে। দেহমধ্যে চন্দ্রসূর্য্যাবহি-তত্ত্বই ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ভ। বহিতত্ত্ব বিন্দুর স্বরূপ, বহিতত্ত্ব জগদ্রূপ বিষয় বিলীন হয়। বিন্দু অনন্ত আনন্দের ধাম সেইজন্য বিন্দুই স্বলোক জগতের সকল চৈতন্য বিন্দুতে গিয়া নিশ্চল চিৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।^২ চিত্তের বহিমুখতা সূর্য্য, চিত্তের অন্তর্মুখতাই চন্দ্র। তাই পিঙ্গলা ও ইড়া, সূর্য্য ও চন্দ্র নামে পরিচিত। মেরুদণ্ডের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম রক্ত আছে, তাহার চতুর্পার্শ্বে শ্বেত ও ধূসরবর্ণ স্নায়বীয় পদার্থ আছে, তাহা হইতেই সাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল দক্ষিণ ও বাম

নাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। মস্তিষ্কের মহাশূন্যস্থান হইতে অধঃপ্রসারিত নাড়ীই সুষুমা। জীবদেহস্থ ঐশী শক্তি ইহাতে বিরাজিত। সুষুমা মধ্যে প্রাণানিল বিলীন হইলে যে লয় হয় তাহার ফলে নাদের অনুভূতি হয়। সুষুমাতে রতি হইলে শিবরূপ লাভ হয়। সুষুমার নামান্তর বহ্নিতত্ত্ব ও শ্মশান, সুষুমা মধ্যে শিবতত্ত্বের সাক্ষাৎ হয় বলিয়া শিবকে শ্মশানবাসী বলা হয়। সুষুমাতে প্রাণানিল লয় করার সাধনাই প্রকৃত শ্মশান সাধন। যোগসিদ্ধ যোগী পার্থিব ভাবের অতীত হইলে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, তখন তাঁহার অনুভূত উপদেশ দ্বারা লোকের উপকার হয়, দার্শনিক কর্তৃক তাহা স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা হইতে দর্শনের উৎপত্তি। সিদ্ধ নাথযোগী স্বীয় দেহে যে চতুর্দশ ভুবনের অনুভূতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

কূর্ম্মঃ পাদতলেহদৃষ্টতলে পাতালমুচ্যতে ।
তলাতলং পুরোহদৃষ্টাং পাদপৃষ্ঠে মহাতলম্ ॥
গুল্ফে রসাতলং প্রোক্তং জজ্বায়াং সূতলং মতম্ ।
বিতলং জানুদেশে স্মাদতলং মূল ইয্যতে ।
উর্দ্ধঃ স্বভাবো যঃ পিণ্ডে স স্মাৎ কালাগ্নিরুদ্রকঃ ।
পাতালপদবাচ্যানাং সন্ধানামধিদেবতা ।
ভূরাদিলোকত্রিতয়ং গুহ্যে লিঙ্গাগ্রমূলয়োঃ ।
তত্রাধিদেবতা শক্রঃ পিণ্ডেহহববিনায়কঃ ।
দণ্ডাগ্রে দণ্ডকুহরে মহর্লোকে জনস্তথা ।
তপো দণ্ডতলে সত্যং মূলে যোমান (?) এতদীট্ ।^১

অধোলোকের (তলাতল হইতে পাতাল) দেবতা কালাগ্নিরুদ্রক, উর্দ্ধলোকের (ভূরাদিলোকের) অধিদেবতা শক্র। ভূতকুক্ষিতে স্বর্লোকে অচ্যুতদেবতা (বিষ্ণু)—হৃদয়ে রুদ্রলোকে রুদ্রঅধিদেবতা, বক্ষে ঈশ্বরলোকে ঈশ্বরদেবতা, তিনি পিণ্ডে তৃপ্তিস্বরূপ অবস্থিত, কণ্ঠে নীলকণ্ঠলোকে সদাশিব ক্রীকণ্ঠ অধীশ, তিনি সনাতন, পিণ্ডান্তরে কুতাদিবাস। লম্বিকামূলে (আলুজিভে)—ভৈরব দেবতা, তালুদ্বারে শিবলোক তথায় যোগশক্তিরূপ শিব, তালুর অভ্যন্তরে সিদ্ধলোক তথায় প্রবোধাত্মা মহাসিদ্ধ, ললাটে অনাদিলোক তথায় পর অহস্তারূপে অনাদি

অধীশ্বর, শৃঙ্গাটে কুললোকে সদানন্দ স্বরূপে কুলেশ্বর, ব্রহ্মরন্ধ্রে পরব্রহ্মলোক, তথায় পরিপূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্ম পরাপরলোকে পিণ্ডমধ্যে অস্তিত্বরূপ পরেশ্বরদেবতা, ত্রিকুটে শক্তিলোকে শক্তিদেবতা অধিষ্ঠিত, ইহারা “বৃন্তে বিপ্রো নৃপঃ শৌর্যো উগ্ধমে বিড্ভয়েত্ত্বিজঃ।” অর্থাৎ জ্ঞানে বিপ্র, শৌর্য্যে ক্ষত্রিয়, উগ্ধমে বৈশ্য, ভয়ে শূদ্র। গোরক্ষসিদ্ধাস্ত-সংগ্রহে মহাসাকার পিণ্ডের মূর্ত্তি অষ্টককে (শিব, ভৈরব, শ্রীকণ্ঠাদি) “আচারে ব্রাহ্মণা বসন্তি শৌর্য্যো ক্ষত্রিয়া ব্যবসায়ে বৈশ্যাঃ সেবাভাবে শূদ্রাঃ” বলা হইয়াছে। এইরূপে দেহমধ্যে বিভিন্ন ভুবন ও বিভিন্ন অধিদেবতার কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির অবস্থানও দেহমধ্যে কল্পিত হয়, যথা ললাটে শ্রী পর্ব্বত, দক্ষিণ কর্ণে বিষ্ণু, বামে মৈনাক পর্ব্বত, মেরুদণ্ডে মেরু ও দ্বাসপুত্ৰিসহস্র নদী, গঙ্গা, সরযু, যমুনা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন শিরাতে অবস্থিত—বৌদ্ধ গান ও দোহাতেও গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ নীলে পার করেই ॥২

গঙ্গা-যমুনা অর্থে চন্দ্র-সূর্য্য বা ইড়াপিঙ্গলা নাড়ী, সরস্বতীই সুষুম্নানাড়ী বা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী নদী। সিদ্ধযোগী সুষুম্না পথেই ধ্যান সাধন করেন। গোরক্ষসংহিতায় আছে (৪।১৮৩, ১৮৪)

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহতোষা সরস্বতী।

তাসান্ত সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিম্ ॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে সরস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাদের সঙ্গমস্থানে যিনি স্নান করিতে পারেন, তিনিই ধন্য এবং তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।

মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোহতিতুল্লভঃ ॥

ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া জানিবে, এবং পিঙ্গলা নাড়ীকে যমুনা বলিয়া জানিবে, মধ্য নাড়ীর নাম সরস্বতী, কিন্তু ইহাদের পরস্পর সম্মিলন সাতিশয় তুল্লভ পদার্থ। -

তেত্রিশকোটি দেবতা রোমকূপমধ্যে বিরাজ করেন, গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরা যক্ষ সকলের বাসস্থান এই দেহমধ্যে নির্ণীত হয়, নেত্রদ্বয়ে চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান, লতাগুল্ম তৃণাদি, কুমিকীট সকলই দেহকে আশ্রয় করিয়া

আছে। যাহা সুখ তাহা স্বর্গ, যাহা দুঃখ তাহাই নরক। তুরীয় বা নির্বিকল্প অবস্থা মোক্ষ, যাহা কৰ্ম তাহা বন্ধন, যাহা নির্বিকল্প তাহা মুক্তি, “স্বরূপদশায়াং নিজাদৌ স্বাভিজাগরঃ শান্তিঃ”—যাহা অথও পরিপূর্ণ আত্মা বিশ্বরূপ মহেশ্বর, তিনি ঘটে ঘটে (প্রতি দেহে) চিৎপ্রকাশরূপে অধিষ্ঠিত—

অথওপরিপূর্ণাত্মা বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ।

ঘটে ঘটে চিৎপ্রকাশস্তিষ্টতীতি প্রবুধ্যতাম্ ॥^১

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগসাধনই যোগীর লক্ষ্য। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়ের উৎপত্তি। ইহারা ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে যুক্ত। ব্যষ্টি অর্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিশেষ ভাব, সমষ্টি অর্থে সমুদায় বা অপৃথক্ ভাব, যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের সমষ্টি ‘এক বন’ জলের সমষ্টি ভাব ‘এক জলাশয়’ ইত্যাদি।^২ অতএব পিণ্ড জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান হয় ইহা স্থনিশ্চিত। গুরু-উপদেশে পিণ্ডজ্ঞান লাভ করিয়া সাধক প্রকৃতিতে পুরুষ বিলীন করিবেন।

লয়যোগ-সংহিতায় আছে—

ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডে সদৃশে ব্রহ্মপ্রকৃতিসংভবাৎ।

সমষ্টিব্যষ্টিসংবন্ধাদেকসংবন্ধগুণ্মিতে ॥

ঋষিদেবৌ চ পিতরৌ নিত্যাং প্রকৃতিপুরুষৌ।

তিষ্ঠতি পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহনক্ষত্ররাশয়ঃ ॥

পিণ্ডজ্ঞানেন ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানং ভবতি নিশ্চিতম্।

গুরুপদেশতঃ পিণ্ডজ্ঞানমাপ্ত্বা যথায়থম্ ?

ততো নিপুণয়া যুক্ত্যা পুরুষপ্রকৃতেলয়ঃ।^৩

মনুষ্য-শরীরে একরূপ রক্ত আছে যাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। এই সংযোগের প্রধান সহায় চৈতন্যধারা, কারণ চৈতন্যধারা এই ছিদ্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিলিত আছে। স্পর্শেন্দ্রিয়ার ক্রিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়-ধারা দ্বারা মস্তিকে প্রেরিত হয়, অতএব পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি হইতে হইলে চৈতন্যধারা ব্যষ্টির উপযুক্ত ছিদ্র দ্বারা প্রবেশ করিলে এই দেহেই বিশ্বানুভূতি হইতে পারে। উল্লিখিত

নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন ধামের সহিত মনুষ্যদেহের বিভিন্ন চক্রের যোগ সাধন-বলেই স্থাপিত হয়, এই নিমিত্ত অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ কর্তব্য।

কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে^১ শিবকে লিঙ্গ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়কর্তা বলা হইয়াছে, ইহা সিদ্ধলিঙ্গ, মানসলিঙ্গ, মনোলিঙ্গ এবং প্রত্যেকের দেহে অবস্থিত আছে বলিয়া ‘দেহলিঙ্গ’ নামেও অভিহিত হইয়াছে। কুল বা শক্তিও এই লিঙ্গের সহিত নিত্যযুক্ত। গ্রহনক্ষত্র-তারকাদি জাগতিক পদার্থসকল এই লিঙ্গের বিন্দু হইতে জাত, প্রারম্ভে ইহারা বিন্দুমধ্যে স্থিত ছিল (৩।২০-২২), শিবশক্তির মিলনে জগতের ‘সৃষ্টি’ হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বস্তুর জন্ম অনির্দিষ্টের নাশ হয়। “নাশঃ কারণে লয়ঃ”, স্বকারণে লীন হওয়াই ‘লয়’। জীবমধ্যে যে শক্তি মূলাধারে কালাগ্নিক্রমে বিরাজ করেন তাহা নিয়ন্তরে থাকিলে সৃষ্টি রক্ষা পায়, উর্দ্ধমুখী হইলে প্রলয় হয়। জীবদেহমধ্যে সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দশ ভুবন বিরাজমান (দ্বিতীয় পটল)।

জীবদেহের কঙ্কালদণ্ডকে মেরুগিরি বলা হয়, তন্মধ্যস্থ শূন্য নাড়ীই গিরিগহ্বর নামে খ্যাত। এই গহ্বরের নামান্তর ‘আকাশ’, এখানে আসিলে বিন্দু স্থির হইয়া যায়।

সিদ্ধমতে পিণ্ড ও পিণ্ডধার শক্তির জ্ঞান উপলব্ধ না হইলে তত্ত্ববোধ অসম্পূর্ণ থাকে। দেহই পিণ্ড, তাহার জ্ঞান আবশ্যক। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে মূলগত ঐক্য বর্তমান, কারণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মাত্র পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে ভেদ, অতীত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে পিণ্ডেও তাহাই আছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্থায় পিণ্ডেও চতুর্দশ ভুবন বিদ্যমান, ইহা কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের উক্তিতে দেখান হইয়াছে। নিরাকার পরমবস্তু আকার গ্রহণে উন্মুখ হইলে সৃষ্টির সূচনা হয়, তাহা হইতে পর, অনাদি ও আদি, মহাসাকার, প্রাকৃত ও গর্ত এই ছয় পিণ্ডের আবির্ভাব হয়। এই পিণ্ড উৎপত্তির পূর্বাবস্থাই ‘স্বয়ংতত্ত্ব’ ইহার ‘নিজাশক্তি’ স্বরূপাত্মশক্তি, তাহা হইতে পঞ্চশক্তির উদ্ভব হয়, তাহাদেরও পঞ্চ পঞ্চ গুণ থাকায় সর্বসমেত পঞ্চ-বিংশতি গুণের সমাবেশ ‘পরপিণ্ডে’ হয়।

মহাকাশাদি পঞ্চ তত্ত্ব ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সমষ্টিভাবে শিব, ভৈরব আদি মহাসাকার পিণ্ডের ‘অষ্টমূর্তি’ নামে পরিচিত।

ছয় পিণ্ডের কোনটি সিদ্ধপিণ্ড নহে, কারণ পরমপদের সহিত সামরস্য না হওয়া পর্য্যন্ত পিণ্ডসিদ্ধি হয় না। পিণ্ডের আধারভূতা কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন না হইলে পিণ্ডসিদ্ধি হয় না, যোগমার্গের ইহাই বৈশিষ্ট্য। অতএব পিণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান হইলে সাধক সাকার-নিরাকারাতীত পরমপদের সন্ধান পাইতে পারেন। সিদ্ধমতে সাকারের স্থায় নিরাকারও সৃষ্টির অন্তর্গত, কিন্তু পরমতত্ত্ব সাকার বা নিরাকারের অতীত। নিরাকার অবস্থাই অদ্বৈত অবস্থা, সাপেক্ষতা থাকায় উহাও পরমপদ নহে। কুণ্ডলিনী শক্তিই ‘পিণ্ডসংসিদ্ধিকারিণী’, তিনিই পরমপদের সন্ধান দিতে পারেন।

পাশ্চাত্যদেশেও পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা প্রাচীনযুগে প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ একটি এমন নাক্ষত্রিক লোকের কল্পনা করিতে হইবে যাহাতে জড়জগতের সকল বস্তুর সত্তা বিद्यমান আছে। তৎপরে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সমস্ত বস্তুর অভেদ কল্পনা করিয়া সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্বশেষে (মন্ত্রাদি দ্বারা) স্বীয় ইচ্ছাকে বশীভূত করিয়া মানব দেহের ও স্বীয় অদৃষ্টের প্রভু হইতে পারে। এই তিনটি ক্রম সৃষ্টির রহস্যসাধনের তিনটি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।’

ষট্‌পিণ্ড ও মনুষ্যপিণ্ডের আবির্ভাব এবং ত্রিবিধ দেহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল, অতঃপর আমাদের দেহ বা পিণ্ডের বিভিন্ন চক্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের কিরূপ সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল তাহাই বিবেচ্য। এই বিশ্বের উৎপত্তি নাদ ও বিন্দু হইতে, উহারা বস্তুতঃ এক হইলেও একটি আধার অণুটি আধারস্থ সাক্ষী স্বরূপ, অর্থাৎ নাদ ব্যাপকরূপে আকাশের স্থায় আধার স্বরূপ আর বিন্দু সেই আধারস্থ সাক্ষীচৈতন্য। নাদ শক্তি, বিন্দু শক্তিমান। শব্দব্রহ্ম অখণ্ড অব্যক্ত নাদরূপে ক্ষুরিত হইলে তজ্জন্ম আকাশেরও কল্পনা হইল, কারণ শূণ্য কল্পনা ব্যতীত নাদের ক্ষুরণ সম্ভব নহে। সেই আকাশকে শব্দগুণময় বলা হয়। নাদের সঞ্চরণক্রিয়া হইতে বায়ু-তত্ত্বের এবং বায়ুর গতিশীলতা হইতে তেজের উৎপত্তি হয়। তেজ মন্দীভূত হইলে শৈত্য রসরূপে বা জলতত্ত্বে পরিণত হয়। রস ঘনীভূত হইলে ক্লেদের উৎপত্তি, তাহা হইতে গন্ধের উৎপত্তি হয়; এই গন্ধ তন্মাত্রাই

পৃথ্বীতত্ত্বে পরিণত হয়। অতএব নাদ হইতেই শব্দ, স্পর্শ (বায়ু হইতে), রূপ (তেজ হইতে), রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণের উৎপত্তি। এই পঞ্চগুণ মানবদেহেও রহিয়াছে। নাদ হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং তাহা হইতে যথাক্রমে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়,—সমগ্র সৃষ্টির এই পঞ্চস্তর মানবদেহের মেরুমধ্যস্থ কেন্দ্রবিশেষে বর্তমান রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান স্থূলজগৎও পঞ্চস্তরে বিভক্ত, ইহা সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের প্রতিবিম্বমাত্র। স্থূলকে সূক্ষ্মাকারে জানিবার জন্তই যোগীর যোগসাধন। সহস্রদল ও আজ্জাচক্রের উর্দ্ধভাগে অব্যক্ত সৃষ্টিভূমি। অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম মিলিয়া সৃষ্টি সপ্তস্তরে অবস্থিত। অবধূত জ্ঞানানন্দ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের তুলনামূলক যে সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করিতেছি—

“প্রথম স্তরে মহাশূন্য নিগূর্ণ শিবপদবীতে ইচ্ছাক্রাপিণী শক্তির উদয়, তাহার নাদ ও বিন্দুরূপ ধারণ এবং বিন্দুভেদ হইয়া শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি। যোগিদেহে ইহা মস্তিষ্ককোটরের সহস্রদল নামক মহাশূন্য। দ্বিতীয় স্তরে বিন্দুরূপী পুরুষের আজ্জাতে বীজাকারে পঞ্চাশং শূন্যমণ্ডলের উৎপত্তি, সেই সকল শূন্য হইতে ব্যক্তনাদের আবির্ভাব, এবং তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার বিশিষ্ট মহত্ত্বের সৃষ্টি। এই আজ্জাই ব্রহ্ম প্রকৃতি মহামায়া এবং যোগী তাহাকে ক্রমধোর সমীপবর্তী মস্তিষ্কের অধস্তনভাগে সাক্ষাৎ করেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম আজ্জাচক্র। তৃতীয় স্তরে শব্দগুণ-বিশিষ্ট আকাশতত্ত্ব, যোগীর ইহা কণ্ঠপ্রদেশস্থ বিশুদ্ধিচক্র, কারণ আকাশ পুরুষ না হইলে চিন্তাজাল বিশুদ্ধ হয় না। চতুর্থ স্তরে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল, ইহা যোগীর হৃৎপ্রদেশস্থ অনাহতচক্র, যেখানে নাদরূপী অনাহত ধ্বনির ক্ষুরণ প্রথম উপলব্ধি হয়। পঞ্চম স্তরে তেজস্তত্ত্ব বহ্নিমণ্ডল ও তদ্বারা রূপবিকাশ, ইহাই যোগীর মণিপূরচক্র, কারণ মণিগণের বিভিন্ন জ্যোতিই প্রথম রূপসৃষ্টি এবং বহ্নি হইতেই সমস্ত মণিকাঞ্চন উৎপন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠতত্ত্বে রসতত্ত্ব ও কামসৃষ্টি, এইখানেই যোগীর স্বাদিষ্ঠান চক্র। জীব কামরসে লিপ্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, আকারভেদে কাম নানা বন্ধনে জীবকে বাঁধিয়াছে, সেই কামচক্র বা রাধাচক্র জীবাত্মার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া ইহার নাম স্বাদিষ্ঠান। কামই প্রেমে পরিণত হয়, তখন কামচক্র রাধাচক্র হইয়া দাঁড়ায়। সপ্তমস্তরে পার্থিবমণ্ডল, ইহাই জীবজগতের স্থূলভোগের স্থান

‘মূলাধার’, পার্থিব ভোগে নিম্পৃহ না হইলে উর্দ্ধতন ভূমির অভিজ্ঞান আসে না।”^১

এই সপ্তস্তরে বিস্তৃত সৃষ্টিমণ্ডলে যোগীর সপ্ত যোগভূমি ও সপ্ত আচার কল্পিত হয়। মূলাধারে প্রথম ভূমিতে আত্মজ্ঞানলাভের উদয় হয়, তাই উহাতে বেদাচার, স্বাধিষ্ঠানে বৈরাগ্যের উদয়ে যোগী বৈষ্ণবাচারে রত হন। মণিপূরে যোগী জিতেন্দ্রিয় ও অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনে রত হন বলিয়া শৈবাচারী, অনাহতে রাগহীন যোগী শুদ্ধসবস্থ বলিয়া দক্ষিণাচারী, বিশুদ্ধে যোগী আকাশবৎ স্বচ্ছ হন এবং প্রকৃতির লয়ক্রম উপস্থিত হয় বলিয়া বামাচারী। আজ্ঞাতে বিন্দুদর্শন হয় এবং সোহং ভাবের বিকাশ হয় বলিয়া তখন সিক্তাস্তচারী। সহস্রদলমণ্ডলে সচ্চিদানন্দময় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া যোগীর শক্রমিত্র, বিষ্ঠাচন্দনে ভেদাভেদ থাকে না বলিয়া কুলাচারী বা ‘কৌল’ বলিয়া অভিহিত হন। বুদ্ধিকৃত কৰ্ম তখন লুপ্ত হইয়া যায় এবং যোগী কুলের অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া বিচরণ করেন।^২

নাথসিদ্ধগণ নিজেদের ‘কৌল’ বলিতেন—মৎস্যস্তোত্রের পুথির ভণিতায় তাহা পাওয়া যায়। নাথগণ দেহমধ্যে চক্রের ধ্যানের দ্বারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বা স্থূল ও সূক্ষ্মের সম্বন্ধ স্থাপনা করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। অমনস্ক গ্রন্থেও আছে “ব্রহ্মাণ্ডং সফলং পশ্যেৎ পানিস্থমিব মৌক্তিকং” যোগী করস্থিত মুক্তার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করেন।^৩ যোগী পঞ্চতত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন (১।৭০—৭৫) এবং “রাধাযন্ত্র বিধাননে জীবন্মুক্তো ভবিষ্যতি” (২।১৬) ইহাও উক্ত গ্রন্থে আছে। এই রাধাযন্ত্র পূর্বোক্ত কামচক্র বা রাধাচক্র বলিয়া অনুমান হয়, কামই প্রেমে পরিণত হইয়া মানবকে উর্দ্ধমুখী করে।

রাধাস্বামী সম্প্রদায় মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্চক্রের মধ্যে নিম্নের চারি চক্র দ্বারা মনুষ্য-শরীরের ক্রিয়া হয় এবং সকলেই তাহা বুঝিতে পারে কিন্তু উপরের দুইটি চক্রক্রিয়া যোগসাধন করিলে প্রকাশিত হয়, এইরূপ মতামত প্রচলিত আছে। আজ্ঞাচক্রে আত্মার অবস্থান, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ চক্রে প্রাণ ও মনের

১। ময়যোগ, অবদুত জ্ঞানানন্দ পৃ ১৫০

২। ময়যোগ, অবদুত জ্ঞানানন্দ পৃ ১৫৪, ১৫৫

৩। অমনস্ক ১।৭৬

স্থান বর্ণিত হয়। মনুষ্যদেহের ষট্চক্রের স্থায় ব্রহ্মাণ্ডের ষট্চক্র আছে, পিণ্ডদেশে মনের সহিত আত্মার যেকোন সঙ্ঘর্ষ, ব্রহ্মাণ্ডেও মনের সহিত আত্মার সেইরূপ সঙ্ঘর্ষ। এই পিণ্ডদেশের বহির্ভূত এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহাতে ষট্চক্র আছে বলিয়াই তাহা হইতে উৎপন্ন পিণ্ডদেশেও ষট্চক্র দেখিতে পাই। সন্তদের পরিভাষায় পিণ্ডদেশের অতীত এই বিশাল দেশকে 'ব্রহ্মাণ্ড' বলে। পিণ্ডদেশের ষট্চক্র দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ষট্চক্রের ধারণা করিতে হয়, পরব্রহ্মপদও এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। পরব্রহ্মপদকে বাদ দিলে ব্রহ্মাণ্ডের ষড়্ভাগ অসম্পূর্ণ থাকে ও পিণ্ডদেশের ষট্চক্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের ষড়্ভাগের সামঞ্জস্য হয় না। পিণ্ডদেশের ষট্চক্র ব্রহ্মাণ্ডের ষট্চক্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

মনুষ্যশরীরের কেন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের তদনুরূপ কেন্দ্রশক্তির সঙ্ঘর্ষ আছে। মনুষ্যশরীরের ভিন্ন ভিন্ন চক্রে মনের ভিতর দিয়াই জীবনীশক্তি অপিত হইয়া থাকে। অনাহত চক্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইলে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়। আত্মা মনের সহিত মিলিত হইয়া ষট্চক্রের কার্য্য করে। সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের চিতিশক্তির কেন্দ্র আছে, উহা ব্রহ্মাণ্ড-মনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে। বেদে এই পরমপদের 'নেতি' 'নেতি' করিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু আত্মা ও মনের যেকোন ভেদ, পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের ভেদও তদ্রূপ। আত্মা যেকোন মনের সহিত মিলিত, সেইরূপ পরব্রহ্মও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও মিলিত, যথা ঘনক্ষেত্র মধ্যে সম-চতুর্ভুজক্ষেত্র ভিন্ন হইয়াও মিলিত।

বেদের ব্রহ্মাণ্ড ও সন্তদের ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন, কারণ সন্তদের পরমব্রহ্ম পদও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। কবীরাদির মতে ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি উচ্চধাম আছে—সুন্ন, ত্রিকুটি ও সহস্রদলকমল। সুন্নের দেবতা অবিনাশী 'অক্ষর' তিনি ব্রহ্মাণ্ডী মন বা পুরুষ বা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত। এই পুরুষ অক্ষর হইতে চৈতন্যশক্তি সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করেন, ত্রিকুটির দেবতা 'ব্রহ্ম' এবং সহস্রারের 'নিরঞ্জন'। অতএব ব্রহ্মের তিন রূপ, অব্যাকৃত, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট; ইহারা যথাক্রমে অপ্রকাশিত, প্রকাশের উৎপত্তিস্থল ও প্রকাশিতরূপ (সুন্ন, ত্রিকুটিতে ও সহস্রারে)। জীবের তিনটি অবস্থা সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ইহার সহিত তুলনীয়।

মনুষ্যের মস্তিষ্কের মধ্যে যে রক্ত আছে তাহাতে দ্বাদশ দ্বার আছে, চক্ষুর ছিদ্র দ্বারা সূর্য্যের সহিত সঙ্ঘর্ষ স্থাপন যেকোন সম্ভব, সাধনদ্বারা

মনুষ্য এই দ্বাদশ দ্বার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের ষট্চক্র ও চৈতন্যদেশের ষড়্ধামের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির এইরূপ সম্বন্ধ রাধাস্বামী সম্প্রদায় মধ্যে বর্ণিত হয়।^১

মনুষ্যদেহকে 'শ্রীচক্র'রূপে ধারণা করা হয়, শ্রীচক্রের পূজাই বহির্ধাগ। পিও মধ্যে শক্তির পঞ্চ রূপ—দ্বক্, অম্বক্, মাংস, মেদ ও অস্থি কল্পনা করা হয় ও শিবের চতুর্কূপ মজ্জা, শুক্র, প্রাণ ও জীব কল্পনা করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে শক্তির পঞ্চরূপ—৫ ভূত, ৫ তন্মাত্র, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ এবং শিবের চতুর্কূপ—মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, মহেশ্বর ও সদাশিব, কল্পনা করিয়া বহির্ধাগ নিষ্পন্ন হয়।^২

এইরূপে বহির্ধাগ পিও ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া যোগী মুক্ত হইবার প্রয়াস করেন। একটি জন্মে অস্মিতার তিনটি রূপ প্রকাশিত দেখা যায়, তাহারা যথাক্রমে মানস শরীর, প্রাণময় শরীর ও ভৌতিক শরীর। এই প্রত্যেক দেহের স্বকীয় দৈহিক অনুভূতি আছে। ভৌতিক দেহের জন্মদাতা পিতা ও মাতা, প্রাণময় ও মানস শরীরের জন্ম 'অহম্' হইতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক জন্মের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। অস্মিতা স্বাতন্ত্র্যের আংশিক রূপমাত্র। মানব বারম্বার এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়, মুক্তার হারের এক একটি মুক্তা তাহার এক একটি জন্মের ন্যায়, সমগ্র হারটি তাহার স্বাতন্ত্র্যকে নির্দেশ করে। উহাই অহম্ বা 'আত্মা'। ইহার অংশমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টরূপে দেহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই 'অস্মিতা' নামে খ্যাত। জ্যামিতির বিংশ ত্রিকোণ যুক্ত icosahedron নামক ঘনবস্তুর প্রত্যেকটি ত্রিকোণ 'অস্মিতাকে' ব্যক্ত করিবার উপমা স্বরূপ। বিংশ ত্রিকোণকে পরস্পর সমীপবর্তী স্থাপন করিলেও ঘনবস্তুর তৃতীয় মাত্রার অনুভূতি হইবে না, তদ্রূপ প্রত্যেক জন্মকে ধার্য্য করিয়া তাহাদের এক সঙ্গে ধারণা করিলেও প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে না। এই বিধানে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় শরীরের ভেদ নির্ণয় করেন।^৩

সিদ্ধযোগীর সাধনায় সেই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিই বা আত্মোপলব্ধির সাধন দেখা যায়। সিদ্ধগণ এক জন্মেই যোগসাধনার দ্বারা ও

১। অন্তঃকরণ পৃ. ২৬, ২৭, ৩০, ৪১ ও ভূমিকা ৮০।

২। Wave of Bliss. Arthur Avalon p. ৭.

৩। First Principles of Theosophy, ch. VI, Jinarajadasa.

পিণ্ডের বিচার দ্বারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ স্থাপনা করিয়া শিবহ-
লাভের প্রয়াস করেন। সেই নিমিত্ত মধ্যযুগের সাধনায় শ্রীচক্রপূজাদির
স্থান আছে। তাহার দ্বারা বহির্যোগ সাধনের সহিত অন্তর্যোগ সাধনই
মুখ্যতম লক্ষ্য। মানবের মন অতিশয় বক্র, তাহাকে সরল করিয়া
নাদজয়ী শক্তিরূপে সুষুমা পথে প্রবেশ করানই সাধন। আত্মশক্তি
তালুমূলে উর্দ্ধে শূন্য স্থানে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন, পৃথ্বী-
মণ্ডলে আসিয়া সৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তাই পৃথিবীতে নিবৃত্তিকলা এবং রসতত্ত্বে
প্রতিষ্ঠা, বহ্নিতে বিজ্ঞা, বায়ুতে শান্তি, আকাশে শাস্ত্যতীতা কলা।
নাদশক্তি শব্দব্রহ্ম মূলাধারে আধারপদে আসিয়া জড়ভাবাপন্ন হন, তাই
যোগী সেই জড়তা মুক্ত করিতে সুষুমার পথে শক্তিকে উর্দ্ধে নীত করেন।
বিভূতिलाভ বা আত্মসাক্ষাৎকার, যাহার জন্যই হউক, মনকে সুষুমা পথে
চালিত করিতেই হয়, সুষুমা সর্বশক্তির আধার। এই পথেই মন শূন্যে
নীত হয়, শূন্য কি তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শূন্যত্ব

‘শূন্যত্ব’ শব্দটী স্বভাবতঃই আমাদিগকে বৌদ্ধধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ বৌদ্ধেরা শূন্য হইতে জগতের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে শূন্যত্বের ধারণা প্রচলিত আছে, ঋগ্বেদের যুগেও শূন্যবাদ প্রচারিত হয়, অতএব শূন্যত্ব বা শূন্যবাদ যে কেবল বৌদ্ধধর্মের সহিত যুক্ত একরূপ ধারণা করা অযথার্থ। ‘শূন্যের’ সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কারণ মধ্যযুগের বহু সাধকসম্প্রদায় উহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া স্ব স্ব কল্পনা অনুযায়ী শূন্যত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান-কাল হইতে যে সকল বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যেই কোন না কোন প্রকারে শূন্যের উল্লেখ দেখা যায়। জৈনধর্ম শূন্যের স্থান না থাকিলেও শূন্যের কথা পাই—

যথা— সূর্য ন হোই সূর্য দীপ্যে সূর্য চ তিভবণে সূর্য

অবহরই পাবপুণ্য সূর্য সহাবেণ নও অশ্মা।^১

অর্থাৎ শূন্য শূন্য নহে, শূন্য হইতেই শূন্য দেখা যায়, ত্রিভুবন শূন্য, পাপ শূন্য, সমস্তই এই শূন্যস্বভাবে বিলীন হয়।

কালক্রমে নাথধর্মের উদ্ভব হইলে তাহাতেও ‘শূন্যের’ ধারণা প্রবেশ করে। সহজিয়া বৌদ্ধের শূন্যসমাধিই সহজাবস্থালভ, নাথসিদ্ধের সমরস-সাধনই সহজাবস্থা লাভ, ইহাই পরমপদে স্থিতি। সহজিয়ামতের সহজাবস্থাই ‘মহাসুখ’, ইহা বিকল্পহীন অবস্থা, এই অবস্থায় জরামরণ থাকে না, কর্তৃত্ববোধ লুপ্ত হয়।^২ গুরুর উপদেশে শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, সেই গুরুর স্বরূপ ‘যুগনন্দরূপ’ বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনস্বরূপ। নাথমতেও গুরু উপদেশে শিব ও শক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়া তত্ত্বাতীত অবস্থায় উপনীত হওয়াই পরমপদ লাভ। ইহাই শিব ও শক্তির মিলন বা সামরস।

১। গাহড়া দৌহা উল্লেখ—মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধসাধনের ধারা—‘পরিচয়’ আশাঢ় ১৩৪৭,

ডঃ প্রবোধ বাগ্‌চী।

২। চণ্ডী-২৮ অষ্টবা।

বৌদ্ধ সহজিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ শৃঙ্খের মিলনে অনাদি দিব্য মিথুনাবস্থার কল্পনা করেন, এই অবস্থায় যুগপৎ সর্বধর্মের উদয় হয়, সকল ভেদাভেদ দূর হইয়া অদ্বয়সিদ্ধি হয়। বৌদ্ধ সহজিয়ামতে চারিশৃঙ্খ কথা আছে, নাথমার্গের হঠযোগপ্রদীপিকা গ্রন্থের চতুর্থ উপদেশে শৃঙ্খের কথা আছে।^{১)} ইহারা যোগের আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি অবস্থা-চতুষ্টয়ের সহিত যুক্ত শব্দের স্তরবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

ত্রন্ধগ্রন্থেভবেদ্রোদো হানন্দঃ শৃঙ্খসম্ভবঃ ।
বিচিত্রঃ কণকো দেহেহনাহতঃ শ্রয়তে ধ্বনিঃ ॥৭০
দিব্যদেহশ্চ তেজস্বী দিব্যগন্ধস্বরোগবান্ ।
সম্পূর্ণহৃদয়ঃ শৃঙ্খ আরম্ভো যোগবান্ ভবেৎ ॥৭১
দ্বিতীয়ায়াং ঘটীকৃত্যে বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ ।

* * *

অতিশৃঙ্খো বিমর্দশ্চ ভেরীশব্দস্তথা ভবেৎ ॥৭৩
তৃতীয়ায়াং তু বিজ্ঞেয়ো বিহায়োমর্দলধ্বনিঃ ।
মহাশৃঙ্খঃ তদা যাতি সর্বসিদ্ধিসমাপ্তয়ম্ ॥৭৪

এই গ্রন্থের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

মুদ্রেয়ং খলু শাস্তবী ভবতি সা লক্ষ্য প্রসাদাদ্ গুরোঃ ।
শৃঙ্খাশৃঙ্খাবিলক্ষণং স্মরতি তন্তস্বং পরং শাস্তবম্ ॥২

অর্থাৎ গুরুপ্রসাদে শাস্তবী মুদ্রা লাভ হইলে যে পরমতত্ত্ব লাভ হয়, তাহা শৃঙ্খাশৃঙ্খভাববর্জিত। এইরূপ যোগীই নাথমতে ‘জীবমুক্ত’।

বস্তুতঃ (সহজিয়াদের সহজাবস্থালভ বা তুরীয়াতীত অবস্থালভ, নাথমার্গের উন্নয়নী অবস্থা) বা পাতঞ্জল যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বৌদ্ধ সহজিয়া কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়াছেন, মহাসুখের নিবাস চতুর্দলপদ্ম মধ্যে :—

(চউ) পদ্মের চউকম চউমৃণাল শিখা মহাসুখবাসে।^৩

অর্থাৎ শৃঙ্খমতিশৃঙ্খঃ মহাশৃঙ্খমিতি চতুঃশৃঙ্খস্বরূপেণ পত্রচতুষ্টয়ং চতুরাদি-
স্বরূপেণ চতুর্মৃণালসংস্থিতা। মহাসুখং বসত্যগ্নিমিতি মহাসুখাবাস
উক্ষীষকমলং তত্র সর্বশৃঙ্খালয়ো—মেরুগিরিশিখরমিত্যর্থঃ ॥৩

এইরূপে 'শূন্য' নিগূর্ণ সাধকদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরক্তের নামান্তরে দাঁড়াইয়াছে।

কবীরাদি এই 'শূন্য'-মণ্ডল মধ্যে পরম জ্যোতির প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন।

নাথসম্প্রদায়ে প্রচলিত 'অমনক' নামক গ্রন্থে আছে যোগী শূন্যপর হইবেন, চিন্তানাশ হইলে আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে। অতএব সর্ব বৃত্তি নিরোধের দ্বারা যোগীর প্রযত্ন কল্পনা সংকল্প ও চিন্তাশূন্য হইলে অর্থাৎ যোগী সর্বদা শূন্যময় হইয়া থাকিলে তত্ত্বের প্রকাশ হইবে। যথা :—

ন কিকিচ্চিন্তয়েদ্ যোগী সদা শূন্যপরো ভবেৎ ।

ন কিকিচ্চিন্তনাদেব স্বয়ং তত্ত্বং প্রকাশতে ॥

বাস্তবকায়সংকোভং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ।

দিশা চাস্তমিবাগ্নানং স্থিরং ধারয়েৎ সদা ॥

যাবৎ প্রযত্নলেশোহস্তি যাবৎ সংকল্পকল্পনা ।

যাবৎ চিন্তাধিকারোহস্তি তাবত্তত্ত্বকথা কৃতঃ ॥^১

(এই তত্ত্বের প্রকাশে তত্ত্বলীন যোগী নির্বাক প্রাপ্ত হন, নির্বাক্তে স্থাপিত অচঞ্চল দীপের স্থায় জগদ্ব্যাপারে বিনিমুক্ত যোগী নিশ্চল ও নিশ্চলমনা হন।) গীতাতেও আছে—

যথা দীপো নিবাতস্থো নেদ্রতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুজ্যতো যোগমাগ্নয়ঃ ॥^২

অর্থাৎ নির্বাক্ত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, আত্মযোগ অনুষ্ঠানকারী যোগীর একাগ্র মনের সেই উপমা জানিবে অর্থাৎ যোগীর চিত্ত সেইরূপ স্থির দীপশিখার স্থায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে।

শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া যোগী জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত লবণের স্থায় ক্রমশঃ ব্রহ্মমধ্যে লীন হইয়া যান।

লবণং তোয় সম্পর্কাদ্ যথা তোয়সমং ভবেৎ ।

মনোহপি ব্রহ্মসম্পর্কান্তথা ব্রহ্মময়ং ভবেৎ ॥

যথা ক্ষারময়ত্বেন প্রাপ্যতে লবণং স্বকং ॥

ব্রহ্মজ্ঞানময়ত্বেন নির্বাকং মনসন্তথা ।

দুতাং পৃথগ্বিরহিতং দ্বুতে লীনং দ্বুতাং যথা ॥

তত্ত্বে লীনস্তথা যোগী পৃথগ্ভাবং ন বিন্দতি ।^১

বৌদ্ধ ও জৈন সাধনায় ইহার অনুরূপ কথা পাই। সরহপাদ বলিয়াছেন—

অলিঙ্গ ধর্ম মহাস্থ পইসই

লবণ জিম পানী হি বিলিঞ্জই ॥

অর্থাৎ লবণ যেমন জলে বিলীন হয়, অলীক ধর্মসমূহও তেমনি ‘মহাস্থে’ বিলীন হয়। বৌদ্ধযোগ মতে ইহা ‘সহজানন্দ’। ‘সমরস’ বা ‘সহজানন্দ’ একই ভাবাত্মক।

পাছড়া দৌহায় পাই—

জিম লোগু বিলিঞ্জই পানিয়ছ

তিন জই চিত্ত বিলিঞ্জ।

অর্থাৎ চিত্ত তখন এমনভাবে বিলীন হয় যেমন লবণ জলের মধ্যে বিলীন হয়।^২

শ্বাসপ্রশ্বাস সমান হইলে শ্বস্মাদ্বার মুক্ত হয়, ইহাই শূন্যপদবী বা ব্রহ্মনাড়ী, চন্দ্রসূর্য্যের মিলন ভিন্ন এই শূন্যপথ উন্মুক্ত হয় না। শূন্যতাও আপেক্ষিক, অতএব হঠযোগে শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য স্তরভেদ আছে, বিশুদ্ধ শূন্যই ‘নির্ব্বাণপদ’, ইহা বাসনাকামনাহীন, কর্ম্মাশয়হীন, তত্ত্বাতীত অবস্থা। শিব ও শক্তির পার্থক্য বা বিন্দুদ্বয় অতিক্রম না করিলে শূন্যাবস্থার উদয় হয় না। পারমার্থিক অবস্থাই ‘শূন্য’ নামে পরিচিত। (শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্যে ক্লেশাদি মল আছে, কিন্তু চতুর্থ বা তুরীয়শূন্য নিরূপাধিক, ইহা অদ্বৈতভূমি। ইহার প্রভাবে তিন শূন্যের দোষ অপগত হয়, তাই ইহা বিশুদ্ধশূন্য, বৌদ্ধ সহজিয়া মতে ইহার নাম ‘প্রভাস্বর’। প্রথম তিনশূন্যে কায়ানন্দ, চিত্তানন্দ, রাগানন্দ অনুভূত হয়, ইহারা একরস হইয়া চতুর্থ আনন্দের আবির্ভাব হয়, তখন জরামৃত্যুরাহিত্য হয় ও সিদ্ধিসকল করতলগত হয়। সপ্ত প্রকৃতিদোষ ও সমাধিমল দূর হয়, “নিবর্তন্তে চ ধাতুনাং বন্ধা কুর্ব্বন্তি ধাতবঃ। চতুঃশ্বাসলয়েনাপি সপ্তধাতুগতা রসাঃ” ॥^৩ তৎপরে বিন্দু ও নাদ সাম্যাপ্রাপ্ত হয়, বিকল্প থাকে না। গ্রাহকজ্ঞানরূপ

১। অমরস, প্রথম অধ্যায় ২৩—২৮ শ্লোক।

২। মধ্যমুপের জৈন ও বৌদ্ধসাধনার ধারা—প্রবোধ বাগচী।

৩। অমরস ১।৩৪

বিকল্পই বৌদ্ধ সহজিয়া মতে 'উপায়', গ্রাহ্যজ্ঞানরূপ বিকল্প 'প্রজ্ঞা', তন্ত্রের উহাই 'বিন্দু' ও 'নাদ'। চতুর্থআনন্দ বা অনন্তরবোধিতে গ্রাহ্যগ্রাহক ভেদ থাকে না, উপায় ও প্রজ্ঞা বা নাদ ও বিন্দুর মিলন হয়, বৈতন্ড্য অদ্বৈতে পরিণত হইয়া নির্বাকপদ প্রকাশিত হয়। অতএব নাথমতে নির্বাক লাভ করিতে হইলে চিত্তকে শূন্যময় করিবার উপদেশ আছে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইল।

এতদ্ব্যতীত নাথধর্মে যে 'ব্যোমপঞ্চকে'র সাধনা আছে তাহাও শূন্যেরই সাধনা। আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তৎস্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ ইহারা ব্যোমপঞ্চক বা পঞ্চ আকাশ নামে পরিচিত। ইহা শূন্য হইতে শূন্যে গমনের সাধনা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিবন্ধের সাধনা অংশে দেওয়া হইয়াছে। (এতৎসহ পরিশিষ্ট সংযোজিত সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক ৩০ দ্রষ্টব্য।) ইহা দ্বারাও নাথপন্থে শূন্যসাধনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, "তিষ্ঠতি খেচরী মুদ্রা তস্মিন শূন্যে নিরঞ্জে"।^১ এখানেও শূন্য কল্পনা। নাথপন্থীদের মধ্যে শিবঠাকুরের সহিত নিরঞ্জনের পূজাবিধিও আছে, এই 'নিরঞ্জন' শূন্যমূর্ত্তি, নিগুণী সম্প্রদায়ের সাধকেরাও নিরঞ্জনের উপাসক। নাথযোগীরা ভারতের সর্বত্র পর্য্যটন করিলেও শৈবতীর্থসকলই তাঁহাদের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে উহাদের আচার-পদ্ধতি বর্ণাশ্রমী হিন্দু হইতে ভিন্ন হওয়ায়, কালক্রমে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতির নাথপন্থে সমাবেশ হওয়া বিচিত্র নহে। ডাঃ পীতাম্বর বড়খাল বলিয়াছেন, নিরঞ্জন সম্প্রদায় নাথ-সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। ইহা নাথ ও নিগুণ সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়-বিশেষ, কবীরাদির সহিত বিশেষ মতদ্বৈধ ইহাদের নাই।^২

নিরঞ্জন শব্দের অর্থ, যাহার অঞ্জন বা কালিমা নাই (নিঃ+অঞ্জন)।

ডাঃ প্রবোধ বাগচীও বলিয়াছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগুলির বহিরঙ্গ বা ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাব দূর হইয়া খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সাধন বিষয়ে একটা ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকেরা এই সাধনপন্থারই পুষ্টিসাধন করেন।... বৌদ্ধধর্ম্মের শেষযুগের গ্রন্থসমূহে মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ, দেবদেবীর আবাহন,

১। গো. সি. স. পৃ ৩৬

২। নিগুণ সম্প্রদায়ে বড়খাল ভূমিকা ৮০-৮০

গুরুশিষ্যের জ্ঞাতিবিচার প্রভৃতি বহিরঙ্গ কিছু নাই, একমাত্র ‘যোগ’ বা অন্তরঙ্গ সাধনই এই যুগের প্রধান অঙ্গ।^১

অতএব মধ্যযুগের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাধনগত ঐক্য থাকা বিচিত্র নহে। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধদোহা ও চর্যাপদের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের যোগ দেখা যায়, নাথপন্থেও কুণ্ডলিনী জাগরণ প্রসিদ্ধ, কুণ্ডলী অর্থাৎ যাহা কুণ্ডলাকার অর্থাৎ বৃত্তাকার বা শূন্যাকার।

নাথপন্থীদের মধ্যে ওঁকার বা প্রণব সাধনার বিশিষ্ট স্থান আছে। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, “অয়মোঙ্কারো মহাসিদ্ধানাং ধ্যেয়ঃ।” তান্ত্রিক সাহিত্যে প্রণবের ব্যাপিনীকে ‘শূন্য’ নামে অভিহিত করা হয়।^২ ব্যাপিনী ওঁকারের মাত্রাংশ, ওঁকারের স্বরূপ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। নাথ সম্প্রদায়ের কোন কোন গ্রন্থে ব্যাপক নিরাকার নাথস্বরূপের বিবরণ প্রণবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপিনী ও নিরাকারনাথকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তবুতঃ উভয়ের মধ্যে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তন্ত্রমতে ব্যাপিনীর পর সমনা, সূতরাং ব্যাপিনী মহামনের অন্তর্গত অবস্থা। নাথগণ নিরাকার-নাথকে মনের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, অন্ততঃ সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রণবের স্বরূপ যথা—“উকারোহত্ররূপস্বরূপম্ অর্দ্ধমাত্রা শক্তিস্বরূপম্ বিন্দুর্নাথস্বরূপম্ অর্দ্ধমাত্রয়াজ্ঞাতোহকারো বিষ্ণু-স্বরূপম্ বিন্দোজ্ঞাতো মকারো ব্রহ্মস্বরূপম্ ধ্বনির্নিরাকার নাথস্বরূপম্ ব্যাপকং ধ্বনির্বর্ণশ্চোভয়মপি মিলিতং পূর্ণং যদদ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্ সাকার নিরাকারাতীতম্ অদ্বৈতোপরবর্ত্তি মহানাথ স্বরূপমিতি।.....পুনর্ধ্বনি-নিরাকারনাথরূপং ধ্বনির্বর্ণশ্চোভয়ায়কঃ পূর্ণনাথস্ত ... ধ্যানভাগস্তাধিক্যাং ধ্বনিশ্চ নাথরূপমেব”।^৩

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ উল্লিখিত গোরক্ষবোধেও ওঁকারধ্বনি ও শূন্যত্বের কথা আছে। যথা, চঞ্চল মন যখন স্থির হইয়া শূন্যে থাকে তখন ওঁকারধ্বনি শ্রুত হয়। মনের চঞ্চল অবস্থায় সে ধ্বনি শোনা যায় না। ওঁকার ধ্বনি হইতে জগতের উৎপত্তি। যখন সকলই স্থির থাকে, তখন সমস্তই মহাশূন্যে বিলীন থাকে। কিন্তু সেই মহাশূন্যে যখন স্পন্দন উদ্ভূত হয়, তখনই জগতের সৃষ্টি হয়। আকাশের স্পন্দন হইলেই শব্দ সত্ত্বত

১। পরিচয় পত্রিকা, আবার ১৩৩৭ প্রবোধ বাগচী প্রবন্ধ মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা।

২। গো. সি. স. পৃ ৪৭

হয়, সেই শব্দই ওঁকারনাদ। মহাব্যোমে এই ওঁকারনাদ অনবরতই হইতেছে। ইত্যাদি।^১

আর একখানি গোরক্ষবোধের পুঁথি (ইহাতে কবীরপন্থীদের মতামত অস্বাধিক প্রবেশ করিয়াছে) তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, “অবিনাশীর জীব শূন্য, শূন্যের জীব অনূপ, অনূপের জীব কাল, কালের জীব শিব, শিবের জীব নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের জীব একব্রহ্ম। নিরঞ্জন অনিল হইতে উৎপন্ন, শিব নিরঞ্জন হইতে উৎপন্ন, কাল শিব হইতে উৎপন্ন, ওঁকার কাল হইতে উৎপন্ন। শূন্য ওঁকার হইতে উৎপন্ন।.....তনুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়া যায়, ... শূন্য ওঁকারে মিশে।”^২

অতএব ওঁকার সাধন করিতে হইলে শূন্যের সাধনা অত্যাৱশ্যক ইহা গোরক্ষবোধ হইতে সহজেই অনুমেয়।

সদানাথ যোগী রচিত ‘গোরক্ষ-বিকাশ’ নামক গ্রন্থে রাজপুতনায় প্রাপ্ত গোরক্ষবোধের উল্লেখ আছে, তাহাতেও প্রশ্নোত্তর ছলে শূন্যের বাস কোথায়?—শূন্যের নিরন্তরে বাস। মনের কোন্ রূপ?—মনের ‘শূন্য’ রূপ। হৃদয় যখন ছিল না তখন শূন্যে মন থাকিত। “মন সো আত্মা শূন্য সমায়,” ইত্যাদি নানা কথা আছে।^৩

উপরোক্ত গোরক্ষবোধ ও ডাঃ মোহন সিং উল্লিখিত গোরক্ষবোধে সমজাতীয় প্রশ্নোত্তর আছে, তবে শ্লোকসংখ্যায় পার্থক্য আছে, যথা—কায়ামধ্যে কয়লাখ চান্দ? পুষ্পমধ্যে কি সুগন্ধ, দুগ্ধমধ্যে কোথায় ঘৃত, দেহমধ্যে কোথায় জীব, এই প্রশ্নটি উল্লিখিত গোরক্ষ-বিকাশে উল্লিখিত গোরক্ষবোধের শ্লোকসংখ্যা ১৩, ডাঃ মোহন সিং রচিত গোরক্ষনাথ গ্রন্থে উল্লিখিত গোরক্ষবোধের শ্লোক সংখ্যা ৩৩।

স্বামীজি—কোন শূন্যসে উৎপন্ন আয়, কোন শূন্য সদগুরু বুঝায়।

কোন শূন্যমে রহে সমায়, যে তত্ত্ব কহে গুরু সমঝায় ॥

অবধো—সহজ শূন্যসে উৎপন্ন হৈ, সমঝ শূন্য সদগুরু বতলায়।

অতীত শূন্যমে রহে সমায় যে তত্ত্ব কহে গুরু সমঝায় ॥

স্বামীজি—কোন শূন্যসে জ্যোতি পলটে, কোন শূন্যসে ত্রিভুবন সার।

কোন শূন্যসে বাণী কুরকে, কোন শূন্যসে উত্তরে পার ॥

১। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ ‘যোগিজ্ঞাপ্তি’, অনুলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ।

২। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২২ যোগিজ্ঞাপ্তি প্রবন্ধ।

৩। গোরক্ষ-বিকাশ, সদানাথ যোগী, পৃ ৩৬, ৩৭, ৭৯ প্রশ্নোত্তর ৪, ৭, ৮, ২০, ১১৪।

অবধো—উগ্রতেজ সে জ্যোতি পলটে, প্রভু শূন্যসে ত্রিভুবন সার ।

সোহহঃশূন্য সে বাচা ফুরকে, অতীত শূন্যসে উত্তরে পার ॥^১

এই যোগ-সাধন শূন্য-সাধনার নামান্তর, এই 'শূন্য' নিরাকার ।
সাকার উপাসনায় বা ব্রহ্মলাভে শূন্যতত্ত্বের প্রশ্ন উঠে না । এই শূন্য
সাধনাই যোগীর লয়সাধনা ।

লয়সাধনা দ্বারা উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তিই নাথযোগীর লক্ষ্য । এই
অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে নির্বিষয় যোগীর চিন্ত—

“অন্তঃ শূন্যে বহিঃশূন্যঃ শূন্যঃ কুন্ত ইবান্বরে

অন্তঃ পূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণঃ কুন্ত ইবার্ণবে”

হয়, অর্থাৎ লয় অবস্থায় যোগীর চিন্ত শূন্যময় হয় ।^২

উন্মনী অবস্থায় শূন্য কল্পনা অন্তর্য ও পাই, যথা—শূন্যই মন্দির, শব্দ
তার দ্বার, জ্যোতিই মূর্তি, অগ্নি হৃদয়ে, অরূপের রূপ ধ্যানে বা গুরুর
আদেশে সাধক গুপ্ততত্ত্ব জানিতে পারে বা উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।^৩

গোরক্ষনাথ-কৃত পদে আছে “জীবতে হি উলটা মরনা । সহজি
হী আকাশ চরনা” ইত্যাদি ।^৪ এই স্থানে সহজভাবে আকাশ গমনের
কথায় শূন্য-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।

শূন্য আমাদের মধ্যে আছে । নাদের উৎপত্তি অজ্ঞেয়ে বা ওঁকারে,
ইহার শূন্যে স্থিতি, ইহার পবনের মধ্যে লয়, নিরঞ্জন বা কায়াহীনের
সহিত বা আকাশের সহিত ইহার মিলন সম্ভব ।^৫

প্রশ্ন । কায়া ন হোতী তব কহী রহতা সুরজ চান্দ ।

পুহ্প ন হোতা তব কহী রহত গন্ধ ।

দুধ নহী হোতা তব কহী রহতা ঘীব ।

কায়া ন হোতা তব কহী রহতা জীব ?—

উত্তর । - কায়া ন হোতী তব নিরস্তুরি (মধ্যে) রহতা সুরজ চন্দ ।

পুহ্প নহী হোতা তব অনহদ রহতা গন্ধ ।

দুধ ন হোতা তব স্ননি রহতা জীব ।

কায়া ন হোতী তব প্রম (পরম) স্ননি রহতা জীব ॥^৬

১। গোরক্ষ-বিকাশে উল্লেখ গোরক্ষ-বোধ প্রমোত্তর ৪১, ৪২ এবং ৬৩ ৬৪

২। মঙ্গলযোগ, অবদুত জ্ঞানামল পৃ ১৮৪ ।

৩। ডাঃ সিং গোরক্ষনাথ—গোরক্ষবোধ শ্লোক ১২০ ।

৪। ঐ ঐ পরিশিষ্ট—গোরক্ষনাথের পদ ।

৫। ঐ ঐ গোরক্ষবোধ শ্লোক ৩, ৪০ ।

৬। ঐ ঐ ঐ ৩২, ৩৬ ।

মন কি কি অবস্থায় উন্মত্তী প্রাপ্ত হয়? তাহার উত্তর আমাদের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহাতেই মনের ‘উন্মত্তী’ অবস্থার আবাস। সহজ হংস খেলাশেষে শূন্যে স্থিতি করে, আকার যখন নিরাকার প্রাপ্ত হয় তখন হংস অর্থাৎ আত্মা ‘পরম জ্যোতি’তে বাস করে। জ্যোতিই পরমতত্ত্বকে ধারণ করিয়া রাখে, ইহাই মৎস্তেন্দ্রনাথের বিচার এবং ‘মন সু আত্মা সুনি সমাই’ অর্থাৎ মন শূন্য মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকে।^১

এই শূন্যতত্ত্বের প্রভাব হইতে বঙ্গীয় গীতিকাব্য রচয়িতারাও মুক্ত হইতে পারেন নাই। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর গানে (ভট্টশালী ও শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত) নাথধর্মের খ্যাতনামা হাড়িপা শূন্য হইতে সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত বঙ্গদেশে ধর্মপূজার প্রচলন করেন, এই ধর্মঠাকুরের মূর্তিও শূন্যমূর্তি, ইহার নাম নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল। এই ধর্মপদ্ধতির নাম ‘শূন্যপুরাণ’। একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম হীনপ্রভ হইতে থাকে, ‘বৌদ্ধ’ শব্দ অর্থহীন হইয়া নাস্তিক পদবাচ্য হইয়া পড়ে, এই কারণেই সম্ভবতঃ ধর্মের উপাসকগণ নিজেদের ‘সদ্ধর্মী’ বলিতে লাগিলেন। “সদ্ধর্মীরে করএ বিনাস” (শূন্যপুরাণ বসুমতী সং, পৃ ২৩৩)। অশোকের সময়ে বিজ্ঞানধর্মই সদ্ধর্ম নামে পরিচিত ছিল। ধর্মঠাকুর সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের নামাস্তর, তাহার মূর্তি হিন্দুর দেবদেবীর স্থায় নহে, কূর্ম বা স্তূপের মূর্তি। শূন্যপুরাণে ধর্মের ধ্যান যথা—

“শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিশ্ববিনাশনং।

সর্বপরং পরদেবং তস্মাস্তং বরদো ভব ॥

নিরঞ্জনায় নমঃ ॥^২

এই সদ্ধর্মীরা অহিংসাব্রতী হইয়াও হিন্দুর মনস্ত্বটির জগৎ ছাগবলির ব্যবস্থা করিলে ক্রমশঃ ধর্মঠাকুর শূন্য নিরঞ্জন রূপে হিন্দুসমাজে স্থান পান। আবার “নিরঞ্জনের রূপা” নামক শূন্যপুরাণের শেষে যে অধ্যায়টি আছে তাহাতে ‘ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেকাশ্বর’ ইত্যাদি থাকায় মুসলমানের সংস্পর্শে আসিবার চিহ্ন দেখা যায়। এই অধ্যায়টি যে প্রক্ষিপ্ত বাদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যমূর্তি করুণাময় ও ধবলাকার, কারণ তিনি

১। ডাঃ সিং গোরক্ষনাথ—গোরক্ষবোধ, ১৭, ১৮, ৪৪, ৭২, ১২৮

২। শূন্যপুরাণ ভূমিকা পৃ ২। মুহম্মদ শরীফুল্লাহ।

জ্যোতির্ষ্ময়। এই শূন্যের রূপ দ্বিবিধ,—নিরঞ্জন ও ধর্ম; তন্মধ্যে নিরঞ্জন নিরাকার, ধর্ম সাকার। নিরঞ্জনের স্বৈদজ্জল হইতে আগ্নাশক্তির জন্ম, তিনি সপ্তবার জন্মগ্রহণ করার পর হিন্দুর শিবপত্নী চণ্ডীতে পরিণত হন—“মহেশ করিবে বিভা জন্মজন্মান্তরে” (শূন্যপুরাণ বসুমতী সং পৃ ৪১)। ধর্মঠাকুরও ক্রমশঃ শিব ও বিষ্ণু মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়া পরম নির্ব্যাণ লাভ করেন। এই ধর্মপূজা বঙ্গের লৌকিক পদ্ধতিমাত্র, ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ পদ্ধতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ধর্মপূজায় নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন অপর কোন বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কালের কবীরপন্থাদির দ্বারা বঙ্গদেশীয় ধর্মপূজা একটি সঙ্কর ধর্মবিশেষ। শূন্যপুরাণে অর্কাচীন অংশে ‘অথ যজ্ঞ’ মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ‘গোরক্ষ-বিজয়’ গ্রন্থে দেবী কর্তৃক সিদ্ধগণের নিমন্ত্রণ ও পরীক্ষা বৃত্তান্ত আছে, ‘শূন্যপুরাণে’ সিদ্ধদের নিমন্ত্রণের উল্লেখমাত্র আছে। শূন্যপুরাণের প্রাচীন অংশে নাথসিদ্ধগণের বা মুসলমান পীর প্রভৃতির উল্লেখ নাই।

(বৌদ্ধেরা আলোক হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি কল্পনা করেন, বেদপন্থী হিন্দুমতে অন্ধকার হইতে জগতের উৎপত্তি, এই অন্ধকারই শূন্যের স্বরূপ, বৌদ্ধদের শূন্য ‘স্বয়ংজ্যোতি’)^১ রামাই পণ্ডিতের শূন্য হইতেই বিশ্বের উদ্ভব-কল্পনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে শূন্য জ্যোতির্ষ্ময়, ইহা বৌদ্ধমতের অনুরূপ কল্পনা। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সংঘও শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া ধর্মপূজায় স্থান পাইয়াছে মনে হয় ‘সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার’ (শূন্য পুরাণ, পৃ ১৪৭)।

বঙ্গদেশে ধর্মপূজার অপর নাম ‘দেলপূজা’। চৈত্র-সংক্রান্তিতে দেল বা দেউল পূজা হইয়া থাকে, দেউলকে পাট ও বলা হয়। পাটস্কে ভিক্ষা করা ও চড়ক-সংক্রান্তির দিন বাগফোড় ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন ইহার অঙ্গবিশেষ, পশ্চিমবঙ্গে ইহা ‘গাজন-পূজা’ নামে পরিচিত। দেউল মধ্যে মহাদেব অবস্থান করেন। দেলপূজার ছড়ার সৃষ্টি-কাহিনীর সহিত শূন্যপুরাণের সৃষ্টি-কাহিনীর মিল আছে। ধর্ম নিরঞ্জনের উল্লেখও পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণে ‘নহি রেক নহি রূপ, নহি বস চিন’এর সহিত দেলপূজার “রূপরেক না ছিল গোসাঞি”র তুলনীয়। আবার দেলপূজার

মনেতে জন্মিল চন্দ্র চক্ষে দিবাকর।

মুখেতে জন্মিল ইন্দ্র অতি খরতর ॥

প্রাণেতে জন্মিল পবন জগতের প্রাণ।

গন্ধর্ব্ব কিয়র জন্মিল স্থানে স্থান।

ইত্যাদির সহিত ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সাদৃশ্য দেখা যায়। দেলপূজার ছড়া রচয়িতা একজন কবি নহেন। দক্ষিণবঙ্গে ইহাকে অষ্টকের গান বলে, মণ্ডাহকাল পর্য্যন্ত নৃত্যগীতের পর চৈত্র-সংক্রান্তিতে পূজা শেষ হয়।^১

দেলপূজার ছড়ায় ‘অমুক নাথকে বর দাও, ভোলা মহেশ্বর’ আছে, এই পূজা দক্ষিণবঙ্গে অধিক প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়, ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে নাথদের দান স্বীকার্য্য, ধর্মপূজা হিন্দু ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই শূন্য পরম তত্ত্ব, ইহা অভাব বা নঞ নহে। সাধারণতঃ বৌদ্ধেরা জগতের পরিবর্তনকে শূন্যের স্বরূপ মনে করেন, শঙ্করের মায়াবাদ ইহারই প্রকারভেদ। ধর্মমঙ্গল সাহিত্যেও ধর্মপূজার শিব ও ধর্ম উভয়েই স্থান পাইয়াছেন। গাজনের ছড়াতেও ধর্মের স্থান আছে, এই ধর্মঠাকুরই নিরঞ্জন বা নারায়ণ। লাউসেন এই ধর্মদেবতার বরে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। লাউসেন ও রজাবতীর পুরোহিত রামাই পণ্ডিত। ধর্মমঙ্গলগুলিতে লাউসেন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধের কথা থাকায় ইহাকে মুসলমান বিজয়ের পূর্বের কাহিনী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা যায়।

দেখা গেল ‘শূন্য’ ‘নিরঞ্জন’, ‘ধর্ম’ প্রভৃতি শব্দ ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল কোথায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতএব সংক্ষেপতঃ শূন্যত্বের উদ্ভব ও প্রচারের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে। সর্বপ্রথমে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৯ সূক্তে নাসদাসীয়া সূক্তে যে শূন্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

সদস্যং রজ বোম ছিল না তখন ।
বোমের উপরে কোন ছিল না ভুবন ।
কে ছিল কোথায় ? কিছু ছিল আবরণ ?
ছিল কি তখন অন্তঃ গভীর গহন ॥১॥
ছিল না তখন মৃত্যু ছিল না অমৃত ।
রাত্র হ’তে দিবসের ছিল না প্রকেত ।
সেই এক ছিলেন স্বধায় প্রাণবান,
ছিল না তা হ’তে কেহ পর বিচ্যমান ॥২॥

তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত ।

এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত ॥

তুচ্ছতে আচ্ছন্ন যাহা ছিলেন তখন ।

তাহা এক হইলেন তাপে উৎপাদন ॥৩ ৷

শব্দার্থ :—প্রকেত = প্রভেদ, স্বধায়—আত্মধারণ শক্তি দ্বারা ।

বেদের পর উপনিষদের যুগে বহুদেবতার পরিবর্তে যে নিরাকার ঈশ্বর কল্পনা করা হইল তিনি ‘অশকম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্’; তিনি ‘ব্রহ্ম’ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই নিরাকার ঈশ্বরের সহিত শূন্যবাদের নিরঞ্জনের কোন পার্থক্য নাই। বেদে ‘নিরঞ্জন’ সংজ্ঞাটিও পাওয়া যায়। হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (৪।৫০) শূন্যত্বের আভাস পাওয়া যায়।

ইহার পরবর্তী কালে সাংখ্য ধর্মে ঈশ্বর স্বীকৃত না হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভকে স্বীকার করা হইয়াছে। তিনি সগুণ ব্রহ্ম, তাহার আসন মহাশূন্যে; ইহার সহিত ঋগ্বেদের “যো অস্মাধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমস্তুসো অংশঃ” (১০।১২৯ সূক্ত) তুলনীয়। ইহাকে আশ্রয় করিয়া চরাচর জগৎ যথানিয়মে চলিতেছে। মনুষ্যের ইহার নিকট প্রার্থনীয় কিছু নাই, দেহস্থ সদাশিব ‘আত্মা’কে জানাই মনুষ্যের কর্তব্য, গ্রীক মনীষীও বলিয়াছেন ‘নিজেকে জান’ অর্থাৎ “আত্মানং বিদ্ধি”।

(বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, ঈশ্বরও নাই, আত্মাও নাই, সংস্কর্ষ সাধন কর যাহাতে পরজন্মে শ্রেষ্ঠতর দেহ ধারণ সম্ভব হয় এবং জন্মজন্মান্তরে নির্ব্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধমতে সমস্ত জগৎ অনাত্ম বলিয়া শূন্য “সর্ব্বম্ অনিত্যং, সর্ব্বম্ অনাত্মম্, নির্ব্বাণম্ শাস্তম্,” এই তিনটি তত্ত্ব বৌদ্ধদর্শনের মূল। জাগতিক দৃশ্যপদার্থ অনিত্য, একমাত্র সত্য হইতেছেন সেই পরমতত্ত্ব তিনি দৃশ্যাতীত, অতএব সমস্ত দৃশ্য ধর্ম্মের নিষেধবাচক ‘শূন্য’ দ্বারাই বৌদ্ধেরা তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই শূন্য অভাববাদ নহে, ইহা অবিকারী শূন্য। আর্যগণও অবিকারী কূটস্থ চৈতন্য-পদার্থকে অদৃষ্ট, অচিন্ত্য, অব্যবহার্য্য প্রভৃতি দৃশ্যধর্ম্মের নিষেধ দ্বারা বাক্ত করিয়াছেন। যে চরমপদার্থকে বৌদ্ধেরা ‘শূন্য’ নামে অভিহিত করেন তাহার সম্বন্ধে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায়

আছে, “শূন্যরূপেণ কৌশিক স্থিতি” অর্থাৎ শূন্য আছে বা উহা ‘ভাব’ পদার্থ। ইহাকে সম্পূর্ণ অভাব বলা যায় না।^১

বুদ্ধদেব পুনর্জন্মরহিত মোক্ষলাভকে ‘নির্ব্বাণ’ অবস্থা বলিলেও তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বুদ্ধদেবের শিষ্য নাগার্জ্জুন প্রচার করিলেন, নির্ব্বাণলাভ হইলে চিন্তের যে অবস্থা হয় তাহাই ‘শূন্য’, রাগদ্বেষমোহের আবরণ শূন্যতাহেতু নির্ব্বাণ ‘শূন্য’, এই শূন্য অনির্ব্বচনীয়, ইহা অস্তি, নাস্তি, তদুভয় ও অনুভয় এই চতুর্বিধ অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা বিশেষ, ইহাই শূন্য কিন্তু ইহা অভাববাদ নহে। বস্তু ঐকান্তিক সং বা অসং হইতে পারে না, অতএব উহার স্বরূপ সং ও অসং এর মধ্য-বিন্দুতে নির্ণীত হয়, ইহাই শূন্যরূপ। এই শূন্যই পরমতত্ত্ব, ইহা সত্য, ইহা বজ্র। এই আধ্যাত্মিক মধ্যমমার্গকে ‘মাধ্যমিক দর্শন’ আখ্যা দেওয়া হয়। কালক্রমে ইহা হইতেই ‘বজ্রযান’ সম্প্রদায়েৰ উৎপত্তি হয়।

সমস্ত বৌদ্ধেরা যে ঐরূপে শূন্যের লক্ষণ নির্ণয় করেন তাহা নহে। জায়ানুযায়ী উহার লক্ষণ, যথা—

“ভগবানাহ, শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনিমিত্তমিত্য প্রণিহিতমিতি (অর্থাৎ রাগাদি প্রণিধি বা উদ্দেশ্য রহিত) দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেষ ইত্যাব্যবদানম্ ইত্যভাব ইতি নির্ব্বাণমিতি ধর্ম্মধাতুরিতি তথতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে”।^২

উক্ত লক্ষণ মধ্যে ‘অভাব’ পদটি নিরর্থক, কারণ ভাবের নিষেধই যখন অভাব তখন অনিমিত্তাদি অভাববাচক পদসকল বলা বাহুল্য মাত্র এবং ধর্ম্মধাতু প্রভৃতি ভাবার্থপদ বলা স্বোক্তিবিরোধ। উক্ত লক্ষণে যদি ‘নির্ব্বাণ’ স্থলে ‘পরমসুখ’ বলা হয় তবে ঐ শূন্য উপনিষদের আত্মা হইতে বিশেষ ভিন্ন পদার্থ হয় না। ‘শান্ত’ ও ‘নির্ব্বাণ’ একই পদার্থ, শিব ও পরমসুখ একই বস্তু। বৌদ্ধধর্ম্মের চিন্তের নির্ব্বাণধাতুতে স্থিতি ও সাংখ্যের অব্যক্তেলীন হওয়া বস্তুতঃ এক কথা।^৩ অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎএর সপ্তম শ্লোকে আত্মার যে লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে তাহা এইরূপ—“যিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন ও জাগরণের

১। প্রজ্ঞাপারমিতা ১ম ভাগ পৃ ৩। ২. গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী নং ১।

২। বোধিচর্যাবতার, ভূমিকা, ‘শূন্যবাদ’ পৃ ৭১, শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্যক।

৩। বোধিচর্যাবতার, ভূমিকা, ‘শূন্যবাদ’ পৃ ৭২।

মধ্যবর্তী নহেন, প্রাজ্ঞ নহেন, যুগপৎ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা নহেন, জড় নহেন, যিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেষ, অচিন্ত্য, অনির্দেশ, যিনি কেবল আত্মা এই প্রতীতির গম্য, যিনি প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়, তাঁহাকেই বিবেকীরা চতুর্থ মনে করিয়া থাকেন। তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়।”^১

বৌদ্ধ নির্বাণ চিন্তের চিরশান্তিময় অবস্থাবিশেষ, ক্রেশক্কে চিত্ত চিরবিশ্রান্তি লাভ করে। এই নির্বাণ শূন্যোপম, “নির্বাণং শূন্যোপমং মায়োপমং তথাগতঃ শূন্যোপমং মায়োপমঃ” ইহা সর্ববাদিসম্মত। সাংখ্য, বেদান্ত আদি নির্বাণবাদীরা সকলেই জগৎ ও জাগতিক পদার্থকে ভ্রান্তিরূপে নির্দেশিত করেন, ঐ ভ্রান্তি বা অবিজ্ঞা যে ত্যাজ্য তাহাও সর্বসম্মত। শূন্যবাদীরা বলেন সংএর মূল ‘শূন্য’, মায়াবাদীরা বলেন ‘অনির্বাচ্য’, আরম্ভবাদীরা বলেন তাহা ‘অসং’, ইহাই মাত্র ভেদ।

মহাযান বৌদ্ধমতে শূন্যের বহুপ্রকার ভেদ বর্ণিত হয়। এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্র “ও শূন্যব্রহ্মণে নমঃ”, ইহাকে তাঁহারা নিরাকার মন্ত্র বলেন। মহাযান বৌদ্ধেরা পরমতত্ত্ব উপলব্ধির জন্ত যে সকল সাধন করেন তন্মধ্যে চারিপ্রকার ভেদ আছে—সংনাহ প্রতিপত্তি, প্রস্থান প্রতিপত্তি, সংভার প্রতিপত্তি ও নির্যান প্রতিপত্তি। ইহারা যথাক্রমে মনন, ধ্যান, জ্ঞান বা ধর্মসংকল্প, এবং সর্বজ্ঞতা সিদ্ধিরূপে বর্ণিত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে সংভার প্রতিপত্তির ত্রয়োদশবিধ ভেদ আছে, যথা—করুণা, দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, ধারণা-সম্ভার অর্থাৎ স্মৃতি, জ্ঞান-সম্ভার অর্থাৎ বিংশতিপ্রকার শূন্যতা ইত্যাদি। জ্ঞানসম্ভারের বিংশতিপ্রকার শূন্যতায় সাপেক্ষত্ব ভেদ আছে, ইহাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।^২

শূন্যত্বের মূলকথা সাপেক্ষত্ব,—

যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদঃ শূন্যতা সৈব তে মতা।

ভাবঃ স্বতন্ত্রো নাস্তীতি সিংহনাদ স্তবাহতুলা ॥^৩

(লোকাভীত স্তব শ্লোক ২২)

অকূটস্থ ও অবিনাশিত্ব এই উভয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া শূন্য সাপেক্ষ।

১। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ পৃ ২৩৮, উদ্বোধন কার্যালয়।

২। Abhisamaya-alankara (Maitreya) পৃ ১০৪—১০৫ ত্রুট্য।

৩। ঐ, ১২৩ পৃ ফুটনোট।

শূন্যতাও জ্ঞানের বিষয়, অধ্যায় ও বাহ্যের শূন্যতা আছে, অতএব শূন্যতার জ্ঞানও শূন্যতা, মাধ্যমিক মতে শূন্যতাভিমুখ সিদ্ধ হইলে সেই শূন্যতাও ত্যাজ্য, কারণ শূন্যতা-ভাবনাও ‘ভাব’ কল্পনা।

এই মহাযান সম্প্রদায় হইতে বজ্রযান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ইহারা শূন্যকেই পরম পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনেও “নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরি,” “চিঅ কল্পহার শূনতা মাজ্জে” ইত্যাদি আছে। প্রধান অবদ্বিতিকা নাড়ীকে গুরুপ্রসাদে মণিমূলে বা শূন্যস্থান-রূপ অন্তরাকাশে ধৃত করিয়া রাখিবার কথাও আছে। “অনাহতং ডমরুশব্দং বীরনাদেন শূন্যতা সিংহনাদেন নদিতঃ সন্ কৃষ্ণাচার্যো। হি কাপালিকঃ”।^১

চর্যাপদ মতেও জগৎ মিথ্যা, জাগতিক ব্যাপারের জ্ঞান মিথ্যা, কারণ, সকল বস্তুই নশ্বর, একমাত্র যে অবিদ্যার সত্যস্বভাব বর্তমান আছেন, তাঁহাকে অবিদ্যা বলে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু যোগী দেহমধ্যেই সেই নিত্যানন্দধাম বা জিনপুর দেখিতে পান। নিত্য-পরিবর্তনশীল বস্তুজগৎ মিথ্যা, প্রতিপদে যে পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাই ‘শূন্যতা’। অবিদ্যা দূর হইলে বস্তুজগতের জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং ‘মহাশূন্যে’ অবস্থিতি হয়। নির্ব্যাণে শূন্যতা ও মহাসুখ আছে, এই শূন্যতাই নৈরাশ্বাদেবী, নির্ব্যাণপ্রাপ্তিমাাত্র চিত্ত এই নৈরাশ্বাদেবীর সঙ্গসুখে মহাসুখ লাভ করে। কালক্রমে এই মহাসুখ বাদ হইতেই সহজযানের পঞ্চ-মকার সাধনার উৎপত্তি হয়।

(বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন মধ্যে ধর্মকে ‘শূন্য’ নামেও অভিহিত করা হয়। এই নিমিত্ত ‘শূন্য’ মহাপ্রভু, মহাশূন্য ও দয়া এবং একবার পুরুষ, একবার প্রকৃতি (স্বভাব) ও একবার ঈশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সাধকের লক্ষ্য মহাশূন্যে স্থিতি ও চরম সিদ্ধিলাভ। মহাশূন্যতা একেবারে নাস্তি নহে, অস্তিত্বের সম্ভাবনীয়তা মহাশূন্যের অন্তরে বিরাজ করে। প্রকৃতি বা স্বভাব যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাহাই ‘মহাশূন্য’। মহাশূন্যের বিপরীত অবিদ্যা, সমগ্র বস্তুরূপ, যাহা অসৎ হইয়াও সংরূপে প্রতিভাত হয়।^২)

১। চর্যাপদ ১০, ৪২, ১১ এবং টীকা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২। D. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, p. 173. শূন্যপুরাণ প্রবেশক, পৃ ২২।

মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা কালক্রমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়েন, একদলের নাম হইল মায়োপমাদ্বৈতবাদী, তাহারা বলিলেন শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মতো, দ্বিতীয় দলের নাম সর্বধর্মপ্রতিষ্ঠানবাদী অর্থাৎ সর্বধর্মের মধ্যে বা পদার্থের মধ্যে পরমার্থ সত্যের অর্থাৎ শূন্যের স্বরূপ বিद्यমান।^১

পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য্য মায়োপমাদ্বৈতবাদের সহায়তায় ‘মায়াবাদ’ প্রচার করেন এবং আগম ও বেদকে প্রমাণ স্বরূপ করিয়া মায়াবাদ স্থাপনার চেষ্টা করেন। সকল বস্তুতে ‘শূন্যতা’ আছে বলিলে উহা অত্যাশ্চর্য্য বলি হয় না, অর্থাৎ দার্শনিকেরা উহাকে ‘ভাব’ পদার্থ বা ধ্যেয় রূপে সংজ্ঞিত করেন। বৌদ্ধভাষায় যাহা প্রত্যয় অর্থাৎ কারণহীন তাহাই অভাব, তাই শূন্যতা ‘অভাব’। পরমার্থ অর্থে উত্তমার্থ, যাহার অধিগমে বস্তুত্বের বিজ্ঞান হইয়া ক্রেশের সম্যক্ প্রহাণ হয়, এই পরমার্থের অন্য নাম সর্বধর্মের নিঃস্বভাবতা, শূন্যতা, তথতা ধর্মধাতু ইত্যাদি। এইরূপ যে শূন্যতা তাহাই পরমার্থ সত্য, ইহা বুদ্ধির অগোচর। মায়্যা বা অবিজ্ঞা বশে জগতের উপলব্ধি বুদ্ধিগোচর, ইহাই সংবৃতি সত্য, সংবৃতি অর্থে অবিজ্ঞা। তাই সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দ্বিবিধ সত্য মাধ্যমিকেরা স্বীকার করিয়াছেন।^২

পরমার্থ সত্য ত্রিকালের দ্বারা অবাধিত বলিয়া ‘শূন্য’, ইহার অনুভূতি যোগিজনসাধ্য। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সংবৃতি সত্য, যাহা কল্পিত তাহা সংবৃতি মিথ্যা, কিন্তু পরমার্থদশাতে উভয়ই মিথ্যা বলিয়া অবভাত হয় এবং ‘শূন্যের’ উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধির নিমিত্ত ষট্‌পারমিতা অর্থাৎ জ্ঞান, শীল, শান্তি, বীৰ্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞার উপলব্ধি এবং ইহাদের সতত অভ্যাস কর্তব্য। মাধ্যমিকদের মায়াবাদী বলা যায়, কারণ তাহাদের মতে জগৎ শূন্যমূল এবং যাহা দৃশ্য তাহাই ‘মায়্যা’।^৩

গৌড়পাদের মাণ্ড্যুকারিকাতে ‘শূন্য’র পরিবর্তে ‘ব্রহ্ম’ আছে, কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়াছে। মাধ্যমিকেরা বলেন সৎ ও অসৎ একত্রে কোন বিকারী পদার্থে থাকিতে পারে না, অতএব বিকারী পদার্থ ‘শূন্য’, বেদান্তী

১। অমরবজ্র তত্ত্বরত্নাবলী পৃ ১৪, ভারতীয় দর্শনের পৃ ২২৭ উল্লেখ।

২। বোধিচর্য্যাবতার ২।২ টীকা সঙ্কেত।

৩। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ২২৪ ইত্যাদি।

ঐ যুক্তিবলেই বলেন মায়া ‘মিথ্যা, অর্থাৎ আছে বা নাই, বলা যায় না। মাধ্যমিকেরা বলেন মায়া সংও নহে, অসংও নহে। বেদান্তীরা মায়াকে ‘সদসদ্ভ্যাম্ নির্বাচা’ বলিয়াছেন।

প্রজ্ঞাপারমিতাদি মহাযান শাস্ত্রে ‘শূন্যতা’ ভাবনার সবিশেষ উপদেশ আছে ইহাই মোক্ষমার্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মৈত্রেয় অসংস্কৃত মহাযান তন্ত্রশাস্ত্রে ‘গো’এর বিবৃতি আছে, তাহা বেদান্তের ‘জীব’বাদের অনুরূপ অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীতে ‘বুদ্ধত্ব’ আছে এবং ইহার সত্যত ধ্যানে যে পার্থিব পদার্থ প্রতিভাত হয়, তাহা কলুষহীন এবং ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত।^১

নাগার্জুনের প্রচারিত শূন্য শূন্যমণ্ডলের মধ্যে নিহিত তথ্য হইয়া আছে, গোরক্ষনাথের যোগতত্ত্বের মধ্য দিয়া ‘শূন্য’ নিগূর্ণ সাধকদের মধ্যে পৌছাইয়া ব্রহ্মপদবাচ্য হইয়াছে। নাগার্জুন শূন্যকে সং বা অসং কিছুই নহে বলেন, নিগূর্ণীরা শূন্যকে ‘সং’ বলিয়া গণ্য করেন। সমাধিস্থ যোগীর নির্বিষয় চিত্তকেও নিগূর্ণীরা ‘শূন্য’ বলেন। রাধাস্বামী মতে সাধনপথে সাধককে অবকাশ উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহাই ‘শূন্য’ ও ‘মহাশূন্য’।^২

নিগূর্ণ সাধকদের মধ্যে সগুণ নিগূর্ণের অতীত ‘সত্যলোক’ আছে, তথায় সত্যপুরুষের আবাসস্থল। সত্যলোকের নিম্নে ‘শূন্য’ ও ‘অমরগুহা’ আছে, ইহাদের অধিষ্ঠাতা যথাক্রমে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম।^৩

জগৎ অর্থে যাহা গতিশীল, অলাতচক্রবৎ; ইহার গতিশীল অবস্থাই আমরা দেখি, প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ব্যাপার খণ্ড খণ্ড জ্ঞান মাত্র, সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে ও স্বগতির যোগে সত্য বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয় তাহা ব্যবহারিক সত্য, মূলতঃ মিথ্যা, তাই জগৎ ‘শূন্য’ পদবাচ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান পাইলে সবই শূন্যবৎ মনে হয়— বঙ্গীয় গীতিকাব্যে বহু শতাব্দী পরেও ইহারই কল্পনা দেখা যায়—

শূন্য কাঁথা শূন্য কুলি রাজা কান্দে দিয়া।

দেশান্তরী হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ॥^৪

১। অতিসময়ালকার—পৃ ৮৬।

২। নিগূর্ণ সম্প্রদায় ভূমিকা। ১। ১/০

৩। নিগূর্ণ সম্প্রদায় ভূমিকা, পৃ ২৮।

৪। গোপীচাঁদের পাঁচালী, ডবানী দাস কৃত (২য় খণ্ড) পৃ ৩৮৪।

অনিলপুরাণেও পাঠ—

২।

শূন্যের খাট, শূন্যের পাট, শূন্যের সিংহাসন
শূন্যরথে আছেন একেলা নিরঞ্জন ॥^১

এইরূপ বৌদ্ধ শূন্যবাদের যুগ হইতে শূন্যতত্ত্ব বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে গ্রহীত হয়, কিন্তু শূন্যতত্ত্বের মূল বৈদিক যুগে। বৌদ্ধমতে শূন্যেতে করুণা আছে তাই জীব উদ্ধারার্থে সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ ‘শূন্য’ অর্থে প্রজ্ঞাপারমিতা অর্থাৎ সমাধিজাত প্রজ্ঞা। শূন্য হইতেই সৃষ্টি হয়। এই বৌদ্ধ ‘শূন্য’ ও নাথসিদ্ধদের ‘নাথ’ এবং ‘পরমেশ্বর তত্ত্বে’ ভেদ বা সাদৃশ্য কি তাহাই বিবেচ্য।

পরমেশ্বর সগুণ ও নিগুণের অতীত, তাহাতে পক্ষীকরণ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ আছে, তন্মধ্যে প্রথম চারিটি জীবের উপর অনুগ্রহার্থে, নিগ্রহও প্রকারান্তরে অনুগ্রহ, কারণ উহা জীবের সুখ চৈতন্য জাগরুক করে। সৃষ্টি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে ‘শূন্য’ বা ‘পরমেশ্বর’ কল্পনা নিস্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাংখ্য জগৎ রচনার জন্ত বা কর্মফল প্রদানের জন্ত ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। সাংখ্য জগৎ রচনায় ঈশ্বরের স্বার্থ বা কারুণ্যও স্বীকার করেন না। ঈশ্বর কৃষ্ণ ঈশ্বরের নিষেধ মানিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলেন নাই।^২ তবে ঈশ্বর মাত্র জগতের সাক্ষী স্বরূপ, ঈশ্বরের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতি জগৎ ব্যাপারে লিপ্ত হন, এইরূপে নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিতে ক্রিয়ার সঞ্চার হয়। যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলে। যোগে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসহ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত হয়। সেই ঈশ্বর “সদৈব মুক্তঃ”।^৩ তাহাতে ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে।

নাথপন্থের পরমেশ্বর-লক্ষণ : তিনি উমাসহায়, প্রশান্ত, নীলকণ্ঠ ও ত্রিলোচন। তিনি ব্রহ্ম, শিব, অক্ষর, স্বরাট, পরম, বিষ্ণু, প্রাণ ও আত্মা। “ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ”।^৪ যিনি আনন্দ, নিত্য, শক্তিমান যিনি, তিনি পরমেশ্বর, তিনি জ্ঞানরূপে জেয় বিষয়।^৫ অতএব পরমেশ্বর স্বগুণ সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু ‘নাথ’ সগুণ নিগুণের

১। শূন্যপুরাণ ভূমিকা পৃ ৪৭।

২। সাংখ্যপুত্র টীকা ১।২২-২৪ ; ৩।৫৬, ৫৭ ; ৪।২-১২ কালীঘর বেদান্তবাণীশ

৩। যোগপুত্র ১।২৪।

৪। গো. সি. স পৃ ৮।

৫। সি. সি. স পৃ ২৪।

ঐ.ত, তাহার বামভাগে নিগূর্ণ ব্রহ্ম, দক্ষিণভাগে সগুণ ইচ্ছাশক্তি এবং মধ্যভাগে তিনি স্বয়ং বিরাজিত। এই নাথ স্বরূপে সগুণ ও নিগূর্ণ ঐক্য প্রাপ্ত হন, তাই তিনি সর্কোপরিবর্তী, দ্বৈতাদ্বৈতবিবজ্জিত, বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ, ইহাই নাথপন্থের নাথস্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

“সর্বম্ শূন্যম্” সম্বন্ধে হীনযান ও মহাযান মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও তাহার স্তর সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। হীনযান পৃথিবী সম্বন্ধেই ‘শূন্য’ বলিয়াছেন, মহাযান বিশেষতঃ মাধ্যমিক ও যোগাচারীরা তাহাতে বিরত হন নাই, তথাগত, নির্বাণ বা আকাশও তাহাদের মতে শূন্য।^১

শূন্যত্বের তুলনা

এখন শূন্যত্ব সম্বন্ধে শেষকথা এই যে, সকল সাধনার মূলত্ব এক, তাহা চিন্তকে বৃত্তিহীন বা নির্বিষয় করা। তাই যোগসাধনের পথে কয়েকটি স্তর বা অবকাশ অতিক্রম করিতে হয়, তবেই পূর্ণতাপ্রাপ্তি, নাথ-মতে পরমপদ প্রাপ্তি বা বৌদ্ধমতে নির্বাণলাভ সম্ভব হয়। এই অবকাশের নামান্তর ‘শূন্য’, তবে বিভিন্ন ধর্মে শূন্যের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য কিন্তু এক, অর্থাৎ চিন্তের লয়সাধন এবং “অন্তঃশূন্যঃ বহিঃশূন্যঃ শূন্যঃ কুন্ত ইবাম্বরে” অবস্থা প্রাপ্তি, চিন্ত এই নির্বিতর্ক-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নাদ বা মন্ত্র কোনরূপ স্পন্দনের অনুভূতি থাকে না, স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে ‘স্বরূপ-শূন্যের’ বা বিতর্করহিত অবস্থা অর্থাৎ শব্দহীন জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় (যোগসূত্র ১।৪৩), ইহাই নিগূর্ণ উন্মুনী অবস্থা বা যোগমতে নির্বীজ সমাধি। ইহাই নাথগণের ‘অমনস্ক’ বা মনোহীন অবস্থা, বৌদ্ধদের নির্বাণ অবস্থা, সহজিয়া বৌদ্ধদের চতুর্থ বা তুরীয় আনন্দের অবস্থা। পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগীর চারিটি অবস্থার বর্ণনা আছে—প্রথমকল্লিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয় (যোগসূত্র ৩।৫১)। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যাহারণ করিলে ‘মন’ অবশিষ্ট থাকে, তখন মনের পশ্চাতে যে অস্মিতা আছে তাহা মনের সঙ্কল্পবিকল্প নিরোধের চেষ্টা করে; এই নিরোধ সম্ভব হইলেই প্রজ্ঞালোকের বিকাশ সম্ভব হয়, তখন মন সেই জ্ঞানস্বরূপ প্রজ্ঞায় লীন হয়, মনের এই বিলীন

অবস্থাই শাস্ত্রমতে কুণ্ডলিনীর জাগরণ। ইহাই যোগের প্রথম অবস্থা। যোগের দ্বিতীয় অবস্থায় সাধকের জীবভাবের সহিত পরমাত্মার আধ্যাত্মিক সংযোগের ফলে সাধক মৃত্যুরও অতীত হন।

“অস্পৃশো জন্মমৃত্যুভ্যাং প্রজ্জায়েতি বিমুচ্যতে” (স্বাধ্যায়ব্রহ্ম ১।১১)। এইরূপে ক্রমান্বয়ে চারিটি স্তর সাধককে অতিক্রম করিতে হয়, তবেই কৈবল্য লাভ সম্ভব হয়। ইহারই প্রথম স্তরের নাম প্রথমকল্লিক, ইহাতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র হয়, ঈশ্বরদর্শন, পরচিন্তাজ্ঞান প্রভৃতি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় স্তরে মধুমতী ভূমিতে দেবগণ কর্তৃক ভোগের জন্ম আহৃত হইয়াও সাধককে অবিচলিত থাকিতে হয়; তখন যোগী ঋতস্তরপ্রজ্ঞ হন। তৃতীয় স্তর প্রজ্জাজ্যোতি, ইহাতে যোগী ভূতেন্দ্রিয়জয়ী হন, যোগীর অনিমা, লঘিমাদি সিক্তি প্রাপ্তি হয়, এই অবস্থায় যোগী বিশোকাদি অসম্প্রজ্ঞাত পর্য্যন্ত সাধনীয় বিষয়ে সাধনযুক্ত হন। চতুর্থ স্তর অতিক্রান্তভাবনীয়, তখন চিত্তবিলয়ই একমাত্র অবশিষ্ট সাধন থাকে। চিত্ত বিলীন হইলে কেবল মাত্র আত্মা বিরাজ করেন, ইহাই নিরোধ-সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহারই অপর নাম ব্যাখানাবস্থা বা কৈবল্য।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনেও চারিটি স্তর বা শূন্যের বর্ণনা আছে, যথা, শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য। চিত্তকে এই শূন্য হইতে শূন্যাস্তরে লইয়া গেলে তবেই জ্ঞানের শেষ পর্য্যয়ে পৌছাইতে পারা যায়। প্রথম তিনটি শূন্যাবস্থায় নানাবিধ প্রকৃতিদোষ থাকে, ক্রমশঃ তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চতুর্থ বা সর্বশূন্য অবস্থায় আর কোনরূপ প্রকৃতিদোষ থাকে না; ইহাই বিশুদ্ধ শূন্য অবস্থা বা নির্বাণপদ। কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়াছেন (চর্য্যা নং ১৩) ‘ত্রিশরণ নাবী’ অর্থাৎ কায়বাক্চিত্তরূপ নৌকা বাহিয়া তিনি চতুর্থ আনন্দস্বরূপ পরমকূলে পৌছিয়াছেন। প্রকৃতিদোষযুক্ত প্রথম শূন্য হইতে এইরূপে নৌকা বাহিয়া সর্বশূন্যের দেশে পৌছিলে বুদ্ধত্ব লাভ হইবে। ইহাই জন্মমৃত্যুর উর্দ্ধে অবস্থান, ইহা সংসারের গতির বিপরীত গতি।

হঠযোগপ্রদীপিকার চতুর্থ উপদেশে (৪।৭০) যে তিনটি শূন্যের কথা আছে, তাহারা নাদের বিভিন্ন অনুভূতির সহিত যুক্ত স্তরবিশেষ, ইহারা যথাক্রমে আরম্ভ, ঘট ও পরিচয় অবস্থা নামে পরিচিত। এই তিনটি স্তরই ক্রেশাদি মলযুক্ত, ইহার চতুর্থ স্তর নিষ্পত্তি অবস্থা নামে

পরিচিত, ইহাই বিশুদ্ধশূন্যরূপ অদ্বৈতভূমি। গোরক্ষসিদ্ধাস্ত-সংগ্রহ প্রভৃতি নাথমার্গের গ্রন্থে যোগের এই চতুর্বিধ অবস্থার বিশেষ আলোচনা দেখা যায়, কারণ যোগকেই ইহারা প্রাধান্য দেন। সাধনের চতুর্বিধ অবস্থা-ভেদে কাশ্মীর শৈবাগমে যোগীদের সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ যোগী রূপে ভেদ করা হয়।

নাথসিদ্ধদের সাধনে যে পঞ্চব্যোমতত্ত্ব আছে তাহাও শূন্যের সাধনা, যথা—আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ। এই আকাশ হইতে আকাশাস্তরে গমনের সাধনার প্রথম স্তরে যোগীর নিরাকার অত্যন্ত নির্মল আকাশ দর্শন ঘটে, দ্বিতীয় স্তরে অত্যন্ত অন্ধকারনিভ আকাশ দর্শন হয়, তৃতীয় স্তরে কালানল সদৃশ মহাকাশ দর্শন, চতুর্থ স্তরে নিজতত্ত্বরূপ তত্বাকাশ দর্শন ও পঞ্চম স্তরে সূর্য্যাকোচিনিভ সূর্য্যাকাশ দর্শনের পর যোগী স্বয়ং ব্যোমসদৃশ বা শূন্যোপম হন, অর্থাৎ তাহার চিত্ত অব্যাক্তে লীন হয় বা তাহার ‘নির্ব্বাণ’ লাভ হয়। এই পঞ্চব্যোম সাধনার সহিত নাথমার্গের ত্রিলক্ষ্য সাধনের বিশেষ যোগাযোগ আছে—অন্তরলক্ষ্য অবলম্বনে কুণ্ডলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার হয়, বহির্লক্ষ্য অবলম্বনে নাসাগ্রের বাহিরে নীলপীতাদি আকাশ দর্শন, মধ্যলক্ষ্যে নিকটবর্ত্তী অন্তরীক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য বা বহির জ্বালা দর্শন হয়, এই মধ্যলক্ষ্যের অভ্যাস বশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়—ব্রহ্মলাভার্থে এই ত্রিলক্ষ্যের অনুসন্ধান কর্তব্য (অদ্বয়তারকোপনিষৎ শ্লোক ৪। সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতির ২।৩০ শ্লোকেও এই ব্যোমপঞ্চক ও বাহ্যভ্যন্তরে তাহাদের দর্শন করিয়া ব্যোমসম হইবার কথা আছে—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

শূন্যতত্ত্বের মূলকথা সাপেক্ষ, অতএব ইহার তিনটি, চারটি, পাঁচটি, এমন কি মহাযান বৌদ্ধমতে বিংশতি শূন্যের (অভিসময়ালঙ্কার পৃ ১০৪-১৩৫ দ্রষ্টব্য, Cal. Ort. Series, No. 27) যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা মূলতত্ত্বের ভেদ হয় না। মহাযান বৌদ্ধদের বীজমন্ত্রও “ও শূন্যব্রহ্মণে নমঃ”। চিত্তকে ইন্দ্রিয়জ বিষয় হইতে নিবৃত্তির পথে ফিরাইলে সাধকের যে শূন্য-স্বরূপতার জ্ঞান হয়, তাহাই বৌদ্ধদের ‘প্রজ্ঞা’, এই প্রজ্ঞার সহিত মিশ্রিত থাকে ‘করুণা’ অর্থাৎ জীবের ক্লেশ দূর করিবার বাসনা। শূন্যতা ও করুণার যোগে যে বোধচিন্তের উৎপত্তি হয় তাহাকেও উর্দ্ধযাত্রার পথে দশটি ভূমি অতিক্রম করিতে হয়, এই

মুদিতা, বিমলা প্রভৃতি দশটি ভূমি সাধকের শূন্যতা ও করুণাময় চিত্তেরই বিভিন্ন অবস্থা, এই দশ অবস্থা অতিক্রম করিলে সাধকের বুদ্ধিবৃত্তি হয়। এই চিত্তচাক্ষুর একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সম্যক চিত্তবিশ্রান্তি ও স্বস্বমধ্যে নিমগ্নতাই নিরুপস্থান দশা, এই নৈরুপস্থ্যের উপলক্ষিতেই নাথগণের পরমপদে অবস্থিতি হয়। (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের পরমপদ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।) (ইহাই চিত্তের বৃত্তিহীন অবস্থা বা শূন্য হইতে শূন্যান্তরে গমনের শেষ অবস্থা, নাথগণের ইহাই উন্নয়নী বা অমনস্ক অবস্থা। ইহাই শূন্যত্বের সিদ্ধান্ত ও সাধনা।)

পরিচিত, ইহাই বিশুদ্ধশূন্যরূপ অদ্বৈতভূমি। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ প্রভৃতি নাথমার্গের গ্রন্থে যোগের এই চতুর্বিধ অবস্থার বিশেষ আলোচনা দেখা যায়, কারণ যোগকেই ইহারা প্রাধান্য দেন। সাধনের চতুর্বিধ অবস্থা-ভেদে কাশ্মীর শৈবাগমে যোগীদের সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ যোগী রূপে ভেদ করা হয়।

নাথসিদ্ধদের সাধনে যে পঞ্চব্যোমতত্ত্ব আছে তাহাও শূন্যের সাধনা, যথা—আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ। এই আকাশ হইতে আকাশান্তরে গমনের সাধনার প্রথম স্তরে যোগীর নিরাকার অত্যন্ত নির্মল আকাশ দর্শন ঘটে, দ্বিতীয় স্তরে অত্যন্ত অন্ধকারনিভ আকাশ দর্শন হয়, তৃতীয় স্তরে কালানল সদৃশ মহাকাশ দর্শন, চতুর্থ স্তরে নিজতত্ত্বরূপ তত্বাকাশ দর্শন ও পঞ্চম স্তরে সূর্য্যাকোটিনিভ সূর্য্যাকাশ দর্শনের পর যোগী স্বয়ং ব্যোমসদৃশ বা শূন্যোপম হন, অর্থাৎ তাহার চিত্ত অব্যক্তে লীন হয় বা তাহার ‘নির্ব্বাণ’ লাভ হয়। এই পঞ্চব্যোম সাধনার সহিত নাথমার্গের ত্রিলোক্য সাধনের বিশেষ যোগাযোগ আছে—অন্তর্লোক্য অবলম্বনে কুণ্ডলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার হয়, বহির্লোক্য অবলম্বনে নাসাগ্রের বাহিরে নীলপীতাদি আকাশ দর্শন, মধ্যলোক্য নিকটবর্ত্তী অন্তরীক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য বা বহির জ্বালা দর্শন হয়, এই মধ্যলোক্যের অভ্যাস বশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়—ব্রহ্মলাভার্থে এই ত্রিলোক্যের অনুসন্ধান কর্তব্য (অদ্বয়তারকোপনিষৎ শ্লোক ৪। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির ২।৩০ শ্লোকেও এই ব্যোমপঞ্চক ও বাহ্যাত্মন্তরে তাহাদের দর্শন করিয়া ব্যোমসম হইবার কথা আছে—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

শূন্যতত্ত্বের মূলকথা সাপেক্ষত্ব, অতএব ইহার তিনটি, চারটি, পাঁচটি, এমন কি মহাযান বৌদ্ধমতে বিংশতি শূন্যের (অভিসময়ালঙ্কার পৃ ১০৪-১৩৫ দ্রষ্টব্য, Cal. Ort. Series, No. 27) যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা মূলতত্ত্বের ভেদ হয় না। মহাযান বৌদ্ধদের বীজমন্ত্রও “ও শূন্যব্রহ্মণে নমঃ”। চিত্তকে ইন্দ্রিয়জ বিষয় হইতে নিবৃত্তির পথে ফিরাইলে সাধকের যে শূন্য-স্বরূপতার জ্ঞান হয়, তাহাই বৌদ্ধদের ‘প্রজ্ঞা’, এই প্রজ্ঞার সহিত মিশ্রিত থাকে ‘করুণা’ অর্থাৎ জীবের ক্লেশ দূর করিবার বাসনা। শূন্যতা ও করুণার যোগে যে বোধচিত্তের উৎপত্তি হয় তাহাকেও উর্দ্ধযাত্রার পথে দশটি ভূমি অতিক্রম করিতে হয়, এই

মুদিতা, বিমলা প্রভৃতি দশটি ভূমি সাধকের শূন্যতা ও করুণাসক্ত চিত্তেরই বিভিন্ন অবস্থা, এই দশ অবস্থা অতিক্রম করিলে সাধকের বুদ্ধিব্রূতাপ্রাপ্তি হয়। এই চিত্তচাকল্যের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সম্যক্ চিত্তবিশ্রাস্তি ও স্বস্বমধ্যে নিমগ্নতাই নিরুত্থান দশা, এই নৈরুত্থোর উপলক্ষিতেই নাথগণের পরমপদে অবস্থিতি হয়। (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের পরমপদ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।) (ইহাই চিত্তের বৃত্তিহীন অবস্থা বা শূন্য হইতে শূন্যান্তরে গমনের শেষ অবস্থা, নাথগণের ইহাই উন্নয়নী বা অমনস্ক অবস্থা। ইহাই শূন্যত্বের সিদ্ধান্ত ও সাধনা।)

ତୃତୀୟ ଭାଗ
ସାଧନା ଅଂଶ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুরুত্ব ও সদগুরু-মহিমা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ‘শূন্যত্বের’ আলোচনা করিয়াছি। চিত্ত শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে নির্বাণ লাভ হয়, তাহাই নাথদের ‘উন্মনী’ অবস্থা প্রাপ্তি। এই মনোহীন অবস্থাই পরমপদের সহিত সাম্যাবস্থা লাভের অবস্থা, ইহাই নাথমতে সামরস্ত্র সাধন। এই পরমপদে স্থিতিই নাথগণের চরম লক্ষ্য। কিন্তু নাথমতে এই সিদ্ধিলাভ হয় একমাত্র গুরুকৃপায়—তেন সন্দর্শিতে মার্গে প্রাপ্যতে পরমঃ পদম্।

অজ্ঞান জীবের পক্ষে গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই নাথগণ প্রতিপদে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সাংসারিক জীবের সাধারণতঃ মানব-দেহধারী যে গুরু লাভ হয়, নাথগণ সেক্ষেপে গুরুর একপক্ষে নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদিগকে শাস্ত্রজালে জড়িত পণ্ডিত-মূর্থ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের বহু শিষ্টাও থাকে। কিন্তু এক্ষেপে গুরু শিষ্টাকে অধিকদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সক্ষম নহেন, তাহার দ্বারা কেবল একটী আনন্দাবস্থার বা বৌদ্ধমতে শূন্যাবস্থার লাভ হইতে পারে মাত্র। কিন্তু শূন্যের অতীত অতিশূন্যাদি বা নির্বাণের অতীত পরিনির্বাণাদি যে সকল অবস্থা বৌদ্ধধর্মে ও সন্তকবি বা পাতঞ্জলযোগের ভাষায় অশ্রুতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, মানবীয় গুরুর পক্ষে তথায় নীত করা অসম্ভব। তাই নাথেরা যাহাকে সদগুরু আখ্যা দিয়াছেন—সেই সদগুরুই প্রকৃত গুরু, নাথমতে সেই গুরু ‘অবদূত’রূপী—তাহার বর্ণ নাই, আশ্রম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, ভোগ নাই, ভোগ নাই—তিনি সকলের অতীত এবং সকল গুরুর গুরু। এইরূপ গুরু সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

“ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ”

(গোঃ সিঃ সঃ পৃঃ ৩২)

একমাত্র ইহার করুণাতেই মানবের অষ্টপাশ ছিন্ন হয়, এবং একমাত্র তিনিই ‘নাথ’ পদের পরমতত্ত্ব তাহার মৌনব্যাখ্যা দ্বারা শিষ্টাকে অধিগম করাইতে সক্ষম। পরমপদের ঠিক নিম্নে এইরূপ গুরুর স্থান, তাই

নাথেরা বলিয়াছেন সেরূপ গুরুকে 'দেবভাবেন পরিচিত্তয়েৎ' অর্থাৎ গুরুকে দেবভাবে দর্শন কর্তব্য। (সিঃ সিঃ সঃ ৫৮)

নাথমার্গে গুরুই সকল শ্রেয়ের মূলভূত। গুরুকৃপা ভিন্ন সহজাবস্থালভরূপ যোগের বা সাধনের চরমফললাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং গুরুত্ব সমাক্রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হইলে নাথমার্গের মূলত্ব অধিগত হইবে না। গুরুই আদর্শ, গুরুই উপদেষ্টা, গুরুই পথ-প্রদর্শক এবং তাঁহার কৃপাখড়গপাত দ্বারা তিনি জীবের অষ্টপাশের ছেদক।

জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধির্গুরুবাকোন লভাতে ॥

হ্রস্বভো বিষয়ত্যাগো হ্রস্বভঃ তত্ত্বদর্শনম্।

হ্রস্বভা সহজাবস্থা সদৃগুরোঃ করুণাং বিনা ॥^১

কোন কোন যোগমার্গে প্রসিদ্ধি আছে যে মানব নিজের কৰ্ম্মদ্বারাই মুক্তিলাভ করে, গুরুকৃপার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নাথমার্গের সিদ্ধান্ত অগ্নিরূপ, নাথমার্গের লক্ষ্য সিদ্ধিলাভ, তাহা একমাত্র গুরুবাক্য দ্বারাই লভ্য, তাই "সিদ্ধির্গুরুবাকোন লভাতে" ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

নাথগণ যোগশাস্ত্রের প্রবর্তক, তাঁহারা প্রতিপদে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। মানবের প্রতিপদক্ষেপে গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে, শিশুর পক্ষে পিতামাতাই গুরু বয়োবৃদ্ধির সহিত পিতামাতা ব্যতীত শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতির সাহচর্য্য অত্যাৱশ্যক হইয়া পড়ে, অতএব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সহজাবস্থালভে যে গুরুকৃপার বা গুরুবাক্যের আবশ্যক, ইহাতে সন্দেহ কি? গুরুই আদর্শ, কারণ তিনি মুক্ত, গুরুই পথপ্রদর্শক, কারণ তিনি স্বয়ং সেই পথে সাধন করিয়াছেন।

সেই গুরুর স্বরূপ কি? তিনি শিবস্বরূপ, সকল বিঘ্ননাশকারী, "শিবায় সুখরূপায়ৈশ্বর্য্যভিন্নায় বা। নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে ॥"^২ অর্থাৎ গুরু ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তিনি শিবরূপী অর্থাৎ সুখস্বরূপ। যোগসূত্র মতেও তিনি (ঈশ্বর) কালাবচ্ছেদপ্রযুক্ত পূর্ব্বতনদিগেরও গুরু। নাথমার্গে গুরুকে 'নাদবিন্দুকলাত্মা' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি নাদ, বিন্দু ও কলা স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন

১। হ যো প্র ৪৮, ২, গো সি. স পৃ ৩২, ৩৩

২। হ যো প্র ৪১৩ টীকা, ষোড়শ নিত্যাত্ম উল্লেখ, গো সি. স পৃ ৪৫

(নাদবিন্দুকলাতত্ত্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যে সাধক উক্তরূপ ঈশ্বরাভিন্ন শিবরূপী গুরুতে নিরত আছেন, তিনি নিরঞ্জনপদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলায়নে।

নিরঞ্জনপদং যান্তি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ ॥^১

নাদবিন্দুকলাযুক্ত গুরুই স্বয়ং শিবস্বরূপ, “নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে” দ্বারাও নাথ, শিব ও গুরু এই তিন যে অভেদাত্মক তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

“ন দেবঃ ক্রীণুরোঃ পরঃ”—গুরু হইতে শ্রেষ্ঠতর দেবতা আর নাই।^২ তাই সিন্ধুসিন্ধাস্ত-পদ্ধতিতেও উক্ত হইয়াছে, “ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ।”^৩

সহজাবস্থালাভে গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাথগণের মতের সহিত সমুদায়সাধকদের মতের ঐক্য আছে। সমুদায়তেও গুরু বিনা সাধন সম্ভবপর নহে। সাধনের প্রতিপত্তিতে বিভিন্ন গুরুর অস্তিত্ব তাহারাই স্বীকার করেন, যথা গুরুপদ বা যোগেশ্বর, সাধগুরু বা মহাত্মা, সমুদায়গুরু ও সর্বশেষে পরমসমুদায়গুরু। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত যেরূপ বিভিন্ন পদগৌরব-বিশিষ্ট গুরুর প্রয়োজনীয়তা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপে সাধকের সাধনাপথেও বিভিন্ন গুরুর প্রয়োজন আছে। তত্ত্বশাস্ত্রেও সাধনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন গুরু গ্রহণের কথা আছে। যেরূপ মধুলুক ভৃঙ্গ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুক শিষ্য গুরু হইতে গুরুবিস্তারে গমন করে।

শিবদয়াল, কবীর প্রভৃতি সমুদায়গুরুর মতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে গুরুলাভ হয় না, ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ ও গুরুপদমাত্র দর্শন ঘটে, কূটস্থ ব্রহ্মের প্রকাশিত রূপই এই গুরুপদ। সমুদায়তে সহস্রারে অনাহত নাদ শ্রুত হয়, তদুর্দ্ধে ত্রিকূটাতে মৃদঙ্গের দ্বারা ওঁকার নাদ ধ্বনিত হয় ও সাধগুরুর প্রাপ্তি হয়, তৎপরে তৃতীয় বা শূন্যমণ্ডল ও মহাশূন্যমণ্ডল আছে, তদুর্দ্ধে চতুর্থ মণ্ডল বা অমরগুহায় ‘সোহং’নাদ হয় এবং তৎপরে সত্যলোকে সত্যনাম পুরুষ বা পরমসমুদায়গুরুর লাভ হয়। সত্যলোকে প্রবেশকালে ‘সত্য’ ‘সত্য’

নাদ শ্রুত হয়। শিবদয়ালের অনুরূপ সহস্রার হইতে বর্ণিত হইয়া ত্রিকূটী ও তদুর্দ্ধে পৌছাইয়া সত্যপুরুষ, অলম্বপুরুষ ও অগমপুরুষ ও তাঁহাদের তিন লোকের দর্শনে নিবৃত্ত হইয়াছে।^১ ভ্রমরগুহার অবস্থান সম্বন্ধে সম্ভদের মধ্যেও মতভেদ আছে। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৭) জীবহৃদয়-গুহাতে ব্রহ্মের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে, কবীরও হৃদয়গুহাকে ভ্রমরগুহা বলিয়াছেন।

দেহস্থ চক্রসকলকে অতিক্রম করিয়া দেহবাহ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের চক্রসকলও অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপনীত হইতে হয়, কবীর-পন্থী ও রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে ইহার বিশেষ চর্চা আছে। যে ভেদী পুরুষ নিম্নচক্র ভেদ করিয়া ত্রিকূটীতে পৌছিয়াছেন তিনি যোগেশ্বর, যিনি সূরে পৌছিয়াছেন তিনি সাধ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের পরে নির্মলদেশে পৌছিয়াছেন তিনি সমুৎপাদক ধামে বা পরমপুরুষের ধামে যিনি পৌছিয়াছেন তিনি পরমসমুৎপাদক; ভেদী পুরুষ অর্থে যিনি ষট্চক্রভেদ করিয়াছেন।^২

কবীরাদির মতে সত্য সগুণ ও নিগুণের অতীত। ঈশ্বর ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও তাঁহার আবাস চতুর্থলোকে, এই লোক নিগুণ বা নিরঞ্জনের উর্দ্ধে। নিরঞ্জনের উর্দ্ধে সহজ, ওঁকার, ইচ্ছা, মোহহং, অচিন্তা, অক্ষয় এই ষট্‌পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন, ইহারও উর্দ্ধস্তরে সত্যলোক, তথায় সত্যপুরুষ বিরাজমান আছেন। ইহাদের স্বরূপ ও আবাস নির্ণয়ার্থে পঞ্চ ব্রহ্মের ও পঞ্চ অণ্ডের কল্পনা করা হইয়াছে, তৎপরে ষষ্ঠ ব্রহ্ম ও ষষ্ঠ মণ্ডল কল্পনা আছে। এই ষষ্ঠ অণ্ড হইতেই নিরঞ্জন ও জ্যোতির (মায়ার) উদ্ভব, তাঁহারাই ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।^৩ নাথপন্থেও ষট্‌পিণ্ডের কল্পনা আছে (সিদ্ধান্ত অংশের পিণ্ডতত্ত্ব অধ্যায়ে ইহার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ষষ্ঠ পিণ্ড হইতেই বিশ্বের তথা জীবের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধনপথে জীবকে একে একে সকল পিণ্ড অতিক্রম করিতে হয়। গুরু তাহার সহায়। তন্মধ্যে গুরুর স্থান অতি উচ্চে, গুরুকে শিবের অংশরূপে কল্পনা করিয়া চারিজন বাহ্যগুরু কল্পনা করা হয়, যথা গুরু, পরমগুরু, পরমেশ্বরগুরু ও পরাংপরগুরু। ইহারা সকলেই শিবের অংশবিশেষ। ষট্‌চক্রের সর্বোচ্চস্থানে অধোমুখ

১। বাড়পাল, নিগুণসম্প্রদায় পৃ ১৫৬-১৫৭।

২। অমৃত বচন পৃ ৫২।

৩। বাড়পাল, নিগুণসম্প্রদায় পৃ ২০।

সহস্রদলকমলের কর্ণিকা মধ্যে মৃণালরূপী চিত্রিনী নাড়ী দ্বারা ভূষিত গুরুমস্ত্রাস্বক দ্বাদশবর্ণরূপী দ্বাদশদলপদ্মে অকথাদি ত্রিরেখা ও কোণ দ্বারা ভূষিত কামকলা ত্রিকোণে নাদবিন্দুরূপী মণিপীঠ বা হংসপীঠের উপর শিবস্বরূপ শ্রীগুরুর স্থান আছে—পাছকাপঞ্চক স্তোত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।^১ এই পাছকাপঞ্চক স্তোত্র পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে ভাষিত হইয়াছে, ইহাদ্বারা মন্ত্রদেবতাগণের সাধনফল লাভ হয়, ইহা অতি দুর্লভ, কারণ শ্রীগুরুর কৃপা ভিন্ন ইহার উপলব্ধি হয় না (অ, উ, ম, নাদ ও বিন্দু ইহারাই শিবের পঞ্চমুখ, এই পঞ্চতত্ত্বই পাছকাপঞ্চক)।

ষট্চক্র সাধনার বিভিন্ন স্তরে কুণ্ডলিনীর জাগরণে ‘প্রথম গুরু’র সহায়তা আবশ্যক, তৎপরে সহস্রারে শিবশক্তির মিলন-অনুভূতি বোধার্থে ‘দ্বিতীয় গুরু’র প্রয়োজন, তদুর্দ্ধে শিবশক্তির অভিন্নতা বা ব্রহ্মবোধার্থে ‘ব্রহ্মগুরু’র কৃপালাভ আবশ্যক, সর্বশেষে জীব ও ব্রহ্মে অভেদই যিনি উপলব্ধি করাইতে সক্ষম তিনিই ‘সদগুরু’ পদবাচ্য। দেখা যাইতেছে সাধনপথে গুরুর আবশ্যকতা আছে, কিন্তু সে গুরুর লক্ষণ কিরূপ হইবে, তাঁহার কৃপা কাহার দ্বারা লভ্য হইবে? তদন্তরে বলিতে হয়, গুরু সদগুরুর লক্ষণযুক্ত হইবেন ও তিনি অভেদে কৃপা করেন বলিয়া তাঁহার কৃপা সকলের দ্বারাই লভ্য হইবে। বৈষ্ণবদের মধ্যেও গুরুর অভেদে কৃপা করিবার কথা আছে। সং ও অসং গুরুতে প্রভেদ এই যে, অসং গুরু ভেদে কৃপা করেন। বস্তুতঃ সদগুরু কোন মানবদেহধারী গুরু নহেন, উহা আত্মা স্বয়ং, কারণ নিজের স্বরূপের উপলব্ধি নিজের দ্বারাই সম্ভব, অত্য়ের দ্বারা তাহা লাভ করা সম্ভব নহে, যোগসাধনের প্রথম অবস্থায় গুরুর সহায়তা আবশ্যক, কিন্তু তারক যোগে গুরুর আবশ্যকতা নাই, কারণ উহাই আত্মোপলব্ধি।

সাধনপথের মহৎ কষ্টসকলও সদগুরুলাভ হইলে স্বল্প হয়। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—“ভো পুরুষা গুরুহীনানাং তেষাং কষ্টং ভবেৎ যদা তাদৃশঃ পূর্বোক্তপূর্ণো গুরুর্লভ্যতে তদা মহদপি কষ্টমতিস্বল্পং ভবেৎ।...তথা গুরুময্যা কুক্ষিকয়া স্বল্পেনাপি কষ্টেন সহজসিকির্ভবতি। যদিচ মহৎ কষ্টমপি ভবেত্তদা কষ্টোত্তরে তু মহানানন্দো ভবত্যেব।” অত্য়াত্র “স চ যোগো গুরুকৃপয়াহল্লশ্রমেণৈব

প্রাপ্তো ভবেৎ।”^১ গুরু শিষ্যের পক্ষে মোক্ষদ্বার অর্গলমুক্ত করিবার উপায়স্বরূপ, তাই তিনি কৃষ্ণিকারূপী, তাঁহার সাহায্যে কষ্টে উত্তীর্ণ হইলে মহানন্দলাভ ঘটে। “মুচ্যাতে শিষ্যো জন্মসংসারবন্ধনাং”—জন্মমৃত্যুর দুঃখ নিবারণার্থে শিষ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সফলকাম হন এবং

অনন্তভাবেন নিরুখিতিশ্রীলাভেন চাঞ্চল্য বিধুননেন।

অবস্থিতিঃ শ্রীকরণাসুধাক্ষি গুরুপ্রসাদাদ্ ভবতীতি সত্যম্ ॥^২

অর্থাৎ গুরুকৃপাকলে নিরুখিতিশ্রীলাভ হয়, চাঞ্চল্যমুক্ত হইয়া মুমুক্শু শিষ্য কৈবল্যলাভে সক্ষম হয়।

নাথগুরুর অপর একটি বৈশিষ্ট্য যে তাঁহারা সর্ববিদ্যাবিৎ, মহাতপা ও সকলের মন্ত্রদাতা এবং “নাথা মহাদিব্যা যোগশাস্ত্রপ্রবর্তকাঃ”।^৩ যিনি সর্বোপরি বিরাজমান নাথমতে সেই ‘নাথ’ই একমাত্র পারমার্থিক গুরু, কিন্তু লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্ত চারিজন ‘যুগনাথ’ আছেন, তাহাদের নাম যথাক্রমে মিত্রীশ, উড্ডীশ, ষষ্টিশচর্যা ও কুন্তসম্ভব। ললিতাপুরের উত্তরকোণে মহাভূতি বায়ুলোক আছে, তথায় বায়ুশরীর দানপরায়ণ পবনভ্যাসী সিদ্ধ দেবর্ষিগণ ও গোরক্ষপ্রমুখ যোগিগণ অবস্থান করিতেছেন—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ললিতাখণ্ডে এইরূপ বিবৃতি আছে। নাথলোকে মহাতপা যুগনাথেরা বাস করেন, তাঁহারা লোকরক্ষার্থে পাত্ৰকাত্তক বহু লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল লোকে সাযুজ্য-সিদ্ধ, সারূপ্যসিদ্ধ ও সালোক্যসিদ্ধেরা অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ৭৭৭৭ দিব্যৌঘ, মিত্রাদিরা মানবৌঘ, সুরতাপসাদি সিদ্ধৌঘ, এই ত্রিবিধ গুরুপরম্পরাকে ওষত্রয় অর্থাৎ শ্রোতত্রয় আখ্যা দেওয়া হয়। সিদ্ধদের মধ্যে দিব্যগুরু, সিদ্ধগুরু ও মানবগুরুর এই তিনটি বিভাগ কোন কোন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেও দেখা যায়। ললিতসহস্রনামের “দিবৌঘশ্চ মানবৌঘাঃ সিদ্ধৌঘাশ্চ সমাগতাঃ”র ভাস্কর রায় যে ভাষ্য করিয়াছেন সেই তালিকার সহিত তারারহস্তের তালিকার মিল নাই। তারারহস্তে দিব্য ও সিদ্ধ শ্রেণীর বর্ণনা আছে অন্তর্নিহিত হয়, তন্মধ্যে মীননাথ নামও আছে। কৌলাবলীতন্ত্রে মানবৌঘ শ্রেণীর গুরুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে “মীনো গোরক্ষশ্চৈব ভোজদেবপ্রকীর্তিতঃ.....মানবৌঘঃ প্রকীর্তিতাঃ”

পাওয়া যায়, শ্যামারহস্তেও ইহার প্রায় অনুরূপ তালিকা আছে।
ওষত্রয় মধ্যে মীন গোরক্ষের উল্লেখই বুঝা যায় যে সিদ্ধরূপে তাঁহারা
লোকমাগ্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে তাঁহারা স্থান
পাইয়াছেন।^১

যাঁহার আশ্রয়ে জীব একসঙ্গে ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধি লাভ
করিতে পারে সিদ্ধমতে তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। পূর্ণসত্যের প্রতিপাদক গুরু
ও শাস্ত্রই সদগুরু ও সংশাস্ত্র। সদগুরু প্রাতিভজ্ঞানবিশিষ্ট অর্থাৎ
তাঁহার সতর্ক বা শুদ্ধবিজ্ঞান উদয় স্বতঃই হইয়া থাকে। মানব সদগুরুর
মধ্যে অকল্লিত (স্বয়ংসিদ্ধ), অকল্লিতকল্লক (ভাবনাবলে যিনি
শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন), কল্লিত (দীক্ষাযোগে যিনি শুদ্ধজ্ঞান লাভ
করিয়াছেন) ও কল্লিতাকল্লিত (যিনি আকস্মিকভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ
করিয়াছেন)—এই চারিপ্রকার ভেদ আছে, তদ্ব্যতীত সিদ্ধগুরু ও
দিব্যগুরুও আছেন। মূলে কিন্তু সর্বত্রই পরমেশ্বরই একমাত্র অনুগ্রাহক।
সদগুরু বলিতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অথবা তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্ত
তৎসাদৃশ্যাপন্ন জীবন্মুক্ত অধিকারী পুরুষকে বুঝায়। এই অধিকারী
দেবতা, সিদ্ধ ও মনুষ্য—তিনিই হইতে পারেন।^২

মুক্তিপথে সাযুজ্য, সাষ্টি, সাক্ষ্য ও সালোক্য এই চারিটি স্তর-
ভেদ আছে অর্থাৎ শিবের দৃষ্টির মধ্যে আসিলে সালোক্য, তাঁহার রূপের
মধ্যে পৌঁছিলে সাক্ষ্য, তাঁহার শক্তির মধ্যে আসিলে সাষ্টি ও তাঁহার
সত্তা বা স্বরূপ উপলব্ধি করিলে সাযুজ্য সিদ্ধি হয়। নাথমতে শ্রেষ্ঠ গুরুরা
এই চারিটিকে এক মনে করেন।^৩ সামীপ্য সর্বসময়েই থাকে, ইহাকে
পৃথকভাবে গণনা করিলে পঞ্চস্তর কল্পনা করিতে হয়। যে ‘ওষত্রয়’ বর্ণিত
হইয়াছে তান্ত্রিকসাধনে ষোড়শী হইতে সপ্তদশীতে উপনীত হইতে হইলে
এই ওষত্রয় ভেদ করিতে হয়। আদি নাদই চল্লের অমানাগ্নী ষোড়শী
কলা আর যাহা নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্বাবস্থা তাহাই সপ্তদশী কলা বা
‘সমনী’—অর্থাৎ তখন মন অতি সূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকে, ইহার উর্দ্ধে

১। গো. সি. স. পৃ ৪৩

বাগ্‌চী—কৌলজ্ঞান ভূমিকা পৃ ২০, ললিতসহস্রনামের উল্লেখ। ‘কল্যাণ’ সাধনাক (১ম) ‘তত্ত্বমে
গুরু সাধনা’ প্রথমে জীনগরের মন্দিরে ও রাজচিহ্নভাণ্ডারে ‘গুরুমণ্ডলার্চনা’র পুঁথির বর্ণনা।

২। গুরুত্ব ও সদগুরুহস্ত, গোপীনাথ কবিরাজ। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৪০ পৃ ৩১১, ৩১২,

৩। গো. সি. স. পৃ ৪৪

‘উন্মনী’ অবস্থা; কোন কোন স্থলে সমুদ্রশী কলাকেই উন্মনী বলা হইয়াছে। উন্মনী স্থান নিগূর্ণ শিবপদ। ইহা লাভ করাই যোগীর লক্ষ্য। তত্ত্বমতে গুরুপূজায় শিবশক্তি-সামরস্ত স্বরূপ নাদবিন্দু কলাতীত পরমানন্দতত্ত্বেরও পূজা হয়। ইহাই তত্ত্ববর্ণিত শ্রীগুরুসাধনের বিশেষত্ব। নাথযোগীর ‘নাথ’স্বরূপে অবস্থানই লক্ষ্য, ইহাও তত্ত্বাতীত অবস্থা।

নাথযোগীর আদর্শ কি? যোগীকে যাহা অধিগত হইতে হইবে, যে স্বরূপে অবস্থান করিতে হইবে, তাহাই নাথযোগীর আদর্শ। সহজাবস্থা-লাভেই মোক্ষ, তাহাই পরমপুরুষার্থ বা নাথস্বরূপে অবস্থান, ইহাই আদর্শ। “পরমঃ পুরুষার্থস্ত মুক্তিরুক্তাহতস্ত সা। নিরুপায়ে অবধূতানাং যোগসাধনজং ফলম্। পরমপুরুষার্থস্ত মুক্তিরিত্যুক্তম্। সা চ নাথস্বরূপেণা-বস্থানম্ ॥”^১

এই ‘নাথস্বরূপ’ বলিতে কি বুঝায় তাহা শ্রীনিত্যানাথ-কৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতিতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

“ন ব্রহ্মা বিষ্ণুরজ্রো ন সুরপতিঃ সুরা নৈব পৃথ্বী ন চাপো নৈবাগ্নির্নাপি বায়ুর্ন চ গগনতলং ন দিশো নৈব কালঃ। ন বেদা নৈব যজ্ঞা ন চ রবিশশিনৌ ন বিধিনৈব কল্লাঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সত্যমেবং জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে ॥ তৎপদেনাবস্থানং মুক্তিরিতি ॥”^২ সেই সত্যস্বরূপ স্বয়ংজ্যোতি পরমপদে অবস্থানই মুক্তি। গুরুবাক্যানুসারে সাধন করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তখন নির্বিকারস্বরূপে অবস্থিতি হয়। ঐহিক বিষয়াদি পরিত্যাগ, পারত্রিক স্বর্গভোগাদির অভিলাষ নিবৃত্তি, তত্ত্বদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার এবং সহজাবস্থালাভ বা সমাধি সকলই সদৃগুরুর কৃপাসাপেক্ষ।

শ্রীনাথকৃত সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে যে আদিনাথ মহাসিদ্ধ শক্তিয়ুক্ত জগদগুরু।...“তত্ত্ব পদং তাদৃশযোগিনামেবাপরোক্ষ-মিতি সিদ্ধান্তঃ”—সেই নাথপদবী যোগিগণের অপরোক্ষানুভূতি-সাপেক্ষ।^৩

নাথমতে অবধূত এই পদ অনুভূতির দ্বারা লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহার “একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশৈচককরে স্বয়ম্ ॥”^৪ তিনি ত্যাগ ও ভোগের দ্বারা অলিপ্ত, তিনি কেবল ত্যাগীও নহেন কেবল ভোগীও

^১ গো. সি. স. পৃ ১০১৭

^২ গো. সি. স. পৃ ১১ তে উল্লেখ, নিত্যানাথকৃত সি. সি. প.

^৩ গো. সি. স. পৃ ১১তে, উল্লেখ শ্রীনাথকৃত সি. সি. প.

^৪ গো. সি. স. পৃ ১

নহেন; অবধূতের একদিকে বৈত, অন্যদিকে অদ্বৈত, তিনি স্বয়ং সর্ব-
দ্বন্দ্বাতীত। এইরূপে নাথমার্গে ‘অবধূত’ বলিয়া যাহাকে সংজ্ঞা দেওয়া
হইয়াছে তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী সকল গুরুর গুরু অর্থাৎ সকলের মন্ত্রগুরু,
তাহার ছায় শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই। স্মৃতসংহিতায় শ্রেষ্ঠগুরুর বর্ণনা
আছে, যথা—

‘অতিবর্ণাশ্রমী সাক্ষাদ্ গুরুণাং গুরুকচ্যতে।

ন তৎসমো নাধিকশ্চাপ্নিল্লোকেহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥’

সিদ্ধমতে গুরুর কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে,
তাহাকে পঞ্চমাশ্রমী, অবধূত প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সদগুরু
সর্বাধিকারীর গুরু, তাহার নিকট শিষ্যের বর্ণ বা আশ্রমের ভেদ নাই,
তিনি স্বয়ং বর্ণাশ্রমধর্মের অতীত বলিয়া অতিবর্ণাশ্রমী বা পঞ্চমাশ্রমী নামে
খ্যাত। তিনি আদর্শ যোগী পুরুষোত্তম, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে
পারে না বা তাহার তুল্য হইতে পারে না। এই অবধূত-গুরুর উপদেশের
বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি মৌন ব্যাখ্যান দ্বারা উপদেশ দেন, “গুরোস্ত
মৌনং ব্যাখ্যানম্” এবং অবধূত-গুরু নিজ শিষ্য নির্বাচন করিয়া লন বলিয়া
অনাবশ্যক উপদেশ দ্বারা শিষ্যদের বিভ্রত করেন না। পুরাণে বর্ণিত
আছে শৌচাদি ক্রিয়া পর্য্যন্ত গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিবেন, অবধূত-গুরু
দ্বারা পূর্বেই শিষ্যের যোগ্যতাবিচার হইয়া যায় বলিয়া এইরূপ উপদেশ
অনাবশ্যক বোধ করেন। সিদ্ধমতে সাধন বিনা কেবল শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল,
তাই সদগুরুর কৃপা ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকারের অন্য উপায় নাই। জঠর-
সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, যথার্থ গুরুর দ্বারা প্রদর্শিত মার্গে স্বসংবেগ
পদের দর্শন হয়, তাহা আত্মবিশ্রাস্তির কারণ, এইরূপ গুরুকেই
দেবভাবে দর্শন কর্তব্য। “তেন সন্দর্শিতে মার্গে স্বসংবেগস্ত দর্শনম্
ভবতীতি গুরুং দেবভাবেন পরিচিস্তয়েৎ ॥”^১ গোরক্ষকৃত অমরৌঘশাসনম্
গ্রন্থে আছে শব্দব্রহ্ম দ্বিপ্রকার—স্বসংবেগ ও অসংবেগ—“স্বসংবেগম্
অসংবেগম্ শব্দ ব্রহ্মদ্বিধাস্থিতম্”—যাহা স্বপ্রকাশ তাহাই স্বসংবেগ, যাহা
পরের দ্বারা প্রকাশিত তাহা অসংবেগ।^২

যে গুরু স্বসংবেগ পদের দর্শন করান তিনিই সদগুরু ইহা বলা
হইয়াছে, এখন সদগুরুর অন্যান্য লক্ষণ নাথমার্গে কিরূপে নির্দেশিত

হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য। নিমেষার্দ্ধ বা তদর্দ্ধকালমাত্র যাহার বাক্যের আলোচনা দ্বারা স্থির আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই সৎগুরু, যাহার উপদেশে সামরসাত্ম্য শ্রেষ্ঠ পরমপদরূপ সম্যক্ চৈতন্যে বিশ্বাস্তিলাভ হয় তিনিই সৎগুরু।^১ যিনি স্বয়ং তীর্ণ হইয়াছেন তিনিই অপরকে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, যে রূপ এক প্রস্তরে আরোহণ করিয়া অপর প্রস্তরসকল নদী পার হইতে পারে না, পার হইবার নিমিত্ত নৌকারই প্রয়োজন হয় সেইরূপ উত্তীর্ণ গুরুই সাধককে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, অস্ত্রে পারে না।^২

সৎগুরুই পরমপদপ্রাপ্তির সহায়স্বরূপ। জাগতিক যে সমস্ত জ্ঞানের উদয়ে পরমপদপ্রাপ্তি ঘটে, সেই জ্ঞানের চারিটি অবস্থাভেদ আছে। প্রথমাবস্থা ‘স্বাত্মসংবিত্তিরূপ সহজজ্ঞান’ বা বিশ্বমধ্যে বিশ্বময়কে দর্শন, অর্থাৎ তুরীয়াতীত পরমাত্মাকে বিশ্বের অণুতেও প্রত্যক্ষ করা। দ্বিতীয় অবস্থা ‘সর্বনিগ্রহরূপ সংযমযুতজ্ঞান’ বা ক্ষুরণশীলবৃত্তির আত্মামধ্যে সংযম। তৃতীয় অবস্থা ‘স্ব স্ব বিশ্বাস্তিরূপ সোপায়জ্ঞান’ বা প্রকাশময় আত্মাকে স্বরূপতঃ অভিব্যক্ত করিয়া সর্বদা লৌল্য বা উত্তম অবস্থায় স্থিতি। চতুর্থাবস্থা ‘সাদ্বয়জ্ঞান’ বা ‘পরমপদরূপ অদ্বৈতজ্ঞান’, ইহা অদ্বয়-জ্ঞানের অবস্থা, তখন আত্মস্বরূপে জাতি প্রভৃতি বিকল্পের আত্যন্তিক অভাব দৃষ্ট হয়। এই চতুর্বিধ অবস্থা একমাত্র সৎগুরু-মুখনিঃসৃত উপদেশে লাভ হয়, কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহে, সৎগুরুর সম্যক্ প্রসাদই তাহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।^৩

“দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্তা বিনাপি দৃশ্যং বায়ুঃ স্থিরো যস্তা বিনাপ্রযত্নম্।

চিন্তাঃ স্থিরা যস্তা বিনাবলম্বং স এব যোগী স গুরুঃ স সেব্যঃ ॥”

এইরূপ গুরুই অত্যাশ্রমী, যোগী, জ্ঞানী, সিদ্ধ ও সূত্রত। তাঁহাতে ঈশ্বরতা স্বামিত্ব ও সাধুতার সম্যক্ ক্ষুরণ দৃষ্ট হয়, সেজন্য তিনি ধন্য। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সুধী, কোবিদ, বৃধ এবং সমস্ত দর্শনের স্বরূপ প্রকাশে সমর্থ, এইরূপ সৎগুরুই সম্ভজনীয়।^৪ কৈবলামুক্ত যোগী গুরু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাতে ঈশ্বরতা থাকিবেই এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। তন্ম্বের সাধনে যোগীর বা গুরুর ঈশ্বরতা ক্ষুরণ অনিবার্য, ইহার বিকাশ-ক্রিয়ার আলোচনা এখানে অপ্ৰাসঙ্গিক।

নাথমার্গে ওঁকারতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সৎগুরু সেই ওঁকারের তত্ত্বদর্শক—“তস্মিন্ মধো স্থিতং তত্ত্বং প্রদর্শয়তি সৎগুরুঃ”।^১ ওঁকার সাধনই মুমুক্শুর কর্তব্য।

অনন্তোপায়যত্নেভ্যঃ প্রাপ্যতে পরমং পদম্।

গুরুদৃকপাতমাত্রাণাং দৃষ্টানাং সত্যবাদিনাম্॥

কথনাদ্ দৃষ্টিপাতাদ্বা সান্নিধ্যাদ্বাবলোকনাৎ।

প্রসাদাৎ সৎগুরোঃ সম্যক্ প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥^২

এইরূপ দীক্ষার কথা বায়বীয় সংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—গুরু স্বীয় প্রসন্ন দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারা একক্ষণমাত্রে শিষ্যকে স্বরূপে স্থিতি করাইয়া দেন, এই দীক্ষার নাম ‘শাস্ত্রবী’ দীক্ষা। রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে ভগবান শম্ভুর চরণদ্বয় হইতে সমুত দীক্ষাই শাস্ত্রবী দীক্ষা। সৎগুরুর দীক্ষা শান্ত্রী, শাস্ত্রবী ও মাস্ত্রী। শান্ত্রী দীক্ষাতে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়, গুরু শিষ্যের অন্তর্দেহে প্রবেশ করিয়া শক্তিকে জাগরিত করেন। মাস্ত্রী বা আগবী দীক্ষার স্মাস্ত্রী, মানসী, চাক্ষুষী, স্পার্শিকী, বাচিকী প্রভৃতি দশবিধ ভেদ আছে।^৩

যোগবাশিষ্টে আছে—

দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্ছব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।

জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাস্ত্রবং স হি দেশিকঃ॥

(নির্বাণ প্রকরণ ১:১২৮-১৬১)

অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্বক দর্শন, স্পর্শন বা শব্দ দ্বারা শিষ্যের দেহে শিব-ভাবের আবেশ উৎপাদন করিতে পারেন তিনিই দেশিক বা গুরু। কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া ষষ্ঠচক্রভেদপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে পরশিবের সহিত মিলিত হইলে এই আবেশ ঘটে। সত্যসঙ্কল্প গুরু মাত্র একবার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াও এই স্তম্ভহং কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। “অযোগ্যোহপি যোগ্যতামাপাণ্ড্রীশ্রীগুরুসূর্য্যো বোধয়তি” অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপী সূর্য্য অযোগ্যকেও যোগ্য করিয়া প্রবুদ্ধ করেন, ইহাই সৎগুরুর কার্য্য।^৪

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গীয় যোগী সিদ্ধ তিলোপার শিষ্য তিব্বতের রাজপুত্র নারোপার কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। নারোপা ছাদশ

১। শো. সি. স. পৃ ৩৩

২। সি. সি. স. ৪২২, ৩.

৩। কল্যাণ সাধনাক (১ম) পৃ ২১৩, ‘দীক্ষা ও অমুশাসন’।

৪। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ: ৩১৩, গুরুত্ব ও সৎগুরু-রহস্য।

বৎসর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পর, সিদ্ধগুরুর সপাদঘাত বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন। তিলোপা বঙ্গদেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং নারোপা দশম শতাব্দীর লোক ছিলেন ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।^১ সিদ্ধগুরু হাড়িপা বা জালন্ধারনাথের দ্বারা বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্রের অশেষ লাঞ্ছনার পর উদ্ধারসাধনের কাহিনী গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি বঙ্গীয় গীতিকার উপজীব্য।

গোপীচন্দ্র, ময়নামতী প্রভৃতি গুরুর নিকট মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এই মহাজ্ঞানের দ্বারাই তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ী হন। ইহাই নাথগুরুর বৈশিষ্ট্য।

শারদাতিলক, অভিসময়ালঙ্কার প্রভৃতিতেও লক্ষণ বিচার করা হইয়াছে যথা—জ্ঞিতেন্দ্রিয়, শিবশাস্ত্র-বিধানজ্ঞ, সত্যবাদী, বীর্য্যসম্পন্ন, দয়াদাক্ষিণ্যসংযুক্ত, ত্যাগী, দন্তনির্মুক্ত ইত্যাদি।^২ কিন্তু তিনি মহাজ্ঞানের তত্ত্বপ্রদর্শক, এইরূপ ব্যাখ্যা নাথমার্গ বাতীত অশ্রুত নাই। এই মহাজ্ঞানের স্বরূপ অশ্রুত ব্যাখ্যাত হইতেছে (যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এক্ষণে অসদ্গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে, কারণ অসদ্গুরু পরিত্যাজ্য—

জ্ঞানহীনো গুরুস্ত্যাজ্যো মিথ্যাবাদী বিকল্পকঃ।

স্ববিশ্রান্তিং ন জ্ঞানাতি পরেষাং কিং কৰোতি সঃ ॥^৩

জ্ঞানহীন, মিথ্যাবাদী, বিকল্পক গুরু ত্যাজ্য, এবং যে সকল গুরু মাত্র শাস্ত্রদৃষ্ট অনুমান, তর্ক, মূঢ়াদি লইয়া ভ্রমণ করে, বাধ্যত্বে যাহাদের সম্বল তাহারা ত্যাজ্য কারণ তাহারা অসদ্গুরু।^৪ “বহুদীক্ষিতা আচার্য্যা গুরবস্ত্যাজ্যাঃ মহাসিদ্ধ এব গুরুঃ কৰ্ত্তব্যঃ”^৫ যে গুরুর বহুশিষ্য আছে তিনি শিষ্যদের ভুবনবিশেষের ঐশ্বর্য্যভোগের জ্ঞান নিয়োজিত করিতে পারেন কিন্তু দিব্যজ্ঞান দিতে অক্ষম হন, অতএব তিনি ত্যাজ্য।

১। With Mystics and Magicians in Tibet. Alex David Neel p 165.

২। শারদাতিলক ২।১৪২—১৪৪, অভিসময়ালঙ্কার ১।১০—১৫ শ্লোক মৈত্রেয়কৃত।

৩। সি. সি. স. ৫।৩৮

৪। গো. সি. স. পৃ ৩২, অভিসময়ালঙ্কার, ১।১০, ১৭ অসদ্গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—তর্কিক, গুরুসিদ্ধি-সাধনপর, শাস্ত্রবর্জিত, সত্যশৌচ-বিবজ্জিত, ইত্যাদি।

৫। গো. সি. স. পৃ ৫০

মহাসিদ্ধ গুরুই বরণীয়। নাথমতে “মহাসিদ্ধা বহুন্ দীক্ষিতান্ কুবন্তি”, কারণ বহুশিষ্যের মোক্ষলাভের যোগ্যতা থাকে না, অতএব বহু শিষ্য গ্রহণে গুরুর মনস্তাপের কারণ ঘটে। মহাসিদ্ধ গুরুর নিজাপেক্ষা চতুর্লক্ষণ নূন শিষ্যগ্রহণ কর্তব্য, শিষ্যপক্ষেও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত গুরুগ্রহণ কর্তব্য। গুরুর বত্রিশ লক্ষণ, শিষ্যের তদপেক্ষা চারিটি লক্ষণ নূন থাকিবে বা গুরুর ছত্রিশ লক্ষণ ও শিষ্যের বত্রিশ লক্ষণ থাকিবে। চারিটি লক্ষণ নূন হইলে যোগ্য শিষ্য বিবেচিত হয়, তদপেক্ষা অধিক লক্ষণ নূন থাকিলে মূর্খ শিষ্য বিবেচিত হয়, এইরূপ শিষ্য দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয় না, অতএব সিদ্ধগুরু লক্ষণ বিচার করিয়া শিষ্য গ্রহণ করেন। ‘গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে’ যে পুরুষলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, শিষ্যপক্ষেও ঐ সকল লক্ষণ থাকা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য উভয়ের গুণসাম্য থাকিলে উপযুক্ত গুরুশিষ্যভাব হয়, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যোগবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে শিষ্যপক্ষে চারিটি লক্ষণ নূন থাকা কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে, “মহাসিদ্ধৈরপি চতুর্লক্ষণ-নূন শিষ্যঃ কর্তব্যো, বহবশ্চ শিষ্যা বর্জনীয়া ইতি সিদ্ধান্তঃ।”

সিদ্ধ সম্প্রদায়ে পুরুষের যে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ থাকা কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে তাহা এইরূপ অষ্টবিভাগ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে,^১ যথা—

জ্ঞান পরীক্ষা	বিবেক পরীক্ষা	নিরালম্ব পরীক্ষা	বিবেক পরীক্ষা বা পরীক্ষাবমেক
নিরালম্ব	নির্মোহ	নিম্প্রপঞ্চ	সর্বদ্বন্দ্বী
নিভ্রম	নির্বন্ধ	নিস্তরঙ্গ	সাবধান
নিবাসী	নিঃশঙ্ক	নির্দ্বন্দ্ব	মন
নিঃশব্দ	নির্বিষয়	নির্লেপ	সারগ্রাহী
সন্তোষ পরীক্ষা	শীল পরীক্ষা	সহজ পরীক্ষা	শূন্য পরীক্ষা
অযাচকঃ	শুচিঃ	স্বহৃৎ	লয়ঃ
অবাঞ্ছকঃ	সংযমী	শীতলঃ	লক্ষ্যম্
অমানঃ	শাস্তুঃ	সুখদঃ	ধ্যানম্
অস্থিরঃ	শ্রোতা	স্বভাবঃ	সমাধিঃ

১। গো. সি. স. পৃ ৫৮।

২। গো. সি. স. পৃ ৫৬, ৫৭। ‘গোরখ-বাণী’, বড়পাল, পৃ ২৪২ বতীদ লখন।

বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে—যথা, মহাপাদানা ললিতবিস্তর ইত্যাদিতে—মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, যথা—১। সহস্রারচক্রাঙ্কিত পাণিপাদতলা ২। কুর্মবৎ সুপ্রতিষ্ঠিতপাদতা, ৩। রাজহংসবৎ জালাবনদ্ধাদুলি-পাণিপাতো ৪। মৃদুতরুণহস্তপাদতা ৫। সমুচ্ছিত হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, স্বদ্বয়, গ্রীবাগ্রদেশেহাৎ, সপ্তোৎসদগাত্রতা, ৬। দীর্ঘাদুলিতা, ৭। আপনয়াতা ৮। বৃন্তমুহুগাত্রতা, ৯। উচ্ছংষ্টগপাদতা, ১০। উর্দ্ধগ-রোমতা, ১১। পেণেয় জঙ্গতা, ১২। পাত্তরুবাঙ্গতা, ১৩। কোশগতাবস্তি-গুহতা, ১৪। সুবর্ণতা, ১৫। সূক্ষ্মচ্ছবিতা, ১৬। প্রদক্ষিণাবর্ত একৈকরোমতা, ১৭। উর্ণাঙ্কিতমুখতা ১৮। সিংহপূর্ব্বাঙ্গিকায়তা, ১৯। সুসংবৃত্তস্বকতা, ২০। চিতান্তরাংসতা, ২১। রসরসাত্রতা, ২২। অগ্রোধপরিমণ্ডলতা, ২৩। উষ্ণীষশিরস্তথা, ২৪। প্রভূতজিহ্বতা (প্রভূততনুজিহ্বতা), ২৫। ব্রহ্মস্বরতা, ২৬। সিংহহনুতা, ২৭। শুক্লদন্ততা ২৮। সমদন্ততা চতুর্মার নিবৃত্তহাক্ততুর্দংষ্ট্রাবিহায় ভগবতঃ, ২৯। অবিরলদন্ততা, ৩০। চহারিংশদদন্ততা, ৩১। অভিলীননেত্রতা, ৩২। গোপননেত্রতা।^১

উপরোক্ত ৩২ লক্ষণের সহিত পূর্ব্বোক্ত ৩২টি লক্ষণের মিল নাই। মহাপুরুষ-লক্ষণ বিচার বুদ্ধ, চক্রবর্তী রাজা, বোধিসত্ত্ব, প্রভৃতির বিষয়ে করা হয়, কারণ তাঁহারা মহাপুরুষ-পদবাচ্য। পদতলে ও হস্ততলে চক্র থাকিবে, হস্ত বক্র না হইয়াও জানু স্পর্শ করিবে, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা প্রায় ১২০০ গ্রন্থে লক্ষণ বিচার করা হইয়াছে।^২ শকুনশাস্ত্র প্রভৃতি জ্যোতিষের গ্রন্থেও লক্ষণ বিচার আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপুরুষের আজানুলব্ধিতভুজ, মেঘ জিনি কণ্ঠস্বর, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণনা আছে। মহাপুরুষদের এই দ্বাত্রিংশ মুখ্য লক্ষণ ব্যতীত ৮০টি গৌণ লক্ষণ বা অনুব্যাঞ্জন বৌদ্ধগ্রন্থে নির্দেশিত হইয়াছে। এই সকল চিহ্ন দ্বারা ‘বজ্রগুরু’র দেহ লক্ষিত হয়। চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়, দীঘনিকায়, বিনয়-পিটক, মজ্জিম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিচার আছে।^৩

১। ‘প্রতিমালক্ষণ’ C. U. Pub. Texts from Nepal, বন্যোপাধ্যায় সংগৃহীত।
Grunwedels. Buddhist Art in India p. 161.

২। Childer’s Pali Dictionary—‘Mahapuriso’.

৩। উত্তরা, কাষ্টিক ১০০৪, ‘ভাস্করিক বৌদ্ধবর্ণন’ গ্রন্থে উল্লেখ—Getty. The Gods of Northern Buddhism, pp. 170-71.



লৌকিক ব্যবহারার্থে শাস্ত্রে মহাপুরুষের এই সকল লক্ষণ নির্ণীত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বাহ্যরূপ দ্বারা তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া কঠিন, কারণ তাঁহারা কেহ জড়বৎ, কেহ পিশাচবৎ, কেহ উন্মত্তবৎ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ। পাশ্চপত-সম্প্রদায়ের ‘গণকারিকা’ গ্রন্থে আছে ভিক্ষাশয়ন, ভিক্ষাশ্রয়, উপহার, জপ, প্রদক্ষিণ, ক্রথন, স্পন্দন, মন্ত্রন, শৃঙ্গারণ, অপিতংকরণ, অপিতদ্ভাষণ, ইহারা চর্যাবিধি অর্থাৎ ধর্মসাধনের অঙ্গবিশেষ। উপহার মধ্যে উচ্চহাস্ত, নৃত্য, গুণকীর্তন, ছুঁকার (বৃষের স্থায় চিৎকার) ও প্রণাম গণ্য হয়। অপিতংকরণ ও ভাষণ অর্থে নটের স্থায় করণ ও ভাষণ।^১ এই গ্রন্থে “গুরু কে?” তাহারই সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চমত মতে গুরু নবগণের বেত্তা, অষ্টগণ যাহার প্রত্যেকটিতে পাঁচ পাঁচটি করিয়া বিষয় আছে এবং নবমগণ যাহাতে তিনটি বৃত্তি আছে, গুরু এই নবগণের বেত্তা ও বেদিতা হইবেন।

নবচক্রেস্বরতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়, স্বচ্ছন্দ সংগ্রহ, গুরুগীতা প্রভৃতিতে গুরুলক্ষণের চারিটি ক্রমের বর্ণনা আছে—যিনি পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীতের সম্যক্ বেত্তা তিনি গুরু অর্থাৎ যিনি কুণ্ডলিনী-শক্তি, হংস, বিন্দু ও নিরঞ্জনকে জানিয়াছেন তিনি গুরু।

পিণ্ডঃ কুণ্ডলিনী-শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্তিতঃ।

রূপং বিন্দুরিতি জ্যেষ্ঠঃ রূপাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥

—গুরুগীতা।

দাদৃশিষ্য সুন্দর দাসের গ্রন্থেও এই চারিটি ক্রমের বর্ণনা আছে, জৈনগ্রন্থেও এই চারিধ্যানের কথা আছে, অতএব বুঝা যাইতেছে পূর্ণ ও শুদ্ধতম জ্ঞানই গুরুর লক্ষণ।^২

আমার পুঁথিসংগ্রহের মধ্যে মৎসেন্দ্র-রচিত ‘যোগবিষয়’ নামক পুঁথিতে গুরুর সম্বন্ধে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি ভাবনাতে এবং শিষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

কুলজাতিসমায়ুক্তঃ সুচরিত্রো গুণাযুক্তঃ ॥৩

গুরুভক্তিয়ুতো ধীমান্ স শিষ্য ইতি কথ্যতে।

১। গণকারিকা—বহুটীকা ভাসবর্জ-বিরচিত পৃ ১৮

২। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩১৩ নোট, ‘গুরুত্ব ও সৎগুরুহস্ত’।

এবং গুরুশিষ্য সম্বন্ধের বিষয়ে বলা হইয়াছে—

স্বং গুরুঃ স্বং চ শিষ্যশ্চ শিষ্যশ্চ চ গুরোরপি ।

নানয়োরপি ভেদোহত্র সমসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৬

অর্থাৎ তুমি গুরু, তুমি শিষ্য এবং শিষ্য ও গুরু^১ এই উভয়ে অর্থাৎ গুরুশিষ্যে যখন ভেদ থাকে না তখনই সমসিদ্ধি হয় ॥

আমার সংগৃহীত অন্য একটা ‘অমরৌঘ প্রবোধ’ নামক গোরক্ষ রচিত পুঁথিতে শিষ্যমধ্যে সাধকভেদ বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্যমধ্যে মৃদুমধ্য অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর ভেদ আছে। ইহারা চারিপ্রকারের সাধক।^২

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে আছে আদর্শ যোগী বা গুরু আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মভূত হন। তিনি পক্ষপাতবিনির্মুক্ত অর্থাৎ দেহাদি অভিমানশূন্য, ভাবাভাবের অতীত, নিষ্কল, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন।

“পক্ষপাতবিনির্মুক্তং ব্রহ্ম

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ ॥

তদব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে প্রবম্” ॥^৩

গুরু অতিবর্ণাশ্রমী বলিয়া তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের গুণধর্ম স্পর্শ করে না, ত্রিগুণকে অতিক্রম না করিলে মুক্ত হওয়া যায় না; গুরু গুণপাশের অতীত, তাই তিনি মুক্তিপ্রদ সদগুরু। তাঁহাতে লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, দর্প নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, তিনি মানাপমান-স্বখদুঃখহীন, তিনি স্বয়ং দৃশ্যমান ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি পর, তিনি পরাংপর। সেই কুলাচারহীন গুরু জগতে একটাও ছল্লভ, কারণ গুরুরা কুলাচাররত ও শাস্ত হন। “কুলাচারবিহীনস্ত গুরুরেকো হি ছল্লভঃ।”^৪

যিনি কুলাচারবিহীন আদর্শ যোগী তিনিই অবদূত অর্থাৎ কৈবল্যমুক্ত, শ্রেণীগত কোন দোষ তাঁহাতে স্পর্শে না। সেই অবদূতরূপী গুরু সন্মার্গদর্শনশীল, যোগমার্গই সেই সন্মার্গ। অবদূত গুরুর—

বচনে বচনে বেদান্তীর্থানি চ পদে পদে ।

দৃষ্টৌ দৃষ্টৌ চ কৈবল্যং সোহবদূতঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥

একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশৈচককরে স্বয়ম্ ।

অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাং সোহবদূতঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥^৫

১। পুঁথি, যোগবিনয়ক ৩, ৪, ৬ শ্লোক

২। পুঁথি ‘অমরৌঘ প্রবোধ’ ১৮ শ্লোক ইত্যাদি।

৩। গো. সি. স. পৃ: ২।

৪। অমনস্ক ২।১৭।

৫। গো. সি. স. পৃ: ১।

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে—

সর্বান্ প্রকৃতিবিকারানবধুনোত্তীত্যবধূতঃ ।

প্রসরং ভাসয়েচ্ছক্তিঃ সঙ্কোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ ।

তয়োৰ্যোগস্ত কৰ্ত্তা যঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥^১

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহেও উক্ত মতের সমর্থন আছে। সমস্ত প্রকৃতি বিকৃতিকে যিনি অনাদর করিতে পারেন, অভিভব করিতে পারেন ও ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে গমন করিতে পারেন, তিনিই অবধূত। প্রসর বা বিস্তারই শক্তির প্রকাশ, শক্তির সঙ্কোচই শিবভাব, এই প্রসঙ্গ নিবন্ধের সৃষ্টিসংহার ইত্যাদি অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এস্থলে তাহার সহিত যোগীর কি সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। এই শিবশক্তিভাবের যিনি যোগকর্ত্তা, তিনিই সিদ্ধযোগিশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ।

বিবেকমার্গেও উক্ত হইয়াছে ক্ষেত্রজ ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ, অতএব যিনি ক্ষেত্রজ ও পরমাত্মার সংযোগসাধন করিতে পারিয়াছেন তিনিই যোগী।

‘যোগিনো বীতসংকল্পা নির্দ্বন্দ্বাঃ পুণ্যদর্শনাঃ ।

যোগরত্নকরগুণস্তে জয়ন্তাবিধিগোচরাঃ’ ॥^২

যিনি সকল সঙ্কল্পমুক্ত, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, যাহার দর্শন পুণ্যদায়ী, করণে যেরূপ রত্নসকল সময়ে রক্ষিত হয়, যোগরূপ রত্নসমূহও যাহাতে সেইরূপ আহিত, বিধিও যাহার তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহেন, তাদৃশ পুরুষই যোগিপদবাচ্য।

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে সিদ্ধযোগিরূপ গুরুর বর্ণনা আছে, যথা—

বিশ্বাতীতং যদা বিশ্বমেকমেবাবভাসতে ।

সংযোগেন যদা যন্ত সিদ্ধযোগী ভবেত্তু সঃ ॥১০

সর্বাসাং নিজবৃত্তীনাং বিশৃতিং ভজতে তু যঃ ।

স ভবেৎ সিদ্ধসিদ্ধান্তে সিদ্ধযোগী মহাবলঃ ॥১১

উদাসীনবদাসীনঃ স্বস্তোহস্তুর্নিজভাসকঃ ।

মহানন্দময়ো ধীরঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥১২

১। সি. সি. স. ৩৯, গো. সি. স. পৃ. ১, ২, সি. সি. প. ৩১ সর্বান্ প্রকৃতিবিকারান্ ইত্যাদি।

২। গো. সি. স. পৃ. ৮।

পরিপূর্ণঃ প্রসন্নাত্মা সর্বাসর্বপ্রদোহপরঃ ।

নিরুথো নিৰ্ভরানন্দঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥১৩॥

গতেন শোকেন ভয়েন বীপ্সাপ্রাপ্তেন হর্ষং ন করোতি যোগী ।

আনন্দপূর্ণো নিজবোধলীনো ন বাধতে কালপথো ন নিতাম্ ॥১৪॥^১

যাঁহার সংযোগসাধন দ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণ পদার্থসকল একরূপ অবভাসিত হয়, তিনি সিদ্ধযোগী । যিনি আপনার যাবতীয় বৃত্তির মার্গ ভঞ্জন করিতে পারেন সুতরাং অপ্রমত্ত, তিনি মহাবল সিদ্ধযোগী । যিনি উদাসীনের ছায় সদা আসীন, যিনি কখনও আত্মবিস্মৃত নহেন, সুতরাং সর্বদা স্বস্থ, যিনি আপন অন্তরকে আপন ভাস দ্বারা উদ্ভাসিত রাখেন, যিনি মহানন্দময়, যিনি ধীর অর্থাৎ বিকারের হেতু সত্ত্বেও সদা অবিকৃত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ । যাঁহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছু না থাকায়, সর্বদা পরিপূর্ণ ও প্রসন্নাত্ম, যিনি সর্বাসর্বপ্রদ ও সাধারণ হইতে অপর বা ভিন্ন, যিনি নিরুত্থনী লাভ করিয়া সদাকালের জন্ত নিৰ্ভরানন্দে অধিষ্ঠিত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ । যোগী হর্ষবিষাদের অতীত, লাভালাভে শোকভয়ে অবিচলিত, আনন্দপূর্ণ, আপনবোধে সংলীন অতএব কালের দ্বারা অবাধিত এবং নিত্যানিত্যভাব বিবর্জিত । এইরূপ যোগীই আদর্শ ও যথার্থ গুরু ।

নাথমার্গে অত্যাশ্রমী যোগীই গুরু ।^২ মুমুক্শু ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় যোগসাধনে ব্রতী হন । অত্যাশ্রমী গুরু সর্বকর্মত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ ; “কালত্রিতয়জং কর্ম তাজতাত্যাশ্রমী দ্রুতম্” ও “অবদ্বৃতাঃ ক্রিয়াসিদ্ধা-স্তদ্বরূপা নিরঞ্জনাঃ” ।^৩ এইরূপ গুরুর বাক্য দ্বারা শাস্ত্রসারমাত্র শ্রবণ করিলেও যোগধর্মের কৃতকৃত্যতা জন্মে, মুঢ় ব্যক্তির আত্মতত্ত্ব না জানিয়া শাস্ত্রে মোহগ্রস্ত হয় ।^৪

কোটি কোটি শাস্ত্র পাঠ করিলেও গুরুবাক্য ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, কিন্তু গুরু মাত্র তাঁহার করুণাধঙ্গপাত দ্বারা পশু বা জীবের বন্ধন ছিন্ন করেন ।^৫ চিন্তামণি এক গুরুর কৃপায় সাধকের লয়প্রাপ্তি সম্ভব ।^৬ অতএব মুমুক্শু ব্যক্তির এইরূপ গুরুগ্রহণ কর্তব্য । সেই শিবরূপী গুরুর লক্ষণাদি এইরূপ—তিনি সর্ববিলক্ষণ অর্থাৎ সর্ব বিষয় হইতে তাঁহাতে ভেদ আছে, তিনি প্রারব্ধ কর্ম নির্মূল বা ক্ষয় করিতে সক্ষম, এবং সমাধি

১। সি. সি. স. ৩১০—১৪

৪। গো. সি. স. পৃ. ২৫

২। গো. সি. স. পৃ. ৫১

৫। গো. সি. স. পৃ. ৩২

৩। গো. সি. স. পৃ. ৫৩

৬। গো. সি. স. ৩১, ৫

আশ্রয় করিয়া তিনি ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিয়াছেন।^১ তাঁহার মার্গ দিব্যমার্গ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর মার্গ আর নাই, তাঁহার পক্ষে বেদের কৰ্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন নাই, “আব্রহ্মস্বপৰ্য্যন্তং সম্পূর্ণং পরমাত্মনি। ভিন্নাভিন্নং ন পশ্যামি তস্মাহং পঞ্চমাত্মনী ॥” তিনি বাসনাবর্জিত, তাঁহার গাত্র ধূলিধূসরিত অথচ তাঁহার চিত্ত নিরাময়, অনন্তানন্দব্রহ্মত্ব তাঁহার লক্ষণ, তিনি চিন্তাচেষ্টা বিবর্জিত, অহঙ্কারমুক্ত, স্বচ্ছস্বভাব, গগনোপম, লোকালোক বা কুলাকুল তাঁহার মধ্যে নাই।^২

অবধূত গুরুর বাহ্যলক্ষণ নাদ, মুদ্রা, ভাস্ম, শৈলী, উর্ণাযজ্ঞোপবীত। এই সকল বাহ্যলক্ষণের বিষয় গৌরঙ্গসিদ্ধাস্তসংগ্রহে এইরূপ বর্ণিত আছে— “মুদমোদে তুরাদানে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। উভয়োরৈক্যসংভূতির্মুদ্রেতি পরিকীর্তিতা।...নাদধারণমাহ,—অনাহত শৃঙ্গীতি তেষামন্তোহন্তমন্ত্রাপি চ যো বাগ্ ব্যবহারস্তমাহ। আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারেণ। ত্রয়াণামৈক্যসংভূতিরাদেশ ইতি কীর্তিতঃ ॥ আদেশ ইতি সঙ্গামীম।” আবার আদেশ অর্থে ভাস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রধারণ। অত্বে “অবধূতগুরোর্মূর্ধ্ব-চিহ্নম্ নাদোমুদ্রাভাস্মশৈলী” ইত্যাদি^৩। সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতিতে আছে, অবধূত অর্থে যিনি প্রকৃতি বিকারকে ‘অবধুনোতি’ তিনি অবধূত। তাঁহার কেশকুন্তল অর্থে সর্বাবস্থাভিনির্মুক্ত হওয়া, বিভূতিধারণ অর্থে নিজেকে স্মরণ করা, শংখের ‘শং’ অর্থে সুখ, ‘খ’ অর্থে ব্রহ্ম, তাঁহার মেখলা ‘নিবৃত্তি’, কুণ্ডল ‘চিংপ্রকাশ’, ইত্যাদি।^৪ এই নিবন্ধের ঐতিহাসিক অংশে বিভূতি, জল, ও নাদজনেউ দ্বারা দীক্ষার রহস্য বিবৃত হইয়াছে (দীক্ষা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি পৃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)।

স্বনাথমতে একমাত্র অবধূতই সকল মার্গের লক্ষ্য, পরমহংসাপেক্ষা অবধূত উত্তম,^৫ কারণ অবধূতই শ্রেষ্ঠতর ও নাথলক্ষণযুক্ত। তিনি একাধারে ত্যাগী ও ভোগী, পরমহংস মাত্র ত্যাগী। কথিত আছে, শঙ্কর নানামত গ্রহণান্তর অবধূতরূপ শ্রেষ্ঠমার্গ গ্রহণ করেন।^৬

যোগমার্গে নিষ্কাত অবধূত গুরু পরিপক দেহ, তিনি জীবন্মুক্ত, সদা স্বস্থ, সর্বদোষবিবর্জিত,^৭ দেবগণেরও ছল্লভ যোগদেহ মহাবলের

১। হ-বো-প্র ৪১২ টীকা।

২। গো. সি. স. পৃ ১০, ১৫, ২০, ২৮, ২, ৩০।

৩। গো. সি. স. পৃ ৯, ৫১।

৪। সি. সি. প. ষষ্ঠ উগদেশ।

৫। গো. সি. স. পৃ ৫৫, ৭২।

৬। গো. সি. স. পৃ ১৮।

৭। গো. সি. স. পৃ ৩১।

আশ্রয়স্বরূপ, উহা ছেদবদ্ধবিনির্মুক্ত নানাশক্তিদ্বর, পরমশ্রেষ্ঠ। উহা আকাশহইতেও নির্মল, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, অপিচ স্থূল হইতেও স্থূলতর। অবদূত গুরুর দেহ এইরূপ ‘যোগদেহ’।

উচ্ছারূপো হি যোগীন্দ্রঃ স্বতন্ত্রভুজরামরঃ ॥ ৫১

ক্রৌড়তি ত্রিষু লোকেষু লীলয়া যত্র কুত্রচিৎ।

অচিন্ত্য শক্তিমান্ যোগী নানারূপাণি ধারয়ন্ ॥ ৫২

সংহরেচ্চ পুনস্তানি স্বেচ্ছয়া বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

মরণং যত্র সর্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি ॥ ৫৩ ১

অচিন্ত্যশক্তিমান্ যোগী নানা রূপ গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন বিচরণ করেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। জীবন্মুক্ত বলিয়া তাঁহার কর্তব্য কিছু নাই, কৃতকর্মের দ্বারাও তিনি অলিপ্ত। এইরূপ সিদ্ধগুরুর কৃপায় পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ যোগিপদে আরুঢ় হইয়া সংসার অতিক্রম করিতে পারেন। চিন্তামণিকল্প একগুরুর কৃপা ও সঙ্গগুণ বিনা শাস্ত্র, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা কেহই পরমপদলাভে সমর্থ হন না, কেহই সংসার অতিক্রম করিতে পারেন না, —এতাদৃশই সদগুরুর মহিমা। এই বিচিত্র বিশ্বের অভ্যন্তরে এক আশ্রয়তত্ত্বরূপ যে পরম অদ্বৈতভাব বিরাজমান, সদগুরুর কৃপা ভিন্ন তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। “শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ। অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব ॥ তজ্জ্যেয়ং সদগুরোর্বক্তৃদ্রামান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ।”^২ সদগুরুর নিকটই দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য, তিনিই ভজনীয়, পরম আশ্রয়। স্বরূপ ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সহায় তিনিই।

গুরুত্ব অর্থে সকল স্থলে মানবগুরু বুঝায় না; পারমার্থিক গুরু ও ব্যবহারিক গুরু ভিন্ন, নাথসম্প্রদায়ে ব্যবহারিক বা মানবগুরুর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা, আচার্য্য্য বহুদীক্ষিতাভূতিরতা নগ্নব্রতাস্তাপসা নানাতীর্থ-নিষেবকা জিনপরা মোনে স্থিতা নিত্যশঃ। এতে তে খলু হৃৎখভারনিরতাস্তে তদ্বতো বক্তিতাস্তস্ম্যাং সিদ্ধমতমিত্যাदि।^৩

মন্ত্রব্যাখ্যারত বহুশিষ্যপরিবৃত অজিন বা বকলধারী গুরু তত্ত্ববঞ্চিত জপপরা গুরু মাত্র। কেহ বা আগম কেহ বা নিগমজালে আবদ্ধ, কেহ বা তর্কপরায়ণ, ইহারা কেহই শঙ্করীকে জানেন না। ইহারা তত্ত্ববঞ্চিত, সাধনে অশক্ত, কারণ প্রারক দ্বারা লিপ্ত বলিয়া কাতর, শরীরসুখার্থে

১। যোগবীজ। গো. সি. স. পৃ ৩১ পাঠান্তর জটয়া।

২। সি. সি. প. ৪১২৬, সি. সি. স. ৪১৩৭।

৩। গো. সি. স. পৃ ১২, ১৩।

‘অহং ব্রহ্ম’ বলিয়া থাকেন। কুলবধূরিব শঙ্করীকে জানিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। এইরূপ তত্ত্ববঞ্চিত গুরু মূর্থ ও নরকভোগী।^১

নাথসম্প্রদায় মতে পারমাধিক গুরু একমাত্র ‘নাথ’। রাজগুহ্যে যে নাথলক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

না-কারোহিনাদিরূপঃ থ-কারঃ স্থাপ্যতে সদা।

ভুবনত্রয়মেবৈকঃ শ্রীগোরক্ষ নমোহস্ত তে ॥^২

সূর্য্যকে দীপ দ্বারা দেখাইবার চেষ্টার স্থায়ী শাস্ত্রে নাথলক্ষণ বর্ণনের চেষ্টা দেখান যায়, কারণ যোগীদের যাহা অপরোক্ষ অনুভব, সে বিষয়ে বর্ণনা কিরূপে সম্ভব? পদ্মপুরাণে কপিলগীতায় আছে, শঙ্কর দত্তাত্রেয়াদিরও গুরু হইলেন ‘নবনাথ’, তাহাদের বিবরণ অত্র দেওয়া হইয়াছে। নাথ হইতে গুরুশিষ্যক্রমে বা পরম্পরায় নাদসন্তান ও বিন্দুসন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে। গুরুর জ্ঞানদেহের দ্বারা লইয়া যে সন্তানের উৎপত্তি তাহার নাম নাদসন্তান বা শিষ্য এবং মায়িকদেহের দ্বারা হইতে যাহাদের জন্ম তাহার নাম বিন্দুসন্তান। সিক্তসিক্তাস্তপদ্ধতিতে পঞ্চপ্রকার গুরুকুল সন্তানের কথা আছে—আদ্রিসন্তান, বিলেশ্বরসন্তান, বিভূতিসন্তান, নাথসন্তান ও যোগীশ্বরসন্তান; তাহাদের সন্তানদেরও পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য আছে।^৩

নাথাদ্ দ্বিপ্রকারা সৃষ্টির্জাতা—নাদরূপা বিন্দুরূপা চ। নাদরূপা শিষ্যক্রমেণ বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ। নাদ হইতে নবনাথের জন্ম, বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম, ভৈরবের শক্তি ভৈরবী হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি। নবনাথের পর দ্বাদশসিক্ত, ৮৪ সিক্ত, দ্বাদশপন্থা ও অনন্তসিক্তের উৎপত্তি।^৪

নাথাংশো নাদো, নাদাংশঃ প্রাণঃ শক্ত্যাংশো বিন্দুবিন্দোরাংশঃ শরীরম্। এবং যোগসম্প্রদায়ে শিষ্টোহধিকো যো নাদাংশো জায়তেহন্য-মতে পুত্রোহধিকঃ কথ্যতে। স চাধিকঃ কথং ভবেৎ। কথং বপুর্বিন্দুতো জাতম্। পুনঃ পুনঃ নাদাংশঃ প্রাণ উক্তো বিন্দ্বংশঃ শরীরমুক্তম্। তত্রাপি প্রাণাচ্ছরীরমুত্তিষ্ঠতি শরীরস্থাধারঃ প্রাণো ভবতি। তথা চ নাদস্তাস্ত্রজঃ শিষ্য এবাধিক ইতি।^৫

১। গো. সি. স. পৃ ১৩, ৩৮.

২। গো. সি. স. পৃ ১১

৩। সি. সি. প. ৩৪৩

৪। গো. সি. স. পৃ ৪৮

৫। গো. সি. স. পৃ ৫৮

সংসারীদিগের মতে বিন্দুসন্তানেরই প্রাধান্য, কিন্তু সিদ্ধমতে পিতাপুত্র সম্বন্ধ অপেক্ষা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ মুখ্য, কারণ গুরু পিতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নাদাস্বজ শিষ্য পুত্রাপেক্ষা প্রিয়।

গুরু সিদ্ধদেহী না হইলে তাঁহার নাদসন্তান সম্ভব হয় না, কারণ অপকদেহী যোগী জরামৃত্যুর অধীন, (পকদেহী যোগীর জরা নাই, মৃত্যু নাই, তিনি মৃত্যুজয়ী।) অজর, অমর গুরু বিনা শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণে কে সক্ষম? পুত্রৈব মৃত এবাসৌ মৃতস্ত মরণং কৃতঃ, মরণং যত্র সর্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি ॥^১

সাধারণ জীব শরীর দ্বারা বিজিত, কিন্তু যোগী দ্বারা শরীর বিজিত। অতএব শরীর হইতে সুখদুঃখাদি ফলভোগ তাহাদের বিরূপে হইবে? যোগী যোগাগ্নিদ্বারা সম্প্রদাতুময় দেহ জয় করিয়াছেন, এইরূপ মহাবল যোগদেহ দেবতার পক্ষেও দুর্লভ। জীবিতকালেই প্রাণবিলীন হওয়াতে যোগীর পিণ্ড বা দেহ পতিত হয় না, অতএব তিনি শিষ্যের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হন।

অপরপক্ষে এইরূপ দৃষ্টান্তও দুই একটি দেখা গিয়াছে যেখানে শিষ্যই গুরুর নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। পরমসিদ্ধা মীননাথ বা মৎস্যেশ্বরনাথ কদলীরাজ্যে ভ্রমণকালে রাজ্যের অধীশ্বরী কমলা ও তাঁহার ভগিনী মঙ্গলার আকর্ষণে যোগধর্ম বিস্মৃত হইয়া সংসারধর্ম্মে মগ্ন হইয়াছিলেন—প্রচলিত গীতিকাব্যে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। অতঃপর গুরুর উপযুক্ত শিষ্য শ্রীগোরক্ষনাথ নর্ত্তকীর বেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধের তালে তালে ‘কায়াসাধনের’ তত্ত্বগুলি গুরুরই নাম স্মরণ করিয়া ‘জয়গুরু মৎস্যেশ্বর’ বলিয়া তাঁহার স্মৃতিপথে আনয়ন করিলে, মীননাথের চৈতন্যোদয় হয়, এবং রাজসীমায়ের মায়াজাল হইতে তিনি শিষ্য কর্তৃক মুক্ত হন। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, গুরু পতিত হইলেও শিষ্যের নমস্, তাই গুরুর নাম লইয়াই শিষ্য গুরুর উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইলেন। যে গুরুশক্তির সাহায্যে শিষ্যপক্ষে গুরুর দায়িত্বগ্রহণ সম্ভব হইয়াছিল সে গুরুত্ব কোন মানবগুরুর নহে, শিষ্যের সেই গুরুভক্তি সত্ত্ব ও নিগুণ গুরুভক্তি, সেই ভক্তি সাহায্যেই শিষ্য বলশালী, অস্তথা সামান্য মানবের কি সাধ্য যে সে অঘটন সাধন করিবে?

গুরুকৃপা ভিন্ন শিষ্যপক্ষে মুক্তিলাভ যেরূপ অসম্ভব, অশ্রুপক্ষে শিষ্যের পুরুষকার ভিন্ন গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধন করা অসম্ভব। গুরুশিষ্য মধ্যে দাতা ও গ্রহীতাভাব প্রশস্ত, গুরু নিজ 'শক্তিপাত' দ্বারা শিষ্যকে বলীয়ান করিবেন, শিষ্য সমস্ত্রমে সে দান গ্রহণ করিবে। তাত্ত্বিকাচার্যের মতে শক্তিপাত অর্থে গুরুকৃপা বা ভগবদনুগ্রহ। ইহা ব্যতীত কেবল পৌরুষ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।

গুরু বহুশিষ্য গ্রহণ করিলে তাহাদের পাপ গ্রহণ করিয়া গুরুর অশেষ দুর্গতি হয়। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যে গুরু তত্ত্ববাক্তি এবং বহুশিষ্যের গুরু, তিনি নরকভোগী, “যতো হেতোর্বহুশিষ্য-করণং সিদ্ধানাং মতে বর্জিতম্”।^১

দ্বাদশবর্ষব্যাপী গুরুসেবার ফল শিষ্যপক্ষে বিশেষ শুভ। শিষ্য প্রথম বৎসরান্তে নীরোগ, লোকপ্রিয় হয়, তাহার আত্মভাব প্রস্ফুট হইতে থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে কাব্যরচনায় সামর্থ্য জন্মে, তৎপরে দিব্যযোগী, দূরশ্রাবী, বাক্যসিদ্ধ প্রভৃতি হইয়া পঞ্চমবর্ষে পরকায় প্রবেশ ক্ষমতা জন্মে। ষষ্ঠ বৎসরে শিষ্যদেহ শত্রু বা বজ্র দ্বারা ছেদ বা ভেদ হয় না, সপ্তম বৎসরে আকাশগামী ও দূরদর্শী হয়, অষ্টমে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হয়। নবমে বজ্রকায়, খেচর ও দিক্চর হয়; দশমে পবনবেগে যথেষ্ট গমন সম্ভব হয়। একাদশে সর্ব্বজ্ঞ ও সিদ্ধিভাক্ত, দ্বাদশে শিবতুল্য হর্ষাকর্তা হইয়া ত্রৈলোক্যপূজ্য হয়। একমাত্র সদগুরু প্রসাদেই দ্বাদশ বর্ষে শিষ্যের এই সকল মহাবললাভ সম্ভব হয়, তাহা নিঃসংশয়।^২

এইরূপে শিষ্য গুরুর উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধিলাভ করে এবং গুরুও তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন।

“গুরুশব্দককারঃ স্ত্রাক্ষরশব্দস্তনিরোধকঃ।”^৩ অর্থাৎ ‘গু’ দ্বারা অন্ধকার ও ‘রু’ দ্বারা যিনি তাহা নিরোধ করেন তাহাই লক্ষিত হইতেছে, তিনিই ‘গুরু’-পদবাচ্য। নাথগুরুর কৃপায় কেবল অজ্ঞান দূর হয় তাহা নহে, ‘মহাজ্ঞান’ লাভ হয় ও সিদ্ধিসকল করায়ত্ত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যোগসাধনের উদ্দেশ্য

নাথ-সম্প্রদায়ের সাধকগণ পরমপদ প্রাপ্তির উপায়ের মধ্যে যোগকেই সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিবৃত্ত এবং তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যোগসাধনের প্রাধান্য নির্দেশের জন্যই তাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ‘যোগী’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু যোগের মহত্ত্ব প্রাচীন ভারতে সর্বত্রই অঙ্গীকৃত হইত। শঙ্করাচার্য্য “এতেন যোগঃ প্রত্যাভ্যাসঃ” বলিয়া যোগদর্শনের অবলম্বিত সাংখ্যপ্রণালী নিরাকরণ করিলেও যোগের মহত্ত্ব অস্বীকার করেন নাই, বরং ‘শারীরিক ভাষ্য’ এবং বহু প্রকরণ গ্রন্থে তাহার উৎকর্ষ খ্যাপনই করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অঙ্কিকে সূত্রকার এবং ভাষ্যকার সমবেতকণ্ঠে যোগাভ্যাসের আবশ্যকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন।^১ বৈশেষিকদর্শনেও স্পষ্ট ভাষায় যোগাভ্যাসের প্রভাব স্বীকার করা হইয়াছে। শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, বীরশৈব, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত প্রভৃতি যাবতীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ই যে যোগের অলৌকিক প্রভাবে সমরূপে প্রভাবিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, “অয়ং তু পরমো ধর্ম্মঃ যদ্ যোগেনাস্তদর্শনম্” অর্থাৎ যোগসাধনা দ্বারা আস্ত্রসাক্ষাৎকার লাভ করাই মনুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

যোগের মহত্ত্ব অঙ্গীকার এবং আপন আপন সাধনপদ্ধতির মধ্যে যথাসম্ভব যোগপ্রক্রিয়ার সমাবেশ সর্বত্রই উপলব্ধ হয়। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের যোগসাধনা এবং পাতঞ্জলাদি মুখ্য যোগসম্প্রদায়ের যোগসাধনা হইতেও কোন কোন অংশে নাথ-সাধকগণের যোগসাধনায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। অবশ্য সাধর্ম্ম্য যে ছিল তাহা সত্য, কারণ বিভিন্ন যোগসাধনায় পরস্পর পার্থক্য সত্ত্বেও মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সাম্যভাব থাকা স্বাভাবিক। নাথ-সম্প্রদায়ের যোগের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা

হইল, উহা যোগের আদর্শগত ও সাধনগত উভয়ই বৃত্তিতে হইবে, কারণ আদর্শে বৈশিষ্ট্য না থাকিলে সাধনে বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না।

✓ নাথগণের আদর্শ কি? তাহারা জীবনের লক্ষ্যনির্দেশ কি প্রকারে করিয়াছেন, আমরা সিদ্ধান্ত অংশে পরমপদ বা পূর্ণসত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত-ভাবে কিছু আলোচনা করিয়াছি। মহাসৃষ্টির পূর্বে ও মহাপ্রলয়ের অবসানে যখন সকল কার্য্যপদার্থ পরমকারণে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন একমাত্র পূর্ণসত্যই অবশিষ্ট থাকেন। কেহ ঐ পরমসত্তাকে আত্মরূপে, কেহ শূণ্যরূপে, কেহ ব্রহ্মরূপে, কেহ বা পরমপদরূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু বস্তুতঃ উহা বর্ণনাভীত। উহাকে সগুণ বলা যায় না, নিগুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও উহার সম্যক পরিচয় দেওয়া যায় না—উহা একাধারে সগুণ ও নিগুণ উভয়ই, অথচ সগুণ ও নিগুণের দ্বন্দ্বভাব উহাতে না থাকাতে উহা চির দ্বন্দ্বাভীত। উহা ভোগ ও মোক্ষের সমন্বয়, সাকার ও নিরাকারের মিলনভূমি, সর্ববিরোধের অবসানস্বরূপ। নাথগণ উহাকেই ‘নাথ’ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে—

“নিগুণং বামভাগে চ সবাভাগেহদ্ভূতা নিজ্জা।

মধ্যভাগে স্বয়ং পূর্ণস্তস্মৈ নাথায় তে নমঃ ॥”

এই নাথতত্ত্বই সগুণ ও নিগুণের সামান্যত পূর্ণতত্ত্ব। উহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবের অতীত। পরমপদ অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

এই সর্বতত্ত্বের অতীত পরমতত্ত্বকে লাভ করাই যোগসাধনের উদ্দেশ্য কিন্তু উহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কারণ এই পরমসত্যের সাধনের অধিকার সাধারণ মনুষ্যের নাই। মনুষ্যদেহ অপবিত্র, তাহার চিত্ত মলিন; অপবিত্র দেহে, মলিন হৃদয়ে ‘মহাজ্ঞানে’র উদয় সম্ভব নহে। সুতরাং দেহ ও চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে, পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্মদেহ এবং সপ্তদশ বা অষ্টাদশ অবয়ব সম্পন্ন সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ উভয়ই শুদ্ধ হওয়া আবশ্যিক। সাধারণতঃ উভয় দেহ একরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে যে দুইটিকে পৃথক করা চলে না, অথচ দুইটিকে মিলিত করিয়া এক ও অভিন্নরূপে পরিণত করাও যায় না। সূক্ষ্মশরীর হইতে যখন সূক্ষ্মদেহ নির্গত হইয়া যায়, তখনই মৃত্যু ঘটে এবং সূক্ষ্মশরীর যখন

প্রাপ্তন কৰ্মবিপাকানুসারে পুনর্বার স্থলদেহ ধারণ করে, তখনই জন্ম হয়। সুতরাং জাগতিক জন্মমরণ বস্তুতঃ সূক্ষ্ম ও স্থলদেহেরই যোগ ও বিয়োগের লীলা মাত্র। আর একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য। সূক্ষ্মদেহ পৃথক হইলেও তাহাতে স্থলদেহের অংশ সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে, তেমনি স্থলদেহেও সূক্ষ্ম তত্ত্বের অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ নহে। দেহশোধন ব্যাপারে এই বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। নাথযোগিগণ বলেন যে ক্রিয়াকৌশলে এই স্থলদেহকেই একরূপে পরিবর্তিত করা যায় যে তখন ইহাতে কোন প্রকার আগন্তুক মলের লেশমাত্র বর্তমান থাকে না। তখন সূক্ষ্মদেহ ইহার সহিত মিলিত হইয়া একাকার ধারণ করে। এই অবস্থায় যে সকল তত্ত্বদ্বারা উভয় দেহ গঠিত হইয়াছিল তাহারা মূলতঃ অভিব্যক্ত হইয়া ও তীব্র সংবেগবশতঃ দ্রুত হইয়া এক অখণ্ডরূপে পরিণত হয়, সাধারণতঃ ইহাকেই ‘সিদ্ধদেহ’ বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ ‘কায়সিক্তি’ প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই দেহসিক্তি কেবল স্থল ও লিঙ্গের সংঘট্টে সম্পন্ন হয় না, চরমাবস্থায় কারণ-দেহের সহিত সংঘর্ষ আবশ্যক হয়। স্থল, লিঙ্গ ও কারণ এই তিনটি মায়িক দেহ, অন্তর্গত মলের অপসারণ ও তাত্ত্বিক সম্মিলনের প্রভাবে এক অখণ্ডরূপে আবির্ভূত হয়। তাহাই প্রকৃত ‘সিদ্ধদেহ’—তাহা জরা, মরণ, বিকারাদি বর্জিত, শোকদুঃখ প্রভৃতি হইতে চিরমুক্ত, জ্যোতির্ময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নিত্যবিগ্রহ। এই দেহের উপর পৃথিব্যাदि পঞ্চভূতের কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না, দেশ বা কাল দ্বারা ইহা পরিচ্ছিন্ন হয় না। সর্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বরিক গুণসকল ইহাতে সর্বদা স্বাভাবিক ধর্মরূপে বিরাজমান থাকে।

যে যোগী এই সিদ্ধদেহ লাভ করিতে পারেন, তিনি যে কষ্টের অতীত তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণতঃ জ্ঞানী ও ভক্ত প্রারন্ধের অধীন, তাই তাহারা প্রারন্ধজনিত ভোগ পরিহার করিতে সমর্থ হন না। প্রারন্ধের অবসানে দেহপাত বা মৃত্যু তাহাদের পক্ষে অবশ্যজ্ঞাবী, কিন্তু সিদ্ধযোগপথে সাধক মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন, কালকে অধীন করিয়া রাখেন।^১

পূর্ববর্ণিত সিদ্ধদেহই বিশুদ্ধদেহ, ইহা ব্যতিরেকে ব্রহ্ম-উপাসনা এবং তাহার ফলে মহাজ্ঞানলাভ সুদূরপরাহত। সিদ্ধান্ত শৈবাচার্য্যগণ

এই সিন্ধুদেহকেই 'বৈন্দব দেহ' বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা বিন্দু বা মহামায়া দ্বারা রচিত বলিয়া ইহাতে মায়ার বিকার বর্তমান থাকে না, কর্মসংস্কারও ইহাতে কার্য্য করে না। পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিভাষাতে এই দেহকে 'অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়' বলিয়া বর্ণনা করা চলে, ইহা ত্রিগুণের অতীত, তবে গুণাতীত কোন বস্তু থাকা সম্ভব নহে বলিয়া উহা 'সাত্বদেহ' অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধান দেহ।

যোগিগণ সিন্ধুদেহ ধারণ করিয়া সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জগতের কল্যাণ সম্পাদন করেন ও এইরূপে পরোপকার কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকেন। ক্রমশঃ ব্যাপক আত্মভাবের সহিত পরিচয় ঘটে। তখন ধীরে ধীরে এক মহান আত্মরূপে তাহারা নিজেকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং 'মহাজ্ঞানে'র উদয় হয়। তখন সিন্ধুদেহ দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়, মন ও জ্যোতির্ময় অব্যক্ত ভগবৎস্বরূপে লীন হইয়া যায়, স্বকীয় ভগবৎস্বরূপতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাত্ত্বিক পরিভাষাতে ইহাই 'শাক্তদেহ' বা 'প্রণবতনু'। ভগবদ্রূপ চিদায়ক বলিয়া যোগীও তখন চিৎস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হন। সিন্ধুদেহ যে শক্তির বিকাশ, দিবা বা শাক্ত দেহ তাহারই অন্তর্লীন অবস্থা মাত্র।

এখন যোগসাধনের উদ্দেশ্য কি তাহা ভালরূপে বুঝা যাইবে। যোগসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণহলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি, এবং গৌণ উদ্দেশ্য সিন্ধুদেহলাভ, যাহা দ্বারা ভগবৎসাধন সম্ভবপর হয়। মনুষ্যের অপকদেহ যতদিন যোগাগ্নি দ্বারা পরিপক না হয়, ততদিন ঐ দেহে ভজনসাধন চলে না, উপাসনা সম্ভবপর হয় না, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইজন্য দেহপাক আনুষঙ্গিক হইলেও, ভগবৎতত্ত্বলাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কারণ অপকদেহে মহাজ্ঞানের আবির্ভাবের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

পূর্ণহলাভের নামই নিকুথানদশা, অর্থাৎ এই অবস্থা হইতে আর ব্যুত্থান হয় না। "যজ্জ্ঞান ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম," শ্রীভগবান্ এই গীতাবাক্যে পরমপদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে যাইতে পারিলে জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। এখান হইতে পুনরাবর্তন হয় না, তাই ব্রহ্মসূত্রে "অনারুতিঃ শব্দাৎ অনারুতিঃ শব্দাৎ" বলিয়া ইঙ্গিতে ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

অতএব সাধকের যোগসাধনের দুইটি উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে—প্রথম হইল, স্বয়ং দ্বৈতভাব হইতে অদ্বৈতভাবে উপনীত হওয়া ; দ্বিতীয় হইল, জগতের কল্যাণসাধন করা। এইরূপ বহুসিদ্ধ যোগীর সিদ্ধদেহে জগতের কল্যাণসাধন করার বৃত্তান্ত জানা যায়, যথা, বুদ্ধদেব নিরুত্থানে যাইতে অসম্মত হন এবং প্রাণীর মঙ্গলের জন্য বহুকাল সিদ্ধদেহে এজগতে বিরাজ করেন। ক্রুদ্ধকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আনন্দের চতুর্থস্তরে উপনীত হইয়াও তিনি মহাজ্ঞানলাভে সমর্থ হন নাই, তখন গয়ায় বোধিবৃক্ষতলে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু তৎফলে নির্বাণ তাহার সম্মুখীন হইলেও প্রাণী-উদ্ধারের জন্য তিনি তাহা লাভ করিলেন না।

নাথমতেও সিদ্ধদেহে অমরত্বপ্রাপ্তি ও জগতের কল্যাণসাধন উদ্দেশ্য, ইহার পর দিব্যদেহে যে অবিনাশত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাই নিরুত্থানদশা। এই নিমিত্তই যোগসাধনকে নাথসিদ্ধগণ সর্বোচ্চস্থান দিয়াছেন, যোগসাধনের দ্বারাষ্ট সিদ্ধদেহ ও দিব্যদেহ লভ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহজাবস্থানাভ, যোগসাধন-প্রণালী

প্রকৃতিকে ‘মায়া’ বলিয়া ত্যাগ করিবার উপদেশ সাধারণতঃ যোগ-পথের সাধককে দেওয়া হয়; প্রকৃতির যাহা ‘ঐশ্বর্য্য’ তাহা পাক্‌ভৌতিক, তন্নিমিত্ত যোগীর পক্ষে তাহার প্রাপ্তি অকিঞ্চিৎকর। নাথমতে ও অজ্ঞাত তত্ত্বমতেও এই অসার ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পরম ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নির্দেশ রহিয়াছে। পরম ঐশ্বর্য্যালাবে যোগী যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হন তাহার জ্ঞাত ‘সহজ পন্থা’ বা সুখ সাধনের বিধানও তন্মতে নির্দেশিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতেও অযথা কঠোর তপস্তাদ্বারা স্বশরীরকে পীড়ন করা নিষিদ্ধ। তাত্ত্বিক সাধনের উদ্দেশ্য শক্তিকে লাভ করিয়া শিবের তুল্য হওয়া, তখনই সাধকের যথার্থ ‘শিবোহং’ বলা সার্থক, ইহাই তত্ত্বমত। পাতঞ্জল যোগমতে বিবেকখ্যাতি দ্বারা ‘পুরুষ ও প্রকৃতির ভিন্নতা উপলব্ধি ও দ্রষ্টাশ্বরূপ পুরুষের সহিত অভিন্নাত্মক হইবার উপদেশ আছে, কিন্তু তত্ত্বমতে পুরুষ-প্রকৃতি বা শিবশক্তি অভিন্ন, অতএব শক্তিকে ত্যাগ করিবার উপদেশ নাই।

তত্ত্বের শক্তি কি? তত্ত্বমতে ব্রহ্ম বা বিন্দুর দুইটা অংশ আছে, এক অংশ শিব, অপর অংশ শক্তি। এই শক্তি শিবের সমান তেজস্বিনী, ইনি শিবের তুল্যা, শিবের যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গিনী, শিবের নিকট পরাভূত মায়া নহেন। শঙ্করমতে ব্রহ্মা হইতে মায়ার উদ্ভব। যেরূপ সাগর হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি হয় ও তাহাদের চিরন্তন সত্ত্বক অবিচ্ছিন্ন থাকে, ব্রহ্মা ও মায়ার সত্ত্বক সেইরূপ। কিন্তু তত্ত্বের শক্তি এইরূপ মায়া নহেন, তিনি মহামায়া, অনন্তশক্তিধারিণী, শিবের হ্লাদিনী শক্তিবিশেষ। এক শিব ভিন্ন অপর কেহ এই মহাশক্তি ধারণের যোগ্য নহেন, অতএব সাধক শিবোহং বলিলে তাহাকে প্রথমে শিবের ছায় শক্তিধর হইবার ক্ষমতাজ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তত্ত্বমতে বা নাথমতে যোগসাধন-প্রণালীর প্রথম আদর্শ।

বস্তুতঃ শিব ও শক্তিকে ভিন্ন বলিলেও উহারা স্বরূপতঃ এক, নিষ্ক্রিয় শক্তিই শিব ও ক্রিয়মাণ শিবই শক্তি। কর্মাবসানে শক্তি যখন

অন্তর্মুখী হন তখনই শক্তির শিবভাব হয় অর্থাৎ শিব শক্তিরই রূপবিশেষ, ভিন্ন কোন সত্তা নহেন।

নাথগণ বলেন, শক্তিমান শিবই সর্বতোমুখ সর্বাকার হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ। যোগী শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করেন। শক্তি ত্যাজ্য হইলে পূর্ণসত্য উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে।^১ কিন্তু এই শিব বা পরম শিবকে উপলব্ধি করিবার উপায় কি? সকল সাধন-প্রণালীর মূলতত্ত্ব এক, “চিন্তকে শুদ্ধ কর, তাহা দর্পণের স্থায় স্বচ্ছ হইলে তাহাতে পরম শিবের যে ছায়াপাত হইবে, তাহাকেই আশ্রয় কর”; জীবের আত্মাতে পরমাশ্রয় এই ছায়াপাতই জীবের দ্বিজ্ঞান প্রাপ্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মলাভ, তাহাই সাধনপথের উপযোগী জন্মপ্রাপ্তি। একমাত্র গুরুকুপায় (বা কোন কোন মতে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেই পরমগুরুর কুপায়) এই দ্বিজ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভবপর। খৃষ্টান আদি ধর্ম সম্প্রদায়েও ইহার সদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহার নাম দীক্ষা। যাহার সতর্ক (শুদ্ধ বিজ্ঞা) স্বভাবতঃ উদিত হয় তাহার পক্ষে দীক্ষা নিম্প্রয়োজন। বাহ্য দীক্ষা, বাহ্য অভিষেক আদিতে তাহার আবশ্যকতা থাকে না বটে কিন্তু সে নিজে সংবিস্তি দেবীগণের দ্বারা দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হয়। তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল অন্তর্মুখী হইয়া প্রমাতার সহিত তাহার স্বাশ্রয় ঐক্যসাধন করে। ইহারাই জ্যোতনকারিণী সংবিদদেবী, ইহারা তাহার জ্ঞানক্রিয়াখ্য প্রসুপ্ত চৈতন্যকে উত্তেজিত করে। ইহাই দীক্ষা। যে ক্রিয়ার বলে সে সর্বত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তাহা অভিষেক। বহিমুখ চিন্তের বৃত্তিসকল অন্তর্মুখী হইলে শক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকই আচার্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ সাধক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত শাস্ত্রার্থ রহস্যভেদে সমর্থ হয়। ইহাই প্রাতিভ মহাজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।^২

প্রত্যেক জীবের মধ্যেই শিবভাব আছে। প্রশ্ন হইতে পারে জীবই যদি শিব হয় তবে সাধনার প্রয়োজন কি?—উত্তরে বলা যায় সেই মহান্কে যে উপলব্ধি করিবে, হৃদয়মধ্যে তাহার কণাপরিমাণ সাদৃশ্য বা অনুভূতি না থাকিলে সাধনপথে কাহাকে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইবে? তাহার

১। সি. সি. প. ৭।১৪ অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরঃ স বিশ্বরূপী বিশ্বমাত্রা ভবতীতি প্রসিদ্ধা; সিদ্ধানাং চ পরাশরথকৃপা কুণ্ডলিনী বর্ততে। অতস্তে পিওসিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ।

২। উত্তরা, বৈশাখ ১৩০০, পৃ ৩০২ গুরুত্ব ও সদগুরুরহস্য।

স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে না। তাই তত্ত্ব উপদেশ দিলেন, শিবকে পাইতে হইলে শক্তির আরাধনা কর, বেদান্তমতে মায়া ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-উপলব্ধি করিলে চলিবে না, তাহাতে পরম-ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইবে না। অতএব তত্ত্বের আদর্শ ও সাধনপ্রণালী বেদান্তের আদর্শ ও সাধনপ্রণালী হইতে ভিন্ন। বেদান্তের জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তত্ত্বমতে মহাশিবপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কেবল সেই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহার সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ নাই, একমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করাই পন্থা, তাহাতেই আনন্দের উপলব্ধি। তত্ত্বমতে এই আনন্দ উপলব্ধির প্রক্রিয়া ভিন্ন। ইহাতে শক্তি বা মহামায়ার উপলব্ধি কর্তব্য, প্রথমে পরম শিব ও মহামায়ার জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, পরে পূর্ণজ্ঞানের উদয়ে পরমশিব ও মহামায়ার মিলনে যখন একজ্ঞানের উদয় হইবে, দ্বৈতজ্ঞান হইতে অদ্বৈতজ্ঞানে যখন সাধক পৌছাইবেন, তখন সাধকের যথার্থ শিবত্ব-প্রাপ্তি ঘটিবে। এই দ্বৈত হইতে অদ্বৈত জ্ঞানই ‘একীকরণ’ বা এককরণ, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, তাহাই তাত্ত্বিক সাধকদের আদর্শ। নাথ-সম্প্রদায়ের মতেও এই একীকরণ বা সমীকরণ কর্তব্য। শিববিন্দু, শক্তিবিন্দু ও সামরস্যবিন্দুর সমাবেশে যে ত্রিবিন্দু-সমাবেশ বা মহাবিন্দু হয়, তাহার প্রাপ্তিই লক্ষ্য। এই মহাবিন্দুর নামান্তর ‘ব্রাহ্মী স্থিতি’ বা পীঠ।

এই একীকরণের সাধনপদ্ধতি অতি বিচিত্র; ইহা চরম ভোগের পর চরম ত্যাগের পদ্ধতি, অর্থাৎ শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়া তাহাকে ত্যাগের উপদেশ। সংসারক্ষেত্রে সকল ভোগ করিয়া সকল ত্যাগ করা বড় সহজ নহে, তবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ত্যাগ ও ভোগের এই বিচিত্র সমাবেশে সাধক মহত্তর আদর্শের পথে অগ্রসর হন, তাই সাধনলভ্য শক্তিকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ত্যাগ অর্থে সমন্বয় সাধন, সহজ সম্প্রদায়ের সাংকেতিক ভাষায় ‘হ’ ও ‘ঠ’ বর্ণদ্বারা সমন্বয় সাধন বা চন্দ্রসূর্য্যের একীকরণের ইঙ্গিত আছে। সহজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখা যায় যে, যে পথে আগম ও সিদ্ধ মার্গের উদ্ভব, ইহাও সেই পথের প্রদর্শক। চন্দ্রসূর্য্যের একীকরণ অর্থে ইড়া-পিঙ্গলা বা প্রাণাপানের সমীকরণ। ইড়া-পিঙ্গলা সহযোগে বা প্রাণ-অপানের সমীকরণ সাহায্যে আনন্দ উপলব্ধিই লক্ষ্য, নাথমার্গেও দ্বৈত হইতে অদ্বৈতভাবে পৌছাইবার উপায় ইঠযোগ। নাথ ও অন্যান্য সম্প্রদায়

মতে বৈষম্য হইতেই জগতের সৃষ্টি ; যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি হয় তাহা যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তবে জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয় না, তাহাই অদ্বৈত বা সাম্য অবস্থা বা প্রলয় অবস্থা। সাম্যভঙ্গে বৈষম্যের উৎপত্তি, তাহাই বিশ্বসৃষ্টি। এই ভঙ্গ অবস্থায় অদ্বৈত দ্বৈতভাব গ্রহণ করে, পুরুষ-প্রকৃতি, শিবশক্তি প্রভৃতি এই দ্বৈত ভাবের নামান্তর মাত্র, চন্দ্রসূর্য্যের মিলন অর্থেও এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ব্যতীত অপর কিছু নহে। প্রাণ-অপানের সাম্যতা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাধন দ্বারা মিলন করিতে পারিলে পরমানন্দের অনুভূতি হয়—এই পরমানন্দের অনুভূতিই হইল শিব উপাসনার ফল। বহিঃশক্তির প্রাধান্যে সৃষ্টি, অন্তঃশক্তির প্রাধান্যে সংহার, স্থিতি উভয় শক্তির সমানতার নিদর্শন। জীবদেহে এই উভয় শক্তি বা প্রাণ-অপান সমভাবে জাগ্রত না থাকার দরুণ পরস্পর মিলিত হইতে পারে না, তাই সাধারণতঃ উভয়ের সাম্য হয় না। স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস ‘পূরক’ ও ‘রেচক’ এবং উভয়ের সমীকরণ ‘কুম্ভক’ নামে খ্যাত। শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ইড়া-পিঙ্গলা মার্গ ক্রিয়াশীল থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সাম্য হইলে সুষুমা দ্বার খুলিয়া যায়, ইহাই শূন্য পদবী বা ‘ব্রহ্মনাড়ী’। চন্দ্রসূর্য্যের মিলনই প্রকৃতি-পুরুষের আলিঙ্গন। এই আলিঙ্গন ভিন্ন শূন্যপথ যুক্ত হয় না। শূন্যতাও আপেক্ষিক, সর্ব্বোচ্চ শূন্যপদ যাহা বিশুদ্ধ শূন্য, তাহাই নির্ব্বাণ, তাহা বাসনা-কামনাহীন, ক্লেশ-কর্মাশয়হীন। সেই স্থান তত্ত্বাতীত, শিব ও শক্তি নামক বিন্দুদ্বয় পার্থক্য পরিহার করিয়া ঐক্যলাভ না করিলে সে অবস্থার উদয় হয় না। ইহাই বাম ও দক্ষিণ পথ পরিহার করিয়া মধ্যপথে চলিবার ইঙ্গিত, মধ্যাবস্থাতেই নির্ব্বাণ ; হঠযোগ মতে সহস্রারের মহাবিন্দুতে এই মহামিলন অনুভূত হয়। এই মহামিলনের রসধারায় সাধক নিজেকে প্রাবিত করেন, তাই জীব শিব হইলেও তাহার শিবোপাসনা সার্থক।

তত্ত্বমতে কুণ্ডলিনীশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া যোগসাধনই কর্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্তা আছেন, সহস্রারে নিত্যপুরুষ অবস্থান করেন, কুণ্ডলিনীর সুপ্তাবস্থায় সৃষ্টির প্রবাহ চলে, বিভিন্ন যোগাঙ্গ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় কুণ্ডলিনী উর্দ্ধমুখী হইয়া সরলপথে ধাবিত হন, উত্থানকালে সমগ্র জাগতিক পদার্থ শক্তি দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া অনুভূত হয় ও ইন্দ্রজালের ন্যায় বাহ্যসৃষ্টি

পুরুষে বিলীন হইয়া যায়।^৩ তখন মহাশূন্য উপলব্ধি হয়, ফলে ভূত ও চিত্ত সংহত হয়, ষট্চক্র-ভেদ হইয়া আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে স্থিতি হয়। পরে অতিসূক্ষ্মপথে কুণ্ডলিনীশক্তি পরমশিবের বক্ষে মিশিবার জন্ম ধাবিত হন। উহাদের আলিঙ্গনে বিচিত্র আনন্দের উদয় হয়, জীব তাহা আন্বাদন করে। মহাবিন্দুতে যখন এই মিলনের সূত্রপাত হয়, তখনও দুইটা বিন্দু থাকে, ক্রমশঃ বিন্দুদ্বয় এক মহাবিন্দুতে পরিণত হয়, উহা অখণ্ড পরমানন্দময়, যুগল ভাবাপন্ন হইয়াও অদ্বয়।

জীবদেহে পঞ্চকোষের সংস্থান আছে,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। ষট্চক্র সাধনে বিন্দুসাধনের দ্বারা অন্নময় কোষ, প্রাণ ও বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণময় কোষ, মনের ক্রিয়াবলে মনোময় কোষ, বিচার ও বিবেক দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ শোধিত হইয়া থাকে। আনন্দময় কোষ নিত্য শুদ্ধ, তবে ভক্তিয়োগে উহার আগন্তুক মল দূর করা বিধি। বিন্দুসাধনে প্রাণমন বিজ্ঞানের ক্রিয়ায় অধিকার জন্মে, তাহাতে সাত্বিক তেজ জন্মে, তখন সূক্ষ্মার মধ্যে প্রাণের গতাগতি ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মমনের সঙ্কল্প-বিকল্প ক্রিয়া চলে, তাহা অভিভূত হইলে চিত্রানাড়ীর বিকাশের সহিত বিজ্ঞানময় কোষ খুলিয়া যায় ও তখন সত্য সঙ্কল্পের উদয় হয়, এই ভূমিতে ‘যোগবিভূতি’ লাভ হয়। মনোময় ভূমি নির্বিকল্প হইলেও নিঃসঙ্কল্প অবস্থা নহে। সঙ্কল্প অর্থে জ্ঞান ও ইচ্ছা, তাহার নিবৃত্তিতে পরমানন্দ, সেই আনন্দ অন্নময় কোষে বজ্রনালের মধ্যে উপলব্ধ হয়। ইহার পরে যে অবস্থা হয় (বস্তুতঃ তাহা অবস্থা নয়) তাহাই ‘স্বভাব’ বা সহজ, সেই সহজাবস্থা অব্যক্ত, পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহা আনন্দেরও অতীত। এই সহজাবস্থা লাভ বা পরম শিবের উপলব্ধি তান্ত্রিক সাধকের একমাত্র চরম লক্ষ্য। নাথগণ বলিয়াছেন, “হুল্লভা সহজাবস্থা সদগুরোঃ কল্পণাং বিনা”—গুরুকৃপা ভিন্ন সিদ্ধমতে সাধকের সহজাবস্থা লাভ অসাধ্য, কারণ পথ অতি দুর্গম।

বেদান্তের পঞ্চকোষ বিবেক, তন্ত্রের চক্রভেদ, পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, বৌদ্ধগণের অমুপক্স বিহার—মূলতঃ এক পথেরই প্রকার-ভেদ। বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মার্গ, এইমাত্র প্রভেদ। যোগ

৩। লয়যোগসংহিতা ভাষ্যে আছে, পৃ ২ উল্লেখ বার্ষগলে পৃ ১৩৭ ফুটনোট : “আধারপথে প্রকৃতিঃ হস্তা কুণ্ডলিনী স্থিতা”—ইত্যাদি

বিদ্যালয়ের (বীরভদ্র, স্বরীকেশ) স্বামী সত্যানন্দ 'অনুভূত যোগ সাধন' নামক গ্রন্থে ধ্যান কাহাকে বলে এবং ধ্যানকালে জীবাত্মার পঞ্চকোষময় শরীরের একে একে সংযমন কি প্রকারে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। বিজ্ঞানময় শরীরও পরিত্যাগ করিয়া সাধক কিরূপে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন তাহা বর্ণনা করিয়া যোগবিদ্যাকে পুনর্জীবিত করা স্বামীজির উদ্দেশ্য।^১

যোগসাধনের যোগ্যতা বিচার, দেশকাল, আনুষঙ্গিক অবস্থার অনুকূলতা

গুরু তাহার শিষ্যের বা মুমুকুর যোগ-সাধনের যোগ্যতা বিচার করেন তাহার বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া। সংসারের প্রতি অনাসক্ত না হইলে যোগ-সাধনের যোগ্যতা জন্মে না, তত্পরি রোগহীন দেহ না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। মুমুকুর সাধনে তীব্রতা দেখিয়াও যোগ্যতা বিচার কর্তব্য, তীব্র সংবেগ ভিন্ন আশুফল লাভ সম্ভব নহে। গুরু উচ্চকোটির হইলে শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তাহার অনেক ক্রটি স্বয়ং শোধন করিয়া লন। সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও গুরু ব্যতীত প্রকৃত সত্যলাভ সম্ভবপর নহে। সাধনের চরম উদ্দেশ্য সহজাবস্থা লাভ, উহাই সমরসী-করণ (সিদ্ধান্ত অংশে উহার আলোচনা করা হইয়াছে), সেই অবস্থা-লাভে গুরুর অপেক্ষা আছে, সাধকের তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

“ষট্চক্রং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।

স্বদেহে যে ন জানাস্তি কথং সিধ্যস্তি যোগিনঃ ॥^২

সিদ্ধি ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রথমতঃ আপন শরীরস্থ ষট্ (নব) চক্র, ষোড়শ আধার, ত্রিলক্ষ্য ও আকাশ-পঞ্চকের তত্ত্ব অভ্যাস করিবেন, এইগুলি অভ্যস্ত হইলেই পরে যোগানুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকার জন্মিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ সাধনা অংশের যোগ ও যোগাঙ্গে দেওয়া হইতেছে।

চলে বাতে চলং সর্বং নিশ্চলে নিশ্চলং সদা।

যোনিস্থানে বশীভূত্বা ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥^৩

১। অনুভূত যোগ সাধন, ২য় সাং, পৃ ১৩০ ইত্যাদি।

২। গোরক্ষসংহিতা ১।১১ ; সি. সি. স. ২।৪৮ নবচক্র কথা ৩।১১ ; সি. সি. প. ২।৩১

৩। গো. সং ১।১৪৩। যোগমার্গও পৃথি।

বায়ু যে পর্য্যন্ত পরিবাহিত থাকে, তাবৎ দৈহিক সমস্ত পদার্থ চলিতে থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে শারীরিক পদার্থ নিরুদ্ধ হয়। বায়ুর সহিত চিত্ত চঞ্চল হয় বলিয়া প্রথমে বায়ু রুদ্ধ না করিলে ধ্যানধারণা করিবার যোগ্যতা জন্মে না। বায়ু শরীরমধ্যে নিরুদ্ধ হইলে যোগী নীরোগ হন এবং প্রাণায়াম সাহায্যে ক্রমধাভাগে অবলোকন করিলে যোগীর মৃত্যুভীতি দূর হয়, ইহা যোগসাধনের কল।

এক্ষণে প্রাণায়ামের স্থান নিরূপণ করা যাইতেছে—

দূরস্থানে বিপিনে চ রাজধান্যাং জনালয়ে ।

যোগাভ্যাসং ন কুর্ধ্যাদ্ভু কৃতে চ যোগহা ভবেৎ ॥

সুপ্রদেশে ধর্ম্মযুক্তে সুভক্তে নিরূপদ্রবে ।

তত্রৈকং কুটীরং কুহা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতং ॥

বাপীকূপতড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্যবর্ত্তি চ ।

নাভ্যুচ্চং নাতিনিম্নঞ্চ কুটীরং কীটবজ্জিতং ॥

গোময়েন বিনির্লিপ্তং কুটীরং তত্র কল্পয়েৎ ।

এবং স্থানেষু গুপ্তেষু প্রাণায়ামং সমভ্যাসেৎ ॥^১

নিজের আশ্রয় হইতে অতিদূর দেশে গমন করিয়া যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে তাহাতে চিত্তে অবিশ্বাস জন্মে, যোগের প্রতি আপনার মানসিক অবিশ্বাস হইলে কদাচ যোগাভ্যাস হইবে না ; বিজন প্রদেশে যোগাভ্যাস করিবে না, কারণ তাহাতে আশ্রয়ক্ষী লোকের অভাব হইবে, সুতরাং যোগের নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে ; লোকাকীর্ণ রাজধানীতে যোগাভ্যাস করিবে না, কারণ সাধারণে সে কথা প্রকাশ হইলে অনেক লোকের দ্বারা যোগভঙ্গ হইতে পারে। এই কারণে দূরদেশ, বন, লোকাকীর্ণ স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকার্য্য সমায়ুক্ত স্থানে যোগানুষ্ঠান করিবে। যাহাতে স্বল্পব্যয়ে আহাৰাদি নির্ব্বাহ হইতে পারে ও যেখানে কোন প্রকার উপদ্রব নাই, এতাদৃশ কোন স্থানে কুটীর নির্মাণ করিয়া, তাহা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে। এই প্রাচীরের মধ্যভাগে কূপ ও তড়াগাদি নির্মাণ করিবে। কুটীর অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন করিবে না, কুটীরে যাহাতে কীটাদি প্রবেশ করিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। কীটাদি দ্বারা যোগের

ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অতএব কুটীর কীটবর্জিত করিয়া নির্মাণ করিবে। শুদ্ধগোময় দ্বারা কুটীর লিপ্ত করিয়া তাহাতে যোগাভ্যাস করিবে। এইরূপ স্থান ব্যতীত স্বেচ্ছাকল্পিত স্থানে প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে কদাচ সিদ্ধিলাভ হইবে না। হঠযোগপ্রদীপিকাতে যোগের অন্তরায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১।১৫, ১৬)—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজ্ঞানো নিয়মগ্রহঃ ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ বড়্ভির্যোগো বিনশ্যতি ॥

এবং যোগের সহায়—

উৎসাহাৎ সাহসানৈর্ধ্যাত্ত্বজ্ঞানাত্ত নিশ্চয়াৎ ।

জনসঙ্গপরিভ্যাগাৎ বড়্ভির্যোগঃ প্রসিধ্যতি ॥

যোগারম্ভং ন কুর্স্বীত হেমন্তে শিশিরে মুনিঃ ।

তথা গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ কৃতে যোগী রোগান্বিতঃ ॥

বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ ।

তথা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগান্মুক্তো ভবেদ্ ভ্রবৎ ॥^১

ছয় ঋতুর মধ্যে বসন্ত ও শরৎকালে যোগারম্ভ করিলে যোগসিদ্ধি হয় এবং যোগী রোগমুক্ত হইয়া প্রকৃত আত্মকল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন। মননশীল ব্যক্তি হেমন্তকালে, শীতকালে, গ্রীষ্মে বা বর্ষায় যোগারম্ভ করিবেন না, কারণ তাহাতে যোগী রোগান্বিত হইবেন, সুতরাং তাঁহার উত্তম বার্থ হইবে। মধ্যরাত্রি বা সন্ধিকালই যোগসাধনের প্রশস্ত সময়।

হঠযোগপ্রদীপিকাতে হঠযোগ সাধনের স্থান নিরূপণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যে স্থানে রাজাপ্রজা সকলেই সুশীল, সর্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, ভক্ষ্যদ্রব্য দুর্লভ নহে, চৌরব্যাঘ্রাদির উপদ্রব নাই, সুখস্বচ্ছন্দে বহুকাল বাস করা যাইতে পারে, সেই দেশের কোন নির্জন প্রদেশে কুত্র মঠমধ্যে উপবেশন করিয়া হঠযোগী যোগ সাধনা করিবেন। অভিপ্রেত স্থানের চতুর্দিকে চারিহস্ত প্রমাণ স্থানের মধ্যে শিলা, অগ্নি ও জল থাকিবে না, অর্থাৎ যাহাতে শীতোষ্ণাদি ক্লেশ জন্মিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকিবে।^২

যে স্থানে বহু জনসমাগম আছে, তথায় কলহ অবশ্যস্বাবী, সেই কলহ হঠযোগের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, এই নিমিত্ত হঠযোগ সাধনে

নির্জ্ঞান স্থান বিধেয়। অনাবৃত স্থানে শীতবাতাদির ক্লেশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত মঠমধ্যে যোগসাধনই প্রশস্ত। যোগীর পক্ষে নির্জ্ঞান প্রদেশে, গুহা বা বনে নিত্যযুক্ত হইয়া সর্বদা সম্যকরূপে ধ্যান-সাধন নির্ণীত হইয়াছে।^১

গোরক্ষসংহিতা মতে পরিমিতাহার না করিয়া যোগারম্ভ করিলে নানাপ্রকার ব্যাধিদ্বারা দেহ আক্রান্ত হয়, অতএব যোগশিক্ষার পূর্বে মিতাহারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিতাহার কাহাকে বলে?

শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরার্দ্ধবিবজ্জিতং।

ভূজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ ॥^২

যোগী এইরূপে প্রীতির সহিত অর্দ্ধ উদর শূন্য রাখিয়া অর্থাৎ অর্দ্ধভাগ অগ্নের দ্বারা তৃতীয় ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া চতুর্থ ভাগ বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত শূন্য রাখিয়া আহার করিবেন। এই প্রকার মিতাহার যোগসাধনে হিতকারী।

হঠযোগপ্রদীপিকাতে—

সুস্নিগ্ধমধুরাহারশ্চতুর্থাংশবিবজ্জিতঃ।

ভূজ্যতে শিবসম্প্রীতৌ মিতাহার স উচ্যতে ॥^৩

এইরূপে মিতাহার নিরূপণ করা হইয়াছে।

যোগীর পক্ষে কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভজ্জিতদ্রব্য, দধি, তক্র, মন্ত, তাল, কাঁঠাল ও পাকা কলা নিষিদ্ধ। কলাই, মসুর, কুম্ভাগু, শাকের ডাঁটাও নিষিদ্ধ। অধিক উষ্ণ, রুক্ষ দ্রব্যাদি যোগীর পক্ষে অহিতকর। অতিভোজন, অতিনিদ্রা এবং অতি ভাষণও যোগী বর্জন করিবেন।

এলাচি, জাতিফল, জাম, হরীতকী, খজুর, পটল, মান, ডুমুর, রসুতা, খোড়, বেগুন, মূলা, গোধূম, শালিধাতোর অন্ন, যব, ত্রুক্ষ, ঘৃত, পঞ্চশাক, (জিয়াতি বেখো, হিংচা, নটে ও পুনর্নবা) যোগীন্দ্রগণের পথ্য।

যোগাভ্যাসকালে বহিসেবা, স্ত্রীসংসর্গ, পথপর্যটন ত্যাগ বিধি। গোরক্ষ বলিয়াছেন—

বর্জয়েদ্ভুজ্জনপ্রাপ্তং বহিস্ত্রীপথিসেবনম্।

প্রাতঃস্নানোপবাসাদিকায়ক্লেশবিধিং তথা ॥^৪



প্রাতঃস্নানে শীতবিকার, উপবাসাদিতে পিত্তোষণ হইতে পারে বলিয়া উহা বর্জন করা কর্তব্য।

প্রাতঃস্নানোপবাসাদিকায়ক্লেশবিধিঃ বিনা।

একাহারং নিরাহারং যামাস্তে চ ন কারয়েৎ ॥১

গোরক্ষসংহিতায় উক্তশ্লোকটি আছে; উহা দ্বারা যোগশিক্ষেচ্ছুগণের প্রাতঃস্নান ও উপবাসাদি ক্লেশ ব্যতীত একাহার করা বা অনাহারে থাকা নিষিদ্ধ বুঝায়। এক গ্রহর অন্তর ভোজন করিলে অবশ্য কালবিধি উল্লঙ্ঘিত হইবে না।

যোগাদি অনুষ্ঠানের নিমিত্ত দুষ্ক ও দূত ভক্ষণ বিধি, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন কাল ব্যতীত অল্প সময়ে আহার নিষিদ্ধ। এই দুইবেলা মাত্র আহার বিধি।

অভ্যাসকালীন নিয়ম ও আচারাঙ্গি, অনিয়মাঙ্গি, পঞ্চব্রত ও পঞ্চনিয়ম পালন

দেবর্ষি নারদ কোন সময়ে ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিচার উপদেশার্থে গিয়াছিলেন। সনৎকুমার সত্যভাষণ, ব্রহ্মচর্যা, গুরুসেবাদিরূপ শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাদির উপদেশ দেন, তৎপরে ভূমাবিচার উপদেশ দিয়া আত্মজ্ঞান রক্ষার নিমিত্ত আহারশুদ্ধাদির বিষয় বলেন—“আহারশুদ্ধৌ সবশুদ্ধিঃ সবশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলস্ত্রে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ”—এই প্রকারে নিষ্পাপ নারদকে ভগবান্ অজ্ঞানের পার অর্থাৎ পরব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করাইলেন। এইস্থানে আহারের দ্বিবিধ অর্থ আছে,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ ও ভোজন উভয়ই শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সাংখ্যিক ভোজনসহ শুদ্ধ বিষয় গ্রহণ সাধকের কর্তব্য। কৈবল্য উপনিষদে আছে—

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ।

অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য ॥২

অর্থাৎ সাধককে নির্জনে স্থিরাসনে যোগসাধন করিতে হইবে এবং সাধক শুচি হইবেন। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে—

যোগমার্গাৎ পরো মার্গো নাস্তি নাস্তি শ্রুতৌ স্মৃতৌ ॥৩

এই যোগমার্গে বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিয়া অত্যাশ্রমী হইতে হইবে, “নাস্তি গুণবৃত্তীনাং মুক্তিসাধকত্বম্”।^১ অত্যাশ্রমীই পক্ষপাতশূন্য হইতে পারেন এবং পরমনাথকে স্বরূপতঃ দেখিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। অভ্যাসকালে লোভ-মোহ, শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, সুখদুঃখ, মান-অপমান, সঙ্কল্প-বিকল্প সব ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্ম এই সকল ভাবের অতীত।^২

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে “সর্বদোষাবৃত্তো জীবঃ কথং জ্ঞানেন মুচ্যতে”—অর্থাৎ মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভব নহে, কারণ জীব শরীর দ্বারা বিজিত। জ্ঞানিগণ দেহান্তে পুণ্যপাপের ফল ভোগ করেন কিন্তু জীবমুক্ত পক্ষদেহ যোগী সর্বদোষবিবর্জিত, “মরণং যত্র সর্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি”। এই পক্ষদেহ লাভ করিতে হইলে যোগিদেহ নির্মল করিতে হইবে।^৩

আচার ও বিচার এই উভয় প্রণালী দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, কিন্তু বাহ্য আচার (যথা স্পর্শাদিদোষ) নাথদের ত্যাজ্য, “আচারোহস্মাকং মতে বর্ততে স চ বিচারপূর্বক ইতি”।^৪ বিচার মধ্যে আবার তত্ত্ববিচার মুখ্য। বাহ্য আচার দ্বারা যতই শুদ্ধ হওয়া যাউক না কেন, মনঃস্থৈর্য্য বিনা মোক্ষলাভ হয় না। তাই শ্রীনাথ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ আচার প্রবর্তন করিয়াছেন, যোগী বিচার প্রবর্তন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ যতদিনে আচার হইতে বিচার লাভ করিবেন, যোগী ততদিনে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন।^৫

অতএব আচার ত্যাগ করিয়া বিচার গ্রহণ কর্তব্য। তথাপি প্রথম অভ্যাসীর পক্ষে পক্ষযম ও পক্ষনিয়ম পালন কর্তব্য, তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সহায়তা হয়। যোগ ও যোগাঙ্গ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, অলোভ ও অহিংসা এই পঞ্চব্রত এবং অক্রোধ, গুরুসেবা, শৌচ, লঘুভোজন, নিত্যবেদপাঠ পঞ্চনিয়মরূপে কীৰ্ত্তিত হয়। ভিক্ষুকদিগের ইহা পালনীয়।^৬

১। গো. সি. স. পৃ ৩

২। হেতুবিম্ব উপনিষদ ১।২২, ১৪

৩। গো. সি. স. পৃ ৩০, ৩১ যোগবীজ।

৪। গো. সি. স. পৃ ৩০

৫। গো. সি. স. পৃ ৬২

৬। যোগব্রহ্মসূত্র (যোগশাস্ত্রাবলী) পৃ ৪০৪, শ্লোক ১৬, ১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে^১ যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধের কথা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—নানামার্গে শিবভাষিত কৈবল্যরূপ মোক্ষ হুপ্রাপ্য, কিন্তু সিদ্ধমার্গে তাহা সুলভ, সেই অনির্বাচ্যপদ শাস্ত্রজালে পতিত বুদ্ধিবিমোহিত পণ্ডিত বা দেবগণ বলিতে অক্ষম। “পতিতাঃ শাস্ত্রজালেষ্ণু, প্রজ্জয়া তে বিমোহিতাঃ। অনির্বাচ্যপদং বক্তুন্ম ন শক্যতে সুরৈরপি ॥ সাত্বপ্রকাশরূপং তৎ কিং শাস্ত্রেণ প্রকাশ্যতে।” সেই নিম্নলি নিম্নলি সাত্বপ্রকাশ জীবরূপেই অবভাসিত হন, কিন্তু জীব কাম, ক্রোধ, ভয় ও চিন্তাদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহা হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি হয় না। কেহ কেহ বলেন, জীব জ্ঞানের দ্বারাই মুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু কেবলমাত্র ‘জ্ঞান’ সিদ্ধির পক্ষে অপরিয়াপ্ত, তাই তাহা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; অপরপক্ষে যে ‘যোগ’ জ্ঞানহীন, তাহাও মুক্তিপ্রদ নহে, অতএব নাথমতে “জ্ঞানযুক্ত যোগে”র প্রয়োজন। মাত্র ‘জ্ঞান’ বা শাস্ত্রজাল দ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভবপর নহে, ‘যোগ’ বিনা মোক্ষলাভ হয় না, তাই দেবপক্ষেও যোগসাধন আবশ্যক।

জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞেয়ের পরিসমাপ্তি হইলেও তাহার মোক্ষলাভ হয় না, কারণ দেহী জীবের ‘পক’ ও ‘অপক’ ভেদ আছে, যোগহীনেরা অপকদেহী, যোগাগ্নি দ্বারা দেহ পক হইলে জীব অজড় ও শোকতাপ-বর্জিত হয়। অপকদেহে বৈরাগ্য সাধন বা জপতপাদি ক্রিয়া বৃথাশ্রম মাত্র, কারণ “শরীরেণ জিতঃ সর্কে, শরীরং যোগিভিজিতম্”, অতএব যোগদ্বারা শরীরকে জয় করিতে হইবে।

জ্ঞানী রূপে যাহারা মৃত হন, তাহারা দেহান্তে পাপপুণ্যানুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হন, সেই সকল যথাবৎ ভোগের পর জ্ঞানীর পুনর্জন্ম হয়। যদি কোন পুণ্যবলে একরূপ জ্ঞানীর সিদ্ধগণের সঙ্গলাভ ঘটে ও তাহাদের কৃপায় তিনি যোগী হন তাহা হইলে তাহার পক্ষে সংসারনাশ সম্ভব হয় (অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে তিনি অব্যাহতি পান), অন্যথা শিবভাষিত মোক্ষ লাভ করা জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হয় না।

“বেদস্ত পূর্বভাগে জ্ঞানং যথা তাৎপর্যোহস্তু তথা বেদান্তভাগে যোগস্তাৎপর্যার্থোহস্তু”—বেদের পূর্বভাগে জ্ঞানতাৎপর্য ও বেদান্তভাগে যোগতাৎপর্য আছে, তন্মধ্যে নাথমতে যোগভাগই মুখ্য, “যোগভাগস্তব-
দুতানাম্”, অতএব অবদুতই নাথমার্গে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।
অবদুতের স্বানুভূতি আছে, তাই উক্ত হইয়াছে—“যস্য সাক্ষাদনুভবঃ
শাস্ত্রজ্ঞানেন তস্য কিম্”।^১

এখন জ্ঞানের স্বরূপ কি, যোগেরই বা স্বরূপ কি, এবং নাথমার্গে
যোগকে কেন প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহাই বিচার্য। নাথগণ
বলেন, “যোগ আবশ্যকঃ সর্বেষাং কৰ্তব্যো যঃ স সৰ্বদা স্বতন্ত্রোহস্তু”^২
অর্থাৎ যোগ নিরপেক্ষ ও সকলের কৰ্তব্য। কিন্তু জ্ঞান নিরপেক্ষ নহে,
জ্ঞান ও কৰ্ম পরস্পরসাপেক্ষ, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম আবশ্যক।
বেদান্তীরা চিত্তশুদ্ধির জন্য কৰ্মের উপদেশ দেন, তৎসঙ্গে জ্ঞানের সাধনা
করিতে বলেন, অতএব জ্ঞান ও কৰ্ম পরস্পরসাপেক্ষ। কিন্তু
যোগসাধন নিরপেক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ, অতএব সাধকের যোগসাধনই কৰ্তব্য।
তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল জ্ঞানদ্বারা যেরূপ মোক্ষলাভ
সম্ভব নহে, সেইরূপ যে যোগ জ্ঞানহীন, তাহাও মুক্তিপ্রদ নহে।

যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরী।

যোগোহপি জ্ঞানহীনস্ত ন ক্রমো মোক্ষকৰ্ম্মণি ॥^৩

অতএব জ্ঞানযুক্ত যোগের প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব।
অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

যোগাৎ পরতরং পুণ্যং যোগাৎ পরতরং সুখম্।

যোগাৎ পরতরং সূক্ষ্মং যোগমার্গাৎ পরং ন হি ॥^৪

অমনস্কৈ ‘যোগ’কে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে—অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ।

বহির্মুদ্রায়িতং পৃষ্টং বহির্যোগঞ্চ তন্ময়ং ॥

অন্তর্মুদ্রাখ্যমপরমন্তর্যোগং তদেব হি।

রাজযোগঃ স কথ্যতে স এব মুনিপুঙ্গব ॥^৫

বহির্যোগ বহির্মুদ্রায়ুক্ত, অন্তর্যোগ অন্তর্মুদ্রায়ুক্ত, তন্মধ্যে বহির্যোগই মন
বলিয়া গণ্য। অন্তর্যোগই রাজযোগ। ইহা সর্বযোগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া

১। গো. সি. স. পৃ. ২২

২। গো. সি. স. পৃ. ১৩

৩। যোগবীজ ১৮, ১৯ শ্লোক

৪। যোগবীজ ৮১ শ্লোক

৫। অমনস্ক-বিবরণ—দ্বিতীয় অধ্যায় ২, ৩ শ্লোক।

‘রাজ’যোগ নামে খ্যাত এবং ‘রাজ’ত অর্থে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার প্রাপক, অতএব ইহার নাম ‘রাজযোগ’। মুক্তির নিমিত্ত অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ উভয়ই বিশেষরূপে জানা কর্তব্য; যিনি উভয় যোগ জানেন, তিনিই সকলের পূজ্য হন।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের চতুর্বিংশ পটলে দেবী প্রশ্ন করিতেছেন, “দেহস্থ সিদ্ধদের পূজাবিধি কি?” তৎপরে ভৈরব বলিতেছেন, “সিদ্ধরা হৃদয় বা মস্তকস্থ চক্র মধ্যে বিরাজ করেন, তাঁহাদের পূজাবিধি দ্বিবিধ—‘বহিঃস্থ’ ও ‘অধ্যাত্ম’, বহিঃস্থ পূজায় সুগন্ধপুষ্প, ধূপচন্দনাদি ব্যবহার বিধি, কিন্তু অধ্যাত্ম পূজায়—

প্রসন্নবদনানৈশ্চব পিবন্ত্যো মদিরাসবম্ ॥১১॥

ইচ্ছাক্রপধরাঃ সর্বের জরামরণবর্জিতাঃ ।

সৃষ্টিপ্রবর্তকাঃ সর্বের বরদানৈকতংপরাঃ ॥

ই দাধ্যায়েদচিরান্তং সুমোভবেৎ ॥১২॥

এই স্থানে অধ্যাত্ম পূজায় যোগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। “পিবন্ত্যো মদিরাসবম্” দ্বারা খেচরীমূত্রা দ্বারা অমৃতপানের ইঙ্গিত ও তৎফলে ইচ্ছাক্রপ ধারণ, জরামরণজয়, সৃষ্টি-ক্রমতা অর্জন প্রভৃতি যোগজ সাধন ফলে সিদ্ধিলাভের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ‘যোগ’কেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

পুষ্পাং প্রকাশ্যতে যদ্বং ফলং পুষ্পপ্রণাশনং ।

আত্মনঃ তত্ত্বমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু মুহুতি ॥’

পুষ্প হইতে যেমন পুষ্পবিশ্বাসী ফলের উৎপত্তি হয় সেইরূপ লোকে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করে, আত্মজ্ঞান লাভ হইতে শাস্ত্রত্যাগ কর্তব্য, কিন্তু মূঢ়েরা আত্মজ্ঞান হইলেও শাস্ত্রবচনে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

এস্থলে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে—

অর্থাৎ ‘জ্ঞান’ অপেক্ষা ‘যোগ’কে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

এখন জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা আলোচ্য। নাথগণ ‘জ্ঞান’ বলিতে শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র বলেন, ইহা মোক্ষলাভের পক্ষে নিকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু ‘জ্ঞানে’র দ্বারাও সাধনরাজ্যের স্তরে স্তরে কিরূপে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহার পরিচয় বৈদিকশাস্ত্রে, আগমে ও বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ আছে—শ্রোত,

চিন্তাময় ও ভাবনাময়, “স। চ প্রজ্ঞা শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী, ভাবনাময়ী চ।”^১ ইহাদের মধ্যে পূর্ব জ্ঞানই উত্তর জ্ঞানের হেতু। বিক্ষিপ্তচিত্তের শাস্ত্রার্থ জ্ঞানকে ‘শ্রোতজ্ঞান’ বলে; শাস্ত্রার্থ আলোচনা দ্বারা, অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ভাবনাই ‘চিন্তাময়’ জ্ঞান, এবং যে জ্ঞান দ্বারা মায়িক তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সাধক পরমশিবের সহিত যুক্ত হইতে পারেন তাহাই ‘ভাবনাময়’ জ্ঞান। স্বভাস্ত চিন্তাময় জ্ঞান হইতেই এই ভাবনাময় জ্ঞান হয়, ইহাই মোক্ষের কারণ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। ইহা দ্বারাই যোগ ও যোগফল লাভ হয়।

মৎস্যেন্দ্রনাথ বিরচিত ‘কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে’ উক্ত হইয়াছে—

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসং বিধীয়তে ।

যত্র তত্র স্থিতো যোগী জ্ঞানমেবং সমাশ্রয়েৎ ॥^২

যোগী সকল অবস্থাতে জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

‘যোগবীজ’^৩ গ্রন্থে আছে—দেবী শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, “অজ্ঞান হইতে সংসার এবং জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়, তবে যোগের প্রয়োজনীয়তা কি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলুন।” তৎপরে শঙ্কর বলিলেন, “তোমার উক্তি সত্য, তথাপি তোমাকে বলিতেছি, জ্ঞানের স্বরূপ কি, জেয় কি, জ্ঞানের সাধন কি, অজ্ঞানই বা কীদৃশ, এই সকল বিষয় বিবেকীর দ্বারা প্রথমেই বিচার্য। যে ব্যক্তি নিজেকে পরম শিবরূপে জানিয়াছে, সে কি কামক্রোধাদি দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে? সকল দোষমুক্ত জীব কেবল জ্ঞান দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে?” দেবী বলিলেন—

“সাম্বরূপং যজ্ জ্ঞাতং পূর্ণং তদ্ব্যাপকং তথা ॥

কামক্রোধাদিদোষণাং স্বরূপান্নাস্তি ভিন্নতা ।

পশ্চাত্তস্তা বিধিঃ কিঞ্চ নিষেধোহপি কথং ভবেৎ ॥”^৪

অর্থাৎ সাম্বরূপকে যখন পূর্ণ বলিয়া জানা যায় আর তাহাই যখন সর্বব্যাপক, তখন কামক্রোধাদি দোষের স্বরূপ হইতে কোন ভিন্নতা থাকে না, সে অবস্থায় বিধিনিষেধের অবকাশ কোথায়? “বিবেকী সর্বদা মুক্তঃ সংসারভ্রমবর্জিতঃ”। ঈশ্বর বলিলেন, “সাম্বরূপ যে পরিপূর্ণ স্বরূপ তাহা সত্য, তাহার পূর্ণত্বহেতুই তাহা ‘সকল’ ও ‘নিষ্কল’ অর্থাৎ অংশযুক্ত

১। অভিধর্মকোশ: ৩১৪

২। কৌলজ্ঞাননির্ণয় ২১/১০

৩। যোগবীজ ২০ শ্লোক ইত্যাদি।

৪। যোগবীজ ২৩, ২৪ শ্লোক।

ও অংশহীন। সংসারভ্রম প্রাপ্ত হইয়াই সে ক্ষুদ্রিক্রমে মোহসমুদ্রে পতিত হয় (ক্ষুদ্রি অর্থে কলামুক্তস্বরূপ বা সকল)। যে জ্ঞানী, যে নিষ্কল, নিষ্কল, সাক্ষাৎস্বরূপ, গগনোপম, উৎপত্তিস্থিতিসংহার-ক্ষুদ্রিজ্ঞানবিবর্জিত সে কেন বিছাকে ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে নিমগ্ন হয়? ইহার কারণ অজ্ঞানী সংসারী জীব যেক্রপ সুখ-দুঃখ-মোহে অবস্থিত, জ্ঞানীও যখন বাসনা দ্বারা অবসিত হইয়া সেইভাবে অবস্থান করে, তখন জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, উভয়েরই সংসারবাসনা তখন তুল্য হয়। অতএব জ্ঞানীর পক্ষেও যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তি সম্ভব, তখন অজ্ঞানীর পক্ষে ক্রিয় হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। হে প্রিয়ে, যোগ বিনা জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত ধর্মজ্ঞ বিজিতেন্দ্রিয় দেবতার পক্ষেও মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। অতএব দেবপক্ষেও যোগসাধন কর্তব্য।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোহপি ধর্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

বিনা দেবোহপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে ॥

জ্ঞানী হইলেও যোগী না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয় না, যোগীর পক্ষেও জ্ঞান আবশ্যক; অতএব যোগ ও জ্ঞান পরস্পরের সহায়ক, তথাপি যোগই প্রধান।

প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে চারিটি অবস্থা দেখা যায় :—

- ক। গুরু বা ভগবানের কৃপায় পৌরুষ অজ্ঞান দূর,
- খ। নিজ সাধনাদ্বারা বর্তমান জন্মেই বৌদ্ধজ্ঞানের উদয়,
- গ। বৌদ্ধজ্ঞানের উদয়ে বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি,
- ঘ। পৌরুষ জ্ঞানের উদয়।

যদি সাধন দ্বারা ইহজন্মে বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় না হয় (উপরোক্ত 'খ' অবস্থা) তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ জ্ঞানের উদয় হইবে ('ঘ' অবস্থা), কারণ আমাদের বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সাধনার প্রয়োজন। গুরু দীক্ষা দ্বারা প্রদীপ জালিয়া দেন, জীবিতকালে সাধন দ্বারা তাহার আবরণ না ঘুচাইতে পারিলে মৃত্যুর পর সে আবরণ স্বতঃই ঘুচিয়া যায়, তখন গুরু দ্বারা প্রজ্জ্বলিত দীপ আপনিই প্রকাশিত হয়, কারণ সে দীপ নির্বাপিত হইবার নহে।

নাথমার্গের 'জ্ঞান' ও 'যোগ' বলিয়া যে দুইটি অবস্থা আছে বলা হয়, তাহা উপরোক্ত (ক) ও (খ) অবস্থা। প্রথমতঃ গুরু 'জ্ঞান' দান করেন,

তৎপরে যোগসাধন সম্ভব হয়, যোগ বিনা 'মহাজ্ঞানে'র উদয় হওয়া সম্ভব নহে। গুরু সাধকের দৃষ্টিশক্তি উন্মুক্ত করিয়া দিলেই সাধনা সম্ভব হয় ও 'মহাজ্ঞান' লাভ হয়।

বেদান্তে 'জ্ঞান' সম্বন্ধে দুইটা মত প্রচলিত। শঙ্কর বলিয়াছেন, শব্দ দ্বারা জ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, অতএব যোগ আবশ্যকীয় নহে, তবে 'যোগ' উপায়স্বরূপ। মণ্ডন মিশ্র বলিয়াছেন, শব্দ দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান হয়, 'যোগ' দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অতএব যোগের আবশ্যকীয়তা আছে।

সাংখ্যকার বলিয়াছেন, 'জ্ঞান'ই প্রধান, 'যোগ' তাহার সহায় মাত্র। পাতঞ্জল বলেন, যোগ বিনা কেবল জ্ঞান দ্বারা যে সম্প্রজ্ঞান লাভ হয় তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব যোগের দ্বারা যোগাতীত অবস্থালাভই কর্তব্য।

সিদ্ধমতে জ্ঞানী ও যোগীর মৃত্যুর সহিতও সম্বন্ধ বিচার করা হয়, যে ব্যক্তি 'অজ্ঞানী' তাহার মৃত্যু অনিবার্য, কারণ সে জন্মমৃত্যুর চক্রমধ্যে আবর্তন করে। যে 'জ্ঞানী' তাহারও মৃত্যু বা দেহত্যাগ অনিবার্য, কারণ 'জ্ঞান' দ্বারা সে কালজয়ী হইতে সক্ষম হয় না, তাহার দেহের লয়প্রাপ্তির সময় হইলে তাহার দেহনাশ ঘটিবেই, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাহার থাকে না, তথাপি তাহার মৃত্যু আসিতেছে তাহা সে বুদ্ধিতে সক্ষম হয়, কারণ জ্ঞানীর আমিত্ব লোপ পায় না। সেই নিমিত্ত মৃত্যু জ্ঞানীর পক্ষে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগের ত্রায় ব্যাপারমাত্র। কিন্তু যোগীর মৃত্যু 'ইচ্ছামৃত্যু', কারণ তাহার পক্ষে কাল তাহার অধীন, তাহার 'জ্ঞান' সহ 'যোগ' যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ যোগীর জ্ঞানই 'মহাজ্ঞান', সেই জ্ঞান দ্বারা যোগী অজর-অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা সে কালকেও জয় করে, তাই মৃত্যু তাহার স্বৈচ্ছাধীন। তাই নাথমার্গের সর্বত্র 'যোগ'কেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

আগমে যোগীর চারিপ্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ ভেদে যোগী চারিপ্রকার। সংপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে যোগের উপদেশ মাত্র পাইয়াছে, ঘটমান অর্থে যোগাভ্যাসে নিরত যোগী, সিদ্ধ অর্থে যোগসিদ্ধ ও স্বভাস্ত জ্ঞানী এবং সুসিদ্ধ অর্থে যিনি নির্বিকার বা ব্যবহারভূমির অতীত। ইহাদের মধ্যে সিদ্ধ যোগীই যোগী ও জ্ঞানী

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন, কারণ তিনি যোগী ও জ্ঞানী উভয়ই, জ্ঞান দ্বারা তিনি অন্ধকে মুক্ত করিতে সক্ষম, অন্ধপ্রকারে অর্থাৎ সিদ্ধি প্রভাবে তিনি মুক্ত করেন না।^১

আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা।

নিষ্পত্তিঃ সর্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥^২

আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পত্ত্যবস্থা—সর্বপ্রকার যোগেই এই চতুর্বিধ অবস্থা হয় (‘নাদানুসন্ধান’ অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে)। নাথমার্গে ইহার বিশেষ আলোচনা দেখা যায়, কারণ যোগকেই তাঁহারা প্রধান বলেন। তথাপি ‘মহাজ্ঞান’ প্রাপ্তি যোগীর আদর্শ, তাহার স্বরূপ উপস্থিত আলোচ্য।

মহাজ্ঞানের স্বরূপ

গোরক্ষনাথ স্বয়ং ময়নামতী রাণীকে শিশুকালে ‘মহাজ্ঞান’ দিয়া-
ছিলেন। রাণী মৃত্যুমুখী স্বামীকে বলিলেন—

কিছু জ্ঞান কহি দিহু আড়াই অক্ষর
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যমঘর।

কিন্তু স্বামী জ্বর নিকট সে জ্ঞান লাভ করিতে অসম্মত হইলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র গোপীচন্দ্রের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আয়ুষ্কাল শেষ হইবার লিখন পরিবর্তিত করিবার জন্ত পুত্রকে নানারূপে বুঝাইয়া মাতা হাড়ি-সিদ্ধার নিকট মহাজ্ঞান লাভ করিতে প্রেরণ করিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, নাথসিদ্ধরা সকলেই ‘মহাজ্ঞান’ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাজ্ঞানের স্বরূপ কি? পূর্বে যে ‘যোগযুক্ত জ্ঞানে’র কথা বা যোগীর জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহাই ‘মহাজ্ঞান’—এই জ্ঞান স্বয়মুদ্ভূত, ইহার অপর নাম ‘তারকজ্ঞান’। তারকজ্ঞানকে ‘অনৌপদেশিক’ বলা হয়, তথাপি বদ্ধজীবের পক্ষে উপদেশের অপেক্ষা আছে। ‘যোগসূত্রে’ আছে, “তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথা বিষয়মক্রমং চেতি তদ্ বিবেকজং জ্ঞানম্” অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্ববিষয়, সর্বথাবিষয় ও অক্রম।^৩ তারকজ্ঞান পরিপূর্ণ, ইহা স্বপ্রতিভোৎপন্ন ও অনৌপদেশিক। আগমে যে জ্ঞানকে ‘গুরুশাস্ত্রানপেক্ষ’

১। গুরুত্ব ও সৎসঙ্গ রহস্য, গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩৪১

২। শিবসংহিতা ৩।৩৩

৩। পাতঞ্জল দর্শন, পুত্র ৩।৫৪

বলে তাহা এই স্বয়মুদ্বৃত্ত জ্ঞানই। এই জ্ঞান দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়, গুরু দীক্ষা দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। ‘মহাজ্ঞান’ লাভেরও দুইটি প্রকারভেদ আছে, ‘স্বাভাবিক’ ও ‘আগ্নায়গত’। যাহা স্বাভাবিক তাহাই বিবেকজ্ঞ জ্ঞান বা সমাগজ্ঞান, ইহা অন্তঃকরণ-সম্পাণ্ড নহে বলিয়া অতীন্দ্রিয়; ইহা লাভের ফলে শিবৈকঘনরূপে বিশ্বের সাক্ষাৎকার হয়। যাহা আগ্নায়গত তাহা বদ্ধজীবের জন্ম, কারণ বদ্ধজীবই গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ, গুরু দীক্ষাদ্বারা শিষ্যের ‘পাশ’ ছিন্ন করিলে ‘মহাজ্ঞানে’র উদয় সম্ভব হয়, তাহা অন্তঃকরণ-সম্পাণ্ড বলিয়া সেন্দ্রিয়। স্বাভাবিক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

‘ত্রিপুরা-রহস্ত্রে’ আছে, আরাধনা দ্বারা অন্তর্যামিনী দেবীকে প্রসন্ন করিলে তিনিই সাধকের চিত্তরূপ আকাশে বিচাররূপে আবির্ভূত হন।

রাধিতা পরমা দেবী সম্যক্ তুষ্টা সতী তদা।

বিচাররূপতাং যাতি চিত্তাকাশে রবির্ঘথা ॥’

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে হৃদয়বাসিনী দেবীকে আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপা উপাসকের চিত্তে স্বতঃই উদ্ভূত হয়; ইহাই স্বাভাবিক জ্ঞান, বিবেকজ্ঞ জ্ঞান বা ‘মহাজ্ঞান’।

এই ‘মহাজ্ঞান’-লাভ যোগদেহে অর্থাৎ ‘পক্’দেহেই সম্ভব হয়। নাথমতে জ্ঞান অর্থে শাস্ত্রজ্ঞান, মহাজ্ঞান অর্থে জ্ঞান ও যোগের সমন্বয়। “তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ জ্ঞানেনৈব বিনা যোগেন ন সিধ্যতি কদাচন”—এইস্থলে জ্ঞান অর্থে শাস্ত্রজ্ঞান নহে, সেই মহাজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এ কথা মিথ্যা নহে, কারণ জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারাই যোগযুদ্ধে জয় হয়। আবার যোগবিহীন জ্ঞানেও মুক্তি নাই, অতএব মোক্ষবিষয়ে জ্ঞান ও যোগের সমন্বয় কর্তব্য। বীৰ্য্যপূর্বক যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যোগ-সাধন করিয়াই মোক্ষলাভ করিতে হয়।

যোগাগ্নি ভিন্ন মুক্তিলাভ হয় না, ইহা ব্যতিরেকে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও জপাদি মিথ্যা। সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে যোগদেহলাভ হয়। উপনিষদ আত্মা সম্বন্ধে ‘অণোরণীয়ান্’ ‘মহতো মহীয়ান্’ প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ দিয়াছেন, যোগদেহ বা সিন্ধদেহ বলিতে তাহাই বুঝায়।

এইরূপ দেহধারী জীবমুক্ত যোগী কর্তব্যহীন, দোষবর্জিত, নির্লেপ, সদাশ্বরূপস্থ, তাঁহার জ্ঞান খড়্গস্বরূপ, যোগ তাঁহার পক্ষে যুক্ত ও বীৰ্য্যস্বরূপ এবং মোক্ষলাভই তাঁহার জয়লাভ। যোগবীজ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

জ্ঞানেনৈব হি মোক্ষো হি বাক্যং তেষাস্তু নাস্তথা ॥৬২

সর্ব্বৈ বদন্তি খড়্গোজ্ঞান জয়ো ভবতি তর্হি কঃ ।

বিনা যুদ্ধেন বীৰ্য্যোণ কথং জয়মবাশ্নুয়াৎ ॥৬৩

তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ ।

জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিধ্যতি কদাচন ॥৬৪

তস্মাদত্র বরারোহে তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে ।

জন্মান্তরৈশ্চ বহুভি ধৌগঃ জ্ঞানেন লভ্যতে ॥৬৫

জ্ঞানস্ত জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে ।

তস্মাৎ যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্ত মোক্ষদঃ ॥৬৬

জ্ঞানীর পক্ষে যোগপ্রাপ্তি বহুজন্মসাপেক্ষ, কিন্তু যোগীর পক্ষে জ্ঞানপ্রাপ্তি একজন্মেই সম্ভব, তাই যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতর মুক্তিমার্গ আর নাই। যোগীর পক্ষে জ্ঞানলাভ সামান্য কথা, তাহা এক জন্মেই লভ্য, তাই বলা হইয়াছে, “যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্ত মোক্ষদঃ”। অন্ততঃও আছে—

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মানয়েৎ ।

স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥^১

যোগবীজ ও যোগশিখোপনিষদে আছে : দেবী প্রশ্ন করিলেন, “বহু জন্মের জ্ঞানদ্বারা যোগপ্রাপ্তি হয়, অথচ একজন্মের যোগদ্বারা জ্ঞানলাভ হইবার কারণ কি ?” শঙ্কর তত্ত্বতরে বলিলেন, “বহুজন্মের জ্ঞানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক ‘আমি মুক্ত’ মনে করিয়া কেহ মুক্ত হয় না, পুরুষ জন্মান্তর-শতান্ত্রে যোগের দ্বারাই মুক্ত হয়, সেইরূপ যোগ সম্পন্ন হইলে পুনঃপুনঃ জন্ম-মুক্ত্য ঘটে না।”^২

জ্ঞানী রূপে তাঁহার। মুক্ত হন, দেহান্ত্রে তাঁহার। পাপপুণ্যানুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হন, সেই সকল যথাবৎ ভোগের পর পুনর্জন্ম হয়। পুণ্যবলে যদি সিদ্ধদের সঙ্গলাভ হয় তবে তিনি যোগী হন ও মোক্ষলাভ করেন।

গীতায় আছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকাশ্রয়িত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ।^১

এখানে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাদি শুভলোক লাভ করিয়া বহুবংশের বাস করিবার পর সদাচারী ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ করার কথা আছে । তাই নাথমার্গে উক্ত হইয়াছে, “জ্ঞানং চ যোগং চ মুমুক্শুর্দম্ অভ্যাসেৎ”^২ অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য ‘মহাজ্ঞানে’র আশ্রয়-গ্রহণ কর্তব্য ।

যোগ ও যোগাঙ্গ

ইতিপূর্বে যে যোগমাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার স্বরূপ নির্বাচন এবং প্রকারভেদ নিরূপণ করা কর্তব্য ।

যোগ কি ? প্রচলিত মতানুসারে ‘যোগ’ অর্থে মিশ্রণ, যোগসূত্র অনুসারে ‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ’, নাথমার্গের গ্রন্থমতে, যোগ—

যোহপানপ্রাণয়োঃ যোগঃ স্বরজরেতসোসুখা ।

সূর্য্যচন্দ্রমসৌর্যোগো জীবাশ্বপরমাশ্বনোঃ ॥৮৩

একস্ত দ্বন্দ্বজালস্ত সংযোগো যোগ উচ্যতে ।^৩

অতএব তন্ত্রমতে প্রাণঅপান, রজরেত, চন্দ্রসূর্য্য, জীবাশ্বপরমাশ্বায় যোগকে যোগ বলে,—ইহাই শিবশক্তির সামরস্ত । যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে—

জ্ঞানং যোগাশ্বকং বিদ্ধি, যোগকাষ্টাঙ্গসংযুতম্ ।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাশ্বপরমাশ্বনোঃ ॥^৪

যোগশিখোপনিষদ মতে যোগ এক, বহু নহে, উহা মহাযোগ নামে প্রসিদ্ধ । মন্ত্র, লয়, হঠ, রাজ তাহার ক্রমমাত্র ।

মন্ত্রোলয়োহঠো রাজযোগোহস্তভূমিকাঃ ক্রমাৎ ॥১২৯

এক এব চতুর্ধায়াঃ মহাযোগোহভিধীয়তে ।

শিবসংহিতায়—

মন্ত্রযোগো হঠশৈব লয়যোগস্তৃতীয়তঃ ।

চতুর্থো রাজযোগঃ স্তাৎ স দ্বিধাতাববজ্জিতঃ ।^৫

১। গীতা ৬।৪১

২। যোগশিখোপনিষৎ ১।১৪

৩। যোগবীজ, স্লোক ৮৩, যোগশিখোপনিষৎ, স্লোক ৬৮

৪। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৩

৫। শিবসংহিতা ৪।১৭

যোগ অর্থে এক বস্তুতে অস্থির মিশ্রণ ইত্যাদি সপ্তদশ প্রকার যোগের ভেদ আছে। আবার যোগের চতুষ্পথও আছে—

মন্ত্রযোগলয়শ্চৈব রাজযোগহঠস্তথা।

যোগশ্চতুর্বিধাঃ প্রোক্তা যোগিভিস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥^১

প্রত্যেক যোগের সহিতই লয়ের সম্বন্ধ আছে, কারণ চিত্তের লয়সাধনই যোগের উদ্দেশ্য। সূর্য্যাকিরণে তৃণোপরি অর্ককাস্তমণি ধরিলে যেরূপ তৃণ ভস্ম হয়, সেইরূপ কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রস্থিত সকল জব্যই যোগীর নিকট প্রকাশ্য, অতএব যোগী সর্ব্বজ্ঞ। যোগসাধন দ্বারা যোগী স্বল্পাহারী, শ্বাসপ্রশ্বাসজয়ী ও দীর্ঘজীবী হন। যোগের ক্রম বর্ণনা (মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগ) অতঃপর বিস্তারিত হইতেছে।

যোগের ‘অঙ্গ’ কয়টি? পাতঞ্জল মতে যোগের অষ্ট অঙ্গ—
যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥২।২৯।^২

মার্কণ্ডেয় পাতঞ্জলের স্থায় যোগাঙ্গ ‘অষ্ট’ বলিয়াছেন, গোরক্ষমতে যোগাঙ্গ ‘ষট্’, যথা—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবন্তি ষট্ ॥^৩

(ধ্যানবিন্দু উপনিষদের ৪১ শ্লোক)

যম ও নিয়মকে এখানে যোগভূমিরূপে নিশ্চয় করিয়া অঙ্গমধ্যে ধার্য্য করা হয় নাই। অষ্টত্রয় ও ষড়ঙ্গ যোগের কথা আছে, যথা—

প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোহথ ধারণা।

তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গে যোগ উচ্যতে ॥

(অমৃতনাদ উপনিষৎ শ্লোক ৬)

ইহার মধ্যে আগম-অবিরোধী বাক্যই ‘তর্ক’।

আগমস্তাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে ॥ (ঐ ১৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে অষ্টাঙ্গযোগ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।

প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ॥৪৫

১। পাতঞ্জল-দর্শনম্, কালীঘর বেদান্তবাণীশ (১৩২৬ সন) এবং অমরোদগ্রবোধ (পুণি)
শ্লোক ৩ ত্রুট্য।

২। পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্, হরিহরানন্দ আরণ্য ২।২৯

৩। পাতঞ্জলদর্শনম্, কালীঘর বেদান্তবাণীশ, ধ্যানবিন্দু উপ ১।৪১

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে ।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধা সুপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৪৬ (প্রথম অধ্যায়) ১

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই অষ্টাঙ্গ উত্তরোত্তর এক হইতে অষ্টটি উচ্চতর ক্রমের। যোগসূত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের চারিটি অঙ্গকে বহিঃসাধন ও চারিটি অঙ্গকে অন্তঃসাধনরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার বহিরিन्द्रিয়ের উপর প্রভাব স্বরূপকে ‘যম’ ও অন্তরিन्द्रিয়ের উপর প্রভাব স্বরূপকে ‘নিয়ম’ বলে। যম ও নিয়ম প্রত্যেকটি বিভিন্ন মতানুসারে দশবিধ বা পঞ্চবিধ।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১।৪৯, ২।১) দশবিধ ‘যম’—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, ধৃতি, মিথ্যাহার ও শৌচ ; এবং দশবিধ ‘নিয়ম’—তপস্তা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরার্চনা, সিদ্ধাস্তশ্রবণ, হ্রী, মতি বা বুদ্ধি, জপ ও ব্রতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হঠযোগপ্রদীপিকাতে জপ ও ব্রত স্থানে তাপসহন ও হোম উল্লিখিত হইয়াছে—এইমাত্র উভয় গ্রন্থে ভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রতিধানানি নিয়মঃ ॥ ২।২০, ৩২

বর্ণিত হইয়াছে ; অর্থাৎ যম ও নিয়ম প্রত্যেকটি পঞ্চবিধ।

যোগসাধনের ‘আসন’ কয় প্রকার? ৮৪ লক্ষ প্রকার আসন আছে।^১ তন্মধ্যে উত্তম আসন অষ্ট প্রকার^২ ও উত্তমোত্তম আসন ত্রিবিধ^৩ সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন। মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের নামেও আসন প্রচলিত আছে।

সিদ্ধাসন ও পদ্মাসন উভয়ই প্রশস্ত। ইহা দ্বারা যোগসাধন সম্ভব। সর্ব্বদা সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ীমল বিশোধিত হইয়া থাকে, দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত অভ্যাসে যোগসিদ্ধি হয়। সিদ্ধাসন আসন মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ সুখকর, মতভেদে ইহার নাম বজ্রাসন, মুক্তাসন বা গুপ্তাসন।

অতঃপর সিদ্ধাসনাদি বর্ণিত হইতেছে—

সিদ্ধাসন—ঈহাতে বামপদ নিম্নদিকে, দক্ষিণপদ বামপদের সন্ধিস্থলে

১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৯, ৪০

২। গোরক্ষসংহিতা ১।৭

৩। স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, ধীর, সিংহাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন ও মদুরাসন—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

৪। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৭।

বিশ্রান্ত করিয়া হৃদয়ে চিবুক স্থাপন করিয়া দেহকে সরল ও নিশ্চল করিয়া বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া ক্রিয়ের মধ্যভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া উপবেশন করা রীতি। ফলাফল—এই আসন দ্বারা চৈতন্যদ্বার মুক্ত হয়, পরমাত্মার উপলব্ধি সহজ হয়, রোগাদি দূর হয় এবং বিনম্রতা বর্দ্ধিত হয়।^১

পদ্মাসন—ইহাতে বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বামচরণ স্থাপিত করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা উভয়চরণ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া হৃদয়দেশে চিবুক স্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া উপবেশন করা রীতি। ফলাফল—এই আসনসিদ্ধি দ্বারা ব্যাধি ও বিকার সম্যকরূপে বিনষ্ট হয় এবং ইষ্টসিদ্ধি হয়। পদ্মাসন দ্বিবিধ, কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ পদ্মাসনে কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের পদ্মাসন (বজ্রাসন) মূর্তিতে দেখা যায়—দক্ষিণপদ বাহিরের দিকে থাকে ও পদতল বাম উরুর উপর স্থাপিত থাকে, বুদ্ধের হস্তদ্বয় প্রসারিত ও করতলদ্বয় উর্দ্ধমুখী থাকে।^২ হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বুদ্ধ-পদ্মাসনে বামপদটী দক্ষিণ পদের উপর দিয়া আড়ভাবে রাখার নিয়ম আছে।^৩

স্বস্তিকাসন—জানুদ্বয় ও উরুদ্বয়ের মধ্যে পদতলদ্বয় সম্যক স্থাপন-পূর্বক সরলভাবে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন বলে। দক্ষিণ গুল্ফ সীবনের বামপার্শ্বে ও বাম গুল্ফ সীবনের দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া উপবেশনও স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত। এই স্বস্তিকাসন সর্বপাপনাশক বলিয়া কথিত।

ঘেরওসংহিতানুসারে * মৎশ্বেত্ৰাসন—

উদরং পশ্চিমাভ্যাসং কৃতা তিষ্ঠতি যত্নতঃ ।

নম্রান্নবামপদং হি দক্ষজানুপরি ত্সেৎ ।

তত্র যাম্যং কূর্পরঞ্চ যাম্যকরে চ বক্তৃকম্ ।

ক্রবোর্শ্বেধো গতং দৃষ্টিং পীঠং মাৎশ্বেত্ৰমুচ্যতে ॥২১

ঘেরওসংহিতানুসারে* গোরক্ষাসন—

জানুর্কোঁরন্তরে পাদৌ উত্তানাব্যাক্তসংস্থিতৌ ।

গুল্ফৌ চাচ্ছাণ্ড হস্তাভ্যামুত্তানাব্যাক্তাঃ প্রযত্নতঃ ।

১। যোগবিজ্ঞা, হনুমান্‌জী শর্মা, ৩১২, কল্যাণযোগাঙ্ক পৃ ৬৬৫ ।

২। Tibetan Yoga, Evans Wentz p. 182.

৩। যোগিবাঙ্গবাক্য ৩০, ৪০, হ—যো—প্র ১১২; ঘেরও সং ২১২ ।

৪। ঘেরওসংহিতা ২১২১, ২২ ।

কণ্ঠসঙ্কোচনং কৃৎস্না নাসাগ্রমবলোকয়েৎ ।

গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণম্ ॥২২

বামপদ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপনা করিয়া তত্পরি দক্ষিণ কনুই রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের উপর মুখ রাখিয়া ক্রম্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উপবেশন করাকে 'মৎস্যেন্দ্রাসন' বলে । উভয় জাহ্নু ও উরু মধ্যে পদদ্বয় উত্তান ও গুপ্তভাবে রাখিয়া দুই হস্তদ্বারা দুইটী গুল্ফ আবৃত ও কণ্ঠদেশ সঙ্কুচিত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিলে 'গোরক্ষাসন' সিদ্ধ হয় । এই আসন যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদ । মৎস্যেন্দ্রাসন-সিদ্ধিতে বীৰ্য্য বর্দ্ধিত হয় ।^১

হঠযোগপ্রদীপিকাতে যে মৎস্যেন্দ্রাসন বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রণালীভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

বামোরুমূলার্ণিতদক্ষপাদং জ্ঞানোর্কর্ষহির্কোষ্ঠিতবামপাদম্ ।

প্রগৃহ্য তিষ্ঠেৎ পরিবর্তিতাঙ্গঃ শ্রীমৎসানামোদিতমাসনং স্থাৎ ৷^২

প্রতিদিন এই আসন অভ্যাসের ফলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, দুঃসহ প্রচণ্ড রোগসমূহ শীঘ্র বিনাশ পায়, কুণ্ডলিনী অর্থাৎ আধারশক্তির প্রবোধ হয়, কখনও নিদ্রাভাব উপস্থিত হয় না এবং চন্দ্র যে তালুর উপরিভাগস্থিত হইয়া সর্বদা অমৃতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয় ।

ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্বব্যাদিবিনাশনম্ ।

গোরক্ষাসনমিত্যাহুরিদং বৈ সিদ্ধযোগিনঃ ৷^৩

সিদ্ধযোগিগণ ভদ্রাসনকেই গোরক্ষাসন বলিয়া থাকেন অর্থাৎ গোরক্ষসম্প্রদায়ের যোগীরা প্রায়শঃ এই আসনে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া ইহার নাম গোরক্ষাসন হইয়াছে ।

আসন সিদ্ধ হইলে 'প্রাণায়াম' সিদ্ধ হয় । প্রাণায়াম কি ? শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদই 'প্রাণায়াম' নামে পরিচিত । প্রাণায়াম সম্বন্ধে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদ আছে । হঠযোগের রেচক, পূরক ও কুস্তক, যোগসূত্রের বাহুবৃদ্ধি, আভ্যাস্তরবৃদ্ধি ও স্তম্ভবৃদ্ধি নহে ।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥

পাতঞ্জলদর্শন ২।৪২

১। যোগবিজ্ঞা, কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৬৬৭ ।

২। হ. যো. প্র ১১৬০ ।

৩। হ. যো. প্র ১১৪৪, ৪৫ ।

অর্থাৎ তাহা (আসন জয়) হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহাই প্রাণায়াম । প্রশ্বাস ফেলিয়া অগ্রহণ 'বাহুবৃদ্ধি,' শ্বাসগ্রহণ করিয়া ধারণ 'আভ্যাস্তরবৃদ্ধি,' রেচন বা পূরণ না করিয়া হঠাৎ বায়ুরুদ্ধ করার নাম 'সুস্তবৃদ্ধি' । হৃদয়াদি প্রদেশে ইহাদের আচরণে অস্বৈর্য্য ও জড়তারূপ রাজস ও তামস ভাব দূর হয় ।^১

প্রাণাপানসমাযোগ্যপ্রাণায়াম ইতীরিতঃ ।

প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুস্তকৈঃ ॥ ৬২

বর্ণত্রয়াত্মিকা হোতে রেচকপূরককুস্তকাঃ ।

য এব প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামশ্চ তন্ময়ঃ ॥ ৬৩^২

অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগই প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত । রেচক, পূরক ও কুস্তক দ্বারা এই প্রাণায়াম সম্পাদিত হয় । এই রেচক, পূরক ও কুস্তক (যথাক্রমে অ, উ, ম) এই ত্রিবর্ণাত্মক । সুতরাং এই প্রাণায়ামই প্রণবাত্মক । যন্ত্রবিশেষ দ্বারা প্রাণবায়ুকে গ্রহণ করার নাম পূরক, জালন্ধরাদি বন্ধ অবলম্বন দ্বারা সেই পূরিত বায়ুর নিরোধই কুস্তক ও যন্ত্রবিশেষ দ্বারা সেই কুস্তিত বায়ুর অপসারণ তাহাই রেচক (হ-যো-প্র ২।৭ টীকা) ।

উপরোক্ত রেচক, পূরক ও কুস্তকই 'ত্রিবিধ' প্রাণায়াম নামে অভিহিত হয় । প্রাণায়াম দ্বারা প্রত্যাহার সূকর হয় । সেই 'প্রত্যাহার' কি ? "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্ত স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ"^৩ অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপানুকার তাহাই প্রত্যাহার । স্বরূপানুকার অর্থে চিত্ত-নিরোধে ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হয় ।

প্রত্যাহার পঞ্চবিধ (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৭, ৪৮) পঞ্চ-ইন্দ্রিয়যুক্ত বিষয় হইতে চিত্ত নিরুদ্ধ করিলে—অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিযুক্ত করিলে পঞ্চবিধ প্রত্যাহার সাধিত হয় । যোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যাহার সাধন করিতে পারেন, প্রাণায়াম একরূপ রোধের পক্ষে সহায় । ভাবনা দ্বারাও প্রত্যাহার সম্ভব ।

অতঃপর ধারণা । যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—

যমাদিগুণযুক্তস্ত মনসঃ স্থিতিরাস্বনি ।

ধারণেতুচ্যতে সন্তিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ ॥^৪

১। পাতঞ্জলযোগদর্শনম্ ২।২ • টীকা, শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ।

৩। পাতঞ্জলযোগদর্শনম্ ২।৪৭

২। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ৬।২, ৩

৪। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ৮।২

অর্থাৎ যমাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মাতে যে মনের স্থিতি, শাস্ত্রতঃপর্যাবেদী সাধুগণ তাহাকেই 'ধারণা' বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। ধারণা পঞ্চবিধ— ক্রিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম; এই তত্বপঞ্চকে পঞ্চদেবের ধারণা করিতে হয়, সুতরাং ধারণা পঞ্চবিধ। পাদদেশ হইতে জাম্বুস্থান ক্রিতিস্থান, জাম্বু হইতে পায়ু পর্য্যন্ত জলের স্থান, পায়ু হইতে হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত অগ্নির স্থান, হৃদয়মধ্য হইতে ক্রুরয়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বায়ুস্থান এবং ক্রমধ্য হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আকাশস্থান বলিয়া কথিত। (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য—৮।৬-৮)

যে স্থানে ধারণা করা হইয়াছে, সেই স্থানে জ্ঞানবৃত্তির যে একতান তাহাই ধ্যান। তৈলধারা একতানপ্রবাহের বা ধ্যানের উপমা, বিন্দু বিন্দু জলধারা ধারণার উপমা।

ধ্যানই বন্ধমোক্ষের কারণ। মনে মনে আত্মার স্বরূপচিন্তাও ধ্যান। ধ্যান ষোড়শবিধ। প্রধানতঃ ধ্যান সগুণ ও নিগুণ ভেদে দ্বিবিধ, নিগুণ ধ্যান একপ্রকার, সগুণ ধ্যান মধ্যে তিনটি মুখ্যতম।^১

সমাধি কি?—ধ্যান পরিপক্ব হইলে যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্র জ্ঞানগোচর থাকে, স্বরূপেরও বিস্মৃতি ঘটিয়া যে চরম চিন্তাহৈর্য্য হয়, তাহার নাম সমাধি।

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্থা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥^২

জীবাত্মা-পরমাত্মার সমতাবস্থাই সমাধি। ব্রহ্মপদার্থে জীবাত্মার স্থিতিও তাহাই।

প্রাণায়ামাং লাঘবঞ্চ ধ্যানাং প্রত্যক্ষমাত্মনি।

সমাধিনো নির্লিপ্তং মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪।৮

—গোরক্ষসংহিতা।

প্রাণায়ামের দ্বারা লঘুতা, ধ্যান দ্বারা আত্মপ্রত্যক্ষ, সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ত সাধন করিতে হইবে, আসন-অভ্যাস দ্বারা চাক্ষুষ দূর করিতে হইবে, মুদ্রার অভ্যাস দ্বারা স্থিরতা, ও প্রত্যাহারের দ্বারা ধীরতা সিদ্ধ হইবে, ইহার সহিত ষট্কার্ম সাধন দ্বারা দেহ শোধন করিতে পারিলে

যোগীর সপ্তসাধন সিদ্ধ হইবে ও যোগীমুক্তির অধিকারী হইবেন।^১

গোরক্ষসম্প্রদায়ে শোধন, স্থিরতা, ধৈর্য্য, লঘুত্ব, দৃঢ়তা, প্রত্যক্ষ ও নিলিপ্ত এই সপ্তপ্রকার দৈহিক সাধন দ্বারা দেহবিশুদ্ধিক্রিয়াকে ‘সপ্ত-সাধন’ বলা হইয়াছে।^২

সমাধি ও সমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ এইরূপও করা হইয়াছে—

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাশ্বপরমাশ্বনোঃ ।

নিস্তরঙ্গপদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥

নিশ্বাসোচ্ছ্বাসমুক্তো বা নিঃস্পন্দোহচললোচনঃ ।

শিবধ্যায়ী শূলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥

ন শৃণোতি যদা কিক্কিং ন পশ্যতি ন জিহ্বতি ।

ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥^৩

যোগের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ দেওয়া হইল, এখন যোগের প্রধান চারিটি ভেদ বা পথ বর্ণন আবশ্যক। রাজযোগই যোগমধ্যে উত্তমোত্তম, তথাপি মন্ত্র, লয়, হঠ প্রভৃতিরও স্ব স্ব গুরুত্ব আছে। অতএব চতুর্বিধ যোগের ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। নাথমার্গে হঠযোগের বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহাকে রাজযোগে আরোহণ করিবার সোপান-স্বরূপ বিবেচনা করা হয়; অতএব হঠ ও রাজযোগের সম্বন্ধ-বিচারও করা হইতেছে। নাথমার্গের লক্ষ্যও ‘উন্মনী’ অবস্থাপ্রাপ্তি, উহা রাজযোগের চরম পরিণতি, তথাপি সিদ্ধরা হঠযোগের আশ্রয়েই উক্ত পদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

মন্ত্রযোগ

নাথসিদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে প্রণব-জপের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রণবাদি শব্দ দ্বারা মন্ত্রচেতনা হইলে জীবের যে উর্দ্ধগতি হয় ও শকাতীত পরমানন্দ-ধামে জীব উপনীত হয়, তাহাকেই ‘মন্ত্রযোগ’ বা জপযোগ বলে। বৈখরী শব্দ হইতে ক্রমশঃ মধ্যমা অবস্থা ভেদ করিয়া পশ্চাত্তীতে প্রবেশ করা মন্ত্রযোগের প্রধান উদ্দেশ্য। পশ্চাত্তী শব্দ স্বপ্রকাশ-মান, চিদানন্দময়, চিদাশ্রয় পুরুষের উহাই অক্ষয় ও অমর যোড়শী কলা।

১। ষট্কার্মণ্য শোধনাজ্ঞ আদ্যেনৈব ভবেৎ দুঃখ ।

মুহুর্থা স্থিরতা ইভ প্রত্যাহারেন ধীরতা । গোরক্ষসংহিতা ৪১৭

২। গোরক্ষসংহিতা ৪১৬

৩। পাতঞ্জলদর্শনম্, কালীঘর বেদান্তবাণিশ ।

শব্দচৈতন্য, আত্মজ্ঞান বা ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার একই কথা। এই অবস্থায় উপনীত জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে, তৎপরে যে অব্যাক্তভাব স্বতঃই উদ্ভূত হয়, তাহাই শব্দের তুরীয়াবস্থা। জাগতিক কেন্দ্রে যে শব্দ বর্তমান আছে, তাহার শ্রোতাই মূলধার হইতে নিরন্তর উৎসর্গিত হইয়া উঠিতেছে, বহির্মুখী জীব সে বিষয়ে অজ্ঞ। কোন ক্রিয়াকৌশল দ্বারা যখন ইন্দ্রিয় রুদ্ধ ও প্রাণমন স্থগিত হয়, তখন জীব এই চেতনশব্দের সন্ধান পায়। যগ্মুখী মুদ্রা দ্বারা এই নাদানুসন্ধান করা যায়। অভিঘাত-জনিত শব্দকে অনাহদ-নাদে লীন করিতে পারিলে মন্ত্র অক্ষরসমষ্টিমাত্র-রূপে থাকিয়া যায়, উহার সামর্থ্য ও প্রকাশ অনুভবগম্য থাকে না। ইড়াপিঙ্গলার গতি রুদ্ধ করিয়া প্রাণ ও মনকে সুষুম্নাতে প্রবেশ করাইতে পারিলে এই নিত্য সারস্বত শ্রোত অনুভূত হয়। সাধক ইহার সাহায্যে আজ্ঞাচক্র ও তৎপরে বিন্দুস্থান ভেদ করিয়া সহস্রারে মহাবিন্দুতে উপনীত হন, তখন জীবের ‘হংস’ মন্ত্রই গুরুকৃপায় ‘সোহং’ মন্ত্রে পরিণত হয়; ইহাই মন্ত্রযোগ সমাধি বা মহাভাব সমাধি।^১

মন্ত্রযোগের সিদ্ধাস্ত এই যে, পরমাত্মা হইতে ভাব, ভাব হইতে নামরূপ ও তাহার বিকার এবং বিলাসময় সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহার বিপরীত মার্গে সাধন করিলে লয়প্রাপ্তি হইবেই। যে ভূমিতে মনুষ্য পতিত হয়, তাহার সাহায্যেই সে পুনরুত্থান করে, সেইরূপ নামরূপের আশ্রয়ে ক্রমশঃ ভাব ও ভাবগ্রাহী পরমাত্মাতে চিন্তবৃত্তির লয় হইলে মুক্তি সম্ভব হইবে।^২

মন্ত্রযোগের সাহায্যে মূর্তিপূজা ও পীঠবিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। উহার সাধনপ্রণালী ষোড়শাঙ্গ-বিশিষ্ট; যথা—ভক্তি, শুদ্ধি, আসন, প্রাণ-ক্রিয়া, মুদ্রা, তর্পণ, হবন, বলি, ইষ্টমন্ত্রাদি পঞ্চাঙ্গসেবন, দিব্যাদেশ-সেবন, আচার, ধারণা, যাগ (অন্তর্যাগ ও বহির্যোগ), জপ, ধ্যান ও সমাধি।^৩

মন্ত্র ও হঠযোগের সম্বন্ধ এইরূপ,—মন্ত্রযোগে যেকোন ভাবপূর্ণ স্থূল ধ্যানের বিধি আছে, হঠযোগে সেইরূপ জ্যোতির্ধ্যান আছে। মন্ত্রযোগে অন্তরঙ্গগতে দেবদেবীর ধ্যান বিধি আছে, হঠযোগে জ্যোতি রূপে সেই

১। যোগকা বিদ্য পরিচয়, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ বোগাঙ্ক পৃ: ৭১

২। যোগচতুষ্টয়, কল্যাণ সাধনাক্ষ ১ম খণ্ড পৃ: ১০১, ১০২

৩। মন্ত্রযোগকে অঙ্গ, শ্রীরামেশ্বর প্রসাদিকী বকীল, কল্যাণ বোগাঙ্ক, পৃ: ৩০১ ইত্যাদি

ধ্যানের বিধি আছে। মন্ত্রযোগে নামরূপ দ্বারা লয়সাধন হয়, হঠযোগে বায়ুনিরোধে সমাধিলাভ বিধি। মন্ত্রযোগের সমাধিকে মহাভাব সমাধি ও হঠযোগের সমাধিকে মহাবোধ সমাধি বলা হয়।

জীব অহরহঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ‘হংস’ মন্ত্র জপ করিতেছে, সেই মন্ত্রই গুরুকৃপায় প্রাণের বিপরীত ভাবাপন্ন অবস্থাতে ক্রমপে ‘সোহং’ মন্ত্রে পরিণত হইতেছে তাহার বিবরণ ‘সদগুরুবাণী’তে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

কর্মেণ সহিত ক্রিয়াশক্তির দ্বারা যে যোগ স্থাপিত হয় তাহা কর্মযোগ। চেতনশক্তিতে বা প্রাণে ক্রিয়াশক্তি আছে, জড়ে তাহা নাই। যোগসূত্রে আছে, “প্রচ্ছদন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত” ; এই প্রাণ কি ? কাশীখণ্ডে—

ষট্‌ত্রিংশদম্বুলো হংসঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ।

সব্যাপসব্যামার্গেণ প্রয়াণাং প্রাণ উচ্যতে ॥

হংসপ্রবাহ নাভিচক্র হইতে মায়াচক্র (আজ্জার নিম্নস্থ চক্র) পর্য্যন্ত বিদ্যমান, ইহাতে সব্বগুণাত্মক চৈতন্য ঈশ্বরের বাস, এই হংসপ্রবাহের সহিত জীবের সম্বন্ধ হওয়া কর্তব্য, কিন্তু ‘অপানং কর্বতি প্রাণঃ প্রাণোহপানং চ কর্বতি’ ; অতএব জীব নাভির উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয় না, তাহার ঈশ্বরবোধও হয় না।

প্রথম দীক্ষাতে—প্রাণাপানের গতির সমতা সাধন করিয়া এক ‘হংস’প্রবাহে পরিণত করা হয়, ইহার নাম ‘কর্মযোগ’। ক্রিয়ার সময়ে নাসিকাদ্বারে বায়ু বাহিরে আসে না, রোধেরও প্রয়োজন হয় না, ইহাই মুখ্যসাধনা। দীক্ষিতের সুষুপ্তি হয় না, নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার জন্মে।

দ্বিতীয় দীক্ষাতে—নাভিভেদ হইলে জীব ‘হংস’মন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন জীবের হংস শব্দের সহিত উর্দ্ধাধঃ গতি হয় ; যোগসূত্রে ইহাকেই বিতর্কাবস্থা বলা হইয়াছে, ইহাতে জ্ঞানশূন্য ভক্তি হয়।

তৃতীয় দীক্ষাতে—অভ্যাসফলে মায়াচক্রভেদ হইয়া ‘হংস’প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া, ‘সোহং’ প্রবাহে পরিণত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যের সহিত সাধকের যোগ হয়, ইহাই ‘জ্ঞানযোগ’; গীতাতে ইহাকেই “সদ্বাং সঞ্জায়তে জ্ঞানং” বলা হইয়াছে।^১

ভৃগু, কশ্যপ, প্রচেতা, দধীচি, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বাঙ্গীকি, গর্গ প্রভৃতি

মন্ত্রযোগের উপদেষ্টা। মহাভারতের শান্তিপর্বে ইহার অমুষ্ঠান ও ফলাফল বর্ণিত আছে। সাধারণ স্বাস্থ্যপ্রস্থানের গতিই কিরূপে জীবকে শিব করিতে পারে, ‘মন্ত্রযোগ’ তাহার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। মন্ত্রযোগ-সাধনে কোন বিশেষ বাহ্য নিয়মাদি নাই, কারণ ইহা মানসিক যোগ। বৈদিক যুগে মন্ত্রের দ্বারাই যুদ্ধে জয়লাভ, আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি ও শস্যলাভ প্রভৃতি সাধিত হইত। সকল ধর্মসম্প্রদায়েই স্বরশক্তির ক্রিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন মন্ত্র দ্বারা পূজা বা উপাসনার বিধি নির্ণীত হইয়াছে। মন্ত্রজপ দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়—“জপাৎ সিদ্ধিঃ” ইহাও সাধকগণ জানেন। কিন্তু আগম উপদেশ দিয়াছেন, “শক্তিয়ুক্তো জপেন্নম্নঃ ন মন্ত্রঃ কেবলং জপেৎ।”^১ অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপ স্বরশক্তির সংযোগে মন্ত্রজপ করাই বিধি, কেবল অক্ষরমাত্রের আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রজপ হয় না। এখনকার প্রচলিত দীক্ষা মাত্রী-দীক্ষা, অর্থাৎ ইহাতে গুরু দ্বারা প্রদত্ত মন্ত্র দ্বারা দেবতার অর্চনা বিধি, ইহাতে কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করিবার কোন বিধি নাই। মন্ত্রযোগ দ্বারাই সাধকের নাদানুভূতি হয়, তাহা নাদ ও নাদানুসন্ধান অধ্যায়ে জ্ঞেয়া।

হঠযোগ

হঠযোগের আদি প্রবর্তক আদিনাথ বা শিব হঠযোগীদের এই মত সম্মত।

দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্ত্ব গোরক্ষাদিস্বসাধকৈঃ।

অন্তো মৃকণ্ড-পুত্রাদৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ ॥

(পাতঞ্জলদর্শনম্—কালীবর)

মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, মরীচি, জৈমিনি, পরাশর, ভৃগু, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কৃপায় এই যোগের বিস্তার সাধিত হয়। তৎপরে গোরক্ষ, মৎসেন্দ্র, চর্ণী, জলন্ধর, কনেড়ী, চতুরঙ্গী, বিচারনাথ প্রভৃতি নাথ-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ কর্তৃক ইহা অমুষ্ঠিত হয়, এবং তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষশতক, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ, গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, অমনস্ক, যোগবীজ, হঠযোগপ্রদীপিকা, হঠতত্ত্বকৌমুদী, ঘেরণ্ডসংহিতা, নিরঞ্জনপুরাণ ইত্যাদিতে হঠতত্ত্ব আলোচিত হয়।

হঠযোগের অষ্টাঙ্গ, ষড়ঙ্গ ও চতুরঙ্গ ভেদ আছে। সাধারণতঃ “যম-নিয়মাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যানসমাধিযোগৈষ্ট্যাবঙ্গানি” প্রচলিত মত যোগতত্ত্ব উপনিষদ্ ইত্যাদিতে দেখা যায়। মহাভারতেও আছে “বেদেষু চাষ্টেগুণিনঃ যোগমার্জ্জুনীষিণঃ।” গোরক্ষ-উপদিষ্ট হঠযোগের ‘ষট্ অঙ্গ’ বলা হয়, যম ও নিয়মকে ভূমিস্বরূপ ধরিয়া লইয়া আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদিকে ‘ষড়ঙ্গ’ বলা হইয়াছে। হঠযোগপ্রদীপিকাতে ‘চতুরঙ্গ’ যোগ বিষয় আছে,—তাহারা যথাক্রমে আসন, প্রাণায়াম বা কুস্তক, মুদ্রা বা করণ ও নাদানুসন্ধান। প্রত্যাহারাদি সমাধি পর্য্যন্ত নাদানুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত।^১

“আসনেন রজ্জো হস্তি” ইহা সিদ্ধান্ত যোগিসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ উক্তি অর্থাৎ দীর্ঘকাল আসনের অভ্যাস দ্বারা রজ্জোগুণ জনিত দৈহিক চাঞ্চল্য দূর হয়, যোগের বিপ্লবরূপ যোগাদিও বিনষ্ট হয়। “কুর্ধ্যাত্তদাসননৈশ্চর্য্যমারোগ্যং চান্দ্ৰলাঘবম্।”^২ আসন অভ্যাস দ্বারা দেহের লঘুতা সম্পন্ন হইয়া তমোগুণ দূরীভূত হয় ও দেহে সাত্ত্বিক তেজের উদয় হয়। পাতঞ্জল সূত্রেও রোগের দ্বারা চিত্ত বিক্ষেপের উল্লেখ আছে। অঙ্গের গুরুতা থাকিলে তপোবিপ্লব ঘটে। বারম্বার আসন অভ্যাস দ্বারা প্রাণায়াম বা কুস্তক সহজ-সাধ্য হয়। সাম্ভারাম বলিয়াছেন যে, কুস্তক দ্বারা প্রাণের গতি রুদ্ধ হইলে চিত্ত নিরালস্য হয়। জীকাকার ব্রহ্মানন্দও বলিয়াছেন যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর ব্রহ্মাকার-স্থিতির উদয় হয়, সেই সময়ে পরবৈরাগ্য অবলম্বনে চিত্তকে সম্যক রুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু প্রাণায়াম সহজ হইলেও নাড়ী-চক্রাদি অশুদ্ধ থাকা কালীন শ্বশ্না-দ্বারে বায়ুর প্রবেশলাভ ও উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তি বাতুলতা মাত্র। শাণ্ডিল্য উপনিষদাদিতে^৩ নাড়ীশোধন ব্যাপারের নিমিত্ত ৪৩ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত সাধন আবশ্যক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণায়াম সাহায্যেই এই শোধন সম্পূর্ণ হয়। যখন দৈহিক ক্লেশতা, কাস্তি, ইচ্ছানুসারে বায়ুধারণ-সামর্থ্য, অগ্নিবৃদ্ধি, নাদের অভিব্যক্তি ও আরোগ্য সাধকে দর্শায়, তখন নাড়ীশুদ্ধি সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ক্লেশতা স্থলে শাণ্ডিল্য উপনিষদে লঘুতা, যোগতত্ত্ব উপনিষদে ক্লেশতা ও লঘুতা, শিবসংহিতা মতে দেহে সাম্য, শ্লগন্ধি

১। হ-যো-প্র ১।৫৬, ৫৭, ৪।৮২

২। হ-যো-প্র ১।১৭

৩। শাণ্ডিল্য উপনিষদ ৫।০। ত্রিচতুঃপ্রিত্ত্বঃসমুত্তি চতুর্মাণপর্য়ন্তং ত্রিসংখিন্ তদন্তরালেণ চ ষট্চক্ৰং আচর্য্যেতাড়ীশুদ্ধির্ভবতি। ততঃ শরীরে লঘুদীপ্তিবন্ধি বুদ্ধিনাশান্তিসাধির্ভবতি।

ও কাস্তির আভা প্রক্ষুটিত হওয়া এবং কঠিনেরে মাদুর্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নিবিবর্জনম্। কুশলং চ শরীরস্ত তদা জায়তে নিশ্চিতম্।^১ বপুষঃ কাস্তিরংকুষ্ঠা জঠরাগ্নিবিবর্জনম্। আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ করণানাঞ্চ জায়তে।^২ ইত্যাদি

যম, নিয়ম ও আসন যথাযথভাবে সিদ্ধ না হইলে যথার্থরূপে প্রাণায়াম-সাধন সম্ভব হয় না; অতএব ঐ অবস্থায় নাড়ীশুদ্ধির চেষ্টা অকর্তব্য। বায়ু, পিত্ত ও কফ দোষাদি-যুক্ত সাধকের 'ষট্‌কর্ম' সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে, ষট্‌কর্ম সাধনের জন্য স্থান, আহার, আচারবিচার পালন কর্তব্য। নিরাপদ স্থান, সাহিত্যিক আহার, বৈরাগ্যাদি পালনই বিধি।

ধৌতীক্সিস্তিস্থতা নেতি ত্রাটকং নোলিকং তথা।

কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্মাণি প্রচক্ষতে ॥^৩

ধৌতি—মুখ দিয়া উদর-মধ্যে নূতন বস্ত্রখণ্ড প্রবেশ দ্বারা উদ্‌গিরণ; ইহা দ্বারা শ্বাসকুষ্ঠাদি দূর হয়। (পাশ্চাত্যেও নল-ব্যবহার-রীতি আছে।)

বস্তি—গুহাধারে নল-সাহায্যে জলাকর্ষণ ও ত্যাগ; প্রীহা, বাতপিত্তাদি দূর হয়।

নেতি—নাসারন্ধ্র দ্বারা জল আকর্ষণ ও নিষ্কাশন; কপাল ও নাসিকার মল রহিত হয়।

ত্রাটক—নিশ্চল নয়নে সূক্ষ্মবস্তুর দর্শন। ইহা দ্বারা নেত্ররোগ বিনাশ হয়, আলস্য ও তন্দ্রা দূর হয়, বশীকরণ-শক্তি হয়। ইঠযোগ গ্রন্থে ত্রাটকের ভেদ বর্ণিত হয় নাই, কেবল অশ্রুপাত না হওয়া পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাকে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ত্রাটক কর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২।৩১ হ-যো-প্র টীকা)। মণ্ডলব্রাহ্মণ্য উপনিষদে ও তিব্বতীয় লামাদের সাধনে ত্রাটকের আস্তুর, বাহ ও মধ্য ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমধ্যে ধ্যানই 'আস্তুর ত্রাটকে'র উদাহরণ। চন্দ্র-নক্ষত্রাদি দূরস্থিত বস্তু লক্ষ্য করিয়া ত্রাটকে 'বাহ ত্রাটক' বলে। সূর্য্যে ত্রাটক নিষিদ্ধ, তাহাতে নেত্রদোষ হয়, জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বে ত্রাটক করা যাইতে পারে। কাগজে বা প্রাচীর-গাত্রে বিন্দু ও দেবমূর্তি

১। যোগতত্ত্বোপনিষৎ ১।৪৭, ৪৮

২। শিবসংহিতা ৫।২৩, ৫।২৮ বায়ুসিদ্ধি

৩। হ-যো-প্র ২।২২, পোরক্ষসংহিতা ৪।২, ধৌতীক্সিস্তিস্থতা নেতি ইত্যাদি পাঠান্তর।

ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া ত্রাটককে ‘মধ্য ত্রাটক’ বলে। দীপশিখা, নাসিকাগ্র, ধাতুমুষ্টি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেও হয়। অধিকারিভেদে এই ত্রিবিধ ত্রাটকের সাধনবিধি আছে। তিব্বতীয় যোগে কোন বৃহৎ বস্তুর দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার একটি মাত্র অংশে মনঃসংযোগ দ্বারা ত্রাটক বিধি আছে। যথা—

উপত্যকা-নিম্নে বা পর্বত-গাত্রে বা অন্ধকারে বসিয়া সাধন করিলে একটি দৃশ্য বা মূষ্টি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে, ক্রমশঃ উহা একটি বিন্দুমাत्रে পর্যাবসিত হইবে এবং চিত্তের স্থিরতার সহিত ‘বিন্দু’ও স্থির হইবে। গুরু প্রশ্ন করিয়া এইরূপ শিষ্যের মনের একাগ্রতা সাধন কতদূর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করেন। এতৎসহ প্রাণায়াম কর্তব্য। মোমবাতির অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থির প্রভৃতি দ্বারাও সাধন প্রচলিত আছে। শ্বেত কাগজে বা দেওয়ালে কৃষ্ণ বিন্দুচিহ্নও কেহ কেহ দিয়া থাকেন।^১

কপালভাতি—লৌহকারের ভদ্রার ছায় শীতলতার সহিত রেচক ও পূরণ ; স্কুলতাহাস ও কফাদি দোষ বিনষ্ট হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিমতে একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা সকল মল দূর হইতে পারে, ষট্‌কর্্মের কোন আবশ্যকতা তাঁহাদের মতে নাই।

হঠযোগের ‘সপ্তসাধন’ অর্থে ষট্‌কর্্ম ও তৎসহ আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি সাধন। ষট্‌কর্্ম একটি সাধন, আসনমুদ্রাদি ছয়টি সাধন, একত্রে উহারা সপ্তসাধন নামে পরিচিত। গোরক্ষসংহিতায় শোধন, দৃঢ়তা ইত্যাদিকে সপ্তসাধন বলা হইয়াছে।

শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্বেখ্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।

প্রত্যক্ষঞ্চ নিলিপ্তঞ্চ দৈহিকং সপ্তসাধনং ॥ (৪৬ শ্লোক)

মুদ্রা। অতঃপর হঠযোগের ‘মুদ্রা’ বর্ণন কর্তব্য। আসন ও মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা দেহের দৃঢ়তা ও স্থিরতা অভ্যাস হয়, তৎপরে প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি দ্বারা আত্মপ্রত্যক্ষ ক্ষমতা জন্মায়, তৎসহ দৈহিক লঘুতা ও ধীরতা প্রাপ্তি হয়। আসন ৩৩ প্রকার—প্রাণায়াম ৮ প্রকার, মুদ্রা ২৫ প্রকার (ঘেরওসংহিতা দ্রষ্টব্য)। হঠযোগপ্রদীপিকাতে মুদ্রার দশবিধ প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে ; যথা—

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।

উড্ডানং মূলবন্ধশ্চ বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ ॥

করণী বিপরীতাখ্যা বজ্রোলী শক্তিচালনম্ ।

ইদং হি মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনম্ ॥ (৩৬, ৭)

শিবসংহিতায় মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীতকৃতি, উড্ডান, বজ্রোলী, শক্তিচালন এই দশটি মুদ্রাকে উত্তমোত্তম বলা হইয়াছে ।^১

মহামুদ্রা । তিব্বতীয় লামাদের মধ্যে ‘মহামুদ্রা’ সাধন প্রচলিত আছে । লামা মারপা ভারতে আসিয়া অতীশার নিকট শিক্ষালাভ করেন (অতীশার ১০৫৩ খৃঃ মৃত্যু হয়) । অন্তর্দৃষ্টি লাভের প্রণালীকে ইহারা ‘মহামুদ্রা’ আখ্যা দেন ।^২ ভারতীয় যোগীর পক্ষে মহামুদ্রা একটি মুদ্রা মাত্র, কিন্তু লামাদের নিকট উহা নির্ব্বাণ-লাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ গণ্য ।^৩

আদিনাথ-বর্ণিত মহামুদ্রা সাধন দ্বারা কুণ্ডলী সরল হয়, ইড়া-পিঙ্গলার মরণাবস্থা হয়, অবিজ্ঞাদি পঞ্চক্লেশ ও শোকমোহাদি দূর হয়, জরামরণ, নাশ হয় । বামপদ নিম্নে ও দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়া উপবেশন করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী বাতীত অন্যান্য অঙ্গুলী দ্বারা প্রসারিত পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ ও জালন্ধর বন্ধযোগে কণ্ঠপ্রদেশে বায়ু রুদ্ধ করিয়া স্রুশ্মাতে বায়ুধারণ করার নাম ‘মহামুদ্রা’ । (ঘেরণ্ড-সংহিতা ৩৬)

মহাবন্ধ ও মহাবেধ । বাম গুল্ফ দ্বারা পায়ুমূল নিরোধ করিয়া দক্ষিণপদ দ্বারা সমস্ত বাম গুল্ফ আপীড়নপূর্ব্বক জালন্ধর বন্ধ করিয়া বায়ুপূরণ করিয়া যোনিতে আকর্ষণ বা মূলবন্ধ করিয়া মধ্যনাড়ীতে মনঃসংযোগ করাকে ‘মহাবন্ধ’ বলে ।

মহাবন্ধে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে উভয় নাসাপুটে বায়ুগ্রহণ করিয়া করতলদ্বয় সাহায্যে কটিদেশে মন্দ মন্দ আঘাত করিলে স্রুশ্মামধ্যে বায়ু প্রবাহিত হইবে, ইহার নাম ‘মহাবেধ’ । মহাবেধ বিনা মহামুদ্রা-সাধন নিষ্ফল । সুতরাং যোগী যত্নসহকারে এই তিনটির (মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ও মহাবেধ) অনুষ্ঠান করিবেন । প্রত্যাহ চারিবার এই তিনটির অনুষ্ঠান দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায় ।

মুদ্রা-সাধনের ফল । এই মুদ্রাদি সাধনে জরামরণ হয় না, অধিমাди অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয় । তন্ম্ব পঞ্চ-মকার মধ্যে মুদ্রাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে;

কারণ মুদ্রা দ্বারাই শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। তাত্ত্বিক সাধনে কেবল ত্যাগের কথাই নাই, ভোগের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভোগময়ী মনের গতিকে ত্যাগাভিমুখী করাই তাত্ত্বিক সাধন। মুদ্রার মধ্যে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি সকল ক্রিয়ার সংমিশ্রণ আছে। অমুভবী ও পারদর্শী গুরুর নিকট মুদ্রা-শিক্ষা কর্তব্য।^১

আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রাসাধন অস্বাভাবিক মনে হইলেও, মনঃস্থৈর্যের উহা প্রকৃষ্ট উপায়। শিব স্থির, শক্তি চঞ্চল; শিব ও শক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সাধকের পক্ষে মুদ্রাদি সাধন দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন সহজ। ভোগী মানব এই পবিত্র সাধনকে বাসনা-পূরণের সাধনরূপে পরিণত করিয়া লোকচক্ষে ইহাকে দুষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ মুদ্রার যথার্থ সাধনে সংযমের পরাকাষ্ঠা আছে।

শাস্তবীমুদ্রা। এই মুদ্রা সাধন দ্বারা পরমাত্মা দর্শন হয়। ইহা ক্রমদ্বারা একাগ্রচিত্তে ধ্যানযোগে পরমাত্মা দর্শনের সাধনা, ইহা কুলবধূর হ্যায় গোপনীয় সাধন। মুদ্রামধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ মুদ্রা (ঘেরও-সংহিতা ৩৬৪, ৬৫)। আজ্ঞাচক্রভেদ হইলে মানসক্রিয়ার উপরম হয়, সহস্রার কর্ণিকামধ্যে আবদ্ধ মন নিশ্চল হয়, নিষ্ক্রিয় মন বিলীন হইলে 'অমনস্ব' অবস্থা হয়,—শাস্তবীমুদ্রার ইহাই পূর্ণ পরিণতি। মন, দৃষ্টি ও বায়ু (প্রাণ) স্থির হইলে আকাশরূপী আত্মচেতন প্রকাশমান থাকে।

অজ্ঞান-সমুদ্র পার হইয়া জ্যোতির্শ্রয় আত্মাকে জানিতে হইবে, “তজ্জ্ঞানপ্রবাহিরুঢ়েন জ্ঞেয়ম্”। ইহাই আন্তর ও বাহ্য লক্ষণ, ইহার মধ্যেই জগৎ লীন হইয়া আছে। ইহা নাদ, বিন্দু ও কলার অতীত অখণ্ডমণ্ডল, ইহা সগুণ ও নিগুণ স্বরূপ, ইহার বেত্তা মুক্তিলাভ করেন। যোগী সিদ্ধাসনে প্রথমে অগ্নিমণ্ডল, তত্পরি সূর্য্যমণ্ডল, তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল, তন্মধ্যে বিদ্যাতের হ্যায় অখণ্ড ব্রহ্মতেজোমণ্ডল দর্শন করেন, ইহাই শাস্তবীমুদ্রার বৈশিষ্ট্য। অমা, প্রতিপদ ও পূর্ণিমা ভেদে ত্রিবিধ দৃষ্টিভেদ আছে, তাহারা যথাক্রমে নিমীলিত, অর্ধনিমীলিত ও সর্কোদীলন দৃষ্টিরূপে খ্যাত। নাসাগ্রে পূর্ণিমা দৃষ্টির অভ্যাস কর্তব্য। “যদা তালুমূলে গাঢ়তমো দৃশ্যতে। তদভ্যাসাদ্ অখণ্ডমণ্ডলাকার জ্যোতির্দৃশ্যতে। তদেব সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভবতি। এবং সহজানন্দে যদা মনো লীয়তে

তদা শাস্তো ভবী ভবতি । তামেব খেচরীমাত্তঃ ।^১ তালুমূলে গাঢ় তমঃ তৎপরে জ্যোতির্গুণল দর্শনে সচ্চিদানন্দে এবং সহজানন্দে মনোলায় হইলে ‘শাস্তবী’র উৎপত্তি হয়, ইহাকেই ‘খেচরী’ বলে ।

খেচরীমুদ্রা-সাধন যোগীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে । শিবসংহিতায় (৪।৫১, ৫২) ইহার বর্ণনা আছে, যথা—

ক্রবোরস্তর্গতাঃ দৃষ্টিং বিধায় সুদৃঢ়াঃ সুধীঃ ।

উপবিষ্টাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জিতঃ ॥

লম্বিকোঙ্কস্থিতো গর্ভে রসনাং বিপরীতগাম্ ।

সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ ॥

সিদ্ধীনাং জননী হেমা ।

বজ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রমধ্যে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক বিপরীত-গামিনী জিহ্বাকে লম্বিকার উর্দ্ধস্থ গর্ভে চালনা করিয়া (ক্রমধাস্থিত) অমৃতকূপে সংযোজনের ক্রিয়াই খেচরীমুদ্রা সাধন । এই মুদ্রা সকল সিদ্ধির জননীস্বরূপা । ক্রমমাত্রের সাধনেও ইহলোকে দিব্যভোগ ও জন্মান্তরে সংকূলে জন্মগ্রহণ হয় । চন্দ্রস্থিত অমৃত পানের জন্য সূর্য্যনাড়ীকে উর্দ্ধে ও চন্দ্রনাড়ীকে নিম্নে করিবার জন্য মস্তক ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া পদদ্বয় উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া কুস্তক করিবার প্রথাকে ‘বিপরীতকরণী’ মুদ্রা বলে ।

যোনিমুদ্রা সাধনে ধরাতলে কোন সিদ্ধির অভাব থাকে না, ইহাকে শিবসংহিতায় (৪।৬৪, ৬৫) মূলবন্ধের সহিত যুক্ত বলা হইয়াছে । ঘেরুসংহিতায় (৩।৩৭-৪৪) যোনিমুদ্রার বিশেষ বিবরণ ও তৎফল বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহাতে ষট্চক্র ভাবনা করিয়া কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করিয়া ‘হংস’ মন্ত্র দ্বারা শিবশক্তির সামরস্ত্র সাধনে আনন্দ উপলব্ধির কথা বর্ণিত হইয়াছে । ইহা পরম গোপনীয়, দেবগণেরও ছল্লভ । একবার সাধনেই ইহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় । ইহা সাধনের ফলে ঘোরতর পাপসমূহও বিনষ্ট হয়, অতএব মুমুক্শু ব্যক্তির ইহা-সাধন কর্তব্য ।

কুস্তক । চতুরঙ্গ যোগের মধ্যে অষ্টপ্রকার কুস্তক বা বন্ধ আছে । উন্নয়ন-সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদের অনুষ্ঠান কর্তব্য । ইহার অনুষ্ঠানে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয় বলিয়া ইহার নামান্তর ‘বন্ধ’ । বন্ধমধ্যে জালন্ধর, মূল ও উড্ডীয়ান বন্ধত্রয় প্রধান । জালন্ধর বন্ধে কণ্ঠ আকুঞ্চন দ্বারা

হৃদয়োপরি চিবুক স্থাপন করা বিধি। মূলবন্ধে বামপার্শ্বিত দ্বারা গুহী-প্রদেশ আকুঞ্চন করিয়া নাভিগ্রন্থি সময়ে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন ও পীড়িত করিয়া দক্ষিণগুল্ফ দ্বারা উপস্থকে দৃঢ়রূপে সংরুদ্ধ করিতে হয়। নাভির উর্দ্ধ ও পশ্চিম দ্বারকে জঠরে সমভাবে আকুঞ্চন করিয়া নিম্নস্থিত নাড়ীসমূহকে নাভির উর্দ্ধে উত্তোলন করার নাম উজ্জীয়ান বন্ধ। বন্ধমধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে অভ্যস্ত হইলে মুক্তিলাভ হয়।

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে কথিত হইয়াছে সংযমের দ্বারা যোগী কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিতে সক্ষম হন। তৎপরে উক্ত বন্ধত্রয় সাধন বিধি।

জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠে সঙ্কোচলক্ষণে ।
ন পীযুষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি ।
কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা ।
ক্রবোরন্তুর্গতা দৃষ্টিমূঢ়া ভবতি খেচরী ॥

এই মুদ্রা জরামরণজয়ী। খেচরী মুদ্রার সাধক পতনোন্মুখ বিন্দুকে বজ্রোলী সাধন দ্বারা উর্দ্ধে নীত করিতে পারেন। বিন্দু ও রজের মিলনে পরমবপু লাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি এবং চন্দ্রসূর্য্যের যোগে বাতপিত্তাদি রস শোষিত হইলে মহামুদ্রা সাধন পূর্ণ হয়।^১

উপরোক্ত বন্ধত্রয়ের কথা যোগকুণ্ডল্যুপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণে ‘মূলবন্ধ’ সিদ্ধ হয়। “কর্তব্যঃ কুস্তকো নিত্যং বন্ধত্রয়-সমন্বিতঃ”। কুণ্ডলিনী ত্রিগ্রন্থি (ত্রন্ধা, বিষু ও রুদ্রগ্রন্থি) ভেদ করিয়া সহস্রারে গমন করে। এইরূপে কুণ্ডলিনী প্রকৃতাষ্টকরূপং (পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) ত্যাগ করিয়া শিবের আলিঙ্গনে বিলীন হয়।^২

মুদ্রা, বন্ধ প্রভৃতির রহস্য কি? উত্তরে বলিতে হয়—

সংসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসংসঙ্গেষু বন্ধনম্ ।

অসংসঙ্গমুদ্রণং যং তন্মুদ্রা পরিকীর্তিতম্ ॥ (বিজয়তন্ত্র)।^৩

অতএব অসংসঙ্গ পরিত্যাগই মুদ্রা নামে কীর্তিত, অসংসঙ্গে যে বন্ধন হয় তাহা পরিত্যাগ কর্তব্য। ধ্যান, সমাধি আদিতেও মুদ্রার সহায়তা অত্যাৱশ্যক।

১। ধ্যানবিন্দু উপঃ ৭৮-৯০ শ্লোক জট্টবা।

২। যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ ১।৪০-৪১, ৪৫, ৬৭-৭০, ৭৪।

৩। অ—ক—খ চন্দ্র, সহস্রার, দৃষ্টিবিবেকী, মুদ্রাদিররহস্য; শিবনারায়ণজী শর্মা সেঙ্গই, কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃ ৬৪২।

সমাধি। হঠযোগের অন্তিম সাধনা হইল 'সমাধি'।

গোরক্ষনাথেন নাদোপাসনমুচ্যতে ॥

শ্রীআদিনাথেন সপাদকোটিলয়প্রকারাঃ কথিতা জয়ন্তি।

নাদানুসন্ধানকমেকমেব মত্তামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্।

(হ-যো-প্র ৪।৬৫, ৬৬)

শ্রীঅনাদিনাথ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সপাদকোটীপ্রকার উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ-অভিমত নাদানুসন্ধান দ্বারা লয়সাধনই মুখ্যতম।

আসনাদি দ্বারা কায়িক বিষয়সকল তাক্ত হয়; প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা মানসিক ব্যাপারও নিবৃত্ত হয়। দীর্ঘকাল এইরূপ অভ্যাসের ফলে নির্বিকার স্বরূপে যে অবস্থিতি হয়, তাহাই সহজাবস্থালভ বা জীবমুক্তি।

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, “হকারকীর্ষিতঃ সূর্য্যচন্দ্রকারশ্চন্দ্র উচ্যতে। সূর্য্যচন্দ্রমসৌর্যোগাদ্ধঠযোগা নিগততে।” ‘হ’ ও ‘ঠ’ বা সূর্য্য ও চন্দ্র বা প্রাণ-অপানের যোগই প্রাণায়াম, ইহা হইতে ক্রমশঃ সমাধি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত হঠযোগকে ‘রাজযোগ’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগও বলা হয়।

সাধক প্রথমতঃ স্থূলশরীরের ক্রিয়া সাধন দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়া শক্তিকে অন্তর্মুখী করেন এবং উহা দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকে বশীভূত করিয়া চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎকার করেন। এই সাধনপ্রণালীই হঠযোগ হইতে রাজযোগে উপনীত হইবার প্রণালী। সূক্ষ্মশরীরের তীব্র সংস্কার হইতে উৎপন্ন কণ্ঠের ভোগের জন্মই এই স্থূল শরীরের সৃষ্টি, অতএব স্থূল শরীরের কার্য্য দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব নহে।

হঠযোগপ্রদীপিকায় (৪।১৪) আছে—

চিত্তে সমত্বমাপন্যে বায়ৌ ব্রজতি মধ্যমে।

তদামরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥

চিত্ত সমত্বলাভ করিলে এই তিন মূত্রসাধন আয়ত্ত হইয়া পড়ে। এই তিন মূত্রার দ্বারা বিন্দুরক্ষা সম্ভব হয়, ফলে কালজয়ী হওয়া যায়। বজ্রোলী, সহজোলী, শব্দাদি হইতে বজ্রযান, সহজযানের স্বৃতি উদ্ভিত হওয়া স্বাভাবিক।

কথিত আছে যে, গোরক্ষ প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু তিনি সে ধর্ম ত্যাগ করেন। গোরক্ষের বৌদ্ধ সিদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত তান্ত্রিক সাধনা লইয়া মতভেদ। গোরক্ষনাথ বিন্দুরক্ষার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে তান্ত্রিক ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তাহার সাধনে দৃষ্টিভেদ আছে ইহাই বলা চলে। কারণ হঠযোগপ্রদীপিকাতে সহজোলী, বজ্রোলী ও অমরোলী নামে যে মুদ্রা সাধন বর্ণিত হইয়াছে তাহা তন্ত্রের সাধন। “বিন্দু অগণি মুষি পারা। জো রাথে সো গুরু হামারা।” ইহাই গোরক্ষের বাণী, তথাপি গোরক্ষসম্প্রদায়ে যে অমরোলী প্রভৃতি সাধন ছিল তাহার উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে বিন্দুরক্ষা, এই সাধনা অতীব কঠিন।

সহজোলিশ্চামরোলির্বজ্রোল্যা ভেদ একতঃ।

পিন্তোষণহাং প্রথমাস্থধারাং বিহায় নিঃসারযান্ত্যধারাম্।

নিষেব্যতে শীতলমধ্যধারা কাপালিকে খণ্ডমতেহমরোলী ॥^১

(গোরক্ষপদ্ধতি পৃ ৫১)

আবার গোরক্ষশতকের (ত্রীগস পৃ ৩০২ দ্রষ্টব্য) ৯৪ শ্লোক-সংখ্যা হইতে প্রাণের ষট্‌ত্রিংশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত গমনেও বজ্রোলী মুদ্রার ইঙ্গিত আছে।

সিদ্ধদের অমরোলী সাধন নিগুণীদের মধ্যেও প্রচলিত থাকায় কবীর তাহার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই নিন্দা করেন। পরবর্তী কালে ‘গুলাল’ বজ্রোলী, অমরোলী ও সহজোলী সাধনকে পঞ্চ আকাশ সমান বলিয়াছেন, —ইহা প্রশংসাসূচক।^২

বজ্রোলী সাধনে দেহে বিন্দুধারণ সম্ভব হয়, তাহা দ্বারা মৃত্যুভয় দূর হয়। সহজোলী ও অমরোলী মুদ্রা সাধন বজ্রোলীর প্রকার-ভেদ মাত্র।

হঠযোগপ্রদীপিকার (১৯৪) শ্লোকের টীকায় মৎসোন্দ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভঙ্গলেপনে সহজোলী মুদ্রা ক্রিয়াকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, এইরূপ উক্তি আছে। অমৃতসিদ্ধিতে জানা যায় যে, পুরুষের বীজ এবং

১। হ. গে. প্র. ৩২০, গোরক্ষপদ্ধতি পৃ ৫১

২। Nirguna School of Hindi Poetry, Barthwal, p. 300.

শ্রীর রজঃ এই উভয়ের বাহ্য যোগে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়, এবং উহাদের আন্তরিক যোগে মনুষ্য যোগী হইতে পারে। ইহা দ্বারাই পরমপদ লাভ হয়। কোন নারীও বজ্রোণী মুদ্রা সাধন করিলে, মূলাধার হইতে নাদ সমুথিত হইয়া হৃদয়োপরি বিন্দুর সহিত একীভূত হয় অর্থাৎ তাহার শরীরে নাদ বিন্দুতা প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে পুরুষ যোগী বা স্ত্রী যোগিনী উভয়েরই সিদ্ধি লাভ (যথা আকাশমার্গে গমন, ভূতভবিষ্যৎ-দর্শনাদি) হয় এবং শরীর রূপলাবণ্যসম্পন্ন ও বজ্রবৎ দৃঢ় হয়।

সিদ্ধেরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী হইতেন এ কথা সন্তেরাও স্বীকার করেন—

দত্ত গোরক্ষ হনবন্ত প্রহ্লাদ। সাত্ত্বো পড়িএ ন মুণিএ সাধ।

মারে মরে ন সিদ্ধ সরীর। কৃষ্ণ কাল্বসি একহি তীর ॥

অর্থাৎ দত্তাত্রেয় গোরক্ষ হনুমান, প্রহ্লাদ শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণ একবাণেই মৃত হন।^১

সমাধি সিদ্ধিতে কিরূপে উপরোক্ত মুদ্রাত্রয় সিদ্ধি হয় ও এই মুদ্রাত্রয়ের রহস্য কি তাহা রাজযোগ অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

কুণ্ডলিনীতত্ত্ব। উপর্যুক্ত মুদ্রাদি সাধনের জন্ত কুণ্ডলিনীর প্রবোধন কর্তব্য। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই মানবদেহে বিরাজিতা শিবের ‘শক্তি’। এই কুণ্ডলিনী শক্তি কিরূপ? ইহা প্রজ্জ্বলবৎ সর্পের ছায় আকৃতি বিশিষ্ট অতিশয় বক্রা ও পদ্মতন্তুর ছায় অতিশয় সূক্ষ্মা, মঙ্গলদায়িনী, সমস্ত প্রাণীর জননীস্বরূপা ও কোটি সূর্য্যের ছায় প্রভাবিতা। সূর্য্য নাড়ীর দ্বারাই এই শক্তি উর্দ্ধভাগে নীতা হন। যোগের আধারভূতা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইলে সমস্ত চক্রভেদ হয়, অতএব যোগেচ্ছু ব্যক্তি প্রথমতঃ তাহাকে জাগরিত করিয়া মুদ্রাভ্যাস করেন।

যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারং নিরাময়ং।

মুখেনাচ্ছাণ্ড তদ্বারং সুপ্তা সা পরমেশ্বরী ॥

(গোরক্ষসংহিতা ১।৪২)

অর্থাৎ যে দ্বারের দ্বারা নিরাময় ব্রহ্মদ্বারে প্রবেশ করিতে হয়, সেই দ্বার আপন মুখের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পরমেশ্বরী এই কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্তা রহিয়াছেন। তাহাকে উত্তিত করিয়া ব্রহ্মদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিলে জীবের মুক্তি হয়। এই কুণ্ডলিনীর প্রবোধন ও মুদ্রাদি সাধন

কঠিন হইলেও যথাবিধি অনুষ্ঠানে শরীর ব্যাধিমুক্ত হয়, চিত্তও নির্মল হয়।
 মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা।
 শায়িতা ভুজগাকারা সার্কত্রিবলয়ায়িতা ॥

(গোরক্ষসংহিতা ১।১০১)

যোগী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় হস্তদ্বারা রুদ্ধ করিয়া কাকীমূদ্রা দ্বারা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া, অপান বায়ুতে উহাকে সংযোজিত করিয়া, শরীরস্থ চক্রাদি ধ্যান করিয়া ‘হ্রীং হংস’ মন্ত্র দ্বারা ভুজঙ্গিনী দেবীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়া শিবের সহিত যুক্ত করেন, ইহাই যোগীর সমাধিস্থ অবস্থা। (গোরক্ষসংহিতা ১।৮৯-৯৪)

যে মূদ্রা দ্বারা যোগী মোক্ষলাভ করেন ও বিন্দুসিদ্ধ হইয়া সমস্ত সিদ্ধি তাহার করতলগত হয় তাহার নাম ‘বজ্রোলীমূদ্রা’, গোরক্ষসংহিতায় হস্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবী অবলম্বন করিয়া মস্তক শূন্যে ও পদদ্বয় উর্দ্ধে রক্তার ক্রিয়াকে বজ্রোলী মূদ্রা সাধন বলা হইয়াছে। ভোগালু হইয়াও এই মূদ্রা সাধনে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য, ভোগতৃষ্ণা পরিহার করিয়া এই মূদ্রা সাধনে মুক্তি পর্য্যন্ত লভ্য। (গোরক্ষসংহিতা ১।৯৭-১০০)

মৎস্বেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি হঠমার্গ প্রবর্তক নাথ্যাচার্যগণ ও আগমবিদগণ বলেন যে, মূলাধারে প্রস্থিত কুণ্ডলিনীকে উদ্ধুদ্ধ করিতে না পারিলে কর্ম, জ্ঞান কিম্বা ভক্তি কোনটিই মুক্তির উপায় স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে না। যে কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে সহায়তা করে, তাহাই যথার্থ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিয়োগ। তদ্বিন্ন কর্মাদি ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। তাহা সিদ্ধিদায়ক হইতে পারে না। কুণ্ডলিনীর নিজাভঙ্গ ব্যতীত আত্মা অথবা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে।

কুণ্ডলিনী তত্ত্ব বা কুণ্ডলিনীবাদ কোন নূতন বাদ নহে। যে শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বিद्यমান আছে, তাহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। ইহার চৈতন্য সম্পাদনে ইহা নিরাধার হয়, তৎকালে জাগতিক সকল বস্তুই নিরাধার হয় ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে, ‘সর্বং খবিদং ব্রহ্ম’ বোধ হয়। এই জাগরণ ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়—কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই জাগরণের অবস্থাভেদ মাত্র। পূর্ণ জাগরণে পরিপূর্ণ অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, তাহার পূর্বে দ্বৈতক্ষুদ্ভি অবশ্যস্তাবী। তদ্বশান্ত্রে পূর্ণজাগরণই ‘পূর্ণহস্তা’ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।’

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

মহীং মূলাধারে কাপি মণিপূরে হৃতবহং ।
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমূপরি ॥
মনোহপি ক্রমধ্যে সকলমণি ভিদ্ধা কুলপথং ।

সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি ॥ (আনন্দলহরী)

অর্থাৎ হে দেবি! তুমি কুণ্ডলিনীস্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরচক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্রস্থিত বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধচক্রস্থিত আকাশমণ্ডল, ভ্রূয়মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত মনঃচক্র, এই ষট্চক্রভেদ করিয়া কুলপথ দ্বারা সহস্রারে গমন করিয়া পতির সহিত একান্তে বিহার কর । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শরীরমধ্যে মূলাধারে ভূলোক, স্বাধিষ্ঠানে ভুবলোক, মণিপূরে স্বলোক, অনাহতে মহলোক, বিশুদ্ধে জললোক, আজ্ঞায় তপোলোক, সহস্রারে সতালোক আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় । ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় ঘটনা ঘটে এই দেহমধ্যেও সেই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে এইরূপ অনুভূতি যোগিগণের যোগসাধন-সাপেক্ষ । মহাকুণ্ডলিনীর সাহায্য ব্যতিরেকে যোগীর পক্ষেও শিবস্থান বা ব্রহ্মপদ লাভ করা কঠিন ।

হঠযোগে সিদ্ধির লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

বপুঃ কুশলং বদনে প্রসন্নতা
নাদক্ষুটং নয়নে স্তূর্ণিশ্চলে ।
অরোগতা বিন্দুজয়োহগ্নিদীপনঃ
নাড়ীবিভক্তি হঠযোগলক্ষণম্ ॥^১

শ্রীআদিনাথ-উপদিষ্ট হঠযোগবিদ্যা গ্রন্থে রাজযোগ লাভের নিমিত্ত হঠযোগের আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে । হঠযোগসিদ্ধির শরীর কুশ ও বদন প্রসন্ন হয়, তাহার বাক্য অতি স্তূর্ণশব্দ ও নয়নযুগল নিঃশব্দ হইয়া থাকে, শরীরে রোগ থাকে না, শারীরিক অগ্নির দীপ্তি হয় ও নাড়ী শুদ্ধ হয় । এইরূপ হইলেই হঠযোগ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় ।

লয়যোগ

চিদ্রূপ দ্বারা মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্যলাভের নাম 'লয়যোগ' ; ইহাই হঠ ইত্যাদি যোগেরও চরম উদ্দেশ্য । প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন

ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড একই সম্বন্ধে আবদ্ধ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি মাত্র ভেদ। ঋষি, দেবতা, পিতর, গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, প্রকৃতি ও পুরুষ সকলেরই স্থান সমরূপে ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডে বর্তমান। অতএব পিণ্ডজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান হইতে পারে। গুরুপদেশে পিণ্ডের জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতিকে পুরুষে লয় করাই লয়যোগের সাধন। অঙ্গিরা, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ, বেদব্যাসাদি লয়যোগের সাধক ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রণালী এক ছিল না।

যোগশাস্ত্রে লয়যোগের নবান্ন বর্ণিত হইয়াছে,—যম, নিয়ম, স্থূল-ক্রিয়া, সূক্ষ্মক্রিয়া, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, লয়ক্রিয়া ও সমাধি ইহারাই নব অঙ্গ। স্থূলক্রিয়া অর্থে স্থূলদেহের ক্রিয়া, বায়ুপ্রধান ক্রিয়ার নাম সূক্ষ্মক্রিয়া, জীবমুক্ত সাধকের উপদেশে প্রাপ্ত ক্রিয়ার নাম 'লয়ক্রিয়া'। হঠযোগের প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রাদি সাধন স্থূলক্রিয়ার মধ্যে স্বল্পাধিক আছে।

প্রত্যাহারের সিদ্ধি আরম্ভ হইলে যোগীর নাদশ্রবণ আরম্ভ হয়, লয়ক্রিয়া সাধনে শরীরস্থ ঘটচক্রের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান সাহায্যে সাধন আরম্ভ হয়। কুলকুণ্ডলিনীকে শিবশক্তির সংযোগস্থলে সহস্রারে উপনীত করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়, জীবের শিবত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহাই লয়ক্রিয়ার সাধনে মহাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মে লীন করার সাধন। বহিরিন্দ্রিয় বশের সাধনই 'যম', অন্তরিন্দ্রিয় বশের সাধন 'নিয়ম'।

লয়যোগের ধ্যানের নাম 'বিন্দুধ্যান', কারণ যোগী সাধন করিতে করিতে প্রকৃতির সূক্ষ্মরূপকে বিন্দুরূপে দর্শন করেন। এই ধ্যান সাধনে ক্রমশঃ যে সমাধি হয় তাহার নাম 'মহালয়', ইহার বৈশিষ্ট্য স্বরোদয়ের সূক্ষ্মক্রিয়া, ঘটচক্রভেদ ইত্যাদি।

সুপ্তা কুণ্ডলিনীর জাগরণে শিবত্বলাভ হয়, তাহার সুপ্তিতে সংসার উৎপন্ন হয়।

জীবমুক্তোপদেশেন প্রোক্তা সা হি লয়ক্রিয়া।

লয়ক্রিয়াসাধনেন সুপ্তা সা কুলকুণ্ডলিনী।

প্রবুদ্ধয় তস্মিন্ পুরুষে লীয়তে নাত্র সংশয়ঃ।

শিবত্বমাপ্নোতি তদা সাহায্যাদস্ত সাধকঃ ॥

লয়ক্রিয়ায়াঃ সংসিক্তৌ লয়বোধঃ প্রজায়তে।

সমাধির্ধেন নিরতঃ কৃতকৃত্যো হি সাধকঃ ॥

লয়যোগীর কৃতকৃত্যতা নিশ্চিত। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া লয়যোগ সাধন করিতে সমর্থ হইলে যোগীর পক্ষে সিদ্ধিসকল সুলভ হয়।

লয়যোগ-সংহিতায় আছে —

ষট্চক্রং ষোড়শাধারাদ্বিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্ ।
পীঠানি চোনপকাশজ্জাহ্না সিদ্ধিরবাধ্যতে ॥
সমাধিসিদ্ধির্ধানস্ত সিদ্ধিশ্চাপ্যনয়া ভবেৎ ।
আত্মপ্রত্যক্ষতাং যাতি চৈতয়া যোগবিজ্ঞনঃ ॥

ষট্চক্র, ষোড়শাধার, ব্যোমপঞ্চক, ঊনপকাশপীঠ জানিলে লয়যোগে সিদ্ধি হয়। লয়ক্রিয়া দ্বারা ধ্যানসিদ্ধি, সমাধিসিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

মন্ত্রযোগে রূপকল্পনা দ্বারা ধ্যান বিধি, হঠযোগে জ্যোতিঃকল্পনা বিধি, লয়যোগে কোন বিধি নাই—সাধন দ্বারা অন্তরঙ্গগতে যে বিন্দু দর্শন হয়, তাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান কর্তব্য। লয়যোগী স্বপিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে সক্ষম, কারণ লয়যোগের সিদ্ধান্তানুসারে সমষ্টিরূপা ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টিকরূপী পিণ্ডই পূর্ণস্বরূপ।^১ অন্তত আছে—

নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং ।
অদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥^২

সিদ্ধিসিদ্ধান্তসংগ্রহে বর্ণিত হইয়াছে—

নবাক্ষং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং ।
সমানং যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥

দ্বিতীয় উপদেশ ৪৮ শ্লোক।

সিদ্ধিসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে (২।৩১) কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয় (নিবন্ধের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

নাথমার্গে নবচক্রের কথা আছে, ষোড়শাধার প্রভৃতির বর্ণনাও আছে। যথা—

নবচক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, তালুকা (ললনা), অাজ্ঞা, ব্রহ্মরন্ধ্র ও সহস্রার।

ষোড়শাধার—অঙ্গুষ্ঠ, পাদমূল, গুহাদেশ, লিঙ্গমূল, জঠর, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, জিহ্বাগ্র, তালু, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, নাসাপুট, ক্রমধ্য ও নেত্র।

১। যোগচতুষ্টয়, কল্যাণ সাধনাক্ষ ১ম খণ্ড পৃ ১০২ ইত্যাদি।

২। তাত্ত্বিক সাধন, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, কল্যাণ সাধনাক্ষ, ১ম খণ্ড পৃ ৪২৪।

ত্রিলক্ষ্য—স্বয়ম্বুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ ।

পঞ্চবোম—আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ ।

ত্রিলক্ষ্য মধ্যে অন্তর্লক্ষ্য, বহির্লক্ষ্য ও মধ্যলক্ষ্য বর্ণিত হয় । এই ত্রিবিধ লক্ষ্য অবলম্বনে ক্রমধ্যে তারক জ্যোতির্দর্শন হয় । অন্তর্লক্ষ্য বা কুণ্ডলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার, বহির্লক্ষ্য বা নাসাগ্র হইতে চারি বা ছাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত নীল ও পীত বহুল আকাশ দর্শন, মধ্যলক্ষ্য বা নিকটবর্তী অন্তরীক্ষে সূর্য্য, চন্দ্র বা বহির জ্বালা দর্শন হয় । মধ্যলক্ষ্যের অভ্যাসবশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় ।

শ্রুতি বলেন, অদ্বয়ব্রহ্মলাভার্থে ত্রিলক্ষ্যের অনুসন্ধান কর্তব্য, তৎসিদ্ধৌল্লক্ষ্যত্রয়াণাং সন্ধানং কর্তব্যম্ ।^১ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করিবার জন্মই ‘তারক’যোগ অবলম্বন কর্তব্য । তারকযোগ দ্বিবিধ—পূর্ব্ব ও উত্তর । মনোযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি তারকযোগের প্রকাশক । অমনস্ক বা মনোবিলীন অবস্থাই উত্তর তারক । পূর্ব্বতারকের দ্বিবিধ ভেদ আছে, মূলাধার হইতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত মূর্ত্তিতারক, আজ্ঞা হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত অমূর্ত্তিতারক ।

তত্তারকং দ্বিবিধং মূর্ত্তিতারকম্ অমূর্ত্তিতারকং চেতি ।

অদ্বয়তারকোপনিষৎ, ১০ শ্লোক ।

প্রথমটীর অভ্যাসে তালুমূলের উর্দ্ধে বিরাট জ্যোতি দর্শন হয়, তাহা চৈতন্যস্বরূপ । ইহা দ্বারা অষ্টসিদ্ধিলাভ হয় । অমনস্ক উত্তর তারক-যোগের পরিপক্ক অবস্থাই ‘শান্তবীমুদ্রা’, হঠ ও তন্ত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসা আছে । ‘অমনস্কে’ আছে—

ইন্দ্রিয়ানি দশ প্রাণা জুহোতি জ্যোতির্শ্মণ্ডলে ।

তন্মূলাদিদ্ব্যুপর্য্যন্তং বিভাতি জ্যোতির্শ্মণ্ডলং ॥

একৈব শান্তবীমুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব ।

অন্তর্লক্ষ্যে বহির্দৃষ্টি নিমেষোন্মেষবর্জ্জিতা ॥^২

শ্রুতিতে আছে, “দেহস্ত পঞ্চ দোষা ভবন্তি কামক্রোধনিরন্ধাস-ভয়নিজা ।”^৩ ইহাদের অতিক্রম করা কর্তব্য । সংসারে সমুদ্র তীর্ণ হইবার জন্ম তারকব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে হইবে—সেই তারকজ্ঞানই ‘প্রণব’ । “যোগশাস্ত্রোপদিষ্টং তারকং জ্ঞানং তথা চ সর্ব্বশকার্যপ্রকৃতি-

প্রণবোহপি সৈব।”^১ ক্রমধ্যে তারকব্রহ্মের উপলব্ধির নিমিত্ত ত্রিলোক্যের সাধন করিতে হয়।

পঞ্চ আকাশের বা ব্যোমপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত হয়—
বাহ্যভ্যন্তরম্ অক্ষকারময়ম্ আকাশম্। বাহ্যস্তাভ্যন্তরে কালানলসদৃশং
পরাকাশম্। সবাহ্যভ্যন্তরেহপরিমিতজ্যোতির্নিভং তদ্বং মহাকাশম্।
সবাহ্যভ্যন্তরে সূর্যানিভং সূর্য্যাকাশম্। অনির্বচনীয়জ্যোতিঃ সর্বব্যাপকং
নিরতিশয়ানন্দলক্ষণং পরমাকাশম্।^২

নবচক্রং ষড়্ভাধারং ত্রিলোক্যং ব্যোমপঞ্চকং।

সম্যাগেতন্ন জানাতি স যোগী নামতো ভবেৎ ॥

মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের শেষ অংশে এইরূপ উক্তি আছে।

চক্র। তন্ত্রে ষট্চক্র, নবচক্র আদি বর্ণনা পাওয়া যায়। সুব্রূনা
নাড়ীর মধ্যে ছয় চক্রের অবস্থান কল্পিত হয়। এই চক্রসকল বিভিন্ন
নাড়ীর মিলনকেন্দ্র। মানবদেহে সার্কি-তিনলক্ষ নাড়ী বিद्यমান, তাহাদের
বিভিন্ন গ্রন্থিসকলই ‘চক্র’ নামে খ্যাত। সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত
করিয়া চক্রপথে উর্দ্ধে নীত করাই তন্ত্রের সাধন। কুণ্ডলিনীশক্তি
বান্ধেবী অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী বীজমন্ত্রস্বরূপা। ইহাকে উর্দ্ধে নীত করাই
ষট্চক্রভেদরূপ ক্রিয়া। ইহা তন্ত্রের অস্ত্রধাণের প্রধানতম অঙ্গ।
বহির্ধাণ অর্থে ধূপধূনাদি উপকরণ দ্বারা পূজা। অস্ত্রধাণে মানস উপচার
কল্পনা আছে, যথা—পৃথিবীকে গন্ধ, আকাশকে পুষ্প, বায়ুকে ধূপ,
তেজকে দীপ, জলকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া সাধন আছে। ষট্চক্রভেদও
ইহার অঙ্গস্বরূপ।

নাথমতে “নবচক্রাণি দেহেহস্মিন ভবন্তীতি বিনিশ্চিতম্” বলা হয়।^৩
এই নবচক্র যথাক্রমে মূলাধার, তদুর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান নামক চতুর্দলচক্র,
নাভিতে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, তালুচক্র, রাজদণ্ডে ঘটিকা,
‘শূন্য’ মনোলয় কার্য্যে ধ্যেয়, সহস্রার বা ব্রহ্মচক্র। এই স্থানে ‘হংস’মন্ত্র
ধ্যানে তন্ময়তা প্রাপ্তি হয়। ইহাই গোরক্ষ সম্প্রদায়ে প্রচলিত ‘নবচক্র’।

এই বর্ণনার মধ্যে ‘আজ্ঞা’র উল্লেখ নাই।

নাথমতে ষোড়শাধার। পাদাদ্বৈত, পার্শ্বি (গোড়ালি), মূলাধার,
স্বাধিষ্ঠান, সর্বশরীরের নাভ্যাধার, নাভি (মণিপুর), হৃদয়, কণ্ঠ,

১। বেদানান্ত বাস্তবিকং স্বরূপম্, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, পৃ ৪।

২। মণ্ডলব্রাহ্মণ উপ. ৪।১-৪

৩। সি. সি. স. ২য় উপদেশ

ঘটিকাসহ জিহ্বার স্পর্শ, তালুম্লে জিহ্বার প্রবেশ, রসাধারে জিহ্বাগ্রস্পর্শ, উর্দ্ধরদ (দন্ত), নাসিকাগ্র, নাসামূল, ক্রমধ্য ও নয়নাধার।’

পূর্বোক্ত প্রচলিত ষোড়শাধার বর্ণন হইতে এই বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ভেদ দ্রষ্টব্য।

নাথমতে নবচক্র। গোরক্ষ-অনুমোদিত চক্র বর্ণন তন্ত্র ও হঠযোগের বর্ণনা হইতে ভিন্ন। বিরাটপুরাণের পুঁথি ও একটি চক্রের চিত্র অবলম্বনে তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে মূলাধারে রক্তবর্ণ ‘আধারচক্র’—গণেশ ও তাঁহার দুই শক্তি সিদ্ধি ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠাতা, এই চক্র তন্ত্রের মূলাধার চক্রের অনুরূপ। কিন্তু দ্বিতীয় চক্র ‘মহাপদ্ম চক্র’—ইহার অধিষ্ঠাতা নীলকণ্ঠ, ইহা তন্ত্রে নাই। তৃতীয় ‘স্বাধিষ্ঠান চক্র’ ইহার দেবতা ব্রহ্মা ও শক্তিসাবিত্রী। স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর মধ্যে তিনটি কেন্দ্র আছে—ষড়্দল সুষুম্না চক্র, গর্ভ ও কুণ্ডলিনী (ইহার দেবতা অগ্নি, কটিদেশের নিকট ইহার অবস্থান)। নাভিস্থানে মণিপুর, ইহার দেবতা বিষ্ণু, ইহার উর্দ্ধে ‘লিঙ্গচক্র’, তাহার বর্ণনা নাই, তদুর্দ্ধে মনের স্থান বা ‘মনস্’। অনাহতের স্থান হৃদয়ে, ইহা দ্বাদশদল পদ্ম, দেবতা মহাদেব, উমা তাঁহার শক্তি। ইহার ঋষির নাম হিরণ্যগর্ভ। ইহা কারণদেহ, সুষুম্না, পশুন্তী বাক্ ও সামবেদের অনুরূপ।

তৎপরে কণ্ঠে ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্র, ইহা ধূমবর্ণ, জীব ও আত্মাশক্তি ইহার অধিষ্ঠাতা, ইহার ঋষি বিরাট। ইহা সুষুম্না, পরাবাক্, অথর্ববেদ, জালন্ধরবন্ধ ও সায়ুজ্যমুক্তির অনুরূপ। গলস্থানে (ইহা যোগসূত্র ৩৩০ বর্ণিত কণ্ঠকূপে) ৩২দল পদ্ম, উদ্যোতবর্ণপ্রভা ‘প্রাণচক্র’ বিद्यমান, ইহা প্রাণনাথ ও পরমাশক্তির অধিষ্ঠান। ইহাই মানবদেহের ‘দশম ছয়ার’। বিশুদ্ধের উপরে ও আজ্ঞার নিয়ে চারিটি চক্রের মধ্যে দ্বিতীয়টি ‘অবলাচক্র’ ৩২দল পদ্ম অরুণোদ্যোতপ্রভা, অগ্নি ইহার দেবতা। ইহার অবস্থিতি ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ৰাশ্বির মিলনস্থানে অনুমিত হয়। ইহা কালচক্র যান ও যোগিনীচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

মুখে চিবুকের নিকটে ‘চিবুক চক্র’ আছে, উহা ৩৪দল পদ্ম, সূর্যের দ্বায় উজ্জ্বল, প্রাণ ও সরস্বতী ইহার অধিষ্ঠাতা। ঐ পদ্মমধ্যে সকল দেবতার আসন আছে, উহার ঋষির নাম ‘ক্রোধ’, মনুষ্যের ভাষার ইহাই

উৎপত্তিস্থল বলিয়া বিবেচিত হয়। আজ্ঞার নিম্নে নাসিকাদেশে 'বলবান্ চক্র'। ইহা শ্বেত রক্ত ও গাঢ়বর্ণের ত্রিদল পদ্ম, ইহাই 'ত্রিবেণী' বা ত্রিনাড়ীর সঙ্গমস্থল। প্রণব ও তাহার শক্তি সুষুম্নার ইহা অধিষ্ঠান। 'অ-উ-ম' এই স্থানের সহিত যুক্ত। ইহার ঋষি মহাহঙ্কার। (ইহা কি ত্রিক ও ত্রিপুরাদর্শনের 'পূর্ণাহস্তা' ?)

প্রচলিত আজ্ঞাচক্র পুঁথিতে 'অগ্নিচক্র'রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ব্রহ্মধামে অবস্থিত, মাণিক্যবর্ণপ্রভা, দ্বিদলপদ্ম, হংসদেবতা ও সুষুম্না শক্তির অধিষ্ঠান। ইহা বিজ্ঞান অবস্থা, অনুপম বাক্ ও প্রণবের অর্দ্ধ-মাত্রার অনুরূপ। কর্ণের নিম্নে কর্ণমূল চক্র ৩৬ দল মিশ্রবর্ণের পীত পদ্ম, নাদ ও তৎশক্তি ঋতির অধিষ্ঠান ও ৩৬ মাতৃকার আসন। 'ত্রিবেণী চক্র' উর্দ্ধে অবস্থিত, ২৬ দল পদ্ম, ইহার ঋষি 'আকাশ', ইহাই প্রকৃত ত্রিবেণী—কিন্তু নিম্নের বলবান চক্রের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার কোন উল্লেখ নাই। কপালে ৩২ দল 'চন্দ্রচক্র' রক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চন্দ্র ও তৎশক্তি অমৃতের অধিষ্ঠান (পুঁথিমাতে শক্তি 'অমদা')। ইহার ঋষি ১৬ কলা সহ 'মনস্'। প্রবাদ আছে, সূর্য্য এই চন্দ্রলোকে অমৃত পান করিতে যান। এই চন্দ্রের সহিত অমৃতচক্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহা ঐদেশেই সামান্য উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার দেবতা ও শক্তি পূর্ব্বের চক্রের ন্যায়, কেবল ঋষি 'আত্মা', মনস্ নহে; এই স্থান হইতে অমৃতক্ষরণ হয়। ইহা 'কামধেনু' নামক গায়ত্রীর আবাস, ইহার চারি স্তন—অম্বিকা, লম্বিকা, ঘটিকা ও তালিকা। ইহার মুখ মনুষ্যের ন্যায়, মদনেত্র, ময়ূরপুচ্ছ, অশ্বগ্রীবা, হস্তিশুণ্ড, শার্দূলহস্ত, গোশৃঙ্গ, পক্ষদ্বয় লীলাব্রহ্ম ও হংস,—ইহার এই অদ্ভুত চিত্র। ধেনুর স্তন হইতে অবিরত অমৃতধারা বর্ষিত হইতেছে। খেচরী ও বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা তাহা রক্ষা করিয়া যোগী অমর ও কালজয়ী হন। তৎপরে ললাটের উর্দ্ধে ব্রহ্মদ্বারচক্র, ইহা ১০০ দল পদ্ম, রামধেনুর বর্ণে রঞ্জিত, ইহার উর্দ্ধে অকুলকুণ্ডলিনীর আসন, তাহা নবসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ৬০০ দল পদ্মবিশেষ। ইহা অতিক্রম করিয়া মূর্দ্ধস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌছান যায়, তথায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ১০০০ দল পদ্ম আছে, ইহাই সহস্রার, গুরু ও চৈতন্য শক্তির আবাসস্থান এবং সাধকের লক্ষ্য।

এই স্থানে চক্রের শেষ হইবে এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু সহস্রারের উর্দ্ধে ছয়টি চক্র রহিয়াছে উর্দ্ধরক্ত, ভ্রমরগুহা, পুণ্যাগার,

কোহ্লাট, বজ্রদণ্ড ও নিরাধার। পুঁথিতে উর্দ্ধরন্ধকে তালুচক্র বলা হইয়াছে। ইহা তালিকায় অবস্থিত ৬৪ দল পদ্ম, গোরক্ষ ও সিদ্ধাস্ত শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত।

ভ্রমরগুহা বা অলেখ (অলক্ষ্য চক্র) পুঁথিতে 'ব্রহ্মচক্র'—১০৮ দল পদ্ম মহামোনীরা এইস্থানে অবিরত জপ করিতেছেন। এই স্থানে 'সমাধি' আরম্ভ হয়, প্রাণমনের কার্য্য রুদ্ধ হয়। এই পদ্মের দশলক্ষ দল, ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল, ইহার দেবতা অলক্ষ্যনাথ, শক্তি মায়া, ঋষি মহাবিশ্ব।

পুণ্যাগারের লক্ষ দল, দেবতা অকলনাথ, শক্তি অকলেশ্বরী, ঋষি অকল। কোহ্লাট চক্রে বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠ, ইহা শিখামণ্ডলে অবস্থিত, ইহা পরম শূন্যের মার্গ, দেবতা অচিন্ত্যনাথ, শক্তি অব্যক্ত।

বজ্রদণ্ডের বর্ণনা অস্পষ্ট, ইহা মহাবিশাল স্তম্বরূপ। শেষচক্র নিরাধার, অসংখ্য দল বিশিষ্ট, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, মাতৃকা, দেবগণ ও সৃষ্টি সকলের অধিষ্ঠান ও গুরুদেবের শ্রেষ্ঠতম আসন।

ইহার উর্দ্ধেও বিংশসংখ্যক শূন্য আছে, তাহাদের বিবরণ নাই। পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ২১টি ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে পরমশূন্য স্থানে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। পরমশূন্য অতিক্রম করিলে যোগী গতাগতি হইতে চিরতরে নিবৃত্ত হন ও সেই জ্যোতির মধ্যেই যুগে যুগে অবস্থান করেন।

উপরোক্ত বিবরণ প্রচলিত তন্ত্রমত হইতে ভিন্ন। স্বচ্ছদসংগ্রহ, অদ্বৈতমার্গ ও প্রভৃতিতেও ৩২টি চক্রের বর্ণনা আছে। সহস্রারকে সর্বোচ্চ চক্র বলা হয় না, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের সহিত এ সম্বন্ধে মিল আছে। উপরোক্ত বিবরণে 'মানসচক্র'র ৩২টি দল বলা হইয়াছে, অত্যাঁত্র ইহার ছয়টি মাত্র দলের বিবরণ আছে।*

উপরোক্ত অকুলকুণ্ডলিনীই তন্ত্রের সহস্রারের স্বক স্বরূপ ও পরব্যোমে (মস্তিষ্কের অংশবিশেষ) অবস্থিত অমৃতস্রাবের স্থানবিশেষ। গোরক্ষমতে ইহার উর্দ্ধে অমৃতচক্র হইতে অমৃতস্রাব হয়।

ভ্রমরগুহা, সন্তুসম্প্রদায়ে থাকিলেও ইহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই, ব্রহ্মরন্ধ্র রূপেই ব্যবহার প্রচলিত। ইহার দ্বারমুখ অন্ধকার, চতুর্দিক জ্যোতিঃপূর্ণ, সাধকের দৃষ্টি তাই রুদ্ধ হয়। সংযম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সাধক

* ১। Serpent Power, p. 146; B. N. Seal—Pos. Sc: s of the Ancient Hindus. p. 221.

গুহাদ্বার উন্মুক্ত দেখিতে সক্ষম হন। তখন সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।^১

ষট্চক্রসাধন। ষট্চক্রসাধনে মানবের মন অতিস্থূল তত্ত্ব হইতে অতীন্দ্রিয় পরমসূক্ষ্ম তত্ত্বে উপনীত হয়, এই নিমিত্ত তত্ত্বে ষট্চক্র সাধনের বিশেষ আদর। শঙ্করাচার্য্যের আনন্দলহরীতে কুণ্ডলিনীতত্ত্বের বিষয় আছে, কুণ্ডলিনীশক্তি ষট্চক্রভেদ করিয়া কুলপথ দ্বারা সহস্রারে গমন করিয়া পতির সহিত একান্তে বিহার করেন। Arthur Avalon আনন্দলহরীর অনুবাদ করিয়া নাম রাখিয়াছেন 'Wave of Bliss,' ইহাতেও উক্ত হইয়াছে কুণ্ডলিনীর অষ্ট অঙ্গ আছে, ষট্চক্র তাঁহার বিশ্রাম করিবার স্থানস্বরূপ, কিন্তু সহস্রারই তাঁহার 'কারণ' স্থান অর্থাৎ স্থায়ী বাসস্থান। তদ্ব্যতীত 'শিব' তাঁহার পতিস্বরূপ আছেন, ইহারাই কুণ্ডলিনীর অষ্ট অঙ্গ।^২ পূর্ণানন্দস্বামী কৈবল্যকালিকাতন্ত্র অবলম্বনে তাঁহার 'ষট্চক্রনিক্রমণ' রচনা করেন, কমলাকান্তও তাঁহার 'সাধকরঞ্জে' স্বানুভূতি হইতে ও শাস্ত্রানুমোদিত চক্রের বিবরণ দিয়াছেন।^৩ মহিম-স্তব, আনন্দলহরী, বিবেকচূড়ামণি, পাণ্ডুকাপঞ্চকস্তোত্র, Serpent Power প্রভৃতিতে চক্রাদির যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে গোরক্ষ-অনুমোদিত চক্রবর্ণনার ভেদ দৃষ্ট হয়। গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে, গোরক্ষ-সিদ্ধাস্তপদ্ধতিতে নবচক্রের বর্ণনা আছে, কিন্তু বিরাটপুরাণ ও একটী চিত্র অবলম্বনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের যে চক্রের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে ষট্চক্র ব্যতীত মহাপদ্ম, প্রাণচক্র, চিবুকচক্র প্রভৃতি বিবিধ চক্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীহট্ট, কোহ্লাট, ত্রিকুট, ওড়পীঠ, অমরগুহা ও ব্রহ্মরক্ত্র নামক ষট্চক্রের অবস্থান সহস্রারের উল্লে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের সামষ্টিক নাম 'সোমচক্র'। এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে মৎস্যেন্দ্র-রচিত 'যোগবিষয়' পুথিতে শ্রীহট্ট, কোহ্লাট প্রভৃতি চক্রের বর্ণনা আছে।^৪ যথা—

ত্রিকুটং ত্রিহটা চৈব গোহ্লাটং (কোহ্লাট ?) শিখরং তথা।

ত্রিশিখং বজ্রমোদ্ধার মূৰ্ধনাথং আবোমুখম্ ॥

১। System of Chakras, according to Gorakhnath, S. B. S. Vol. II, pp. 83-92

২। Wave of Bliss, Arthur Avalon, p. 7

৩। কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন, সা.প. মন্দির, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী দত্ত।

৪। যোগবিষয় ২০, ২১ শ্লোক (পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট)।

আকুঞ্চয়েদ্ রবিং চৈব পশ্চাৎ নাড়ী প্রবর্ততে ।

ভেদে ত্রিহট সংঘদমুভয়ো... ? দর্শনম্ ॥ ২০, ২১ শ্লোক ।

ষট্চক্রসাধন গুরুসাপেক্ষ, কারণ সকল সাধক এক ভাবাপন্ন নহেন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ষট্চক্র বর্ণন আছে । সাধারণতঃ মূলাধার পৃথিবীতত্ত্ব ও গন্ধতন্মাত্রের স্থান, মণিপুর বহ্নিতত্ত্ব ও রূপতন্মাত্র, অনাহত বায়ুতত্ত্ব ও স্পর্শতন্মাত্র, বিশুদ্ধ আকাশতত্ত্ব ও শব্দতন্মাত্র এই ধারণা করা হয় । পঞ্চ চক্র পঞ্চভূতাত্মক, স্থূল তত্ত্বের লয় সূক্ষ্ম তত্ত্বে হইয়া থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় অগ্নিতে, অগ্নির লয় বায়ুতে ও বায়ুর লয় আকাশে হয় । এইরূপে কুণ্ডলিনী এক তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে নীত হন ।

সাধকরঞ্জে উক্ত হইয়াছে—

শুনি কামিনীর ভাষা

যোগীন্দ্র করয়ে আশা

আমি কোন কীটের সমান

জানি এ সকল কৰ্ম্ম

তথাপি তেজিয়ে কৰ্ম্ম

কুল দিতে করিছি পয়ান ॥’

সাধক কমলাকান্ত বলিতেছেন, ‘কামিনী’ অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর প্রাপ্তির আশাতেই আমি সকল কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি ।

কমলাকান্ত পঞ্চ একে একে সকল চক্রের (সাধকরঞ্জন গ্রন্থে) আলোচনা করিয়াছেন, পূর্ণানন্দ গঢ়াাকারে ষট্চক্রনিক্রমণম্ রচনা করেন । পূর্ণানন্দের মতে সুষুম্নানাড়ী মূলাধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, তন্মধ্যে বজ্রা নাড়ী এবং তন্মধ্যেও সূক্ষ্মা চিত্রিণী নাড়ী আছে, যোগিগণ উহা জানিতে পারেন, উহা আজ্ঞাচক্রস্থ প্রণবের জ্যোতিতে সর্বদা দীপ্তিশালিনী, উর্ণনাভ-সূত্রের দ্বায় সূক্ষ্ম এবং বোধস্বরূপা । এই নাড়ীমধ্যে যে বিবর আছে তাহার নাম ‘ব্রহ্মনাড়ী’, এই পথে কুণ্ডলিনী পতির নিকট গমনাগমন করেন । মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী বিহার করেন, তিনি পঞ্চাশৎ অক্ষরময়ী ।

গীতায় আছে, ‘নবদ্বারপুরে দেহী’, কিন্তু তন্মধ্যে দশমদ্বার আছে । এই দশমদ্বার মানবদেহে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, নিত্য যোগাভ্যাসের ফলে তাহা মুক্ত হয় । কৰ্ম্মমুক্ত জীবের এই পথেই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয় ।

দশদ্বার নিরূপণে কমলাকান্ত বলিয়াছেন—

কায়া মন্দির দশ দুয়ার। একটি দুয়ার জানা ভার ॥

দুই চক্ষু দুই নাসা। দুই কর্ণ এক ভাষা ॥

গুহু আর লিঙ্গ নয়। এক দ্বার গোপনে রয় ॥

সেই দ্বারে মনের বাসা। তাই নিলে পূর্ণ আশা ॥

কমলাকান্ত কথা মান। সেই স্থানটির মর্থ জান ॥ (পৃ ৪৬)

বিশুদ্ধ চক্রের উর্দ্ধে ত্রিনাড়ীর সঙ্গমস্থল আছে, এই স্থান হইতে সুষুম্না মস্তিষ্কমধ্যে প্রবেশ করে, এবং ইড়া-পিঙ্গলা দক্ষিণ ও বাম কপালে যাইয়া সুষুম্নার সহিত ক্রমধ্যে মিলিত হয়। এই স্থান হইতে ইড়া বাম নাসিকায় ও পিঙ্গলা দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্না দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি নিম্নমুখী হইয়া ক্রমধ্যে আসে ও আঙ্গা ভেদ করিয়া সরল পথে ইড়া-পিঙ্গলার সহিত মিলিত হয়, তৎপরে বাহিরে আসিয়া সরল পথে উর্দ্ধমুখী হইয়া ললাটমধ্যে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র ভেদ করিয়া আবার নিম্নমুখী হইয়া পুনরায় বক্রাকারে সহস্রারে উঠে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে।^১ দ্বিতীয়টি মস্তিষ্ক হইতে সরল পথে উর্দ্ধে ‘শিখর’ পর্য্যন্ত যায়, সামান্য বক্রাকারে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে। এই দ্বারটি প্রায়শঃ রুদ্ধ থাকে, প্রথম দ্বারটি উন্মুক্ত থাকে। অতএব দুইটি মার্গের ছিদ্রপথ এক নহে। দেহত্যাগ কালে যোগী সুষুম্নার রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দুইটি ছিদ্রপথ এক করিয়া দেন, ইহাই ‘দশমী দুয়ার’ নামে পরিচিত।

অমরৌঘশাসন গ্রন্থে দশমী দুয়ারকেই শঙ্খিনীদ্বার বলা হইয়াছে—
ইহা রাজদন্তবিবরে অবস্থিত।^২ কঙ্কালমালিনী তন্নে শঙ্খিনীর নিম্নে ব্রহ্ম-
রন্ধ্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। কমলাকান্তও বলিয়াছেন—

শূন্যদেশে শঙ্খিনী তাহাতে আছে গাথা।

কমল সহস্রমুখ অধোমুখ জার।

পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার।^৩

রাধাস্বামী সম্প্রদায় মতে মস্তিষ্ক মধ্যে যে ফাট আছে তাহাতে দ্বাদশ দ্বার আছে, তাহাদের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের ছয় চক্র ও চৈতন্যদেশের ছয় ধামের যোগ আছে। সাধন দ্বারা এই অন্তর্নিহিত দ্বারসকলের অনুসন্ধান

১। Ser. Power, p 130.

২। “যটাকোটি কপোল কোটির কুটী জিহাও মধ্যাশ্রয়স্থিতা গতাঃ রাজদন্তবিবরে প্রাপ্তোঽধি-
বক্তেণ যৎ।” অমরৌঘশাসন ২৪ শ্লোক।

৩। কমলাকান্তের সাধকরত্ন, পৃ ৩০।

করা কর্তব্য। এই রত্নসকল দ্বারাই অন্তরস্থ শক্তির সহিত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সকল ধামের সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব।^১

পীঠ। যোগিমতে আজ্জাচক্রের উর্দ্ধে তিনটি পীঠস্থান আছে—
বিন্দুপীঠ, নাদপীঠ ও শক্তিপীঠ। এই তিন পীঠ কপালদেশে অবস্থিত।
শক্তিপীঠই ব্রহ্মবীজ বা ওঁকার, উহার নিয়ে ষোড়শদলযুক্ত ‘সোমচক্র’
বিদ্যমান। এই ‘সোমচক্র’ ষোড়শদলযুক্ত, এই দলকে চন্দ্রের ষোড়শ-
কলা বলে। প্রথম কলার নাম কৃপা, তৎপরে মৃদুতা, ধৈর্য্য,
বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিষয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাভীর্ঘ্য,
উজ্জম, অন্ধোভ, ওঁদার্য্য, একাগ্রতা (কল্যাণ যোগাঙ্ক, ‘অ-ক-থ’ চক্র,
পৃ ৬৪৮)।

ইহার নিয়ে একটি গুপ্ত ষড়্‌দল পদ্ম আছে, উহাকে ‘জ্ঞানচক্র’
বলে। উহার প্রতিদলে ক্রমশঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও স্বপ্নের জ্ঞান
উৎপন্ন হয়। ইহার নিয়েই ‘আজ্জাচক্র’। আজ্জার নিয়ে তালুমূলে একটি
গুপ্তচক্র বা দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, তাহাতে পঞ্চ সৃষ্ণভূতের
পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চ স্থূলভূতের প্রাচুর্য্যব হয়। Arthur Avalon ইহাকেই
Serpent Power নামক গ্রন্থে ‘ললনাচক্র’ বা ‘কলাচক্র’ আখ্যা দিয়াছেন।
ইহা ‘ষট্‌চক্রনিরূপণম্’ গ্রন্থে নাই। ইহার নিয়ে বিদ্যুৎচক্রের স্থান। ইহার
দ্বাদশ দল—শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শুদ্ধতা, অরতি,
সম্মম, উন্মি ইত্যাদি।

সহস্রার চক্র অধোমুখী, পঞ্চাশৎ অক্ষর যুক্ত। ইহার মধ্যে
গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল আছে, ঐ চন্দ্রমণ্ডল ছত্রাকারে এক উর্দ্ধমুখী দ্বাদশদল
কমলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, ঐ কমলে ‘অ-ক-থ’ ত্রিকোণযন্ত্র আছে,
উহার চতুর্দিকে সুধাসাগর বেষ্টিত করিয়া আছে, তন্মধ্যে উহা মণিময়
দ্বীপের স্থায় বিরাজিত। উহার মধ্যস্থলে মণিপীঠে নাদবিন্দুর উর্দ্ধে
হংসপীঠের স্থান, এই পীঠে গুরুপাছুকা বা গুরুচরণ ধ্যান কর্তব্য। গুরুই
পরমশিব স্বরূপ। উক্ত চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে অমৃতকলা বা ষোড়শীকলা
ও তন্মধ্যে নির্বাণকলা বিদ্যমান। নির্বাণকলা-অন্তর্গত নির্বাণ-শক্তিরূপা
মূলপ্রকৃতি বিন্দু ও বিসর্গ শক্তির সহিত পরমশিবকে বেষ্টিত করিয়া
আছে, উহার ধ্যানে নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। বেদান্তমতে সহস্রারাস্থিত
পরমশিব ও শক্তিকে ব্রহ্ম ও মায়া বলে, পদ্মকে আনন্দময় কোষ বলে।

তত্ত্বের এই পরমশিব ও শক্তিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ, পুরাণের লক্ষ্মীনारायण বা রাধাকৃষ্ণ ।^১

বৌদ্ধ লামাদের মধ্যে লয়যোগের অনুরূপ যে সাধন আছে তাহাকে short বা direct path বলা হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের পথে চলিয়া কোন বিধিনিষেধ না মানিয়া যে সাধন দ্বারা একজন্মেই বুদ্ধত্বলাভ হয় তাহাই । এই বিশ্ব যে ইন্দ্রজালস্বরূপ স্বকল্পনা-উদ্ভূত এবং মনের মধ্যেই বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয় এই জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য । অন্ধকার গৃহে সাধন আরম্ভ করিলে জ্যোতির্ময় মূর্তি বা পুষ্প দেখা দেয়, ক্রমশঃ তাহা স্থির হইয়া বিন্দুমাত্রে পর্যাবসিত হয় । যখন বহির্জগতের দৃশ্য বস্তু ও অন্তর্জগতের দৃশ্য বস্তু অভিন্ন হইয়া উঠে তখনই চিন্তের একাগ্রতা-সাধন পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ‘ও মণিপদ্ম ছ’ম’কে ছয়টি মাত্রায় বিভক্ত করিয়া তাহার ছয় বর্ণ কল্পনা এবং ক্রমশঃ তাহাদের অন্তর্দান কল্পনা দ্বারাও সাধন প্রচলিত । পূর্ণরূপে সাধনের পর ছয়টি মাত্রা ‘তথতা’র সহিত মিলিত হইয়া যায় । মহাযান মতে ইহাই শূন্য সাধন ।

পীঠতত্ত্ব । পরাশক্তি যখন শিবের সহিত সাম্যভাবে প্রাপ্ত হন, তখন তাহা বিন্দুরূপ ধারণ করে ও জ্যোতির্লিঙ্গরূপে প্রকটিত হয় । এই বিন্দুই তান্ত্রিক পরিভাষায় কামরূপ পীঠ নামে প্রসিদ্ধ, এই পীঠে অভিব্যক্ত চৈতন্য স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নামে পরিচিত । এই পীঠ একমাত্রা শক্তি ও একমাত্রা শিব অংশের সমভাবে সংগঠিত । এই অংশদ্বয়ের নাম শাস্তাশক্তি ও অম্বিকাশক্তি । এই পীঠে মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ ‘পরাবাক্’ নামে পরিচিত, ইহাই শব্দরাজ্যের সূচনা । ইহাই প্রণবের পরমরূপ বা বেদের স্বরূপ । ইহার পর শক্তির ক্রমবিকাশে শাস্তাশক্তি ‘ইচ্ছাতে’ পরিণত হয় ও শিবাংশ অম্বিকাশক্তি ‘বামা’রূপে আবির্ভূত হয়, ইহাদের সামরস্ত-বিন্দুই পূর্ণগিরিপীঠ ও চিহ্নিকাশ বাণলিঙ্গ । শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ইহাই পশুপ্তী বাক্ অবস্থা । ইহাই সৃষ্টির বিকাশের অবস্থা, এই ভূমি হইতে কালের প্রভাব আরম্ভ হয় ও ক্রমানুসারে সৃষ্টিক্রিয়া হইতে থাকে । তৎপরে ‘ইচ্ছা’শক্তির উপরম হওয়ায় ‘জ্ঞান’শক্তির উদয় হয় এবং শিবাংশ জ্যোষ্ঠাশক্তির সহিত অদ্বৈতভাবে মিলিত হইয়া জালঙ্কারপীঠ নামক সামরস্ত-বিন্দুর সৃষ্টি করে । এই বিন্দুতে অভিব্যক্ত চৈতন্য

ইতরলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। শক্তির এই স্তরের নাম ‘মধ্যমা বাক্’—ইহার প্রভাবে সৃষ্ট জগৎ তত্ত্বভাবে স্থিত হয়। স্বভাবের নিয়মে যখন সংহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়, শিবাংশ রৌদ্রী শক্তির সহিত সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, উহাদের ফলস্বরূপ যে অদ্বৈত বিন্দুর আবির্ভাব হয় তাহাকেই উড্ডীয়ান পীঠ বলে। এই বিন্দু হইতে অভিব্যক্ত চৈতন্যই মহাতেজঃসম্পন্ন ‘পরলিঙ্গ’ নামে অভিহিত হয়। ইহাই শব্দের ‘বৈখরী’ নামক চতুর্থ ভূমি। যে সংহারশীল জগতের আমরা অনুভব করি, তাহা বৈখরী শব্দেরই বিভূতি।’

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহের ২য় উপদেশে মাত্র দুইটি পীঠের বর্ণনা আছে, যথা—মূলধারে কামরূপ পীঠ, ইহা সর্বকামপ্রদায়িনী, এবং স্বাধিষ্ঠানচক্রে উড্ডীয়ান পীঠ, ইহাই সিদ্ধিস্থান। (বিশুদ্ধচক্রে যে অনাহত কলা বর্তমান তাহাও যোগীদের মতে মহাসিদ্ধিদাত্রী।)

যোগশিখোপনিষদে চতুঃপীঠতত্ত্ব এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—
কুণ্ডলিনী হইতে নাদ ও বিন্দু, তাহা হইতে হংস ও মন, তাহা হইতে কামফলপ্রদ স্বাধিষ্ঠানচক্রে কামরূপ পীঠ, হৃদয়ে অনাহত পূর্ণগিরি পীঠ, কণ্ঠকূপে বিশুদ্ধচক্রে জালন্ধর পীঠ আজ্ঞাচক্রে উড্ডীয়ান মহাপীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে।*

রাজযোগ

“রাজহাং সর্বযোগানাং রাজযোগ ইতি স্মৃতঃ”,—যোগের রাজা বলিয়া ‘রাজযোগ’ নাম হইয়াছে।

রাজযোগসমাধিষ্ট উন্নয়নী চ মনোন্নয়নী ।
অমরত্বং লয়স্তব্ধং শূন্যশূন্যং পরং পদম্ ॥
অমনস্কং তথাদ্বৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনম্ ।
জীবমুক্তিঞ্চ সহজাতুর্য্য চৈত্যকবাচকঃ ॥*

রাজযোগের এই ষোড়শটি বিভিন্ন নাম হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝা যায়, এই সমুদয় শব্দই একার্থবোধক, অর্থাৎ এই শব্দসমুদয় দ্বারা সমাধিকেই বুঝায়। সমাধি কি? সলিলে সৈন্ধব মিলিত হইয়া যেরূপ সমতা প্রাপ্ত হয়, আত্মা ও মনের সেইরূপ ঐক্য হইলে তাহাকে সমাধি বলা যায়।

১। শক্তিসাধনা (ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ) কল্যাণ শক্তি অঙ্ক

২। যোগশিখোপ ১১৭১ এবং ৭১০ ইত্যাদি চতুঃপীঠতত্ত্ব।

৩। হ-যো-প্র ৪১০, ৪

আত্মার সহিত মনের যোগেই আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সমাধি নামে পরিচিত। প্রাণ অর্থাৎ চাক্ষুশ যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মনের বাসনারাশি দূর হয়, তখন প্রাণ ও মনের ভেদ রহিত হইয়া যে একীভাব জন্মে, তাহাই সমাধি। এই অবস্থাতে একমাত্র আত্মা সর্বময়রূপে বিদ্যমান থাকেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে ঐক্য অবস্থা তাহাকেই সমস্ত সম্বন্ধরূপী মানসকার্যের লয়স্বরূপ সমাধি নামে অভিহিত করা হয়।

রাজযোগস্ত্র মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি তদ্বতঃ ।

জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধির্গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥

হ্রল্ভো বিষয়ত্যাগো হ্রল্ভঃ তদ্বদর্শনম্ ।

হ্রল্ভা সহজাবস্থা সদৃশুরোঃ করুণাং বিনা ॥^১

রাজযোগের মাহাত্ম্য জানেন এইরূপ জ্ঞানী হ্রল্ভ। গুরুবাক্যানুসারে রাজযোগ সাধন করিতে পারিলে তদ্বিজ্ঞান জন্মে এবং বিদেহমুক্তি হয়, তাহা হইলেই নির্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ জীবনমুক্তি এবং অণিমাди অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

বিবিধ আসন, কুন্তক, মুদ্রাদি সাধন দ্বারা যখন ‘প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণঃ শূন্থে প্রলীয়তে’ তখন সর্ববিষয় ত্যক্ত হইয়া ‘যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে’ ; ইহাই হঠযোগের সাহায্যে সমাধিলাভের উপায়। এই অবস্থায় প্রারম্ভ কৰ্ম্মও ক্ষয় পাইয়া থাকে। সমাধি দ্বারা প্রারম্ভ ক্ষয় করিয়া যে যোগী কালকে পরাজিত করিতে সক্ষম, তিনি ধন্য। সমাধিসিদ্ধিতে—

চিন্তে সমত্বমাপন্যে বায়ৌ ব্রজতি মধ্যমে ।

তদামরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥^২

অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধিতে বজ্রোলী, অমরোলী ও সহজোলী এই মুদ্রাসকল সিদ্ধি হয়। যখন চিন্তের সমতা অর্থাৎ ধোয়াকার বৃত্তি প্রবাহতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণ মধ্যনাড়ীতে গমন করে, তখন এই মুদ্রাত্রয় সিদ্ধ হয়। যাহার প্রাণ ও চিন্তাজয় হয় নাই তাহার সিদ্ধি হয় না। ‘যোগবীজ’ গ্রন্থে আছে, নানাপ্রকার বিচার করিলেও মনের সমতা হয় না, অতএব মন ও প্রাণের পরাজয় কর্তব্য, তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষ সিদ্ধি হয় না। প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে রুদ্ধ করিয়া লয় করিতে পারিলে মনেরও লয় হইবে।

যোগবাশিষ্টে আছে, প্রাণের কয় হইলে মন শাস্ত হয়, এইরূপে নিকর্ষণ লাভ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাজযোগ পাতঞ্জলদর্শনের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সমাধি দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে যোগাঙ্গ ও অসম্প্রজ্ঞাতকে মুখ্য যোগ বলিতে হইবে। আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানও রোধ করিলে চিত্তের যে সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন অবস্থা হয়, তাদৃশ সমাধির নামই অসম্প্রজ্ঞাত। ইহাই রাজযোগ বা নিকর্ষীজ সমাধি বিশেষ।

পাতঞ্জল-যোগসূত্রে নিকর্ষীজ সমাধির ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয় এই দ্বিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যোগীদের উপায়প্রত্যয় আর বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় হয়। প্রকৃতিলয় অর্থে প্রধানা ও মূলা প্রকৃতিতে লয় বৃত্তিতে হইবে, কারণ তাহাতেই চিত্ত লয় প্রাপ্ত হয় বা নিকর্ষীজ সমাধি হয়। শ্রদ্ধা বীৰ্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই উপায় দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধির নাম উপায়প্রত্যয় ও জন্মের হেতুভূত অবিজ্ঞামূলক সংস্কারই 'ভব', ভবপ্রত্যয় সমাধিতে চিত্ত-নিরোধ হইলেও 'অবিজ্ঞা' নিবৃত্ত হয় না। তজ্জন্ম আত্মা মুক্তিলাভ করে না।

চিত্তবৃত্তির সমাগ্নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। চিত্তের সমস্ত বৃত্তির নিরোধ অবস্থার যে কারণ (প্রত্যয়) তাহাই পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাসপূর্ব্বক সংস্কারমাত্র যে সমাধিতে অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত (অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত হইতে অগ্নি বা ভিন্ন)। সংস্কারমাত্র থাকার অর্থ চিত্ত কিয়ৎক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিয়া সংস্কারবশে পুনরায় উদ্ভূত হয়, তজ্জন্ম উহার লক্ষণ 'সংস্কারশেষ'; এইরূপ সমাধির অপর নাম নিকর্ষীজ সমাধি, কারণ উহা নির্বিষয়। 'প্রত্যয়' ও 'সংস্কার' চিত্তের এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম, তন্মধ্যে চিত্তের জ্ঞান ও চেষ্টারূপ ধর্ম্মই 'প্রত্যয়' এবং স্থিতিক্রম ধর্ম্মের নাম 'সংস্কার'—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রত্যয় থাকে না, তবে সংস্কার থাকে বলিয়া পুনরায় চিত্তমধ্যে বৃত্তি উঠে।

চিত্ত ও আত্মার স্ব-স্বামি সম্বন্ধ, ব্যুৎপাদন অবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ বৃত্তিসকলের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হয় ও বৃত্তিনিরোধে দ্রষ্টা পুরুষ সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকেন। গভীর অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া

বিষয়জ্ঞানশূন্য ও চিৎস্বরূপে বঞ্চিত অবস্থাকে সাধকের 'প্রকৃতিলয়' বা জড় সমাধির অবস্থা বলা হয় ; ইহা যোগীদের কাম্য নহে ।

বৃত্তিহীন হওয়াতে ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেও জ্ঞানহীন অবস্থা বলিয়া উহা প্রকৃত যোগাবস্থা নহে । বাস্তবিক যোগাবস্থা হইল উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, উপায় অর্থে প্রজ্ঞা বা শুদ্ধ জ্ঞান । জ্ঞানের সম্যক উদয়ে যে সমাধি হয় তাহা অতুলনীয় । ভবপ্রত্যয় অবস্থাতে পুনরায় সংস্কারবশে বাঞ্ছান অবশ্যস্তাবী, কিন্তু প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে সে আশঙ্কাও থাকে না, উহা কৈবল্যের পূর্বস্বাদ স্বরূপ ।

বৌদ্ধযোগী প্রতिसংখ্যা-নিরোধ ও অপ্ৰতिसংখ্যা-নিরোধ নামে যে সমাধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুরূপ । তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সংস্কারের স্থূলরূপ দূর করতঃ প্রসংখ্যান বা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহার সুখরূপ দগ্ধ করা বিধেয় । সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতি স্তরে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, অতঃপর সন্নিহিত সমাধিতে সালঙ্ঘজ্ঞানের চরমশুদ্ধি সম্পন্ন হয় । ইহার অপার নাম গৃহীতসমাপত্তি ।^১

রাজযোগে সাধনের ষোড়শ অঙ্গ আছে—অপারোক্ষানুভূতিপূর্ণ জীবনযুক্ত যোগী ইহার তত্ত্বনির্দেশে সক্ষম, প্রথমতঃ সোপান অতিক্রমের দ্বারা একে একে সপ্ত জ্ঞানভূমির অতিক্রমণ, তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষের সংচিদ্রূপী দুই রাজ্যদর্শন ও প্রপঞ্চের বিস্মৃতি, ইহা অষ্টম ও নবম অঙ্গ, তৎপরে প্রকৃতির স্বরূপকে বুঝিয়া ব্রহ্ম, ঈশ বা বিরাট রূপে অদ্বিতীয় ব্রহ্মাসত্তার দর্শন (ইহা দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অঙ্গ) ও সর্বশেষে বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত এই চারি প্রকার আত্মজ্ঞানযুক্ত সমাধি-দশা অতিক্রম করিয়া স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি হয় । এই দশাকে জীবনযুক্ত দশা বলে । এই অবস্থা পূর্বোক্ত মন্ত্র, হঠ, লয় যোগের মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয় সমাধি হইতে ভিন্ন । ইহাই সকল সাধনার চরম লক্ষ্য । ইহাই উপাসনারাজ্যের পরিধি ও বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত ।

উপলব্ধমহাভাবা মহাবোধান্বিতাশ্চ বা ।

মহালয়ং প্রপন্নাশ্চ তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বতঃ ॥

যোগিনো রাজযোগস্ত ভূমিমােসাদয়ন্তি তে ।

যোগসাধনমূর্দ্ধন্থো রাজযোগোহভিধীয়তে ॥

অতএব মন্ত্র, হঠ ও লয় যোগ সাধনে মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয়সাধন, শেষে বিচারশক্তির পূর্ণতা দ্বারা রাজযোগের ধ্যানকে ব্রহ্মধ্যান ও সমাধিকে ‘নির্বিকল্প সমাধি’ বলে। রাজযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীই ‘জীবমুক্ত’, রাজযোগই যোগসাধনের মূর্ত্ত্ত বা চরমসীমা, এই নিমিত্ত ইহার নাম ‘রাজযোগ’।^১

দন্তাত্রেয় প্রভৃতি রাজযোগের সাধক, মন ও বায়ু নিশ্চল করাই ইহার উদ্দেশ্য, অতএব ইহাতে প্রাণায়াম আবশ্যক ও ইহা হঠযোগের অঙ্গ। হঠ ও রাজযোগের সম্বন্ধ নির্ণয় অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হঠ ও রাজযোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

হঠ ঠহ হঠঃ সূর্য্যচন্দ্রোত্তয়োর্যোগো হঠযোগ এতেন হঠশব্দ-
বাচ্যয়োঃ সূর্য্যচন্দ্রাখ্যয়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণং প্রাণায়ামো হঠযোগ
ইতি হঠযোগলক্ষণং সিদ্ধং ।^১ ইহাদ্বারা হঠযোগ কি, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ
জ্ঞানলাভ করা যায় । রাজযোগ অতিশ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই,
কিন্তু এই হঠযোগই তাহাতে আরোহণ করিবার সোপানস্বরূপ অর্থাৎ
কোন উন্নত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিতে হইলে সোপান দ্বারা যেরূপ
অনায়াসে আরোহণ করা সম্ভব হয়, সেইরূপ হঠযোগ-সোপান আশ্রয়
করিলে অনায়াসে যোগশৈলের শিখরে আরোহণ করা যায় । তাই
হঠযোগপ্রদীপিকাতে স্বাম্মারাম বলিয়াছেন—

শ্রীআদিনাথায় নমোহস্ত তস্মৈ যেনোপদিষ্টা হঠযোগবিদ্যা

বিভ্রাজতে প্রোন্নতরাজযোগমারোঢ়ুমিচ্ছারধিরোহিনীব ॥১।১

প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং স্বাম্মারামেণ যোগিনা ।

কেবলং রাজযোগায় হঠবিদ্যোপদিষ্টতে ॥১।২

ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কেবল রাজযোগের নিমিত্ত
হঠবিদ্যা উপদেশ করা হইয়াছে । হঠযোগ দ্বারা যে সকল বিভূতি বা
সিদ্ধি লাভ হয় তাহা লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, রাজযোগ দ্বারা
কৈবল্যলাভই উদ্দেশ্য, কৈবল্যলাভেচ্ছুর নিকট বিভূতিলাভ অতি নগণ্য ।
নানামত রূপ অন্ধকারে পড়িয়া যাহারা রাজযোগলাভ করিতে অক্ষম,
তাহাদের জন্তই স্বাম্মারামযোগী হঠযোগ বিবৃত করিয়াছেন । ইহা
রাজযোগ প্রকাশের প্রদীপস্বরূপ ; মন্ত্রযোগাদি অন্যান্য যোগে সমুপ-
নিগূর্ণ ধ্যান ও মুদ্রাদি দ্বারা সাধকের যে রাজযোগপ্রাপ্তির কথা
আছে তাহা অশাস্তচিত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অলভ্য বলিয়া ঐ সকল যোগ
তাহাদের পক্ষে গাঢ় অন্ধকারস্বরূপ এবং একমাত্র হঠযোগই তাহাদের
আশ্রয়স্বরূপ বা সহায় । রাজযোগ না জানিয়া যে সাধক হঠযোগানুষ্ঠান
করেন, তাহার শ্রম ব্যর্থ হয় ।

রাজযোগমজানন্তঃ কেবলং হঠকশ্মিণঃ ।

এতানভ্যাসিনো মণ্ডে প্রয়াসফলবর্জিতম্ ॥৪৭৯॥

কুস্তকদ্বারা বায়ুরোধ-সামর্থ্য জন্মিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ চিত্তের লয় হয়, অতএব কুস্তক অভ্যাসই মুক্তির হেতু, এই নিমিত্ত ইহাও রাজযোগ । ইহা দ্বারা কুণ্ডলিনী-শক্তিরও প্রবোধ জন্মে । সুষুমা নাড়ীর শুদ্ধিতে হঠযোগের সিদ্ধি হয় এবং হঠযোগ বিনা রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, অতএব সিদ্ধি পর্য্যন্ত রাজযোগ ও হঠযোগ উভয়েরই অভ্যাস কর্তব্য ।

হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ ।

ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমনিষ্পত্তেঃ সমভ্যাসেৎ ॥৫॥

রাজযোগের শারীরিক সাধনের সহিত (অর্থাৎ আসন, প্রাণায়ামাদির সহিত) হঠযোগের সাদৃশ্য আছে । হঠযোগী স্থূলদেহ সাধনে ব্যাপৃত, পাশ্চাত্যের ডেলসার্ট আদি ব্যায়ামাচার্যগণ ও যোগী রামচরক* প্রভৃতি দেহকে ইচ্ছামত চালিত করিবার ক্ষমতা অর্জনের জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হঠযোগের অনুরূপ সাধন । পানাহার বিধি ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিধি এবং 'Ego' (= The Divine Spirit in every soul, around which clusters matter and energy) ও 'Prana' (= Energy used by the Ego) ইত্যাদির বর্ণনাও ইহাতে আছে । দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা নানারূপ ব্যাধি দূর করা কিরূপে সম্ভব, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে ।

হঠযোগী কেবল পেশী নহে, হৃদযন্ত্রকেও রোধ করিতে সমর্থ, কিন্তু ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মে না, অতএব রাজযোগীর পক্ষে ইহা আদর্শ নহে । হঠযোগীর বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা শতায়ু হওয়া বিচিত্র নহে । রাজযোগীর পক্ষে 'জ্ঞান' সাধনই লক্ষ্য । মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩০।১।১০৮-১০) আছে, “যে মহৎ জ্ঞান মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, বেদসকলে, সংখ্যাসম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে দেখা যায় এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায় তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে ।” এই সাংখ্যের উপর রাজযোগ-বিজ্ঞাও প্রতিষ্ঠিত, কারণ পাতঞ্জলসূত্র রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ,

পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত, যোগ ও সাংখ্যে ভেদ অতি সামান্য ।^১

যোগানুশীলন বহু প্রাচীন, উপনিষদের মধ্যেও যোগের অনুশীলন আছে। কঠ উপনিষদে (১।৩।১০-১১) “ইন্দ্রিয়েভ্য পরা হৃথ্বা অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরং । মহতঃ পরমবাক্তম্ অব্যাক্তাং পুরুষঃ পরঃ ॥” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়সমূহ নিজ নিজ উপলব্ধির জন্ত ইন্দ্রিয় নির্মাণ করিয়াছে, কার্য্য অপেক্ষা কারণ সূক্ষ্মতর ও ব্যাপক অতএব শ্রেষ্ঠ), অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ । হিরণ্যগর্ভ হইতে অব্যাক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যাক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ।

যচ্ছেদ বাঙ্ মানসী প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥

(ঐ ১।৩।১৩)

বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্ত্বে অর্পণ করিবেন এবং উক্ত মহান্ আত্মাকে সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন ।

ইহা দ্বারা উপনিষদে সুমহৎ নিগূর্ণ আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে, তাহার উপলব্ধির ক্রমও বর্ণিত হইয়াছে । কঠ উপনিষদে (১০-১১ শ্লোক) যে একটি অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ এই ক্রম বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পুরুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে তাহা হঠযোগের ইন্দ্রিয়-নিরোধ দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিরূপ যোগে উপনীত হইবার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় । এইরূপে উপনিষদেও হঠ ও রাজযোগের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের ইঙ্গিত সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান । কেবল কঠোপনিষদে নহে, কেন (১।২) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করার কথা আছে : এইরূপ যোগী দেহান্তে পুনর্বার দেহ ধারণ করেন না ।

প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তৎসহ সমান ও অপান বায়ুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । পঞ্চম প্রশ্নে প্রণবের তিনটি মাত্রার ধ্যানের কথা আছে । মাত্রাত্রয়ের পরস্পর-সম্বন্ধরূপে

উপাসিত হইলে উহার ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়। এই ধ্যানের ফলে ধাতা সর্বস্বরূপ হন এবং তাঁহার চাকল্যের কোন কারণ থাকে না (৫১৬)। ঔকার অবলম্বনে অপরব্রহ্মায়ক ত্রিবিধ প্রাপ্তি ঘটে এবং যাহা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও সর্বোত্তম তাহাও এই ঔকাররূপ প্রতীক অবলম্বনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ ঔকার দ্বারা পরব্রহ্মেরও প্রাপ্তি হয়। এইরূপে ঔকার-সাধন ক্রমমুক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইচ্ছাযোগেও এই ক্রমমুক্তি আছে। ‘মন্ত্রচৈতন্য’ বা মন্ত্রযোগই তাহার সহায়। (মন্ত্রযোগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মাণ্ড্য উপনিষদে ‘সাম্য’ শব্দ দ্বারা ‘মিলন’ বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তাত্মা যখন ব্রহ্ম দর্শন করে তখন যোগ নহে, সমতা লাভ করিয়া অহং ব্রহ্ম উপলব্ধি করে। (প্রোফেসর রাধাকৃষ্ণের মতে পাতঞ্জল যোগদর্শনের যোগ অর্থে ‘প্রয়াস’, ‘মিলন’ নহে। সাংখ্যযোগ অর্থে সম্যক্ জ্ঞানের যোগ, সং = সম্যক্, থ্যা = জ্ঞান)।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের বিষয় আছে।

শ্বেতাস্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে মনে স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির প্রণবরূপ ভেলা সাহায্যে ভয়াবহ শ্রোত উত্তীর্ণ হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (২১৮)

প্রাণান্ প্রপীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্টে ক্লীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছুসীত।

ছষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥^১

অর্থাৎ সংযুক্তচেষ্টে ব্যক্তি যোগমার্গে প্রাণকে সংযম করেন, যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখন নাসিকা দ্বারা প্রাণাস পরিত্যাগ করেন। পরে যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বযুক্ত রথে আরুঢ় থাকেন তদ্রূপ যোগীও মনকে অপ্রমত্তভাবে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করিবেন।

চক্ষুর প্রীতিকর, সমতল, শুচি, অগ্নি ও বালুকাশূন্য ইত্যাদি স্থানে নির্জ্জনে যোগ অভ্যাস করিতে এবং ব্রহ্মের অভিব্যক্তিসূচক ‘নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং খল্লোতবিদ্যুৎফটিক শশিনাম্’ রূপ ধ্যান করিবার কথা শ্বেতাস্বতরে বর্ণিত হইয়াছে। (২১১০, ১১)

পৃথ্যাপ্তেজোহনিলখে সমুখিতে পক্ষায়কযোগগুণে প্রবৃন্তে।

ন তস্ম রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্ম যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥২১১২

যখন যোগীর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে পঞ্চগুণরূপ যৌগিক অনুভূতিসমুদয় হইতে থাকে, তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ যোগাগ্নিময় শরীর পাইয়াছেন, তাহার আর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না।

যোগারম্ভ করিলে শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ্য, লোভশূন্যতা, সুন্দর বর্ণ, স্বরসৌন্দর্য্য, মূত্রপুরীষের অল্পতা ও শরীরের একটা পরম সুগন্ধ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

মৃত্তিকাদিলিপ্ত সুবর্ণ ও রক্ত অগ্ন্যাদির দ্বারা উত্তমরূপে বিশোধিত হইলে যেমন তেজোময় হইয়া প্রকাশ পায় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে যোগী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ও সর্বদুঃখবিমুক্ত হন। (শ্বেতাস্বতর)।

অতএব দেখা যাইতেছে, উপনিষদে যে যোগতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত হঠযোগের ইন্দ্রিয়নিরোধ প্রভৃতি আচরণ না করিলে রাজযোগ সহজলভ্য হয় না। প্রবন্ধের প্রথমেই তাই বলা হইয়াছে—
“কেবলং রাজযোগায় হঠবিদ্যোপদিষ্টতে”—এবং রাজযোগ না জানিয়া কেবল হঠযোগানুষ্ঠানে ব্যর্থ পরিশ্রম হয় (হ-যো-প্র ৪।৭৯)। অতএব—

হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।

ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভ্যাসেৎ ॥^১

প্রাণায়ামাদি হঠযোগ বিনা রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, রাজযোগ বিনা হঠযোগ সিদ্ধ হয় না, অতএব সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত পরস্পরের সহকারিরূপ হঠযোগ ও রাজযোগ উভয়ই সমভাবে অভ্যাস করিতে থাকিবে।

নাড়ীচক্র ও নাড়ীশুদ্ধি

মানবদেহের সর্বত্র ব্যাপিয়া ৭২,০০০ নাড়ী আছে, উহার দ্বারাই শোণিতের প্রবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই নাড়ীচক্র মধ্যে প্রধান নাড়ী ৭২টি, তাহার দ্বারা প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তন্মধ্যেও আবার দশটি প্রধানতম।

প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো ভূয়স্তত্র দশ স্মৃতাঃ।

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুমা চ তৃতীয়িকা ॥ ১।২৪

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পুষা চৈব যশস্বিনী ।

অলম্বুযা কুভ্বেচৈব শস্বিনী দশমী স্মৃতা ॥ ১১২৫

(গোরক্ষসংহিতা)

যোগশিখোপনিষদে (৫।১৬) উক্ত নাড়ীচক্রের বর্ণনা আছে ।

শিবসংহিতা মতে চতুর্দশ নাড়ী প্রধানতম এবং মানবদেহ মধ্যে সাক্ষিতিনলক নাড়ী বিদ্যমান এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ।

(২।১৩, ১৪, ১৫ শিবসংহিতা) ।

উক্ত নাড়ী মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা সর্বশ্রেষ্ঠ, এই নাড়ীত্রয় যোগসাধনের উপযুক্ত, তন্মধ্যে সুষুমা নাড়ী সর্বশ্রেষ্ঠ ।

ইড়া পিঙ্গলা সুষুমা চ ত্রিশ্রোনাডা উদাহৃত্যঃ ।

ইড়া তত্র স্থিতা বামে, দক্ষিণে পিঙ্গলা স্থিতা ।

সুষুমা মধ্যদেহস্থা প্রাণমার্গঃ সমাশ্রিতা ।

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥^১

ত্রিশিখো ব্রাহ্মণ উপনিষদে ইহাদের সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে, বরাহ উপনিষদে নাড়ীকল্প ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।^২

ইড়া নাড়ীর দেবতা সোম, পিঙ্গলার সূর্য্য, সুষুমার অধিদেবতা অগ্নি । যট্চক্রাদিগ্রন্থেও মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ নাড়ীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, যথা “মেরোর্ক্সাহপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে মধ্যে নাড়ী সুষুমা ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা” ইত্যাদি (গোরক্ষ সংহিতা) ।

জীবদেহে নাড়ীসমূহ মধ্যে বায়ু বিচরণ করিতেছে, এই এক বায়ুর ক্রিয়াভেদে দশটী নাম হইয়াছে, যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় । হৃদয়দেশে ‘প্রাণ’ বায়ুর বসতি, ব্যান বায়ু সর্বদেহ ব্যাপিয়া আছে, অপান, সমান ও উদান যথাক্রমে গুহ, নাভিমণ্ডল ও কণ্ঠ মধ্যে অবস্থিত । এই প্রাণাদি পঞ্চ-বায়ুই প্রধান, ইহার সহিত নাগাদি পঞ্চবায়ুর পদার্থগত কোন ভেদ নাই ।

১। গোরক্ষসংহিতা ১।২৭, ২৮ । Studies in the Tantras. Bagchi, p. 36 ।

বৌদ্ধমতে ইহার ললনা, রসনা, অবদুতী নামে খ্যাত । ললনা প্রজাপতি, রসনা উপাধ্যক, অবদুতী গ্রাহগ্রাহক বর্জিত ।

২। ত্রিশিখো ব্রাহ্মণ উপ. ৩৩ চোক ইত্যাদি । বরাহ উপ. ৩।২০

বায়ুর সহিত দেহের সম্বন্ধ। জীব সর্বদা প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা দেহের অধোদেশে প্রধাবিত হইতেছে, প্রাণের দ্বারা বামভাগে ও অপানের দ্বারা দক্ষিণভাগে বিচরণ করিতেছে। জীবের এই সকালন-ক্রিয়া অতিক্রান্ত বলিয়া বাহির হইতে লক্ষিত হয় না। প্রাণ ও অপান বায়ু উভয়ে উভয়কে উর্দ্ধ-অধোদেশে আকর্ষণ করিতেছে, এই আকর্ষণ ক্রিয়া যিনি অবগত হন, তিনিই যোগী। যখন জীব বহির্ভাগে প্রধাবিত হয় তখন 'হং' শব্দের উচ্চারণ হয়, এবং যখন জীব পুনরায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন 'সঃ' শব্দের উচ্চারণ হয়, এইরূপে জীব দিবা ও রাত্ৰিতে 'হংস' এই মহামন্ত্রটি একবিংশতি সহস্র ষট্ শত বার (২১ হাজার ছয়শত বার) জপ করিতেছে।

হকারেণ বহির্ঘাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।

হংস হংসেতি মন্ত্রোহয়ং সর্বৈর্জীবৈশ্চ জপ্যতে।

গুরুবাক্যাৎ শ্রুশ্রুয়ায়াং বিপরীতো ভবেজ্জপঃ।

সোহংসোহংসমিতি প্রোক্তো মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে।

(যোগশিখোপনিষৎ, ১৩০-১৩২ শ্লোক)

“অথ 'হংস' ঋষি.....সোহং ইতি কীলকম্।” এই হংস মন্ত্রকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, নিরঞ্জন ও নিরাভাসকে অর্পণ কর্তব্য, এইরূপে হৃদয় মধ্যে অষ্টদলে হংসাত্মাকে ধারণ করিবে।

(হংস উপ, ১০-১৩)

মহামন্ত্র কথন। গোরক্ষসংহিতায় এইরূপ আছে—

হংকারেণ বহির্ঘাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ।

হংসো হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা ॥ (১।৩৬)

কবীরও বলিয়াছেন, জীব এই 'হংস' মন্ত্র দিবারাত্ৰিতে ২১,৬০০ বার জপ করেন অর্থাৎ ২১,৬০০ বার জীব শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে।

এই হংস মন্ত্রই 'মহামন্ত্র' বা অজপা গায়ত্রী, গুরুর উপদেশে এই মন্ত্রই 'সোহং' মন্ত্রে পরিণত হয়। এই অজপা গায়ত্রী পরম মোক্ষদায়িনী।

অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী

তস্তাঃ শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১।২৮

অনয়া সদৃশী বিজ্ঞা, অনয়া সদৃশো জপঃ ।

অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতম্ ন ভবিষ্যতি ॥ ১।৫৯

(গোরক্ষসংহিতা)

অজপা গায়ত্রী স্মরণ করিতে করিতে যোগী সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, পরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও কৈবল্যপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। ইহার দ্বারা বিজ্ঞা, ইহার দ্বারা মন্ত্র, ইহার সদৃশ জ্ঞান পূর্বে ছিল না বা ভবিষ্যতে হইবে না।

মন পবন অরু সুরতি কৌ আতম পকড়ে আপ ।

রজ্জব লাবৈ তত্ত্ব সো যোহো অজপা জাপ ।

(সর্বাদী ১৯।২২)

আত্মা স্বয়ং যখন মন, পবন ও সুরতিকে ধৃত করে, এবং তাহা একত্রিত করিয়া তত্ত্ব সন্নিবেশিত করে, তখন অজপাজাপ সাধন হয়। রজ্জবের মতে অজপাজাপ অর্থে শরীর, শব্দ ও স্বাসের মিলন দ্বারা ‘স্মরণ’।^১ নিগুণীদের এই অজপাজাপ গোরক্ষসম্প্রদায় হইতে গৃহীত।

গোরক্ষপদ্ধতি (শতক), গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতিতে হকারেণ বহির্ধাতি সকারেণ বিশেষং পুনঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোক এবং উহা যোগীদের মোক্ষপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।^২

কুণ্ডলিন্যাঃ সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী ।

প্রাণবিজ্ঞা মহাবিজ্ঞা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ ॥১।৪০

(গোরক্ষসংহিতা)

এই অজপা গায়ত্রী কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহার দ্বারাই জীবন সঞ্চারিত হয়, সুতরাং ইহাকে ‘প্রাণবিজ্ঞা’ বলে, যিনি এই মহাবিজ্ঞা জ্ঞানেন তিনি বেদবেত্তা বলিয়া প্রখ্যাত হন।

নাড়ীশুদ্ধি। নাড়ীপুঞ্জের সংস্থান বর্ণিত হইল, বিধিবিহিতরূপে তাহাদের শুদ্ধি কিরূপে সম্ভব তাহা যোগিয়াজ্ঞবল্লভে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। নিষ্কাম ও নিঃসঙ্কল্প হইয়া অনুষ্ঠান এবং যম ও নিয়ম পালন করিয়া সর্বসঙ্গ পরিবর্জন করিয়া, জিতাসনগত হইয়া পবিত্র স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস কর্তব্য। মন্ত্রপাঠ সহকারে অঙ্গশাস্তি ও নিয়ত ভাস্কর্য্যধারণ-

১। Nir. Sch. of H. Poetry—p. 296. Kabir's Ref.

২। Nir. Sch. of H. Poetry—Barthwal, p. 295

ই পৃ ২৯৬ গোরক্ষশতকের উল্লেখ।

পূর্বক অভীষ্টদেব ও গুরুকে প্রণতিপূর্বক স্মরণ করিবে। আসনবদ্ধ হইলে তত্পরি পূর্বাস্থ বা উত্তরাস্থ হইয়া গ্রীবা, মস্তক ও দেহ সরলভাবে রাখিয়া সংবৃতমুখে নিশ্চলভাবে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে। তৎকালে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপনা করিতে হয়। অনন্তর নাসিকাগ্রে জ্যোৎস্নাজাল-বিরাজিত চন্দ্রবিশ্ব ও বিন্দুযুক্ত সপ্তমবর্গের চতুর্থ অক্ষর (হঁ) হইতে অমৃত প্রাবিত হইতেছে, চক্ষুদ্বারা এইরূপ দেখিয়া সমাহিতভাবে ইড়া নাড়ীতে বায়ু আরোপণ ও উদর পূর্ণ করিবে। পরে শরীরমধ্যস্থ জ্বালামালাসঙ্কুল অগ্নির ধ্যান করিয়া বহুমণ্ডলমধ্যস্থ সানুস্বার বহুবীজ রকার (রং) চিন্তা সহকারে শনৈঃ শনৈঃ বায়ুরেচন করিতে হয়। অনন্তর দীমান্ ব্যক্তি পুনরায় পিঙ্গলাযোগে দক্ষিণ নাসিকায় প্রাণবায়ু পূরণ করিয়া ইড়া দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ রেচন করিবে। নির্জ্ঞন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় ছয়বার অভ্যাস করিলে তিনচারি মাস হইতে তিনচারি বৎসর পর্য্যন্ত কাল মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট নাড়ীশুদ্ধি হইয়া থাকে। নাড়ীশুদ্ধির লক্ষণ যথা :—

নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি পৃথক্চিহ্নোপলক্ষিতাম্।

শরীরলঘুতা দীপ্তিবহুর্জঠরবর্ভিনঃ ॥ ২১

নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতচ্চিহ্নং তৎসিদ্ধিসূচকম্।

যাবন্নৈতানি সম্পশ্যেৎ তাবদেবং সমভ্যাসেৎ ॥ ২২^১

ত্রিচতুস্ত্রিচতুঃসপ্তত্রিচতুর্মাংসপর্য্যন্তঃ ত্রিসন্ধিষু তদন্তরালেষু চ ষট্কৃত্ব আচরেন্নাড়ীশুদ্ধি ভবতি। ততঃ শরীরে লঘুদীপ্তি বহুবুদ্ধিনাদাভিব্যক্তি ভবতি।^২ অর্থাৎ নাড়ীশুদ্ধি হইলে দেহের লঘুতা, উদরাগ্নির উদ্দীপ্তি এবং শরীরাত্যন্তরে নাদের অভিব্যক্তি এই সকল সিদ্ধিসূচক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যতদিন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তাবৎকাল অভ্যাস কর্তব্য।

এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে রেচক, কুস্তক ও পুরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে হইবে। অপানের সহিত প্রাণের যোগের নানই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দূর হইয়া যায়। ধারণা দ্বারা মনের অপবিত্রতা দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাশ হয় এবং ধ্যানের দ্বারা যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাব আবরণ করিয়া রাখে, তাহা নাশ হইয়া যায়।



নাড়ীশুদ্ধি রাজযোগের অন্তর্গত না হইলেও শঙ্করাচার্যের ন্যায় ভাষ্যকারও ইহার বিধান দিয়াছেন, যেতান্বতর উপনিষদের শঙ্কর ভাষ্যে আছে, “প্রাণায়াম দ্বারা ধৌত মনই ব্রহ্মে স্থির হয়, এইজন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়াম বিধি আছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিলে তবে প্রাণায়ামের অধিকার জন্মে। বুদ্ধাদ্ব্যুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা পূরণ ও তৎক্ষণাৎ বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ দ্বারা রেচন, পুনঃ দক্ষিণে পূরণ, বামে রেচন করিবে। অহোরাত্র চারিবার—উষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও অর্দ্ধরাত্রে পূর্বোক্ত ক্রিয়া তিন বা পাঁচবার অভ্যাস করিলে একপক্ষ বা মাসের মধ্যে নাড়ীশুদ্ধি হয়।”^১

গোরক্ষপদ্ধতিতে আছে—

শুদ্ধিমেতি যদা সর্বং নাড়ীচক্রং মলাকুলম্ ।

তদৈব জায়তে যোগী প্রাণসংগ্রহণে ক্ষমঃ ॥^২

অর্থাৎ যখন সমস্ত মলাকুল নাড়ীর শুদ্ধি হয় তখনই যোগী প্রাণ সংরক্ষণের ক্ষমতা অর্জন করেন।

১। রাজযোগ—বিবেকানন্দ, পৃ ২৫। যেতা. উপ. শঙ্কর ভাষ্যের ২ অ. ৮ শ্লোক।

২। গোরক্ষপদ্ধতি, ১১০৫ শ্লোক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাদ ও নাদানুসঙ্গান ও নাদের অবস্থাচতুষ্টয়

বিন্দু বা আকাশ একটি বিশ্বব্যাপী সত্তা। উহা সামান্যভাবে বিद्यমান কিন্তু বৈষম্য না ঘটিলে সৃষ্টি হয় না, তাই এই আকাশে চিৎশক্তির সঞ্চার বা আঘাত হইলে কম্পন আরম্ভ হয়। সেই কম্পনের ফলেই এই সৃষ্টির প্রারম্ভ। চিৎ হইতে শুদ্ধ অচিৎ ও ক্রমশঃ অচিৎ এইভাবে সৃষ্টির কম্পন হইতে থাকে। কম্পনের শুদ্ধ অচিৎ অবস্থায় সামান্যতাব নষ্ট হইয়া যায়, এবং উহা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অন্তর ও বাহির এই দুইটি রূপে প্রকাশ পায়, তৎসহ নাদের উৎপত্তি হয়, কারণ আকাশের গুণই 'শব্দ'। শুদ্ধ অচিৎ পঞ্চমুখী হইয়া অচিৎএ পৌছায় ও তাহারা একত্র হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। মানবমন বহিমুখী হইলেও তাহার এক সামান্য অংশ অন্তর্মুখী। তাই মানব জড় জগৎ হইতে নিজের মনকে সঙ্কুচিত করিয়া শুদ্ধ চিৎএর দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যখন বহিমুখী পঞ্চধারা অন্তর্মুখী হইয়া শুদ্ধ অচিৎএ ফিরিয়া আসে তখন ঐ পঞ্চধারার সহিত শুদ্ধ অচিৎএর বা মূলধারার একটি ধারা বা বিন্দু মিলিয়া ছয়টি ধারা একত্রিত হইলে তাহার দ্বারা ষট্চক্রভেদ হয়। অতঃপর শুদ্ধ চিৎএর দিকে অগ্রসর হইবার পথ উন্মুক্ত হয়। গুরুপ্রমাদে নাদরূপে ইহার সাধন হইয়া থাকে। উক্ত ছয়টি ধারার একটি মন বা চিৎ ও অন্য পাঁচটি অচিৎ পদার্থ।

বদ্ধজীব শ্বাসপ্রশ্বাসের অধীন, তাহাদের ইড়াপিঙ্গলামার্গ নিরন্তর ক্রিয়াশীল বলিয়া সূক্ষ্মমার্গ একপ্রকার রুদ্ধ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি বহিমুখী হওয়ায় যে অথওনাদ জগতের অন্তস্তলে, আকাশমণ্ডলে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে উহা জীবের ক্রতিগোচর হয় না, গুরুকৃপায় বা শাস্তবী-মুজাদি কৌশলের দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে শূণ্যপথ মধ্যে অনাহত ধ্বনি ক্রান্ত হয়। নিরন্তর এই ধ্বনির অনুসঙ্গানে রত থাকিলে মন ক্রমশঃ নির্মল হয় ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন পূর্ণরূপে স্থির হইলে নাদধ্বনিও বিলীন হয়। সেই অবস্থায় চিদান্বক আত্মা আপন স্বরূপে স্থিত হইয়া বাহ্য প্রকৃতির স্পর্শ হইতে মুক্ত হয়, তখন নাদও লয়প্রাপ্ত হয়।

নাদ মূলতঃ এক, কিন্তু ঔপাধিক সম্বন্ধের নিমিত্ত উহাকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। যোগিগণের মতে সাধারণতঃ উহার সপ্ত

বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে, একমাত্র ঔকার বা প্রণব উপাধিরহিত শব্দতত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা ও কোন কোন প্রাচীন সাধকসম্প্রদায় উহার ‘ফোট’ আখ্যা দিয়াছেন অর্থাৎ উহা হইতে ব্রহ্মভাবের স্ফুর্তি হয়, তাই ঔকার ফোট। প্রণব বা শব্দব্রহ্ম অথও সত্তা ব্রহ্মতত্ত্বের বাচক ও বাচ্য সত্তা পরব্রহ্ম রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই ব্রহ্মের প্রকাশক, তদতিরিক্ত কোন পদার্থ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। ফোট বা শব্দতত্ত্ব জীবপক্ষে যতদিন অব্যক্ত থাকে, ততদিন তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, তাই যোগী যথাবিধি ধ্বনি ও নাদের অবলম্বনে ইহার অভিব্যক্তি কামনা করেন। কুণ্ডলিনীর উদ্বোধনও আংশিকভাবে এই কার্যের সহায়ক, মূলাধার হইতে নাদের উৎপত্তি ও সহস্রারে উহার লয়প্রাপ্তি হয়, সাধক এই নাদের সহিত তাহার মনকে যুক্ত করিয়া অনায়াসে পরব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়া মনকে চিন্ময় করতঃ স্বয়ং চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। এই নাদানুসন্ধানের বৃত্তান্ত হঠযোগপ্রদীপিকা, যোগতারাবলী প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। নাদানু-সন্ধানের প্রথম অবস্থায় প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন সময়ে সাগরগর্জন, মেঘধ্বনি, ভেরীশব্দাদি শোনা যায়, মধ্য অবস্থায় প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে মর্দল, শঙ্খ, ঘণ্টাদি শব্দের ন্যায় সূক্ষ্ম শব্দ শোনা যায়, এবং অন্তে প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থির হইলে কুঙ্গ ঘণ্টা, বাঁশী, বীণা ও ভ্রমরাদির নাদের ন্যায় সূক্ষ্মতর নাদ শোনা যায়। নাদানুরক্ত মন সর্ববিষয় পরিত্যাগ করে, ইহা হইতে মনের সমাধি লাভ হয়।^১

নাদের অবস্থাচতুষ্টয়, যথা আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পত্তাবস্থা। সর্বপ্রকার চিন্তাবৃত্তিনিরোধেই উক্ত অবস্থাচতুষ্টয় হইয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা অনাহত চক্রে বর্তমান ব্রহ্মগ্রন্থির ভেদ হইলে দেহমধ্যে হৃদয়াকাশে নানাবিধ ভূষণধ্বনির ন্যায় আনন্দধ্বনি শ্রুত হয়, তখন যোগীর হৃদয় প্রাণবায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়, দেহ রূপলাবণ্যসম্পন্ন হয়, তেজ বৃদ্ধি হয়, রোগ দূর হয় ও অতিউত্তম গন্ধ অনুভূত হয়। ইহাই যোগীর ‘আরম্ভাবস্থা’।

নাদের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রাণবায়ুর সহিত অপানবায়ু এবং নাদবিন্দু মিলিত হইয়া কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল মধ্যচক্রে আবদ্ধ হয়, প্রাণ-অপান বায়ু ও

১। হ্যসটপনিষদ, ১০ শ্লোক, দশবিধ নাদবর্ণনা আছে। দশম নাদটী (মেঘনাদ) অন্ত্যাস কর্তব্য। নাদবিন্দু উপাঃ—৩১-৪১ শ্লোক, সিদ্ধাসনে বৈকণ্ঠী মূলাধানে দক্ষিণকর্ণে নাদশ্রবণ, নাদানুসন্ধানে চিন্তাবিলীন ও ‘উন্মত্তী’ অবস্থা প্রাপ্তির বিবরণ আছে।

নাদবিন্দু একীভূত হইয়া ঘটাকৃতি হয় বলিয়া এই অবস্থার নাম ‘ঘটাবস্থা’। কণ্ঠস্থিত বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদবশতঃ ব্রহ্মানন্দসূচক ভেরী শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত হয়, তাহা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ হয়।

তৃতীয় বা ‘পরিচয়’ অবস্থাতে ক্রমধাগত আকাশে মর্দল নামক বাতবিশেষের ন্যায় শব্দ অনুভূত হয়, এই অবস্থায় প্রাণ অগ্নিমাди অষ্টমিক্রির আশ্রয়ভূত ক্রমধাগত আকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যোগীর ক্ষুধা-নিদ্রাদি দূর হইয়া আত্মস্থের উপলব্ধি ঘটে। প্রাণের আজ্ঞাচক্রস্থিত রুদ্রগ্রন্থি বা ঈশ্বরের পীঠস্থান ভেদে এই অবস্থা হয়।

চতুর্থ বা ‘নিষ্পত্তি’ অবস্থায় প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে, তখন বংশীধ্বনি বা বীণাবাদনের ন্যায় শব্দ শ্রুত হয়। চিন্ত একবিষয়ীভূত হয় ও বিষয়-বিষয়ীর অভেদহেতু মন নির্বিষয় হয়। এইরূপ চিন্তের একাগ্রতাই ‘রাজযোগ’, তখন যোগী সৃষ্টি ও প্রলয় করিতে সক্ষম বলিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরতুল্য বলা যায়।^১

গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে নাদের অবস্থাচতুষ্টয়ের কথা আছে, যথা—
আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্ঠাবস্থা। আরম্ভ অবস্থায় “ব্রহ্মগ্রন্থির্ভবেদ্ভিন্ন আনন্দঃ শূন্যসম্ভবঃ। বিচিত্রকণিকো দেহোহনাহতঃ শ্রুতে ধ্বনিঃ ॥ দিব্যগন্ধো দিব্যচক্ষুস্তেজস্বী সাদরোগবান্। সম্পূর্ণহৃদয়ঃ শূন্য আরম্ভো যোগবান্ ভবেৎ ॥”

অথ ঘটাবস্থায়—“ঘটাকৃতা বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ। দৃঢ়াসনোভবেদ্যোগী জ্ঞানী দেবসমস্তথা। বিষ্ণুগ্রন্থির্হৃদা ভিন্নঃ পরমানন্দসূচকঃ। অতিশূন্যবিভেদশ্চ ভেরীশব্দস্তথা ভবেৎ ॥”

অথ পরিচয়াবস্থা—“ততো ভিত্তা বিহায়োমর্দলধ্বনিঃ। মহাশূন্যঃ তথা যাতি সর্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্ ॥ চিন্তানন্দং ততো জিত্ব সহজানন্দসম্ভবঃ। দোষহুঃখক্ষুধানিদ্রাজরামৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ রুদ্রগ্রন্থিঃ ততো ভিত্তা সর্বপীঠগতোহনিলঃ ॥”

অথ নিষ্ঠাবস্থা—“নিষ্পন্নো বৈণবঃ শব্দঃ কণদ্বীপাকণো ভবেৎ। অস্ত বা মাস্ত বা মুক্তিরত্রৈবাখণ্ডিতং মহৎ ॥ লয়ামৃতমিদং সৌখ্যং রাজযোগাদবাপ্যতে। রাজযোগপদং প্রাপ্তং সুখোপায়ং সুচেতসাম্ ॥”

শ্রুতিতে যোগের চারি অবস্থা—“আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়ঃ স্মৃতঃ। নিষ্পত্তিশ্চৈত্যবস্থা চ সর্বত্র পরিকীৰ্ত্তিতা ॥”^২

নাদানুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ লয়কারক, যোগতারাৱলীতে আছে—

“নাদানুসন্ধায়কমেব নাত্মং মন্তামহে ধন্যতমং লয়ানাম্ ।”^১

অতএব চিত্তলয়াকাজ্ঞী যোগী লয়সাধনের প্রধান সহায় নাদানুসন্ধানের সাধন করিবেন। মনোরূপ মন্তুহন্তী সংসারবিষয়োচ্চানে বিচরণ করিতে থাকে, নাদানুসন্ধানরূপ অক্ষুশ দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। যেমন পক্ষীর পক্ষদ্বয় ছেদনে সে উড়িতে অক্ষম হয়, তদ্রূপ মনও এইভাবে নিবৃত্ত হইলে বিষয় গ্রহণে বিমুখ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু রুদ্ধ ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু রাজযোগারূরুক্ষু হঠযোগিগণ সর্বপ্রকার বাহ্য চিন্তা রুদ্ধ করিয়া নাদানুসন্ধানের দ্বারাও চিত্তলয়ে প্রবৃত্ত হন। চঞ্চল মনোরূপ মৃগের বন্ধনে নাদানুসন্ধান জালতুলা; নাদ উক্ত মৃগের ব্যাধতুলা, কারণ ব্যাধ যেক্রমে হরিণকে বিনাশ করে তদ্রূপ নাদ নাদানুসন্ধানের দ্বারা চিত্তকে নাশ বা বিলীন করে। নাদই মনঃস্বরূপ পারদের জারণহেতু গন্ধকস্বরূপ, কারণ মন নাদ দ্বারা জারিত গন্ধকের স্থায় চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া বদ্ধ হয়, এইরূপে বদ্ধ মন (ভাবনারূপ মন), সহজেই ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে। তখন রজঃ ও তমোগুণ মল নষ্ট হইয়া চিত্তের শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তি মন্ত্র অবলম্বন হয়।

অনাহত ধ্বনি শ্রুত হইলে আকাশ কল্পনা হয়, শব্দ আকাশের গুণ। অনাহত ধ্বনিক্রমে যাহা শ্রুত হয় তাহা শক্তি, এবং যাহাতে উহা লয় হয় তাহাই পরমেশ্বর। নাদের লয়ে সর্ববৃত্তিনিরুদ্ধ হইয়া আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করে। হঠযোগের আসন, কুস্তক, নাদানুসন্ধান দ্বারা রাজযোগের সমাধি বা উন্মনী অবস্থারূঢ় হইলে কালজয়ী বা মৃত্যুজয়ী হওয়া যায়।

“নাদো যাবৎ মনস্তাবৎ নাদান্তেহপি মনোন্মনী” ।^২

প্রাণায়ামরূপ ক্ষেত্রে, চিত্তরূপ বীজকে, বৈরাগ্যরূপ জলদ্বারা সিদ্ধিত করিলে সর্বইষ্টদাত্রী উন্মনীলতিকার উৎপত্তি হয়, তখন যোগীর জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণ এই পঞ্চ অবস্থার অতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয়, কোন নাদ শ্রুতিগোচর হয় না, কোন চিন্তা থাকে না, তুর্ধ্যাবস্থাবান্

১। যোগতারাৱলী, ২য় স্কোক; গো. সি. স., পৃ ৩৩; হ-যোগ-প্র., পৃ ২২২

পাঠান্তর—নাদানুসন্ধানকমেব মন্তামহে ধন্যতমং লয়ানাম্।

২। নাদবিন্দু উপ., ৪৮ স্কোক

যোগী জীবন্মুক্ত হন। যোগসূত্রে “তদা জ্ঞেয়ঃ স্বরূপে অবস্থানম্” দ্বারাও বৃত্তিনিরোধে আত্মার উক্তরূপ স্বরূপে অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। সমাধিযুক্ত যোগীর শীতোষ্ণ জ্ঞান, ষড়্‌রসের আনন্দন, বিবিধ গন্ধের অনুভূতি থাকে না। সর্বদা সর্ববিষয়ে সমভাব লক্ষিত হয়। এইরূপ যোগীই জীবন্মুক্ত, তাহারই সহজাবস্থালাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

নাদানুসঙ্গানের শেষফলই জীবন্মুক্ততা, কারণ নাদ শ্রবণে বার্তা জগতের আকর্ষণ দূর হয়। শ্যামের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যেরূপ ভাব হয়, ইহাও সেইরূপ, এই নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে ‘মন্ত্রচৈতন্ত্যে’র ব্যবস্থা রহিয়াছে। শব্দবিশেষকে চেতন করিয়া সেই শব্দ সাহায্যে পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই জীবন্মুক্তির স্বরূপ, নাথগণের নাদবিন্দু সাধন অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইতেছে। পৃথিবীর সকল ধর্মসম্প্রদায় এই শব্দচৈতন্ত্যের কথা অতি গাভীরোর সহিত বলিয়াছেন, শব্দ চেতন হইলেই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়। অচেতন শব্দ বারবার জপ করিলে ও তাহার সহিত গুরুর উপদেশানুযায়ী কোন কোন বিশেষ ক্রিয়া করিলে অচেতন শব্দও ক্রমশঃ চেতন শব্দরূপে পরিণত হয়, ইহাই অধম অধিকারীর সাধন। মধ্যম অধিকারীকে গুরু বিশুদ্ধচেতন শব্দ দ্বারা উপদেশ দেন, সেই শব্দ শ্রবণেই বাহ্যাকর্ষণ নিবৃত্ত হয়। শ্রেষ্ঠ অধিকারীকে গুরু মাত্র মৌন উপদেশ দেন।^১

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ পরস্পরসংশ্লিষ্ট, কারণ জগৎ জীব ও ঈশ্বরের মিলনভূমি, প্রয়োজনানুসারে কারণ জগৎ হইতেই অবতারাди স্থূল জগতে অবতীর্ণ হন ও জীবোদ্ধারের নিমিত্ত উপদেশ দেন। কবীর, রৈদাস, নানক প্রভৃতি সন্তগণও জীবোদ্ধারের নিমিত্ত অনহদ নাদের উপদেশ দিয়াছেন। এই নাদের উৎপত্তিস্থল বিরাটের ষট্‌ত্রিংশ মণ্ডলে; প্রত্যেক মণ্ডলের ভিন্ন শব্দ আছে, তন্মধ্যে দশটি প্রকট, ষড়্‌বিংশতিটি অপ্রকট। এতাজ বাঁহুযন্ত্রের ৩৬টি তার ঐ ৩৬টি মণ্ডলের স্মারক। মৃদঙ্গ, মুরলী বীণা ইত্যাদির ধ্বনির দ্বারা দশপ্রকার অনাহত নাদ শ্রুতিগম্য, বাকি ২৬টি অনুভবগম্য। কারণ, মাত্র দশটি মণ্ডল হইতে অবতারাди অজ্ঞাপি স্থূল জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই দশটি মণ্ডল

অপরার অধীন, বাকি ২৬টি পরার অধীন। দক্ষিণ কর্ণে কোন একটি নাদ শ্রবণ অভ্যাস করিলে বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং সাধক স্বর্গের কোন না কোন মণ্ডলে আশ্রয় পান।^১

চিন্তকে মন্ত্রসাহায্যে নাদরূপে ব্রহ্মশক্তিতে লীন করা যায়। কারণ নাদই এই জগৎ প্রপঞ্চের মূল কারণ। নাদে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, নাদরূপে মহাশক্তি এই জগৎরূপে প্রকাশিত, অতএব নাদের জ্ঞান হইলে জগতের জ্ঞান হয়, নাদ আয়ত্ত হইলে জগৎও সাধকের আয়ত্তাধীন হয়। সেইজন্য নাদ ও নাদানুসন্ধানেই জীবের অন্তর্জগতের শক্তিসংকয়ের একমাত্র উপায়। নাথগণ বলেন, মৃত্যুর পর কি অবস্থা হইবে তাহা অজানিত, ইহজীবনেই সাধন দ্বারা ‘আমিহকে’ উপলব্ধি করিতে হইবে ও শক্তিবিকাশ সাধন করিতে হইবে সমুগ্ধগণও এসম্বন্ধে একমত। অতএব নাথগণ ও সমুগ্ধগণ ‘মন্ত্র’সাধনার উপরই জোর দিয়াছেন, মন্ত্রজপের দ্বারা আপনাকে ‘নাদরূপী’ বলিয়া জ্ঞান হইলে জড়ত্ববুদ্ধি অপগত হয় এবং যে পরিমাণে নাদের সহিত পরিচয় হয় সাধক তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হন। নাদানুসন্ধান করিতে করিতে নাদের বিশ্রামভূমি অব্যক্ত ধামে সাধক উপনীত হন, তখন মোক্ষ তাঁহার করতলগত হয়।

অজপা হংসমন্ত্র জপের দ্বারাই জীব পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে। “হংস ঋষিঃ। অব্যক্তাঃ গায়ত্রী ছন্দঃ। পরমহংসো দেবতা। অহমিতি বীজম্। স ইতি শক্তিঃ। সোহহমিতি কীলকম্।”^২ অর্থাৎ হংস বা আত্মাই মন্ত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা, অব্যক্ত গায়ত্রীই ছন্দস্ (বেদ), পরমহংস (পরমাত্মা) দেবতা, ‘হং’ বীজস্বরূপ, ‘সঃ’ শক্তিস্বরূপ এবং ‘সোহং’ই কীলক বা হংসাত্মাকে উপলব্ধি করিবার বিনিয়োগ বা উপায় স্বরূপ।

‘সোহং’ মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়ে অষ্টদল পদ্ম মধ্যে হংসাত্মাকে দর্শন করা যায়।

এই হংসমন্ত্র দ্বারাই জীব দশবিধ নাদ শ্রবণের পর নাদব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। ইহাই নাদ ও নাদানুসন্ধানের রহস্য।

১। ‘অনাহত নাদ’, নয়নানন্দজী সরস্বতী, কল্যাণ সাধনালয় (১ম খণ্ড) পৃ ৩৪৭

২। হংসোপনিষৎ, ১০ শ্লোক।

শ্রী আদিনাথেন সপাদকোটি
লয়প্রকারাঃ কথিতা জয়ন্তি ।
নাদানুসঙ্গানকমেকমেব
মন্ত্যামহে মুখ্যতমঃ লয়ানাম্ ॥১

শ্রী আদিনাথ মহাদেব সপাদকোটি প্রকার চিন্তবৃত্তির নিরোধের
উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায় বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু আমরা
(গোরক্ষ সম্প্রদায়) কেবল নাদানুসঙ্গানকেই লয়সাধনের মুখ্যতম উপায়
স্বরূপ জানিয়াছি ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ওঁকারের স্বরূপ ও তাহার সাধন

সকল সম্প্রদায়ের মূল সাধন ওঁকার, নাথসম্প্রদায়েও ওঁকারসাধনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে : ওঁকারবিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ। তস্মিন্ মধ্যে স্থিতং তত্ত্বং প্রদর্শয়তি সদগুরুঃ ১১ সদগুরু এই ওঁকার সাধনের পথপ্রদর্শক। নাথস্বরূপ মনোবাগতীতো এবং মনোবাঙময়শ্চ তাহা ওঁ, নাথঃ, শক্তি কর্তা ও অকর্তা ভেদে পঞ্চবিধ, প্রণবের দেবতাও পঞ্চ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও শিব। উক্ত শক্তিই কর্তা ও অকর্তা ভেদে দ্বিবিধ, কারণ নাথ লীলাবশে অকর্তাকে কর্তা করেন। ১২ মানবমধ্যে এই চিৎশক্তির বিকাশেই তাহার শিবত্ব উন্মুক্ত হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবায়া যদিও শিবরূপী, তথাপি ব্যবহার-জগতে অনাদি মলের প্রভাববশতঃ জীবের শিবত্ব অভিব্যক্ত নহে, কারণ জীবের স্বাভাবিক শক্তি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। ওঁকার সাধনে চিৎশক্তির বিকাশে জীবায়া শিবসাম্য হয়, এই চিৎশক্তির বিকাশ সম্প্রদায় অনুসারে কৰ্ম, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়। হুংখসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্ত মানব এই তিনটি মার্গের একটি অবলম্বন করে। সংসারাসক্ত 'কৰ্মযোগ', সংসারে অনাসক্ত 'জ্ঞানযোগ' ও আসক্ত ও অনাসক্ত নহে একরূপ ব্যক্তির পক্ষে 'ভক্তিযোগ' সরল ও সুগম পথ, তথাপি গুরু-উপদেশ বিনা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কৃচ্ছ্র তপাদি সাধনে স্বল্পব্যক্তিই সক্ষম, তাই ভক্তিপূর্বক নামস্মরণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়, ভগবানের বাচকরূপ ওঁকারসাধনে মোক্ষলাভ নিশ্চিত। বেদান্তের মার্গ জ্ঞানমার্গ, ওঁকারসমন্বিত গায়ত্রী মন্ত্রের সাধন ইহাতে আছে, তান্ত্রিকের শক্তি উপাসনা ভক্তিমার্গ হইলেও ইহাতেও গায়ত্রী মন্ত্র আছে। ১৩

যোগসূত্রে আছে 'তস্ম বাচকঃ প্রণব' (১।২৭)। শ্রুতিতেও আছে—

১। গো. সি. স., পৃ ৩০

২। ঐ ৪২, ৩০

৩। আত্মার বিদ্যা পরমেশ্বরে ধীমহি, তন্ন কালী প্রচোদয়েৎ।

—ওঁকার ও গায়ত্রীতত্ত্ব, পৃ ১৮১, হরেশচন্দ্র সিংহ।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যায়্য ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদ্ববাং শরবত্তন্যয়ো ভবেৎ ॥ ১৪

আত্মানমরণিং কুত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্ ।

ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদেব পশ্চেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ২২

(ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ)

প্রণবই ধনু, জীবায়্যাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন, প্রমাদহীন হইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। অতঃপর বাণের ন্যায় তন্ময় অর্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন হইবে। আত্মাকে (অস্ত্যঃকরণ) নিজের অরণি ও ঔকারকে উজ্জ্বল অরণি করিয়া ধ্যান দ্বারা মগ্ন করিয়া, নিজেকে ঘটাচ্ছাদিত দীপের ন্যায় দেখিবে। এইরূপে নাদে বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত ঔকার জপ কর্তব্য। হৃদয়মধ্যে পদ্মকর্ণিকায় স্থিরদীপনিভাকৃতি অদৃষ্টমাত্র অচল ঔকার ঈশ্বরের ধ্যান কর্তব্য।

প্রণবধ্যানে অস্ত্যঃকরণ শুদ্ধ হয়, শব্দাদি বিনষ্ট হয়, এবং ব্রহ্মলাভ হয়। চিন্তের চাকলা দূর করিতে হইলে ঔকার সাধনের ন্যায় মন্ত্র আর নাই। চিন্তের মল, আবরণ ও বিক্ষেপ নাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ঔকারসাধনে ব্যাধিস্ত্যানসংশয়াদি একাদশপ্রকার অস্তুরায় ও পঞ্চপ্রকার বিক্ষেপ বিনষ্ট হয়। ঔকারকে ঈশ্বরের বাচক বলা হয়, বাচ্য হইলেন সেই পরমব্রহ্ম বা পরমশিবস্বরূপ সত্তা।

ঔকার ও গায়ত্রী সাধনার অপরিমিত প্রভাব ভারতে প্রাচীনকাল হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। গায়ত্রী ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র, বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের জ্ঞেয়; ঔকার বেদের কোন মন্ত্র নহে, ঔকারের জ্ঞেয় কোন ঋষি নাই, তথাপি ঔকারের যথাবিধি উচ্চারণ ব্যতীত কোন বৈদিক মন্ত্রের বিনিয়োগ হইতে পারে না। বেদভেদে ঔকারের উচ্চারণের পার্থক্য হইয়া থাকে।

‘ওম্’ শব্দ প্রথমতঃ দুই মাত্রা ‘অ’, ‘ম’ বিশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা জ্বালোক ও পৃথিবীকে বুঝাইত, ইহারা ঋগ্বেদের প্রাচীন দেবতা। ক্রমশঃ ঔ শব্দ চারিমাত্রাবিশিষ্ট হইয়াছে। জ্বালোক ও পৃথিবীর আধিদৈবিক দেবতা অগ্নি ও বরুণ। জ্বাপৃথিবীকে মিতুন কল্পনা করা হয়, ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি। এই মিতুন কল্পনা ঋগ্বেদে দেখা যায়। ক্রমশঃ ভূঃ ভুবঃ স্বর্লোক, ঋক্ যজু সামবেদ প্রভৃতি অ-উ-ম দ্বারা নির্দেশিত হইতে লাগিল। অস্তর্জগতে উহা প্রাণ, অপান, ব্যান বায়ুকে নির্দেশ

করিল। অ-উ-ম কারের সহিত যে চতুর্থমাত্রা চন্দ্রবিন্দুর যোজনা হইল, তাহা শক্তি মতানুসারে নাদবিন্দু-কলার স্মারক, নাদরূপিনী মহাশক্তি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি নাদবিন্দু বা শিবশক্তি তত্ত্বমতে অভিন্ন। বৈদিক সাধনের সহিত তান্ত্রিক সাধনের এই যোগ দ্বারা ‘ও’ শব্দের সৃষ্টি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তথাপি ইহাই প্রচলিত হইয়াছে।

ওঁকার সাধনে ‘ত্রিরস্ব’ উপলব্ধি করিতে হয়। এই ত্রিরস্ব নিত্য, ইহারা যথাক্রমে (১) চিৎস্বরূপ, চৈতন্য, পরমেশ্বর বা পরমশিব, (২) চিৎশক্তি বা শক্তি, ইনি পরমশিবের সহিত নিত্যযুক্ত, (৩) বিন্দু, মহামায়া বা কুণ্ডলিনী। এই বিন্দুই উপাদান শক্তি, ইহার দ্বারা জগৎসৃষ্টি হয়, শুদ্ধ ও মলিন ভেদে জগৎ দ্বিবিধ, শুদ্ধজগৎ নিত্য। শুদ্ধ জগতের শুদ্ধ স্তরের উপাদান বিন্দু, বিন্দুর মহামায়া, মায়া ও প্রকৃতি এই তিনটি রূপ আছে। ইহারা তিনটি স্তরবিশেষ। মহামায়া বিন্দু বা কুণ্ডলিনীর স্তর নির্মল, মায়ার স্তরে আবরণযুক্ত মলের আরম্ভ হয় এবং প্রকৃতির স্তরে ত্রিগুণের বশে ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। মহামায়ার উর্দ্ধে কৈবল্যাবস্থা, ইহা শুদ্ধতম অবস্থা হইয়াও চরম অবস্থা নহে। অজ্ঞানাত্ম্য আণবমল (বিজ্ঞানকল) যুক্ত জীবের মহামায়ার জগতেও প্রবেশাধিকার থাকে না, যদিও ইহারা প্রকৃতি ও মায়ার রাজ্যের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। প্রকৃতি হইতে যে চৌদ্দ ভুবন, মায়া হইতে মায়িক জগৎ সে সকল উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধদেহ (মতান্তরে বৈন্দব দেহ)—লাভ হইলেও মহামায়ার জগতে প্রবেশাধিকার জন্মে, কিন্তু এই দেহ লাভের নিমিত্ত সর্বাত্মে দীক্ষার প্রয়োজন আছে।

মানবমধ্যে শিবত্বের অভিব্যক্তির জন্য আত্মশক্তির বিকাশসাধন কর্তব্য, কিন্তু বদ্ধজীবের ঈশ্বরানুগ্রহ বা দীক্ষা ব্যতীত নিজস্ব কোন ক্ষমতা দ্বারা এই শক্তির বিকাশসাধন সম্ভবপর নহে। জীবের অবিচ্ছাদি পক্ষক্লেশ দূর হইলেও জীব জীবই থাকে, কৈবল্যপ্রাপ্তি হইলেও তাহা দ্বারা উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্তি হয় মাত্র, তাহাতে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। তত্ত্বমতে তাই ভগবতী শক্তির বিকাশের নির্দেশ আছে। এই শক্তিবিকাশে জীবের প্রকৃতি-বিজয়ের ক্ষমতা হয়, জীব তখন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন। জীব ঈশ্বর দ্বারাই বদ্ধ বা মুক্ত হন, প্রকৃতি বা পুরুষ বা শক্তি জীবকে বদ্ধ বা মুক্ত করে না। অজ্ঞলোক মাত্রই বদ্ধ, নিজের সুখ-দুঃখে তাহার ইচ্ছাধীন নহে। ঈশ্বর জীবকে বদ্ধ করেন সত্য, কিন্তু

উৎকার ক্রিয়াশক্তি জীবের অন্তরে পতিত হইলে জীবের আবরণ সরিয়া যায়, তখন জ্ঞান ও ক্রিয়া (বা চিৎ) শক্তির বিকাশ হয় ; ইহার নাম ‘দীক্ষা’—ইহার দ্বারা ‘মল’ অপসারিত হয়। “দীক্ষাতে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়াতে ক্লেশকারণম্” ইহাই দীক্ষার অর্থ। গুরু বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা ক্লেশ ক্ষয় করেন। কিন্তু ‘মল’ অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা নহে, ইহা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, দীক্ষার দ্বারা অপসারণীয়। মানবাত্মার দুইটা অবস্থা আছে, শিবাবস্থা ও পশুবস্থা। শিবাবস্থাই স্বাভাবিক অবস্থা, পশুবস্থা অনাদি হইলেও উহা আগন্তুক। দীক্ষা দ্বারা মল বিগত হইলে মানবের পশু অবস্থা দূর হইয়া শক্তির উন্মেষের সহিত দিব্য বা শিবাবস্থা লাভ হয়। মলের দরুণ যে বিপরীত জ্ঞান হয়, তাহাই ‘অজ্ঞান’ ; মল অপসারিত হইলে অজ্ঞানও দূর হয়।

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী শৈবসম্প্রদায় যথাক্রমে শিব ও পরমশিবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অনাদিকাল হইতে নিগ্রহ শক্তির দরুণ মানব মধ্যে পশুভাব বর্তমান, তাহা দূর করিবার জন্তই সৃষ্টি আদি ব্যাপার হইয়া থাকে। মল পরিপক্ব হইলে সাক্ষাৎভাবে অনুগ্রহশক্তি পতিত হয়। সৃষ্টি স্থিতি সংহারই ‘নিগ্রহ’। এই নিগ্রহের পর অনুগ্রহ আসে যেমন রাতের পর দিন বা শীতের পর গ্রীষ্ম আসে। শিবের নিগ্রহ অর্থে মানবের ‘অণু’ভাব বা পশুত্ব, ইহাই জীবের আণবিক চরিত্র, অণুর ভার গ্রহণ করেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ইহারা যথাক্রমে মানবদেহের সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার কর্তা। এই নিগ্রহ শক্তির অবসানে অনুগ্রহ আসিলে জীবের মায়িক বা মহামায়িক জগতে আবির্ভাব হয়। এই অনুগ্রহ লাভের জন্তই মানবের সাধন।

মানবের কর্মের মূলে আছে মায়া ও পশুত্ব, কারণ পশু লইয়াই মায়ার খেলা, ইহার মূল হইতেছে ‘মল’ বা পরমেশ্বর কর্তৃক অনাদি আবরণ। মল অপগত হইলে, অপকদেহ মানবের পক্বতা হয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যোগসূত্রে আছে : “দৃষ্টানুশ্রবিকাবিষয় বিতৃষ্ণা বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্”^১—অর্থাৎ দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা-চিন্তের যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় এই তিন অবস্থার পর বশীকার সিদ্ধ হয়, ইহা অনাভোগাত্মক। দৃষ্ট বিষয় ইহলোকের ভোগৈশ্বর্য আনুশ্রবিক অর্থাৎ পরলোক সম্বন্ধীয় বিষয়, যথা স্বর্গভোগাদি। ইহাতে

বৈরাগ্য হইলে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য হয়, অর্থাৎ যোগীকে ইচ্ছাপূর্বক রাগাদিকে নিবৃত্ত করিতে হয় না। তখন যোগীর চিত্ত সহজতই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে। ইহাই বিষয়ের প্রতি পরম উপেক্ষা। ইহা সাধক মাত্রের কাম্য অবস্থা।

উপরোক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইলে মানবের অজ্ঞান দূর কর্তব্য। ইহা দ্বিবিধ—পৌরুষ অজ্ঞান ও বৌদ্ধ অজ্ঞান। প্রথমটি দূর হয় দীক্ষা দ্বারা, দ্বিতীয়টি দূর হয় শাস্ত্রপাঠ ও তপস্বাদি দ্বারা। পৌরুষ অজ্ঞান অর্থে মানবের মধ্যে যে অজ্ঞান আছে, বৌদ্ধ অজ্ঞান অর্থে বুদ্ধির অজ্ঞান। গুরু দীক্ষা দ্বারা শিষ্যের পৌরুষ অজ্ঞান দূর করেন, শিষ্য স্বীয় সাধনবলে বৌদ্ধ অজ্ঞান দূর করেন। নাথসম্প্রদায়ের সাধন মধ্যে গুরুর স্থান অতি উচ্চে, এবং সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ মধ্যে ওঁকার সাধন বা অনাহত নাদ সাধনের কথাও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। ওঁকারকে বেদের সার ও যোগে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলা হইয়াছে। অ-উ-ম কার যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লোককে প্রতিভাসিত করে। অ-উ-ম কার ও অর্দ্ধমাত্র বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয়ে উত্তরোত্তর প্রবিলয়ে তৃত্বাশিব স্বরূপের মনন সম্ভব হয়, ইহা চতুর্থমাত্রা বা অদ্বৈত-ভাব। এইরূপে বাঙ্মনপাতীতে প্রবিলয় হয়। “অতঃ প্রণব এব বেদ ইত্যভ্যুপগম্য তদ্বারা তৎপ্রবর্তক-নাদব্রহ্মেত্যবলম্ব্য নাদব্রহ্মাণো যৎ স্থূলং তত্ত্বমিতি বিশ্বাস্তিমতাং মতে কা বা ঋতিঃ সাধিকা ন ভবতীতি প্রসিদ্ধতরমেব সর্বত্র।” প্রণব জপ দ্বারাই তাহার প্রবর্তক নাদে এবং নাদব্রহ্মের যে মূলতত্ত্ব তাহাতে উপনীত হওয়া যায় ইহাই সিদ্ধ সম্প্রদায়ের মত।^১

গোরক্ষসংহিতায় আছে—

ওঁকারং পাদলো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।

যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ং ।

প্রণবে নিত্যযুক্তস্ত ন ভয়ং বিজ্ঞতে কচিৎ ॥^২

অর্থাৎ ওঁকারকে প্রত্যেক পাদরূপে জ্ঞানিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। সাধকগণ সর্বদা চিত্তকে প্রণবে সংযোজিত করিবে অর্থাৎ প্রণবরূপ ব্রহ্মে আপনার অদ্বৈতভাব সুদৃঢ় করিবে। এই প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না,

তাই ব্রহ্মকে নির্ভয় বলা হইয়াছে, প্রণবে সর্বদা অর্পিতচিত্ত ব্যক্তির কদাপি কোন ভয় থাকিতে পারে না।

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিद्यমান ঈদৃশ ঔকারকে ঈশ্বর বলিয়া জানা কর্তব্য। একবার ঔকাররূপ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে সংসার নিমিত্ত শোক করিতে হয় না, অতএব ইহা মুনিমাত্রের ধ্যেয়। প্রণব পঞ্চবর্ণযুক্তঃ অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ। এই প্রণবকে ‘হংস’ পক্ষী রূপে বিকৃত করা হয়। ‘অ’কার উক্ত পক্ষীর দক্ষিণ পক্ষ, ‘উ’কার উহার উত্তর পক্ষ, ‘ম’কার তাহার পুচ্ছ এবং অর্ধমাত্রা বা নাদবিন্দু বর্ণদ্বয় তাহার মস্তকস্বরূপ।^১ এই পক্ষীর শরীরে সপ্তলোক বিভাগ আছে—

ভূলোকঃ পাদয়োস্তস্ত ভুবলোকস্ত জানুনোঃ।

স্বলোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ ॥

জনলোকস্ত হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্তথা।

ক্রবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকে ব্যবস্থিতঃ ॥^২

যে বিচক্ষণ যোগী উক্ত হংসে আরোহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারাও সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। “এবমেতাং সমারূঢ়ো হংসযোগবিচক্ষণঃ। ন ভিষ্যতে কৰ্ম্মচারৈঃ পাপকোটি-শতৈরপি।” নাদবিন্দু উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্যক্তি নিয়ত হংসরূপী ঔকারের চিন্তা করেন, তিনি শতকোটি পাপেও আবদ্ধ হন না।^৩

অতঃপর ঔকারের দ্বাদশমাত্রা বিবৃত হইতেছে। গোরক্ষ-সংহিতায় আছে—ইহার প্রথম মাত্রা অকারের দেবতা বশু, দ্বিতীয় মাত্রা উকারের দেবতা অগ্নি, তৃতীয় মাত্রা মকারের দেবতা সূর্য্য আর চতুর্থ বা অর্ধমাত্রাকে পরমামাত্রারূপে পণ্ডিতগণ কীৰ্ত্তন করেন। এই মাত্রাচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের তিন তিন মাত্রা আছে। অতএব ঔকারের দ্বাদশমাত্রা জানা যায়। চিত্ত দ্বারাই এই দ্বাদশমাত্রা জ্ঞেয়—যোষিণী (যোষিণী নাদবিন্দু উপঃ, ৯ শ্লোক), বিছান্মালা (বিছা), পতঙ্গী, বায়ুবেগিনী, নামধেয়া, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, শঙ্করী, মহতী, ক্রবা, মৌনী, ব্রাহ্মী—ইহারাই প্রণবের দ্বাদশ মাত্রা। এই মাত্রাসকল জানিয়া উপাসনা করিলে উক্ত মাত্রাসকলের নামানুসারে সেই সেই লোকে গমন করিতে পারা যায়। (গোরক্ষ-সংহিতা, ৫।২১-২৫ এবং নাদবিন্দু উপনিষদ ১২-১৬ শ্লোকে বিভিন্ন মাত্রায় চিত্তযুক্ত হইয়া সাধকের মরণ হইলে যে যে ফল হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে,

যথা, পরজন্মে সার্বভৌম রাজা হওয়া, যক্ষ, বিজ্ঞানধর, গন্ধর্ব্ব, পশুপতি প্রভৃতি পদপ্রাপ্তি, দ্বাদশী মাত্রাতে চিত্তসমর্পণ ফলে মরণান্তে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়।)

উক্ত দ্বাদশমাত্রারহিত, শুদ্ধ, সর্বব্যাপক নিষ্কল ব্রহ্মের বিজ্ঞানের নিমিত্ত সাধক বিন্দু নামক অন্তনাদাকরে চিত্ত স্থাপন করিবেন, ইহাই প্রণবের পঞ্চমাকরে চিত্তযোজনার ফলস্বরূপ। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মতেজেই সমস্ত পদার্থ প্রকাশ পায়, এই ব্রহ্ম হইতেই সূর্যাদি ও চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণ উদ্ভূত হইতেছে। দ্বাদশমাত্রায় চিত্তস্থাপনের ফল বর্ণিত হইলেও মনোলায়ই নাদধারণার ফলস্বরূপ। পঞ্চান্তরে উক্ত হইয়াছে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠেতে উৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠের সহিত শাস্ত্র হয় তেমনি চিত্ত নাদে প্রবর্তিত হইয়া নাদের সহিতই লয় পায়।^১

প্রশ্লোপনিষৎ মতে ‘অ’কার মাত্রায়ক প্রণবের সাক্ষাৎফলে শীঘ্রই পৃথিবীতে জাত হইতে হয়, ‘উ’কার মাত্রায়ক প্রণব সাক্ষাৎফলে চন্দ্র-লোকের ঐশ্বর্য্য ভোগান্তর পুনরায় মহাশূন্যলোকে প্রত্যাগমন হয় এবং অ-উ-ম এই ত্রিমাত্রায়ক ও এই অক্ষররূপ প্রতীকে পরমপুরুষকে ধ্যান ফলে তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতির্ময় সূর্য্যে সম্মিলিত হওয়া যায়। এই মাত্রাত্রয়ের পৃথকভাবে উপাসনার ফল বিনাশী, কিন্তু পরস্পর-সম্বন্ধরূপে উপাসিত হইলে উহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়।^২ গোরক্ষ-সিদ্ধান্তসংগ্রহে প্রণবের মাত্রা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—ওঁকার মহাসিদ্ধদের ধ্যেয়—অকার বিষ্ণুস্বরূপ, উকার রুদ্রস্বরূপ, মকার ব্রহ্মস্বরূপ, অর্দ্ধমাত্রা শক্তিস্বরূপ, বিন্দু নাথস্বরূপ, ধ্বনি নিরাকার নাথস্বরূপ, ধ্বনি ও বর্ণ উভয়ের মিলনে দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, সাকার নিরাকার অতীত, অদ্বৈতো-পরিবর্তী মহানাথস্বরূপ প্রতিভাত হয়, পৃ ৫৭। ওঁকারে ভূভুবর্লোক চন্দ্রসূর্য্যঅগ্নিদেবতা, ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মীরৌদ্রীবৈষ্ণবী শক্তি, এই সকলই আছে, ইহার জপফলে সাধক পদ্মপত্রের দ্বায়ে নির্লিপ্ত থাকেন, জিতায়ু কামবর্জিত হইয়া নিত্য তারক জপ করেন। ইহাই নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থিরপূর্ব্বক ওঁকার জপ (পৃ ৫৯)। এই তারকই ব্রহ্ম, দণ্ডক বিষ্ণু, কুণ্ডল্যা রুদ্র, অর্দ্ধচন্দ্র ঈশ্বর, বিন্দু সদাশিব, ইহারাই প্রণবের পঞ্চ-দেবতা, নিরঞ্জন ইহাদের উর্দ্ধে। গুরুকৃপা ভিন্ন ঐহিক বিষয় ত্যাগ,

১। গো. সংহিতা, ৫১২০ টীকা; নাদবিন্দু উপা, ১০ শ্লোক।

২। প্রশ্লোপনিষৎ, ৫।৩.৩।

পারত্রিক অভিলাষনিবৃত্তি ও সহজাবস্থালাভ (সমাধিলাভ), সকলই ছিন্নভি।^১

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড ভূলোকের অন্তর্গত, ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকালের কত ব্রহ্মাবিক্ষু ভূবলোকে আছেন, ভুবঃলোক অর্থে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্তী স্থান বা অন্তরীক্ষ, সেখানে সিদ্ধগণের বাস। ভোগবিতৃষ্ণ জীব জগতের কল্যাণার্থে ভূবলোক হইতে পুনরায় উপযুক্ত অবসরে ভূলোকে অবতীর্ণ হন। আর ভোগবিতৃষ্ণ জীব যদি নিত্যাধামে বিরাজ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার স্বলোকে গতি হয়, ইহা সুখহঃখরহিত পূর্ণানন্দময় স্থান। প্রণবের প্রথম মাত্রা ভূলোক, দ্বিতীয় মাত্রা ভূবলোক ও তৃতীয় মাত্রা স্বলোকের জ্ঞাপক। ষট্চক্রসাধনে মূলধার হইতে অনাহত পর্য্যন্ত চারিচক্রে ভূলোকবিষয়ক জ্ঞান হয়, বিশুদ্ধচক্রে ভূবলোকের অনুভূতি হয়, এবং আজ্ঞা হইতে উর্দ্ধে স্বলোকের আশ্বাদন হয়। আজ্ঞাচক্রভেদ হইলে অক্ষয়ধাম সকল অধিগত হয়।

অন্যত্র ঔকারের মাত্রাংশ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—অকারের মাত্রা এক, উকারের মাত্রা দুই, মকারের তিন, উহারা একত্রে ছয়মাত্রা। বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা, তৎপরে মাত্রাংশ আরও কমিতে থাকে, এইরূপে বিন্দু হইতে সমনা পর্য্যন্ত মাত্রাংশ যোজনা করিলে একমাত্রা হয়। মায়াজগতে মন্ত্ৰের ছয় মাত্রা হইলেও, মায়াতীতপদে উহা মাত্র একমাত্রা। এই এক মাত্রাই সৃষ্ণ হইতে সৃষ্ণতর হইয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া কার্য্য করে। এই এক মাত্রার মাত্রাংশ, যথা—

বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা	নাদাস্ত ৩½ মাত্রা
অর্দ্ধচন্দ্র ১ মাত্রা	শক্তি ৬½ মাত্রা
নিরোধিকা ৫ মাত্রা	সমনা ১২½ মাত্রা
নাদ ১২½ মাত্রা	ব্যাপিনী ১২½ মাত্রা

সমষ্টিমাত্রা ১

আবার অ, উ, ম, বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদাস্ত, শক্তি ও ব্যাপিনী ঔকার উচ্চারণে মন্ত্ৰের অবয়ব ক্রমশঃ এই একাদশ কলা বা অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তৎপরের অবস্থাই দ্বাদশীকলা, উহা নিষ্কল, অদ্বৈতাবস্থা।^২

১। গো সি. স. পৃ ৭৭, ৩৯, ৩৩; হ-যো-প্র ৪৯৯ চূর্ণভো বিষয়ভাগো ইত্যাদি।

২। মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমগদ, ম ম গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ—ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৩০২, ৩০৮।

এক্ষণে এই মাত্রাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে : প্রণবের স্বরূপ ত্রিকোণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, সাক্ষি ত্রিবলয়াকার ভূজঙ্গ বিগ্রহ। সুষুম্না কুণ্ডলিনীও ত্রিকোণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হন, এই শক্তির জাগরণে ত্রিকোণের ত্রিবিन्दু এক মধ্যবিন্দুতে পরিণত হয়। সাধক এই বিন্দুভূমিতে ‘অহং’ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিন্দুর পূর্ণ তিরোধান না হওয়া পর্য্যন্ত মহাবিন্দু বা শিবভাবের অভিব্যক্তি হয় না। এই নিমিত্ত কলাঙ্কয়ের সাধন কর্তব্য। প্রণবের চতুর্থমাত্রা বিন্দুকে ‘চন্দ্রবিন্দু’ বলা হয়, তৎপরে উল্লেখযোগ্য প্রধানচক্র অর্দ্ধচন্দ্র (অর্দ্ধবিন্দু), এই অবস্থায় অষ্টকলা শক্তির বিকাশ হয়। ইহার পরে রোধিনী, অনুগ্রহ শক্তি বাতীত ইহার আবরণভেদ কঠিন। ইহা ভেদ হইলে নাদ নাদাস্ত প্রভৃতি নাদভূমির প্রাপ্তি হয় ও চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মরক্তের যে স্থানে নাদের লয় হয় ইহা ঐ স্থান। ইহার পর ত্রিকোণরূপা ‘ব্যাপিনী’, ইহাই বিন্দুর বিলাসস্বরূপ বামাদি শক্তিত্রয় দ্বারা সংঘটিত। অতঃপর ‘সমনা’র আবির্ভাব হয়। ইহা সর্বকারণভূতা, এতদাক্রুত শিবই পঞ্চকৃত্যকারী, এই স্থানে মনোরাজ্যের অস্ত হয়। ইহার পর দেশকালতত্ত্ব প্রভৃতি সদাকালের জ্ঞাত্য তিরোহিত হয়। ইহাই উন্মাদা ভূমি, তথাপি নিষ্কল অবস্থা নহে, কারণ চিদ্রূপা নির্বাককলা এই অবস্থাতেও অবশিষ্ট থাকে, এই কলার নামান্তর দ্রষ্টা বা সাক্ষী। সাংখ্যের কৈবল্য এই অবস্থার ছোতক, কারণ পুরুষ নির্বাককলাস্বরূপ, তিনি দ্রষ্টা বা সাক্ষী এবং ষোড়শী কলা, প্রকৃতি পঞ্চদশ কলায়ক। ‘উন্মাদা’ অবস্থার উর্দ্ধে উঠিলে শিবতত্ত্ব উপলব্ধি হয়, বিন্দু শূন্য হইয়া গেলে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ মহাবিন্দুর পূর্ণস্থিতিতে পরাশক্তি নিত্য অভিব্যক্ত থাকেন, মহাবিন্দু রিক্ত হইলে পরমশিব আবির্ভূত হন। শিবশক্তি অভিন্ন হওয়ায় এই শূন্যত্ব ও পূর্ণত্বের আবির্ভাবও নিত্য। রিক্তদিশাই অমাবস্তা, পূর্ণদিশাই পূর্ণিমা। এক মহাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই যাহা অমাবস্তারূপে সৃষ্টি হয় তাহা কালী এবং যাহা পূর্ণিমারূপে স্কৃষ্ট হয় তাহা ষোড়শী, ত্রিপুরা স্রীবিজ্ঞানামে সাধক সমাজে সুপরিচিত।

অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনোলীনং যদাভবেৎ ।

অনুপমং শিবং শাস্তং যোগযুক্তং সদা বিশেৎ ॥^১

যখন মন গুণাতীত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তখন শিবস্বরূপে প্রবেশ হয়। এই মনোলয়ের প্রধান উপায় ওঁকার জপ, ওঁকার জপপরায়ণ ব্যক্তি শুচি

বা অশুচি অবস্থায় থাকিলেও সর্বদা ঔকার মহামন্ত্র জপফলে কদাচ পাপাদি দ্বারা লিপ্ত হন না, পদ্যপত্রে জলের ন্যায় প্রণবজপকারী নির্লিপ্ত থাকেন।^১

জীব এই ‘মহামন্ত্র’ দিবারাত্রি জপ করিতেছে, ইহারই নামান্তর ‘হংস’মন্ত্র বা অজপা গায়ত্রী। দিবারাত্রিতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা জীব একবিংশতিসহস্র ষট্শত বার ঐ মন্ত্রজপ করিতেছে, এই গায়ত্রী যোগীদের মোক্ষদায়িনী। ইহার ন্যায় বিজ্ঞা, ইহার ন্যায় জপ বা জ্ঞান কখনও হয় নাই বা হইবে না, এই অজপা গায়ত্রী কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহার দ্বারা জীবন সঞ্চারিত হয়, সুতরাং ইহাকে প্রাণবিজ্ঞা বলে। অজপা গায়ত্রী উচ্চারণের সহিত প্রাণবায়ুর ক্রিয়া হয় বলিয়া উহা প্রাণের তোষয়িত্রী, কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি হয়।^২

বিবেকমার্ভণ্ডে উক্ত হইয়াছে, শ্রী আদিনাথ স্বয়ং মীননাথকে অজপা গায়ত্রীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, ইহা যোগীদের মোক্ষদায়িনী, ইহার সঙ্কল্প-মাত্রেই সর্বপাপ মোচন হয়, “অনয়া সদৃশী বিজ্ঞা, অনয়া সদৃশো জপঃ। অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ অনয়া সদৃশং স্বর্গমনয়া সদৃশং তপঃ। অনয়া সদৃশং বেজং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥” প্রণব নিগুণ, ইহা বেদমাতা গায়ত্রীর ‘আত্ম’, পাছকা পরমন্ত্র, শ্রীগুরু পরদেব, শাক্ত পরমার্গ, কুলপূজা পরপূণ্য।^৩ প্রণবের অ-উ-ম এই তিন মাত্রা এবং বিন্দু ও নাদ এই পঞ্চটি শিবের পঞ্চমুখস্বরূপ এবং এই পঞ্চতত্ত্বই ‘পাছকাপঞ্চক’।^৪ শিবোপনিষদে আছে “ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ”—ইহারা প্রণবের পঞ্চদেবতা।^৫

ছান্দোগ্য, মাণ্ডুকা, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ও ভাগবত-পুরাণে প্রণব প্রশংসা আছে। গীতাতে আছে—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥^৬

অর্থাৎ ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ও উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

এই একাক্ষর নাম স্মরণ দ্বারা ব্রহ্মলাভ বা শিবহলাভ সম্ভব তাহা

১। গো. সং, ৭১২৯।

২। গো. সং, ১১০৮, ৪০।

৩। বিবেকমার্ভণ্ড, উল্লেখ গো. সি. স., পৃ ৪০, ৪১। গো. সং, ১১০৯ অনয়া সদৃশী বিজ্ঞা ইত্যাদি।

৪। গো. সি. স., পৃ ৪৩

৫। ময়যোগ অবদূত জ্ঞানানন্দ, পৃ ২১

৬। শিবোপনিষদ, উল্লেখ গো. সি. স., পৃ ২৭

৭। গীতা ৮।১৩

পূর্ব পূর্ব সাধকদের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাক্তন নাথসম্প্রদায় মধ্যেও ইহার সাধন ছিল, তাহা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি হইতে উল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছে। ঔকার সাধন বা প্রণব মহামন্ত্রের জপের তাহার যথার্থ অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। আধুনিক জগতে 'শব্দ বিজ্ঞানে'র সর্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইলেও 'শব্দব্রহ্মে'র তাৎপর্য আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। ঔকার সাধনকেই প্রাচীন আগম শাস্ত্রে 'শব্দযোগ' বা বাগ্‌যোগ বলিত, ইহাই নাদবিন্দুসাধন প্রক্রিয়া, ইহার সাধনেই পরমপদপ্রাপ্তি হয়।

শৈবাগমের অন্তর্গত ব্যাকরণ আগমেও এই শব্দযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। ভর্গুরির বাক্যপদীর ও তাহার সাম্প্রদায়িক প্রাচীন ব্যাখ্যায় ইহার পরিচয় আছে। ব্যাকৃত শব্দের বৈখরী অবস্থা হইতে মধ্যমা, তৎপরে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চাত্তীরূপে প্রবেশ করাই এই যোগ সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য। পশ্চাত্তী হইতে পরা অবস্থায় অর্থাৎ অব্যাকৃত পদে গতি ও তথায় স্থিতি স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে, অতএব তাহা কোন সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

বৈখরী বা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দবিশেষের মিশ্র অবস্থা বলিয়া তাহা আগন্তুক মলে পূর্ণ, গুরু উপদেশানুযায়ী সাধন করিলে যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল শব্দকে তাহার স্থূলাবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধাবস্থায় পরিণত করিয়া ব্রহ্মলাভ করা যায়। মন্দ বা ভাল যে কোন শব্দকে ব্রহ্ম মানিয়া লইয়া শব্দব্রহ্মের উপাসক সাধন করিবেন, কারণ ব্রহ্ম এক ও সম এবং অনুকূল প্রতিকূলাদি শব্দ বা রাগদ্বৈষ হর্ষপ্রশংসাত্মক শব্দাদি সাধকের নিকট একার্থবোধক। স্থূল মলপূর্ণ শব্দকে শোধন করার নামই 'শব্দসংস্কার', শুদ্ধ শব্দই শক্তিক্রিণী, একটি মাত্র শব্দকে শুদ্ধ করিতে পারিলে জীব সদাকালের জ্ঞান কৃতকৃত্য হয়। এই এক শব্দ তখন জীবের সম্মুখে কামধেনুরূপে আবির্ভূত হইয়া সাধককে অলৌকিক শক্তি প্রদান করে; "একঃ শব্দঃ সমাগ্ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি", বশিষ্ঠাদি ঋষি এই সাধনাদ্বারাই বিভূতिलाভ করেন। শোধিত শব্দশক্তি প্রাণশক্তির সহায়ে সূক্ষ্ম পথে উর্দ্ধমুখী হয়, এই পথ জ্ঞাপাদি ক্রিয়া দ্বারা স্বল্পমুক্ত হয় এবং ইড়াপিঙ্গলা অপেক্ষাকৃত স্তম্ভিত হয়। এই অবস্থায় 'অনাহত নাদ' প্রকটিত হয়, ইহাই শব্দের সূক্ষ্ম বা মধ্যমাবস্থা। স্থূল শব্দ বিরাট প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া চেতনভাব ধারণ

করে। ইহাই মন্ত্রচেতনের উন্মেষভাব। দেশ বা কাল এই শব্দের ক্ষুণ্ণি রোধ করিতে অক্ষম, সাধক এই অবস্থায় জীবমাত্রেরই চিত্তবৃত্তিকে অপরোক্ষভাবে শব্দরূপে জানিতে সক্ষম হয়। ইহার পর বালসূর্য্যসমান শব্দব্রহ্মরূপী আদিত্য সাধকের ইষ্টদেবতা বা আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া অন্তরাকাশের অন্ধকার দূর করেন, আগমশাস্ত্রে ইহাই ‘পশ্যন্তী বাক্’। প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে ইহাকেই ঋষিঃপ্রাপ্তি বা মন্ত্রসাক্ষাৎকার বলা হইয়াছে। আত্মদর্শন, শিবনেত্রের বিকাশ, জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন, ইষ্টদেবতাদর্শন, ঘোড়শীকলার উন্মেষ অথবা সাংখ্যে বর্ণিত দ্রষ্টা পুরুষের স্বরূপাবস্থিতিক্রম কৈবল্য, এই সকলই পশ্যন্তী ভূমির বিভিন্ন অবস্থা। পশ্যন্তী অপেক্ষা পরাভূমির পথ অত্যন্ত গুপ্ত, ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অনধিকারচর্চা।^১

বেদান্তমতে বাচ্য ব্রহ্ম, বাচক প্রণব। তন্মধ্যে বাচ্য ও বাচককে কুণ্ডলিনীর দ্বিবিধা মূর্ত্তি বলা হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের কুণ্ডলিনীতত্ত্ব ও শব্দ-ব্রহ্মতত্ত্ব দুইটি পরমরহস্য। সারদাতিলক তন্মধ্যে আছে শব্দব্রহ্ম চৈতন্যরূপে সর্বভূতে অবস্থিত, সেই শব্দব্রহ্ম কুণ্ডলিনীরূপে প্রাণিগণের দেহমধ্যে থাকিয়া পুনর্ব্বার কণ্ঠতালু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সঞ্চারিত হইয়া গল্পপত্নাদিরূপে আবির্ভূত হন।

চৈতন্যং সর্বভূতানাম্ শব্দব্রহ্মেতি মে মতম্।

তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং
বর্ণাঙ্ঘ্রনাবির্ভবতি গল্পপত্নাদিভেদতঃ ॥^২

গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যমোঙ্কারমেকং রবিকোটাদীপ্তিম্।

পশ্যন্তি যে সর্বজ্ঞনাস্তরস্থং হংসাত্মকং তে বিরজা ভবন্তি ॥^৩

অর্থাৎ যাহারা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মধ্যে ঔকার অক্ষরে ‘হংস’ দর্শন করেন যে হংস গমনাগমন শূন্য, কোটিসূর্য্যাদীপ্তিতুল্য এবং সর্বজ্ঞনের অন্তরে স্থিত, তাহারা রজোগুণমুক্ত হন, এবং সর্বোচ্চপদ প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রই হংসযোগের বীজ। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—

স্বরেণ সাধয়েদ্ যোগমন্ত্রং ভাবয়েৎ পরম্।

অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইত্যতে ॥

১। শব্দযোগ ও বাণযোগ, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ (কল্যাণ যোগাঙ্ক), পৃ ৫২, ৫৩

২। ঔকার ও গাণ্ডীতত্ত্ব—হরেশচন্দ্র সিংহ, বিজ্ঞানবি, পৃ ১২০।

৩। ধ্যানবিন্দু উপঃ, ২৪ সৌক।

এবং “তাবদ্ রথেন গন্তব্যং যাবদ্ রথপথি স্থিতঃ। স্থিত্বা রথং যথাস্থানম্
রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি। মাত্রালিঙ্গপদং ত্যক্ত্বা শব্দ ব্যঞ্জনবর্জিতম্।
অস্বরেণ মকারেণ পদ্যং সূক্ষ্মং চ গচ্ছতি।”

এস্থলে ঔকাররূপ রথে আরোহণের কথাই বলা হইয়াছে।
ব্রহ্মলোকে পৌছাইবার নিমিত্ত ঔকাররূপ রথের আবশ্যক, গম্যস্থানে
পৌছিলে রথত্যাগ কর্তব্য। তখন মাত্রালিঙ্গপদ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া,
স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণও ত্যাগ করিয়া, মাত্র অস্বর ‘ম্’ অক্ষর সাহায্যে
ব্রহ্মলোকে পৌছান যায়। এই অস্বর ‘ম্’ অর্থে বাক্যের উর্দ্ধে উঠিয়া
ব্রহ্মলাভ হয়। ‘ও’ স্বর, ‘ম্’ অস্বর এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, স্বর দ্বারা
অর্থ্যং মন্ত্রবাক্য দ্বারা যোগসাধন হয়, কিন্তু পরমপদ লাভ করিতে
হইলে তদূর্দ্ধে অস্বরের সাহায্য লইতে হয়। “ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ধোয়ঃ
সর্বমুমুকুতিঃ।”^১ ‘অ’কার পীতবর্ণ রজোগুণ, ‘উ’ শুক্লবর্ণ সাত্বিক,
‘ম্’ কৃষ্ণতামস এবং ঔকারের অষ্টঅঙ্গ, চতুষ্পদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতা
আছে। ঔকারের হৃদ উচ্চারণে পাপনাশ হয়, দীর্ঘ উচ্চারণ সম্প্রদ,
অর্ধমাত্রাসমায়ুক্তঃ প্রণবো মোক্ষদায়কঃ।”

ঔকারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণাস্তিকং।

যাবহলং সমাদধ্যাৎ সম্যক্ত্ নাদলয়াবধি ॥^২

সাধকের যতদূর সম্ভব ঔকার নাদে মনকে আসক্ত করা কর্তব্য, যতক্ষণ
শ্বাসের গতি নিয়মিত না হয় ও নাদ লয়প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত
এইরূপে অভ্যাস কর্তব্য।

প্রণবের অষ্ট অঙ্গ—অ, উ, ম, বিন্দু, নাদ, কলা, কলাতীত ও
তৎপর। চতুষ্পাদ—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় (বাষ্টিতে) এবং বিরাজ,
সূত্র, বীজ ও তুর্য্য (সমষ্টিতে)। ত্রিস্থান—জাগ্রৎস্বপ্নশুষ্টি অবস্থা,
স্থূলসূক্ষ্মকারণ দেহ, সত্ত্বরজস্তমোগুণ, ক্রিয়া ইচ্ছাজ্ঞান শক্তি, ভূতবর্তমান-
ভবিষ্যৎ কাল। পঞ্চদেবতা—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব। ইহাদের
না জানিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।^৩ প্রপঞ্চসারমতে জাগ্রৎ—বীজ,
স্বপ্ন—বিন্দু; শুষ্টি—নাদ, তুরীয়—শক্তি, লয়—শাস্ত।^৪

অন্যত্র ঔকার রূপ অন্তঃপ্রণবকে অষ্টভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—

১। গো. সি. স., পৃ ২, ৭, তুলনীয় ব্রহ্মবিন্দু উপঃ ও অমৃতনাদোপনিষৎ, ৩, ৪ শ্লোক।

২। ধ্যানবিন্দু উপঃ, ৬ শ্লোক।

৩। ধ্যানবিন্দু উপঃ, শ্লোক ১২, ১৩, ১৭ শ্লোক।

৪। ই শ্লোক, ২০

৫। Adyar Up., p. 153 ff.

৬। Serpent Power, p. 82 f. n.

অ-উ-ম, অর্দ্ধমাত্রা, নাদ, বিন্দু, কলা ও শক্তি। প্রণবকে ব্রহ্ম বা সংসার তারক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ‘সংহার প্রণব’ ও ‘সৃষ্টি প্রণব’ এই ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। সংহার প্রণবই ব্রহ্মপ্রণব বা অর্দ্ধমাত্রা প্রণব; সৃষ্টি প্রণব অমৃত, বাহু ও উভয়াঙ্গক প্রণবভেদে ত্রিবিধ, উহারা যথাক্রমে ব্যবহারিক প্রণব, আর্ষ প্রণব ও বিরাট প্রণব। সংহার প্রণব নিগুণ, বিরাট প্রণব সগুণ, উৎপত্তি প্রণব উভয়াঙ্গক।

বিরাট প্রণবের ষোড়শ মাত্রা আছে এবং ইহা ষট্‌ত্রিংশতত্বাতীত। ষোড়শ মাত্রা, যথা—অ-উ-ম, অর্দ্ধমাত্রা, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীতা, শাস্তি, শাস্ত্যতীতা, উন্ননী, মনোন্ননী, পুরী, মধ্যমা, পশুস্তী ও পরা। এই ‘পরা’র ৬৪ মাত্রা আছে, পুরুষের ২৮ মাত্রা, প্রকৃতির ২৮ মাত্রা, অর্থাৎ ইহা সগুণ-নিগুণের ঐক্যভূমি।^১

নাদবিন্দু উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, “সহস্রার্ণমতীবাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ। এবমেতাং সমাক্রতো হংসযোগবিচক্ষণঃ।”^২ অর্থাৎ ওঁকার (ইহাতে ‘অ’কার যুক্ত আছে), সহস্র অঙ্গবিশিষ্ট (বৈদিক শাস্ত্রানুসারে ‘অ’কার সহস্রাঙ্গযুক্ত)। হংসযোগ বিচক্ষণ ব্যক্তি যিনি বিরাজ বিজ্ঞায় পারদর্শী তিনি কোন পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না।

প্রণবের চারি মাত্রা—প্রথমা, অপরা, উত্তরা ও পরমা। ইহারা যথাক্রমে আগ্নেয়ী, বায়বী, ভায়ুমণ্ডলসঙ্কাশা ও বারুণী, অর্থাৎ প্রথম মাত্রা ‘অ’কার অগ্নি (বিরাজ) সহ যুক্ত, দ্বিতীয় মাত্রা ‘উ’ বায়ুর সহিত যুক্ত, তৃতীয় মাত্রা ‘ম’কার (বীজাঙ্গা) সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পায় (সূর্য্যই ইহার দেবতা), এবং চতুর্থ বা অর্দ্ধমাত্রাকে বরুণা (তূর্য্য) বলিয়া পণ্ডিতগণ জ্ঞানেন। ইহাদের প্রত্যেকের তিনটি করিয়া কলা আছে, তাই ওঁকারের দ্বাদশ কলা। এই মাত্রা সকল চিত্ত দ্বারাই জ্ঞেয়।^৩

প্রণবোপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভের উপায় ওঁকারের চারি মাত্রা ধ্যান। ওঁকারের কলা বা মাত্রা চারিটি, অ-উ-ম এবং অব্যবহার্য্য বা অর্দ্ধমাত্রা। ব্রহ্ম ও চারি প্রকার শুদ্ধ (তূর্য্য বা শাস্ত), ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। মায়া কার্য্যোপাধিরহিত ব্রহ্মই শুদ্ধ মায়েোপহিত ‘ঈশ্বর’। অপকীকৃত ভূত-কার্য্যরচিত সমষ্টিভূত সূক্ষ্মশরীরোপহিত ‘হিরণ্যগর্ভ’ এবং পকীকৃত ভূতকার্য্যরচিত স্থূল শরীরোপহিত ‘বিরাট’ পুরুষ। জীবও চারিপ্রকার

১। নারদপ বিব্রাজক উপঃ, অষ্টম উপদেশ, প্রথম সৌক।

২। নাদবিন্দু উপঃ, সৌক ২।

৩। গো. সং., ৫১৫, ১৬, ১৭, নাদবিন্দু উপঃ, ১১০, ৭।



অবস্থায়ুক্ত—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। সেই অবস্থাভেদে জীব বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও অব্যবহার্য্য নাম ধারণ করে। ওঁকারের চারি মাত্রার ধ্যান বা ভেদচিন্তা এইরূপে করিতে হয়—বিশ্ব, বৈশ্বানর ও অকারমাত্রার একতার ধ্যান অর্থাৎ পরমাত্মার বিশ্বরূপ, জীবাত্মার বৈশ্বানররূপ ও ‘অ’কারমাত্রাকে এক জ্ঞান করিতে হইবে। সেইপ্রকার হিরণ্যগর্ভ, তৈজস ও ‘উ’কার এবং ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ ও ‘ম’কারের একতা ধ্যান কর্তব্য। শুদ্ধচিদ্রূপ, আত্মচিদ্রূপ ও ওঁকারের অব্যবহার্য্যের একতা ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যানযোগের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা শিবত্বলাভ হইবে।

অকারমাত্রাঃ বিশ্বঃ স্রাজ্জকারতৈজসঃ স্মৃতঃ ।

প্রাজ্ঞো মকার ইত্যেবং পরিপশ্যেৎ ক্রমেণ তু ॥

অকারঃ পুরুষঃ বিশ্বমুকারে প্রবিলাপয়েৎ ।

উকারঃ তৈজসঃ সৃক্ষ্মঃ মকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥

মকারঃ কারণঃ প্রাজ্ঞঃ চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ ॥^১

স্বরবর্ণ যেরূপ স্বতন্ত্র, ‘অ’ ও ‘উ’ সেইরূপ স্বতন্ত্র; ব্যঞ্জন যেরূপ পরতন্ত্র, মায়াবাচক ‘ম’ও তদ্রূপ। প্রণবের চতুর্থ মাত্রা অমাত্র, উহা প্রপঞ্চোপশম, শিব ও অদ্বৈত। অতএব উহা অব্যবহার্য্য নামে খ্যাত। এই চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, কারণ উহা নাদরূপ, এবং স্বর ও ব্যঞ্জনের সংঘাতের অমুরণনের দ্বারা লক্ষিত হয়।

“তিশ্রোমাত্রাঙ্কিমাত্রা চ ত্র্যক্ষরশ্চ শিবশ্চ তু”—অ-উ-ম, যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নিরূপে ধোয়, অঙ্কিমাত্রা দীপশিখার স্থায় ত্রিমাত্রার উর্দ্ধে স্থিত।^২ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ওঁকার প্রকৃতি-পুরুষের সমন্বয় দ্বৈতবাদকে তিনি অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিয়াছেন, এই সমন্বয়ই ‘শব্দব্রহ্ম’, ইহাই ওঁ শব্দ প্রভৃতি দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। শব্দের তিনটি অবস্থা—পশ্চাত্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—অ-উ-ম রূপে প্রতিভাত হয়। বিন্দুগর্ভস্থ বিশ্বের মূলস্বরূপ মহাত্রিকোণ উক্ত ত্রিবিধ বাক্ ও পরাবাক্ সমন্বিত। ত্রিকোণের ত্রিরেখা দ্বারা ত্রিবিধ বাক্, সৃষ্টিস্থিতিসংহার, ব্রহ্মাবিস্ফুরজরূপ শিবাংশ ও ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপ শক্ত্যাংশ প্রতিভাত হয়, ত্রিকোণের মধ্য-বিন্দুই পরাবাক্ বা শিবশক্তির সাম্যভাব। ত্রিকোণের ত্রিবিন্দু ত্রিজগতের স্রোতক। অন্তর্মুখী প্রেরণায় ত্রিবিন্দু এক হইয়া মধ্যবিন্দুতে লয়প্রাপ্ত

১। প্রণবোপাসনা—হরিশ্চন্দ্রী শর্মা বেদান্তাচার্য্য, কল্যাণ সাধনাক (২য়), পৃ ১৪৮২।

২। ব্রহ্মবিজ্ঞোপনিষৎ, ৩, ৮, ২ শ্লোক।

হয়, ইহাই দিব্যমিথুন, যুগনন্দরূপ, নিত্যলীলা প্রকৃতি নামে পরিচিত। এই ত্রিকোণই প্রণবের স্বরূপ, ইহাই কুণ্ডলিনী শক্তি, ইহার প্রবোধনে শিবশক্তির মিলন হয় এবং জীব শিবে অভেদ প্রাপ্তি হয়। তখন বিন্দু বা ত্রিকোণের ভেদও অপগত হইয়া এক অনামা মূলতত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই মূলতত্ত্বকে সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কবীরাদি ইহাকেই 'নিরঞ্জন' বলিয়াছেন, শিবদয়াল ইহাকেই 'রাধাস্বামী' বলিয়াছেন। শব্দত্রয়ের বা ঔকারের কূটস্থ রূপই 'বিন্দু' এবং পরিণামরূপ 'নাদ'। কূটস্থরূপে তাহা বিন্দু মাত্র, তাহার স্থিতি আছে, পরিসর নাই। বিন্দুর প্রসার হইলে তাহা হইতে রেখা ও ক্রমশঃ ক্ষেত্রাদি উৎপন্ন হয়, নাদের স্পন্দনে বা ইচ্ছাশক্তির বিকাশে বিন্দুতে অভিঘাত ফলে এক হইতে বহুর সৃষ্টি হয়। খৃষ্টানদের মতেও ঈশ্বরের বাক্য হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমান ও আল্লার 'কুন' শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি কল্পনা করেন। সম্ভ্রান্ত 'নাদবিন্দুসংযোগে' বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। বেদান্তীর 'ক্ষোটিবাদ'ও ইহাই। একমাত্র অদ্বৈতবাদীরা প্রকৃতিতত্ত্ব অস্বীকার করেন। বৈষ্ণবের লীলাপুরুষ শব্দত্রয়ের অনুরূপ, তিনি সঙ্কল্প দ্বারা এক হইতে বহু হন। দাদু বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে ঔকারের উৎপত্তি, তাহা হইতে পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি এবং পঞ্চতত্ত্ব হইতে ঘটাদি ও ঘটাদি হইতে বর্ণাদির উৎপত্তি হইয়াছে।^১

মাণ্ডুক্য উপনিষদ ও গোড় পাদাচার্যের মাণ্ডুক্যকারিকার ঔকারকে 'আত্মা' বলা হইয়াছে। এই আত্মার চারিপাদ আছে। বিশ্বনামক অধ্যাত্ম ও বৈশ্বানর নামক অধিদৈবী দেহী প্রথম পাদ, ইহা জাগরিত অবস্থার পরিচায়ক। ছান্দোগ্য বৈশ্বানরের উপাসনা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে এবং দেহস্থ সপ্ত অঙ্গের সহিত ছালোক, আদিত্যাদির অবস্থান বর্ণিত আছে। তৈজস নামক অধ্যাত্ম ও সূত্রসংজ্ঞক অধিদৈবী দেহী দ্বিতীয় পাদ, ইহা স্বপ্নাবস্থার পরিচায়ক, ইহার ভোগ্য বাহ্যৈন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে, ইহা মনঃকল্পিত সূক্ষ্ম বিষয়কে গ্রহণ করে। ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ আত্মার তৃতীয় পাদ, ইহা সুষুপ্তি অবস্থা, ইহাতে বুদ্ধির লয় হয় বলিয়া দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, ইহা আত্মা ও পরামাত্মার যোগ বা আনন্দময় অবস্থা।

এই তিনটি পাদ মায়ামাত্র, চতুর্থ পাদ অনাবৃত শুদ্ধচিদাত্মা তুরীয়

অবস্থা। ইহা বর্ণনাতীত অদ্বৈতস্বরূপ শাস্ত্র ও শিব অবস্থা। ইহাই আত্মা, ইহাই জ্ঞেয়। আত্মার আগমোক্ত চারিটি স্বরূপ—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাকী ; নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞা ও শাস্ত্র ইহার কলা। আত্মার অ-উ-ম দ্বারা বিধ, তৈজস, ও প্রাজ্ঞের সহিত অভেদাত্মক হওয়া যায়, কিন্তু তুরীয় অমাত্রের উপলক্ষিতে গতি থাকে না, কারণ উহা প্রপঞ্চশূন্য অদ্বিতীয় অবস্থা। “অমাত্রশ্চতুর্থোহবাবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবো-
হদ্বৈতএবমোকার আত্মৈব সংবিশত্যাশ্বনাশ্বানং য এবংবেদ, য এবংবেদ”।^১
অর্থাৎ যিনি পাদ ও মাত্রার একক জ্ঞানেন তাঁহার দ্বারা অমাত্র ওকার তুরীয় ব্যবহারাতিত, জগতের নিবৃত্তিস্থল, মঙ্গলময় অদ্বিতীয় আত্মরূপে পর্যাবসিত হয়। ইহার বেত্তা পরমাশ্বায় প্রবেশ করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, ওকার সাধনে আত্মা-পরমাশ্বায় ঐক্য ধ্যানে ক্রমমুক্তি হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাদবিন্দু কলা

হঠযোগপ্রদীপিকাতে (৪১১) যে গুরু-নমস্কার আছে তাহা নাদবিন্দু ও কলাস্বরূপে বর্তমান ঈশ্বরাভিন্ন শিবরূপী গুরুকেই নমস্কার, তিনিই নিরঞ্জনপদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। যথা—

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলায়নে।

নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ ॥৪১১ হ-যো-প্র

সকলের মূলে আছেন চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর। চিৎশক্তি তাহার সহিত সদাই যুক্ত হইয়া আছেন। সেই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় শিব বা পরমেশ্বর 'সকল', শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শিব 'নিষ্কল'। গায়কের নিদ্রিতাবস্থায় তাহার শক্তি যেরূপ সুপ্তিমগ্ন থাকে, শিবের নিষ্কল অবস্থায় শক্তিও তদ্রূপ সুপ্ত থাকেন। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শিব সদাই জাগ্রত, শক্তিরই জাগরণ বা সুপ্তি তাঁহাতে আরোপিত হয় মাত্র। জীব বা জড়জগতের তুলনায় শিবকে 'সকল' 'নিষ্কল' আখ্যা দেওয়া হয়। শিবই একাধারে বিরুদ্ধগুণযুক্ত সকল ও নিষ্কল। বাস্তবিকপক্ষে এই পরস্পরবিরোধী গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভব নহে।

চিৎস্বরূপ পরমাত্মা নিরূপাধিক। ভগবতী শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আবির্ভূত হন। পরমাত্মার শক্তি 'ওঁকার', তিনি 'ত্রিপুরা' নামে প্রসিদ্ধ।

দশমহাবিজ্ঞার তৃতীয়া বিজ্ঞা ষোড়শী জীবিজ্ঞা বা ত্রিপুরাসুন্দরী। ত্রিপুরা উপনিষদ হইতে জানা যায় এই উপাসনা বেদ হইতে তত্ত্বে গৃহীত হইয়াছে। একমাত্র ত্রিপুরাই আদিতে ছিলেন, শিবশক্তির ঐক্য ভাবনা দ্বারা সাধক যে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন, তাহা ত্রিপুরা বিজ্ঞাকেই আশ্রয় করিয়া করেন। শ্রীগোড়াপাদাচার্য্য এই জীবিজ্ঞার উপাসক ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যও শৃঙ্গেরী মঠে জীবিজ্ঞার যন্ত্র স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। গোড়াপাদাচার্য্যের জীবিজ্ঞার সূত্রে আছে "আত্মৈবাত্মণ্ডাকারঃ চৈতন্যস্বরূপা চিচ্ছক্তিঃ" (২-৩) অর্থাৎ এক অখণ্ডাকার, তাহাই তাঁহার আকার। তাঁহার যে শক্তি সেই শক্তি চৈতন্যস্বরূপা চিৎশক্তি ও শিবের

ন্যায় অথঙ্কার। তত্ত্বত্রয়যোগে তিনি অভিযাক্ত হইয়া জীবের প্রতি কল্যাণ করেন। তিনিই অখ্যাতা বা অনাগ্নী ‘শ্রীবিজ্ঞা’।^১

সেই সনাতন শিব নিত্য বস্তু, তিনি সকলে অবস্থিত, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, বিকারশূণ্য, তিনি স্বয়ং কৰ্ত্তা বা ভোক্তা নহেন, সাক্ষিমাত্র।

শারদাতিলকে আছে—

নিগুণঃ সগুণশ্চৈতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।

নিগুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ॥^২

অর্থাৎ সনাতন শিবতত্ত্ব নিগুণও বটে, সগুণও বটে। প্রকৃতি হইতে পৃথক বিবেচিত হইলে তিনি নিগুণ, আর প্রকৃতিযুক্ত চিন্তাতে তিনি সৃষ্টির উপযোগী বলিয়া সকল বা সগুণ ব্রহ্মরূপে কথিত হন। ‘কলা’ শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি, কলা এখানে অংশ অর্থে ব্যবহার হয় নাই।

চিৎশক্তির আসন চিদাকাশ, ইহাই মহামায়া বা বিন্দুর স্তর এবং এই বিন্দুই ‘কারণবিন্দু’, ‘পরবিন্দু’, ‘মহাবিন্দু’ প্রভৃতি নামে খ্যাত। সমস্ত সৃষ্টি চিদাকাশ হইতে বিস্তৃত হয়, জলবিন্দুদের ন্যায় প্রতিফলিত কত শত সৃষ্টির পুনরাবির্ভাব ও লয় হইতেছে। সুতরাং চিদাকাশ সকল সৃষ্টির আধার ও অবিনাশী। এই চিদাকাশ কি? সৃষ্টির বিকাশের জন্ত যে সকল পরবর্তী অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, তাহারা সেই ‘তৎ’ (বেদান্তের অনাদি আদি তত্ত্ব) বা মনবুদ্ধির অগোচর ও অগম্য যে অবস্থ বস্তু বা ‘চিৎ’ তাহা হইতেই আগত। তৎ হইতে আগত বলিয়া তাহারা ‘তত্ত্ব’ নামে অভিধেয়। যে তত্ত্ব চিৎএর প্রথম বিকাশোন্মুখ অবস্থা তাহাই ‘চেতন’, ইহা অব্যাক্ত অবস্থা, বীজের অঙ্কুরের ন্যায় অপরিপুষ্ট বা ‘কলান’ অবস্থা। এই চেতন হইতে ক্রমশঃ সৃষ্টির অঙ্কুর উদগত হইয়া চৈতন্য নামে কথিত হয়, তাহাই আরও বিকশিত অবস্থায় ‘চিন্তে’ পরিণত হয়। জীবের মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদিই চিন্ত। অতএব এক চিৎ হইতে চেতন, চৈতন্য ও চিন্ত এই তিনটি অবস্থাভেদ লক্ষিত হইল। কিন্তু চিৎ, চেতন ও চিন্তকে অপ্রভেদে অনেক স্থলে ‘চিদাকাশ’ আখ্যা দেওয়া হয়। এই চিন্তাকাশই ব্রহ্মচিন্তের চেতনত্ব হইতে চিন্তের বিকাশ, সেইজন্ত চিন্তাকাশ চৈতন্যধাম, সদাস্থায়ী বলিয়া সৎ ও আনন্দধাম

১। শ্রীমদ্বৈতপাদ্যচরণের শক্তিবাদ, বেদান্তে শক্তিতত্ত্বের নবম অধ্যায়, তুর্গাচৈতন্য ভারতী।

২। মন্ত্রযোগ, পৃ ৭২—অব্যক্ত জ্ঞানানন্দ।

বলিয়া আনন্দ—অতএব ‘সং চিং আনন্দ’ বলিয়া চিত্তাকাশরূপ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হয়। যাহা ‘চিং’ তাহা শুদ্ধজ্ঞানমাত্র, তাহাই নিগুণ শিবপদ, এবং চিংএ যে চৈতন্যের উদয় বর্ণনা করা হইল, তাহাই আগমের ‘শক্তিতত্ত্ব’।

এই চিদাকাশ বা মহামায়ার স্তর জ্যোতির্শ্রয়, এই স্তরে অষ্টমহেশ্বর ও সপ্তকোটি মন্ত্র বিরাজ করেন, পরে তাঁহাদের বিষয় আলোচিত হইতেছে। চিংশক্তির আসন ‘চিদাকাশ’ তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, চিংশক্তি যখন ক্রিয়াশীল হন, তখন তাঁহার কৃপাফলে কারণবিন্দু বা পরবিন্দু বিদ্যুৎ হন। চিংশক্তির ক্রিয়াতে কারণবিন্দুতে আঘাতের ফলে যে কম্পন হয় তাহাই জ্যোতি বা নাদ বা শব্দরূপে প্রকটিত হয়, ইহাই ‘ওঁকার’ এবং এই জ্যোতির বহিরঙ্গই মায়া। ইহা এক ছায়াময় স্তরবিশেষ বা শিবের আশ্রাবরণ-বিশেষ। চিংশক্তি যতক্ষণ ক্রিয়াশীল না হইতেছেন ততক্ষণ জ্যোতি বা ছায়ার প্রশ্ন উঠে না, তাঁহার ক্রিয়াতে বিন্দুতে আঘাত ফলে যে কম্পন হয় তাহাতেই জ্যোতি ও ছায়া উভয়ের উৎপত্তি। পরবিন্দু শূন্যবৎ, ইহা বিশ্বের মূলকারণ অবস্থা। তৎপরের জ্যোতির্শ্রয় মহামায়ার স্তরই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা, (ইহাকে বিন্দুর ক্ষুদ্র অবস্থা বলা চলে), ইহার পরে ছায়াময় মায়ার স্তর বিশেষ।

প্রলয়কালে যে সকল জীবের মন পরিপক্ব হইয়াছিল, তাঁহারা উক্ত মহামায়ার মায়ার স্তরে ভাসিয়া উঠেন, অতরা নিম্নে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ সমভাবে সকল ফলকে আকর্ষণ করিলেও যেমন পরিপক্ব ফলগুলি ভূমিতে পতিত হয়, তেমনি পক্বমলজীবেরা মাত্র উদ্ধারলাভ করে, ইহাই মহামায়ার ও মায়ার জগতের জীবোদ্ধার। জীবের বা অণুর আণব, মায়ীয়া ও কার্মমল ফলে বিজ্ঞানকল প্রলয়াকল ও সকল জীবভেদ আছে। আণবমলযুক্ত অবস্থায় অণু ‘বিজ্ঞানকল’, আণব ও মায়ীর এই দ্বিবিধ মলযুক্তজীব ‘প্রলয়াকল’, আণব, মায়ীয়া ও কার্ম এই ত্রিবিধ মলযুক্ত অবস্থার অণু ‘সকল’। কার্মজনিত মলই মুখ্য সংসার কারণ এবং অণুর (দেহীর) ভোগসিদ্ধার্থে এই চরাচর জগৎ প্রকটিত হইয়াছে।’

যাঁহারা সর্বপ্রথম এই শক্তি বা অমুগ্রহ লাভ করেন তাঁহারা সংখ্যায় অষ্টজন; ইহাদের প্রত্যেকের উপর শিবের জ্ঞানশক্তি পূর্ণমাত্রায়



পতিত হয়। এই অষ্টজন অনন্ত হইতে শিখণ্ডী পর্য্যন্ত মন্ত্ৰেশ্বর নামে পরিচিত, ইহারা জগৎগুরুরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। ইহারা সকলেই 'সর্বজ্ঞ' তথাপি ইহাদের শক্তির তারতম্য আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের পকতা অনুযায়ী তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তথাপি ক্রিয়াশক্তির তারতম্য রহিয়াছে। এই অষ্ট মন্ত্ৰেশ্বরই বিভিন্ন মহামায়া জগতের অধীশ্বর বা কর্তা। ইহারা স্বয়ং কোন কার্য করেন না, অধীনস্থ সপ্তকোটি মন্ত্ৰ দ্বারা কাজ করান। পরমেশ্বরও স্বয়ং একমাত্র প্রলয়াবস্থাকালেই জীবোদ্ধার করেন, তৎপরে অষ্টগুরু দ্বারা করান। অষ্টগুরু আদেশ মান্ত করাই মন্ত্ৰদের কর্ম। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে স্বাদিকরণ অর্থাৎ গুরুর মধ্য দিয়া অনুগ্রহ করেন ও প্রলয়কালে নিরধিকরণ অনুগ্রহ করেন।

উপর্যুক্ত গুরু ও মন্ত্ৰ উভয়ের দেহ 'বৈন্দব' দেহ অর্থাৎ বিন্দুই এই দেহ নির্মিত হইবার উপকরণ, বিন্দু হইতেই ইহাদের দেহ লাভ হয়।

চিৎশক্তি প্রসব করেন না, তাই তাঁহার আখ্যা 'কুমারী', কিন্তু বিন্দু ও মায়া প্রসব করেন বলিয়া 'মাতা'। ঈশ্বরের (অনন্তের) দৃষ্টি মায়াতে পড়ে, কিন্তু পরমেশ্বরের দৃষ্টি মায়াতে পড়ে না, কারণ পরমেশ্বরের সে ক্ষণ-শক্তি নাই, ঈশ্বরে আছে এবং তাঁহার নাদধারাও আছে। ঈশ্বরের দৃষ্টি মায়াতে পড়িলে জগৎ সৃষ্ট হয়। এই দৃষ্টিই সবিকল্পজ্ঞান, পরমেশ্বরের জ্ঞান 'নির্বিকল্প জ্ঞান'।

প্রলয়কালে যে সকল পকমলজীব অণুরূপে ভাসিতেছিল, চিৎশক্তিই তাহাদের বিন্দুর উপকরণে নির্মিত জ্যোতির্ময় দেহ প্রদান করেন। অতএব বৈন্দব বা বিন্দুনির্মিত দেহ জ্যোতির্ময়। অতএব মন্ত্ৰদের দেহও জ্যোতির্ময়। ইহাদের সপ্তকোটির মধ্যে সাড়ে তিন কোটি মহামায়ার রাজ্যে ও সাড়ে তিন কোটি মায়ার স্তরে বিরাজ করেন।

বিন্দুর প্রথম কম্পনে 'নাদে'র উৎপত্তি বা সৃষ্টির বিকাশ হয়। ইহাই ওঁকার ধ্বনি বা মতান্তরে 'ফোটবাদ', এই শব্দ বিশ্বব্যাপী ও ইহা অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে। মানবদেহেও ইহা 'অনাহত' নাদরূপে বিরাজিত, ঘুমন্ত মনুষ্যেও এই নাদ অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে। শাস্ত্রে নাদকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হইলেও, ওঁকার নাদের কোন ঔপাধিক ভেদ বর্ণিত হয় নাই, অতএব একমাত্র ওঁকারই উপাধিরহিত শব্দতত্ত্ব

এবং উহা দ্বারা ব্রহ্মভাবের স্ফুর্তি হয় বলিয়া প্রাচীন সাধকেরা উহাকে 'স্ফোট' আখ্যা দিয়াছেন।

এই 'নাদ' হইতেই কলা বা বর্ণের উৎপত্তি হয়। বর্ণ অর্থে 'অক্ষর' নহে, ইহা বিভিন্ন রশ্মির দ্বারা, তথাপি বর্ণের স্থূলরূপ আছে, তাহা অতিক্রম করিবার নিমিত্তই তত্ত্বে ষট্চক্রসাধনের ব্যবস্থা আছে এবং প্রতিচক্রে বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা আছে। বর্ণগুলির সমষ্টি অবস্থায় তাহাদের ময়ূরের অঙ্গুরসের মত অবস্থা, ময়ূর-অণ্ডে যেরূপ ময়ূরপুচ্ছের সকল বর্ণই অব্যক্ত অবস্থায় আছে, তদ্রূপ। আজ্ঞাচক্রের উপরেও সকল বর্ণের সমষ্টি আছে, তাহাই বিন্দু, ইহাই মন্ত্রচৈতন্য বা সমস্ত বর্ণের সমষ্টি, কারণ মন্ত্রই বর্ণ। এই শব্দব্রহ্ম বা মন্ত্রচৈতন্য কুণ্ডলিনী রূপে মানবদেহে অবস্থিত হইয়া বর্ণোচ্চারণের মূলায়ন হইয়াছেন—'তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীকরণং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্'। (শারদাতিলক)।

তত্ত্বে কথিত আছে বর্ণগুলি যখন কুণ্ডলীমধ্যে থাকে তখন তাহারা জ্যোতির্স্মাত্রারূপে অবস্থিত, এই অবস্থার নামই 'পরাবস্থা'। যখন সুষুপ্তা পথে তাহারা নাভিপদ্মে উদিত হয়, তখন সেই পদ্ব্যবস্থিত বহ্নিতবে তাহাদের দীপ্তি বিকসিত হয়। কুণ্ডলিনী মধ্যে সমস্ত বর্ণের একই জ্যোতির্স্মাত্রারূপ, নাভিপদ্মে পৃথক পৃথক বর্ণের পৃথক পৃথক দ্ব্যতি ভাসিত হওয়ায় সেখানে তাহারা 'স্বয়ংপ্রকাশা' এবং এই অবস্থার নাম 'পশ্চাত্তী'। স্রুৎপদ্মে উদিত হইলে বর্ণগুলি নাদযুক্ত হয়, কিন্তু তখনও স্রুতিগোচর হয় না, তাহাদের অন্তরে নাদ স্ফুরিত হইলেও তাহা বাহিরে আসা ত দূরের কথা, যোগী ভিন্ন অণ্ডের উপলব্ধি হয় না। এই অবস্থার নাম 'মধ্যমা'। স্রুৎপদ্ম ত্যাগ করিয়া তখন তাহারা ফুস্ফুস্ মধ্যে শ্বাসযন্ত্রে স্পন্দিত হয় এবং সেই অবস্থার নাম 'সংজ্ঞমাত্রা'। পরে যখন জিহ্বাগূলে কণ্ঠ তালু দন্ত ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থল হইতে শ্রবণগোচর হইয়া শব্দরূপে নির্গত হয়, তখন তাহাদের নাম 'বৈখরী'। কুণ্ডলিনী মধ্যে বর্ণাবলীর যে 'পরাবস্থা', উক্ত অকথাদি ত্রিরেখা মধ্যেও তাহাদের সেই পরাবস্থা। সুষুপ্তার নিয়ন্তরে যিনি কুণ্ডলিনীরূপে বর্ণাবলী ধারণ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মরূপে অকথাদি ত্রিরেখা রূপে অবস্থিত, এবং ঐ ত্রিরেখাই কুণ্ডলিনীর আদিম বা কারণ অবস্থা। কোন তত্ত্বমতে সুষুপ্তা নাড়ীর উর্দ্ধ ও অধঃ উভয় প্রান্তেই সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত। ষট্চক্র বর্ণনা স্থলে ইহার আলোচনা যুক্তি-

সঙ্গত।”^১ বর্ণের স্থূলরূপ অতিক্রমের জন্তই এই সাধন ব্যাখ্যাত হয়। পরমেশ্বরের চিৎশক্তি ইচ্ছারূপে বহিমুখী হয় ও বিন্দুতে আঘাত করে, সেই সংঘাত ফলে পঞ্চস্তর বা কলার উৎপত্তি হয় তাহারা যথাক্রমে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞা, শাস্তি ও শাস্ত্যতীত কলা নামে পরিচিত। এই কলা-পঞ্চক সমগ্র জগতের উপাদান এবং এই সকল কলা ঐশীশক্তিতে নিত্য-প্রতিষ্ঠ বলিয়া শিব ‘সকল’। রশ্মির বিকীরণই ‘কলা’, তাহা দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় তাহা ‘তত্ত্ব’। বিভিন্ন মিলনে বিভিন্ন তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। যথা—ঈশ্বর শব্দের প্রত্যেকটী অক্ষর কলা, তাহার মিলনই তত্ত্ব; সেইরূপ—

- ১। নিবৃত্তি কলা হইতে পৃথিবীতত্ত্ব।
- ২। প্রতিষ্ঠা কলা হইতে ২।৩ রকম মিলনে প্রকৃতি হইতে জলতত্ত্ব পর্য্যন্ত।
- ৩। বিজ্ঞা কলা হইতে ষট্ কঙ্ক, মায়া, কলা, রাগ, অবিজ্ঞা, কাল, নিয়তি।
- ৪। শাস্তি কলা হইতে শুদ্ধবিজ্ঞা, ঈশ্বর, সদাশিব ও শক্তি তত্ত্ব।
- ৫। শাস্ত্যতীত কলা হইতে শিবতত্ত্ব স্বয়ং—ইহাই প্রথমতত্ত্ব বা বিন্দু।

এই ৩৬টী তত্ত্বের উদয় হয়, এবং তত্ত্ব হইতে ভুবন (sphere) সৃষ্টি হয়।

কলার সহিত বর্ণ আছে, বাক্যের সহিত অর্থ যেরূপ নিত্যমিলিত ইহারাও তদ্রূপ। বাক্যের দিক ‘বর্ণ’, অর্থের দিক ‘কলা’। কলা, তত্ত্ব ও ভুবনই অর্থের দিক; মন্ত্র, পদ, বর্ণ বাক্যের দিক। তত্ত্ব মন্ত্রবাচক, ভুবন পদবাচক, কলা বর্ণবাচক, ইহারাই ‘ষড়্ধা’ নামে খ্যাত। দীক্ষার সময়ে এই ষড়্ধা শুদ্ধ করিতে হয়, দীক্ষা দ্বারা অষ্টপাশমুক্তি ও শিবতত্ত্বের অভিব্যক্তিই লক্ষ্য। ইচ্ছাশক্তির সংঘাতের বিন্দুর স্পন্দনে মহামায়ার গর্ভে শাস্ত্যতীত প্রভৃতি পঞ্চস্তরের উৎপত্তি হয় এবং বিন্দু ক্ষুদ্র হইয়া শব্দ ও অর্থের যে দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই ‘ষড়্ধা’। শক্তির সক্রিয় অবস্থাতে বিন্দু বা কুণ্ডলিনীরূপা মহামায়া ক্ষুদ্র হইয়া একদিকে কলা (শাস্ত্যতীতা প্রভৃতি), তত্ত্ব (শিবাদি ক্রিত্যন্ত) ও ভুবন (অনাশ্রিত হইতে কালাগ্নি ক্ষত্রের ভুবন পর্য্যন্ত), অপরদিকে বর্ণ, মন্ত্র ও নাদরূপ ষড়্ধা সৃষ্টি করেন।

নাদসম্বন্ধিত বিন্দু হইতে মন্ত্র, বর্ণ ও পদের উৎপত্তি তত্ত্বের গূঢ়ার্থাত্মক মন্ত্র ও বর্ণসকল ‘কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে’ও বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। মাতৃকাবর্ণ বা যে সকল অক্ষরের দ্বারা শব্দের উচ্চারণ বুঝা যায় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। নাদের উৎপত্তির কারণ তৃতীয় পটলে বর্ণিত হইয়াছে, স্থান অর্থে পিণ্ড অর্থাৎ চরম নাদ বা শব্দব্রহ্মের আধার, ইহাই তত্ত্বোক্ত মূলধার, নাদ হইতে বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়। স্থান, ধ্যান, বর্ণ ও লক্ষ্য (৩৩-৫) বা পিণ্ড, পদ, রূপ ও অরূপ যে সর্বত্র বিরাজ করে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। জগৎ নাদের উপর নির্ভর করে। নাদ দ্বিপ্রকার—আহত ও অনাহত, ইহার উৎপত্তি পিণ্ডে। পিণ্ডই শব্দব্রহ্মের উৎপত্তিস্থল রূপে মানবদেহে মূলধারের নিম্নে স্থিত। অক্ষুট নাদ হইতে ক্রমশঃ যে ক্ষুটতর নাদ, বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়, ব্যক্তিগত মন্ত্রোচ্চারণ বা জপ দ্বারাও ঐ একই প্রকার ব্যক্তিগত রহস্যময় শক্তির উন্মেষ হয়।

ব্যক্তিগত শক্তির উন্মেষের জন্য যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহার বিকাশরীতি ও গীতের উৎপত্তিও একইরূপে হয় বলিয়া বর্ণিত হয়। সঙ্গীতরত্নাকরে “গীতং নাদাত্মকং—

নাদেন ব্যজতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বচঃ ।

বচসো ব্যবহারোহয়ং নাদাধীনমতো জগৎ ॥

আহতোহনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগততে ।

সোহয়ং প্রকাশতে পিণ্ডে তস্মাৎ পিণ্ডোহভিধীয়তে ॥”

গীতের উৎপত্তি বর্ণনাক্রমে পিণ্ড, পদ, বর্ণ আদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নাদব্রহ্মের চারিটি অবস্থাভেদ শ্রুতিতে আছে (যোগশিখোপনিষদ্ ৩।১-৫)। ব্রহ্মের ভেদ দ্বিবিধ, এক পরমব্রহ্ম বা ‘অক্ষর’ স্বরূপ, দ্বিতীয় ‘শব্দব্রহ্ম’। “অক্ষরং পরমো নাদঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে” আবার শব্দব্রহ্মই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। কারণ মূলধারে চিৎএর অনুরূপ শক্তি বা পরা শক্তি বিद्यমান, তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত, তাহা হইতে নাদের উৎপত্তি হয়, ইহা বীজের অক্ষরের স্থায়। যাহা দ্বারা যোগী বিশ্বকে দেখেন তাহা ‘পশ্চন্তী’ বা অনাহত। (পরা হইতে নাদরূপ অক্ষরের দ্বিদল পত্র পশ্চন্তীর উৎপত্তি।) হৃদয়ে এই শব্দ বজ্রবৎ ঘোষিত হয়, ইহাই ‘মধ্যম’ নামে খ্যাত। ইহাই পুনরায় ‘বৈখরী’ নামে অভিহিত হয় এবং প্রাণবায়ুর সহিত যুক্ত হইলে ‘স্বর’ নামে খ্যাত হয় অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দরূপ ধারণ

করে। “পরব্রহ্মণঃ সকাশাত্তদনুকারস্তেব শব্দব্রহ্মাখ্যস্ত বেদস্ত যথা বস্তুতঃ কোহপি ভেদো নাস্তি তথা”.....পরব্রহ্মে ও শব্দব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। “শব্দব্রহ্মাবগতিরেব ঋতিবিজ্ঞাদিপদবাচ্যা। পরন্তু তপসোহনুষ্ঠানং বিনা ন কদাচিদেষা বিজ্ঞাবিভবতি”—শব্দব্রহ্ম-জ্ঞানই ঋতিবিজ্ঞা, তথাপি ইহা তপস্যার অনুষ্ঠান বিনা অধিগত হয় না। “তপোহনুষ্ঠানমপি দেহবিশেষাদেব ভবতীতি।” সেই তপ-অনুষ্ঠানও বিশেষ বিশেষ দেহে হয়, অর্থাৎ মাত্র যোগীদের হয়।

ভর্তৃহরি আদি ‘শব্দসংস্কারের’ বিষয়ে বলিয়াছেন যে পুনঃপুনঃ স্বাধ্যায়ের দ্বারা প্রাণ ও অপানের সাম্য হয়। তৎপরে স্থূল বায়ুর সূক্ষ্মতা প্রাপ্তি হয় এবং সূক্ষ্মতর ব্রহ্মরূপে উহার সঞ্চার হয়। তৎপরে মন ও ভূতাদির আসক্তি ত্যাগ করিয়া উহার অস্তুরে প্রবেশ করে। ইন্দ্রিয়াধীন বহিমুখ মন ব্রহ্মপথে প্রবেশ করিলে, উহা ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রত্যাহত হয়। স্বাধ্যায়কালে যে শব্দ উথিত হয় উহা অনাহত নাদময় শব্দে তাদাত্ম্য লাভ করে, যেমন বায়ুদ্বারা তরঙ্গ উথিত হয় ও বায়ু-উপশমে তাহা জলস্বরূপে লীন হইয়া যায় তদ্রূপ। অতঃপর সেই প্রবেশমান শব্দ বায়ু ও মনের ক্রম সংস্কারের মহিমা দ্বারা অত্যন্ত সংস্কৃত হইতে থাকে। ইহা সংজ্ঞারূপ ‘মধ্যমা’ বাগ্ভূমি। ইহার পরে বাক্‌এর সংস্কার হইলে অর্থেরও সহিত ভেদাভেদ দূর হয়। ইহাই ‘পশুশ্রী’ বাক্‌ দেবরূপা ও আয়শক্তির উল্লাসস্বরূপা হয়। বস্তুতঃ মন্ত্রই চিত্তস্বরূপ, তাহাদের ভেদ নাই, দিব্যজ্যোতিও একাগ্রচিত্তের ফলস্বরূপ। সেই নিমিত্তই মন্ত্র ও দেবতার অভেদ কল্পিত হয়। মন্ত্রদেবতার বিগ্রহও বর্ণন করা হয়, চিত্ত ও দেবতার অভেদ বিবরণের প্রথাও একার্থেই ব্যবহৃত হয়। বাক্‌ ও অর্থের নানাবিধ বহির্দৃষ্টিতেই সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। নাদানুসন্ধানকালে উহার আভাস স্পষ্ট হয়। নাদ পরপ্রকাশে বিলীন হইলে ক্রমও বিলীন হয় অর্থাৎ বাচ্য ও অর্থের ভেদ দূর হয়। জ্ঞানাকাশে সব বিকল্প লীন হয়। সে আনন্দ অবর্ণনীয়, মুককে রসের আশ্বাদন জিজ্ঞাসার ন্যায়।^১

এক বিরাট শুদ্ধজগৎ সৃষ্টি হইল, তাহাতে বিন্দুর কম্পনে নাদের উৎপত্তি হইল এবং বিজ্ঞানাকল জীবেরা বাহির হইতে লাগিলেন। পুরুষমল জীবেরা বৈন্দব দেহ লাভ করিল, ইহাই নাথদের সিদ্ধদেহ বা দীক্ষাফলে গঠিত দেহ। তখন জীবের শিবত্ব হইল, জীব কার্যোশ্বর



হইলেন। এইরূপে অষ্টজন মন্থেধর হইলেন ও অন্তেরা মন্ত্র পদ লাভ করিলেন।

পরবিন্দু হইতে তিনটি প্রসর হয়, যথা —

- | | | |
|---|---|---------|
| ১। নাদ—অক্ষুট অবস্থা বা পরনাদ | } | অচিৎকলা |
| ২। বিন্দু—সূক্ষ্মরূপ, ইহাই কার্যাবিন্দু বা অক্ষর বিন্দু | | |
| ৩। বর্ণ—স্থূলরূপ | | |

নাদ, বিন্দু, বর্ণ অচিৎকলা, শক্তিই চিৎকলা।

জ্ঞান শক্তির বিকাশে মূল ‘পরবিন্দু’ ত্রিধা বিভক্ত হয় ও তাহা হইতে সৃষ্টিক্রমিণী নাদ, বিন্দু, বর্ণ নির্গত হয়। সৃষ্টিক্রমে যে সকল তত্ত্ব প্রাপ্তভূত হয়, তাহার প্রধান প্রকৃতির অংশ বলিয়া ‘কলা’ নামে অভিহিত হয়। শক্তিয়ুক্ত শিবই সৃষ্টির আদিকারণ, তিনিই ‘সৎ’, সর্ব-চৈতন্যের আধার বলিয়া ‘চিৎ’ এবং ইচ্ছাশক্তি তাহার কলা বা অংশ বলিয়া তিনি ‘সকল’ পরমেশ্বর। তাহা হইতে প্রথমে শক্তির আবির্ভাব হয়, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়—

সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলাং পরমেশ্বরাম্”।

আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাবিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥ ১ ॥

তথাপি মায়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি সম্ভবে না, তাই ইচ্ছাশক্তি মূল কারণ হইলেও মায়া নাদ প্রভৃতি সহকারী কারণ। শক্তি ইচ্ছাক্রমিণী। সেই ইচ্ছা কি? মহাপ্রলয়ে যে সৃষ্টি ব্রহ্মপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছিল, তাহার পুনর্বিকাশের ইচ্ছাই শক্তির ‘ইচ্ছা’ নামে খ্যাত। ইচ্ছাশক্তির ফলে বিন্দু বিক্ষুব্ধ হইলে যে জ্যোতি বা নাদের উৎপত্তি হয় সেই তেজ ও ধ্বনি মূলতঃ একই বস্তু, উভয়েই একত্রে বিद्यমান থাকে। শক্তি স্বীয় নাদায়ক জ্যোতিতে শূন্য ব্যাপ্ত করিলেন, সেই নাদই তাহার জ্যোতি এবং জ্যোতিই তাহার নাদ। ইচ্ছার ফলে যে ক্রিয়ার অভিযুক্তি হয় তাহা ঐ ‘নাদ’। ইচ্ছাশক্তির প্রথম অবস্থা ‘অব্যক্ত’, দ্বিতীয় অবস্থায় ‘ব্যক্ত’ নাদের উৎপত্তি। চিৎশক্তির মায়াকল্পিত ব্যাপ্তিই নাদ বা জ্যোতি এবং সেই নাদ সৃষ্টির বিস্তারের জগৎ যখন শক্তির আকর্ষণে কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া বিন্দুর প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাই ঘনীভূত বিন্দু অবস্থা। নাদ ও বিন্দু বস্তুতঃ একই পদার্থ, ব্যাপ্তি অবস্থায় যাহা ‘নাদ’, ঘনীভূত অবস্থায় তাহাই

‘বিন্দু’। নাদে জ্যোতি না থাকিলে, বিন্দুও জ্যোতির্ময় হইত না। পরমেশ্বরের প্রথম বিকাশ নাদ ও বিন্দুতে, সেই নিমিত্ত সাধকের পরমপদ সাংক্যকালে শুদ্ধ জ্যোতি ও নাদধ্বনির উপলব্ধি হয়। শক্তির উদয় হইয়াছে অথচ নাদের আবির্ভাব হয় নাই, তন্মতে সেই অবস্থাই ইচ্ছাশক্তির নির্বাণকলা, আর নাদরূপে প্রথম অভিব্যক্তি ‘অমাকলা’। তবে যোগমার্গে দর্শনভেদ বশতঃ মতভেদ লক্ষিত হয়।

পরবিন্দু হইতে নাদ, বিন্দু ও বর্ণ রূপ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। শিবের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তির ভেদ তাঁহাতে আরোপিত হয় বলিয়া শিবের তিনটি অবসর আছে বলা হয় (‘অবস্থা’ শব্দ শিবের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না, নাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়,) এই তিনটি অবসর যথাক্রমে—

শিব—লয় অবসর

সদাশিব—স্থিতি বা ভোগ অবসর

ঈশ্বর—সৃষ্টি বা ভোগ্য অবসর

এই তিনটি অবসর যথাক্রমে অব্যক্ত, বিকাশোন্মুখ ও ব্যক্ত ভাব। ঈশ্বর যখন মায়ায় উপর দৃষ্টিপাত করেন তখন জগতের সৃষ্টি হয়। সিদ্ধ-সিদ্ধাস্তপদ্ধতিতেও ব্রহ্মা দৃষ্টি দ্বারা প্রকৃতিপিণ্ড সৃষ্টি করিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে (নিবন্ধের পিণ্ড উৎপত্তি বিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

শক্তির ত্রিরূপ—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ; ইহারাও যথাক্রমে অব্যক্ত, বিকাশোন্মুখ ও ব্যক্ত ভাব। চিৎস্বরূপা অখণ্ডরূপিনী ব্যাপিনী (ঘটচক্র বিবরণে আদিনাদকে ব্যাপিকাশক্তি বা কলা বা আজ্ঞা বলা হয়, কোথাও চন্দ্রের অমানাগ্নী বোড়শী কলা বলা হয়। আর যাহা অব্যাকৃতা ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ যাহা নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্বাৱস্থা, তাহা সপ্তদশী কলা বা ‘সমনী’, সমনীর উর্দ্ধে শূণ্যগামী ‘উন্ননী’ বলা হয়। সপ্তদশী কলাকেও উন্ননী বলা হয় (মন্ত্রযোগ, পৃ ৭৯ ।)—নিগুণ শিবতত্ত্বে সংযুক্তা সেই পরাশক্তি সৃষ্টি নির্মাণের ইচ্ছাহেতু বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন। ইচ্ছাশক্তির প্রথম উদিত অবস্থায় তিনি অব্যাকৃপরূপিনী, ইচ্ছাশক্তিসম্পূর্ণ ঐ অব্যক্ত আদিনাদ যখন বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন, তখন ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হইলেন, সেইজন্য বিন্দুতে প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি লক্ষিত হয়—‘বিন্দুভাবক ক্রিয়াপ্রাধান্তলক্ষণম্’, কারণ বিন্দু হইতেই সৃষ্টির ক্রিয়া নির্গত হইতে লাগিল।

পরবিন্দু হইবামাত্র উহা কি বিশিষ্ট তাহা জানিবার জন্ম যে ইচ্ছা বা অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, তাহা জ্ঞানশক্তির প্রথমাস্কর, ঐ ইচ্ছার সঙ্গেই বিন্দুটা ফাটিয়া গিয়া বিন্দু, নাদ ও বীজ এই তিন তত্ত্ব নির্গত হইলেন।^১

জগতের লয় অবস্থা কোলজ্ঞানের দ্বিতীয় পটলে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যে স্থিতঃ শিবঃ ।

জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তে ইচ্ছয়া ॥৬॥

ইচ্ছাশক্তির্লয়ঃ যাতি যত্র তেজঃ পরঃ শিবঃ । (২।৬, ৭)

অর্থাৎ শক্তি শিবের মধ্যে বিলীন হন, শিব ক্রিয়ামধ্যে বিলীন হন, ক্রিয়া জ্ঞানমধ্যে ইচ্ছার সাহায্যে বিলীন হন, ইচ্ছাশক্তিও শিবে বিলীন হন, ইহাই শিবের অন্তিম পরিণতি বা ‘পরঃ শিবঃ’ অবস্থা, এমতাবস্থায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় ও সৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়। এস্থলে শক্তির ত্রিরূপ অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোলজ্ঞানের (১৬।২৫, ২০।১৩) “ইচ্ছাঃ জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াখ্যা চৈব ভাসিনি”—দেবী উবাচ—“জ্ঞানশক্তির্ময়া জ্ঞাতা ক্রিয়াশক্তির্বদ প্রভো” ইত্যাদিতেও শক্তির ত্রিরূপ বর্ণন আছে। স্বপ্রকাশ হইবার ইচ্ছাই ‘ইচ্ছা’ অভিধেয়, জ্ঞান এই প্রকাশের অনুভূতি এবং শক্তির যে স্বরূপ দ্বারা সমস্ত কার্য সম্পন্ন হয় তাহাই ‘ক্রিয়া’। জ্ঞানই দ্বৈতাবস্থা, এই অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই থাকে। শক্তির এই ত্রিরূপ যখন পুনর্ব্বার শিবে লীন হয়, তখন শিবশক্তির মিলন হয় এবং পরম বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই ‘মুক্তি’। এই নিমিত্ত বলা হয়, শক্তির অধোগতিতে সংসার, উর্দ্ধগতিতে মুক্তি, শক্তির বহিঃ-প্রকাশের উত্তমে সৃষ্টি, অন্তর্মুখে লীন হওয়াই লয়। শিবের চিৎ ও আনন্দ স্বরূপের জ্ঞায় শক্তিরও ঐ দুই রূপ স্বীকৃত হয়, তাহা শক্তির সচ্চিদানন্দের সহিত অবিভাবাবী রূপ। কোলজ্ঞানে (১৭।৮, ৯) শিব ও শক্তিতে অগ্নি ও তাহার ধূমের জ্ঞায়, বৃক্ষ ও তাহার ছায়ার জ্ঞায় অভিন্ন বলা হইয়াছে, “ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ ।”^২

শক্তিতত্ত্বের সহিত বিন্দু, নাদ, কামকলা শব্দাদি জড়িত হয়। কোলজ্ঞানের বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ আছে। শিব বা মহালিঙ্গের শক্তিকে ‘বিন্দু’ বলে। ইহাই উৎপত্তি ও লয়ের কারণ—“অক্ষোভ্য সর্ব্বশক্তীনাম্ আশ্রয়শক্ত্যানুরঞ্জিতঃ” (২০।২০, ২১) অর্থাৎ ইহা কোন

শক্তি দ্বারা অবিচলিত এবং একমাত্র আত্মশক্তি দ্বারাই ভেদ্য। বিন্দু ও নাদই শক্তি (৫১৩১, ৪৮), আবার বিন্দুই অমৃত (৬১২৩) ; ইহা জরা ও বার্কিক্য দূর করে, ইহার জ্যোতিতে সকল বস্তু বিশুদ্ধ হয় ও ইহা কামকলাযুক্ত বলিয়া অমরত্ব প্রদান করে (৭১৩১, ৩২) । ইহাই সহজাবস্থার চরম পরিণতি। ইহা নির্মল মণির ন্যায়, মুক্তাফলের ন্যায়, খড়োতের ন্যায়, আকাশের তারকারাজির ন্যায় উজ্জল, ইহা 'সিতরক্তক কৃষ্ণক ধূমপীতক রূপকম্'—ইহা 'সৃষ্টিসংহারকারকম্' ও কুলাকুলের উর্দ্ধে (১৪১৯৬, ৯৭) ।

পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা হয় তাহাকেই বিন্দুরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদের উৎপত্তি, ইহা হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। কামকলাবিলাসে ইহাকেই 'মহাবিন্দু' বলা হইয়াছে, পরশিবের স্বতঃক্রিয়াশীল বিমর্শদর্পণে তাহার অসংখ্য জ্যোতি প্রতিকলিত হইলে মহাবিন্দু চিত্রে প্রবেশ করে, তৎফলে পরশিবের অহঙ্কারের উদয় হয়, এবং বিন্দুই সেই অহঙ্কারের আত্মস্বরূপ গণ্য হয়।

কামকলাবিলাসে—

পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিকলিতবিমর্শদর্পণে ।

প্রতিরুচিরুচিরে কুতো চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥৮

বিন্দুরহঙ্কারাশ্রা রবিরেতগ্নিধুনসমরসাকারঃ ।

কামঃ কমনীয়তয়া কলা চ দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দুঃ ॥৯

ভাষ্য—প্রকাশরূপপরমেশ্বরস্ত দর্পণবৎ স্বরূপবিমর্শসংবন্ধে জ্ঞাতে তদানীং তত্র মহাবিন্দুঃ 'পূর্ণোহিহম্' ইত্যেবং রূপং পরমেশ্বরোহবভাসতে ॥

কাম ইতি কাম্যতে অভিলষ্যতে স্বাস্থ্যতেন পরমার্থমহস্তির্যোগিভিরিতি কাম', তদ্বাহেতুঃ কমনীয়তয়া ইতি, কমনীয়ত্বম্ স্পৃহণীয়ত্বম্ তেন কলা বিমর্শশক্তিঃ মহাত্রিপুরাসুন্দরী বিন্দুসমষ্টিরূপা কামকলা ইতি উচ্যতে ।^১

পরশিবের বিন্দুর স্বতঃস্পন্দন শক্তিই 'কলা' এবং ইহার মোহিনী শক্তি থাকায় উহার নাম 'কামকলা' হইয়াছে। বিন্দুতে মাতা, মানস ও মেয়ম্ এই তিনের সমষ্টি আছে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞ এই তিনের অঙ্কুর আছে। কামকলা এই তিন বিন্দুর সমষ্টি বলিয়া উহাকে 'ত্রিপুরাসুন্দরী'ও বলা হয়।

সৃষ্টির আদিতে অনাদিকাল হইতে যে পূর্ণ নিরাকার ও শূণ্য স্বরূপ বস্তু বিরাজমান আছে, তাহাই শৈবের 'পরমশিব', শাক্তের 'মহাশক্তি'। তিনি বর্ণনাভীত, কারণ তত্ত্বাভীত। ইহাতে স্বয়ং-প্রকাশ ভাব নাই। এই তত্ত্বাভীত অন্তর অবস্থাকে শাস্ত্রে বাচকরূপে আদিবর্ণ 'অ' বলা হয়, ইহার পর প্রকাশ ও বিমর্শের সাম্যরূপ অবস্থা, অর্থাৎ 'অ'কাররূপ প্রকাশের সঙ্গে 'ই'কাররূপ বিমর্শ বা অগ্নি ও সোমের সাম্যভাবই 'কাম' বা 'রবি' নামে প্রসিদ্ধ। শিবই 'অ', শক্তি 'ই' বিন্দুরূপে উহা অহং বা পূর্ণহস্তা হয়। এই স্পন্দনকার্য্য দ্বারা যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই 'চৈতন্য' নামে বর্ণনা করা হয়। ইহার অপর নাম 'চিৎকলা'। অগ্নিস্পর্শে ঘৃতধারা যেরূপ দ্রুত বহে, প্রকাশাত্মক শিবের সম্পর্কে বিমর্শরূপ পরাশক্তি সেইরূপ দ্রুত হয় এবং এক অমৃত-ধারার স্রাব হয়। ইহা শিবশক্তির আপেক্ষিক বৈষম্য হইতে উৎপন্ন। শুদ্ধপ্রকাশ বা শুদ্ধবিমর্শ বিন্দু পদবাচ্য নহে। নিখিল প্রপঞ্চবিলীন হইয়া যে বিমর্শশক্তি থাকে তাহারই সংসর্গে অন্তর অক্ষরস্বরূপ 'বিন্দু' বা প্রকাশবিন্দু রূপ ধারণ করেন। ইহার পর বিমর্শশক্তি প্রকাশ-বিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে উহা হইতে তেজোময় বীজস্বরূপ 'নাদ' নির্গত হয়। এই নাদ মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে। নাদ নির্গত হইয়া ত্রিকোণাকার রূপ ধারণ করে, ইহাই বিন্দুনাদাত্মক 'অহং' নামক প্রকাশ-বিমর্শের শরীর। প্রকাশ-বিমর্শের পারস্পরিক সাম্যই 'পরমাত্মা' ইহাই রবি বা কাম। এই কামের কলা অগ্নি ও সোম। অতএব কামকলা বলিলে এই ত্রিবিন্দু বুঝায়। এই ত্রিবিন্দুর সমষ্টিভূতা মহাত্রিকোণই আত্মাশক্তির নিজরূপ। ইহার মধ্যে রবিবিন্দু দেবীর মুখ, অগ্নি ও সোমবিন্দু স্তনদ্বয় ও 'ই'কারের অর্দ্ধকলা যোনিরূপে কল্পিত হয়। শিবশক্তির মিলনে অমৃতধারা প্রবাহিত হইলে উহাতে যে লীলারূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাত্ত্বিক পরিভাষায় তাহাই 'হার্দ্ধকলা' নামে খ্যাত।

যে ত্রিকোণ সম্বন্ধে 'কামকলা' বর্ণন করা হইতেছে, তাহা পশ্চাত্তী, মধ্যমা ও বৈষ্ণবী এই ত্রিবিধ শব্দের পরস্পর সংশ্লেষাত্মক সম্মিলিত রূপ। ইহার কেন্দ্রস্থিত বিন্দু যাহার স্বরূপ 'অহং' রূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহা পরমাত্মকার বিলাসক্ষেত্র সদাশিব তত্ত্বের স্বরূপ। মধ্যবিন্দু তথা মূল ত্রিকোণ হইতে সমস্ত তত্ত্ব ও পদার্থ জাত হয়।

মহাবিন্দু অনন্ত কলার সমষ্টি হইলেও তত্তদ্ ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্ত উপাদানের মাত্রামুসারে নির্দিষ্ট কলাদ্বারা গঠিত হইয়া অব্যক্তের গর্ভ হইতে অহং রূপে আবির্ভূত হয়। এই ‘অহং’রূপই অব্যক্ত সত্তার আত্মপ্রকাশ। কলার নিরন্তর ও ক্রমিক পূর্ণতায় যেরূপ বিন্দুরূপ পূর্ণকলা বা অহং তত্ত্বের বিকাশ, তদ্রূপ উহার নিরন্তর ও ক্রমিক ক্ষয়ে শূন্যস্বরূপ অহংভাববর্জিত আত্মভাবের আবির্ভাব হয়। এই উভয়েই পূর্ণকলার এককলা সাক্ষিরূপে প্রপঞ্চের লয়ের পরও জাগ্রত থাকে। জীবের ‘উন্মন্নী’ অবস্থায় ইহাই ‘নির্ব্বাণকলা’ রূপে অবস্থিত থাকে। ইহারও নিবৃত্তি হইতে যে নিষ্কল অবস্থার বিকাশ হয়, তাহাই শিবশক্তি তত্ত্ব বা ‘মহাবিন্দু’। সংসারী জীব পঞ্চদশ কলাত্মক, মুক্ত জীব ষোড়শ বা নির্ব্বাণ কলাত্মক।^১

ত্রিবিন্দু, ত্রিরেখা ও নাদ লইয়াই কামকলার ধ্যান। এই কামকলাতেই জগদ্রূপ অণু অবস্থিত। ঋতিতেও আছে ‘অগ্রে শক্তিরূপিণী দেবী একা ছিলেন, তিনি এই জগদ্রূপ অণু সৃজন করিয়াছেন, তাঁহাকে কামকলা বলা হয়। তাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি ও স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে’ (বহুচ উপনিষদ)।

কামকলার ধ্যান (কামিনীতত্ত্বের ধ্যান) বীরযোগীদের জন্মই বিহিত হইয়াছে। সাধক নিজদেহের সহিত ঐ কামকলা রূপ কামিনীদেহ একীভূত চিন্তা করিবেন। ইহাই বীরযোগ, ইহা দ্বারা যে পুং ও স্ত্রী একরস হইয়া যায়, তাহারই নাম ‘সামরস’। সামরস না হওয়া পর্য্যন্ত নাদের উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হন না। উর্দ্ধশক্তি ও অধঃশক্তিরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি, নাদ ও বিন্দুরূপে ভিন্ন হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই ক্ষোভজনিত ‘কাম’ থাকাতে ‘সামরস’ হইতে পারে না। সাধক কামকলা ধ্যানে নিরত থাকিলে কামজনিত ক্ষোভ হইতে পারে না, এবং সামরস সাধন সহজ হয়। এই উদ্দেশ্যেই আগমে কামকলারূপ কামিনীচিন্তার উপদেশ আছে, কিন্তু ‘সঙ্গমেব হি কর্তব্যং কর্তব্যং ন তু মৈথুনম্’ ইহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কামিনীদেহ কামকলার প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠান, কামিনী কুণ্ডলিনীর স্থূল শরীর, সেই শরীর নাদময়, এই ধারণা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে কামিনী রাখিবার ব্যবস্থা। তত্ত্বে কুমারীপূজার ব্যবস্থা আছে, কারণ অপ্রফুটযৌবনা নারীদেহ দর্শনে কামোদ্বেগ হয় না। ইহাতে ভোগের ইচ্ছিত নাই।

সাধক স্বদেহে যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপ বিন্দু আছে, সাধনা দ্বারা তাহাকে স্ক্রু করিয়া বৈন্দবদেহ লাভে সমর্থ হন, ইহাই মায়িকজগতের বা অশুদ্ধজগতের জীবোদ্ধার। বৈন্দবদেহ মায়িকদেহের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে বলিয়া তাহার কোন বহিঃপ্রকাশ থাকে না। এইরূপ দেহধারী গুরুই মায়িক রাজ্যের 'ঈশ্বর' বা 'সদগুরু' পদবাচ্য, অন্য গুরুরা শাস্ত্রপাঠজ্ঞ গুরু মাত্র। সদগুরু যে মহাজ্ঞান লাভ করেন তাহা দ্বারাই বিন্দু হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, এই বীজ পরিপক্ব হইলে সদগুরু শিষ্যকে বীজমন্ত্র দানের উপযুক্ত হন। বহু সাধকের নামজপাদি দ্বারাও এইরূপ পথ উন্মুক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন 'উপায়' দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। ভগবান দীনহীন অকিঞ্চনের প্রতিই অহেতুক কৃপা করেন, মাতা যেরূপ অসহায় শিশুরই সহায়তা করেন, স্বাবলম্বীর সহায়তা করেন না।

শিবের পঞ্চবক্তৃ হইতে যাহা নির্গত হয় তাহাই তন্ত্র বা আগম। সেই আগমের শাসন 'প্রথমং কামিনীং ধ্যানা জপপূজাং সমাচরেৎ'। কামকলার ধ্যান (ইহাই কামিনীতত্ত্ব) না জানিলে বা না বুঝিলে তন্ত্রোক্ত পূজা ও জপ নিষ্ফল। ইষ্টদেবতা বা ইষ্টমন্ত্র অপেক্ষাও এই কামকলার ধ্যান ও জ্ঞান আগমোক্ত সাধনমার্গে একান্ত প্রয়োজনীয়। নাদবিন্দু বীজ ঘটিত রেখাত্রয় লইয়াই তন্ত্রের কামকলা ধ্যান। শিব নিগুণ, আদিবিন্দুতে শিব ও শক্তি তত্ত্ব অভিন্নরূপে বর্তমান ছিল, তাহাই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অপরবিন্দু ও বীজে পরিণত হইল, এবং তাহাদের সম্মিলনঘটিত বা উভয়ায়ক 'নাদের' উৎপত্তি হইল। বীজ শক্তিতত্ত্বপ্রধান, বিন্দু শিবতত্ত্বপ্রধান, বীজই অকথাপি ত্রিরেখা ঘটিত সমগ্র 'বর্ণাবলী'র সমন্বয়। তন্ত্রোক্ত রহস্যপূজার নিমিত্ত অকথাটির জ্ঞান আবশ্যক। 'নাদ' মধ্যে অকারাদি ঋকারান্ত সমগ্র বর্ণাবলীর অব্যক্ত ধ্বনি বর্তমান। বীজ-মন্ত্রের রহস্য জানিতে হইলে কামকলার দর্শন জানা আবশ্যক। তাহা এইরূপ :—

অ=যখন 'চিং'শক্তি একা বিরাজ করেন ইহাই অমুস্তর বা transcendent অবস্থা, ইহার রৌদ্রী, জ্যোষ্ঠা ও বামা শক্তিত্রয় ত্রিকোণ আকার।

আ=এক হইতে দ্বৈতরূপ ধারণ, দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখার ন্যায়, ইহাই যুগলরূপ যুগনকরূপ বা আনন্দভাব, ইহাও ত্রিকোণ আকার।

ই = 'ইচ্ছা'র বিকাশ অর্থাৎ অন্তর্মুখী চিৎশক্তির বহির্মুখী অবস্থা, আনন্দের ভাব হইতে সৃষ্টির যে ইচ্ছা, চিৎশক্তির ইহাই প্রকাশরূপ। কিন্তু খৃষ্টানদের Divine Father যেমন Divine Sonএ প্রকাশিত হইবার জন্য Divine Motherএর অস্তিত্ব অনিবার্য ছিল, সেইরূপ 'অ' হইতে 'ই'তে পৌঁছাইতে হইলে 'আ'র প্রয়োজন, ইহাই তান্ত্রিকের 'মহাশক্তি' ও নববৌদ্ধধর্মের 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

ঐ = ইহা মাত্রামাত্র, 'ই' দীর্ঘ হইয়া 'ঐ' হয়, ইহা ঐশ্বর্য বা ঐশ্বর্যভাব।

উ = উন্মেষ অর্থাৎ 'জ্ঞান' শক্তির উন্মেষ, ইহা নিরাকার অবস্থা, যথা—জল।

উ = উনতা বা সাকারভাব, জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা, যথা, জল হইতে বরফের উদ্ভব, কিন্তু জলের মধ্যেই তাহার অবস্থান বা মৃত্তিকা হইতে ঘটাদিরূপ ধারণ।

এ-ঐ = ইহারা চারিটি ক্রিয়াশক্তির বিভিন্ন স্তর বা বিকাশ, যথা, ঘনীভূত জলকে বিভিন্ন আধারে স্থাপন ইত্যাদি।

শিবের পঞ্চবক্তৃ ই যথাক্রমে অ, আ, ই, উ, এ-ঐ; ইহারাও যথাক্রমে চিৎশক্তি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।^১

নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতিতে এই 'উ' ভাবের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাকে 'স্বপ্রসারচাতুর্য্য' বলা হইয়াছে।^২ অধঃশক্তির আকৃষ্ণনে অর্থাৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়বাপার বন্ধ করিয়া (মুলাধার বন্ধন দ্বারা), মধ্যশক্তির প্রবোধ দ্বারা (যে শক্তি জীবকে নানা তরঙ্গের মধ্যেও স্ব স্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাই মধ্যশক্তি) উর্দ্ধশক্তি নিপাতনে পরমপদ লাভ হয় (সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতি ৪।১৬ ও অমরৌঘশাসন)।^৩ এই মধ্যশক্তিই কুণ্ডলিনীশক্তি, ইহা স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ, স্থূলরূপে নিখিল বিগ্রহের আধার, সেইরূপে কুণ্ডলিনী সাকারা, তাহারই 'স্বপ্রসারচাতুর্য্য' আছে—ইহাই উপর্যুক্ত তন্ত্রের বর্ণনার 'উ'কার। কুণ্ডলিনীর সূক্ষ্মরূপ নিরাকারা, মহাসিদ্ধেরা ইহাকে প্রবুদ্ধ করেন, তাই ইহা তাঁহাদের মতে প্রসিদ্ধ।^৪

অ—উ পর্য্যন্ত মহামায়ার স্তর, শিব রূপহীন, শক্তি বহুরূপে

১। সংকীর্ণানুতন্ত্রম্, লণ্ডাবনা, পৃ ৮০

৩। অমরৌঘশাসনম্, গোরক্ষনাথ বিরচিত ১।১

২। সি. সি. প. ৪।২২

৪। সি. সি. প. ৪।১৬-২২



রূপাধিত, তথাপি শিব বা শক্তি একাকী সৃজন করিতে অক্ষম। চিৎমাত্র হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি সম্ভবে না, চিৎএর সহিত ইচ্ছার মিলনই বৌদ্ধশূন্যের সহিত বিজ্ঞানের মিলন। এই মিলনে ‘মহাস্থ’ অ + ই = এ ; ইহাই বৌদ্ধদিগের এবম্কার। ব্রাহ্মীলিপিতে এ Δ ছিল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণের দ্বারা শিবশক্তির মিলন সূচিত হয়। তন্মধ্যস্থ বিন্দুই ‘মহাস্থে’র নিদর্শন। দেবেন্দ্র পরিপূচ্ছতন্ম্বে—

একারন্তু ভবেন্মাতা বকারন্তু পিতা স্মৃতঃ ।

বিন্দুস্তত্র ভবেদ্ যোগঃ স যোগঃ পরমাক্ষরঃ ॥

একারন্তু ভবেৎ প্রজ্ঞা বকারঃ সুরতাধিপঃ ।

বিন্দুশ্চানাহতঃ জ্ঞানং তজ্জ্ঞানানুক্ষরাণি চ ॥^১

কারুপাদের দৌহায় ‘এবম্কার দিড় বোধোড় মোড়িউ’ ইত্যাদি দ্বারা চন্দ্রসূর্য্য বা রাত্রিদিন বা কালকে ইঙ্গিত করিতেছে। যোগধর্ম্মে চন্দ্রই ‘প্রকৃতি’, ও সূর্য্য ‘পুরুষ’। হিন্দু তন্মধ্যে অ + ই = এ ত্রিকোণ আকারে কল্পিত হয়। ষট্‌কোণ অর্থে অ বা আ-র সহিত এ-র যোগ = ঐ, ইহাই তন্ময়ের ষড়র নামে খ্যাত। বৌদ্ধদের ‘এবম্’ ও তন্ময়ের ‘ঐ’ অভিন্ন।

অতএব দেখা যাইতেছে নিগূর্ণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতির মধ্যে প্রতিবিশ্ব উদিত হয়। নিগূর্ণ শিবতত্ত্বে প্রকৃতির প্রতিবিশ্ব ও প্রকৃতিতে শিবের প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিবিশ্বকে কেহ শক্তি, কেহ শিব, কেহ নারায়ণ আখ্যা দেন। উভয়ের প্রতিবিশ্ব একীভূত হইয়া পরাপ্রাসাদবিজ্ঞা হয়, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। (আগমে হকার, সকার, ঔকার, বিন্দু ও বিসর্গ সংযোগে পরাপ্রাসাদ মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। কুলার্ণব সকারকে হকারের আদিতে বলিয়াছেন। হকার শূন্য আকাশের বীজ বা নিগূর্ণ শিবের বীজ, সকার শক্তিবীজ, চতুর্দশশ্বর উকার ‘আজ্ঞা’ বা আত্মাকর্ষিণী শক্তি, ইহার পৌরাণিক নাম ‘সঙ্কষণ’। বিন্দুমূল ক্রিয়াশক্তি, বৈষ্ণব দর্শনের ইহাই ‘প্রহ্লাদ’। বিসর্গ বা দ্বিবিন্দু দ্বারা ইচ্ছা বুঝায়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে ‘অনিকৃদ্ধ’ বলে। স্বচ্ছ প্রধানা প্রকৃতি নিজের চেতনাকালে স্বেচ্ছায় নাদরূপে পরিণত হন, এবং আপন নিগূর্ণ ভাব স্মরণার্থে নাদকে আকর্ষণ করিয়া বিন্দুতে পরিণত হন, ইহাই তাঁহার আজ্ঞা, এই নাদবিন্দুর মিলনে পরাপ্রাসাদবিজ্ঞার অর্দ্ধ-

নারীশ্বর মূর্তি।) যাহাকে প্রতিবিশ্ব বলা হইয়াছে তাহাই মায়া, ইহা হইতেই সৃষ্টি।^১

তত্ত্বমতে সৃষ্টির মূল উপাদান চন্দ্র বা সোম। চন্দ্র যেখানে বিন্দুরূপে অবস্থিত সেখানে সৃষ্টি বা কম্পন নাই। ইহাই অমৃতকলা বা ষোড়শীকলা। উহা পঞ্চদশ কলার সমষ্টি হইয়াও তাহার অতীত। এই নিত্যকলার ক্ষরণ হয় না, উহা ‘অক্ষর’ বা ‘বিন্দু’। তবে কৌশলে শিবতত্ত্বের যোগে ইহা হইতে সুধাধারা বর্ষণ হয়। বিন্দুদ্বয়ের অদ্বয় অবস্থাই ষোড়শী, ইহার ক্ষরণ হইলেও ইহার অক্ষরত্ব ব্যাহত হয় না। এই বিন্দুক্ষরণ হইতেই নাদের আবির্ভাব হয়। সৃষ্টি নাদরূপা ও নাদমূলিকা। সৃষ্টি দ্বিপ্রকার—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। বিন্দুর প্রসার হইতেই উভয়ের উদয়। শুদ্ধসৃষ্টিতে আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব অবস্থা। আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরালে ভাবের স্বেচ্ছা থাকে, ক্রমিক পরিণাম থাকে না। অশুদ্ধমার্গে প্রতিফলনে অবস্থান্তর স্বাভাবিক।^২ স্থিরবিন্দুতে কোন পরিবর্তন নাই, সৃষ্টির উপাদান পুরুষ নহেন। অতএব পুরুষতত্ত্ব বিন্দুরও অতীত। সৃষ্টির মূল উপাদান মধ্যবিন্দু, পুরুষ তৎসহ নিত্যমিলিত হইয়াও নিত্যবিমুক্ত। সিদ্ধমতে সাকারের স্থায় নিরাকারও সৃষ্টির অন্তর্গত, পরমবস্তু সাকার ও নিরাকারের অতীত।

“গোরক্ষ-উপনিষদ” নামক আমার সংগৃহীত আর একটি পুঁথিতে আছে, “যা সময়ে মহাশূন্য থো আকাশাদি মহাপঞ্চভূত অকৃ তিনহী পঞ্চভূত ন ভয় ঈশ্বর ঔর জীবাদি কোই প্রকার ন থে, জব যা সৃষ্টি কৌ করতা কোন থা?” ইহার উত্তরে গোরক্ষ বলিতেছেন, নানাপ্রকার সৃষ্টির পূর্বে প্রথম কর্তা মহাভূত ছিল, তাহার শুদ্ধস্বাংশ লইয়া ‘ঈশ্বর’ হইলেন ও মলিন সত্তা লইয়া ‘জীব’ হইলেন। ইহারা সাক্ষাৎ কর্তা হইলেন না। তবে সেই অনির্বচনীয় কর্তা কে? তিনি আদি অনাদি মহানন্দরূপ নিরাকার সাকার বজ্জিত অচিন্ত্য এক পদার্থ, তিনিই মুখ্যকর্তা।..... ইনি অদ্বৈতাদ্বৈতরহিত অনির্বচনীয় ‘নাথ’ সদানন্দস্বরূপ দেবতা। তিনি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি প্রকটিত করিলে পিও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়।.....এই নাথ ‘শূন্য’ বা ঈশ্বরসম্ভান। সম্ভান দ্বিপ্রকার—নাদরূপা, বিন্দুরূপা। শিষ্য বিন্দুরূপ, পুত্র নাদরূপ, নাদ শক্তিরূপ,

১। মন্ত্রযোগ, অবদুত জ্ঞানানন্দ, পৃ ৭০, ৭১, ১।

২। তাত্ত্বিকবোধধর্ম, ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, কার্তিক ১৩৪৪।

বিন্দু নাদরূপ, তন্মধ্যে শিষ্য প্রথম। নবনাথ স্বরূপ শক্তি, বিন্দুরূপ পরশিব, তিনিই ঈশ্বরনামে পুত্র।

Sir John Woodroffe সাহেবের Garland of Letters এ তিনি 'নাদবিন্দু'র আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনে নাদবিন্দুতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। প্রথমে তত্ত্বাতীত বা নিষ্কল ব্রহ্ম বিরাজ করেন, তিনি অনির্বচনীয়, শক্তি তাঁহাতে বিলীন হইয়া আছে। এই নিষ্কল ব্রহ্ম নিজেকে ঈক্ষণ করায় 'অহম্' ও 'অস্মি'র উদ্ভেক হয়, অহমের প্রকাশ হয়, তৎসহ অস্মির বিমর্শ হয়। (ঈক্ষণ অর্থে মানুষ স্বপ্নে যেরূপ নিজ সংস্কার দর্শন করে, বিমর্শ অর্থে জ্ঞান।) এই প্রকাশ শিবতত্ত্ব, বিমর্শ শক্তিতত্ত্ব। ইহারা ঈক্ষণ দ্বারা আবির্ভূত বলিয়া ইহারা শক্তির প্রসার, কিন্তু এই প্রসার 'নিষেধব্যাপাররূপা', কারণ এই অবস্থায় নিষ্কল ব্রহ্ম হইতে সকল ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়। শিবশক্তির সংশ্লিষ্ট অবস্থাই সৃষ্টির মূল। 'অহম্' নিষ্ক্রিয় বলিয়া শিবরূপ, 'অস্মি' মধ্যে সমস্ত সংস্কার থাকায় উহা ইদম্ শক্তিরূপ, এই 'ইদম্' অহমের নিষেধরূপা, তাই শক্তিকে 'নিষেধরূপা' বলা হয়।

ঈক্ষণের পর নিষ্ক্রিয় হইতে যে সক্রিয় অবস্থা হয় বা শিবশক্তির সংযোগ হয় তাহাই 'নাদ'—

যদগমমুত্তরমুর্ত্তির্নিজেচ্ছয়াখিলমিদং জগৎ স্রষ্টুম্।

পস্পন্দে স স্পন্দঃ প্রথমঃ শিবতত্ত্বমুচ্যতে তজ্জৈঃ ॥

ইচ্ছা সৈব স্বচ্ছা সন্ততসমবায়িনী সতী শক্তিঃ।

সচরাচরস্ত জগতো বীজং নিখিলস্ত নিজনিলীনস্ত ॥

(তত্ত্বসন্দোহ ১, ২ শ্লোক)

যাহার পরে কিছু নাই, বিশ্বসৃষ্টির জন্ত নিজ ইচ্ছায় যিনি স্পন্দিত হন, তাঁহার সেই প্রথম স্পন্দকেই জ্ঞানী পুরুষেরা শিবতত্ত্ব বলেন। ঐ শুদ্ধ-ইচ্ছারূপী শক্তি যাহা নিত্যশিবের সঙ্গে থাকেন, তাঁহার নিজের ভিতরে লীন হইয়া সচরাচর জগতের বীজ আছে।

সাংখ্যের ভাষায় শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, ইহাদের সংযুক্ত নাদই সদাখ্যাতত্ব। ঈক্ষণে অহমের প্রকাশ-সময়ে শিব নিষ্ক্রিয়, শক্তি সক্রিয়, ইহাদের মিথসমবায়ই 'নাদতত্ত্ব', তত্ত্বের ভাষায় উহাই মহাকাল ও মহাকালীর বিপরীত রতি। নিষ্কল শিবে লীন শক্তির নাম 'সরস্বতী' অর্থাৎ সংসরণকারিণী, ইহার বাহন 'হংস', 'হ' শিবতত্ত্ব, 'সঃ' শক্তিতত্ত্ব

অর্থাৎ শক্তি-সংসরণে প্রপঞ্চাভিমুখী এবং বিপরীত প্রবাহে তাহাই 'সোহ' বা পরাবাক্ অবস্থায় প্রত্যাগমন, এই অবস্থায় শিবশক্তির একত্ববোধে নাদের অনুভূতি হয়। নিকল শিবের সহিত অভিন্না শক্তিই 'উন্মনা', সৃষ্টিকৃপিনী শক্তি 'সমনা', উন্মনা ও সমনার সন্ধিই শিবশক্তির সংযুক্তাবস্থা, ইহাই 'নাদ'।

সকল পরমেশ্বর হইতে শক্তি, তথা নাদ, তথা বিন্দুর উৎপত্তি হয়। (গণিতে বিন্দুর স্থান আছে পরিমাণ নাই, তত্ত্বমতে স্থানও নাই।) বিন্দুই সৃষ্টির মূল ও শক্তির অবস্থা বিশেষ, বিন্দুতত্ত্বই ঈশ্বরতত্ত্ব। এই অবস্থায় শক্তি চিহ্নপিনী হইয়া অব্যক্ত ইদম্কে তাদাত্ম্যভাবে আনিয়া চিহ্নবিন্দুরূপ ধারণ করে বা অহম্ (ঈশ্বর) আপন চেতনায় ইদম্কে (অখিলবিশ্বকে) দেখেন। অহং মহাপ্রলয়ের অন্তিম অবস্থা, ইদম্ সৃষ্টিরচনার পূর্বাবস্থা।

এইরূপে নাদ ও বিন্দু উভয়ই শক্তির বিভিন্ন অবস্থা। বিন্দুকে শক্তির ঘনীভূত অবস্থা বলে, সৃষ্টির ইচ্ছায় শক্তি ঘনীভূত হন বা বিন্দুৎলাভ করেন। সৃষ্টির ত্রিগুণের সবগুণ সকল ব্রহ্মে চিদ্রূপে জ্ঞানপ্রধান, নাদতত্ত্বে ক্রিয়ারূপে রজঃপ্রধান, বিন্দুতত্ত্বে ঘনীভূত হইবার কারণ তমঃপ্রধান। প্রত্যেক স্তরেই ত্রিগুণযুক্তাবস্থা হইলেও একটি গুণ প্রধান হইয়া বিরাজ করে।

অতএব সৃষ্টিবিকাশের মূলতত্ত্ব শক্তি, উহা একদিকে চিৎশক্তি, অন্যদিকে বিশ্বরূপিনী মায়াশক্তি। সকলব্রহ্ম হইতে বিন্দুতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিকাশে ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাতে মায়াশক্তির লক্ষণ স্পষ্ট উপলক্ষিত হয়, এই ভেদবুদ্ধিকে নিষেধব্যাপার রূপ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

বিন্দুতত্ত্ব পরিবিন্দুরূপে ত্রিধা বিভক্ত হয়, ভাস্কররায় ললিতা সহস্র-নাম স্তোত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, এই কারণে বিন্দু হইতে ক্রমশঃ কার্য্য-বিন্দু, তাহা হইতে নাদ, নাদ হইতে বীজ এই তিনরূপ হয়। এই তিনকে ক্রমশঃ পরবিন্দু, সূক্ষ্মবিন্দু ও স্থূলবিন্দু রূপেও অভিহিত করা হয়। “অস্মাচ্চ কারণাদ্বিন্দোঃ সাক্ষাৎক্রমেণ কার্য্যবিন্দুস্ততো নাদস্ততো বীজমিতি ত্রয়মুৎপন্নং তদিদং পরমসূক্ষ্মস্থূলপদৈরপি উচ্যতে”। ইহার মধ্যে সূক্ষ্মবিন্দু হিরণ্যগর্ভ ও স্থূলবিন্দু বিরাটের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মায়াশক্তিকে সকল ব্রহ্মে সবপ্রধান, তথা নাদতত্ত্ব হইতে বিন্দুর ত্রিরূপ পর্য্যন্ত রজঃ-প্রধানরূপে আমরা দেখি। মায়াশক্তি তমঃপ্রধানরূপে জীবে অভিব্যক্ত হয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিবিকাশের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল।

‘কলা’ কি ? চিত্রপিনী শক্তি ব্রহ্মে লীন হইলে ‘নিষ্কল’ ও শক্তি চৈতন্যরূপিনী হইলে ব্রহ্ম ‘সকল’ হন, এই দ্বিবিধস্বরূপ সত্য, শ্রুতিতে আছে—

এতাবানস্ত মহিমতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥

এই বিশ্বচৈতন্যরূপিনী শক্তির মহিমা, সকল স্বরূপের নিদর্শন, পুরুষ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐ পুরুষের একপাদ (সূক্ষ্মতম অংশ) অখিল প্রাণী ও ইহার অমৃতত্রিপাদ (মহত্তম অংশ) ছালোকে আছে ।

শক্তির দুইটি অবস্থা উন্মনী ও সমনী । উন্মনী অবস্থাই শক্তির নিষ্কল অবস্থা, সমনী অবস্থা শক্তির কলাযুক্ত অবস্থা । শক্তি প্রধানতঃ ষোল কলাতে বিভক্ত, $\frac{১}{৫}$ অংশের নাম কলামূর্তি, কিন্তু শিব নিষ্কল । শক্তি প্রকৃত পূর্ণতাকে ভেদ করিয়া ‘অস্তি’ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ‘অহং’রূপে প্রকটিত হন, এই আচ্ছাদনই শক্তিই ‘কঙ্কুক’ (কোষ) নামে অভিহিত । ইহারা সংখ্যায় ষট্, যথা—মায়া, কলা, রাগ, বিজ্ঞা, কাল ও নিয়তি । শক্তির ষোড়শতম কলা ‘অমাকলা’ নামে খ্যাত এবং সপ্তদশতম কলা ‘নির্ঝাণকলা’ । প্রশ্লোপনিষদে (৬।৪) ষোল কলার বিবরণ আছে । কলা অর্থে শিবের অংশ বা কর্তৃত্বশক্তির কিঞ্চিৎ অংশবিশেষ ।^১

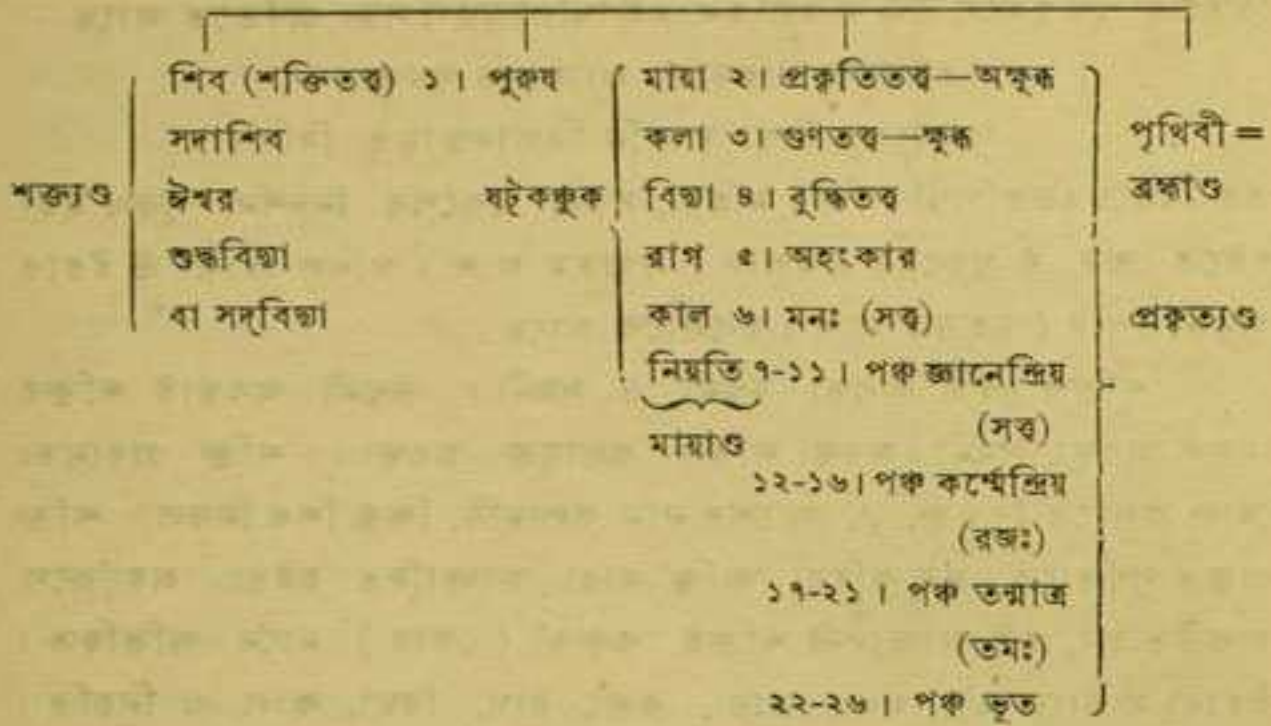
ষট্ কঙ্কুকের মায়া, অহং ইদম্কে পৃথক করে, অহং হইতে পুরুষ, ইদম্ হইতে প্রকৃতি হয়, পুরুষে কলা, বিজ্ঞা, রাগ ইত্যাদি আবরণ বা কঙ্কুক হয় । কলা অর্থে জীবে কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ববোধ, বিজ্ঞা জীবের অলঙ্ঘ্যতা, রাগ জীবের অনুরাগের কারণ, কাল জীবের অনিত্য ভাব, নিয়তি জীব যাহার দ্বারা নিয়মিত কার্য্য করে—এই পঞ্চ কঙ্কুক জীবকে আবরিত করে । এই মায়াবৃত্ত জীবই পুরুষ । এই পুরুষ ও প্রকৃতির পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব লইয়াই পরশিবরূপা সংবিদ্ বিশ্বময়ী ।

তত্ত্বসারে আছে, ‘তং সমস্তম্ অক্ষানং দেহে বিলাপ্য, দেহং প্রাণে, তাং ধিয়ি, তাং শূন্যে, তৎ সংবেদনে নির্ভরপরিপূর্ণসংবিৎ সংপদ্যতে ষড়্ বিংশ-তত্ত্বস্বরূপজ্ঞঃ তত্ত্বতীর্ণাং সংবিদং পরশিবরূপং পশ্যন্ বিশ্বময়ীমপি সংবেদয়তে ।’^২ পরশিবরূপা সংবিদ্ বিশ্বময়ী ও বিশ্বোত্তীর্ণা । পরশিব তত্ত্বাতীত । তত্ত্বসকল মূলতঃ ষট্ বিংশতি, যথা—

১। নাদবিন্দুকলা, শ্রীগৌরীশঙ্কর দ্বিবেদী সাহিত্যরত্ন, শক্তিষক্ কল্যাণ, পৃ ৪৪৬ ইঃ Based on Garland of Letters.

২। তত্ত্বসার ৭ম অঃ

পরশিব চিংমাত্র



নাদাদিতত্ত্বের অন্তরশক্তিরূপ কলা নাদাদিতত্ত্বকে চারিটা অণ্ডে বিভাজিত করে—ব্রহ্মাণ্ড, মায়াণ্ড, শক্তিও ও মূলাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড পৃথ্বাদিতত্ত্বযুক্ত আকাশ দ্বারা আবৃত। মায়াণ্ড মায়া, শক্তিও শক্তি ও মূলাণ্ড প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। শক্তিও শক্তিকলা ব্যাপ্ত থাকে, ইহার সীমা শক্তিতত্ত্ব হইতে শুদ্ধবিজ্ঞা পর্য্যন্ত, ইহাতে সমনী ব্যাপিনী ইত্যাদি শক্তি ও তাহাদের কলা এবং নাদবিন্দু শক্তি ও উহাদের কলা সমাবিষ্ট থাকে। শক্তিওের দেবতা মন্ত্রমহেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্র ও বিজ্ঞেশ্বর। শুদ্ধবিজ্ঞা ও মায়াতত্ত্বের মধ্যে বিজ্ঞানকলা ব্যাপ্ত আছে, উহা বিন্দুবিকাশের দ্বারা বিশ্বরচনা করে। মায়াণ্ডে বিজ্ঞাকলা ব্যাপ্ত আছে, পৃথ্বী হইতে মায়াণ্ড পর্য্যন্ত দেবতা ব্রহ্মাবিষ্ণুকর্ত্র। প্রকৃতিও (মূলাণ্ড) ও ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল সৃষ্টি অবস্থিত আছে। এই কলাদিষ্টাত্রী দেবতার সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক শক্তিতত্ত্বে লীন হন। সেই শক্তিতত্ত্বই শিব বা আনন্দ—সদাশিবতত্ত্ব, 'ইচ্ছা' বা অহং ইদং, ঈশ্বরতত্ত্ব 'জ্ঞান' বা ইদং, শুদ্ধবিজ্ঞা বা সদ্বিজ্ঞাতত্ত্ব 'ক্রিয়া' বা ইদং অহং। পরমেশ্বরের হৃদয়ে বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি শিবরূপ ও শক্তিরূপ হন, শিব প্রকাশ-রূপ, শক্তি বিমর্শরূপ (বিমর্শ=পূর্ণ অকৃত্রিম 'অহং' এর সৃষ্টি)। সুন্দর রাজা যেমন দর্পণে নিজমূর্ত্তি দেখেন, শিবও শক্তিতে তেমনি নিজের সত্তা দেখেন, পুণ্যানন্দের কামকলাবিলাসে ঐ উপমা আছে। শিব ও শক্তি



চন্দ্রচন্দ্রিকার দ্বায় অচ্ছেদ্য। বিমর্শের নামাস্তর পরাবাক্, ক্ষুরতা, স্পন্দ ইত্যাদি।

শিব চিন্মাত্রস্বভাব, পূর্ণ, অধিকারী হইয়াও তাঁহার শক্তি অনন্তভাবে প্রক্ষুরিত হয়, তন্মধ্যে চিং, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই পাঁচটি মুখ্য। শিব ও শক্তি অভিন্ন; যখন মাত্র চিংশক্তির প্রাধান্য তখন শিব তত্ত্ব, আর যখন আপন স্বাতন্ত্র্যমহিমায় বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছায় প্রথম আত্মবিমর্শ দ্বারা শক্তিদশায় অবিশায়িত হইয়া প্রক্ষুরিত হন, তখনই তাঁহার স্বারসিক বা স্বতঃক্ষুর্ত অহংভাবের উদয় হয়, ইহাই তাঁহার 'আনন্দপ্রধান' শক্তিতত্ত্ব। ইহাই 'অহং'ভাব বা প্রকাশের দ্বিতীয় অবস্থা। অনন্তর 'অহং-ইদম্'রূপ পরামর্শদ্বয়ের দ্বারা (ইচ্ছা দ্বারা), আপনাকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছারূপ শক্তির প্রাধান্যে 'সদাশিব' তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহা অক্ষুট ভাবরাশির দ্বায়, ইহা ক্ষুটীভূত হইলে 'ইদম্' অংশে যখন 'অহম্' অংশের নিষেক হয়, তখনই 'জ্ঞান'শক্তি প্রধান 'ইদম্-অহং'রূপে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশ হয়। পরিশেষে 'ক্রিয়া' শক্তির প্রাধান্যে 'অহম্-ইদম্' যখন তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, অর্থাৎ যখন বেত্তা ও বেত্ত উভয়ই ক্ষুট ধারণ করে তখন শুদ্ধবিজ্ঞা বা সদ্বিজ্ঞার প্রকাশ হয় (তত্ত্বসার)। শিবই বেত্তা ও বেত্ত, তিনিই প্রমেয় ও প্রমাতা। একই বস্তু বেত্তা ও বেত্ত, প্রমাতা ও প্রমেয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য হন, কারণ তিনি অদ্বিতীয়, জগতের দ্বিতীয় কারণ নাই। তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যমহিমায় নর্গরভসে বা খেলার ঔৎসুক্যে এই জগৎকে আপনার বোধগগনে প্রতিবিস্তৃতবৎ প্রকাশিত করিয়াছেন।^১

গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে নাদ ও বিন্দু অংশের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা হইয়াছে। নাথ হইতে নাদ, নাদ হইতে প্রাণ এবং শক্তি হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। যোগসম্প্রদায়ে নাদ হইতে জাত শিষ্টাকে বিন্দু হইতে জাত পুত্রের অধিক বলা হয়।^২ নাথ হইতে দ্বিপ্রকার সৃষ্টি হইয়াছে—নাদরূপা ও বিন্দুরূপা। নাদরূপা শিষ্টাক্রমেণ, বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ। নাদান্নবনাথা জাতা বিন্দুতঃ সদাশিবো ভৈরবো জাতঃ। তৎপরে শব্দসৃষ্টি বর্ণনা আছে, এক সূক্ষ্মরূপিণী, দ্বিতীয় স্থূলরূপিণী—সূক্ষ্ম-রূপিণী প্রণবো মহাগায়ত্রী যোগশাস্ত্র, স্থূলরূপিণী ব্রহ্মগায়ত্রী বেদত্রয়। ... পুনঃ নাদসৃষ্টিকৃপিণী সূক্ষ্মস্থূলরূপিণী প্রকারদ্বয়ান্বিকা জাতা।^৩

১। ঈশ্বরপ্রত্যয়িত্তিভাষ্য ৫।৩ ও তত্ত্বসার

২। "সর্গমিহ ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিস্তৃতমাত্র"—তত্ত্বসার ৩ আঃ

৩। গো. সি. স. পৃ ৫৮

৪। গো. সি. স. পৃ ৭৩, ৭৩

নাথশূত্রে একাক্ষর প্রণবকেই সূক্ষ্মবেদ বলা হইয়াছে এবং সত্যযুগে কেবল প্রণব গায়ত্রী সাধনে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি হইত। যে সকল শ্রুতি প্রণবানুসারিণী তাহাই ‘নাথমতানুযায়ী’ ইহাও গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রণবানুসারিণী শ্রুতির নামও উল্লিখিত হইয়াছে, যথা মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ক্ষুরিকা, কৈবলা, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মৈত্রায়ণাদি। প্রণবই একমাত্র বেদ, যাহার দ্বারা প্রণব প্রবর্তক নাদের উপলব্ধি হয় এবং নাদব্রহ্মের যাহা মূলতত্ত্ব তাহার উপলব্ধি হয়।^১

পাতালখণ্ডে আছে—“অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ প্রীয়তে। অহং চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং ‘কামকলায়কঃ’ ॥ সত্যযোষিং স্বরূপোহহং যোষিচ্চাহং সনাতনৌ। অহং চ ললিতাদেবী পুরুষা কৃষ্ণবিগ্রহা ॥” শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের অষ্টম পটলে ‘কদাচিদ্বাঙ্গা ললিতা পুরুষা কৃষ্ণবিগ্রহা। লোকসম্মোহনার্থায় স্বরূপং বিব্রতী পরা। কদাচিদাঙ্গা শ্রীকালী সৈব তারাস্তি পার্বতী। কদাচিদাঙ্গা শ্রীতারা পুরুষা রামবিগ্রহা। ‘রা’ শক্তিরিতি বিখ্যাতা ‘ম’ শিবঃ পরিকীর্তিতঃ। শিবশক্ত্যাঙ্কং ব্রহ্ম রামরামেতি গীয়তে।” অতএব ইহা দ্বারা শিবশক্তির অভিন্নতা উপলব্ধি হয়, কালীতারা শিবরাম একই, বাসুদেবও ‘কামকলায়কঃ’। আবার “বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি বিন্দুরিন্দু রজো রবিঃ। উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্” (পৃ ৪১ গো. সি. স.)। এই বিন্দু দেহে ধারণ করিতে পারিলে মৃত্যুভয় থাকে না, পরমপদ প্রাপ্তিও হয়। নভোমুদ্রা দ্বারা এই বিন্দু ধারণ কর্তব্য। মনঃস্থৈর্য্যে বায়ু স্থির হয়, তাহা হইতে বিন্দু স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে পিও অবশ্যই স্থির হইবে। জিতায়ু কামবর্জিত হইয়া তারক জপ করেন, নামাংগ্রে দৃষ্টি করিয়া ‘ওঁকার’ অক্ষরই জপ বিধি।^২ পরবিন্দু ভেদ হইয়া যে প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম উৎপন্ন হইবার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে সেই প্রণবই জগতের মূলযন্ত্র। তাহাই ত্রিরেখা বা কামকলার যন্ত্ররূপে বর্ণিত হয়, বীজমন্ত্রের নাদাংশই কাম-স্বরূপ বা ইচ্ছারূপিণী নাদশক্তিই কামস্বরূপ।

এই ওঁকার বা নাদবিন্দু সাধন যোগমার্গে কিরূপে আচরিত হইত তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

কায়সিদ্ধি

প্রাচীন ভারতে বহু সম্প্রদায় মধ্যেই আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণ উৎকর্ষ লাভের জন্ত দেহসিদ্ধি বা কায়সিদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকৃত হইত। এই দেহসিদ্ধি দ্বারা জরামৃত্যুহীন শুদ্ধদেহ লাভ করাই উদ্দেশ্য ছিল। যদিও প্রচলিত দার্শনিক গ্রন্থানে আপাততঃ ইহার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি কিকিৎ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহার আভাস অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হইবে। এমন কি, ভারতের বাহিরে অষ্টাশ্ব ধর্মের ইতিহাসেও সিদ্ধদেহের বিবরণ যে না পাওয়া যায় এমন নহে। উদাহরণস্বরূপ যীশুর পরম ভক্ত সেন্ট জনের নাম করা যাইতে পারে।^১ চীনদেশে Laotse সম্প্রদায়েও দেহসাধনের সূক্ষ্ম আলোচনা বর্তমান ছিল জানিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাস সविशेषভাবে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, দেহসিদ্ধিলাভের বহু প্রণালী এই দেশে প্রচলিত ছিল। হঠযোগী সম্প্রদায় সাধারণতঃ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া দেহসাধন করিতেন। রসেশ্বর দর্শনের অনুযায়িগণ পারদের অষ্টাদশ সংস্কার স্বেদন, মর্দন, মূর্ছন, স্থাপন, পাতন, দীপন ইত্যাদি সম্পাদনপূর্বক সিদ্ধদেহ বা হরগৌরীতনু প্রকট করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এবং কোন কোন বৌদ্ধ অথবা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে বিভিন্ন উপায়ও অবলম্বন করা হইত। কেহ ভাবসাধনের দ্বারা ভাবদেহ অর্জন করিতেন, আবার কোন কোন সাধক বিন্দুজয়পূর্বক তাহার উর্দ্ধগতি সম্পাদন করিয়া দেহ সিদ্ধ করিতেন। প্রাচীন বৌদ্ধগণের মধ্যেও ‘স্কন্ধসিদ্ধি’ নামে দেহসিদ্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে আশ্রয় পরাবৃতি বা শুদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণে নবকায়লাভ বিবেচ্য।^২ বজ্রযান, সহজযান, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে,

১। The Apocalypse Unsealed (Revelation of St. John), James Pryse, New York.

২। ধর্মকায় হইলেন নূতন শুদ্ধ আশ্রয়, ইহাই অনাস্রব ধর্মসম্প্রদায় বা আশ্রয় পরাবৃতি।
—অভিধর্মকোশ ৭১০৪

এই গুহ্য সাধনার অনেক রহস্যই জানিতে পারা যাইবে। নাথগণ দেহ-সিক্তিকে বিশেষ প্রাধান্য দিতেন, তাই ইহা তাঁহাদের নামেই প্রচলিত। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও অপর ভাষায় নিবদ্ধ রচনাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।

আমাদের পূর্বে আলোচিত নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে এবং বঙ্গীয় গাথার মধ্যে কায়সিক্তির বহু উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় গাথার আলোচনা পরে করিতেছি। সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে “চন্দ্রাং সারঃ শ্রবিতবপুশা তেন মৃত্যুর্নারাণাং তং বঙ্গীয়াং শূকরণমথো নান্থথা কায়সিক্তিঃ”।^১ যে যোগী খেচরীমূর্ত্তা জানেন তিনি কালের দ্বারা বাধিত হন না, যিনি চন্দ্রের এই নির্দোষ অমৃতধারা পান করিয়াছেন, তিনি মৃণালের দ্বারা বপু ধারণ করিয়া জীবিত থাকেন। চন্দ্রসার যাহার দেহে শ্রবিত হইতেছে, তাহার কায়সিক্তি অনিবার্য। তিনি রোগের দ্বারা পীড়িত হন না, কষ্টের দ্বারাও বাধিত হন না, তিনি পঞ্চমুখ হরের দ্বারা অজর অমর হন। এই সাধন গুরুর উপদেশে লভ্য, কোটিশাস্ত্র পাঠেও এই জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। হঠযোগপ্রদীপিকাতেও আছে—“নির্ব্যাধিঃ স মৃণালকোমল-বপুর্যোগী চিরং জীবতি” (৩৪১)।

প্রশ্ন হইতে পারে, কাল শরীরকে ত্যাগ করে না, তবে যোগী কায়সিক্তি দ্বারা কিরূপে কালকে বধনা করেন? বস্তুতঃ কাল স্থূল শরীরকে ত্যাগ করে না, “শরীরং নো ত্যজেদেব কালঃ কস্তাপি কুত্রচিৎ। অন্তঃশরীররক্ষার্থং যত্নঃ কার্যাস্ত যোগিনা”।^২ তাই যোগী অন্তঃশরীর রক্ষাকার্যে যত্নবান হন, এইরূপ যোগীর পক্ষে অহংভাববর্জিত মনের অভ্যাসই লক্ষ্য। যে পূর্ণরূপে কল্পনাহীন সে কালকে জয় করিতে অক্ষম। আত্মজয়ই কাল, তাহাই শিব, তাহা সর্বশ্ব, ইহা ব্যতীত কিছু নাই। কালযুক্ত সংসারে যোগী স্বীয় পৌরুষের দ্বারা কালকে জয়ী করিয়া সিদ্ধযোগী হন। যোগী নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া বায়ুরোধ করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অমরোঘশাসনের প্রথমেই উর্দ্ধশক্তির নিপাতনে ও অধঃশক্তির আকৃষ্টনে মধ্যশক্তির প্রবোধ দ্বারা মহাস্থত উৎপন্ন হইবার কথা আছে। অধঃশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি, তাহাকে মধ্যপথে অর্থাৎ



সুষুমাপথে নীত করিয়া সহস্রারে মিলিত করিতে হয়, তৎকালে উর্দ্ধশক্তির নিপাতন হয় অর্থাৎ সহস্রার হইতে অমৃতক্ষরণ হয়।

কুণ্ডলিনী বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়াই উর্দ্ধে গমন করেন। জীব খেচরী মুদ্রা সাধন দ্বারা সহস্রার-ক্ষরিত অমৃত পান করিলে তাহার পিণ্ডস্থৈর্য্য হয়।^১ ইড়া সঞ্চারী পুরকের সহিত খেচরী দ্বারা নাভিস্থ বহ্নিকে সিদ্ধিত করিলে 'নবতমু' লাভ হয়।

নাসা পশ্চিমমার্গবাহপবনাং প্রাণেহতিদীর্ঘাকৃতে
চন্দ্রাপু প্রতিসারণাং স্কৃতিনঃ প্রাগ্ ঘটিকায়াঃ পথঃ ।
সিঞ্চন্ কালবিশালবহ্নিবশগং ভূদ্বা স নাড়ীশতং
তৎকার্য্যং কুরুতে পুনর্নবতমুং জীর্ণক্রমস্কন্ধবৎ ॥^২

হঠযোগপ্রদীপিকাতে উক্ত হইয়াছে—

অবোধ্মধ্যে শিবস্থানং মনস্তত্র বিলীয়তে ।
জ্ঞাতব্যং তৎপদং তুর্য্যং তত্র কালো ন বিদ্যতে ॥
অভ্যাসেৎ খেচরীং তাবদ্ যাবৎ স্তাদ্যোগনিদ্রিতঃ ।
সংপ্রাপ্তযোগনিদ্রস্ত কালো নাস্তি কদাচন ॥^৩

অর্থাৎ ক্রমুগলের মধ্যে শিবস্থান আছে অর্থাৎ ঐ স্থানেই সুখস্বরূপ আত্মার অবস্থান। এই শিবস্থানে মল বিলীন হয় অর্থাৎ শিবাকার বৃত্তি প্রবাহ হয়। এইরূপ চিত্তলয়ই জ্ঞাতব্য স্বপ্ন সুষুপ্তির পরবর্তী তুর্য্য বা চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থা হইলে মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের নিরোধ হেতু আয়ুক্ষয়কারক কাল থাকে না, এই নিমিত্ত সুষুমাতে কালের ভোক্ত্রী বলা হয়।

যাবৎ সাধক খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করেন, তাবৎ সেই সাধক যোগনিদ্রামগ্ন থাকেন—অর্থাৎ তাহার সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। যে সাধক এইরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিয়াছেন, তাহার কদাচ মৃত্যু ঘটে না।

হঠযোগপ্রদীপিকায় যে যোগী-নমস্কার আছে তাহাতেও বলা হইয়াছে, তুমি চিরজীবী যোগী, তোমাকে নমস্কার করি। যে কাল ছর্ব্বার, তুমি সেই 'কাল' অর্থাৎ মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। যে কালের বদনে

১। অমরোৎপাদন, তৃতীয় স্কন্ধ—পিণ্ডস্থৈর্য্যঃ বদমান্ ভবতি বত মহামৃত্যুরোগাগ্রবস্তে ইত্যাদি।

২। অমরোৎপাদন, ৪৪ স্কন্ধ।

৩। হ ষো প্র ৪১৮, ৪২ ; ৪১১৭ ভোক্ত্রী ব্রহ্মা কালত।

এই পরিদৃশ্যমান স্বাবর-জঙ্গমায়ক জগৎ পতিত আছে, সেই জগদুৎসুক কালও যখন তোমার নিকট অভিজুত হইয়াছে তখন তোমাকেই নমস্কার কর্তব্য—“অমরায় নমস্তভ্যং সোহপি কালস্বয়া জিতঃ” ১১

গোরক্ষসংহিতায় যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন—

অপানপ্রাণয়োঠৈক্যাং ক্ষয়ো মূত্রপুরীষয়োঃ

যুবা ভবতি বুদ্ধোহপি সততং মূলবন্ধনাং ১২

অর্থাৎ মূলবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা প্রাণ ও অপান (এই দুইটা বায়ু পরস্পর উর্দ্ধে ও অধঃ অবস্থিত) বায়ুর একতা সম্পন্ন হয় সুতরাং মূত্র ও পুরীষের ক্ষয় হয় এবং বুদ্ধ ও যুবার দ্বারা দৈহিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। অতএব বলা যাইতে পারে মূলবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস দ্বারাও কায়সিক্তি হয়।

কোন কোন মতে কায়সাধন ক্রিয়াতে বজ্রোলী, সহজোলী প্রভৃতি যে সকল মুদ্রার সাধন আছে তাহাতে শ্রীসঙ্গ অনিবার্য। বজ্রোলী সহজোলী নাম হইতে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। বজ্রোলী প্রভৃতির রহস্ত হঠযোগপ্রদীপিকায় এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—

চিন্তে সমহমাপনে বায়ো ব্রজতি মধ্যমে।

তদামরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে ১৩

এই সকল মুদ্রা সাধন দ্বারা বায়ু মধ্যম নাড়ীগত হয় অর্থাৎ শূন্য পথে প্রবাহিত হয়, তদ্বারা কাল জয় সম্ভব হয়, কারণ শূন্য কালভোক্ত্রী ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে নাথসম্প্রদায় মধ্যে কায়সিক্তি ছিল। পূর্বে যে রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিতও নাথসম্প্রদায়ের যোগ ছিল। গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে “রসায়নৌ মহাবিষ্ঠা সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্” ১৪ বলা হইয়াছে। রসায়নবিষ্ঠা দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ তাহার পিণ্ডসিক্তি হয়। যোগী ইহার ফলে বৈষয়িক দেহ ত্যাগ করিয়া যোগদেহ লাভ করেন এবং কালকে জয় করিয়া তাহা রক্ষা করেন।

যোগদেহং সৃজত্যেব কালমীত্যবতায়ম্ ।

হস্তি বৈষয়িকং দেহং তন্নাথঃ কহরীশ্বরঃ ॥^১

রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কায়সিদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা পরে করা যাইতেছে, তৎপূর্বে দেহসিদ্ধির দুইটি বিশেষ ধারার আলোচনা কর্তব্য। দেহসিদ্ধির দুইটি ধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম ধারায় কেবল সূক্ষ্মদেহের স্থিরতা সম্পাদন করা হয়, দ্বিতীয় ধারায় সূক্ষ্মদেহেরও শুদ্ধি সম্পাদন করা হয়।

প্রথম ধারায় দেহসিদ্ধির জন্য সূক্ষ্মদেহের সাক্ষাৎভাবে সিদ্ধতা অপরিহার্য্য নহে; এই মতে সূক্ষ্মদেহটিকে স্থূল হইতে পৃথক করিয়া লইয়া স্থির করিয়া লইতে হয়, সূক্ষ্মদেহ স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত পারদের ন্যায় স্বভাবতঃ চঞ্চল থাকে। আশ্রয় ব্যতিরেকে উহা একপ্রকার অব্যক্ত থাকিয়া যায় এবং আশ্রয় পাইলেও উহা আশ্রয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় বলিয়া স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। সাধনার সূক্ষ্মকৌশলে স্থির আশ্রয়ের সহকারিতায়, জীবের সূক্ষ্ম সত্তাকে স্থিতিশীল করা যাইতে পারে। এই স্থিতি আপেক্ষিক অথবা পূর্ণ তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এই প্রণালীতে যে সিদ্ধদেহের আবির্ভাব হয় তাহাতে সূক্ষ্মদেহের সারাংশ গ্রথিত থাকে, অসার অংশটি বাহ্যাবরণের ন্যায় তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, ইচ্ছামাত্র তাহাকে পৃথক করিয়া ফেলা যায়, লৌকিক দৃষ্টিতে এই পৃথকীকরণকে মৃত্যু বলে। বস্তুতঃ ইহা “মৃত্যু” নহে। ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ বা সর্পের কক্কুক ত্যাগের ন্যায় সাধারণ ব্যাপার মাত্র। সূক্ষ্মসত্তাতে ‘অহং’ বোধ উদ্ভূত হয়, ইহা অহঙ্কার নহে, সূক্ষ্মসত্তা সিদ্ধ হইয়া গেলে এই বোধের স্থায়িত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়—অর্থাৎ ‘আমিহ’ বোধটুকু অটুট থাকে। সাধারণ জীবের মৃত্যুতে ‘আমিহবোধের’ লয় হয় এবং পুনর্জন্ম হইলে ‘আমিহ’ বোধ নূতনরূপে আবির্ভূত হয়। যোগী ও সাধারণ জীবের দেহত্যাগে ইহাই ভেদ। (জাতিস্মরণের চৈতন্যের আবরণ শিথিল থাকে বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি অটুট থাকে।) সাধারণতঃ জীব ক্ষণিক বা অল্পকালস্থায়ী জ্ঞান ব্যতিরেকে স্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, চিন্তের চঞ্চলতাই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কায়সিদ্ধি হইলে জ্ঞান

সর্বদা অথও ভাবেই উদিত থাকে, তাহার তিরোধান সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানের তিরোধান না হইলে অজ্ঞানের আবির্ভাব কি প্রকারে হইতে পারে? মৃত্যু, প্রলয় বা নিগ্রহ অজ্ঞানের নামান্তর। অতএব একবার স্থিরজ্ঞান হইয়া গেলে ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। ইহাকেই ‘মৃত্যুঞ্জয়’ বলে, আচার্য্যগণ ‘কালবধন’ দ্বারা ইহারই নির্দেশ করিয়া থাকেন।

কালচক্রযান সম্প্রদায়েও কালকে ধ্বংস করিবার কথা আছে, শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন কাল অর্থে ‘দানব’, তাহাকে ধ্বংস করিবার চক্রবিশেষ বলিয়া কালচক্রযান নাম হইয়াছে।^১ ওয়াডেল সাহেবের মতে উত্তর ভারতের কাশ্মীর ও নেপালে তন্ত্রের উদ্ভব হয়, তাহাতে মন্ত্রযানের সাধন-প্রণালীর সহিত দানবাদির সংযোগে ‘কালচক্রযানের’ উদ্ভব হয়।^২ এই কালচক্রযান মধ্যে ‘পরাবৃত্তি’ অর্থাৎ উন্টাসাধন ছিল,—ইহা মৃত্যুর পথে অগ্রসর না হইয়া উন্টাপথে অগ্রসর হওয়ার সাধন (যথা—ঘড়ির কাঁটা উন্টাইয়া দেওয়া) অতএব ইহাও ‘সিদ্ধদেহ’ লাভের সাধনা। স্থূলদেহ নাশে বিষয় হইবার কারণ নাই, চর্যাপদে ইহার উল্লেখ পাই “কান্ধবিরোএ মা হোহি বিষয়া”।^৩ দেখা যাইতেছে, যৌগিক সম্প্রদায় মাত্রেরই স্থূলদেহ ত্যাগে ভীত হইতেন না, তাহাকে সাধারণ ব্যাপার রূপে গণ্য করিতেন, ইহাই দেহসিদ্ধির প্রথম ধারা।

এই যে প্রথম ধারার উল্লেখ করা হইল তাহাতে ‘মৃত্যু’ বলিয়া কিছু না থাকিলেও, দেহত্যাগরূপ ব্যাপার আছে। এই কণ্ঠক ত্যাগের দ্রষ্টারূপে এবং কোন কোন স্থলে অধিষ্ঠাতৃরূপে চিন্ময়ী সূক্ষ্মসত্তা বর্তমান থাকে। অর্থাৎ দেহত্যাগেরও দুইটি অবস্থা আছে : প্রথমটি ইচ্ছাধীন নহে ও দ্বিতীয়টি ইচ্ছাধীন। প্রথম অবস্থায় প্রারক কৰ্ম অভিজুত হয় না বলিয়া দেহত্যাগ ইচ্ছাধীন নহে, এই অবস্থায় জ্ঞানমাত্র থাকে, কিন্তু ইচ্ছামৃত্যু সম্ভব হয় না। তথাপি দেহত্যাগকালে অজ্ঞান থাকে না বলিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি জ্ঞানপূর্বক দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই প্রথম অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক দেহত্যাগের সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয়প্রকার অবস্থায় প্রারক ও কালশক্তি অভিজুত থাকে বলিয়া দেহত্যাগ ইচ্ছামুরূপ সময়ে, স্থানে ও উপায়ে করিতে পারা যায়।

১। উড়িয়ার বৌদ্ধ ধর্ম নগেন্দ্রনাথ বহু, ভূমিকা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃঃ ৮

২। ওয়াডেল, ‘লামাধর্ম’ পৃঃ ১৫

৩। চর্যা ৪২।২

এক্ষণে পূর্বের উল্লিখিত দেহসিদ্ধির দ্বিতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই ধারায় স্থূল দেহের অর্থাৎ ভৌতিক উপাদানে গঠিত দেহের আত্যন্তিক শুদ্ধি নিষ্পন্ন হয়, এইজন্য দেহে বর্জনীয় অংশ কিছু থাকে না। যাহারা এই ধারণাকে অবলম্বন করিয়া দেহকে সিদ্ধ করেন, তাহাদের পক্ষে দেহত্যাগ আবশ্যক হয় না, কণ্ঠক বলিয়া তাহাদের পক্ষে বর্জনীয় কিছু থাকে না, সমস্ত দেহটী শুদ্ধ উপাদানরূপে পরিণত হইয়া যায়। এই ধারায় পরিহারযোগ্য অংশ থাকে না, যদি দেহের ঐরূপ কোন অংশ থাকে, তবে বৃদ্ধিতে হইবে দেহসিদ্ধি সম্যক্ নিষ্পন্ন হয় নাই।

পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রে ‘কায়সম্পৎ’ নামে এই দেহসিদ্ধির যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে, পঞ্চভূতকে জয় করিবার ফলে কাস্তিমান্ বজ্রবৎ দেহ লাভ হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যাসভাষ্যে দ্রষ্টব্য।^১ তান্ত্রিকাচার্যগণ ‘মন্ত্র-যোগ’ বা শব্দসাধনার দ্বারা সিদ্ধদেহের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া থাকেন। অবিরত এক মন্ত্র জপের দ্বারা বৃত্তিসমূহ রুদ্ধ হয়, শরীর-মন সহজেই বিরাম পায়। তৎফলে শরীরে নবকাস্তি দেখা দেয়, শরীর লঘু হয় ও অগ্নিমাди সিদ্ধি হয়।

দেহসাধনের মূলে বিন্দুপ্রবাহের স্থিরতা ও শুদ্ধতা সম্পাদনপূর্বক উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক। বিন্দুর গতি উর্দ্ধমুখী না হইলে অন্তঃকরণ, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং দেহের উপাদানস্বরূপ ভৌতিক সত্তা সবগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বিগলিত করিয়া, একটী নিরন্তরবাহী স্রোতের স্থায় উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত করিতে হয়। এই স্রোত যতই উর্দ্ধমুখ হইতে থাকে, ততই তাহা ক্রমশঃ অধিকতর বিশুদ্ধ হইতে হইতে চরম অবস্থায় চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা নির্মূল ও আনন্দময় বিজ্ঞানপ্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাহাকে যোগিগণ সাধারণতঃ ‘নাদানুদান’ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, ইহা তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যুৎ হইয়া অর্থাৎ চিৎশক্তির স্পর্শে কুণ্ডলিনী শক্তি স্পন্দিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন নাদরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনি এই উর্দ্ধমুখ ধারার সূত্রপাত হয়। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃতির নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। মন ও তৎসহযোগে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বহির্মুখ থাকা পর্য্যন্ত ইহা অনুভব করা যায় না। ‘নাদ’ শব্দ-ত্রয়ের ক্ষুরণ অবস্থা, ইহা ক্ষণাত্মক শব্দ, বর্ণরূপী শব্দ নহে, ইহা বলাই

১০। পাতঞ্জলযোগবর্ণন, বিহুতিপাদে “ততোঃনিম্নাধিগ্রাহ্যত্বাৎ কায়সম্পৎ তদুর্দ্ধানন্তিত্যন্তঃ (৪৫ পূত্র) রূপলাবণ্যবলবজ্রনংহননয়ানি কায়সম্পৎ (৪৬ পূত্র)।

বাহুল্য। নাদের উদগমে বর্ণসকল উহাতে মিলিয়া আত্মবিসর্জন করে। এইভাবে বিন্দু হইতে নাদ উদগত হইয়া পুনর্ব্বার বিন্দুতে যাইয়াই আত্ম-সমর্পণ করে। মন প্রভৃতি অস্ত্রকরণ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি, নাদের অনুগতভাবে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ধাবিত হয়, তাহাদের পৃথক সঞ্চারশক্তি থাকে না।

নাদের উর্দ্ধগতি যতই বাড়িতে থাকে ততই নাদ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে থাকে, এইরূপ উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ ইহা মনের ক্রমিক সূক্ষ্মতারই নিদর্শন। চরম অবস্থায় মনের স্থূলতা পরিহৃত হয় ও মন নিশ্চল হইয়া যায়, তখন নাদ আর শ্রুত হয় না, অর্থাৎ নাদ নিত্যসিদ্ধ হইলেও মনের পৃথক সত্তা থাকে না বলিয়া তাহার উপলব্ধি থাকে না। এই প্রকারে নাদ ও মনের অতীত অবস্থার উন্মেষ হয়, ইহাকেই চৈতন্য বা জ্ঞানের বিকাশ বলে। সাধক যে কোন উপায়ে সাধনা করিলেও এই সাধনফল অবশ্যস্বাভাবী। দেহসিদ্ধ করিতে হইলে এই চৈতন্যময়ী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই দেহরূপ জড়সত্তাকে চৈতন্যময় করিয়া লইতে হয়, তখন বস্তুতঃ পঞ্চভূত ও ভৌতিকসত্তা এবং তৎসহ চিন্তাসত্তা উভয়ই শুদ্ধ হইয়া চিন্ময়তা লাভ করে।

সিদ্ধদেহকে অর্থাৎ শুদ্ধদেহকে 'প্রণবতমু' অথবা 'মল্লদেহ' বলা হয়। ইহাই দিব্যদেহ, জ্যোতির্ময়, ইহাতে জরামৃত্যু, ক্ষুৎপিপাসা, কামক্ৰোধাদি জড়দেহ সংক্রান্ত ধর্ম্মের বাস্তব সত্তা নাই। বলা বাহুল্য, শুদ্ধদেহ লাভ না করিয়া সাধক চিংসমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারিলেও উহা আত্মবিনাশের নামান্তর, কারণ ঐ অবস্থায় চৈতন্যের সংরক্ষণ সম্ভবপর হয় না এবং বিরাট শূষ্ণুত্বে সাধক নিমগ্ন হইয়া যান। যোগীর পক্ষে এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ দেহকে আশ্রয় না করিতে পারিলে চৈতন্যশক্তি তিরোহিত হইয়া অব্যক্ত হইয়া যায়। প্রচলিত ভৌতিক দেহ চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল হইলেও চৈতন্যের আত্মবিকাশের ক্ষেত্র, ইহার মলিনতা ইহার একমাত্র দোষ। যোগিগণ বলেন, এই মলিনতা দূর করিয়া একটি অক্ষত দেহের স্থিতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে চৈতন্যের লোপ কখনই হইবে না, ইহাই মৃত্যুঞ্জয়। এই অক্ষত দেহই সিদ্ধদেহ। পাকরাত্রীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শুদ্ধদেহকে বিশুদ্ধ সর্ব্বময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব অপ্রাকৃত, অতএব এই দেহ যে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক দেহ নহে তাহা নিশ্চিত।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত দেহকেই কোন একটা দ্বারা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তখনই অশুদ্ধদেহের পরিবর্তে শুদ্ধদেহের প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এই শোধনের জন্য শুদ্ধ সত্তার বীজ আবশ্যক হয়। স্থূলদেহে যে সকল দোষ জড়িত থাকে, সাধনা দ্বারা তাহা দূর করাই নাথদের আদর্শ। ইহা দ্বারা রোগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি শারীরিক বৈকল্য দূর হয়। নাথযোগিগণ বলেন, যোগিগুরু ‘মহাজ্ঞান’ সঞ্চার করিয়া শুদ্ধসত্তার বীজ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক জপাদি ক্রিয়াসাধন দ্বারা ঐ গুরুদত্ত বীজকেই ক্রমশঃ বিকশিত করিতে থাকে। ইহাই শুদ্ধসত্তায় ক্রমবিকাশরূপ ক্রিয়া। ইহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অশুদ্ধসত্তা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ সত্তার অনুগমন করে, অথবা সার ও অসার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সারাংশ শুদ্ধ সত্তাতে প্রেরণ করে এবং অসার অংশ একটা বাহ্য আবরণের স্থায় কিকিৎকালের নিমিত্ত শুদ্ধ সত্তাকে আচ্ছাদন করিয়া বর্তমান থাকে।

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সিন্ধুদেহ এক প্রকারের ‘অযোনিজ’ দেহ, তাই উহা শুদ্ধ। স্থূলদেহের যাহা স্বাভাবিক মলিনতা, যাহাকে খৃষ্টানেরা ‘আদিপাতক’রূপে বর্ণনা করেন তাহা ইহাতে নাই। সেই নিমিত্ত জ্ঞানদান ও জ্ঞানগ্রহণের পক্ষে ইহাই প্রকৃত বাহন। প্রায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের আদি প্রতিষ্ঠাতাকে এই নিমিত্ত ‘ঈশ্বরসন্তান’ প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় বা কুমারীর গর্ভজাত বলা হয়, অর্থাৎ অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা করা হয়। নাথমার্গেও গোরক্ষকে ‘ঈশ্বর-সন্তান’ ও মৎস্যেশ্বরকে ‘মৎস্যজাত’ বলা হইয়াছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং আদিনাথ বা মহাদেব।

মানবদেহে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় চন্দ্র ও সূর্যের প্রতীক। উর্দ্ধগতির সময়ে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-প্রবাহ উর্দ্ধমুখ হওয়ার সময়ে এই চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের মিলন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে, চন্দ্রসূর্য বা চন্দ্রসূর্য্যঅগ্নিকে এক স্রোতে প্রবাহিত করিতে না পারিলে চৈতন্যের প্রবাহ উপলব্ধ হয় না।

ইড়াপিঙ্গলা বশীভূত হইলে, মন ও বায়ুর স্থিরতা স্বতঃই সম্পাদিত হয়, ইহার দ্বারা প্রজ্ঞার উন্মেষ বা কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। ঘটক্রান্তে দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং ভূতজয় দ্বারা শক্তিলাভ সম্ভব হয়। নাথমার্গের সাধনে মূলা বা নাভিস্থান হইতে মনস্‌এর উর্দ্ধগতি সম্পাদিত

হয়, কিন্তু সুষুয়াপথ উন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শিবশক্তির সামরস্ত্র সাধন হয় না। কেবল জ্ঞান দ্বারা এই পথ মুক্ত হওয়া কঠিন, তাই নাথসিদ্ধ দেহকে আশ্রয় করিয়া যোগ সাধন করিতে বলেন। যোগদ্বারা মানবের স্বাভাবিক অপক দেহকে পক করাই নাথযোগীর প্রধান লক্ষ্য। ইহাদ্বারা শীতোষ্ণতা ও জরামৃত্যু জয় হয় এবং মোক্ষলাভ হয়। এই যোগাগ্নি দ্বারা পক দেহই সিদ্ধদেহ, এই দেহলাভ হইলে পরে দিব্যদেহ লাভ সম্ভব হয়। যোগবীজে শঙ্কর বলিয়াছেন—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোহপি ধর্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

বিনা দেবোহপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে ॥^১

সিদ্ধদেহ লঘু, ইহা চিন্তার গতির স্থায় ক্ষিপ্ৰগতিসম্পন্ন, যে-কোন রূপ ধারণে সমর্থ এবং যথেষ্ট গমনে সমর্থ। ইষ্টক-প্রাচীর, জল, অগ্নি, বায়ু প্রস্তরাদি ভেদ করিয়া ইহার গমনে সামর্থ্য আছে। ইহা শূন্য মধ্যো অদৃশ্য হইতে পারে, আবার একই সময়ে বহুমুখিতে আবির্ভূত হইতে পারে। প্রসর ও সংকোচ সাধনে এই দেহ পটু, দেবমধ্যেও এই দেহ জল্লাভ, ইহা শুদ্ধ আকাশ হইতেও শুদ্ধতর। রসহৃদয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

এবং রসসংসিক্তো ত্বৎজরামরণবর্জিতো গুণবান্।

থে গমনে চ নিত্যং সংচরতে সকলভুবনেষু ॥

দাতা ভুবনত্রিতয়ে শ্রষ্টা সোহপীহ পদ্মযোনিরিব।

ভর্ত্তা বিষ্ণুরিব স্যাৎ সংহর্ত্তা রুদ্রবদগতিঃ ॥^২

যোগবীজেও উক্ত হইয়াছে পবনজয়ের আবশ্যকতা আছে, পবনজয় দ্বারা পিণ্ডশৈথ্র্য সম্পাদিত হয় ও চিত্তশুদ্ধি হয়, তৎফলে স্বাঙ্গজ্ঞান হয়।

যো জিত্বা পবনং মোহাদ্ যোগমিচ্ছতি যোগিনঃ।

সোহপক্কুস্তমারুহ সাগরং তর্জু মিচ্ছতি ॥৭৭॥

যস্ত প্রাণো বিলীন স্তং সাধকে জীবিতে সতি।

পিণ্ডো ন পতিত স্তস্য চিত্তং দোষৈঃ প্রমূচ্যতে ॥৭৮॥

শুদ্ধে চেতসি তশ্চৈব স্বাঙ্গজ্ঞানং প্রকাশতে।^৩

সকল যুগের রহস্যবাদীদের মধ্যে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শুদ্ধ দেহলাভের ঐঙ্গা লক্ষিত হয়। হঠযোগ, তন্ত্র, রসায়ন শাস্ত্রে শুদ্ধদেহের উল্লেখ বারম্বার দেখা যায়। যোগাগ্নি দ্বারা সপ্তধাতুময় দেহ দহ হইলে

যোগদেহ লাভ হয় (যোগবীজ, ৪৯ শ্লোক) । চিত্তরোধের সহিত বায়ু-নাশ না হইলে সকল সাধনা ব্যর্থ, নাশপ্রতীতি ন গুরুন মোক্ষঃ (যোগবীজ, ১২৯ শ্লোক) । যোগীর সাধনবলে তাঁহার দেহ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন সৈন্ধব জলতা প্রাপ্ত হয়, এই ব্রহ্মময়ত্বই মুক্তি, তাঁহার প্রাণের বহিরাগমন নাহি, অতএব তাঁহার মৃত্যু কোথায় ?

ন বহি প্রাণ আয়াতি পিণ্ডস্থ পতনং কৃতঃ ।

পিণ্ডপাতেন যা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ কথ্যতে পুনঃ ॥১৭৩।

দেহো ব্রহ্মত্বমায়াতি জলতাং সৈন্ধবং যথা ।

অনন্ততাং যদায়াতি তদা মুক্তঃ স উচ্যতে ॥১৭৪।

চিন্ময়ানি শরীরানি ইন্দ্রিয়ানি তথৈব চ ।^১

ইহার দ্বারা নাথযোগীর দেহ রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিয়া সূচিত হইতেছে । চন্দ্রসূর্য্যের একতা সম্পাদনে চিত্তলয় এবং চিত্তলয়ের সহিত বায়ুজয় প্রধান কর্তব্য ; নিরন্তর অভ্যাসফলে দেহ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া চিন্ময় শরীর ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়াদি লাভ হইবে । রসেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রক্রিয়া ভিন্ন, তাঁহারা বলেন 'দেহবেধ'রূপ ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ সম্ভব । যদি লোহবেধ অর্থাৎ লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব হয়, তবে দেহবেধ সম্ভব হইবে না কেন ? তাই 'রস' অর্থাৎ পারদ দ্বারা দেহসিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন । পারদসহ অন্নক ও গন্ধকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল । সিদ্ধদেহকে রসময়ী তনু বা হরগৌরীসৃষ্টিজ তনু বলা হইত, কারণ রস শিববীৰ্য্য, শুক্র ও স্বচ্ছ, ইহা হরসৃষ্টি ; অন্নক গৌরীসৃষ্টি, তাই হরগৌরীসৃষ্টিজ তনুর উৎপত্তি । পারদের ক্রিয়া জীবদেহে দেখা যায়, উহা দ্বারা স্বেচছা সম্পাদিত হয় । শিবই রসেশ্বর এবং শিবে-জীবে ভেদ নাহি । রসেশ্বর দর্শনকার বলেন, প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা মোক্ষ হয় না, রসসাধনে দৈহিক স্বেচছা সম্পাদন করিয়া তৎপরে যোগাভ্যাস দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব । পারদের দ্বারা বর্তমান দেহেই স্বেচছা সম্পাদিত হইয়া মুক্তিলাভ সম্ভব হয় ইহাই জীবমুক্তি । দেব, দৈত্য, মুনি, ঋষি, অনেকেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবমুক্ত হইয়াছেন ।^২

মহাদেবের যে প্রচ্যুত বীৰ্য্য ধরণীতলে পতিত হয় তাহাই

পারদরূপে পরিণত হয়, ইহা সংসারের পরপার-প্রাপ্তির হেতু বলিয়া 'পারদ', তাই যাবতীয় ধাতুর মধ্যে পারদই শ্রেষ্ঠ। পারদকে রস বলা হয় কেন? ভাবমিশ্র ভবপ্রকাশে বলিয়াছেন—

রসায়নার্থিভিলৈকৈঃ পারদো রস্তুতে যতঃ ।

ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরূপি স্মৃতঃ ॥^১

অর্থাৎ রসায়ন হিসাবে লোকের দ্বারা পারদ রসিত বা ভক্ষিত হয় বলিয়াই ইহা 'রস' নামে অভিহিত হয়, ইহাকে ধাতুও বলে, ইহাই রসের নিকৃতি। পারদের অশেষপ্রকার গুণ আছে। বর্ণভেদে পারদ চতুর্বিধ—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। পারদ ব্যবহারে খেগমন আদি সিদ্ধিলাভ হয়। যোগসূত্রেও (৪।১) ব্যাসভাষ্যে আছে, অশুরভবনে রসায়নাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইত, তদ্বিষয়ে অধুনা লোকের অভিজ্ঞতা নাই। রসায়ন দ্বারা দৈহিক পরিবর্তন অবশ্যই সাধিত হইত।

এই দৃশ্য জগৎ অনিত্য, স্থলদেহও অনিত্য, কিন্তু ষাটকৌশিক এই দেহ অনিত্য হইলেও, রসাত্তক পদবাচ্য হরগৌরী সৃষ্টিজাতের নিত্য হইয়া থাকে। রসহৃদয়তত্ত্বমতে যাহারা স্বশরীরে হরগৌরীর সৃষ্টিজ্ঞানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই রসসিদ্ধ এবং তজ্জগৎ সকল লোকের বন্দনীয়, সমুদায় মন্ত্র তাহাদের কিঙ্কর।^২ রসহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—

যে চাত্যক্তশরীরী হরগৌরীসৃষ্টিজা তনুং প্রাপ্তাঃ ।

বন্দ্যা স্তে রসসিদ্ধা মন্ত্রগণাঃ কিঙ্করা যেমাম্ ॥১।৭

এই শ্লোকে 'অত্যক্তশরীরী' অর্থে যাহাদের দ্বারা শরীর ত্যক্ত হয় নাই তাহাদের বুঝাইতেছে। তাহারাই জীবমুক্ত। শরীর দ্বিবিধ—স্থল ও সূক্ষ্ম; পঞ্চভূতাত্মক শরীর স্থল, এবং 'কোশত্রয়াত্মকং সূক্ষ্মম্' অর্থাৎ বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোশত্রয় দ্বারা মিলিত শরীর সূক্ষ্ম। রসসিদ্ধেরা অত্যক্তশরীর লইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করেন। রসেশ্বরদর্শনকার বলিয়াছেন, ষড়্‌দর্শনে পিণ্ডপাতানস্তর মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই মুক্তি হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইলেও উপলব্ধি হয় না। সেইজগৎ রস ও রসায়ন সাহায্যে পিণ্ডের রক্ষা কর্তব্য।

ডাঃ রমন শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ যুগ হইতে এ দেশে রস-সাধন বা পারদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ 'ভোগ' নামে

১। দর্শনপরিচয়, গোপাল সেন, পৃ ১২৬-২৭।

২। রসহৃদয়তত্ত্বম্ ১।৭, রসেশ্বরদর্শন—সর্বদর্শনসংগ্রহে ৬ শ্লোকের টিকা।

‘তাও’ সাধক চীনদেশ হইতে আসিয়া ভারতে ইহার প্রচলন করেন। খৃঃ পূঃ বহু শতাব্দী হইতে সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধন চলিতেছে, তন্মধ্যে মাহেশ্বর সিদ্ধ সম্প্রদায় প্রাচীনতম, তাহাদের অলৌকিক কাহিনীসকল অতীত দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ। (C. H. I., Vol. II)

প্রসঙ্গতঃ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পারদ এবং গন্ধক সাহায্যে দৈহিক পরিবর্তন ক্রিয়ার সাধন পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে রজিক্রুসিয়ান নষ্টিক (Gnostic), কোয়াইটিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায় ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন (এ যুগের থিয়োসফিষ্টরা অনেকটা এইরূপ) ; এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময় সাধন প্রচলিত ছিল। নষ্টিকেরা রহস্যবাদের সহিত মন্ত্রবিদ্যার যোগ করেন। রহস্যবাদে ‘অহং’ জ্ঞান উপলব্ধি পর্য্যন্ত সাধন আছে, মন্ত্রবিদ্যায় ‘আমি জ্ঞানিতে চাহি’র পর্য্যন্ত সাধন আছে। পরমসত্যকে উপলব্ধির দুইটি পথ আছে, মন্ত্রাদি দ্বারা বা মনের দ্বারা (Mysticism পৃঃ ৭০)। ইহুদীদের মোসেস রচিত গ্রন্থে একটা বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে, তাহাকে তত্ত্বোক্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা যায়।^১ নব্যযুগে নব্য উপায়ে আমেরিকায় এই সাধন চলিতেছে।^২ অতএব রহস্যবাদের সহিত অভ্যাসজনিত কার্যেরও সম্বন্ধ আছে, উহা কাল্পনিক কার্য মাত্র নহে (Mysticism পৃঃ ৮২)। আবার রহস্যবাদের সহিত সকল দেশেই সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে উইলিয়াম ল ও তাঁহার গুরু যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা এখন দুর্বোধ্য ; তাহাতে ‘লীনা’ অর্থে রোপা, ‘সল’ অর্থে স্বর্ণ, ‘স্পর্শমণি’ তৈয়ারির পরিভাষা হইল পরমাত্মার জ্ঞান ক্রিয়া, ইত্যাদি। Coventry Patmore তাঁহার রচিত Spousa Dei গ্রন্থ নষ্টিক করিয়া যান। Mrs. Atwood “A Suggestive Enquiry into the Hermetic Mystery” রচনা করিয়াও গোপন করিতে বাধ্য হন। লবণ, গন্ধক ও পারদ ব্যবহারে ইহারা শরীরের পরিবর্তন সাধন করিতেন, তন্মধ্যে পারদই প্রধান ছিল। কিন্তু এই পারদাদি আমাদের ব্যবহৃত সাধারণ দ্রব্য নহে, উহারা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত বিশেষ গুণযুক্ত দ্রব্য। আবার লবণ ও গন্ধক, দেহ ও আত্মার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত

১। Hermetic Sciences. How to Wake the Solar Plexus? See ‘Mysticism’, Underhill Ch. VI.

২। হঠযোগ, যোগী রামচন্দ্রক, শিকাগো, বিশেষতঃ অধ্যায়—Solar Plexus.

হইত ; অর্থাৎ গন্ধক হইতেছে প্রাকৃতিক স্বভাব, তাহাতে বুদ্ধিরূপ লবণ দ্বারা সিদ্ধন কর্তব্য ; পারদ হইতেছে 'আত্মা', কেবল বিজ্ঞেরা ইহাদের সন্ধান জানেন। চন্দ্র ও সূর্যের রশ্মি হইতে এই পারদ সংগৃহীত হয়, ইহাই স্বর্ণ ও রৌপ্য অর্থাৎ জীবাণু ও পরমাণুর সংযোজক। মানব-মধ্যে এই তিনটির অস্তিত্ব আছে। মন্দাগ্নিতে উহাদের দগ্ধ করিলে দৈহিক পরিবর্তন অনিবার্য। এই তিনটি মৌলিক সত্য যথাক্রমে কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণের। ইহাই রহস্যবাদীর তিনটি ক্রম : Purgation, Illumination এবং Union। মানবদেহ কৃষ্ণ, শ্বেতপারদের স্পর্শে ইহা নির্মল হয় এবং রক্তবর্ণ দ্বারা জীবাণু-পরমাণু (রৌপ্য ও স্বর্ণ) সংযোগ সাধিত হয়। স্পর্শমণির সন্ধানই হরিদ্বর্ণের সিংহের সন্ধান অর্থাৎ মানবের বল আছে তাই সে সিংহ, হরিত অর্থে অপক, অতএব মানব যে 'রূপ' ধারণ করিয়া আছে সেই 'রূপ'কে বধ করিয়া 'নবরূপ' ধারণ করাই উদ্দেশ্য।^১ ইহাই পাশ্চাত্যের রস দ্বারা কায়সিদ্ধি।

ইহা যোগবীজের পক ও অপক দেহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পকদেহই যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ, যোগী এই দেহলাভের কামনা করেন। রসেশ্বর সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ এখন লুপ্তপ্রায়, সাক্ষেতিক পরিভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় রসবিজ্ঞার গ্রন্থাদিও তুর্কোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই রসবিজ্ঞা বেদের ন্যায় অনাদি হইলেও অধুনা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

গোরক্ষ, দত্তাত্রেয়, নবনাথ, নাগার্জুন প্রভৃতি রসসিদ্ধ ছিলেন। নাগার্জুন বৌদ্ধ রাসায়নিক ও মহাসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সিদ্ধতান্ত্রিক যোগী রূপে খ্যাত। তাঁহার বহু উপযুক্ত শিষ্য ছিল ; সিদ্ধেরাও অনেকে তাঁহার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। হঠযোগী হইলেও নাথদের রসায়ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল, তাই রসায়নী মহাবিজ্ঞার উল্লেখ নাথমার্গের গ্রন্থে পাওয়া যায় (গো. সি. স. পৃঃ ৪৫)। তন্ত্রের প্রচারক সরহ।^২ কিন্তু একাধিক সরহ ছিলেন। নালন্দার প্রধান পুরোহিত সরহের শিষ্য নাগার্জুন, তিনি নালন্দায় রসায়ন শিক্ষা করেন।^৩

শঙ্করের প্রপরমগুরু শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎ পদাচার্য্য রসসিদ্ধ ছিলেন এবং কায়সিদ্ধি জানিতেন। তাঁহার রচিত রসহৃদয়তন্ত্রে তিনি উপদেশ

১। রহস্যগান, অণ্ডারহিল, দ্বাদশ সংস্করণ, ষষ্ঠ অধ্যায় পৃঃ ১৪০ ইত্যাদি পৃঃ ৭০৮২

২। সাধনমালা, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ xlv.

৩। History of Bengal, Vol. I, Dr. De's article, p. 419

দিয়াছেন যে, ধন, শরীর এবং ভোগ সকলই অনিত্য জানিয়া মুক্তির জন্য যত্ন করিবে। এই মুক্তি জ্ঞান দ্বারা লভ্য, জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা লভ্য, এবং দেহের স্থিরতা সম্পাদন হইলে এই অভ্যাস হইয়া থাকে (১।১০)।

দেবদৈত্য মুনি মানবাদি রসসামর্থ্য বলে দিব্যদেহ আশ্রয় করিয়া জীবমুক্ত হইয়াছেন, রসেশ্বরসিদ্ধান্তের দ্বারা এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়—

দেবাঃ কেচিন্মহেশাচ্ছা দৈত্যাঃ কাব্যপুরুষরাঃ ।

মুনয়ো বালখিল্যাচ্ছা নৃপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ ॥

গোবিন্দভগবৎ পাদাচার্যো গোবিন্দনায়কঃ ।

চৰ্ব্বটিঃ কপিলো ব্যালিঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ ॥

এতেহন্তো বহবঃ সিদ্ধা জীবমুক্তা শচরন্তি হি ।

তন্মুং রসময়ীমাপ্য তদাত্মককথাচণা ॥^১

শঙ্কর-সম্প্রদায় মতে গোড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই সিদ্ধযোগী ছিলেন। ইহারা ইচ্ছামত কাল অবধি দেহরক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। দেবীভাগবত মতে গোড়পাদ ব্যাসপুত্র শুকদেবের সন্তান। শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পিতৃ-অনুরোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু ছায়ারূপে আসেন; সেই ছায়ারূপী শুকদেবের সন্তান হইলেন গোড়পাদ। গোড়পাদের গুরু গোবিন্দপাদ এক সময়ে পতঞ্জলিরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন এবং যোগবলে শঙ্করের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।^২ যোগীরা সিদ্ধদেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন, এখানে এইরূপ অনুমানই সম্ভব। শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট খেগমন, পরকায়-প্রবেশ, নশ্বদার জলস্তম্ভন প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করেন। শঙ্করের পরকায়-প্রবেশ কাহিনী সুবিদিত। শঙ্কর অধিমাাত্রতর সাধক ছিলেন, অর্থাৎ মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। হঠযোগের অমৃত-সিদ্ধি নামক গ্রন্থে মন্দ, মধ্যম, অধিমাাত্র ও অধিমাাত্রতর অধিকারীর লক্ষণ আছে।^৩ রস ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রত্যেক জড়চেতন পদার্থে ইহা নানাধিক পরিমাণে বর্তমান আছে। বালাবস্থায় শরীরে এই রসের পরিমাণ অধিক থাকায় দেহ কাস্তিপূর্ণ দেখায়, বয়োবৃদ্ধির সহিত মলের আধিক্য ও রসের নানতায় মনুষ্য বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রস যেমন স্পর্শমণির

১। সর্বদর্শনসংগ্রহ—রসেশ্বরদর্শনম্, ৮-১০ শ্লোক।

২। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮৪৮ শকাল, ২য় সং পৃ ৬৩৮।

৩। ঐ পৃ ৮৮২।

ন্যায় লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করে, মানবদেহকেও সেইরূপ অজর অমর করে। মনুষ্য মধ্যে যে দৈবী শক্তি আছে তাহার বিকাশে ব্যাধি প্রতি-বন্ধক স্বরূপ। রসসিদ্ধ হইলে রোগাদি দূর হয়, ঋক্ষিসিদ্ধি করতলগত হয়, বিশ্বরচনা সম্বন্ধে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান হয় এবং মনুষ্য ঈশ্বরের ন্যায় হইতে পারে। সদগুরু এই জ্ঞানদানে সমর্থ। এই রস পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণ, ইহার সাধারণ পারদ বা গন্ধক নহে। এই পারদ একপ্রকার তীক্ষ্ণজল, সূর্য্য ইহার পিতা, চন্দ্র ইহার মাতা। পারদ ও গন্ধকের নামান্তর কন্যা ও সিংহ অথবা স্ত্রী ও পুরুষ। রসসিদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা ইহার এক রতি মাত্র সেবন করিলে শরীরের রূপান্তর-প্রাপ্তি অবশ্যস্বাভাবী। পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ দামোদর শাস্ত্রী ইহার প্রয়োগ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।^১

তিব্বতী লামাদের মধ্যে শবাহার দ্বারা দৈহিক পরিবর্তন ক্রিয়া অনুমোদিত। অবশ্য এই শব যে ব্যক্তির, তাহার দেহ আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। লামাদের মতে সাধনার দ্বারা এমন আধ্যাত্মিক পারদর্শিতা জন্মে যে জড়বস্তুর পরিবর্তে সূক্ষ্মবস্তুর সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু বাহির হইতে স্বল্প ব্যক্তি সে পরিবর্তন বুঝিতে সক্ষম। এই রূপান্তরিত দেহের মাংসখণ্ডটুকু আহার করিলে আহারকারীর অলৌকিক ক্ষমতা-প্রাপ্তি অনিবার্য। এই লামা সম্প্রদায় মধ্যে দেহস্থ ‘চক্র’র সাধনা আছে, শক্তিকে সহস্রারে নীত করা ইহাদের সাধনা (পৃ ২৫৭)। জনৈক লামার শবাহার কাহিনী একজন ইংরাজ মহিলা বর্ণনা করিয়াছেন।^২

রসেশ্বরদর্শন ‘রস’ দ্বারা যাহা সাধন করিতে উপদেশ দেন, হঠযোগ সম্প্রদায় বায়ুজয় দ্বারা তাহা সাধন করিতে বলেন। উভয়ের লক্ষ্য এক, পন্থা ভিন্ন। কর্মযোগ দ্বারা দেহধারণ বা স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, এই দৈহিক স্থৈর্য্য সম্পাদনের দ্বিবিধ উপায় আছে—রস ও পবন। রসেশ্বর-দর্শনকারও বলিয়াছেন—

কর্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিণ্ডধারণম্।

রসশ্চ পবনশ্চৈতি কর্মযোগো দ্বিধা স্মৃতঃ ॥^৩

১। রসসিদ্ধি, শ্রীনারায়ণ দামোদর শাস্ত্রী—কলাগ সাধনাক, ২য় খণ্ড, পৃ ৮৫১-৮৫৬।

২। With Mystics and Magicians in Tibet, David Neel, pp. 126, 257.

৩। সর্বদর্শনসংগ্রহ—রসেশ্বরদর্শনম্ ১১ [মোক]।

রস বা বায়ু সাধন দ্বারা দৈহিক স্বেচ্ছালাভ হয় বলা হইল, কিন্তু হঠযোগ ও রসেশ্বর প্রণালীদ্বয় দ্বারা দেহকে অজর, অমর বা শুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেও “একোহসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামরং কুরুতে” (রসেশ্বরদর্শনম্, ২৭ শ্লোক)। ইহা দ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ও চরম স্বেচ্ছালাভ হয় না, অতএব এই সাধনপ্রণালীদ্বয় একই সীমাদ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহাদের সাধনে মন ও বায়ুর আঁজাচক্রে স্থিতি হয় এবং সাধক জীবমুক্ত হন। উৎকৃষ্ট সহস্রারের দিব্যজ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়া এই স্বেচ্ছা বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজযোগ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত চরমস্থিতিলাভ হয় না। তাই রসেশ্বরদর্শনকার বলিয়াছেন—

“তস্মাদস্মদ্বক্তৃয়া রীত্যা দিব্যং দেহং সম্পাদ্য যোগাভ্যাসবশাৎ পরতত্ত্বে দৃষ্টে পুরুষার্থপ্রাপ্তির্ভবতি” অর্থাৎ এইজন্ত আমাদের কথিত রীতির অনুসরণপূর্ব্বক দিব্যদেহ সম্পাদন করিয়া, যোগাভ্যাসবশে পরতত্ত্বের দর্শন হইলেই পুরুষার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন—

ক্রয়ুগমধ্যাগতং যং শিখিবিদ্যাং সূর্য্যাবৎ জগদ্ভাসি।

কেযাক্ষিৎ পুণ্যাদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ ॥^১

অর্থাৎ যাহা ক্রয়ুগলের মধ্যাগত হইয়া, অগ্নি, বিদ্যা ও সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ আভাসিত করে, কোন কোন পুণ্যাদ্বাদিগের গোচরে সেই চিন্ময় জ্যোতি উন্মীলিত হইয়া থাকে।

রাজযোগ দ্বারা পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ হয়। সিদ্ধদেহ লাভ না হইলে ইহা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আমাদের পার্শ্বভৌতিক স্থূলদেহ মৃত্তিকার ন্যায়, ইহা প্রজ্ঞা ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মৃত্তিকাতে যেমন সূর্য্যাকিরণ প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ এ দেহে জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না। এমন কি তৎপূর্ব্বক যে অব্যাহত জ্ঞান সাধন কর্তব্য, তাহাও এই দেহে সম্ভব হয় না, কারণ ইহা জরাব্যাধিযুক্ত অপক দেহ। যদি বলা যায় সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বের ফুরণে মুক্তি হয়, অতএব সিদ্ধদেহ সাধনের প্রয়োজন নাই, তত্বতরে বলা যায়, এ দেহে চৈতন্যজ্যোতি ফুরণের কোন সম্ভাবনা নাই। রসহৃদয়তত্ত্বেও বর্ণিত হইয়াছে, যাহা সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের অভীষ্ট, যাহাতে বিকল্পের লেশ নাই, সেই চিদানন্দ ফুরিত হইলেও অফুরিত দেহবিশিষ্টে জন্তুগণের কি করিতে পারেন?

গলিতানল্পবিকল্পঃ সৰ্ব্বাশ্ববিবক্ষিতশ্চিদানন্দঃ ।

ক্ষুরিতোহপাক্ষুরিততনোঃ কৰোতি কিং জন্তবর্গস্থ ॥^১

দেখা যাইতেছে জ্ঞান ধারণের জন্য উপযুক্ত দেহধারণের চর্চা যোগীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় গাথার মধ্যেও বারম্বার ইহার উল্লেখ পাই, মাতা ময়নামতী পুত্র গোপীচন্দ্রকে বলিতেছেন, “গুরু ভজিলে বাছা অমর হয় কঙ্ক” (কঙ্ক অর্থে স্বচ্ছ বা দেহ)—আবার এই গ্রন্থের অন্যত্র পাই, “ভজিলে গুরুর চরণ অমর হয় কায়”, “ভজন সাধন নাম জপ হইবে অমর”।^২ গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে পাই, “কায়া সাধ আমি পুত্র বলি” (পৃ ১৩০), “কায়া সাধে মৌননাথে বসিয়া আসনে” (পৃ ১২৮), “আএ গুরু উলটিয়া যোগ ধর, কায়া তোক্ষার স্থির কর, নিজমন্ত্র করহ ধোরন” (পৃ ১১৫)। “জোগ সাধে মৌননাথে স্থির কৈল কায়া” (পৃ ১২৮), ইত্যাদি দ্বারা নাথমার্গে কায়সিদ্ধি বা দেহলাভ সম্বন্ধে প্রধানতঃ উপদেশ দেওয়া হইত দেখা যাইতেছে।

নাথমার্গে ‘মহাজ্ঞান’ লাভ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার কথা আছে। ইতিপূর্বেও আমরা গুরুপ্রদত্ত ‘মহাজ্ঞান’ দ্বারা শুদ্ধসত্তার বিকাশের কথা বলিয়াছি। মহাজ্ঞানই শুদ্ধসত্তার বীজস্বরূপ, তাহাই প্রাকৃতিক দেহ পরিবর্তনের সহায়। গুরু গোরক্ষনাথ সরলা বালা শিশুমতীর (ময়নামতীর) যাহাতে মৃত্যু না ঘটে সেই নিমিত্ত কৃপা করিয়া তাহাকে ‘মহাজ্ঞান’ দেন, ফলে স্বয়ং যমদূত তাহাকে ভয় করিত। ময়নামতীর বিবাহ হইলে মৃত্যুমুখী স্বামীকে ‘মহাজ্ঞান’ দ্বারা বাঁচাইতে ইচ্ছা করিলে স্বামী দ্বীর নিকট দীক্ষা লইতে অসম্মত হইয়া মৃত্যুবরণকে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। রাজার মৃত্যুতে ময়না ‘গোদা’ যমকে তাড়না করিলেন, তাহার চীৎকারফলে—

কৈলাস হইতে শিব গোরক্ষনাথ মঞ্চকে নামিল।

আস্তার মধ্যে ধরিয়া মএনাক বুঝাতে লাগিল। পৃঃ ৩৯

গোরক্ষনাথ ময়নাকে বুঝাইতে লাগিলেন, “বিধাতার কলম খণ্ডন না যায়”। তৎপরেই ময়নাকে উপদেশ দিতেছেন—

আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরণ।

শিষ্য নেগি ভজাইস সিদ্ধাহাড়ির চরণ ॥

ঐ সিদ্ধাক ভজাইলে তোমার ছেইলার না হবে মরণ ॥২০



অর্থাৎ 'মহাজ্ঞান' লাভ হইলে বিধাতার কলমও খণ্ডান যাইবে। বহু বাদামুবাদেব পর পুত্র মাতৃমাজ্জা শিরোধার্য্য করিয়া হাড়ির শিষ্য হইলেন, তৎপূর্বে তিনি স্বয়ং তাঁহার ছই রাণী অতুনা পতুনার সহ মাতাকে বহু প্রকারে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই। রাণীমাতা 'মহাজ্ঞান' জানিতেন, গুরুনাম স্মরণে তিনি সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন। নাথমার্গের এই 'মহাজ্ঞান' কি? ইহা সেই জ্ঞান যাহা দ্বারা কায়সিকি সম্ভব হয়, অর্থাৎ অজর-অমরত্ব লাভ হয়। ইহা সেই জ্ঞান যাহা দ্বারা কালকেও দমন করা যায়। এই জ্ঞান লাভ হইলে শুদ্ধ স্বরূপে স্থিতি হয়, ইহাই যোগের পূর্ণ পরিণত অবস্থা।

তিব্বতীয় বৌদ্ধলামাদের সাধনায় এই মহাজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার কথা আছে। মায়াঞ্জয়ী ব্যক্তি জীবন্মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া অপরের পথপ্রদর্শক হইতে সক্ষম, তাঁহার নিকট সংসার ও নির্ব্বাণ একই কথা। এইরূপ সাধকেরা সজ্জানে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় দেহত্যাগ করেন। বোধিসত্ত্বরা সজ্জানেই অশ্বদেহ ধারণ করিবার জন্ত উপযুক্ত গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহত্যাগ কালেও সজ্জানে দেহত্যাগ করেন। ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, ইচ্ছামুযায়ী সাধক সজ্জানে ভ্রমণ করিতে পারেন বা এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারেন,—কুণ্ডলিনী যোগের পারদর্শিতার উপর ইহা নির্ভর করে।^১

উপরোক্ত বিবরণে মায়াঞ্জয়ী ব্যক্তি মৃত্যুঞ্জয় করিতে সক্ষম বলা হইয়াছে; এই মায়াঞ্জয় অর্থাৎ মনোজয়। মহাযান মতে মায়া বা দৃশ্য জগতের কোন বাস্তব সত্তা নাই, মনের ক্রিয়া দ্বারাই তাহাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সার জেম্‌স জিন্সও বলিয়াছেন, বাহিরের যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ তাহা মনের মধ্যে জ্ঞান আছে বলিয়াই জানিতে পারি, জ্ঞান না থাকিলে বৃক্ষও থাকিবে না, অতএব মানসিক জ্ঞানই সর্ব পদার্থের মূল—অর্থাৎ 'অহং' গুটাইয়া লইলে দৃশ্যমান জগৎও অদৃশ্য হইবে। অতএব মনই প্রধান।^২

১। Tibetan Yoga & Secret Doctrines, Evans Wentz. The Seven Books in Tibetan, Bk. V, VI. Cf. Milarepa, p. 155; Mystics & Magicians in Tibet—'Art of Phowa'.

২। The New Background of Science, Sir James Jeans, Camb. 1933
পৃ ২৮০-২৮৪, ২৯৭-৮।

বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় মধ্যে ও বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় মধ্যে সহজ স্বরূপের উপলব্ধি আছে, কায়সিকি মুখ্য লক্ষ্য না হইলেও উহা সহজ উপলব্ধির উপায় স্বরূপ। বৌদ্ধ সহজিয়ার যাহা মহাসুখ, বৈষ্ণবের তাহাই মহাভাব, সহজ উপায়ে তাহার উপলব্ধি কর্তব্য। বৌদ্ধ সহজিয়া মধ্যে নাথযোগীদের অনুরূপ হঠযোগ সাধনও ছিল, উহা দ্বারা দেহসিকি লাভ হইত। কায়সাধন, ভাবসাধন, বায়ুসাধনের একই ফল - সিদ্ধিদেহ লাভ। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে ইহার সাধন প্রচলিত। তাই বলা হয় - রসেশ্বরের কায়সাধন, বৈষ্ণবের ভাবসাধন, হঠযোগীর বায়ুসাধন। রসেশ্বর সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য দৈহিক পরমাণু পরিবর্তিত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, জীবমুক্ত হওয়াই তাহাদের লক্ষ্য, বিদেহমুক্তি তাহাদের লক্ষ্য নহে। পারদই তাহাদের মুক্তির উপায় স্বরূপ। কাপালিক, কালামুখ, মহাব্রতীন, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে কায়সিকির বিভিন্ন উপায় ছিল। যমুনাচার্যের আগম-প্রামাণ্যে কাপালিক ও কালামুখ সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে।^১ ইহাদের মধ্যে ছয়মুদ্রাধারণ ও গুপ্তক্রিয়াদি ছিল। কপিকা, রুচক, কুণ্ডল, শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত এই ছয় মুদ্রা। কপালপাত্র ভোজন, শবভক্ষণ, সুরাকুস্তাদি স্থাপন প্রভৃতি বিধি দ্বারা ইহাদের সিদ্ধিলাভ হইত ও পিণ্ডসিকি হইত।

চর্যাপদে (নং ১০) কাঙ্ক্ষু বলিয়াছেন, “তুলো ডোখী হাউ কপালী” অর্থাৎ ‘ক’ অর্থে মহাসুখ, যে মহাসুখকে রক্ষা করে সে কপালী। “কং তব সুখং পালিতুং সমর্থঃ।” সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে কালামুখ, কাপালিক, মহাব্রতীন প্রভৃতির বিবরণ আছে। সোম সিদ্ধান্ত সম্প্রদায় শৈব ছিলেন, ইহাদের সহিত চন্দ্রজ্ঞানবিজ্ঞার যোগ ছিল কি না তাহা এখন অজ্ঞাত। লক্ষ্মীধর চন্দ্রজ্ঞানবিজ্ঞার সহিত কাপালিকদের যোগসূত্র স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে চন্দ্র ও তাহার ষোড়শ কলার প্রাধান্য আছে, ষোড়শ নিত্য পূজা ইহাতে আছে। অধ্যাপক তুচী সোমসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিলেও তাহাদের দর্শন অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।^২

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ৫৬২ তে উল্লেখ।

২। Soma or the Soma Sect of the Saivas. C. Chakravarti, I. H. Q.

বৌদ্ধ সহজিয়া যাহা 'মহাসুখ' দ্বারা লভ্য, রসেশ্বরের তাহা 'রস' দ্বারা লভ্য, আবার নাথযোগীর তাহাই সহস্রার করিত 'সোমরস' দ্বারা লভ্য। বৌদ্ধ সহজিয়া মহাসুখের দ্বারা আত্মানাত্মার উপলব্ধি করিয়া সহজাবস্থা লাভ করেন, বৌদ্ধ সহজিয়া দোহাতে 'স্কন্ধসিদ্ধি'র কথা আছে, "মূচ্ছিতে স্কন্ধবিজ্ঞানে কুতঃ সিদ্ধিরনিন্দিতা" (রতিবজ্র-চর্যাচর্যা পৃ ২)। অর্থাৎ নাড়ী সকল মূচ্ছিত হইলে স্কন্ধসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব? অতএব তাঁহারা যুগনন্দরূপে সহজানন্দফল অন্বেষণ করেন, ইহাই বজ্র ও পদ্মের মিলন (চর্যাচর্যা, পৃ ৩ টীকা)। এই ক্রিয়ায় বিন্দুরক্ষার কোন কথা নাই, কিন্তু নাথমার্গে বিন্দুরক্ষাই প্রথম সাধন। ইহা দ্বারাই নাথেরা কায়সিদ্ধি করিতেন। গোরক্ষ মৎশ্রেষ্ঠের প্রশ্নোত্তরে বিন্দুরক্ষার শুভফল এবং বিন্দুরক্ষের অশুভফলের ভূরিভূরি নিদর্শন আছে। মৎশ্রেষ্ঠের পতনকাহিনী দ্বারা বিন্দুরক্ষায় শরীরক্ষয় ও যোগ নষ্ট হয় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কথিত আছে, গোরক্ষ প্রথমে বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন, ঐ সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ তাঁহার অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি ঐ ধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল রমণবজ্র, মতান্তরে অনঙ্গবজ্র। বৌদ্ধ সহজিয়ারা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন নির্মাণচক্রে (নাভিস্থানে) সাধিত হইলে বোধিচিহ্নরূপ আনন্দ উৎপন্ন হইলে তাহাকে উষ্ণীষ কমলে নীত করিয়া 'মহাসুখ' অনুভব করেন (চর্যাপদ, ১০ টীকা, দ্রষ্টব্য)। মহাযান মতে এই উৎকর্ষগমনের দ্বারাই অবৈত উপলব্ধি হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে প্রজ্ঞা বা নৈরাশ্ব্য দেবীর সঙ্গ কর্তব্য। তাহা দ্বারাই প্রজ্ঞোপায়াত্মিকরূপ 'মহামুদ্রা' সিদ্ধি হয় (পৃ ২০ চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়)। বৈষ্ণবদের মধ্যেও রাধার যে মহাভাব তাহা এই প্রজ্ঞার সহিত তুলনীয়। নাথমার্গে প্রজ্ঞা, নৈরাশ্ব্য দেবী, মহাভাব প্রভৃতির কোন প্রকার উল্লেখ নাই। বরং খেচরীমুদ্রা সাধন দ্বারা বীর্ঘ্যরক্ষা করিয়া দেহকে সুন্দর করিবার কথা আছে। বৈদিক যুগেও সোমরস পান বিধি ছিল, সোমলতার ষোড়শপত্র চন্দ্রের ষোড়শ কলার সহিত তুলনীয়, চন্দ্র ওষধিপতি, তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধিতে সোমলতার গুণের হ্রাসবৃদ্ধি কল্পিত হইত। গীতাতে আছে—

“পুষ্যামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূহা রসাত্মকঃ”।^১

অর্থাৎ “আমি শ্রীকৃষ্ণ রসাত্মক চন্দ্ররূপে ওষধিসকলকে পুষ্ট করি।”

রসেশ্বরদর্শনে বায়ুনিরোধের কথা আছে, নাথযোগেও বায়ুনিরোধের ও খেচরীমুদ্রা সাধনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নাথগণ 'অমর বারুণী' পান দ্বারা অমৃতকরণ নিবৃত্তি করিতে উপদেশ দেন, ইহা দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয়, "নান্থা কায়সিদ্ধিঃ"। গুরু গোরক্ষনাথ বর্ণিয়াছেন, প্রাণিগণের নাভিদেশে অগ্নিময় সূর্য্য আছে, তালুতে অমৃতাত্মা চন্দ্র আছেন, চন্দ্র অধোমুখী হইয়া অমৃতবর্ষণ করেন, সূর্য্য উর্দ্ধমুখে তাহা গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা অমৃতরক্ষা কর্তব্য। গুরু-উপদেশে উর্দ্ধে সূর্য্য ও নিম্নে চন্দ্র রাখিবার অভ্যাস করিলে কালমৃত্যু জয় করা যাইবে।^১ জিহ্বাকে তালুর উর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া চন্দ্রগলিত অমৃতস্রাব (ইহাই অমর বারুণী) পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায়, শরীরে জড়তা উৎপাদন হয় না, অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধিলাভ হয় ও যোগদেহ প্রাপ্তি হয়।^২

সাধারণতঃ চন্দ্রকে সহস্রারে ও সূর্য্যকে মূলাধারে স্থাপিত করা হয় —

অক্ষরন্ধ্রে হি যং পদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং ।

তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্তাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ ॥

মূলাধারে হি যং পদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতং ।

তত্র মধ্যে হি যা যোনিস্তস্তাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ ॥^৩

চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত সূর্য্য দ্বারা নষ্ট হয়। গোরক্ষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

নাভিমূলে বসেং সূর্য্য স্তালুগূলে চ চন্দ্রমা ।

অমৃতং গ্রসতে সূর্য্যাস্ততো মৃত্যাবশো নরঃ ॥১৮৫

এই অমৃত নাশ হয় বলিয়াই মানব মৃত্যুর বশ হয়। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

ভক্ষিমা গরল চন্দ্র কায়া কর তাজা । পৃ ১৫২

তিনচন্দ্র সম্বরিয়া— আপনা দিয়া

গরল যে চন্দ্র কর পান ।

তিনচন্দ্র সম্বরিয়া— গরলচন্দ্র ভক্ষিয়া

তবেহ সকল রক্ষা পাই ॥

আএ গুরু উলটিয়া জোগ ধর কায়া তোক্ষার স্থির কর

নিজমন্ত্র করহ ধোরন—

গোর্থবাক্যে পিণ্ড রৈক্ষা কর । (পৃঃ ১১৫)

তালুস্থ চন্দ্র অধোমুখ হইয়া অমৃত বর্ষণ করেন, নাভিস্থ সূর্য্য উর্দ্ধমুখে অমৃত বর্ষণ করেন, উভয়ের অমৃত একত্রিত করণে একমাত্র গুরু-উপদেশই সহায়। উর্দ্ধে নাভি ও অধে তালু আছে, এইরূপ বিপরীত ভাবনা শতকোটি শাস্ত্রপাঠেও লভ্য নহে, একমাত্র গুরুবাক্য দ্বারাই লভ্য।

বর্ষত্যাধোমুখশ্চন্দ্রো বর্ষতুর্দ্ধমুখো রবিঃ ।

কর্তব্যং কারণমুত্র যেন পীযুষমাপ্যতে ॥

তত্রাস্তি কারণং দিব্যং সূর্য্যস্ত পরিবন্ধনং ।

গুরুপদেশতো জ্ঞেয়ং ন তু শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ ॥

উর্দ্ধং নাভিরধস্তালুর্দ্ধং ভানুরধঃ শশী ।

কেবলং বিপরীতাত্ম্যং গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥^১

বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা বা উন্টাসাধন দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের অমৃতকে একত্রিত বা উন্টাপথে চালিত করা যায়। এই মুদ্রাসাধনে বিশ্বের আশঙ্কা থাকায় গুরু অতি গুপ্ত ভাবে ইহার শিক্ষা দেন (গোরক্ষসংহিতা : ১৮৭) গোরক্ষনাথও গুরুকে বলিতেছেন, “উলটিয়া ধর গুরু সুমেরুর কলা” (পৃ: ১৪২ গোরক্ষবিজয়), “উলটিয়া হউক পুষ্প” (ঐ পৃ: ১৪৮), “উলটিয়া জোগ ধর, কায়্য তোন্ধার স্থির কর” (পৃ: ১১৫)। এই অমৃতপানের উপায় বর্ণন, যথা—

মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল ।

অমর পাটনে জেন যেত করে হাল ॥

উচ্চনীচ ভূমিখানি তাতে কৃষি হয় ।

জদি হয় গৃহবাসী সে ভূমি চসয় ॥ (গোরক্ষবিজয় পৃ: ১৫৮) ।

ইহা খেচরী মুদ্রা সাধনের ইঙ্গিত। খেচরী সাধনই তন্ত্রের ‘মাংস’ ভক্ষণ। ইহা দ্বারা অমরবারুণী বা তন্ত্রের ‘মদ্র’ পান সম্ভব হয় এবং এই মুদ্রার সাধক ‘কাল’ দ্বারা বাধিত হন না, “বাধ্যতে ন স কালেন যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্”।^২

চন্দ্রস্থ অমৃত বক্রনাল বা শঙ্খিনী নাড়ী দ্বারা সহস্রার হইতে তালুমূলে ক্ষরিত হয়, এই অমৃতই মানবদেহস্থ বিন্দু, ইহাই ‘মহারস’। দশমীদ্বার হইতে এই মহারস পতিত হয় (অর্থাৎ সহস্রার হইতে ইহা ক্ষরিত হয়), তাই “দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে” (পৃ: ১৪৪ গোরক্ষ-বিজয়) বলা হইয়াছে। শঙ্খিনী নাড়ীকে সুরসা সর্পিণী (পৃ: ১৪৩)

বলা হইয়াছে এবং গুরুকে গোরক্ষ বলিতেছেন, “ফিরাও খেলাও গুরু হইমুখ সাপ” ।

চাপিলে গজ্জিয়া উঠে বিরহ নাগিনী

সাপিনী না হয়ে গুরু সুরসা সংখিনী ॥ (পৃ: ১৪১)

আবার “সকল্যা সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল” (পৃ: ১৪৪) আছে ।

অমৃতকে রক্ষা করিবার জন্যই যে উন্টা সাধন তাহার দ্বারাই

মেরুমূলে রহিব চন্দ্র না টুটিব কলা (পৃ: ১৪৭)

বলা হয় । এইরূপে যোগী অজর অমর হন ।^১

সন্তকবিরাম উন্টা সাধনের কথা বলেন । ভীখা বলিয়াছেন—

নয়নে সে দেখে উলটি ঠাকুর দরবারা ।

চর্যাপদেও এই অজর-অমরত্বের কথা আছে—

সতজে থির করী বাকুনী সাক্ষে ।

জে অজরামর হোই দিড় কাক্ষে ॥

দশমি ছুআরত চিহ্ন দেখাইআ ।

আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥^২

অর্থাৎ বাকুনীকে (বোধিচিহ্নকে) স্থির করিয়াই অজরামর হওয়া যায় ।

দশমী ছুয়ারে মহাসুখ প্রমোদচিহ্ন দেখিয়া, যোগী সেই পথেই প্রবেশ

করিয়া মহাসুখ কমলের রসপান করিয়া থাকেন । সরহও বলিয়াছেন—

জহি মনপবণ ন সঙ্করই, রবি শশী নাই পবেশ

তহি বট চিহ্ন বিসাম করু সরহে কহিঅ উবেশ ॥

(দোহাকোষ পৃ: ৯৩)

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে ‘নবচক্র’ বর্ণনা প্রসঙ্গে “ষষ্ঠং তালুচক্রং তত্রা
অমৃতধারা প্রবাহঃ ঘটিকালিঙ্গমূল রক্ত রাজদন্তঃ শঙ্খিনীবিবরঃ দশমদ্বারঃ”
ইত্যাকার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ।^৩

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহেও “তালুচক্রং ষষ্ঠমত্র সুধাধারা প্রবাহভূঃ” বলা
হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম চক্র সম্বন্ধে সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি হইতে
মতভেদ দৃষ্ট হয় ।^৪ তালুমূলে দশমীদ্বারে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া
দিলে যে সুধাধারা পান করা যায়, তাহাই অমরত্ব প্রদান করে,
যথা—

১। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থ হইতে ।

২। সি, সি, প, ২১০

৩। চর্যাপদ ৩নং

৪। সি, সি, প, ২১১ সঙ্কেত; তুলনীয় সি, সি, প ২১৭, ৮

সুধাকলাপরিশ্রাবস্তদা স্তাদমরহদঃ ॥

জিহ্বাং চালনদোহাভাং দীর্ঘীকৃত্য নিবেশয়েৎ ।

দশমাধার তাবন্তঃ কাষ্ঠা ভবতি সা পরা ॥^১

অমরৌষশাসনেও বিবৃত হইয়াছে যে সহস্রার-করিত অমৃতধারা খেচরী মুদ্রা দ্বারা ইড়া দ্বারা বাহিত হইয়া মূলাধারে বিষজলে মিশ্রিত হইয়া তাহার বিষহের উপশম সাধন করিয়া (ইহাই 'রবিকালরূপ সদনে রক্ষা) সকল কেন্দ্র অতিক্রম করায় । খেচরী সাধন দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা বিনাশ পায়, দেহস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, মৃত্যুজ্বরারোগহীনতা প্রাপ্তি হয় । ইহাতে (পৃ: ১১) “একং মুখরক্রং রাজদন্তান্তরে, এতদ্ এব শঙ্খিনীমুখং দশমদ্বারং ইত্যাচাতে” দ্বারা দশমীদ্বার নির্ণীত হইয়াছে । মস্তক মধ্যে রাজদন্তময় গর্ভে অমৃত সঞ্চিত থাকে, শঙ্খিনী উহাকে দমন করিয়া ব্রহ্মদণ্ডমূলে সেচন করে ।^২

বঙ্গীয় গীতিকাতেও দশমীদ্বারের কথা আছে—

দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল ।

উজ্জাউক মহারস ভরোক খাল জোর ॥ (পৃ: ১৪৫)

অন্যত্র “ভেদিয়া দশমী দ্বার খোলো জোর ভর” (পৃ ১৩৯) ।^৩

আবার গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন, “দশমীদ্বার মুক্ত রাখিয়া সর্বনাশ করিলেন, চারে সর্বধন অপহরণ করিল, গৃহ শূন্য হইল” (পৃ ১০৮ গোরক্ষ-বিজয়) । অতএব কায়সিদ্ধি চাহিলে দশমীদ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, ইহার দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—

✓ ইড়াপিঙ্গলা শ্বসমনা সন্ধী ।

মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥

দশমী দ্বার দিলো কপাট ।

এবে চড়িলো মো সে যোগবাট ॥

✓ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দশমী দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগারূঢ় হইলেন ।^৪

গোরক্ষকাব্যে জ্ঞীকে ‘বাঘিনী’ বলা হইয়াছে, মূর্খলোকে পশুর ন্যায় সেই বাঘিনীকে পোষণ করিয়া আহার দিতেছে ।^৫ নারীসঙ্গকে ব্যাঘ্রের

১। সি. সি. স. ২২৩, ২৪ ।

২। অমরৌষশাসন ২য় স্কন্ধ—ঘটাকোট কপোল কোটর কুটী জিহ্বাগ্র মধ্যাশ্রয়াজ্জিহ্বা ইত্যাদি ।

৩। গোরক্ষবিজয় হইতে ।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পৃ ৩৪২ ।

৫। মোহনসিং, গোরক্ষনাথ পরিশিষ্ট ।

সম্মুখে গরু, বিড়ালের সম্মুখে হুঙ্কার, ইন্দুরের সম্মুখে মৎস্য, ডাকাতের সম্মুখে ধন, সাপের মুখে ব্যাঙ, ইত্যাদি উপমা দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে (গোরক্ষ-বিজয় পৃ ১২১।১২২)। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও “ঘরে বাঘিণী পোষে”, ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায়। গোরক্ষ গুরুকে বিন্দুরক্ষার্থে বলিতেছেন, “গুরুজী এসে কাম ন কীজৈ। তাঁথে অমীরস ছীজৈ”।^১

যোগী দেহমধ্যেই স্ত্রীপুরুষের মিলনসুখ অনুভব করিয়া শিবহলাভ করেন, ইহাকে যোগের পরিভাষায় চন্দ্রসূর্য্যের মিলনাত্তি বলা হইয়াছে। দেহস্থ শ্বেতবিন্দু চন্দ্রে ও লোহিতবিন্দু সূর্য্যে স্থিত, ইহাদের মিলনে যোগী পরমপদ প্রাপ্ত হন।^২ চর্যাপদের প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনও ইহাই। তন্ত্রের কুণ্ডলিনীশক্তিকে চর্যাপদে ‘চণ্ডালী’ বলা হইয়াছে, ইহার জাগরণে মহাসুখের উদয় হয়, অর্থাৎ জীবের শিবহলাভ হয়। মহাসুখ রাগাগ্নি দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়সকল বিলীন হয়। গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলা, চন্দ্র ও সূর্য্যের নামান্তর চর্যাপদে পাই (নং ১৪)—

গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাই।

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লোলে পার করেই ॥

গোরক্ষবিজয়ে—ইঙ্গলা পিঙ্গলা ছই সুমেরুর জোরা।

মৈদ্বখানি আনিআ জে বন্দি কর চোরা ॥ (পৃ ১৪০)

এই মিলন দ্বারা যোগী চিরজীবী হন। শুবুয়া নাড়ীর নাম অগ্নি; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির মিলন অর্থে ইড়াপিঙ্গলার মিলন সাধন করিয়া মধ্যনাড়ী শুবুয়া পথে বায়ুকে চালনা করা। ইহা দ্বারা আয়ুক্ষয় নিবারিত হয়। নাথমার্গে হাড়িসিদ্ধার অলৌকিক কাহিনী মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া রাখার কথা আছে, অর্থাৎ তিনি চন্দ্রসূর্য্যকে বশীভূত করিয়াছিলেন।^৩

কৃষ্ণাচার্য্যের পদেও আছে—“রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে”— (চর্য্যা ১১)। সরহ বলিয়াছেন, যেখানে নাদবিন্দু বা চন্দ্রসূর্য্য নাই, সেইস্থানে চিত্তরাজ স্বভাবতঃই মুক্ত (চর্য্যা ৩২)। চন্দ্র ও সূর্য্য বাম ও দক্ষিণে স্থাপিত, তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়া মধ্যপথে যাইলে ‘মহাসুখ’

১। নাথসম্মুখে যোগ, বড়পুল কল্যাণ যোগাল পৃ: ৭২।

২। গোরক্ষশতক, স্লোক ৭২, গো: সং ১৮০।

৩। গোপীচন্দ্রের সম্মান ১ম খণ্ড, পৃ ৩১, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ৪৪১।

প্রাপ্তি হইবে (চর্যা ৪, ৮)। এই বাম ও দক্ষিণ বা আলি ও কালি মধ্যপথ রুদ্ধ করিয়া রাখে (চর্যা ৭)। এই আলিকালি দ্বারাই বীণার শব্দ হয় (চর্যা ১৭)। তাই লুইপাদ বলিয়াছেন, আমি ধমণচমণকে (আলিকালির নামান্তর) বশীভূত করিয়া ধ্যানে (ঝানে) দেখিয়াছি (চর্যা ১)। বীণাপাদও বলিয়াছেন—

সুজ লাউ সসি লাগেনি তাস্তী।

অণাহ দস্তী বাকি কি অত অবধূতী (চর্যা ১৭)।

অর্থাৎ তাহার বীণার লাউ ‘সূর্য্য’, তাহার তার ‘চন্দ্র’, এবং তাহার দণ্ড ‘অনাহত নাদ’।

হেবজ্জতন্ত্রে ও হেরুকাতন্ত্রে ললনা, রসনা ও অবধূতী নাড়ীর কথা আছে; ললনা শুক্রবাহী নাড়ী, রসনা রক্তবাহী নাড়ী, অবধূতীতে প্রজ্ঞা ও উপায় বা গ্রাহ-গ্রাহকে ভেদ নাই। ইহারাই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়ীত্রয়। সারদাতিলকে (১৩৯) উক্ত হইয়াছে, মানবদেহে অগ্নি ও সোম থাকায় বিন্দুরও দ্বিবিধ রূপ আছে, দক্ষিণ অংশে সূর্য্য, বাম অংশ চন্দ্র। বামে ইড়ানাড়ী ও দক্ষিণে পিঙ্গলানাড়ী আছে। ‘শুক্ৰম্ অগ্নিরূপম্ রক্তম্ সোমরূপম্’। ইহাই বিন্দুর দ্বিবিধরূপ। কামকলাবিলাসে আছে, “সিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্তশিবশক্তি সঞ্চুচং প্রসরম্”—অর্থাৎ বিন্দুর শ্বেত ও রক্তাংশ শিব ও শক্তির পরিচায়ক।

চন্দ্র ও সূর্য্য রাত্রি ও দিবার পরিচায়ক, দিবারাত্রি কালের পরিচায়ক; অতএব চন্দ্রসূর্য্যকে বশীভূত করা অর্থে কালজয়ী হওয়া। চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা প্রাণ বা অপান ও শ্বাসপ্রশ্বাসও সূচিত হয়, যোগী ইহাদের নিয়মন ও কুস্তক করিয়া যোগারূঢ় হন, তখন কালের জ্ঞান লুপ্ত হয়।

আলিকালিকে স্বর ও ব্যঞ্জনরূপেও ব্যাখ্যা করা হয়। ফোটবাদীরা শব্দকেই সৃষ্টির উৎপত্তির কারণ বলেন (বিন্দু ও নাদই কালি ও আলিনামে খ্যাত, ইহারাই চিৎ ও অচিৎ)। কাশ্মীর শৈবানুশাসনবাদে বিন্দু ও নাদ ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিরূপে ব্যাখ্যাত (বৌদ্ধদের নির্মাণকায় ইচ্ছাস্বরূপ, সন্তোষকায় ক্রিয়াস্বরূপ)। ইহারাই পুরুষপ্রকৃতি, শিবশক্তি, রজস্বতমস্, বিজ্ঞা-অবিজ্ঞা, রেতস্বরজস্ ইত্যাদি। মানব ইহাদের দ্বারাই সংসারে বদ্ধ হয়, কিন্তু যোগী ইহাদের জয় করিয়া পূর্ণ সমাধি লাভ করেন। যজ্ঞের অগ্নিতে সোম আহুতি দেওয়া হয়, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে

সোম ও অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া যোগীরা তাহাদের মিলন সাধন বা সামরস সাধন করেন। এইরূপে দেহমধ্যেই চন্দ্র ও সূর্যের মিলন সাধন করিয়া, যোগী দৈহিক পরিবর্তন সাধিত করেন। চন্দ্রের অমৃত বা সোমরস রক্ষা করা নাথযোগীর আদর্শ, ইহার দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয় অথবা দিবা বা সিদ্ধ দেহ লাভ হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার বৈষ্ণবদের মধ্যেও সিদ্ধ দেহ হইয়া জীবমুক্তির আদর্শের প্রভাব পড়ে। বৈষ্ণব বৌদ্ধ শূন্যবাদী অচ্যুতানন্দ পরমাত্মাকে ‘মহাশূন্য’ আখ্যা দিয়াছেন^১ এবং উল্টাসাধনের কথা, দেহকে অপরিবর্তনীয় করা ও চন্দ্রসূর্যকে বশীভূত করার কথা বলিয়াছেন।^২ বলরাম দাসের ‘প্রণবগীতায়’ “ওঁকার মধ্যে ষড়্‌চক্রস্থান, তথি ভিতরে চৌদ্দভুবন” বৃত্তান্ত আছে। ‘অমর-পটল’ নামক পুথিতে গোরক্ষ-মল্লিনাথের প্রশ্নোত্তর আছে। বৌদ্ধ বৈষ্ণবেরা তাহাদের পুঁথিতে মীননাথ-গোরক্ষনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। নাথমার্গের সহিত সাধনাতে ঐক্যও লক্ষিত হইতেছে, অতএব ‘কায়সাধন’ উড়িষ্যায় অবিদিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

শ্রুতিতেও যে সকল বর্ণনা আছে—আমাদের অনুমানে তাহাও ‘কায়সিদ্ধি’র প্রতি ইঙ্গিত। পাতঞ্জল যোগ ঋঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর, উপনিষদ তাহাপেক্ষা বহু প্রাচীন, অতএব ‘কায়সিদ্ধি’ ভারতে অপ্ৰাচীন নহে। যথা, ধ্যানবিন্দু উপনিষদে—

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি বিন্দুরিন্দু রজো রবিঃ ।

উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং বপুঃ ॥^৩

এই শিবশক্তির মিলন বা চন্দ্রসূর্যের মিলন দ্বারা পরম সুন্দর বপু হয়, ইহাই শ্রুতি-অনুমোদিত ‘কায়সিদ্ধি’।

যোগকুণ্ডল্যুপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

অথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি বিজ্ঞাং খেচরীসংজ্ঞিকাম্ ।

যথা বিজ্ঞানবানস্তা লোকেহস্মিন্নজরোহমরঃ ॥^৪

অর্থাৎ খেচরী-সাধন জানিলে অজর-অমরত্ব লাভ হয়—ইহার দ্বারা ইহাই

১। Modern Buddhism in Orissa—N. N. Vasu, p 46. See ref. অচ্যুতানন্দবাস, শূন্যসংহিতা, ২২ অধ্যায়।

২। ঐ ব্রহ্মসংকলী—পৃ ২৬, প্রাচীন গ্রন্থমালা সিরিজ নং ৩।

৩। ধ্যানবিন্দু উপনিষদ, শ্লোক ৮৮, ৮৯।

৪। যোগকুণ্ডল্যুপনিষদ ২।১।

সূচিত হইতেছে। এই মুদ্রা সাধনসাপেক্ষ, বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনে যোগী কৃতকার্য হন। এই বিজ্ঞা “যোগী লভতে গুরুবক্তৃতঃ”, তৎসহ শাস্ত্রপাঠ প্রয়োজন। কারণ শাস্ত্র বিনা গুরুও বিজ্ঞাদানে অক্ষম। খেচরী-বিজ্ঞা লাভ করিতে হইলে খেচরীযোগসহ খেচরীমুদ্রা ও খেচরীবীজ জানিতে হইবে। খেচরীমন্ত্র সপ্তবর্ণে বিভক্ত—হ্রীং, ভম্, সম্, পম্, ফম্, সম্ ও ক্ষম্—ইহা দ্বারা খেচরীমন্ত্র সিদ্ধ হয় (২।১৭-২০ এবং ৩।১)।

খেচরী অভ্যাসের পূর্বে রসনাচ্ছেদন কর্তব্য (২।২৮, ২৯)। করণাস সহ খেচরীবীজ উচ্চারণে ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ হয়। তিনবৎসর অভ্যাস-ফলে ব্রহ্মরক্ত উন্মুক্ত হয়। দ্বাদশ বৎসরান্তে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য। অতঃপর যোগী স্বীয়দেহে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে সক্ষম হন, “শরীরে সকলং বিশ্বং পশ্যত্যাত্মা বিভেদতঃ” (২।৪৯)। তৎপরে রাজদহউর্দ্ধে কুণ্ডলী (সহস্রারে) নীত হয়, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের মহামার্গের অনুরূপ। অতএব খেচরী দ্বারাই ‘সিদ্ধিলাভ’ হয়।

দেখা যাইতেছে যে, নাথমার্গে ও অন্যান্য সিদ্ধমার্গে খেচরী সাধনের আবশ্যকতার উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যায়। কায়সিকের নিমিত্ত ইহা অত্যাৱশ্যকীয় মুদ্রা। অতএব খেচরী সাধনের মন্ত্র উপরে বর্ণিত হইল।

বৃহজ্জ্বালোপনিষদে (২।১৩, ১৬) মৃত্যুজয়ের কথা আছে যিনি শিবশক্তির অমৃতস্পর্শ লাভ করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু কোথায়? শিবাগ্নি দ্বারা তাঁহার তনু দহ হইয়াছে, তিনি অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। ইহা শিবশক্তির সামরশ্র সাধন দ্বারা কায়সিকের ইঙ্গিত।

তিব্বতেও ব্রহ্মরক্ত উন্মুক্ত করিবার সাধন দৃষ্ট হয়, মৃত লামা যাহাতে এই পথে দেহ হইতে নির্গত হইতে পারেন, তজ্জন্ম বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। বৌদ্ধ লামাদের বিশ্বাস, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্যদ্বারা যে শক্তিসঞ্চয় হয় তাহা দ্বারাই বর্তমান দেহত্যাগের পর ‘নবদেহ’ সৃষ্ট হয়। নবদেহ লাভের পূর্বে ‘বারডো’ নামক স্থানে কিয়ৎকাল বাস ঘটে (এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে)। যাহা হউক প্রণালী জানা থাকিলে নরকেও নাকি সুখে বাস করা যায়! মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা লামাদের জানা থাকায় তাঁহারা মৃত্যুকে ভয় করেন না। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা তাঁহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন অংশে লয়প্রাপ্তি। মৃত্যুর পর কেবল ‘আমিত্ত’ জ্ঞানটুকু থাকে বা বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে এবং বর্তমান দেহ ত্যাগকালে

ঈশ্বর নবদেহের রূপ বা জন্মস্থানও স্থির করা যায়। মৃতপ্রায় লামার আত্মা যাহাতে ব্রহ্মব্রহ্ম হইতে নির্গত হয়, তৎপ্রতি অল্প লামারা দৃষ্টি রাখেন, 'হিক্' ও 'ফট্' উচ্চারণে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হয়। হয় মৃত্যুমুখী লামা স্বশক্তিবলে ব্রহ্মব্রহ্ম হইতে আত্মার নির্গমন সাধিত করেন, নতুবা পার্শ্ববর্তী লামা তাঁহাকে এ কার্যে ঐরূপ উচ্চারণ দ্বারা সাহায্য করেন। মৃত্যুর পরও ethereal double থাকে, তিব্বতী ও মিশরীদের ইহা বিশ্বাস। জীবিতকালেও এ দেহ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করে বা অন্ত্র দেখা দেয়, তথাপি স্থূলদেহ-সংলগ্ন হইয়াই থাকে। এইরূপ দেহ সাহায্যে যিনি ভূমণ্ডল বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন, তিব্বতে তাঁহাকে delog অর্থাৎ 'পরপার-প্রত্যাগত' বলে। উপরোক্ত 'বারডো' নামক স্থানের সম্বন্ধে জীবিতকালেই শিক্ষালাভ কর্তব্য, কারণ ঐ স্থানের যমরাজ প্রভৃতি যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ তাহাদের জীবিতকালে ঈশ্বর বিশ্বাসের ফলানুযায়ী দর্শন ঘটে, শিক্ষিত লামাদের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।^১ দেখা যাইতেছে, তিব্বতী লামাদের মধ্যেও দেহত্যাগ মৃত্যু বলিয়া বিবেচিত হয় না, এবং 'জন্ম' ও 'মৃত্যু' সম্বন্ধে বিশেষ প্রকার শিক্ষাদান প্রচলিত আছে। ইহাকেও কায়সিক্তির প্রকারভেদ বলা চলে।

তিব্বতীয় বিবরণে ethereal double এর কথা বলা হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন যুগের বিবরণেও ইহার অভাব নাই। সৌরভী মুনি পঞ্চাশটি দেহ ধারণ করিয়া মাক্রাতার পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। শঙ্করও বলিয়াছেন, এক দেবতা একদেহই বহুরূপে ধারণ করিয়া বিবিধ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত থাকেন (বেদান্তসূত্র, টীকা : ১।৩।২৭)।^২ এক মনের অধীনে এই বহু দেহ পরিচালিত হয়, ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি ইত্যাদি যোগীর ইচ্ছাধীন। তাহাতে তাঁহার মুক্তিপথে বিঘ্ন হয় না (বিজ্ঞান-ভিক্ষু যোগবস্তুিকা, পৃ ২৬২-৬৩)। এই এক চিত্ত দ্বারা বহু দেহ সৃষ্টি করিয়া কৰ্ম্মক্ষয় করার নাম 'কায়বাহ'। এই সম্বন্ধে বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, "যোগী খলু স্বকো প্রাচুর্ভূতায় বিকরণধর্ম্মা নিশ্চায় সেন্দ্রিয়াণি শরীরান্ত-রাণি তেষু তেষু যুগপজ্জ্জ্যেয়ানুপলভতে"। শঙ্কর (বেদান্তসূত্র ৪।৪।১৫) বলিয়াছেন, "একমনোহনুর্বাণীনি সমনস্ক অন্তো বাপরাণি শরীরানি সত্য-

১। With Mystics and Magicians in Tibet, David Neel, 1st Ch. p. 29-43

২। বেদান্তসূত্র (শারীরকণ্ডম্). মহেশ পাল সম্পাদিত (১৯১৭) ২৪-৪১ পৃ

সকলদ্বাং প্রকৃতি । সৃষ্টেষ্ চ তেষুপাধিভেদাঙ্গনোহপি ভেদনাধিষ্ঠাতৃৎ
যোজ্যতে । এষৈব চ যোগশাস্ত্রেষ্ যোগিনামনেকশরীরযোগপ্রক্রিয়া ।”^১

ঋগ্বেদের সূত্রে (৩।৪৭।১৮) আছে—“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ
ইর্যতে যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতা দশ” অর্থাৎ ইন্দ্র (সক্তিদানন্দ পরমাশ্রা)
নিজ যোগমায়াশক্তি দ্বারা অনেক প্রকার অনেক শরীর রচনা করিয়া নিজ
ভক্তদের মনোরথ পূর্ণ করেন । এই প্রকারে অগ্নিমাди ঐশ্বর্য সম্পন্ন
যোগিরাজও নিজ ‘কায়বাহ’ রচনা করিতে সক্ষম । মহাভারতে স্পষ্ট
উল্লেখ আছে—

আঙ্গনো বৈ শরীরানি বহুনি ভরতর্ষভ ।

যোগী কুর্ধ্যাদ্ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈশ্বর্যহিং চরেৎ ॥

প্রাপ্নুয়াদ্ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদ্ভুগ্নং তপশ্চরেৎ ।

সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্যো রশ্মিগণানিব ॥

অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির, অগ্নিমাди সিদ্ধি সম্পন্ন যোগীশ্বর নিজ এক
আশ্রা হইতে অনেক শরীর রচনা করিতে পারেন । এই বিভিন্ন শরীর
দিয়া রাজ্যাদি বিষয় ভোগ ও তপাদি সাধন করেন । সূর্য যেমন নিজ
রশ্মিগণকে একত্রিত করিয়া অস্তাচল পাহাড়ে অদৃশ্য হন, তেমনি
যোগী বহু শরীরকে একত্রিত করিয়া গুহামধ্যে নির্বিকল্প সমাধিতে
মগ্ন হন ।^২

যীশুর জ্ঞায় মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান করিয়া মৃত্যুসময়ে অনুপস্থিত
শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার কাহিনী জেংসুন মিলারেপা সম্বন্ধেও প্রচলিত
আছে । তিলোপা, নারোপা, মিলারেপা প্রভৃতি দশম শতাব্দীর যোগী
পুরুষ । ইহারা ‘মহামূদ্রা’ সম্প্রদায় নামে খ্যাত । মিলারেপা ‘কায়বাহ’
সৃষ্টি করিয়া একই সময়ে ২৪টি স্থানে উপস্থিত থাকিতেন । দৈবী শক্তি
বলে রোগীকে রোগমুক্ত করিতে ও বস্তুজাত বিভিন্ন তরঙ্গ আবিষ্কার করিয়া
সেই সেই বস্তুকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লিষ্ট করিতে তিনি সক্ষম ছিলেন ।
শিষ্যকে তরঙ্গরূপে দৈব আশীর্বাদ প্রেরণ, শিষ্যের বিপদে প্রাণময়
শরীরকে স্থূল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গুরুর শিষ্যের সাহায্যার্থে
গমন প্রভৃতি সিদ্ধদের পক্ষে সম্ভব । বজ্রকায়ে জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ
করিয়া স্বর্গে গমন ইত্যাদি মিলারেপার সিদ্ধি মধ্যে অন্ততম । মিলারেপা

১ । মরুতী ভবন সিরিজ নং ৩, নির্দ্বাপকায় প্রবক্ত । বেদান্তদর্শনম্ (মহেশ গাল ১৩১৭), পৃ ১০৬৭ ।

২ । নাগদম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ, স্বামীজি মোক্তিকনাথজী, কলাগ সঙ্ঘ অঙ্ক, পৃ ৪৮-৮১ ।

স্বীয় গুরুর নিকট ইচ্ছামৃত্যু বিদ্যা লাভ করেন (পৃ ১৬১)। তাঁহার মৃত্যুতে দুই বিরোধী শিষ্যদল দুইটি মৃতদেহ পান, অল্পপস্থিত শিষ্য রিচুংকে মৃত মিলারেপা পথিমধ্যে স্বদেহে দেখা দেন, পরে শিষ্য তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া অবাক হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে যীশুর মরজগৎ ত্যাগকালে ভৌতিক দেহ থাকে নাই এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইলাইজা জ্যোতির্ময় রথে স্বর্গে গমন করেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। খৃষ্টানদের মধ্যে গুরু দূর হইতেও শক্তিপাতের দ্বারা আশীর্বাদ প্রেরণ করিতে পারেন এইরূপ আশীর্বাদের কথাও আছে (পৃ ২৮১ ফুটনোট)। গুরুগোবিন্দভাগবৎপাদ রসায়নবিদ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাপি জীবিত এই বিশ্বাস ভারতে প্রচলিত আছে। ত্রৈলোক্য স্বামীর কাশীতে আগমন কাহিনীর কেহই উল্লেখ করিতে পারে না, তাঁহার ১৮৮৪ খৃঃ মৃত্যু ঘটে (পৃ ১৪৭ ফুটনোট)। রিচুংএর মৃত্যুতে তাঁহার স্থলদেহের ত্যাগ ঘটে নাই, স্বদেহেই তিনি স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন (পৃ ৩০৭)। মিলারেপার বজ্রকায় জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া পূর্বদিকে চলিয়া যায় (পৃ ৩০০-১)।^১

উপরোক্ত বিবরণে প্রথমতঃ ‘কায়বাহ’ বা বিভিন্ন দেহ রচনার ইতিহাস পাই। দ্বিতীয়তঃ মিলারেপা ও রিচুংএর মৃত্যু বা দেহত্যাগে যে প্রকার ভেদ আছে, তাহা আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে বর্ণিত দেহত্যাগের দুইটি ধারার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়—প্রথমটির সহিত মিলারেপার দেহত্যাগ তুলনীয় অর্থাৎ স্থলদেহ পড়িয়া থাকিল, তিনি বজ্রকায়ে লোকাস্তরে গমন করিলেন; দ্বিতীয়টির সহিত রিচুংএর দেহত্যাগ তুলনীয় অর্থাৎ কণ্ঠক বলিয়া বর্জনীয় কোন অংশ দেহে না থাকায় রিচুং স্বদেহেই প্রস্থান করিলেন।

লিংদেশের রাজা গিসার ‘বহুদেহ’ সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধ করেন, তৎসহ বহু অশ্ব বহু তাম্র সৃষ্ট হয়—এইরূপ নানা কাহিনী তিব্বতে প্রচলিত আছে।^২

শিবসংহিতায় আছে, “স যোগী কৰ্ম্মভোগায় কায়বাহঃ সমাচরেৎ।”^৩ যোগী প্রণব রূপ দ্বারা কৰ্ম্মকূট বিনাশ করিয়া পূর্বার্জিত কৰ্ম্মফলভোগের জন্য ‘কায়বাহ’ ধারণ করেন। যোগী শীঘ্র মুক্তিলাভ কামনায় যুগপৎ বহু

১। Tibet's Great Yogi Milarepa, W. Y. Evans Wentz, London, 1928.

২। With Mystics and Magicians in Tibet, Q. David Neel, p. 270.

৩। শিবসংহিতা ৩।১০

শরীর ধারণপূর্বক ভোগ দ্বারা পাপপুণ্যের বিলয় সাধন করেন, এই বহু শরীরের বাসনা নাই, নূতন কৰ্মসঞ্চয়ও নাই।^১

পাতঞ্জল যোগসূত্রে (৪।৫) যুগপৎ বহু নির্মাণচিত্তের প্রয়োজক এক চিত্তের কথা আছে। নির্মাণকায়ের কোন কথা নাই, যোগী নির্মাণচিত্তের দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। সমাধিসিদ্ধ যোগীর পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু নির্মাণচিত্ত সৃজনে তিনি সক্ষম। মহর্ষি কপিল নির্মাণচিত্ত অবলম্বনে আশুরীকে উপদেশ দেন এবং হিরণ্য-গর্ভদেব নির্মাণচিত্তের সাহায্যে এই বিশ্ব রচনা করেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। আমাদের অনুমানে সিদ্ধদেহ পাক্ভৌতিক দেহ নহে, অতএব নির্মাণচিত্ত বা নির্মাণকায় একই কথা। নির্মাণকায়ও একপ্রকার সিদ্ধদেহ।

উচ্চশ্রেণীর যোগীরা আপন প্রয়োজনানুসারে ‘নির্মাণকায়’ বা ‘নির্মাণচিত্ত’ ধারণ করেন। সাধারণ জীবের দেহ ভৌতিক দেহ, পঞ্চভূত ও অস্থাত্ত উপাদান পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া এই দেহ রচিত হয়। জীবের প্রারব্ধকর্মের ফলে ইহার উৎপত্তি, কিন্তু যোগীর সঙ্কল্প দ্বারা গঠিত দেহের সহিত বা চিত্তের সহিত প্রারব্ধের কোন যোগ নাই। মত্তবলে, তপস্শ্রাফলে বা যোগপ্রভাবে নির্মাণকায়ের উৎপত্তি হয়। যোগবলে সৃষ্ট নির্মাণচিত্তে শুক্রকৃষ্ণাদি কৰ্ম্মাশয় থাকে না। এইরূপ চিত্ত বা দেহই ‘শুদ্ধদেহ’, ইহা শুদ্ধ অস্মিতাতবে প্রতিষ্ঠিত এবং ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য। জৈনদের আচার্য্যাদেহও এইরূপ। বৌদ্ধরাও বলেন, বুদ্ধ সত্ত্বার্থে নির্মাণকায় গ্রহণ করেন। কৈবল্যালাভের পূর্বে সিদ্ধেরা লোক-কল্যাণার্থ দেহধারণে সক্ষম। মানবের মন জিজ্ঞাসু হইলে এইভাবে উচ্চতর লোক হইতে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

মাধ্যমিক মতে ‘শূন্য’ হইতে নির্মাণকায়ের উৎপত্তি হয়, কারণ যোগদেহে উপাদান অনাবশ্যক। অভিনব গুপ্ত ও পঞ্চভূতের উপাদানের অনাবশ্যকতার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন (ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ১।১।৮)। জগৎসৃষ্টি যদি সম্ভব হয় তবে কায়সৃষ্টি অসম্ভব কিসে? নির্মাণকায় পাক্ভৌতিক দেহ নহে, অতএব নির্মাণচিত্ত দ্বারা নির্মাণকায় সৃষ্টি সম্ভব।^২

১। An Introduction to Yoga Philosophy, Major B. D. Basu, 1912, Allahabad. Introduction, p. XVI.

২। নির্মাণকায়, সরস্বতীস্বয়ং সিদ্ধিঃ নং ১

নাথমার্গে সিদ্ধযোগী পক্ষে সিদ্ধদেহে ত্রিলোক ভ্রমণের কথা আছে, যথা—

ইচ্ছাক্রপো হি যোগেন্দ্রঃ স্বতন্ত্রস্বজরামরঃ ॥
 ক্রীড়তি ত্রিষু লোকেষু লীলয়া যত্র কুত্রচিৎ ।
 অচিন্ত্য শক্তিমান্ যোগী নানাক্রপাণি ধারয়ন্ ॥
 সংহরেচ্চ পুনস্তানি স্বেচ্ছয়া বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 মরণং তস্মা কিং দেবি পৃচ্ছসীন্দুসমাননে ॥
 নাসৌ মরণমাপ্নোতি পুনর্যোগবলেন তৎ ।
 পুত্রৈব মৃত এবাসৌ মৃতস্য মরণং কুতঃ ॥
 মরণং যত্র সর্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি ।
 যত্র জীবন্তি মৃঢ়াস্ত তত্রাসৌ ত্রিয়তে সদা ॥
 কর্তব্যান্নৈব তস্মাস্তি কৃতেনাসৌ ন লিপ্যাতে ।
 জীবন্মুক্তঃ সদা স্বচ্ছঃ সর্বদোষবিবর্জিতঃ ॥^১

ইহা দ্বারা যোগেন্দ্র লীলাপর হইয়া, নানাক্রপ ধারণ করিয়া, ত্রিলোকের যথাতথা ক্রীড়া করেন তাহাই সূচিত হইতেছে। রসেশ্বরদর্শনেও ইহার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

এবং রসসংসিক্তো হৃৎস্বজরামরণবর্জিতো গুণবান্ ।

খেগমেনেন চ নিত্যং সঞ্চরতে সকল ভুবনেষু ॥^২

সিদ্ধযোগী যোগবলে পূর্বেই মৃত হন, অর্থাৎ তাঁহার কায়সিদ্ধি পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইলে ভৌতিক দেহ বিনষ্ট হয়, অতএব ‘মরণং যত্র সর্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি’ এবং মূঢ়েরা যেখানে জীবিত সেখানে ইনি সদাই মৃত। ইহার সহিত গীতার

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্মাং জাগর্ন্তি সংযমী ।

যস্মাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ ॥^৩

তুলনীয় ;—ইহার নিগূঢ়ার্থ এই যে, বিবেকিগণ পরমার্থ বিষয়ে জাগ্রত ও জাগতিক বিষয়ে নিদ্রিত, আর মূঢ়গণ পরমার্থবিষয়ে নিদ্রিত এবং ঐহিক বিষয়ে সদা তৎপর থাকে।

সিদ্ধযোগীর কোন কর্তব্য নাই, কর্ম করিয়াও তিনি তাহার দ্বারা লিপ্ত হন না, তিনি জীবন্মুক্ত, সদা স্বস্থ, সকল দোষশূন্য। কিন্তু মাত্র বিরক্ত জ্ঞানিগণ অস্ত্রে দেহের দ্বারা বিজিত হন, তাঁহারা মাংসপিণ্ডদ্বারা



পীড়িত দেহী, তাঁহারা যোগিগণের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন।
গীতাও বলিয়াছেন—

তাক্ত্বা কৰ্মফলাসক্তং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং করোতি সঃ ॥^১

যিনি কৰ্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া সৰ্বদা পরিতৃপ্ত ও নিরবলম্বন হইয়া থাকেন, তিনি জনকাদির স্থায় কৰ্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না, কারণ তাঁহার শুভাশুভ কৰ্মের কর্তৃক জ্ঞানাত্মি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে।

এইরূপে জীবন্মুক্ত হইয়া ইচ্ছামত যে যোগী ত্রিভুবন বিচরণে সমর্থ, তাঁহার 'কায়সিকি' পূর্ণ হইয়াছে বুদ্ধিতে হইবে।

✓ নাথমার্গে কায়সাধনের যে বিশেষ প্রণালী আছে তাহার নাম 'উন্টা সাধন'। গোরক্ষবিজয়ে (পৃ ১১৫, ১১৬, ১৪৫) ও গোরক্ষবোধে (শ্লোক ৩৭, ৩৮) এই সাধনতত্ত্ব আছে। গোরক্ষবোধে চন্দ্রসূর্য্যের ও নাদবিদুর অবস্থিতি সম্বন্ধে এবং উন্টাশক্তির বিশ্রামস্থান সম্বন্ধে সাক্ষেতিক ভাষায় প্রশ্নোত্তর আছে।^২ গোরক্ষবিজয়ে উন্টাসাধন-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

—সট্চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান।

মেরুমূলে রহিব চন্দ্র ন টুটিব কলা

বেঙ্কানাংলে সাধ গুরু ন করিয়া হেলা'। (পৃ ১৪৭)

সাধনের দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উর্দ্ধে নীত করিয়া শিবস্থানে মিলিত করিতে পারিলে সংসারের গতি হইতে নিবৃত্তি হয়। নাভিনিম্নে শক্তিস্থান, উর্দ্ধে শিবস্থান; মানবদেহে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজ করেন, সহস্রারে শিবের নিবাস। মধ্যে ষট্চক্র বা নবচক্রের অবস্থান, তাহার ভেদই সাধন। এই সাধন দ্বারা যোগীর স্বরূপে স্থিতি হয়, সংসারের গতি হইতে ইহা বিপরীত মার্গ, অতএব ইহা উন্টাসাধন।^৩ সূফী, বাউল, সন্তকবিরাম ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। সংঘম বা ক্লেম (গোরক্ষবিজয়ে 'ক্লেমাই' পৃ ১২৪, ১৪১ ইত্যাদি) দ্বারাই যোগ সাধিত হয়, মুদ্রাদি উপায় মাত্র। গোপীচন্দ্রের গানে^৪ চিত্তজয়ের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেও আছে, 'মরণ কর আগা বাছা জীবন কর পাছ' অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ী হও।

১। গীতা ৪।২০

২। "গোরক্ষনাথ", মোহনসিং, পরিশিষ্ট অষ্টক

৩। কোলজাননির্ঘর ২০।১, ২, শক্তি উদ্ধৃগামী হইলে জীবের শিব প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আছে। ইহাই শক্তির উন্টা মার্গ।

৪। ২য় খণ্ড, পৃ ৪৩৫

গোরক্ষবিজয়ের মধ্যেও (পৃ ৯৪, ৯৫) “কায়াসাধ কায়াসাধ মাদলে হেন বোলে.....কায়াসাধ কায়াসাধ মন্দিরাএ বোলে”—ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার ইঙ্গিত আছে। ইহাই ‘বিপরীত’ সাধন।

কবীরের ‘বীজকে’ এমন কয়েকটি ‘শব্দ’ আছে যাহা আমাদের অনুমানে উল্টাসাধন ও কায়সিকির রহস্যকেই ব্যাখ্যাত করে। যথা, কবীরের বীজকের ৬৬নং শব্দে—

যোগিয়া কী নাগরী বসৈ মতিকোই।

জোরে বসৈ সো যোগিয়া হোই ॥১॥

বহ যোগিয়াকে। উল্টাজানা।

কারাচোলা নাহি ম্যানা ॥২॥

অর্থাৎ যে যোগী, তাহার নগরী ব্রহ্মাণ্ড, সেখানে কেহ বাস করে না অর্থাৎ যোগী হঠযোগের সাধক, অতরা হঠযোগ সাধন করে না। বেদান্ত শরীর ও আত্মাকে ভিন্ন বলেন, কিন্তু যোগীর মতে শরীরই প্রধান, পবনকে উল্টানীত করাই যোগীর ‘উল্টাজানা’।

কবীরের বীজকে ‘সাখী’তে আছে (নং ৪২)—

গোরখ রসিয়া যোগকে, মুয়েন জারী দেহ।

মাংসগলী মাটি মিলী, কোরা মাঁজী দেহ ॥

অর্থাৎ জন্ম হইলেই প্রলয়কালে মৃত্যু ঘটিবে, কিন্তু গোরখ এমন যোগ সাধন করিয়াছেন যে মরণেও তাঁহার দেহের নাশ নাই, মাংস গলিয়া মাটির সহিত মিলিয়া যাইলেও তাঁহার ‘নবদেহ’ (কোরা দেহ, মাঁজী = শুদ্ধ চর্ম) উৎপন্ন হইবে।^১

কবীরের সাখীর (পৃ ৬১২তে) কবীরের শব্দাবলী গ্রন্থ হইতে উল্লেখ করিয়া অবদূতের যোগসাধন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইড়াপিঙ্গলাকে দমন করিয়া সুমুগ্ধা নাড়ীকে নাশ করিয়া পবনকে গঙ্গায় চড়াইয়া মেরুদণ্ডে আসন পাতিয়া যোগী যোগ সাধন করেন, তাহাই ‘উন্ননী’ অবস্থা প্রাপ্তি। ইহাও কায়সিকির অন্ততম উপায়।

সিদ্ধদের দুই শ্রেণী আছেন—এক শ্রেণী পারদাদি যোগে ‘কায়সিকি’ লাভ করেন, অন্য শ্রেণী ‘জপাদি’ সহায়ে শরীর শুদ্ধ করেন। উভয় প্রক্রিয়াতেই পঞ্চইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করিতে হয়। জিহ্বার অন্তর্মুখী

অবস্থায় চন্দ্রামৃত ক্ষরণ হয়, কর্ণের অন্তর্মুখী অবস্থায় নাদশ্রবণ হয়, চক্ষুর অন্তর্মুখী অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় ইত্যাদি। “বাজ্রত অনন্তদ বাঁশুরী তিরবেনা কে তীর” (যারী)। বুল্লা সংক্ষেপে সমস্ত সন্তুসাধনা বর্ণনা করিয়াছেন—

ত্রিকুটী দ্বারা দেথৈ আপু। সুখনন দ্বারা সুমিরৈ জাপু।

ইঙ্গলা পিঙ্গলা আঁথৈ জায়। দসবৈ দ্বারা রহৈ সমায় ॥

অর্থাৎ ত্রিকুটী (ত্রদৃষ্টি) মধ্যে নিজেকে দেখ, সুষুন্না দ্বারা (অজপা) জপ কর, ইঙ্গলাপিঙ্গলা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ (প্রাণায়াম) কর—এইরূপে দশমী ছয়ারে প্রবিষ্ট হও।^১

এইরূপে সন্তুরা পারদাদি সহযোগে নহে, জপাদি ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ করিতেন। পাতঞ্জলযোগেও পারদাদি ব্যবহারের কথা নাই। কিন্তু ‘ঋষাভিমতধ্যানাদ্বা’ এবং ‘জন্মোষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজ্ঞা সিদ্ধি’র কথা আছে। আবার বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধোও কায়সিদ্ধি প্রক্রিয়া ছিল, তাহার পরিচয় জ্ঞানদেব রচিত ‘জ্ঞানেশ্বরী’ নামক গীতাভাষ্যে পাওয়া যায়। এই ভাষ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্দশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

প্রশাস্ত্যাদ্বা বিগতভীত্বান্ধচারিব্রতে স্থিতঃ।

মনঃ স যমা মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥৬। ৪

ইহার টীকায় আছে যে, অপানবায়ু মূলবন্ধ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা উল্টামুখী হইয়া তৃতীয় চক্র মণিপু্রে আঘাত করিলে শরীরের দূষিতমল দূর করে, নাড়ীগ্রন্থি মোচন করে, কল্পনা রুদ্ধ হয়, প্রকৃতি শাস্ত হয়। আসনের উষ্ণতা কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে, তাহা বজ্রাসন দ্বারা উত্তিত হইয়া নাভিস্থানে দেখা দেয় হৃদয়কমলের নিম্নের বায়ুকে নাশ করে, সমস্ত অবয়বকে শুদ্ধ করে, তাহাতে বাহুবুদ্ধি রুদ্ধ হয়। নাসিকাগ্র বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্যাস্ত যে বায়ু বহির্গম করে, তাহাকেও অন্তর্মুখী করে। উর্দ্ধবায়ু ও নিম্নবায়ুর মিলন সাধন করে। ত্রিনাড়ী বশীভূত হয়, ষট্চক্রের কলি প্রক্ষুটিত হয়, চন্দ্রামৃত ক্ষরিত হইতে থাকে, এবং যোগীর দেহ ক্ষটিকের স্থায় স্বচ্ছ দেখায়। কুণ্ডলিনী চন্দ্রামৃত পান করিলে সুবর্ণচম্পক সদৃশ দেহ হয়, তাহা দেখিয়া কৃতান্ত ও ভীত হয়, বার্কক্য দূর হয়, লুপ্ত বাল্যাদশা ফিরিয়া আসে। সর্বশরীরে নূতন

রোমাবলী দেখা দেয়, নবদন্তের উদগম হয়, শরীর বায়ুর ছায় লঘু হয়, কারণ শরীরের পৃথ্বী ও জল অংশ থাকে না। অগ্নিমাди সিদ্ধি লাভ হয়। পরচিন্তা জ্ঞান হয়। জগদস্থা কুণ্ডলিনী-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনাহত ধ্বনি করিতে থাকেন, বুদ্ধি তাহা ধীরে ধীরে শ্রবণ করে, তখন ব্রহ্মরঞ্জন দ্বার উন্মুক্ত হয়। কুণ্ডলিনীও তেজ ত্যাগ করিয়া প্রাণরূপে স্থিত হন। তখন নাদ, বিন্দু, কলা, জ্যোতি থাকে না। মনবশ, পবনআশ্রয় প্রভৃতির জ্ঞানও লুপ্ত হয়। কল্পনীয় বা বর্জনীয় কিছু থাকে না। ইহাই মহাভূতের স্পষ্ট নিভুলরূপ। পিণ্ডদ্বারা পিণ্ডের গ্রাস যে নাথসম্প্রদায়ের মর্থ, সেই অভিপ্রায়ই শ্রীমহাবিষ্ণু বর্ণনা করিয়াছেন।^১

তত্ত্বে ও নাথমার্গে দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করা হয়—নিবন্ধের অগ্রত ইহা আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেহমধ্যে চন্দ্র বা সোম এবং সূর্য বা অগ্নিকে প্রধানতম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই চন্দ্রসূর্য্যকে ‘হ’ ও ‘ঠ’ বা প্রাণঅপান ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত করা হয়। এই প্রাণ-অপানকে মানবদেহের শিব ও শক্তি বলা হয়, কারণ চন্দ্র অমরত্ব দান করেন, সূর্য্য কালাগ্নিরূপ। তাই এই দুই নাড়ীর মধ্যবর্তী পথে যাইয়া দশমী ছয়ারে “তালি দিয়া রহিবা সহজে” ইত্যাদি উপদেশ আছে।

চান্দসুরজ দুই করিয়া সমএ

অভয় পুরিতে নাই, বায়ুর জে ভর।

সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল।

পরিচয় করি হাসা বন্দি কর কাল ॥

অগ্রত— ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বুঝিবা বাউ সন্ধি।

রবি শশি চলিয়াছে তারে কর বন্দি ॥^২

সর্বত্র প্রাণ অপানকে বশীভূত করিয়া ‘কালবঞ্চনের’ কথা বলা হইতেছে। নাথমার্গে প্রাণ-অপান শিবশক্তিরূপে কল্পিত হন। গীতায় আছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন।^৩

নাথগণের কায়সাধন অর্থে সামরন্তপ্রাপ্তি, ইহা শিব ও শক্তির মিলন অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যভাবের ভেদাভেদ-কল্পনা দূর করতঃ

১। জ্ঞানেশ্বরী, ইতিহাস গ্রন্থ, এলাহাবাদ ২য় সংস্করণ, পৃ ১০০-১০১। হিন্দী টীকার ইহা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

২। গৌরবিশয় পৃ ১৪৪, ১৪৭,

৩। গীতা ১৪।১৪

সামরস্ভাব সাধন। ভেদজ্ঞান থাকিলে দেহসিদ্ধি বা আত্মোপলব্ধি সম্ভব নহে। শিব ও শক্তিতে বস্তুতঃ ভেদ নাই। শিব শক্তিরই আত্মলীন অবস্থা বা সিদ্ধমতে ‘নিকৃথানদশা’। ইহাই সামরস্ভূমি (পরমপদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। জীবমধ্যে যে কুণ্ডলিনী আছেন তাহার চেতনে সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নি দ্বারা পক্ক হয়, “সপ্তধাতুময়ো দেহো দন্ধো যোগাগ্নিনা শনৈঃ।” তৎফলে ‘যোগদেহ’ প্রাপ্তি হয়। উপনিষদ আত্মা সম্বন্ধে ‘অণোরণীয়ান্’, ‘মহতো মহীয়ান্’ বিশেষণ দিয়াছেন, সিদ্ধদের যোগদেহও তাহাই। সর্বদোষবর্জিত সদাস্বরূপস্থ অভিনব চিদ্বেদের আবির্ভাবেই সিদ্ধদেহ লাভ হয়। যোগদেহ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ। মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্মদেহ থাকে, গীতাতেও ইহার বর্ণনা পাই (৫।১০, ১১)। নাথমার্গে যোগদেহ সৃজনের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (গো, সি, স, পৃ ৫৩)। যোগের দ্বারা কায়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, বায়ু উর্দ্ধে নীত করিবার ফলে চিত্তের দৃঢ়তা হয় ও শ্বাসপ্রশ্বাস বশীভূত হইলে বাক্যের দৃঢ়তা অর্থাৎ স্থিরতা হয়। এই কায়বাক্চিত্তের শুদ্ধিতে ‘বিন্দুসিদ্ধি’ হয় ও তৎফলে সিদ্ধদেহ বা যোগদেহ লাভ হয়।

সিদ্ধদেহ যোগী জরামৃত্যুহীন; জন্মের পরের অবস্থা জরায়ুক্ত অবস্থা, যোগী সাধনবলে জরানাশ করেন, তাহার দেহত্যাগ তিরোভাব মাত্র, উহাও দীর্ঘকাল পরে বা কল্পান্তে সংঘটিত হয় বলিয়া যোগীকে ‘অমর’ বলা হয়। সদাকালীন স্থিতি ইহারও উর্দ্ধে। কালের গতিসুস্তন দ্বারা এই সদাকালীন স্থিতি বা অজরত্ব লাভ হয়, তাহাতে জন্মমরণ কাটিয়া যায়, দেহ বজ্রবৎ সুদৃঢ় হয় ও রূপলাবণ্যযুক্ত হয়। কোন কোন মতে এই কল্পান্তস্থিতি ও সদাকালীন স্থিতি দ্বারা ‘সিদ্ধদেহ’ বা ‘দিবাদেহ’ ভেদ বর্ণিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রেও বৈন্দব ও শাক্ত দেহের ভেদ আছে, সম্প্রদায়ভেদে ও দৃষ্টিভেদে নামভেদ দেখা যায়। ডাঃ রমন শাস্ত্রী শুদ্ধমার্গে যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহের পরিবর্তন দ্বারা কায়সিদ্ধি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত নাথমার্গের কায়সিদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। শুদ্ধমার্গে ত্রিগুণাত্মক মায়িক দেহের পরিবর্তন সাধিত করিয়া শুদ্ধমায়ার সিদ্ধদেহ বা ‘প্রণবতমু’ বা মস্ততমু লাভই ‘জীবমুক্ত’ হওয়া। তৎপরে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মহামায়ার চিন্ময় দেহ লাভ করিয়া যে স্বর্গবাস হয় তাহাই ‘পরামুক্ত’ হওয়া অথবা দিবাদেহ বা ‘জ্ঞানদেহ’ লাভ

করা।^১ বস্তুতঃ সর্বোপরি যে অবস্থা হয় তাহা দিব্যদেহ—অর্থাৎ সিদ্ধদেহ অবস্থায় জ্যোতি পূর্ণ কলা প্রাপ্ত হইলেও তাহা ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকে, এবং দিব্যদেহ লাভ হয়। সিদ্ধদেহ এই দিব্যদেহের অন্তর্গত হইয়া থাকে। যেমন পূর্ণ কলসীর উপর জলপাত হইতে থাকিলেও পূর্ণ কলসী তেমনি থাকে, সেইরূপ যোগীর শক্তি বদ্ধিত হইতে থাকিলেও সিদ্ধদেহ তদন্তর্গতই থাকে। নাথমার্গের ‘পঞ্চদেহ’ই সিদ্ধদেহ বা যোগদেহ। দেখা যাইতেছে, ‘দিব্যদেহ’ ‘সিদ্ধদেহ’রই প্রকারভেদ মাত্র, শুদ্ধমার্গে এই ভেদ বর্ণিত হইলেও নাথমার্গে এই ভেদাভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব নাথমার্গের ‘যোগদেহ’ বলিলে সিদ্ধ ও দিব্য দেহ উভয়ই বুঝিতে হইবে। রসেশ্বরদর্শনমতে সিদ্ধ বা দিব্য দেহ উভয়ই জরামরণহীন, অতএব উহাতে ভেদ নাই। রসেশ্বর ‘সিদ্ধদের ‘রসময়ীতমু’ সূক্ষ্মশরীর বিশেষ, তাহার। এই শরীর ধারণ করিয়া ত্রিলোক বিচরণ করেন। যথা —

মস্থন ভৈরবো যোগী সিদ্ধবুদ্ধশ্চ কস্থড়ী

...

...

...

অল্লামপ্রভু দেবশ্চ ঘোড়াচলী চ টিনিটুনী

ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা রসভাগপ্রসাদতঃ

খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ত্রিলোকাং বিচরন্তি তে ॥^২

ইহাদের মধ্যে সিদ্ধ অল্লামপ্রভুর সহিত গোরক্ষনাথের একদা ‘কায়সিদ্ধি’ লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়। গোরক্ষ অল্লামপ্রভুকে বলিলেন, “তুমি কথা ভাগ করিয়া আমার শরীরে তীক্ষ্ণ কৃপাণ দ্বারা আঘাত কর, তাহাতে ‘মদীয় কায়ে যদি রোমমাত্রঃ কটোত চেত্তর্হি ন কায়সিদ্ধিঃ’, তাহা হইলে আমি লোকমধ্যে সিদ্ধরূপে গণ্য হইতে পারি না।” অল্লামপ্রভু ভাবিলেন, ইহার শরীরে খড়্গাঘাত করিলে যদি মৃত হয়, তবে আমি উচ্চতর যমৌন্দ্র গোরক্ষ সৃষ্টি করিব। এই ভাবিয়া তিনি গোরক্ষের দেহে আঘাত করিলেন; তাহাতে ঘোর শব্দ হইল, পৃথিবী চঞ্চল হইল, অঙ্গিগণ কম্পিত হইল, কিন্তু গোরক্ষের রোমমাত্র ভিন্ন হইল না। অল্লামপ্রভু বলিলেন,

১। The Doctrinal Culture and Tradition of the Siddhas, Dr. Raman Shastri, C. H. I. Vol II. p. 303 ff.

২। রসেশ্বরতত্ত্ব ১৭৭ টীকা।

“যমীদের ইহা প্রকৃত সিকি নহে, এই সিকি মিথ্যা, কারণ তোমার দেহে শব্দ উখিত হইয়াছে, যোগী বাততাপাদি দ্বারা অপীড়িত, জরামরণবজ্জিত হইবেন ও ভূতজয়ী হইবেন। দৈহিক গুণ সকল দ্বারা যে অনাসক্ত থাকে তাহারই ‘কায়সিকি’ হইয়াছে জ্ঞানিবে।” অতঃপর গোরক্ষ অল্লামপ্রভুর সিকি পরীক্ষার্থে বিচিত্র গতিতে অত্র চালনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভুর দেহ ‘নিঃশব্দ অপ্রতিমকাস্তি বিকারশূন্য’ রহিল, গোরক্ষ আশ্চর্য্য হইয়া প্রভুর সিকি স্বীকার করিলেন।^১

উপর্যুক্ত বিবরণ নাথপন্থীদের না হওয়ায় গোরক্ষের সিকিকে নিয়ম করা হইয়াছে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিকিদেহ আকাশের ন্যায়, তাহাতে আঘাত করিলে শব্দ হইবে না, সে দেহ ইষ্টকপ্রাচীরও ভেদ করিতে সমর্থ। জীবমধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে, যেমন তিলমধ্যে তৈল, ছন্ধ মধ্যে ঘৃত। যোগী সাধনদ্বারা বিচ্ছেদ সম্পন্ন করিতে পারেন, কাহারও কাহারও স্বপ্নে সূক্ষ্মশরীরের বহির্গমন হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থাতেও কেহ কেহ এইরূপ অনুভূতি লাভ করেন। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা অন্তের মৃত্যুর সময়ে এই দেহবিচ্ছেদ ক্রিয়া দেখিতে পান, সাধারণের নিকট ইহা অপ্রত্যক্ষ। যোগীরা মন্থনরূপ ক্রিয়া দ্বারা এই দেহবিচ্ছেদ সাধন করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে পারেন, দেশ বা কাল দ্বারা সে শরীর বাধিত হয় না। স্থূল শরীর তখন জড়বৎ পড়িয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ শঙ্করের স্থূলদেহ ভাগ ও অমরুক রাজার দেহে প্রবেশ কাহিনীর উল্লেখ করা যাউতে পারে। স্থূলভাও স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা জনক রাজার দেহে প্রবেশ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে স্থূল শরীর প্রস্তরবৎ পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহে পরকায় প্রবেশ আদি ক্রিয়া হয়।^২ জৈন গ্রন্থাদিতে পরকায় প্রবেশের কথা আছে। এ বিষয়ে ব্রুমফিল্ড সাহেব সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।^৩

মার্গাস্তরে যোগীর স্থূল শরীরও দৃষ্ট হয় না। তিনি স্বশরীরেই ভ্রমণ করেন, ভৌতিক স্থূল শরীর লইয়া যথেষ্ট ভ্রমণ অসম্ভব ব্যাপার, অথচ

১। লিঙ্গায়ণ চক্রিকা, সাকারে প্রীত পৃ ৩৪, ইত্যাদি

২। এই সম্পর্কে গ্রাণশক্তিযোগ ও পরকায় প্রবেশ বিচার পূর্বরূপ, জাম্বক ভাস্কর শাস্ত্রী সাধনাক্ষ ১ম খণ্ড ‘কল্যাণ’ পৃ ৪০৪ ইত্যাদি উল্লেখ্য।

৩। Magic and Miracle in Jaina Literature, K. Mitra, pp. 36, 26

প্রস্তুতবৎ কোন স্থূলদেহ পড়িয়া থাকিতেও দেখা যায় না, (তাহা হইলে যোগী কেবল সূক্ষ্ম দেহে বহির্গমন করিয়াছেন এইরূপ বলিতে হইত)— অতএব যোগীর সে দেহ কিরূপ ? উহা কেবল সূক্ষ্মশরীরও নহে, আবার ভৌতিক দেহ সহ প্রস্থানও সম্ভব নহে । যোগীর এইরূপ দেহের নামই ‘সিদ্ধদেহ’, ইহাই পূর্ণ ‘কায়সিদ্ধি’ । এই দেহ স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, অথচ উভয় দেহের ধর্ম উহাতে বর্তমান । যোগমার্গের উর্দ্ধস্তরে এই দেহ-প্রাপ্তি ঘটে । যোগীকে প্রথমতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ভেদ উপলব্ধি করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ যোগসাধন দ্বারা উভয়ের মিলনে সিদ্ধদেহ লাভ ঘটে । এই সিদ্ধদেহ দ্বারা যোগী জগতের কল্যাণসাধনে ত্রুতী হন, এই দেহ যথার্থ ‘গুরুদেহ’, ইহাই ‘প্রণবতমু’ । নাথমতে গোরক্ষনাথ অত্মাপি এই দেহ ধারণ করিয়া আছেন, অতএব নাথগুরু—

স্বৈচ্ছাযোগী স্বয়ং কর্তা লীলয়া চাজরামরঃ ।

অবধো দেবদৈত্যানাং ক্রীড়তি ভৈরবো যথা ॥^১

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি

জৈনদের মধ্যেও বিশ্বাস যে সিদ্ধগণ কর্মফল ভোগ করেন না, তাঁহারা লোকের উপর আলোকাকাশে বাস করেন এবং অষ্টগুণযুক্ত হন । সেই অষ্টগুণ, যথা—সম্যাক্তব্য অর্থাৎ জৈন-তত্ত্বে বিশ্বাস, জ্ঞান, দর্শন, বীৰ্য্য (ক্লান্তিহীনতা), সূক্ষ্ম, (স্থূলদেহহীন), অবগহন (বহু সিদ্ধের একত্রবাস সম্ভব), অগুরুলঘু (দেহ লঘু বা গুরু নহে), অব্যয়বাদ (নির্বিকার) । অতএব জৈনমতে সিদ্ধদেহী জীবের সর্বোচ্চ দেহপ্রাপ্তি হইতে সামান্য নূন অবস্থা প্রাপ্তি হয় ।

নষ্টাষ্টকর্মদেহঃ লোকালোকস্ত জায়কঃ জষ্টা ।

পুরুষাকার আত্মা সিদ্ধং ধ্যায়েৎ লোকশিখরস্থঃ ॥৫১

ইহা সিদ্ধদেহের বর্ণন, এই দেহ অষ্ট কর্ম হইতে জাত নহে, ইহার লোক ও অলোকের জ্ঞান আছে, ইহার পুরুষের ছায় আকার, তথাপি ইহা স্থূল দেহ নহে, ছায়াময় দেহবিশেষ, ইহা সর্বজ্ঞ ও আলোকাকাশবাসী ।^২

১। সি. স. প. ৫।৩৩, ৩৪

২। Dravya Samgraha, N. Siddhanta Sutras, 14, 51.

দশম পরিচ্ছেদ

অধিকারলাভ, অবধূত বা সিকলক্ষণ

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে, “যস্ত সাক্ষাদ্ অনুভবঃ শাস্ত্রজ্ঞানেন তস্ত কিম্?” সাক্ষাৎ অনুভবীর পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা। নাথমার্গ উপলব্ধির মার্গবিশেষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দ্বারা অধিকারলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। তবে সকল সম্প্রদায় মধ্যেই ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যই বল, ‘নায়মাস্মা বলহীনেন লভ্যঃ’, তাই চতুরাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের স্থান প্রথম। কিন্তু সিক্তমতে ‘অবধূত’ই যথার্থ অধিকারী, তিনি ত্যাগ ও ভোগের দ্বারা অলিপ্ত ও সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত।

সাধারণতঃ বিন্দুর সংরক্ষণকে ‘ব্রহ্মচর্য্য’ বলে। যাহা দ্বারা ব্রহ্মপথের সঞ্চার হয় তাহাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। কামনা-বাসনাদি হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হইলে বিন্দুর যে আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা হয়, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ভূমি; বিন্দুর ক্ষরণে ‘সংসার’, বিন্দুর ধারণে ‘মোক্ষ’। গণিতশাস্ত্রে ত্রিকোণাদির কেন্দ্রই বিন্দু, দেহস্থ কেন্দ্রও সেইরূপ ‘বিন্দু’ নামে অভিহিত হয়। পঞ্চকোষের পঞ্চ বিন্দু কল্পিত হয়, অন্নময় কোষের বিন্দুই স্থূলবিন্দু এবং আনন্দময় কোষের বিন্দু অমৃতবিন্দু। সাধন দ্বারা বিন্দুর ভেদ অতিক্রম করিয়া ষোড়শীকলারূপ অমৃতবিন্দুতে চিত্ত স্থির করিলে সাধক মুক্ত হন। নাভিচক্ররূপ মাধ্যাকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া বিন্দু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপে সহস্রকমল-দলের কর্ণিকাতে মহাবিন্দুর সহিত মিলিত হয়। মহাবিন্দুই চিত্তচন্দ্রমার ‘অমৃতকলা’। বিন্দু শোধনের বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন আছে। বৌদ্ধদের সহজযান প্রভৃতিতে ও জৈনধর্মে এই শোধন-প্রণালী প্রচলিত আছে।

বিন্দু স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়। হঠযোগের ক্রিয়াদ্বারা স্থির বিন্দুকে উর্দ্ধমুখী করাই তত্ত্বের কুণ্ডলিনীর জাগরণ। বিন্দু উর্দ্ধশ্রোতা হইলে নাদাদি শ্রবণ, জ্যোতির্দর্শন, আত্মজ্ঞানের বিকাশ ইত্যাদি হইয়া থাকে,—ইহাই যোগীর অধিকার লাভ।

যোগসূত্রে একতান ধ্যান ও সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞার উন্মেষ ও তাহাও

নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমাধিলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম কল্লিক উপায়স্বরূপ।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ নানাপ্রকারে হয়। পূর্ব সংস্কারের তারতম্যে ভক্তি বা শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানানুষ্ঠান বা হঠযোগ, মন্ত্রযোগ ও রাজযোগের দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস দ্বারা কুণ্ডলিনী-জাগরণের অনুকূল সাধন হইয়া থাকে। সত্যের পথে পদার্পণ মুখ্য উদ্দেশ্য, বৃত্তিনিরোধ দ্বারা একাগ্রতা সাধন লক্ষ্য।

কুণ্ডলিনী সুপ্তা থাকিলে সত্যমার্গ আবরিত থাকে, তাহার জাগরণে মার্গ মুক্ত হয়। তখন জীবের শিবদ্ব্যপ্রাপ্তি হয়, জীবের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নিত্যজাগ্রত শিবের সহিত মিলিত হন। এই মিলনে যে অদ্বয় রূপ প্রকটিত হয় তাহাই জীবের ব্রহ্মপথে অধিকার লাভের সূচনা। এই মিলনের দ্বারাই জীব তদ্ব্যতীতের সন্ধান আভাসরূপে পাইয়া থাকে, ইহা বর্ণনাতীত অবস্থা। এক ব্রহ্মকেই প্রথমে সত্যরূপে ও অবশেষে আনন্দময় সত্ত্বরূপে সাধক উপলব্ধি করেন, কুণ্ডলিনীর জাগরণে যে নিত্যসত্তাতে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, ইহাই সত্য স্থিতি। মৎস্যেন্দ্র সম্প্রদায়ে এই অধিকার লাভে মনের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা, “কার্য্যাকারণনিমুক্তমচিস্তামনা ময়ম্, মায়াতীতং নিরালম্বং ব্যাপকং সর্ব্বতোমুখম্। সমস্তং একভূতক।”

অর্থাৎ কার্য্যাকারণ-বিনিমুক্ত সকল চিন্তা হইতে মুক্ত, মায়াতীত, নিরালম্ব, ব্যাপক, সমস্তযুক্ত চিন্তাই বজ্রযোগ দ্বারা লভা, ইহাই সহজাবস্থা, ‘সহজ’ দেহমধ্যস্থ চক্রবিশেষ, ইহার অপর নাম ‘বজ্র’। মন সহজচক্রে প্রবেশ করিলে দেহ বজ্রের দ্বায় কঠিন ও অবিনাশী হয়। ইহা প্রাপ্ত হইলে সাধক—

স্বয়ং দেবী স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিবঃ স্বয়ং গুরুঃ।

স্বয়ং ধ্যানং স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্ব্বত্র দেবতা ॥^১

হইতে পারেন, তখন যোগ, মন্ত্র, উপাসনা, স্নানাদির প্রয়োজন থাকে না, (অকুলবীরতন্ত্র ১৬-২০), সাধককে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি পৃথিবীতে বাস করিয়াও দক্ষবীজের দ্বায় নিষ্কল বা মূলহীন বৃক্ষের দ্বায় নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এইরূপ যোগীর পক্ষে—

১। অকুলবীরতন্ত্র, ৩০-৩৪ শ্লোক, কোলজ্ঞাননির্ণয় গ্রন্থে উক্তব্য।

ন তস্তু মাতাপিতা বা বান্ধবং ন চ দেবতা ॥৪২
 ন যজ্ঞং নোপবাসঞ্চ ন ক্রিয়া বর্ণভেদকম্ ।
 তাস্তু বিকল্পসংঘাতম্ অকুলবীর লয়ং গতাঃ ॥৪৩
 ন জপো নার্ত্তনং স্নানং ন হোমঃ নৈব সাধনম্ ।
 অগ্নিপ্রবেশনং নাস্তি হেমস্তভৃগুনোদনম্ ॥৪৪
 নিয়মোহপি ন তস্তাস্তি নোপবাসো বিধীয়তে ।
 পিতৃকার্য্যং ন করোতীতি তীর্থযাত্রা ব্রতানি চ ॥৪৫
 ধর্ম্মাধর্ম্মফলং নাস্তি ন স্নানং নোদকক্রিয়া ।
 স্বয়ং ত্যজ সর্ব্বকার্য্যাণি লোকাচারানি যানি চ ॥৪৬

মৎস্তেন্দ্র সম্প্রদায়ের আর একটি পুথিতে (অকুলাগমতন্ত্রম্) ঈশ্বর 'অকুল'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি দ্বারা 'অকুল' প্রাপ্তি হয়। পঞ্চ মকারের আধ্যাত্ম সাধনই প্রকৃত যোগীর সাধন, যাহারা বাহ্য আচরণ করে তাহারা নরকে যায়। যথার্থ ব্রহ্মচারীই 'বাগ্‌দণ্ডী' (বাক্যের উপর যাহার প্রভুত্ব আছে), মনোদণ্ডীই প্রকৃত দীক্ষিত, কর্ম্মদণ্ডীই প্রকৃত বাণপ্রস্থী ও জ্ঞানদণ্ডীই প্রকৃত যতি। বাহ্য আচরণসকল ত্যজ্য।

বাহুমদে রতো যস্ত মৈথুনে মাংসভক্ষণে ।
 তে সর্ব্বের নরকং য'স্তি ইতি সত্যং বচো মম ॥
 নিখাযজ্ঞোপবীতাদিঃ সন্ধ্যায়ত্রিদিগুধৃক্ ।
 যদ্ বাহ্যবিহিতং কর্ম্মং নৈকর্ম্মণি সমাচরেৎ ॥^১

অতএব যথার্থ অধিকারী বাহ্যকর্ম্ম সকলে বিরত হইবেন, ইহাই নাথসম্প্রদায়ের মত। তত্পরি সকল বিষয়ে সমদৃষ্টিভাবাপন্ন হইতে হইবে এবং তত্ত্ববিচারের মূল্য বুঝিয়া আচারাди ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবাপন্ন যোগীই 'অবধূত' নামে প্রসিদ্ধ। অতএব আছে—

বাগ্‌দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ ।
 যস্মৈ তে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদিগৌ মহাযতিঃ ॥^২

অর্থাৎ বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্মদণ্ড এই তিনটি দণ্ড যাহার অধীন, তিনি মহাযতি। গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহের বহুস্থানে এই অবধূত-লক্ষণ বিস্তার করা হইয়াছে, যথা—

১। অকুলাগমতন্ত্রম্ কৌলকতানির্ণয় ত্রষ্টব্য পৃ ৬২, ৬৩ বাগ্‌চী সম্পাদিত।

২। যোগরহস্ত, সোক ২২।

বচনে বচনে বেদা স্তীর্থানি চ পদে পদে ।

দৃষ্টৌ দৃষ্টৌ চ কৈবল্যং মোহবধূতঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥

একঃস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশৈচককরে স্বয়ম্ ।

অলিপ্ত স্ত্যাগভোগাভ্যাম্ মোহবধূতঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥

এইরূপ অবধূতই প্রারম্ভ কর্ম কয় করিতে সমর্থ । সকল মার্গ হইতে অবধূত মার্গ শ্রেষ্ঠ, তাঁহার পক্ষে বেদের কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড নিম্প্রয়োজন, তিনি উভয় বিলক্ষণ যোগমার্গী । এই অবধূত যে নাদমুদ্রা ভাস্মশৈলী উর্নবজ্জোপবীত ধারণ করেন তাহা আধাশ্মা রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা জীবাশ্মা-পরমাশ্মার যোগই ‘মুদ্রা’, অনাহত নাদ ধারণাই ‘নাদ’ ইত্যাদি ।

যাঁহার মাঝাৎ অনুভব হইয়াছে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র মিথ্যা, তিনি ক্রিয়াসিক্ত যোগদেহধারী । অবধূতসম্প্রদায়ে গুরু ৩৬ লক্ষণ ও শিষ্যের ৩২ লক্ষণ থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ উপযুক্ত গুরু এবং তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হওয়া কর্তব্য । অবধূত গুরু অত্যাশ্রমী বা পক্ষমাশ্রমী । নাথশূত্রে আছে, “মহাসত্যস্বরূপমেকাবধূতত্বমেব গৃহীয়াৎ” । এই অবধূতের স্থান দ্বৈতাত্মক উপরিবর্তী, সগুণনির্গুণাতীত, তাই পরমহংসেরা বলেন অবধূতের স্থানই শ্রেষ্ঠ । সগুণ ব্রহ্ম ব্যাপক, নির্গুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপক হইতে পারেন না ; নির্গুণ ব্রহ্ম শক্তিরহিত, অতএব ব্যাপকত্ব ধর্ম তাঁহাতে থাকিতে পারে না । অতএব নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম এই উভয়ের সমন্বয়ে পূর্ণ যে ‘নাথ’ তিনিই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পরমহংস অপেক্ষা অবধূত শ্রেষ্ঠ ।^১

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে—

কচিদ্ ভোগী কচিস্ত্যাগী কচিগ্নঃ পিশাচবৎ ।

কচিদ্ রাজা ক চাচারী মোহবধূতোহভিবীযতে ॥

ইহার অন্যত্র আছে—“সর্বান্ প্রকৃতিবিকারানবধূনোতীত্যবধূতঃ” ।^২ এই অবধূত গুরু, গুরুদেরও গুরু, তিনি পক্ষপাতবিনির্মুক্ত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাকার জ্ঞানশূন্য, তিনি স্বর ও অস্বরের (ও এবং ম) উর্দ্ধে নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, নিকল ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া পক্ষমাশ্রমী হইয়াছেন । দত্তাত্রেয়-কৃত অবধূত-গীতায় আছে—

১। গো. সি. স. পৃ ১, ১৫, ২০, ২৮, ৫১ ৫২, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৭২ ।

২। সি. সি. প. ৩১২০ ।

আশাপাশবিনিম্মুক্তমাদিমধ্যাহ্ননিম্মলঃ ।

আনন্দে বর্ধতে নিত্যম্ 'অ'কারস্তস্মৈ লক্ষণম্ ॥

বাসনা বজ্জিতা যেন বক্তবাং চ নিরাময়ম্ ।

বর্ধমানেষু বর্ধতে 'ব'কারস্তস্মৈ লক্ষণম্ ॥

ধূলিধূসরগাত্রাণি ধূতচিত্তং নিরাময়ম্ ।

ধারণাধ্যাননিম্মুক্তো 'ধূ'কারস্তস্মৈ লক্ষণম্ ॥

তত্ত্বচিত্তা যেন ধূতা চিত্তাচেষ্টাবিবজ্জিতঃ ।

তমোহহঙ্কারনিম্মুক্তঃ 'ত'কারস্তস্মৈ লক্ষণম্ ॥

এইরূপে অ-ব-ধূ-ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ।^১

অবধূতের সাকার-নিরাকার বা ভেদাভেদ নাই, তিনি কেবল দ্বৈতাদ্বৈতবিবজ্জিত শিবকেই জানেন। অবধূত কর্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন, তাঁহার প্রারব্ধ বা এ জন্মের কর্ম নাই, তাঁহার জাগ্রতস্বপ্নশূণ্য বা তুরীয় অবস্থা নাই; তিনি কেবল আত্মাকে জানেন, তাই ধর্মাধর্ম বন্ধমোক্ষ তাঁহার নাই। অবধূত সমবসে মগ্ন, তাঁহার পক্ষে মদ্রও নাই, তদ্রও নাই।^২

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভবে না, যোগ বিনা মোক্ষলাভও সম্ভব নহে, “দেবোহপি বিনা যোগেন ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে”। যোগদেহ পুরুদেহ, অপক ও পুরুদেহ ভেদে দেহ দ্বিবিধ। অপক দেহীর পক্ষে জপ জ্ঞান বৈরাগ্য আদি মিথ্যা, কারণ তিনি ‘শরীরেণ জিতঃ’। যোগদেহধারী স্থূল হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, ইচ্ছারূপ ধারণে সমর্থ, তিনি অজর অমর এবং ত্রিলোকে তিনি ক্রীড়ারত। যেখানে সকলই মরণশীল সেখানে পুরুদেহী যোগী জীবিত থাকেন, তিনি জীবন্মুক্ত। এইরূপ চিন্তামণি এক গুরুর কৃপায় জীবের লয় হয়। ‘অমনস্ক’ আছে অবধূতই সন্মার্গদর্শনশীল, মুমুকুর পক্ষে অবধূত গুরুই কর্তব্য।

কুলাচারবিহীনস্ত গুরুরেকো হি দুর্লভ ইতি ।

বর্ণাশ্রমিত্বমুক্তং নাস্তি বর্ণাশ্রমাচারে সর্বদারন্তপতিত্যাগ ইতি ॥^৩

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহের ষষ্ঠোপদেশে অধিকারী নিরূপণ হইয়াছে, যথা—

নিরূপ্য সর্বং বিষয়মধিকারী নিরূপ্যতে ।

অবধূতো ভবেৎ সোহত্র তল্লক্ষণমিদং যথা ॥

১। অবধূতগীতা ৮-৬-২, গো. সি. স. পৃ ২, ৩০-৩১।

২। ঐ ঐ ১।৬২ ৩০, ১৪, ১৫।

৩। যোগবীজ, অমনস্ক, গো. সি. স. পৃ ৩০, ৫।



নাথমতে অবধূতই যথার্থ অধিকারী, তাই তাঁহার লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে, যথা—অবধূত সর্বাবস্থাভিনিমুক্ত, ভাবময় সূত্র দ্বারা তাঁহার কস্থা নির্মিত, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষ্টবর্জিত, তিনিই ক্ষপণক (সম্যাসী), তিনি শিব ও শক্তির সংযোগকর্তা, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় রূপে তিনি সংযোজনে সিদ্ধ। তিনি মহাবল, উদাসীন মহানন্দময়। তিনি শোক ভয় বীণ্সা (ব্যাপ্তি, পুনঃ পুনঃ ঘটন) দ্বারা অবিচলিত। আনন্দপূর্ণ হইয়া তিনি নিজবোধে লীন হইয়া থাকেন।^১

সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতিতেও সিদ্ধযোগীর উক্তরূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—তিনি পরিপূর্ণপ্রসন্নাত্মা সর্বাসর্বপদোদিত অর্থাৎ ব্যক্ত বা ‘সর্ব’ এবং ব্যক্তাতীত বা ‘অসর্ব’ (immanent and transcendent) এই উভয় অবস্থার উপরিবর্তী অবস্থায় মগ্ন, তিনি শাস্ত্র উদাসীন ধীর স্বস্থ মহানন্দময় সিদ্ধ যোগিরাট্।^২

অবধূতকে ‘পঞ্চমাশ্রমী’ আখ্যাও দেওয়া হয়। অর্থাৎ চতুরাশ্রমের অতীত যে পঞ্চমাশ্রম, অবধূত সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন।

আত্রক্ষাস্ত্রপর্ধ্যাস্ত্রং সম্পূর্ণঃ পরমাশ্রমি।

ভিন্নে ভিন্নং ন পশ্যামি তস্যাহং পঞ্চমাশ্রমী ॥^৩

ইহাই অবধূতের লক্ষণ। নাথমার্গে এইরূপ লক্ষণযুক্ত যোগীকে পূর্ণ অধিকারী বলা হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সিদ্ধি ও যোগপথে সিদ্ধির স্থান

সিদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে, উহা সিদ্ধযোগীর অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। এই সিদ্ধি কি? আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সিদ্ধির স্থান কোথায়? সিদ্ধির সার্থকতা কি? কোন্ সময়ে সিদ্ধি সাধনের বিঘ্নস্বরূপ হয়?—এই সকল তথ্য বিবেচ্য। প্রথমতঃ সিদ্ধি কি? উত্তরে বলা যায়—উহা একপ্রকার ‘বিশেষ শক্তি’। জ্ঞানলাভের দ্বারা সিদ্ধি করতলগত হয় না, ‘মহাজ্ঞান’ লাভ হইলে যে শক্তি লাভ হয়, তাহাই ‘সিদ্ধি’ নামে খ্যাত। বহুদিন মাটির নিম্নে আবদ্ধ থাকা, শূন্য উত্থান প্রভৃতি প্রকৃত সিদ্ধি নহে। যে সকল যোগী সাধারণের মধ্যে এই সকল ক্রিয়া বা ভেলুকা প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধযোগী নামে খ্যাত হন, তাঁহারা বাস্তবিক আধ্যাত্মিক সাধনার অতিনিম্ন স্তরেই অবস্থিত। অনেকের বিশ্বাস, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ যোগের বিঘ্ন উৎপাদন করে। বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুর ‘সং’ ও ‘অসং’ ব্যবহার আছে—যেমন অগ্নি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু শিশুর পক্ষে অগ্নিস্পর্শ হানিকর। অগ্নি আপন স্বভাবানুসারেই কার্য্য করে, কিন্তু ব্যবহারের গুণে উহার ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যে ব্যক্তি বস্তুর স্বভাব জানিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপন অভিষ্ট সিদ্ধ করে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এইরূপে যোগ সাধন দ্বারা লভ্য শক্তিরও সং ও অসং ব্যবহার আছে। যে যোগী সিদ্ধির অপব্যবহার করেন না, তিনিই ধন্য। তাঁহার পক্ষে সিদ্ধি সাধনের বিঘ্নস্বরূপ হইতে পারে না, উপরন্তু তিনি লোককল্যাণার্থে সিদ্ধির ব্যবহার করিলে উহার সার্থকতা স্বীকার করিতেই হইবে। পরমেশ্বরেও ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি আছে, অতএব পরমেশ্বর-প্রার্থীর নিকট সিদ্ধি অনুকূল ও কৈবল্য-প্রার্থীর নিকট উহা প্রতিকূল বিবেচিত হয়।

যোগভাষ্যে দুইটি পথের কথা আছে—একটি অন্তরায় ও অন্টী সহায় স্বরূপ। “স এব মুক্তঃ স এব ঈশ্বরঃ”—অর্থাৎ পরমেশ্বর সদা মুক্ত হইয়াও সদা ঈশ্বর বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই ঐশ্বর্য্যযুক্ত অবস্থাই সিদ্ধির লক্ষণ। যে যোগী ‘কৈবলী’ হইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে সিদ্ধি যোগের

অন্তরায় স্বরূপ, কারণ সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ নিগুণ, কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে আছে, তাহার দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয়। কেবলী যোগী প্রকৃতিকে বা সিদ্ধিকে ত্যাগ না করিলে নিগুণ পুরুষকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। সাংখ্যমতে ইহাই নির্দ্ধারিত হইলেও যোগমতে উহা প্রকৃত তত্ত্ব নহে। যোগের দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিচার করিলে “তিনি সদামুক্ত হইয়াও সদা ঈশ্বর”—এই ভাষ্য দ্বারাই সিদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব ভগবানে যে ঐশ্বর্য আছে, মানবের পক্ষে তাহা লাভ করা কঠিন হইলেও উহাকে অন্বেষণ বলা চলে না। ঐশ্বর্য বা বিভূতি অর্থে আভ্যন্তরিক চৈতন্যশক্তির বিকাশ ও সর্বাত্মত্বের সহিত তাহার যোগ, অতএব যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ অবশ্যস্বাবী, যথা জৈন আচার্যগণ, বুদ্ধদেব, পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সিদ্ধি। কিন্তু অল্পপুঙ্ক্ত কারণে সিদ্ধি প্রদর্শন অকর্তব্য, এই নিমিত্ত বুদ্ধদেব আনন্দকে ভৎসনা করেন।

পাতঞ্জল যোগেও অষ্টসিদ্ধির কথা আছে—অপিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব; ইহারা অষ্ট ঐশ্বর্য নামেও খ্যাত। এই সিদ্ধিসকল সাধনসাপেক্ষ, অবশ্য কাহারও কাহারও জন্মগত অধিকার বা স্বপ্নাদিতে মস্তাদি প্রাপ্তিও ঘটে। যোগী ইচ্ছামত অণু, লঘু, মহান্ হইতে পারেন, দূরস্থ ভ্রবোরও ইচ্ছামাত্র স্পর্শ বা প্রাপ্তি ঘটেতে পারে। প্রাকাম্য অর্থে ইচ্ছার অনভিঘাত, ভৌতিক পদার্থের বশকারী হওয়া ‘বশিত্ব’, এবং সঙ্কল্প দ্বারা ভূত ও ভূতপ্রকৃতি সকলের যথাসঙ্কল্পিত অবস্থায় অবস্থান ‘যত্রকামাবসায়িত্ব’ নামে খ্যাত। পূর্বপূর্বাপেক্ষ শেষগুলি উত্তম ঐশ্বর্য, সর্বশেষ ঐশ্বর্যের মধ্যে পূর্বের সমস্ত সিদ্ধিই বর্তমান রহিয়াছে। সাংখ্যমতে হিরণ্যগর্ভ দেবের সঙ্কল্পে এই জগতের অবস্থিতি, ইহাই অষ্টম ঐশ্বর্যের উদাহরণ। যোগিগণ এই সিদ্ধি লাভ করিয়াও পূর্বসিদ্ধির সঙ্কল্প বিপর্যয় সাধন করেন না বলিয়া জগতে বিপর্যয় ঘটে না। অথবা বিপর্যয়ে প্রাণিহিংসা অবশ্যস্বাবী বলিয়া যোগীরা উহা হইতে বিরত থাকেন। ঈশ্বর সঙ্কল্পের বিপর্যয় অকর্তব্য কিন্তু ঈশ্বর সঙ্কল্প মুক্তপদার্থে যথোচিত শক্তিপ্রয়োগ করিতে যোগীরা সক্ষম।^১

বৌদ্ধশাস্ত্রে ষট্ অভিজ্ঞার কথা আছে—দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ

পরচিন্তাজ্ঞান, জ্ঞাতিস্বরতা, শত্রুদমনক্ষমতা, ঋদ্ধি (লোকাত্তীত শক্তি), ইহারা ষট্ দৈবশক্তি।^১

উপর্যুক্ত অষ্টসিদ্ধি ব্যতীত গৌণ সিদ্ধি দশপ্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা—অনুশ্মি (শোক, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণারূপ উশ্মি হইতে দেহকে মুক্ত রাখা), দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, মনোজব-সিদ্ধি (মনোবেগে যথেষ্ট গমন), কামরূপসিদ্ধি (যথেষ্ট রূপ ধারণ), পরকায়-প্রবেশ, (শব্দর-বৃত্তান্ত সর্বজনবিদিত), স্বচ্ছন্দমরণ (ভীষ্মের স্বচ্ছান্মৃত্যু), দেবকীড়ানুদর্শন, যথাসম্বল সিদ্ধি, অপ্রতিহত গতি এবং আজ্ঞা (যোগীর অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা)।

ক্ষুদ্রসিদ্ধি পঞ্চপ্রকার,—ত্রিকালজ্ঞতা, অবদম্বতা (শীতোষ্ণ ইত্যাদি জয়), পরচিন্ত-অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্টেস্ত (অগ্নি প্রভৃতির কার্য্যকরী শক্তি রোধ), অপরাজয়।

গোরখবাণী গ্রন্থে ২৪ সিদ্ধির বর্ণনা আছে, পূর্বোক্ত অষ্টসিদ্ধি ব্যতীত শীতোষ্ণাদি-রাহিত্য, পরকায়-প্রবেশ, সূর্য ও জল বশীকরণ, দূর শ্রবণ, দূরদর্শন, সর্বদেবতার রূপধারণ, সর্বদেবতার সহিত ক্রীড়া, ভূত-ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি ষোড়শ সিদ্ধি সহ ২৪ সিদ্ধির বর্ণনা আছে।^২

ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ৩৬ সিদ্ধির উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। মস্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মানসিক শক্তির বিকাশ হয় ও সিদ্ধি লাভ হয়, কারণ শব্দে শক্তি নিহিত আছে, তাই তন্ত্রে বাক্যকে ‘অমরবাক্’ বলা হয়, ইহার নাশ নাই। সৃষ্টির আদিতে বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে চরাচর জগতের প্রভাবের উৎপত্তি হয়। অতএব মস্ত্রোচ্চারণ দ্বারাই ভাল বা মন্দ প্রভাবের উৎপত্তি হয়।^৩

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে ধ্যান ও মস্ত্রোচ্চারণের দ্বারা বিভিন্ন শক্তিলাভের কথা আছে, যথা—

ক। পাশস্তোভম্ (কুদৃষ্টিরোধ), নিগ্রহানুগ্রহম্ (পরের ইষ্টানিষ্ট সাধন), ক্রামণম্ (পরকায়-প্রবেশ), হরণম্ (হরণক্ষমতা), প্রতিমাজলনম্, (প্রতিমাকে কথা কওয়ান), ঘটপাষণফোটনম্ (ঘটপাষণাদি ভগ্ন করিবার ক্ষমতা)।

১। সমাধিসাধন ও বিভূতিলভ, বিজয়াস দত্ত, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২২

২। গোরখবাণী, বড়পাণি পৃ ২৪৮

৩। শক্তিকা স্বরূপ, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, শক্তি অঙ্ক কল্যাণ পৃ ২৩২

খ। মারণ (অন্যকে মারা), স্তম্ভ (থামান), আকৃষ্টি (আকর্ষণ করা), বশম্।

গ। সর্বজনপ্রিয়তা, ব্যাধিহরণ-ক্ষমতা, কবিত্ব ও বক্তৃতা শক্তি, দূরশ্রবণ।

ঘ। দীর্ঘায়ুলাভ, অজরত্বলাভ, জিহ্বা দ্বারা অমৃত পান ইত্যাদি।^১

গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে (পৃ ২০) উক্ত হইয়াছে, তাত্ত্বিক অনুষ্ঠান “সংফলমপি যোগ এব”। ইহা দ্বারা যোগফল যে সিদ্ধি তাহা স্পষ্ট বর্ণিত না হইলেও, কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ধ্যান ও যোগফল দ্বারাই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সিদ্ধি যে যোগীর পক্ষে বিদ্বৎস্বরূপ, তাহা বলা চলে না, মধুমতী ভূমির আকর্ষণই যোগীর পতনের কারণ হইতে পারে। যোগীকে দেবতারাও এই স্তরে প্রলোভন দেখাইয়া পরীক্ষা করেন, জরামৃত্যুনাশকারী রসায়ন, আকাশগামী যান, কমনীয়া কন্যা প্রভৃতি প্রলোভনের পদার্থ যোগীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত যোগী প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়জয়ী হন এবং বজ্রোপম সিদ্ধদেহ লাভ করেন। তখন অষ্টসিদ্ধি যোগীর করতলগত হয়, যোগীর সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ক্ষমতা জন্মায়। ‘অস্মিতা’ তবে প্রতিষ্ঠিত যোগী সর্বজ্ঞ ও জীবমুক্ত হন। ইহার পর যে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগভূমি।^২

যোগজ সাধন ফল

ইতিপূর্বে মধুমতী ভূমির কথা বলা হইয়াছে, ইহা প্রকৃত-পক্ষে যোগীর যোগসাধনের দ্বিতীয় স্তর। প্রথম অবস্থায় যখন যোগীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবর্তিত হয়, তাহাকে প্রথমকল্পিক বলা হয়। তৎপরে মধুমতীর প্রলোভন জয় করিয়া যোগী তৃতীয় বা প্রজ্জাজ্যোতি ভূমিতে পদার্পণ করেন। প্রজ্জা বা জ্যোতি লাভই যোগীর পক্ষে সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি অর্থে শক্তি, ইহা যোগীকে স্বীয় সাধনার দ্বারা লাভ করিতে হয়। ‘নাস্তি যোগসমং বলম্’, কিন্তু যোগীর সমাধি জ্যোতিলাভের জন্ম, ইহার নিমিত্ত শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি প্রভৃতির প্রয়োজন। এই ‘জ্যোতি’ই যোগীর অঙ্গস্বরূপ, ইহা লাভ হইলেই যোগীর প্রসর

ও সঙ্কোচের ক্ষমতা জন্মে, তাঁহার পক্ষে পৃথিবীতে অলভ্য কিছু থাকে না। অগ্নিমা-লঘিমাদি তাঁহার নিকট ক্রীড়ার সমান হইয়া পড়ে। যোগী ভূততত্ত্বকে জয় করিয়া জল, অগ্নি, ইষ্টক-প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া গমনে সমর্থ হন। তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে যোগজ সাধন ফলরূপে এই সকল সিদ্ধিলাভ অনিবার্য, কারণ তত্ত্বমতে শিবের সহিত চিৎশক্তি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করেন, অতএব শিবহলাভে শক্তিলাভ অবশ্যস্বাভাবী। এই স্থলেই সাংখ্যের সহিত তত্ত্বের ভেদ, সাংখ্যের প্রকৃতিতে যে শক্তি আছে, তাহা জড়শক্তি, তাহাকে ত্যাগ না করিলে সাংখ্যের পুরুষকে লাভ করা সম্ভব নহে, কিন্তু তত্ত্ব শক্তিত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে না, —শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় অভিন্ন।

চলে বাতে চলৎ সর্বং নিশ্চলে নিশ্চলং তদা।^১

অর্থাৎ বায়ু যে পর্য্যন্ত পরিবাহিত থাকে তাবৎ দৈহিক সমস্ত ক্রিয়া চলিতে থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে শারীরিক ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। যোগী ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া কষ্টসাধ্য প্রাণায়াম সাধন করিয়া বায়ুকে স্থির করেন। এইরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া যোগী যে সমাধিতে মগ্ন হন, তাহা সর্পাদির শীতনিদ্রার তুল্য। ইন্দ্রিয়াদি সংযমের ফলে যোগীর দেহ কাস্তিমান্ হয়। “সমানজয়াজ্জলনম্”—জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া প্রজ্জ্বলিত হন।^২ অর্থাৎ সমান নামক প্রাণের দ্বারা সর্বশরীরে অন্নরসের সমনয়ন বা যথাযোগ্য পোষণ হয়, তাহা দ্বারা শরীরের তেজ বৃদ্ধিত হয়, ফলে যোগী প্রজ্জ্বলিতের ন্যায় দৃষ্ট হন। (অধুনা এই তেজ বা aura-র চিত্র গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যনির্ণয় চেষ্টা চলিতেছে।^৩ মানবদেহে একটি স্বাভাবিক তেজ আছে।) যোগীর দেহে যোগসাধন-ফলে সাম্বিকতা বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্বাভাবিক তেজ ‘স্বতঃ’প্রকাশিত ও দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাই যোগী ও সাধারণ মানব মধ্যে ভেদ।

ট্রাটক যোগ অর্থাৎ নিজের স্থির শরীরে জ্যোতিঃপূর্ণ ধাতুময় শিব-মূর্ত্যাদি দর্শন করিয়া যখন যোগীর শক্তিবৃদ্ধি হয়, তখন দৃষ্টিবিজ্ঞান দ্বারা দৃকশক্তি বর্জন ও সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনাদি করিতে যোগী সমর্থ হন। নিদ্রাতন্দ্রাদিও তাঁহার বশীভূত হয়। মনঃস্থৈর্য্যের নিমিত্ত স্বীয় নাসাপ্রদর্শন, দেবচক্ষু

১। গো সং ১।২৪৩।

২। যোগতত্ত্ব ৩৪০ এবং ভাট।

৩। Whitaker's Almanac 1912, p 746. Ref. in পাতঞ্জল-যোগদর্শন পৃ ২৪৮।

করিয়া স্বীয় ললাটে বিন্দুদর্শন প্রভৃতিও যোগী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। গর্ভবাসকালে চিন্তের দৃঢ়তাই শরীরকে অবিকৃত রাখে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।^১ যোগীর পক্ষে দৈহিক সন্তাপ স্বল্প হওয়ায় তিন-চারি মাস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকা বিচিত্র নহে। সামান্য অন্নজানবায়ুই যোগীর পক্ষে যথেষ্ট, ইহাও সর্পাদি জাতির তুল্য। এইরূপে অনাহারে থাকিয়া, কৌশলে প্রাণক্রিয়া রোধ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে যোগীদের অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের কাহিনী Statesman, Illustrated Weekly প্রভৃতিতে বিবৃত হয়, ইহা কিন্তু প্রকৃত যোগজ সাধনের ফল নহে। রণজিৎ সিংএর রাজত্বকালে হরিদাস যোগীর কীর্তিকলাপ ভারতের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কথিত আছে, তৎকালীন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিরাও এ বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত পত্রাদি লেখেন। হরিদাস মৃত্তিকানিয়ে সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন, জলের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেন, চক্ষু বন্ধ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন, ইত্যাদি। তাঁহার বারম্বার পরীক্ষার সাফল্যে লাহোরের গৃহে গৃহে মঙ্গলবাচ্চ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। দেহত্যাগকালে সমাধিমগ্ন হইয়া হরিদাস মহানিদ্ৰা প্রাপ্ত হন। শান্তিপুরের বিশে পাগলাও জাহ্নবীতীরে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে যোগনিদ্ৰায় মগ্ন হন।^২

কটকশয্যায় শয়ন, শূন্যে উত্থান প্রভৃতির বিবরণও ছুপ্রাপ্য নহে। স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (ভা উ স, ১ম ও ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। শরীরে আকাশ কল্পনা দ্বারা আকাশগতি হয়, লঘুভাবের ভাবনা দ্বারা লঘু হইয়া সম্পাদিত হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে ৪০ জন শূন্যে উত্থানের নিমিত্ত সেন্ট পদবাচ্য হইয়াছেন। বৌদ্ধেরা ইহাকে উদ্বেগাপ্রীতি বলেন। প্রসিদ্ধ মিডিয়ম হোম সাহেবও শূন্যে উঠিতেন। যোগসূত্রে (৩।৪২) ও তাহার ভাষ্যে কায় ও আকাশ সম্বন্ধে সংযম হইতে লঘুতা আকাশগমনাদি ফলের বর্ণনা আছে। কুস্তক বা বায়ুস্তম্ভন ও মস্তজপ ক্রিয়াদ্বারা আকাশগতি হয়। ‘আকাশ’ শব্দ গুণ-বাচক, অতএব শরীরব্যাপী অনাহদ নাদ ভাবনা দ্বারা কায়াকাশ ভাবনা-সিদ্ধ হইয়া আকাশগতি হয়। যোগ ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও শরীর লঘু হইতে পারে।^৩ শরীর-মধ্যে বায়ুনিরোধ দ্বারা যোগী স্বদেহ শূন্যে

১। পাতঞ্জলযোগদর্শন, বেদান্তবাসীশ, ‘অবতরণিকা’ দ্রষ্টব্য। ১৩২৬ সং

২। হিন্দুজাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী, প্রবন্ধপাঠ পৃ ৩৬-৪২ ভা উ স, ১ম খণ্ড পৃ ১২০।

৩। পাতঞ্জলযোগদর্শন, পৃ ২৪১ দ্রষ্টব্য।

উত্থিত করিতে পারেন। খেচরীমূত্রাসাধনে বহুদিন পর্য্যন্ত বায়ুর বেগধারণ সম্ভব হয়। চতুর্বিংশতি বৎসর এই সাধন করিলে রক্ত শুভ্রবর্ণ হয় ও ক্ষুধাতৃষ্ণাজয় হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মহাভারতের মন্তনক শ্বষির আখ্যায়িকা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাধনদ্বারা দিব্যচক্ষু বা শিবনেত্র উন্মীলন হওয়া বিচিত্র নহে। ললাটকেন্দ্র পঞ্চতন্ত্রের মিলনস্থান, অতএব শিবনেত্রের উন্মেষে ললাট হইতে অগ্নি বা বারি নিষ্ক্রমণ অসম্ভব নহে। বিরাটমধ্যে যে আত্মমণ্ডলের ত্রিপুরী আছে, এই ত্রিনেত্র তাহারই প্রতিবিম্ব। শিবনেত্রের সম্বন্ধে ব্রহ্মমণ্ডলের সহিত, দক্ষিণনেত্রের সম্বন্ধে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত এবং বামনেত্রের সম্বন্ধে চন্দ্রমণ্ডলের সহিত। শিবনেত্র হইতে জ্ঞান, দক্ষিণনেত্র হইতে ইচ্ছা ও বামনেত্র হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। দিব্যচক্ষুর উন্মেষে জ্ঞান ও শক্তিদ্বারা ক্রিয়া করা সম্ভব হয়, যথা—ভবিষ্যদর্শন, দেবদর্শন, আয়ুবুদ্ধি ইত্যাদি।

শিবনেত্র উন্মীলনের পূর্বে যোগীর ঘণ্টানিনাদ শ্রবণ, দৈববাণী শ্রবণ, সম্মুখে উপাস্ত্রের আবির্ভাবাদি ঘটে। ললাট মধ্যে জ্যোতি দর্শন ও ভূতভবিষ্যৎ দর্শন সম্ভব হয়। দশম শতাব্দীতে তিব্বতে গুরু পদ্ম সম্ভবের আকাশগমন, সূর্য্যারশ্মিতে আরোহণ, পর্ব্বত ভেদ করিয়া গমন প্রভৃতি ১৫টি সিদ্ধিকথা প্রচলিত ছিল, তিনি ২৫ জন শিষ্যকে স্বীয় সিদ্ধি সকল অর্পণ করেন। তিনি অত্যাধি অক্ষয় তারুণ্যময় দেহে লামাধর্ম প্রচার করিতেছেন, তিব্বতীদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।^১

মহাভারতের শাস্তিপর্বে ‘শূলভা’ নামক সন্ন্যাসিনীর কথা আছে, তিনি উপযুক্ত পতি অভাবে পাণিগ্রহণ করেন নাই, উপরন্তু জনক রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ‘শবরী’ নামক শ্রমণার উপাখ্যান আছে, তিনিও উদ্ধাহত্রে আবদ্ধ হন নাই, রামদর্শনে চরিতার্থ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। শকুন্তলা বৈখানস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পাণিগ্রহণে বিরত থাকিবেন কি না, এই প্রশ্ন ছদ্মস্ত শকুন্তলার সম্বোধনকে জিজ্ঞাসা করেন। অতএব তৎকালে জ্বীলোকেও যোগধর্ম অবলম্বন করিতেন ইহা স্পষ্ট। শূলভার পরকায়-প্রবেশ সিদ্ধি ছিল।

মহাভারতের বিজয়ের যোগবলে দেহত্যাগ ও সৌভরি নামক মুনির যোগবলে ‘কায়বাহ’ সৃষ্টিদ্বারা মাঙ্কাতার কন্যাগণকে বিবাহের

কথা সুবিদিত। এগুলি যোগজ সাধনফলের উদাহরণ। শঙ্করের অমরক রাজার দেহে প্রবেশের কথাও সুবিদিত।^১ পরকায়-প্রবেশ বিজ্ঞা ভারত হইতে লামা মারপা কর্তৃক তিব্বতে প্রচলিত হয়।^২ মাধবীর শঙ্করবিজয়ে উল্লেখ আছে, শঙ্কর অমরক রাজার দেহে প্রবেশের সঙ্কল্প জানাইলে, তংশিয়া পদ্মপাদ তাঁহাকে মংস্ত্রোল্লের কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বিরত হইতে বলেন, কিন্তু শঙ্কর অটল থাকেন। এই গ্রন্থ পরবর্তী কালে রচিত, অতএব নির্ভরযোগ্য নহে, অর্থাৎ ইহা দ্বারা মংস্ত্রোল্লকে শঙ্কর-পূর্ববর্তী বলা চলে না।

হোসেন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা দৃশ্য পদার্থকে অদৃশ্য করিতে ও অপূর্বদৃষ্ট বস্তুকে আনয়ন করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। ভাস্করানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতিও বহু সিদ্ধি দেখাইতে পারিতেন। জনৈক সাহেব যোগীর ব্যাঘ্র নিহত করার ও কাল্পনিক ব্যাঘ্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইবার বৃত্তান্ত Statesman পত্রিকায় বাহির হয়।^৩

জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ইংরাজ মহিলা স্বীয় সাধনবলে একটা লামামূর্তি সৃজন করেন, তিনি স্বয়ং এবং অন্তেরাও সেই মূর্তি দেখিতে পাইতেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মহিলাটির মতে thought form ও সত্যকার আকার ধারণ করিতে পারে। দেহাগ্নি দ্বারা শরীরকে উষ্ণ রাখাও তিব্বতীদের বিশেষ সাধনফল। এই সাধন দ্বারা রক্তকণিকা ক্রমশঃ ষ্ণেতপদার্থে পরিণত হয়। ইহার নিমিত্ত প্রাণায়াম, সংযম, গুরু শক্তিপাতের আবশ্যক।^৪ ইতিপূর্বে বর্ণিত গোরক্ষনাথ ও অল্লাম প্রভুর কায়সিদ্ধির পরীক্ষার জায় সম্প্রতি একটা দৈনিক পত্রে একটা সংবাদ বাহির হইয়াছে।

“Man Who Cannot Be Killed”

London, Oct. 27—“He has been stabbed 500 times with sword, rapier and dagger, immersed in boiling water, shot through the brain and given deadly poison.” That is the brief resume of the career of Mirin Dajo, a young Dutchman who is described as “the man who cannot be killed.”

১। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ, রাঃ ঘোষ—পৃ ১৪২ (১৪৪৮)

২। With Mystics & Magicians in Tibet, p 275

৩। ষাট্রিশং উপনিষৎ, রাঃ ঘোষ (১৮০১) ভূমিকা ৭৬।

৪। With Mystics & Magicians in Tibet, pp 80, 81, 275, 284, 198-200.

To show his powers, Dajo gave a "demonstration" at Zurich before a medical and Press audience, during which he allowed himself to be run through the chest with a four-foot sword's blade entering his heart. Then he walked into an adjoining room for an X-ray examination. When the sword was pulled out, the observers testified that he had not lost a drop of blood, although his body was scarred. The puzzled audience, unable to explain the mystery, reached one unanimous conclusion—that there was no trickery.

Dajo had one hitch at his first public performance at a Zurich theatre—he collapsed when the sword-point struck a bone. After the police had banned the performance, Dajo offered himself for a scientific examination. "Stab me from any angle" was his invitation.—(Globe '.)

ইঠযোগের উড্ডান, জালকর ও মূল বদ্ধত্রয় ও খেচরীমুদ্রা দ্বারা প্রাণরোধ ব্যাপার সম্ভব, ষট্কার্ম সাধনাস্থর কুণ্ডলিনী শক্তিকে দশমদ্বারে রুদ্ধ করিলে শরীর কাষ্ঠবৎ হয়, চিত্তবৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত মোক্ষ বা যোগজ সাধনফল নহে, কারণ সংস্কারক্ষয় বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার ইহা দ্বারা হয় না। এইরূপ সমাধিসিদ্ধিতে জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষও হয় না। অতএব এই সকল সাধনের পরে একাগ্রভূমি সাধনের উপদেশ আছে (যোগশাস্ত্রাবলী গ্রন্থে যোগতারাৱলী শ্লোক ৬, ৭, ১৯ দ্রষ্টব্য)।

যথার্থ সমাধিসিদ্ধি যোগী বিরল। তথাপি স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে স্বপ্নাদিতে ভবিষ্যৎ দর্শনের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব যোগদ্বারা এই সকল আয়ত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পরচিন্তাজ্ঞান প্রভৃতি যোগীর পক্ষে সহজ হইলেও নির্মলচিত্তের আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে,^১ স্থূল দৃষ্টিতে তাহা অদৃষ্টরূপে থাকে মাত্র। যোগী অনাবৃত চক্ষুদ্বারা ত্রিকালদর্শী হন। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র গবাক্ষের তুল্য, গবাক্ষের সম্মুখের দ্রব্য মাত্র আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু প্রজ্ঞা বা জ্যোতিঃসম্পন্ন যোগীর কথা স্বতন্ত্র। ইঠযোগী বা সামান্ত মানবের সহিত প্রকৃত যোগীর শক্তির ইহাই তারতম্য।

১। Morning News, 29 October, 1947.

২। যোগসূত্র ৪।১২, ৩।১৬, সাংখ্যতত্ত্বালোক ৮-১০ (পাঃ যোগধর্ম দ্রষ্টব্য)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরমপদে পিণ্ডলয়—সমরসীকরণ

উপসংহার

নাথপন্থে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া পরমপদে পিণ্ডলয় বা পরমাত্মা ও জীবাশ্মার সামরসাসাধনই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধসম্প্রদায় মাত্র দেহসিদ্ধি বা কায়সিদ্ধিকে প্রথম স্থান দেন, যথা রসেশ্বর সম্প্রদায়, মাহেশ্বর সম্প্রদায় ইত্যাদি নাথসিদ্ধেরাও নিজেদের সিদ্ধ সম্প্রদায় রূপে গণ্য করিতেন। নাথপন্থের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তানুসারে পরমাত্মা কেবল, অর্থাৎ তিনি ভাব ও অভাব উভয়ের পরবর্তী অবস্থা, অর্থাৎ পরমতত্ত্ব অগম, কোন কৌশল দ্বারা বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেখানে পৌঁছান যায় না, কারণ পরমতত্ত্বকে 'ভাব' বলাও যায় না, 'শূন্য' বলাও চলে না। উহা সৎ ও অসৎ বা ভাব ও অভাবের পরবর্তী এবং দ্বৈত বা অদ্বৈত মতের উপরিবর্তী। ব্রহ্মরক্তরূপ আকাশমণ্ডলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, পরমতত্ত্ব এই আকাশমণ্ডলে কথারত বালকের ছায় অবস্থান করেন। তিনি বালকের ছায়, কারণ তিনি পাপপুণ্যহীন, জরামৃত্যুহীন ও কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট। এই নিমিত্ত 'গোরক্ষগোপাল', 'বুঢ়া বাল' ইত্যাদি নামে নাথপন্থে তাঁহাকে সম্বোধন করা হয়। যিনি নাম ও রূপহীন তাঁহার আর কি বর্ণনা হইবে? তাই গোরক্ষবাণীতে উক্ত হইয়াছে—

বসতি ন শূন্যং শূন্যং ন বসতী অগম অগোচর এষা ।

গগন সিম্বর মহিং বালক কোলে তাকা নাব ধরছগে কৈসা ॥^১

'শব্দ' বা 'নাদে'র দ্বারাই ব্রহ্মরক্তে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, তাই তিনি কথারত বালকের ছায়। এই অগম লোকে পৌঁছাইবার পথ অদেখি দেখিবা, দেখি বিচারিবা, অদিসিটি রাখিবা চীয়া।

পাতাল কী গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ড চড়াইবা, তথা বিমল জল পিবা ॥

অর্থাৎ অগোচর যে পরমাত্মা তাঁহাকে দেখিবে, দেখিয়া বিচার করিবে, যাহা আখি দ্বারা দেখা যায় না, তাঁহাকে চিন্তে রাখিবে। পাতালের গঙ্গাকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে, ব্রহ্মদণ্ডে ব্রহ্মরক্তে প্রেরণ

করিবে, সেখানে নির্মল রস পান ঘটে। এই পরমাত্মা সহস্রারে গুণ হইয়া রহিয়াছেন। যোগী কাম-ক্রোধাদি বর্জন করিয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে যে শব্দ উথিত হয়, তাহাতে পরব্রহ্মের উপলব্ধি করেন। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র তাঁহার বর্ণনা করিতে অক্ষম, কিন্তু যোগী তাহার তত্ত্ব অবগত আছেন। শ্রীগোরক্ষনাথ তাই বলিয়াছেন, হে কাজি! তুমি ‘মহম্মদ’ ‘মহম্মদ’ করিও না, কারণ তুমি তাঁহাকে জানো না। মহম্মদের বিচার অতি কঠিন, তাঁহার হস্তে যে ছুরিকা ছিল তাহা জীবহত্যার জন্য ইম্পাত বা লৌহের তৈয়ারী নহে, তাহা শব্দময় ছুরিকা, উহা দ্বারা সংসারের বিষয়-বাসনা ত্যাগ হয়।’

বিষয়-বাসনা ত্যাগ হইলে পরমপদে অবস্থিতি বা পূর্ণসত্যের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই পরমপদ সর্বতত্ত্ব-উর্দ্ধস্থ ও সর্বকারণের কারণ, ইহা যুগপৎ বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোতীর্ণ, ইহাই চরম সাম্যাবস্থা বা নিগূণ-সত্ত্বের ঐক্যভূমি। ইহা দ্বৈত বা অদ্বৈতভাব বিবর্জিত বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত নাথস্বরূপ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ক্রিয়া ও অক্রিয়া উভয়ই স্থিত, শক্তি বা শিবের সামরস্য ইহাতেই দৃষ্ট হয়। নৈরুখান দশামাত্র পরমপদ লাভ নহে, চাকল্যের বিশ্রান্তিই নৈরুখানদশা, ইহা পরমপদে স্থিতির উপায় মাত্র। নৈরুখাদশালাভের পর ‘উন্মদা’ শক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ পরমাবস্থা বা পূর্বব্রহ্মরূপে যে স্থিতিলাভ করেন, তাহাই পরমপদে স্থিতি। সেই পূর্বব্রহ্ম যুগপৎ সাকার ও নিরাকার এবং সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনন্তকারময়। এই পদলাভের নিমিত্ত গুরু-উপদেশ ও পুরুষকারের প্রয়োজন এবং যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁহাকে লাভ করা কর্তব্য।

যোগসাধনের দ্বারা মানবের অপক দেহ পকতলাভ করিলে সেই দেহে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তাই নাথসিদ্ধেরা যোগসাধন প্রণালীর উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। নাথমতে সত্যবিচারে উৎপত্তি বলিয়া কিছু নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতেই উৎপত্তি আলোচ্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পরেও পরব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরব্রহ্ম অনামা ও কার্য্যকারণহীন, তাঁহার পঞ্চশক্তি ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণ হইতে ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব হয়, ষট্‌পিণ্ড হইতেই জীবের আবির্ভাব। জীবের

মুক্তির প্রয়োজন এবং তাহার নিমিত্ত সাধন কর্তব্য। জীবের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত। হইয়া অবস্থান করিতেছেন, জীব সাধনার দ্বারা তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ। এই সাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিবন্ধের 'সাধনা-অংশে' আলোচিত হইয়াছে।

নাথসিদ্ধেরা জগৎপ্রপঞ্চের পরমকারণরূপ শিবের সহিত কারণতারূপ শক্তিকে অভিন্ন মনে করেন। শিবকে পাইতে হইলে শক্তির সাধনা করিতে হইবে, তাই নাথ-সাধনমার্গে কুণ্ডলিনীর সাধন প্রচলিত। শিবের শক্তি মানবদেহে কুণ্ডলিনীরূপে অবস্থান করেন, সহস্রারে শিবের অবস্থান, মানব সাধনার দ্বারা মস্তকস্থ সহস্রদল কমল মধ্যে উহাদের মিলন সাধিত করিয়া ধ্যাত্ব হয়। শক্তি ও শক্তিমান 'অহং-মমেতিবৎ'। এই শক্তি বেদান্তের মায়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদান্তমতে মায়াকে ভাগ করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয়, কিন্তু তন্ত্রমতে শিবকে লাভ করিতে হইলে শক্তিকেও লাভ করিতে হইবে, শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় অভিন্ন। দ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতে ও সগুণের মধ্য দিয়া নিগুণে উপনীত হওয়া ভিন্ন গতান্তর নাই, তাই পরমপদে অবস্থান করিতে হইলে শক্তির সাধনা আবশ্যক। জীব চৈতন্যস্বরূপ, ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি ভেদেই জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, তাই জীবও শিবত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার জ্ঞান জীবের শক্তি সঞ্চয় আবশ্যক। ভারতে প্রাচীন কাল হইতে শক্তিপূজা চলিয়া আসিতেছে, অদ্বৈতাগম-মতে শিব ও শক্তি অভিন্ন, মহাশক্তি তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্বতত্ত্বাত্মক। সিদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দ্বৈত ও অদ্বৈত বিবর্জিত, কারণ দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়ই পরমসত্যের একাংশমাত্র, ইহাই নাথমতের বৈশিষ্ট্য। দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ পদে অবস্থানই মুক্তি, 'ওঁকার' সাধনদ্বারা এই মুক্তি লভ্য। ওঁকার সাধনেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ বা মথানাড়ীর পথ মুক্ত হওয়া একই কথা; এই নিমিত্ত নাথদের মধ্যে হঠযোগের ক্রিয়াসাধন প্রচলিত। কিন্তু মুক্তি একমাত্র লক্ষ্য নহে, মুক্তিসহ সিদ্ধিলাভের জ্ঞান নাথপন্থে বিভিন্ন সাধন আছে। কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্তিতে বা কেবল ব্রহ্মলাভে জীবের মোক্ষ হয় ইহা সর্ববাদিসম্মত। নাথসিদ্ধেরা জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার সংযোগ সাধন করিবার নিমিত্ত কায়ার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন। সিদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে কায়ার বা দেহ মুক্তিলাভের পক্ষে সহায়, আশ্মার অভিব্যক্তির জ্ঞানই শরীর-ধারণ হয়, অতএব শরীর মানবের শত্রু নহে, উহাকে কষ্ট দিয়া

ধর্ম সাধন কর্তব্য নহে, অত্যধিক সুখ বা অত্যধিক ক্লেশ উভয়ই শরীরের পক্ষে অনুপযোগী। তাই গোরক্ষ বলিয়াছেন—

কন্দর্প রূপ কায়াকা মণ্ডণ অবিন্যাস্য উলীচো।

গোরখ কহে স্থণো রে ভৌদ, অরও অমী কত সীচো ॥^১

অর্থাৎ জীবদেহ কন্দর্পের স্থায় স্বতঃ সুন্দর, তাহাকে বৃথা মণ্ডন করিয়া উন্টাই করিয়া কি লাভ? গোরক্ষ বলেন—হে মূর্খ! অরও বৃক্ষকে অমৃত দিয়া কেন সিঞ্চন করিতেছে?

কায়া জরামৃত্যুর অধীন, নাথযোগীরা কায়াকে অজ্ঞর অমর করিয়া বালস্বরূপ রাখিবার প্রয়াসে রসায়নবিজ্ঞার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। গোরক্ষসিদ্ধাস্তসংগ্রহে “রসায়নী মহাবিজ্ঞা সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্”^২ পাওয়া যায়। রসায়নের প্রয়োগে শরীরকে ক্রিয়াকাল অবধি রোগ ও জরা হইতে মুক্ত রাখা যায়, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে বলিয়া নাথযোগীরা উহাকে সিদ্ধিপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না, উহার সহিত যম ও নিয়মের আচরণ কর্তব্য বিবেচনা করেন। ষট্‌কর্মা ও আসন-মুদ্রাদির দ্বারা কালবিজয়ী হওয়া ইহাদের লক্ষ্য। অমৃতপানই মুখ্যতম সাধন কিন্তু “অমাবস কৈধরি কিলিমিলি চন্দা, পুনিম কৈধরি সুর”— অর্থাৎ সহস্রারে অমৃতস্রাবক চন্দ্রমা অবস্থিত কিন্তু তাহার স্রাব মূলাধারস্থিত সূর্য্য গ্রহণ করে বলিয়া চন্দ্রমা খিলমিল হইয়া প্রকাশিত হইলেও অমাবস্তা বিরাজ করিতেছে, তাই গোরক্ষ বলিতেছেন, মীনের মার্গপথে যাও, চন্দ্রের বিরোধী ভান্নকে চন্দ্রের সন্মুখীন কর এবং এইরূপে অমৃত রসাস্বাদন কর, তাহা দ্বারা কালজয়ী হইবে। মীন বা মংস্ত্র নদীর ধারার বিপরীত গতিতে গমন করে, কিন্তু নদীর জলের মধ্যে সে সংবাদ কেহ রাখে না, যোগমার্গও এইরূপ গুপ্ত।^৩

শিবসংহিতাতেও আছে, “মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশসংযুতঃ। পীষ্মরশ্মিনির্ঘাসঃ ধাতুশ্চ এসতি ক্রবম্”^৪ তাই সূর্য্যমার মধ্যবর্তী চিত্রানাড়ীর সহায়ে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নীত করা ও অমৃতপান যোগিজ্ঞানের সাধন। এই সাধনপথে বিন্দুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার

১। নাথপন্থমে যোগ, পীতাখর দত্ত বড়পাল, কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৭০১।

২। গো. স. স. পৃ ৪৫ কল্পদামাল রসসাধন প্রণালী।

৩। গোরক্ষবাণী—গোক ১৪, ১১৫ বড়পাল।

৪। যোগাশ্রমি, পৃ ৯৪; শিবসংহিতা ২।১০, ১১ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত (১৯২১)

উপদেশ নাথমার্গে বারম্বার পাওয়া যায়। গোরক্ষ বলিয়াছেন, বজ্রোন্মী মুদ্রাসাধন করিতে যে অমরোলী রক্ষা করে, অমরোলী সাধনে যে বায়ুকে রক্ষা করে, ভোগ করিয়াও যে বিন্দুকে রক্ষা করে, সে-ই গোরক্ষের ভাই অর্থাৎ সমকক্ষ।^১ অগ্নির সম্মুখে পারদ রাখার স্থায় এই পরীক্ষা অতীব কঠিন। অন্তঃপ্রাণ ও মৎস্তোজ্ঞের পতনে গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

গুরুজী এসা কাম ন কীজৈ । জাতে অমী মহারস ছীজৈ ।

নদীটিগ বিরখা, নারী সঙ্গ পুরখা

অলপু জীবণুকী আশা ।

মনকী চাল মের খিসত হৈ তাতে কন্ধ বিনাসা ।

অর্থাৎ হে গুরু! এমন কাজ করিও না, যাহা দ্বারা মহারসের নাশ হয়। নদীতীরের বৃক্ষ, নারীর সঙ্গে পুরুষ, তাহাদের বহুদিন জীবনের আশা নাই। মনের অস্থিরতা ও বন্ধনহীনতা হইতে মেরুদণ্ডের ক্ষয় ও জীবননাশ হয়।^২

নাথযোগীর উদ্ধারেরতা হইবার সাধন, অমৃত আশ্বাদনের নিমিত্ত বিবিধ বন্ধ, মুদ্রা ও কুস্তক সাধনদ্বারা প্রাণবায়ুকে সুস্থ্যা অন্তর্গত করা বিধি। শরীরস্থ অসংখ্য লোমকূপ বন্ধ রাখিয়া ও নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া পবন-রোধের নাম ‘বায়ুভক্ষণ’। নাথপন্থে ইহার সাধন অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ইহা দ্বারা বিন্দু স্থির হয় ও অমৃতের আশ্বাদন সম্ভব হয়, আশ্বজ্যোতির দর্শন ঘটে। চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করাই যোগের অন্ততম সাধন, কায়াশোধনের দ্বারা বৃত্তি অন্তর্মুখী হইলেও মনবশ আবশ্যক, মনই কায়ার কেন্দ্রস্বরূপ। মনকে স্থির রাখিবার উপায় ‘অঙ্গপা-জপ’ সাধন বা নাদসাধন। ইহাতে প্রত্যেক শ্বাসের সহিত অদ্বৈত ভাবনা কর্তব্য। এই সাধন মধ্যে যোগীর চতুর্বিধ অবস্থা হয়—আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি অবস্থা।

আরম্ভযোগী নিশ্চল একরসে মগ্ন থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে শরীরের বিচার ও বিন্দুরক্ষা করেন, ঘটাবস্থায় সুখঃখকালাতীত হইয়া যোগী অমর বারুণী পান করেন। পরিচয় অবস্থায় যোগী উন্মাদ সমাধিতে ক্রীড়ারত থাকেন, ইচ্ছানুসারে পরমতত্ত্বে লীন হন, আবার অষ্টসিদ্ধি দ্বারা

১। গোরক্ষবালী, শ্লোক ১৪১।

২। গোরক্ষনাথ’ ভাঃ সিং পরিশিষ্ট ৯৫খ। কলাগ যোগাক, নাথপন্থে যোগ প্রবন্ধে উল্লেখ।

নানা রূপ ধারণ করেন। নিষ্পত্তি-অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী সমদৃষ্টি হন, তাঁহার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না এবং অগ্নি ও জলে যে রূপ লৌহ শুদ্ধ হয় তদ্রূপ নানা কঠোর সাধনা দ্বারা তাঁহার দেহ শুদ্ধ হইয়া যায় (গোরখবাণী, শ্লোক ১৩৬-১৩৯)। কথিত আছে গোরক্ষনাথ সিদ্ধাসনসহ খেচরীমূড়া সাধন দ্বারা যোগসিদ্ধ হন। নাথসিদ্ধেরা হঠযোগী হইলেও মধ্যমমার্গী, শরীরকে অযথা কষ্ট দিবার তাঁহারা বিরোধী। শরীররক্ষাও কর্তব্য অথচ সে শরীর যেন জীবকে সংসারে আবদ্ধ না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য, তাই নাথপন্থ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধনের উপদেশ দেন।

মৎশ্বেশ্বর গোরক্ষকে উপদেশ দিয়াছেন—

অবধু রহিবা হাটে বাটে রুখ বিরথকী ছায়া

তজ্জিবা কাম ক্রোধ তিন্মা ঠর সংসারকী মায়া ॥

খায়েভী মরিয়ে, অণখায়ে ভী মরিয়ে।

গোরখ কহৈ পূতা সংজমী হী তরিত্র।

ধায়ে ন খাইবা, ভুখে ন মরিবা

অহনিসি লেবা ব্রহ্ম অগিনি কা ভেবং।

হঠ না করিবা পড়ে না রহিবা

যুঁ বোল্যা গোরখ দেবং ॥^১

জালন্ধরের উক্তিতেও আহাৰাদি বিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বনের কথা আছে।^২ আহাৰ-বিহারে সংযম সাধন করিলে মনের চঞ্চলতা নিবারিত হয়। গীতাতেও “যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কৰ্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগী ভবতি ছুঃখহা ॥” ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা সংসারছুঃখ-নাশের পন্থা নির্দেশিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য ধৰ্ম পালনানন্তর সন্ন্যাস অবলম্বনে কোন মাহাত্ম্য নাই, কালযোগীই কৈবল্যালাভে সমর্থ, ইহা নাথপন্থের মত। নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া দশমদ্বারে সমাধিস্থ হইয়া অমৃতপানরত কালজয়ী যোগী পরমপদে পিণ্ডলয় করিতে সমর্থ হন। ইহার জ্ঞাত যে শক্তি লাভের প্রয়োজন তাহা বার্লুকো লাভ করা সম্ভব নহে, কারণ তখন শরীরস্থ নাড়ী সকল শিথিল হইয়া যায়। অতএব অপক দেহকেই সাধনদ্বারা পক করিতে হইবে। গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, “বায়ু, জীবন, শরীর ও বিন্দু

১। নাথপন্থমে যোগ, কল্যাণ যোগাঙ্ক

২। ঐ ঐ

সবই কাঁচা আছে, তাহারা কিরূপে পাকিবে? কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কাঁচা অগ্নিতে নীর থাকিতে পারে না। হে দেবি, বায়ু, জীবন, শরীর ও বিন্দু পক হয় যখন ব্রহ্মাগ্নি অখণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাগ্নি বা যোগাগ্নি সিদ্ধ হইলে জলময়ী প্রকৃতি জলিয়া উঠেন।^১

নাথপন্থে নিরঙ্কর বিপ্র ও গৃহস্থ যোগীর সঙ্গত্যাগ কর্তব্য, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে একরূপ বাণী উচ্চারণ কর্তব্য বিবেচিত হয় (গোরখবাণী, শ্লোক ২৬১, ২৬৩)। গোরক্ষ বলিয়াছেন—

শব্দ হমারা খরতর খাড়া রহণি হমারী সাচী।

দেখৈ লিখী না কাগদ মাড়ী সো পত্ৰী হম বাচী ॥

মন বাধুগা পবন স্থা পবন বাধুগা মন স্থা।

তব বোলৈগা কোবত স্থা ॥^২

অর্থাৎ নাথদের উচ্চারিত শব্দ খাড়ার স্থায় এবং রহণিও তাহার অনুরূপ। তাহারা পরমাত্মা প্রেরিত সেই পত্র পড়িয়াছেন যাহা লেখাও হয় নাই, কাগজেও নাই। যখন মন ও পবন একত্রে বাঁধা পড়িবে, তখনই অনাহদ নাদের (কোবত = শক্তি) উচ্চারণ হইবে।

এই সংসারপাশে আবদ্ধ জীবের পক্ষে কুণ্ডলিনী উদ্ধারকর্ত্রী, যোগসাধন দ্বারা তাহাকে মণিপূরচক্র হইতে বা মূলাধার হইতে উত্তীর্ণ করিয়া পশ্চিমমার্গে অর্থাৎ সুষুম্নামার্গে নীত করিতে হইবে। “নাথ কহে মেরা ছুছো পন্থ পূরা” অর্থাৎ নাথমতে ‘যত’ ও ‘সত’ বা শারীরিক সংযম ও হৃদয়ের দৃঢ়ভাব উভয় পন্থাই পূর্ণ হইয়াছে,—একটি তাহার ক্রিয়া, অষ্টটি রহণি; যে রহণি স্থায়ী তাহাই নাথের গুরু, দর্শন (কুণ্ডল), তাহার পিতামাতা, ইহার ভেদ যে জানে সে স্বয়ং কর্তা, স্বয়ং দেব। যে নাসাত্রে বা ক্রমধ্যে দিনরাত দৃষ্টি স্থির করিতে পারে তাহার গমনাগমন মিটিয়া যায়, গোরক্ষ এইরূপ বলেন। এইরূপ যোগীর ‘সমরসীকরণ’ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই পরমপদে স্থিতির উপায় গোরক্ষের বচনে—

আসন বাঁধো বাসন বাঁধো অরু বাঁধো নবদ্বার।

তাহি বাঁধো তেরে গুরু কো বাঁধো নিকসো কোনে দ্বারা।

• • • • •

১। গোরখবাণী, শ্লোক ১৫৩, ১৫৭

২। গোরখবাণী, শ্লোক ২৬৪ ইত্যাদি।

শব্দ কহী সে আয়া কহো শব্দ কা বিচার ।

মহী তো মালা তিলক ধরো উতার ॥^১

অর্থাৎ নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসন সিদ্ধ হইলে, পরমপদে স্থিতিলাভ সম্ভব হয় । শব্দের বিচার কর্তব্য, নহিলে তিলক-মালা ধারণ মিথ্যা ।

গোরক্ষের এই বাক্য গোরখ-গোষ্ঠী (অর্থাৎ কবীরের সহিত গোরক্ষের জ্ঞানালোচনা নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে কবীর দ্বৈতবাদী গোরক্ষকে অদ্বৈতবাদী করেন এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদ আছে । প্রথমতঃ কবীরের যুগে গোরক্ষের পাকভৌতিক দেহে অবস্থান সম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ গোরক্ষের পন্থা ছিল দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত, ইহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ের পরবর্তী স্থানে নাথস্বরূপে অবস্থানের সাধন । অতএব বুঝা যায়, গোরক্ষের প্রাধান্যের যুগের পরবর্তী কালে তাঁহার সম্বন্ধে কত প্রমাদপূর্ণ মতামত সাধারণে প্রচলিত হয় । কবীর অদ্বৈতবাদী ছিলেন ইহা সত্য, এবং ‘গোরক্ষ-গোষ্ঠী’ কবীর সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া কবীরকে প্রাধান্য দিবার জন্য গোরক্ষকে দ্বৈতবাদী করা হইয়াছে । ইহাতে বিম্মিত হইবার কিছু নাই ।

গোরক্ষের মতানুযায়ী ‘নাথস্বরূপ’ বা ‘পরমপদে’র বিচার এই নিবন্ধের ‘সিদ্ধান্ত-অংশে’ প্রথমেই করা হইয়াছে । সংক্ষেপতঃ বলা যায়, গুরুর কৃপাকটাক্ষে যে নিরুত্থানদশালাভ হয় তাহাই স্বদেহে আত্মসংবেদ্য অবস্থা ।^২ ইহা প্রাপ্ত হইলে পরমপদের সহিত সামরস্ত লাভ হয় এবং ভেদাভেদ তিরোহিত হয় । নিজ পিণ্ডের জ্ঞানের সিদ্ধিতে স্বভাবতঃই পরমপদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জগতের সকল জ্ঞান উদিত ও সিদ্ধিসকল করতলগত হয় । এই জ্ঞানের চারিটি অবস্থা-ভেদ আছে, প্রথমতঃ সহজ জ্ঞান বা বিশ্বমধ্যে বিশ্বময়কে দর্শন (সহজাবস্থা লাভের জন্যই যোগসাধন কর্তব্য)—অর্থাৎ তুরীয়াতীত পরমাত্মাকে বিশ্বের অণুতেও প্রত্যক্ষকরণ । দ্বিতীয় অবস্থায় ‘সংযম জ্ঞান’ বা ক্ষুরণশীল বৃত্তির আত্ম-মধ্যে সংযমন (তুলনীয় যোগসূত্র—‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ’) । তৃতীয় অবস্থায় ‘উপায়জ্ঞান’ বা প্রকাশময় আত্মাকে স্বরূপতঃ অভিব্যক্ত করিয়া সর্বদা লৌল্য বা উজ্জম অবস্থায় স্থিতিলাভ । চতুর্থ অবস্থায় ‘অদ্বয় জ্ঞানে’র অবস্থা বা আত্মস্বরূপে অবস্থান এবং তখন জ্ঞাতি প্রভৃতি

১ । গোরখ-গোষ্ঠীতে গোরক্ষবচন ১২, ১৫ পৃ ৪৭, ৪৬ সঠিক ।— বাবা লক্ষণদাসজী, বেণারস ।

২ । সি. সি. স ৪১৭, ৮ ।

বিকল্পের আত্যন্তিক অভাব দৃষ্ট হয়। এই চতুর্বিধ ভাব হইতে পরাবস্থার উদয় হয়। পরাবস্থা-প্রাপ্ত যোগী তৃপ্ত ও নির্বিকল্পভাবে নিরুত্থানপদে বিরাজমান থাকেন। তাই উক্ত হইয়াছে—

সহজঃ সাত্বসংবিত্তিঃ সংযমঃ সর্বনিগ্রহঃ।

ষোপায়ঃ স্বাস্থ্য বিশ্রান্তিরদ্বৈতঃ পরমং পদম্ ॥^১

এই নাথ অবস্থায় স্থিতি হইলে পুনরুত্থান হয় না এবং যোগলাভ সম্ভব হয়।

মোক্ষ দ্বিপ্রকার—‘জীবমুক্তি’ ও ‘বিদেহমুক্তি’। নাথমতে ও সম্তমতে জীবমুক্তি আদর্শ, সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া ‘মুক্তি’কে রক্ষা করিতে হয়, মৃত্যুতে মুক্তি হয় সিদ্ধমতে একথা ভ্রান্তি। (অন্যান্য মার্গ হইতে নাথমার্গে মুক্তি সম্বন্ধে ভেদ এই নিবন্ধের জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপরা ও পরামুক্তি অধ্যায়ে ‘সিদ্ধাস্ত-অংশে’ দ্রষ্টব্য।) গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে মুক্তি লভ্য নহে, গুরুর কৃপাকটাক্ষ বিনা সহজাবস্থালাভ হয় না, নাথগুরু যোগ্যতা বিচার পূর্বক শিষ্য গ্রহণ করেন, অবধূতই নাথমতে আদর্শ যোগী ও আদর্শ গুরু এবং শিষ্য পুত্র অপেক্ষা প্রিয়। গুরুর আদেশে শিষ্য নিয়ম ও আচারাতি মান্য করিয়া চলিলে মোক্ষলাভ হইবেই। এই সাধনের নিমিত্ত নাড়ীচক্রের ও নাড়ীশুদ্ধির জ্ঞান আবশ্যক, কারণ যোগানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়কে সুসংস্কৃত করিয়া যোগসাধনের উপযোগী করা কর্তব্য। অতএব নাথমার্গে হঠযোগের উপদেশ আছে, কিন্তু হঠযোগ রাজযোগে আরোহণ করিবার সোপান স্বরূপ গণ্য হয় মাত্র। হঠযোগীকে যথার্থ যোগী বলা যায় না, ঘটশোধনান্তে রাজযোগে বা উন্নয়নী সমাধিতে মগ্ন যোগীই যথার্থ ‘যোগী’-পদবাচ্য। নাদানুসন্ধান এবং ওঁকার সাধন যোগসাধনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ। মুক্তিলাভের দুইটি পন্থা—মতোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি বা ‘বিহঙ্গমমার্গ’ ও ‘পিপীলিকামার্গ’; শুকদেব ও বামদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হয়, ইহা উপনিষদাদিতে দৃষ্ট হয়,^২ পিপীলিকা-মার্গে অষ্টাঙ্গ হঠযোগসাধনে অগ্নিাদি সিদ্ধিলাভ করতঃ যোগী উত্থান-পতনের বিবর্তনে বারবার জন্মলাভ করিয়াছেন, ক্রমবিকাশ দ্বারা একজন্মেই স্ব-স্বরূপে অবস্থান সম্ভব নয়, ইহাই ‘পরমপদে পিণ্ডলয়’ বা ‘সমরসীকরণ’। এই ক্রম দুইটিকে মর্কটক্রম ও কাকমত বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।^৩

১। সি. সি. স. ৪১২৪।

২। বরাহ উপনিষদ, চতুর্থ অধ্যায় ৩৬-৪২ শ্লোক।

৩। যোগশিখোপনিষদ ১৪-১৪০ শ্লোক, যোগবীজ দ্রষ্টব্য।

নাথমতে জরামৃতশীল দেহের বৃত্তান্ত জানিয়া ‘কায়সিদ্ধ’ করিয়া তৎসহ সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করিলে পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভবপর হয়। রসেশ্বর সম্প্রদায়ের ‘হরগৌরীতন্ত্র’, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ‘বজ্রদেহ’, সিদ্ধ-মার্গের ‘দিবাদেহ’ বা ‘সিদ্ধদেহ’ (মতান্তরে বৈন্দবদেহ) একই কথা। কালের খতির উর্দ্ধে স্থিতিলাভই লক্ষ্য। ‘দেহতত্ত্ব’ বিচার বা ‘পিণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড’র জ্ঞান সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্য দেশেও পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা এবং পিণ্ড ব্রহ্মার্থে রসায়নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল (সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশে দেহতত্ত্ব ও কায়সিদ্ধি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রাচীনকালের সাধক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতিদ্বারা বিতক্ত হইলেও তাহাদের মধ্যে সাধনগত ঐক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রাচীন-যুগ হইতে শূন্যতত্ত্বের ধারণাও প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, সমুদ্র সম্প্রদায় মধ্যেও শূন্যতত্ত্বের আলোচনা বা উল্লেখ দেখা যায় (সিদ্ধান্ত অংশের শূন্যতত্ত্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব সকল সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সাধন মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের অবসানে ‘যোগে’র প্রাধান্য লক্ষিত হয়, নাথপন্থেও ‘জ্ঞানযুক্ত যোগে’র বা মহাজ্ঞানের প্রাধান্যের উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নাথপন্থী সাধকেরা একদা ‘ওঁকার’ সাধনের যথার্থ অধিকারী ছিলেন এবং যোগের দ্বারা তাহারা পরমপদের সন্ধান পাওয়া ভারতবাসী খ্যাতি অর্জন করেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বহুশতাব্দী গত হইলেও তাহাদের অপূর্ণ কীর্তিকথা ও জয়গাথা অद्याপি ভারতের উত্তর পশ্চিম পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

শব্দ-সূচী

(পৃষ্ঠার সংখ্যা দেওয়া হইল)

অ

অ, আ প্রভৃতি শিবের পঞ্চবক্তৃ ৫০২,
 "অ, উ, ম"র ব্যাখ্যা ৪৭১
 অওঘর যোগী ২
 অক্ষর ব্রহ্মযোগ ৩১৮
 অথও পরিপূর্ণ আত্মা ২০২
 অঘোরী ৯৯
 অজ্ঞপা—গায়ত্রী যোগীদের মোক্ষদায়িনী
 ৪৫৯, ৪৭৯, ৫৭২
 অজ্ঞান দ্বিবিধ ৪৭৪
 অদ্বৈতাগমে শিব ও শক্তি ২৬৮
 অনাদি পিও ২১৪, ২১৫
 "অনামা" আখ্যা ২০১
 অনাহত নাদ শ্রবণ ২৭৩, ৪৬৩, ৪৮০,
 ৫৭৪
 অপর ও পরামুক্তি ৩০১
 অবকাশ ও স্তর ৩৫৮
 অবদুত—তাহার প্রারম্ভ, ভাগ ও ভোগ
 ২৮৩, ২৮৪, তাহার মূল্য ও নাদ ৫৫৬,
 তাহার লক্ষণ ৫৫৭, ৫৫৮ তিনি ষথার্থ
 অধিকারী ৫৫৩, সমদৃষ্টি ভাবাপন্ন ৫৫৫
 অব্যক্ত স্বরূপ ২১৩
 অভিনব গুণ ৪৬, ৪৭
 অমনস্ক বা মনোহীন অবস্থা ১২৬ (গ্রন্থ),
 ১৮৪, ১৮৮, ২৭৩, ৩৫৮
 অমরনাথ তীর্থ ১০৩
 অমরোলী মূল্য ৪৩২, ৫১৪
 অমাকলা ও নির্মাণকলা ৪২৬, ৫০৭
 অমরৌষশাসনম্—গৌরবকৃত ১২৩, ৫১২

অমৃতকলা ৩১২, ৫৫৩

অমৃতসহর দ্বাদশপদীর মিলনক্ষেত্র ১০৬

অষ্টমস্বেদন ৪২০

অষ্টসিদ্ধি ৫৬০

অসদ্ গুরুর লক্ষণ ৩৭৬

অহম্ বা আত্মা ৩৩৮

অহম্ ইদমের ব্রহ্ম ৫০৫, ৫০৯

আ

আগমে শক্তিতত্ত্বের ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ ২৬৭
 আত্মার তিনটি উপাদি—স্থূল সূক্ষ্ম ও
 কারণ শরীর ৩২৫
 আত্মোপলব্ধির সাধন ৩৩৮
 আদিনাথের জন্ম ২
 'আদেশ' শব্দ দ্বারা অভিবাদন ১২, ১১৭
 আগ্নপিও ২১৫, ২৪৩
 আভাসবাদ ২৬৪
 আভাসই শক্তিভাব ২১৩, ইহাই সৃষ্টি ২৪৪
 'আরম্ভ' প্রভৃতি নাদের অবস্থা-চতুষ্টয়
 ৪৬৪, ৪৬৫
 আলি ও কালি বা নাদ ও বিন্দুর ব্যাখ্যা
 ৫৩৭
 আশাপুরীর মালা ১১৮

ই

ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া, শক্তির ত্রিবিধ রূপ
 ৪২৬
 ইডাপিঙ্গলা, চন্দ্রসূর্য্য, গঙ্গাধমুনীর চতুষ্টয়
 উল্লেখ ৫৩৬, ৫৩৭

ঐ

ঐশ্বর—তাহার সংজ্ঞা ২৫২ ও 'মায়া'
বেদান্তের ২৫৩, নাথগণের আদর্শ
২৫৩, ৫০৪, গোরক্ষনাথ মতে ২৫৪,
২৫৫, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার ২৬০

উ

'উ' ভাবের অভিযুক্তি নাথগ্রন্থে ৫০২
উড্ডীয়ানবন্ধ ৩১১

উন্নয়নী বা তুরীয় অবস্থা—২৮৮, ৩০১,
৩১৪, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৬৫
উহার আবাস ৩৪৮, উহা দ্বারা কালজয়
৪৬৬, উহা নিষ্ঠুর শিবপদ ৩৭০, উহা
শূন্যগামী ৪২৬, উহাই নির্মাণকলা
৫০০, শক্তির নিষ্কল অবস্থা ৫৪৭,
পূর্ণব্রহ্মে স্থিতি ৫৬২

উন্টা বা মীনমার্গ, পরাবৃত্তি সাধন ৩১৪,
৫১৬, ৫৩২, ৫৭১, সম্ভবসম্প্রদায়ে উহার
সাধন ৫৩৪

উ

উর্দ্ধ জীবনী সঙ্গম ৩১৫
উর্দ্ধশক্তির নিপাতনে পরমপদপ্রাপ্তি ২২৭

এ

একাক্ষর নামস্মরণ ৪৭২
এবম্কার ৫০৩

ও

ওষজ্ঞ ৩৭০, ৩৭১
ওড্ডিয়ানের অবস্থিতি ১১৩
ওড্ডিয়ান প্রভৃতি চতুষ্পীঠ ৪৪৮

ওঁকার

দেহ, ৩২৮
তত্ত্বপ্রদর্শক ৩৭৫

সাধনের বৈশিষ্ট্য (নাথমতে) ২৭২,
৩৪৫, ৪৭৫, তাহার ধ্বনিকথা ৩৪৫,
উহাই ফোট ৪৬৪

সাধনে শূন্যসাধনা ৩৪৬
সাধনে কুণ্ডলিনীর আগমন ৫৭০
সাধনের দ্বাদশ মাত্রা ৪৭৫, ৪৭৬
সেই মাত্রারহিত ব্রহ্ম ৪৭৬
সাধনের যথার্থ অধিকারী নাথযোগী ৫৭৭

ক

কদলীদেশ ১১২
কর্ণবেধ অহুষ্ঠান নাথপন্থীদের ১১৭
কবীরের গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার উল্লেখ ৪২

কলা—ব্যাখ্যা ৫০৭, বর্ণের উৎপত্তি ৪২১,
বর্ণের ব্যাখ্যা ৪২২, চন্দ্রস্বর্ষা ও অগ্নির
২১৭

কানফাটা—সম্প্রদায় ৪, ৫, শ্রেণীবিভাগ
২১—২৩
বগুড়ায় বৌদ্ধযোগী ২, ২৮, ২৯
মঠ ও তীর্থ ১০১—১০৮

কাপালিক—বৃত্তান্ত ৫৮, গুরু ও দ্বাদশ
শিষ্য ৫৪, ২০
কামকলার বিচার ৪২৮—৫০০, দর্শন
৫০১—৫০২

কামরূপ পীঠ ৪৭
কালবন্ধন ৫১৬
কালভৈরবের পূজা নেপালে ১১৬
কালজয়ে জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি ৩১২
কায়বাহ ৫৪০—৫৪২, ৫৬৫

কায়সিদ্ধি বা দেহসিদ্ধি

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য ৫১১,
বঙ্গীয় গাথায় উল্লেখ ৫১২, ৫২৮
ইহার দুইটা দ্বারা ৫১৫
ইহার বিভিন্ন উপায় ৫১১

নাথদর্শনে প্রাধান্য ২৭২, ৫১২, ৫৪৫,
৫৪৮, ৫৬৮

মহাস্থখ ও মহাভাব দ্বারা ৫৩০

ইহার আবশ্যকতা ৫৭৭

ইহাই দেহবেদ ৫২১

পাতঞ্জল দর্শনে ৫১৭, উপনিষদে ৫৩৮

উড্ডিয়ায় ৫৩৮, তিরুতে ৫৩২

কবীরের বীজকে ৫৪৬

রসেশ্বর সম্প্রদায়ে ৫৫০

জৈনধর্মে ৫৫১, ৫৫২

গোরক্ষ ও আল্লামপ্রভু মদ্যে ইহার
তর্ক ৫৫০

কায়সম্পন্ন বা সিদ্ধদেহ ৩১৮, ৫১৭

‘কুণ্ডল’ বা দর্শনী ২

কুণ্ডলিনী

শক্তি ২২৪, ২৩২

প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধ ২২৪, পিওসংস্কি-
কারিণী ৩৩৪

উহার জাগরণ ২৭২, ২৭৫, ২৮২

বিভিন্ন উপায়ে জাগরণ ৫৫৪

ইহুদীদের মদ্যে ৫২৩, নাথমার্গে ৫৭০

উহার তত্ত্ব ৪৩৩—৪৩৫, উহার বাচ্য,
বাচক, দ্বিবিধ মূর্তি ৪৮১

মানবের উদ্ধারকর্ত্রী ৫৭৪

কুল

অর্থে শক্তি ২৮৮

ও অকুল ২১৬, ৫৫৫

পঞ্চক ২১৬, ২৪৪

কোল

নামে নাথেরা পরিচিত ১, ১৭৬

মহেশ্বেশ্বরনাথের যোগিনী কোল ১৬৭

মার্গের সহিত নাথমার্গের সম্বন্ধ
বিচার ১৬৫—১৮১

দ্বিবিধ : উত্তর ও পূর্ব ১৭২

কোলাগম ও কোলপ্রথা ১৭, ৫৭

কোলজ্ঞাননির্ণয় পুথি ১৬

উহার লিপিকাল ১২১

খ

খাজাখান্স-বিচার নাথযোগীদের ১১৬

খেচরী—বীজ ৫৩২ উপনিষদে ব্যাখ্যা)

মুদ্রা ২৭৮, ৩০১, ৩১১, ৩১৩, ৪২২,
৫১২, ৫১৩

গ

গম্ভীরনাথ ৬, তাঁহার বৃত্তান্ত ৮৭, ৮৮

গর্ভপিণ্ড ২১৭, ৩২২

গহনীনাথ ৮৬

গুরু—তত্ত্ব ৩৬৫, উহার অর্থ ৩৮৭, শিব

ও নাথ ৩৬৭,

ও শিঙ্গলক্ষণ ৩৭২, ৩৮০,

৩৮৩, ৩৮৫, ৫৫৬

সেবার ফল ৩৮৭

-বাক্যে সিদ্ধিলাভ ২০৪, ৩৬৬

-রূপা ২৭৫, ৩৮৭

-দেহ ৫৪৩, ৫৫২

নাদবিন্দুকলাস্বরূপ ৪৮৭

গোপীচাঁদ—বৃত্তান্ত ১২, ২০, ২১, উহার

প্রচার ২৩, উহার নাটক ১৩২,

রাজধানী ৭৩, কালনির্ণয় ৭৩—৭৫,

শিলালিপি ৭৪, ও গোবিন্দচন্দ্র ৪,

নামান্তর শৃঙ্গারীপাব্ ৮১, সংশ্লিষ্ট

স্থান ১১৫, -সন্ন্যাসে যোগবর্ণনা ২৭৩

গোরক্ষনাথ

জন্মকথা ২, ২২, ৩০, ৪৩, ৪৮, ২৪৮

ঐতিহাসিকতা ৩০—৩২, তাঁহার বৌদ্ধ

নাম ৪, লীলাক্ষেত্র ৪, পূর্ব অঞ্চলের

১১, শৈবধর্মে দীক্ষা ১১, প্রচারিত

যোগধর্ম ১৪, শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ৫৭১,

৫৭২, তাহার কাহিনী ১৯, ২৮,
মঠাদি ২০, শক্তি-পরিচয় ২২, কাল
সংক্ষেপে মতামত ৪০—৪৩, কাল
নিকপণ চেষ্টা ৪৩—৫৮

নব গোরক্ষনাথ বৃত্তান্ত ৭১, ৭২
তাহার মূর্তি ১০২, তাহার টিলা ১০৬
গোরক্ষপুরে মন্দির ১০৪, ১০৫
গোরক্ষ মজিন্দর, গোরক্ষগড়, মজিন্দর
গড় ১০৭

তাহার নাম হইতে 'ওর্থী' ১০২
তাহার নামে আসন ২৭৩, ৪১৭
গোরক্ষপন্থী ৫, গোরখ-বাসলী ৬, ২৯,
১০১

তাহার মতে সৃষ্টির ক্রম ২৪২
তাহার মতে বিশ্বের উৎপত্তি ২৬০
তাহার রচনার ভাষা ১৩২
তাহার হিন্দী গ্রন্থাদি ১৩১, ১৩২,
১৩৩

গোরক্ষশতক ১২২, ১২৩
গোরক্ষসংহিতা ৩, ৭, ১২২,
গোরক্ষসিদ্ধান্ত ৭
গোরক্ষবোধ ১২৮—১৩১
গোরক্ষবিকাশ ১৩৩
গোরক্ষগোষ্ঠী ১৩৬
গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন ১৩, উহার
প্রাচীনত্ব ১২১, ১৩৭
গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ ১২৫

চ

চতুর্দশ ভুবন ৩২২
চতুর্বিধ জ্ঞানভাব ২০৮

চন্দ্র ও সূর্য্য

তাহাদের অবস্থান ৫৩২
পুঙ্খ ও প্রকৃতির প্রতীক ৩১৩

তাহাদের মিলনে পরমপদ প্রাপ্তি
৫১০, ৫১২, ৫৩৮

চন্দ্রামৃত বা অমরবাকলী ৫৩২

ইহা রক্ষা নাথযোগ্যের আদর্শ ৫৩৮

চর্পটনাথ ৮৬

চিৎশক্তির আসন চিদাকাশ ও তাহার
অর্থনির্ণয় ৪৮৮, ৪৮৯

চিত্তের শৃঙ্খল অবস্থা ৩৪৪

চৌরঙ্গীনাথ

পালবংশীয় রাজপুত্র ৭৫
নামাস্তর গাভুরসিদ্ধাই ৭৬
বজ্রযানের ভাষ্যকার ৭৭
কালনির্ণয় ৭৫-৭৭

ছ

ছায়ানাথের জন্মবৃত্তান্ত ২

জ

জগতের উৎপত্তি ২৫০
জগৎই কালচক্র হইতে রক্ষার উপায় ৩০৩
জরা ও মৃত্যুর রহস্য ৩১০
জরা ও বার্দ্ধক্য ৩১৩
জলন্ধর রাজা ৮০
জালন্ধরীপাদ ও কাহিনী ১৫, ১৮
জালন্ধরীনাথের উৎপত্তি কথা ৭৭-৮২
তাহার নামাস্তর হাড়িপা ৭৭
জালন্ধর বন্ধ ২৭৩, ৩১১
জাহোরেব অবস্থান ১১৩
জীব ও ঐশ্বরে ভেদাভেদ ২৫৭, ২৭৭

জীবদেহ

স্বরূপ ২১৮, ২১৯, আবির্ভাব ও মূর্তি
৫৬২, ৫৭০, পঞ্চকোষসাধন ৩২৭
সংসার ও মোক্ষ ২৪৫, জন্মপাশমুক্ত

২৫১, চৈতন্যস্বরূপ ২৫৮, পুণিমা ও
অমাবস্তা জীবনের ৩১২

জীবনযুক্তযোগী

ইহার পিণ্ডপাত হয় না ২২২
ইহার দৈহিক পরিবর্তন ২২৩

জীবনযুক্তি

ইহার আদর্শ ২২২, লক্ষণ ২২৪, ২২৫
উপায় ২৭৭, ও বিদেহযুক্তি ২২৭, উহা
লাভ ৪৬৭, নাথমতে ও সম্মত ৫৭৬
জ্ঞান ও কর্ম ২৭০
জ্ঞানতত্ত্ব ৩০৪
জ্ঞানদেব বৃত্তান্ত ৫০-৫২
জ্ঞানযুক্ত যোগ ৪০৪
জ্ঞানের স্বরূপ ৪০৬
জ্ঞানেশ্বরীতে গুরুপরম্পরা ৪২, ৫০

ঐ

ঠুমুরার মালা ১১৮

ত

তত্ত্বমসি ২৬২
তত্ত্বমতে বিশ্বের উৎপত্তি, বিন্দু ও বিসর্গ
২৬১, ২৬২
তত্ত্বালোক ৪৬
তাত্ত্বিক সাধন ও নাথপন্থ ১৫১-১৬৫

ভ্যাগ ও ভোগ

তাহার রহস্য ২৮১
তাহার উপদেশ ৩২৫, ৫৭৩
উহার সামরসা ২৭১, ২৮০, ২৮৩

ত্রিকদর্শন ১২৫
ত্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রীবিজয়া ৪৮৭, ৪৮৮, ৪২৮
ত্রিবিন্দুতত্ত্ব ৩২১, ৪২২
ত্রিরত্নের উপলক্ষি ৪৭২
ত্রিলক্ষ্যসাধন ৩৬০, ৩২৮

দ

দত্তাশ্রয় ২২-১০০

দশমীদ্বার বা ব্রহ্মরত্ন বা শঙ্খিনী দ্বার
৩১৪, ৩১৫, ৪৪৫, ৫৩৩

বঙ্গ গীতিকায় উল্লেখ ৫৩৫
সম্মতসাধনায় উল্লেখ ৫৪৭
দশদ্বারের কথা ২৭২

দর্শনী বা কুণ্ডল ২. ১২০
দাদুর 'কুস্তারীপাব' নাম ১৮৮
দারা সেধ রচিত গ্রন্থ ১৮৩
ছাদশপন্থ ২০, ৩২৮
দিব্যদেহ ২২৭, ৩১৮, ৩২১
দীক্ষা ও তাহার অর্থ ৩২৪, ৪৭৩
দেবীপাটান ১০২, ১০৩
দেলপূজা ৩৪২
দেহতত্ত্ব ৩২০, ৩৮২

উহার বিচার নাথমার্গের বৈশিষ্ট্য ৫৭৭

দেহতত্ত্বাণ্ড ৩২২
দেহই আত্মা সিদ্ধমতে ২৭২
দেহরক্ষা নাথমার্গের আদর্শ ২৭৭
দেহচক্র ৩২১
দেলপূজা ৩৪২
দ্বৈতাদ্বৈত-বিবজ্জিত নিশ্চলপদ ও তাহাতে
অবস্থানে মুক্তি ২৭১

ধ

ধীনোদয়ের মঠ ১০৭

ন

নবকোটসিদ্ধ ৩০৬
নবচক্র ও নবশক্তি ২২৫, ৪৩২, ৪৪০
নাগপঞ্চমীর উৎসবে গুণাগীত ১১৬
নাড়ীচক্র, ইড়াপিঙ্গলাদির বর্ণনা ৪৫৭, ৪৫৮
নাড়ী সামরস ৩১৫

নাথ

পদবী ১, গোত্র ৩, পন্থ ৫, অর্থ ৮,

স্বরূপ ও আখ্যা ২০৩, ২৭২, ২৭৩,
২৮৫, ৩২৩, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৭২,
৩৮২

উদ্ভব ও লক্ষণ বর্ণনা ২৭২, ২৮৫
দ্বৈতাদ্বৈত-বিবক্ষিত নিষ্কলপদ ২৭১,
৫৬২

পারমাণবিক গুরু ৩৮৫, ও নিগুণে
ভেদ ২৫৫

প্রকৃত্ত ৪, প্রসিদ্ধি ৫, উপাক্ত দেবতা
১০৮—১১০

যোগীসম্প্রদায় ও সংখ্যা ১, ৬, ১০,
২৩—২২, ২৭২

আদর্শ ও সাধন ৩৭২, ৩৮২, ৫৭১—৭৩
মার্গের উপদেষ্টা ২৩, মার্গে যোগের
প্রাধান্য ৪০৫

যোগসাধনের উদ্দেশ্য ৩২২, সিদ্ধ-
যোগীর বিবরণ ৫৪৪

নাথিনী ৮, ১১৭

'নবনাথ' ও তালিকা ৮২, ২০, ২২—
১০০, ৩২৭, ৩৮৫

সংগ-নিগুণের ঐক্যভূমি ২০৬, ২৩১
হইতে বিপ্রকার সৃষ্টি : নাদরূপা,
বিন্দুরূপা ২৪৫, ৩৮৫, ৫০২

মতে নিরঞ্জন ২৬১

গুরু বৈশিষ্ট্য ৩৬২, ৩৭০, ৩৮২
-কল্পনা ২৮০, নাথাবস্থা ২২১

মাদ

উৎপত্তি ৪২০, সাধন ৪৬৩, অবস্থা
চতুষ্টয় ৪৬৪

দুল ও সূক্ষ্ম ২৪৫, সম্ভান ৩০৮, ৩৮৫,
৩৮৬

-ব্রহ্মের উপলক্ষি ৪৬৮

-বিন্দুবর্ণ ৪২৫, ৪২৬

প্রকৃতি প্রণবের ষোড়শমাত্রা ৪৮৩

নাদাহুসঙ্কান ২৭২, ৫১৭

নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠাদি কলা ৪২২

নিরঞ্জন 'শূন্যমূর্তি' ও সম্প্রদায় ৩৪৪

নিরাভাসই শিবাভাস ২৩১, উহাই
সংহার ২৪৪

নিরুখানদশা

ও সামরক্তের মধ্যে ভেদ ২০২

ও পূর্বব্রহ্মে স্থিতিতে ভেদ ৫৬২

নির্দ্বাণকায় বা চিত্র ২২১, ২২৮, ৫৪৩

নেপালে গোরক্ষমূর্তি ১০২

নেপালে বাংলাভাষায় গোপীচন্দ্রের নাটক
১৩২

নৈরখোর স্বরূপ ২১১, ৩২১

প

পক্ষ ও অপকর্মেহ ২০৮, ২৭৭, ৩২১, ৪০৪,
৫২০, ৫২৪, ৫৫৭, ৫৬২, ৫৭৩, ৫৭৪

পক্ষরূতাকারী ২৬২, ৬০২

পঞ্চব্যোমতত্ত্ব ৩৬০, ৩২৮, ৪৩২

পঞ্চমহাত্ততত্ত্ব ২১৫

পক্ষীকরণ ২৭৪, ৩৫৭

পবিত্রী ২, ১১৮

পরমপদ

বাখ্যা ২০১, ৫৬২, ৫৭৫

দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সমতত্ত্ব ২০২, ২৬২

উহাতে ক্রিয়াক্রিয়া বর্তমান ২৭১

চৈতন্যের সাম্যাবস্থা ২৬৫

সাম্রাজ্যের অবস্থা ২০২

যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয়ে লভা ৫৬২

বিশ্ব ও বিশ্বাতীত ২১২

-প্রাপ্তি ২২৪, ৩৬১

বিভিন্ন নাম ২২৭, ৩৮২

উহাতে পিণ্ডলয় নাথপন্থের বৈশিষ্ট্য



পরমশিব পূর্ণস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি
২১৩, ২২৪

পরমহংস ও অবস্থিত ৩৮৩

পরমেশ্বরের লক্ষণ ৩৫৭

পর্যাপ্ত ও অপারমুক্তি ৩০২

পর্যাপ্ত ত্রিবিধ ২৬৩

পরামুক্তির লক্ষণ ৩০৩

পশ্চিমমার্গ ২৮৭

পারমাণবিক অবস্থাই শূন্য ৪৩

পিণ্ড

ব্যাখ্যা ২১৪, ২১৭, ২২২

-তত্ত্ব ২১৩

বিভিন্ন পিণ্ডের গুণ ২১৪, ২৪৩

প্রকৃতিপিণ্ড ২১৫, -আধার ২২২

উৎপত্তি বিচার ২৪১, ৩২২

-সংবেদন ৩২০

ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ ৩২০, ৩৩২, ৫৭৭

পাশ্চাত্য দেশে উহার কল্পনা ৩৩৪

উহার বিভিন্ন চক্র ও ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন
স্তর ৩৩৪

উহাদের ঘটচক্র ৩৩৭

ও ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগে শিবঅলাভ ৩৩২

-জ্ঞানে পরমপদের সহিত ঐক্য ৫৭৫

পীঠ ও পীঠতত্ত্ব ৪৪৬, ৪৪৭

পুরুষ ও প্রকৃতি ৩২৩

পূর্ণাহস্তা ২৮২, ২২১, ৩২৪, ৪২২

পূর্ণদেশে মৎস্তজ্ঞের আবাসস্থল ১১১

প্রকাশই শিব, বিমর্শই শক্তি, বাচা ও

বাচক ২৬১-২৬২, ২৬৩

প্রকৃতির ঐশ্বর্য ৩২৩

প্রকৃতিলীন ও বিদেহলীন ২৭৬, ২২৮

প্রণব

উহার মাত্রা ৩৪৫, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৮৩

-তত্ত্ব ৩০৩, ৩০৭, ৩২৪, ৩২১, ৫১৮,
৫৫২

-সাদন ২১০, ৩৪৫

ব্যাপিনী ও নিরাকারনাথ ৩৪৫

প্রলয়াকলজীব ৪৮২

প্রাণ ও অপানের যোগ ৫১৪

প্রাণায়াম সাদনের উপায় ৩২২, ৪১৭

প্রাতিভ মহাজ্ঞান ৩২৪

প্রারম্ভ কর্মফল ও তাহার ক্ষয় ২৮২, ২২৩,
২২৬

ব

বজ্রকায় ৩১৮

বজ্রোলীমুদ্রা ৪৩২, ৫১৪

বন্ধন ৩১১

বন্ধন ও মোক্ষ ২৮৫

বিজ্ঞানকলজীব ও অবস্থা ২২০, ২২১, ৪২৪

বিন্দুরক্ষা ও সিদ্ধি ৩১৩, ৩১৮

বিন্দুস্থান ৩০৮, ৩৮৫, ৩৮৬

বিশ্বস্থিতির কথা নাদবিন্দু যোগে ৪৮৫

বিহঙ্গমমার্গ ও পিপীলিকামার্গ ২৮৭, ৫৭৬

বৈশ্বদেহ ৩০৪, ৩২১, ৪২০, ৪২৪

বৃত্তি, প্রাণ ও বীর্ষাজয় ২৭২

ব্যোমপঙ্ককের সাদনা ৩৪৪

ব্রহ্মজ্ঞানে শূন্যতা উপলব্ধির কথা বঙ্গীয়

গীতিকায় ৩৫৬

ব্রহ্মনাড়ী ৩২৬, ৪৪৪

ব্রহ্মভাবাপত্তি ২৬২

ব্রাহ্মী স্থিতি ২২২, ৩২৩

ভ

ভগবানের তটস্থা শক্তি-২৩৭

ভর্তৃহরি বা বিচারনাথ ৪৫, ৮০

ভাহার কাহিনী ৮২-৮৫

ভাবদেহ ৩২৮

ভূতাকাশ হইতে পঞ্চমণ্ডল ও পঞ্চচক্র ৩২২

ভোক-বারহ-পদ্ম ১০০

ভোগ ও মোক্ষ ২৮১, ২৮২, ৩২৭



অ

মৎস্রেন্দ্র বা মীননাথ

- জন্ম ২, ১৫, ১৮, ২৭, ৪৩
 তত্ত্বজ্ঞানলাভ ১২
 কদলী কাহিনী ১২, ১১১, ১১২
 রচিত বাংলা পদ ৫৬, ৬৩
 আবির্ভাবকাল ১৮, আবাস ১১১
 কাহিনী ১২, ২৫-২৮
 ঐতিহাসিকতা ৩০-৩২
 তত্ত্বালোকে উল্লেখ ১৭
 কালনিরূপণ ৪৩-৪৮
 গুরুপরম্পরা ৪৪, রথযাত্রা ৪৪
 ব্যক্তিগত প্রমাণ ৫২, ৬০
 ধর্মমত ৬২-৭১
 তাহার নামে আসন ৬৫, ২৭৩, ৪১৭
 লুপ্তপাদ কথা ৬০, ৬২ ৬৮

‘মৎস্র’ শব্দের অর্থ ১৭

মৎস্রেন্দ্রনাথ ৭১-৭২

মীনচেতন পুণি ১৩, ১২১, ১৩৭

মৎস্রেন্দ্র-সংহিতা ১২৩

মহাশক্তি দ্বিবিধ ২২৫

মনন ও বায়ুর সন্ধিস্থল ২৭৬

মন্ত্রচৈতন্য ৪২০, ৪৬৭

মন্ত্রদেহ বা মন্ত্রতত্ত্ব ৩০৪, ৫১৮

মন্ত্রযোগ ৪২০, ৫১৭

ময়নামতীর গান ১৩, ৫৩, ১৩৭

ময়নামতীর স্বামিবৃত্তাস্ত্র ৪

ময়নামতীর গানের প্রাচীনত্ব ১২১

মহাজ্ঞান

- উহার উদয় ৩৮২, ৪০২
 নাথমার্গে প্রাপ্য ৫৭৭
 শুদ্ধসত্তার বীজস্বরূপ ৫৯০
 তিরুতে ইহার সাধনা ৫২২

স্বরূপ বিচার ৪১০-৪১৩

ইহাই তারকজ্ঞান ৪১০, ৪৩৮

ইহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ ৫৫২

মহাত্রিপুরাসুন্দরী ৩১২

মহানন্দ বা মহানাদ ৬, ১০২

মহাপুরুষের লক্ষণ ৩৭৮, ৩৭৯

মহাবিন্দুতে মহামিলন ৩২৭

মহামন্ত্র ৪৫২

মহামুদ্রা সম্প্রদায় ৫৪১

মহামুদ্রা, মহাবক্ষ, মহাবেদ ৪২৭

মহাশক্তি তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্বতত্ত্বাত্মক
২৬২

মহাস্থপ ২৮৩, ৩৪০, ৫০৩

মহাস্থপ ও মহাভাবের দ্বারা সহজ
উপলব্ধি ৫৩০

মানবের জন্মের কারণ ভোগবাসনা ৩১৬

মাহেশ্বর সিদ্ধের দেহাস্ত্র গ্রহণ ৩০৩

মুক্তির প্রকারভেদ ২৮৬, ২৮৭

সিদ্ধমার্গে ৩০৬

মুদ্রা বা কুণ্ডল ১২০

মূলবক্ষ ৩১১

অ

যোগ

সাধনের উদ্দেশ্য ৩২১, ৩২৬

মাহাত্ম্য ৩৮৮

ও তত্ত্বের উপদেশ ৩২৩

শব্দের অর্থ ও তাহার অর্থ ৪১৩, ৪১৪

ও ভোগ ২৭০

-মার্গ শ্রেষ্ঠমার্গ ২৭২

যোগবীজম্ পুণি ১২৬

যোগী

জাতি ১, গোত্র ৩

যোগনাথ হইতে উৎপন্ন ২

কালজয়ী ৫১৩

-র দীক্ষাদি ক্রিয়া ১১৭, ১১৮

-র পঞ্চব্রত ও পঞ্চনিয়ম ৪০৩

-র সম্প্রদায় ৪২০

-র চারি প্রকার অবস্থা ৩০১

-র অধিকার ৫৫৩

-র সিদ্ধিলাভ ৫৬২, ৫৬৩

'যুগীয়াকাচ' নামক গ্রামা সঙ্গীত ২২

ব্র

ব্রহ্ম

স্বরূপ ব্যাখ্যা ৫২৫

ও বায়ু দেহস্থৈষ্যের উপাদান ৫২৬

-ময়ী তত্ত্ব ৩২৮

বা পারদের ব্যবহার ৩১০

ব্রহ্মসূত্রী মহাবিশ্বা ৫৭১

ব্রহ্মসংপ্রদায়

সংপ্রদায় ৫১৪

কালজয়ী ৩০৩, ৫২২

দেহবেধ প্রক্রিয়া ৫২১

সিদ্ধি ৩০৩

হরগৌরীতত্ত্ব ৩১৮

ব্রহ্মপূজাপদ্ধতিতে চক্রাহুষ্ঠান ১৭৭

রাওল ২

ব্রাহ্মযোগের ঘোড়শাস্ত্র ৪৫১

ব্রাহ্মস্বামী সংপ্রদায় ২১৮

ল

লক্ষ্যপূরীর অবস্থান ১১৩

লিঙ্গশরীর ৩২৫, ৩২৬

লুইপা

জন্মস্থান ৪৩

বৃত্তান্ত ৫৪-৫৬, ৬০, ৬২

ধর্মমত ৬২-৭১

শ

শক্তি

ও মায়ার বিচার ৩২৩, ৫৭০

ত্রিবিধ অবস্থা ২২৩

তাহার নিগ্রহ ও অহুগ্রহ ২৩৪

তাহার নাম পিণ্ডাদার ২২২

উক্ত অধঃ প্রভৃতি ২২৫

শব্দ

ব্রহ্ম ও তাহার জ্ঞান ৪২৩, ৪২৪

সংস্কার ৪২৪

পরা, পশ্চাতী প্রভৃতি ৪২১

যোগ ও তাহার পরিচয় ৪৮০, ৪৮১

শাক্তদেহ ৩২১

শিখাদিধারণ ১১২

শিখিনাদ ১১৮

শিব

ও পরমশিব ২৮০

সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ ১২৪

অষ্টমূর্তি ২১৫, ৩৩৩

ও শক্তির সম্বন্ধ ২২২, ২২৮, ২২৯, ৫৭০

তাহার তিনটি অবসর ৪২৬

তাহার নিগ্রহ ও অহুগ্রহ ৪৭৩

আত্মবিমর্শ ২৩২

দিব্যচক্ষু ২৭৪

বহিঃপ্রেরণ ২২৪

প্রাপ্তির উপায় ৩২৫

গোরক্ষ মন্ত্র ১১৭

তাহার পূজা ও উৎসবে গোরক্ষ-

গীত ১১৬

শূদ্র

তত্ত্ব ও তাহার ধারণা ৩৫৫, ৩৫০,

৩৬৫, ৫৭৭

সংখ্যা ৩৬০

সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ ৩৪০, ৩৪১,
৩৪৩, ৩৪২
বীজমন্ত্র ৩৪৩
নামাস্তর “ধর্ম”, “অবকাশ” ৩৪৪, ৩৪৮
উন্নয়নী অবস্থায় শৃঙ্খলনা ৩৪৭
শৃঙ্খ, অতিশৃঙ্খাদি ৩৪৩, ৩৪২
শৃঙ্খপর যোগী ৩৪২
পরমপরিণতি ৩৪৪

শ

ষট্‌কল্লক ৪০৭

ষট্‌চক্র

উহার সাধন ২৭২, ৪৪৩
ভেদ ২৭৬, ৩২৮, ৪১২
উহার ছয়টি ধারা ৪৬৩

ষট্‌ত্রিংশতিতত্ত্ব ২৪০

ষট্‌পিণ্ডের চিত্র ২২০, ২২১

উহার আবির্ভাব ২৪২

ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ব ৪০৮

ষড়্‌ধ্বা ব্যাখ্যা ৪২২

ষোড়শাদার ৩২৮

ষোড়শী-কলা ৩১২, ৪২০

-রূপ অমৃতবিন্দু ৪৪৩

ষোড়শীনিত্যার সহিত নাথগণের সংঘ
৩১৩

স

সকল জীব ৪৮২

সকল ও নিকল শিব ৪৮৭, ৪২২

সত্যনাথের জন্ম ২

সদৃশ

তাহার লক্ষণ ৩৭৪-৩৭৬

তিনি অবদূতরূপী ও শ্রেষ্ঠ ৩৬৪,
৩৭৩, ৩৮০

সন্তমধ্যে সাধকশ্রেণী গোরক্ষ উপাসক ১০০

সন্ত, স্ত্রী ও নাথ সাধক ১৮১-১৮৮

সপ্তদশী কলা বা সমনী ৪২৬, ৪০৭

সম্প্রজ্ঞাত সমাদি ২২১

সহজপন্থা ৩২৩

সহজানন্দ ৩৪৩

সহজচক্র বা বজ্র ৪৪৪

সহজাবস্থা লাভ ২৭৩, ৩২৭, ৩২৮

সহজোলা মূর্তি ৪৩২, ৪১৪

সামরস্র ২৭৭, ৩৪০

উহাই মোক্ষ ২০৩

উহা পূর্বসত্যাক্রম ২১২

উহার ভূমি ২০৩, ২০৪, ২২৩

সিকিমে গোরক্ষমূর্তি ১০২

সিদ্ধ ১,

চারি, ছাদশ ও চৌরাশী ৮, ১১, ৩২৮

তাহাদের কাহিনী ১১, ১৬

মতের বৈশিষ্ট্য ২৬৭

সিদ্ধদেহ

উহা অধোনিজ দেহ ৪১২ বা যোগ-
দেহ ২২৩, ২২৬, ২২৭, ৩২০

-যোগীর লক্ষণ ২৮৭, ২২৩

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, গোরক্ষকৃত ১২৭

সিদ্ধি ২৭৮, উহা অন্তরাহ বা সহায় ৪৪২

স্থখ ও দুঃখ ৩১৬

স্বমুদ্রাপথ ৩২২ ৩৩১

উহার মধ্যবর্তী চিত্রানাড়ী ৪৭১

সৃষ্টি ও সংহার ২০৪, ২৩০, ২৪১, ৩৪৭

সৃষ্টিবর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে ২৪৬-২৪২

হ

‘হংস’মন্ত্র ও পক্ষী ৪৬৮, ৪৭৪, ৪৭২

‘হ’ ও ‘ঠ’ সময় ৩২৪ ; উহার সাধন ৪৪৩

হঠযোগ ২৭২, ২৭৩, ৩০০

হরিদাস প্রভৃতি যোগী ৪৬৪

হাড়িপা ১৪, ৭৮, ৭২ ; তাহার শিষ্টা ৭২

হিংলাজ তীর্থ ১০৭, ঐ তীর্থের চিত্র ১১২

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৭	নামধর্ম	নামধর্ম
১৩	৪	লব	সব
১৪	২২ পংক্তির পরে		যোজনা হবে— “মৈনামতিরে গোর্থনাথে ব্রহ্মজ্ঞান কএ” (২য় পৃষ্ঠা পৃ ৩৪৪)
১৮	ফুটনোট ১	G. R. E.	E. R. E.
২৩	১৮	অলৌকিক	অলৌকিক
২৬	৬	কাউচার	ফুশে
৩০	৩	মজ্জেসুর শিখা গোরক্ষ ও জালঙ্করিপা	মজ্জেসুর শিখা গোরক্ষ। জালঙ্করিপাদ পা-পঙ্খের প্রবর্তক
৪০	১৫	তোষচিত্তে	তোষচিত্তে
৪১	১২	শঙ্করের সময়ে (৭৮৮—৮৫০ খৃঃ)	শঙ্করের সময়ে (৭৮৮—৮২০ খৃঃ)
৪৭	ফুটনোট ১	indischin Litterature	indischen Litteratur
৫০	ফুটনোট ১ ৫ লাইন	Con Pro : p. 495 দ্ববার ছাপা হয়েছে ১২৩৫ বা ১০৩৮	Pandurang Sarma ১০৩৫ বা ১০৩৮
৫৪	১৬	খৃষ্টাব্দে	খৃষ্টাব্দে
৬৪	১৭	সমাবেশ হইল। “ধর্মঠাকুরে”	সমাবেশ হইল ধর্মঠাকুরে।
৭২	ফুটনোট ২		ইহা পৃষ্ঠা ৮০র প্রথম প্যারার ফুটনোট
১১২	১	সভায়-ব্রজ	সভায়-ব্রজ
১২৩	১৩	গোরক্ষকল্প (ক) এর পাদটীকা (৩) (খ) এর পাদটীকা (২)	গোরক্ষকলা (ক) এর পাদটীকা (২) (খ) এর পাদটীকা (৩) ‘বিবেক-মার্গণ্ড’ নাম যুক্ত হবে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	অঙ্ক
১২৬	৩	রাজগৃহ	রাজগৃহ
১২২	১১	চৈত্র ১৩২	চৈত্র ১৩২২
১৪৭	৬	নাথজাপে	নাথমার্গে
১৪৮	৮	বড়সির হিপ	বড়সির ছিপ
১৪২	২৫	সপ্ত আশার	সপ্ত হাজার
১৫২	২৫	সিংহল দেশে অজ্ঞতা	সিংহল দেশে ও অজ্ঞতা
	২২	যন্ত্রযানের	যন্ত্রযানের
১৬০	৪	প্রমাণ—ম শতাব্দীর	প্রমাণ সপ্তম শতাব্দীর
১২৪	২৬		
ইত্যাদি	ইত্যাদি	ত্রিক	ত্রিক
১২৫	১৭, ১৮	শিবসূত্রমণিনী	শিবসূত্রবিমণিনী
১২৫ } ১২৭ }	শিরোনামে	বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের	শৈব সম্প্রদায়ের
৩৭৫	২	তত্ত্বদর্শক	তত্ত্বপ্রদর্শক
৪৩০	ফুটনোট ১	Heirdi	Hindi
৪৮২	নীচের দিকে	বিজ্ঞানফল, প্রলয়াকল	বিজ্ঞানকল, প্রলয়াকল
		আণব	আণব
৫০৫	৩	Johne	John
৫৩০	ফুটনোট ২	Somma	Sauma
৫৪২	ফুটনোট ২	Q.	A.
৫৫৫	ফুটনোট ১	কোলতান নির্ণয়	কোলজান-নির্ণয়
৫৪৭	১২	অধাভিমত...	যথাভিমত
৫৫০	শিরোনাম	অবদুত	অবদুত

अरिभिष्टे

श्रीगोरक्षनाथकृत-

सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः

प्रथमोपदेशः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

आदिनाथं नमस्कृत्य शक्तियुक्तं जगद्गुरुम् ।

वक्ष्ये गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् ॥१॥

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

यदा नास्ति स्वयं कर्त्ता कारणं न कुलाकुलम् ।

अव्यक्तं च परं ब्रह्म अनामा विद्यते तदा ॥४॥

अनामेति स्वयमनादिसिद्धमेकमेवानादिनिधनं सिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धं
तस्येच्छामात्रधर्माधर्मिणीनिजा शक्तिः प्रसिद्धा ॥५॥

तस्योन्मुखत्वमात्रेण परा शक्तिरुत्पिता ॥६॥

तस्याः स्पन्दनमात्रेण अपरा शक्तिरुत्पिता ॥७॥

ततोऽहन्तार्धमात्रेण सूक्ष्मशक्तिरुत्पन्ना ॥८॥

ततो वेदनशीला कुण्डलिनी शक्तिरुद्भवा ॥९॥

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

अस्तिता अप्रमेयता अभिन्नता अनन्तरता अव्यक्तता इति पञ्चगुणा
परा शक्तिः ॥११॥

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

निरंशता निरन्तरता निश्चलता निश्चयता निर्विकल्पता इति पञ्चगुणा
सूक्ष्मा शक्तिः ॥१२॥

पूर्णता प्रतिबिम्बता प्रबलता प्रोच्चलता प्रत्यङ्मुखता इति पञ्चगुणा
कुण्डलिनी शक्तिः ॥१४॥

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

अपरम्परात्स्फुरत्तामात्रमुत्पन्नं परमपदाद्भावनामात्रमुत्पन्नम्
शून्यात् स्वसत्तामात्रमुत्पन्नं निरञ्जनात्स्वसाक्षात्कारमुत्पन्नं
परमात्मनः परमात्मोत्पन्नः ॥१८॥

उक्तञ्च :—अपरम्परं परमपदं शून्यं निरञ्जनं परमात्मा

पञ्चभिरेतैः सगुणैरनाद्यपिण्डः समुत्पन्नः ॥२४॥

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

उक्तञ्च—परमानन्दः प्रबोधः चिदुदयः चित्प्रकाशः ।

सोऽहं भाव इत्यन्तः आद्यपिण्डो महातत्त्वगुणयुक्तः समुत्थितः ॥३०॥

आद्यान्महाकाशः महाकाशान्महावायुः महावायोर्महातेजः ।

महातेजसो महासलिलं महासलिलान्महापृथ्वी ॥३१॥

अवकाशः अच्छिद्रं अस्पृश्यत्वं नीलवर्णत्वं शब्दत्वमिति

पञ्चगुणो महाकाशः ॥३२॥

सञ्चारः सञ्चालनं स्पर्शनं शोषणं धूम्रवर्णत्वमिति पञ्चगुणो महावायुः ॥३३॥

दाहकत्वं पाचकत्वं उष्णत्वं प्रकाशत्वं रक्तवर्णत्वमिति

पञ्चगुणं महातेजः ॥३४॥

प्रवाहः आप्यायनं द्रवः रसः श्वेतवर्णत्वमिति पञ्चगुणं महासलिलं ॥३५॥

स्थूलता नानाकारता काठिन्यं गंधः पीतवर्णत्वमिति पञ्चगुणा महापृथ्वी ।

इति महासाकारपिण्डस्य पञ्चतत्त्वं पञ्चविंशतिगुणाः ॥३६॥

• • • • •

तद्ब्रह्मणः सकाशादवलोकनेन नरनारीरूपः प्रकृतिपिण्डः

समुत्पन्नस्तच्च पञ्चपञ्चात्मकं शरीरमिति ॥३८॥

अस्थिमांसत्वङ्नाडीरोमाणि इति पञ्चगुणा भूमिः ॥३९॥

लाला मूत्रं शुक्रं शोणितं स्वेद इति पञ्चगुणा आपः ॥४०॥

क्षुधा तृषा निद्रा कान्तिरालस्यमिति पञ्चगुणं तेजः ॥४१॥

धावनं श्रमणं प्रसारणं आकुञ्चनं निरोधनमिति पञ्चगुणो वायुः ॥४२॥

रागो द्वेषो भयं लज्जा मोह इति पञ्चगुण आकाशः ॥

इति पञ्चविंशतिगुणानां भूतानां प्रकृतिपिण्डः ॥४३॥

मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चैतन्यमित्यन्तःकरणपञ्चकम् ॥४४॥

संकल्पः विकल्पः मूर्च्छा जडता मननमिति पञ्चगुणं मनः ॥४५॥

विवेको वैराग्यं शान्तिः सन्तोषः क्षमा इति पञ्चगुणा बुद्धिः ॥४६॥

अभिमानं मदीयं मम सुखं मम दुःखं ममेदमिति पञ्चगुणोऽहंकारः ॥४७॥

मति धृतिः स्मृतिस्त्यागः स्वीकारः इति पञ्चगुणं चित्तम् ॥४८॥

विमर्शः तच्छीलनं धैर्यं चिन्तनं निस्पृहत्वमिति पञ्चगुणं चैतन्यम्

एवं अन्तःकरण गुणाः ॥४९॥

सत्त्वं रजस्तमः कालो जीव इति कुलपञ्चकम् ॥५०॥

• • • • •

जायत्स्वप्रसुप्तिसुर्यं तूर्यातीतमिति पञ्चावस्थागुणो जीवः ॥५५॥



इच्छा क्रिया माया प्रकृति वागिति व्यक्तिशक्तिपञ्चकम् ॥५६॥
 उन्मादो वासना वाक्छा चिन्ता चेष्टेति पञ्चगुणा इच्छा ॥५७॥
 स्मरणमुद्योगः कार्यं निश्चयः स्वकुलाचार इति पञ्चगुणा क्रिया ॥५८॥
 मदो मात्सर्यं दम्भः कृत्रिमत्वं असत्यमिति पञ्चगुणा माया ॥५९॥
 आशा लप्सा स्पृहाकांक्षा मिथ्या इति पञ्चगुणा प्रकृतिः ॥६०॥
 परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी मातृका इति पञ्चगुणा वाक् ।
 इति व्यक्तिशक्तिपञ्चविंशतिगुणाः ॥६१॥

॥ इति गोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ पिण्डोत्पत्तिर्नाम-
 प्रथमोपदेशः ॥१॥

द्वितीयोपदेशः

अथ व्योमपञ्चकं लक्षयेत् ॥ आकाशं पराकाशं महाकाशं तत्त्वाकाशं
 सूर्याकाशमिति व्योमपञ्चकम् । बाह्याभ्यन्तरेऽत्यन्तं निर्मलं निराकार-
 माकाशं लक्षयेत् । अथवा बाह्याभ्यन्तरेऽत्यन्ताश्वकारनिभं पराकाशमव-
 लोकयेत् । अथवा बाह्याभ्यन्तरे कालानलसंकाशं महाकाशमवलोकयेत् ।
 अथवा बाह्याभ्यन्तरे निजतत्त्वस्वरूपं तत्त्वाकाशमवलोकयेत् । अथवा
 बाह्याभ्यन्तरे सूर्यकोटिसदृशं सूर्याकाशमवलोकयेत् । एवं व्योमपञ्चकाव-
 लोकनेन व्योमसदृशो भवति ॥३०॥

उक्तञ्चः—नवचक्रं कलाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम् ।

सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामधारकः ॥३१॥

अथ अष्टाङ्गयोगः ॥ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा-
 धयोऽष्टावङ्गानि । यम इति उपशमः सर्वेन्द्रियजयः आहारनिद्राशीत-
 वातातपजयश्चैवं शनैः शनैः साधयेत् ॥३२॥

॥ इति गोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ पिण्डविचारो नाम
 द्वितीयोपदेशः ॥२॥

चतुर्थोपदेशः

अथ पिण्डाधारः कथ्यते ॥

अस्ति काचिदपरम्परा संवित्स्वरूपा सर्वपिण्डाधारत्वेन नित्यप्रबुद्धा निजा शक्तिः प्रसिद्धा कार्यकारणकर्तृणामुत्थानदशांकुरोन्मीलनेन कर्त्तारं करोति अतएवाधारशक्तिरिति कथ्यते । अत्यन्तनिजप्रकाशस्वसंवेद्यानु-भवेकगम्यमानशास्त्रलौकिकसाक्षात्कारसाक्षिणी सापरा चिद्रूपिणी शक्ति-गीयते । सैव शक्तिर्यदा सहजेन स्वस्मिन्नुन्मीलिन्यां निरुत्थानदशायां वर्त्तते तदा शिवः सैव भवति ॥१॥

अतएव कुलाकुलस्वरूपा सामरस्यनिजभूमिका निगद्यते ॥२॥

कुलमिति पराभासत्वादहन्ता सत्तां स्फुरत्ताकलास्वरूपेण सैव पञ्चधा विश्वस्याधारत्वेन तिष्ठति ॥३॥

अतएव परापरा निराभासावभासकात्प्रकाशस्वरूपा या सा परा ॥४॥

अनादि-संसिद्धं परमाद्वैतं परमेकमेवास्तीति या अङ्गीकारं करोति सा सत्ता ॥५॥

अनादिनिधनोऽप्रमेयस्वभावकिरणानन्दोऽहमस्मीत्यहं-सूचन-शीला या सा पराऽहन्ता ॥६॥

स्वानुभवचित्त्वमत्कारनिरुत्थानदशां प्रस्फुटीकरोति या सा स्फुरता ॥७॥

नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपस्य स्वयं प्रकाशत्वमाकलयतीति या सा पराकलेति उच्यते ॥८॥

अकुलमिति । जातिवर्णगोत्राद्यखिलनिमित्तत्वे नैकमेवास्तीति प्रसिद्धं । तथा चोक्तमुमामहेश्वरसंवादे—निरुत्तरं । अनन्यत्वादखण्डत्वादद्वयत्वादन-न्याश्रयत्वात् निर्धामत्वादनामत्वादकुलं स्यान्निरुत्तरमिति ॥९॥

अलुप्तशक्तिमान्नित्यं सर्वकारतया स्फुरन् पुनः स्वेनैव रूपेण एक एवावशिष्यते ॥१०॥

अतएव परमकारणं परमेश्वरः परात्परः शिवः स्वस्वरूपतया सर्वतो-मुखः सर्वाकारतया स्फुरितुं शक्नोतीत्यतः शक्तिमान् । शिवोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्त्तुं न किञ्चन । स्वशक्त्या सहितः सोऽपि सर्वस्या-भासको भवेत् ॥११॥

अतएवानन्तशक्तिमान् परमेश्वरः स विश्वरूपो विश्वमयो भवतीति प्रसिद्धं सिद्धानां च परापरस्वरूपा कुण्डलिनी वर्त्तते । अतस्ते पिण्ड-सिद्धाः प्रसिद्धाः सा कुण्डलिनी प्रबुद्धाऽप्रबुद्धा चेति द्विधा । अप्रबुद्धेति तत्र पिण्डचेतनरूपा स्वभावेन नानाचिन्ताव्यापारोद्यमप्रपञ्चरूपा कुटिलस्वभावा कुण्डलिनी स्याता सैव योगिनां तत्तद्विलसितविकाराणां निवारणोद्यम-स्वरूपां कुण्डलिन्युर्ध्वगामिनी प्रसिद्धा भवति ॥१४॥

ऊर्ध्वमिति । सर्वतत्त्वान्यपि स्वस्वरूपमेवेत्यूर्ध्वं वर्त्तते । अतएव सा विमर्शरूपिणी योगिनः स्वस्वरूपमवगच्छन्तीति सुप्रसिद्धा ॥१५॥

एकैव सा मध्योर्ध्वाधः प्रभेदेन त्रिधा भिन्ना शक्तिरभिधीयते ॥१७॥
वाह्येन्द्रियव्यापार नानाचिन्तामया सैवाधः शक्तिरित्युच्यते ॥१८॥

सर्वशक्तिप्रसरसंकोचाभ्यां जगत्सृष्टिसंहतिश्च भवत्येव न सन्देह-स्तस्मात्सामूलमित्युच्यते । अतः प्रायेण सर्वे सिद्धा मूलाधाररता भवन्ति ॥२०॥

स्थूलेति निखिलग्राह्याधार विग्राह्य स्वरूपापि पदार्थान्तरे भ्राम्य-माणा (इव) चिद्रूपा या वर्त्तते सा कुण्डलिनी साकारा । स्थूला पुनास्त्वयमेव स्वप्रसारचातुर्यतया वर्त्तमाना योगिनां परमानन्दतया कुण्डलिनी या निश्चयभूता वर्त्तते सा सूक्ष्मा निराकारा प्रबुद्धा महासिद्धानां मते प्रसिद्धा ॥२२॥

सृष्टिः कुण्डलिनी स्याता द्विधा भागवती तु सा ।
एकधा स्थूलरूपा च लोकानां प्रत्यगात्मिका ॥
अपरा सर्व्वगा सूक्ष्मा व्याप्तिव्यापकवर्जिता ।
तस्याः भेदं न जानाति मोहितः प्रत्ययेन तु ॥२३॥

तस्मात् सूक्ष्मा परासंवित्स्वरूपा मध्या शक्तिः कुण्डलिनी योगिभि-र्देहसिद्धयर्थं सद्गुरुमुखाज्ज्ञात्वा स्वस्वरूपदशायां प्रबोधनीया ॥२४॥

सर्वेषां तत्त्वानामुपरिवर्त्तमानत्वान्निर्नाम परमं पदमेव ऊर्ध्वं

प्रसिद्धं तस्याः स्वसंवेदनं नानासाक्षात्कारं सूचनशालायासोर्ध्वशक्ति-
रभिधीयते.....॥२५॥

.....परापरविमर्शरूपिणी संविन्नानाशक्तिरूपेण निखिलपिण्ड-
धारत्वेन वर्तते इति सिद्धान्तः ॥२६॥

॥ इति महेश्वरावतार श्रीगोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ
पिण्डाधारनामा चतुर्थोपदेशः ॥४॥

पञ्चमोपदेशः

अथ पिण्डपदसमरसकरणो कथ्यते ।

यत्र बुद्धिर्मनो नास्ति तत्त्वविद्यापराकला ।
उहोपोहौ न कर्तव्यौ वाचा तत्र करोति किम् ।
वाग्मिना गुरुणा सम्यक् कथं तत्पदमीर्यते ।
तस्मादुक्तं शिवेनैव स्वसंवेद्यं परं पदम् ॥३॥

अतएव नानाविधविचारचातुर्यचर्चा विस्मयां गत्वाद्गुरुचरणकृपा-
तत्त्वमात्रेण निरूपाधिकत्वेन निर्णेतुं शक्यत्वात् स्वसंवेद्यमेव परमपदं
प्रसिद्धमिति सिद्धान्तः ॥४॥

निजपिण्डपरीक्षा च स्वस्वरूपकिरणानन्दोन्मेषमात्रं यस्योन्मेषस्य
प्रत्याहरणमेव समरसकरणं भवति ॥११॥

एवं पिण्डे संसिद्धे ज्ञानप्राप्त्यर्थं तच्च परमं पदम् महासिद्धानां मतं
परिज्ञाय च तस्मिन्नहं भावे जीवात्मा च सहजसंयमसोपायाद्वैतक्रमेणोप-
लभ्यते ॥२५॥

तत्र सहजमिति विश्वातीतं परमेश्वरं विश्वरूपेणावभासमानमिति
ज्ञात्वाकमेवास्तीति स्वस्वभावेन यज्ज्ञानं तत् सहजं प्रसिद्धम् ॥२६॥



संयम इति सावधानानां प्रस्फुरद्दयापाराणां निजवर्त्तिनां संयमं
कृत आत्मनि धीयत इति संयमः ॥२७॥

सोपायमिति स्वयमेव प्रकाशमयं स्वेनैव स्वात्मन्येकीकृत्य सदा
तत्त्वेन स्थातव्यम् ॥२८॥

अद्वैतमित्यकर्तृतयैव योगी नित्यतृप्तो निर्विकल्पः सदा निरुत्थान-
त्वेन तिष्ठति ॥२९॥

* * * * *

अनुबुभूषति यो निजविश्रमं सद्गुरुपादसरोरुहमाश्रयेत् ।
तदनुसंसरणात् परमं पदम् समरसीकरणं न च दूरतः ॥४५॥

* * * * *

एतेषामपि सर्वेषां विज्ञाता यः स योगी स सिद्धपुरुषः स योगी-
श्वरेश्वर इति परमरहस्यं प्रकाशितम् ॥५५॥

अतएव सम्यङ् निजविश्रान्तिकारकं महासिद्धयोगिनं सद्गुरुं
सेवयित्वा सम्यक् सावधानेन परमं पदं संपाद्य तस्मिन्निजपिण्डे च समरस-
भावं कृत्वात्यन्तनिरुत्थानेन सर्वानन्दतत्त्वे निश्चलं स्थातव्यं ततः स्वयमेव
महासिद्धो भवतीति सत्यम् ॥५६॥

* * * * *

योगीश्वरेश्वरस्यैवं नित्यतृप्तस्य योगिनः ।
चित् स्वात्मसुखविश्रान्ति भावलब्धस्य पुण्यतः ॥५८॥

* * * * *

कथनाच्छ्रुतिपाताद्वा यद्वा पादावलोकनात् ।
प्रसादात् स्वगुरोः सम्यक् प्राप्यते परमं पदम् ॥६५॥

* * * * *

किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च ।
दुर्लभाश्चित्तविश्रान्ति विना गुरुकृपां पराम् ॥८१॥
चित्तविश्रान्तिलब्धानां योगिनां दृढचेतसाम् ।
स्वस्वमध्ये निमग्नानां निरुत्थानं विशेषतः ॥८२॥
निमिषात् प्रस्फुटं भाति दुर्लभं परमं पदम् ।
यस्मिन् पिण्डो भवेज्जीनः सहस्रानां संशयः ॥८३॥

संवित् क्रियाविकरणोदयचिद्विलासो विश्रान्तिमेव भजतां स्वयमेव
भाति । अस्ते स्ववेगनिचये पदपिण्डमैक्यं सत्यं भवेत् समरसं गुरु-
वत्सलानाम् ॥८४॥

॥ इति श्रीगोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ पिण्डपद-
समरसकरणं नाम पञ्चमोपदेशः ॥५॥

षष्ठोपदेशः

अथ अवधूतयोगिलक्षणे कथ्यते ।

यः सर्वान् प्रकृति विकारानवधुनोतीत्यवधूत योगी ।

* * * * *

प्रसरं भासते शक्तिः संकोचं भासते शिवः ।

तयोर्योगस्य कर्त्ता यः स भवेत्सिद्धयोगिराट् ॥६३॥

विश्वातीतं यथाविश्वमेकमेव विराजते ।

संयोगेन सदा यस्तु सिद्धयोगी भवेत्तु सः ॥६४॥

सर्वासां निजवृत्तीनां प्रसृतिर्भजते लयम् ।

स भवेत् सिद्धसिद्धान्ते सिद्धयोगी महाबलः ॥६५॥

उदासीनः सदाशान्तः स्वस्थोन्तर्निजभासकः ।

महानन्दमयो धीरः स भवेत् सिद्धयोगिराट् ॥६६॥

परिपूर्णप्रसन्नात्मा सर्वासर्वपदोदितः ।

विशुद्धो निर्भरानन्दः स भवेत् सिद्धयोगिराट् ॥६७॥

गते न शोकं विभवे न वाञ्छा प्राप्ते न हर्षं न करोति योगी ।

आनन्दपूर्णा निजबोधलीनो न बाध्यते कालपथेन नित्यम् ॥६८॥

* * * * *

॥ इति श्रीमहेश्वरावतारश्रीगोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धता-
वधूतयोगिलक्षणे नाम षष्ठोपदेशः समाप्तः ॥६॥

॥ श्रीरस्तु ॥

অভিমত

From Mahamahopadhyay Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.

I have read the work with care and attention. The subject chosen is undoubtedly a good one as it furnishes ample scope for original investigation. Though a lot of historical research has been done on Nath culture, nothing of much importance seems to have even been attempted in regard to its philosophical and mystical aspects.

The first part is generally of the nature of a compilation of results of researches carried on by earlier writers. The second and third parts contain much more useful and original matter. The chapter which deals with the system of Yoga in vogue among the Naths as evident from Bengali Literature is interesting.

The greatest and substantial contribution of the writer is the presentation of the contents of "Siddha-Siddhanta-Paddhati". This is a very valuable work though cryptic in character. The presentation and interpretation are commendable and represent an original contribution in the field of Nath Philosophy. The data of doctrinal and cultural traditions found in the works like "Amanaska" and "Yogavija" have been used by way of confirming and illustrating the teachings of "Siddha-Siddhanta-Paddhati". This adds to the originality and importance of the contribution made by the writer. The attempt of the writer as that of the pioneer worker in an unexplored field is admirable.

Sd. Gopinath Kaviraj

From Dr. P. C. Bagchi, M. A., Dr. es Lettres (Paris),

Santiniketan.

I have carefully read the work of Dr. Kalyani Mallik on the History and Philosophy of the Nath Sect. This is the first attempt to present the subject in a comprehensive manner. She has spared no pains in collecting materials from various sources such as the MSS Libraries, the Nath teachers and Sannyasis. The book as such is well documented, critical and authoritative. The author must be warmly congratulated for her successful performance.

Sd. P. C. Bagchi



From Krishna Chandra Bhattacharyya, M. A.

The work is an informative and well documented dissertation in Bengali on the history, philosophy and esoteric discipline of Nath Yogis, an influential religious sect of mediaeval India.

The first portion gives a general account of the origin and affiliations of the sect and critically investigates, in the light of previous researches, questions on the probable time of the traditional Gurus of the sect and brings out interesting affiliations of the sect with Saiva and Bhuddistic schools of thought and with the Tantrik and other mystic cults of the mediaeval period.

More valuable part of the work appears in the second portion dealing with the philosophy of the Nath sect and giving a systematic exposition and philosophy in 12 chapters supported by detailed references to works accepted by the sect as authoritative and supplemented by comparisons with Vedantic and other schools of thought.

The work shows considerable industry and sympathetic understanding of the Cult, of free inner realization in different forms adopted by the Nath Yogis of Bengal and allied Indian sects.

Sd. Krishna Chandra Bhattacharyya

From Dr. H. D. Bhattacharyya, M. A., B. L., P. R. S., Darsana-sagara, retired head of the department of philosophy and Provost, Jagannath Hall, Dacca University

ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহার নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালীতে যে বিপুল অব্যাসম্ভার একত্রিত করিয়াছেন তাহাতে প্রতিপৃষ্ঠায় তাঁহার অধ্যবসায়, গভীর জ্ঞান ও সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা একটা প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হইবে এ আশা করা অসম্ভব হইবে না। হয়তো স্থানে স্থানে কিছু পুনরুক্তি আছে ও সংস্কৃতাংশে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি আছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এ সব ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারিত হ'বে। নাথসম্প্রদায়ের শাস্ত্রে অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়—এ পুস্তকেও তাহাদের সংখ্যা কম নয়। হয়তো পরিশিষ্টাংশে তাহাদের ব্যাখ্যাও সংলগ্ন করা প্রয়োজন হইবে। তিনি যে পরিশ্রমের সহিত এই ছুটির কার্য্যটা সম্পন্ন করিয়া যশঃ অর্জন করিয়াছেন তাহার যথোচিত সমাদর হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। আশা করি তিনি সময় ও সুবিধামত ইহার একটা ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশিত করিবেন।

স্বাঃ শ্রীহরিন্দাস ভট্টাচার্য্য